ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২২ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০]   ভারতী কার্য্যালয়,   [বার্ষিক মূল্য ৩।৵০
২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২২ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

চিত্র-সূচী

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২২ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০]   ভারতী কার্য্যালয়,   [বার্ষিক মূল্য ৩।৵০
২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২২ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

চিত্র-সূচী



কলঙ্কের বোঝা

শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর সি, আই, ই অঙ্কিত চিত্র হইতে।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২২ [১ম সংখ্যা

বিদায় গ্রহণ

পুরাতন চিরস্থায়ী নহে অথচ তাহার মৃত্যুও নাই। সে বর্ত্তমান নূতনে। পিতা-মাতা সন্তানে জীবিত, পূর্ব্বস্রোত পরবর্ত্তী স্রোতে প্রবাহিত, অতীত ভবিষ্যতে সম্মিলিত। নূতনে লীন হইতে না পারিলেই পুরাতনের প্রকৃত মৃত্যু।

পুরাতনের প্রধান ধর্ম্ম নূতনকে অনুগামী করা অর্থাৎ পথ দেখান, অন্য কথায় নূতনকে গঠিত করিয়া তোলা। ইহাতে যে সফলতা লাভ করে তাহার জীবনই সার্থক। আমার বহুদিনব্যাপী সাহিত্যসেবায় যদি এই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সার্থক হইয়া থাকে তবেই আমি ধন্য। কিন্তু সে বিচারের ভারও নূতনের হস্তে।

প্রায় বাধাবিঘ্নহীন নহে। আমার পক্ষেও ভারতীর সম্পাদন কার্য্য নিষ্কণ্টক কর্ত্তব্য পালন ছিল না। পত্রিকা সম্পাদনের অর্থই, পাঁচজনকে লইয়া পাঁচজনের হইয়া কাজ করা; এই কাজের মধ্যে একটি সেরা কাজ শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের দ্বারস্থ হওয়া, অর্থাৎ ভিক্ষা করা। কোন পুরবালার পক্ষে এ কার্য্য কিরূপ অসম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ভারতীর সৌভাগ্য এই যে—এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে তাহাকে মনোযোগ প্রদান করিতে হয় নাই। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে, যেখানে অকুণ্ঠিত প্রার্থনায় বড় আশা করিয়া হাত পাতিয়াছি সেখানেও অধিকাংশ সময় হতাশ্বাসের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে হইয়াছে। আবার আশাতীত স্থল হইতেও

পূর্ণ আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে! এইরূপেই বুঝি জীবনের তৌলদণ্ডে আশা নৈরাশ্যের পরিমাণ সমান থাকিয়া যায়।

সুরুচিসুশ্রীল সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্র ও মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করাই ভারতীর প্রধানতম কর্ত্তব্য ছিল; আর আনুসঙ্গিক একটি কর্ত্তব্য ছিল, নূতন লেখকদিগকে গড়িয়া তোলা। গুপ্ত প্রতিভাকে ফুটাইয়া তুলিতে ভারতী কোনদিন পরিশ্রমকাতর হয় নাই। যে লেখার মধ্যেই কোন একটু সার পদার্থ মিলিয়াছে তাহাই মার্জ্জিত সুশোভিত আকারে ভারতীর পত্রে স্থান লাভ করিয়াছে।

যখন এই সম্পাদন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন ফলাফল লাভক্ষতি গণনা করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। কর্ম্মের আনন্দই কর্ম্মে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়াছিল। আজ সে উৎসাহ-উত্তেজনার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। আজ আমি বড়ই একাকী, বড় অসহায়; আজ শ্রান্তক্লান্ত দেহমন একান্তই নিবৃত্তিলোলুপ।

কিন্তু প্রবৃত্তিতে আনন্দ আছে নিবৃত্তিতে কি নাই? দানের তৃপ্তি কি গ্রহণের তৃপ্তি হইতে অল্প? পূজার মাহাত্ম্য কি বিসর্জ্জনেই ঘনীভূত নহে? বস্তুতঃ ত্যাগের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ বিরাজিত। ব্রত গ্রহণ করিয়া আমি যে উদ্‌যাপনে অবসর পাইলাম ইহাই আমার কর্ম্মের প্রকৃত পুরস্কার।

বিদায়ের দিনে আজ আমার নয়ন যদিও অশ্রুপূর্ণ কিন্তু হৃদয় নিষ্কাম-নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল। সযত্নপালিতা ভারতীকে নবীনের উৎসাহযুক্ত, কার্য্যক্ষম, বলশালী হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক আজ আমি মাতার ন্যায়ই কৃতার্থ।

এই ব্রতসাধনে এতদিন যাঁহারা আমাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছেন, কর্ম্মজীবনের সেই সহায় বন্ধুদিগকে আজ অবসর গ্রহণ কালে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা নমস্কার জ্ঞাপন করি।

পত্রিকা পাঠসূত্রে পাঠকগণও সম্পাদকের সহিত পরিচিত। তাঁহারাও আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন! ভারতীর প্রতি তাঁহারা যেরূপ প্রীতিপূর্ণ অনুরাগ দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাকে যথেষ্ট সম্মানিত জ্ঞান করি! তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই, সম্পাদক পদ ত্যাগ করিলাম বলিয়া ভারতীর সহিত আমার সম্বন্ধ একেবারেই যে ছিন্ন হইয়া গেল এমনটা যেন তাঁহারা মনে না করেন। লেখকরূপে ভারতীর পত্রে তাঁহাদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবার আশা রাখি।

নবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমার স্নেহভাজন আত্মীয়;—তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদ এই, বিধাতা এ কার্য্যে তাঁহাকে কৃতকার্য্য ও জয়যুক্ত করুন!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

আমার কথা

পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর সম্পাদনভার আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এ স্নেহের দান আমি পরম শ্রদ্ধার সহিত মাথায় তুলিয়া লইতেছি। এ ভার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আমার আছে কি না জানি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে ভারতীর গৌরব যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তজ্জন্য আমার মনপ্রাণ সর্ব্বদা সজাগ রাখিতে চেষ্টা পাইব।

ভারতীর গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকবর্গ—এতদিন যাঁহারা ভারতীকে স্নেহ এবং অনুকূল দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সেই স্নেহ ও আনুকূল্য হইতে আমি বঞ্চিত হইব না—এই ভরসায় ভারতীর ভারগ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছি। বঙ্গসাহিত্যের যে-সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ এবং উদীয়মান নবীন লেখক এতদিন ভারতীর শ্রীসম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন ভবিষ্যতে তাঁহারা সে বিষয়ে কার্পণ্য প্রকাশ না করেন—ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা। তাঁহাদের সাহায্য এবং অনুগ্রহের উপর ভরসা রাখিয়াই আমি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি

বহুকাল ধরিয়া ভারতীর সেবা করিয়া পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আজ অবসর লইতেছেন। এ অবসর তাঁর উচিতমতো প্রাপ্য হইলেও তাঁহাকে বিদায় দিতে আমাদের চিত্ত ব্যথিত ও কাতর হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের মাসিক সাহিত্যের এখনো এমন সময় আসে নাই যে তাঁহার মতো এমন একজন নিপুণ সম্পাদককে এত অনায়াসে আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। তাঁহার এই অবসরগ্রহণে মাসিক-সাহিত্য সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইল বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে আশার কথা এই যে, তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, ভারতীর সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলেও তিনি সাহিত্যসেবা এবং ভারতীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক একেবারে রহিত করিবেন না।

ভারতীর সেবায় তাঁহার যেরূপ অদম্য উৎসাহ, অসীম আনন্দ, উদার নিষ্ঠা এবং

অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়াছি এমন কোথাও দেখি নাই। যখনি তাঁহার কাছে গিয়াছি দেখিয়াছি পূজারিণীর মতো তিনি ভারতীর পুষ্পপাত্র সাজাইতেছেন। বাংলা দেশের একজন মহিলার পক্ষে ভারতীর মতো একখানা সুনিয়ন্ত্রিত মাসিক-পত্রিকার পরিচালনা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা যিনি নিজ চক্ষে উহা না দেখিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন না। এই দুরূহতার সহিত প্রতিদিন তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে দেখিয়াছি; বিপদ আপদেও কখনো তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। ভারতীর কাজে তাঁহার এমন একটি পরিপূর্ণ আনন্দ ছিল যাহার বলে তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং নৈরাশ্যকে দলিয়া যাইতে পারিতেন।

সাহিত্য সাধনাই তাঁহার চির-জীবনের সাধনা—ইহা কাহারো অবিদিত নাই। তাঁহার সে সাধনার ফলসম্বন্ধে আলোচনা করার উপযুক্ত স্থান ও কাল ইহা নহে। তবে সকলে এ কথায় আমার সহিত এক-মত হইবেন যে, তিনি বাংলা দেশের নারীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন; এবং বিশ্বনারীসভায় বাঙালী নারীকে বরেণ্য করিয়া তাঁহাদের গৌরব-আসন সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন।

বাংলার অনেক নবীন লেখক তাঁহার কাছে সবিশেষ ঋণী। নবীন লেখকগণ যাহাতে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারে তাহার জন্য তাঁহার একটা আন্তরিক চেষ্টা ছিল। এতটুকু লেখা যাহার ভালো দেখিয়াছেন তাহাকেই মুক্তকণ্ঠে উৎসাহ দিয়াছেন;—কেমন করিয়া তাহার লেখা প্রকাশযোগ্য হইবে তজ্জন্য বিধিমত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুগ্রহ অনেক নবীন লেখক ইহজন্মে ভুলিতে পারিবে না। আমিও সেই দলের একজন। তাঁহার নিকট হইতে সাহিত্য-সাধনায় নানা বিষয়ে আমি এত উৎসাহ পাইয়াছি যে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এ ঋণ শুধু কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পরিশোধ করিবার নহে।

পরিশেষে একটি কথা বলিতে চাই। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আমার সহিত একযোগে ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বন্ধুত্বের নানা ঋণে তিনি আমাকে পূর্ব্ব হইতেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এখন আবার নূতন ঋণপাশে বদ্ধ করিলেন।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

নববর্ষ

এস তুমি নিত্য নূতন ! নিদাঘ-দীপ্ত সাজের ঝাঁকে,—
মিলিয়ে গেছে কালের বেলায় বর্ষ যেথা লাখে লাখে।
চল্‌ছে ঘুরে ঋতুর খেলা, প্রাচীন তোমায় দেখেনি কেউ ;
স্রোতের উপর স্রোত চলেছে, ঢেউ-এর উপর চলেছে ঢেউ।

জন্ম জরা মৃত্যু ফোটে বুদ্‌বুদিয়ে তটে তটে,—
তোমার দীপ্ত মূর্ত্তি নিত্য বিম্বিত সে সিন্ধুপটে।
বিশ্ব ভাঙ্গে, বিশ্ব গড়ে, চূর্ণ আশার প্রতি অণু ;
যৌবনেতে ফুল্ল তুমি, জীবন-রসে সিক্ত তনু।

লঙ্ঘি' তুমি অগণিত লক্ষ লক্ষ সাগর শিলা,
এলে নবীন ! ভবের তটে দেখতে মোদের মর্ত্ত লীলা।
অর্ঘ্য দিয়ে সম্ভাষিতে অন্ধ আতুর সবাই হাজির ;
ওগো নূতন ! লওগো তুলে ফুল দুটি এই ভাঙ্গা সাজির।

রুধিরাক্ত ধরাখানি হিংসা দ্বেষের দ্বন্দ্বে রণে,
শান্তিজলে অভিষিক্ত কর তুমি শুভক্ষণে।
সাম্য মৈত্রীর নব নীতি আন তুমি ভবে এবার ;
করাও অভিনব লীলা বিশ্বব্যাপী নরসেবার।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দশের একজন

মে মাসের অপরাহ্ন। অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান কিরণ-রেখা ডিউক মোরার উপরকার বসিবার ঘরের জানালায় সবুজ ভেলভেটের পরদার উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল। চারিধার স্তব্ধ। মন্ত্রিসভার সদস্যের দল আপনাদের কাজ সারিয়া তখন বিদায় লইয়াছে। পথে ডিউকের প্রাসাদের সম্মুখে ডাক্তার জেঙ্কিন্সের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল।

কাল হইতে ডিউকের শরীরটা খারাপ যাইতেছে। আজ আহারের পর হইতে আরও খারাপ বোধ হইতেছিল, তাই পার্ল-ডাক্তার জেঙ্কিন্সের তলব পড়িয়াছে। ডিউকের কাল হইতে ক্ষুধা নাই, চোখে নিদ্রাও নাই—শরীরটা অত্যন্ত ভার বোধ হইতেছিল।

জেঙ্কিন্স ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডিউকের খাস-কামরায় বসিয়া জেঙ্কিন্স ভাবিতেছিল, কি আবার নূতন উপসর্গ ঘটিল যে হঠাৎ এই অবেলায় ডাক পড়িয়াছে! ডিউক চারি-পৃষ্ঠা-লেখা একখানা চিঠি পড়িতে ছিলেন, সম্মুখে একজন অনুচর চোখে অধীর আগ্রহ লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চিঠিখানা পড়িবার সময় ডিউক নিজের মনেই অসম্বদ্ধ দুই-একটা কি কথা বকিতেছিলেন—মধ্যে মধ্যে কলমটা টানিয়া লইয়া চিঠির গায়ে দুই-চারিটা আঁচড়ও টানিতেছিলেন। বাহিরে মর্ম্মরে-রচা কৃত্রিম নির্ঝরের জলের উপর সোয়ালোর ঝাঁক মৃদু আনন্দ-ধ্বনি তুলিয়া ঘুরিতেছিল; এবং দূরে পুলের উপর বসিয়া কে ক্লারিয়োনেট বাজাইতেছিল, অপরাহ্নের স্নিগ্ধ-শীতল বায়ু-তরঙ্গে তাহারই উদাস সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

ডিউক মোরা হঠাৎ চিঠিখানা টেবিলে রাখিয়া অনুচরকে কহিলেন, "না, এ আজ আর দেখা হবে না—লাস্তিগ্। কাল নিয়ে এসো—আমার হাত-পাগুলো বড় ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। এই যে ডাক্তার, দেখ ত—আমার হাত যেন হিম হয়ে রয়েছে, ঠিক যেন বরফ-জলে হাত ধুয়েছি—। আজ দু'দিন ধরে শরীরটা এমনি খারাপ রয়েছে! অথচ, এমন গরম যাচ্ছে—নাঃ, কোথায় যে গোল হল, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।"

ডাক্তার রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হুঁ—দেখলুম। একটা কথা,—এর ভিতর কোন অত্যাচার কিছু হয়েছিল?"

ডাক্তারের মনে একটা সন্দেহ জাগিতে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু ঈর্ষাও! নূতন সেই বন্ধুটির সহিত ডিউকের অন্তরঙ্গতা ডাক্তার লক্ষ্য করিয়াছিল; কিন্তু সে বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে ত ডাক্তার কোন একটা ইঙ্গিত করিতে পারে না—তাই আজ অবসর পাইয়া সেই বিষয়টার প্রতিই মৃদু ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার এই প্রশ্ন করিল। প্রশ্ন করিয়া অধীর চোখে আগ্রহ

ভরিয়া সে ডিউকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ডিউকের মুখে কোন ভাবান্তর ঘটিল না—ভ্রূদুইটাও অকুঞ্চিত রহিল। ডিউক বেশ শান্ত স্বরেই কহিলেন, "ঐটেই তোমার ভুল, ডাক্তার। আমি এখন এত বাঁধা নিয়মে রয়েছি যে ছেলেবেলাতেও বোধ করি এমন ছিলুম না।"

ডাক্তারের মনের মধ্যে ঈর্ষাটা তীব্রতর হইয়া উঠিল। ডাক্তার কহিল, "তাই ত, তবে গোল হল কি করে?"

ডাক্তার দ্বিতীয়বার আর এ কৌতূহলটাকে পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ পাইল না—ইহার বেশী অগ্রসর হইবার সাহসও তাহার ছিল না—এবং সে বিষয়ে অধিকার আছে কি না, সে-সম্বন্ধেও ডাক্তারের মনে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। ডাক্তার কি বলিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময় ডিউক কহিলেন, "শোন ডাক্তার, ভেবে যে তুমি কতকগুলো আবল-তাবল হেঁয়ালি বকবে, তার দরকার নেই—সে সব শুনতে আর ভালও লাগে না, আমার। সাফ জবাব দাও—এত ঠাণ্ডা আমি বোধ করছি কেন? কি এ? খুব অল্প কথায় বুঝিয়ে দাও—"

ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য দ্বিধায় পড়িল—তার পর কহিল, "শরীরে রক্ত নেই—তার উপর খাটুনি, মাথা-ঘামানো,—এই। এ ছাড়া আর ত কোন কারণ দেখছি না।"

"তাহলে এর প্রতিকার কি?"

"প্রতিকার, চুপ করে বসে থাকা—একদম্ জিরুনো। কোন রকমে মাথা-ঘামানো নয়, কোনরকম খাটুনি নয়। তার উপর যদি হপ্তাখানেকের জন্য কোথাও বেড়িয়ে আসতে পারেন—এই ধরুন, গ্রানবোয়ে— কি—"

ডিউক ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "থামো, থামো। বেড়াতে গেলে এই কৌন্সিলের মিটিং, তবে গে—না, না, সে ত হতেই পারে না—অসম্ভব!"

ডাক্তার কহিল, "কিন্তু মাথাটাকে একটু ছুটি না দিলে—"

ডাক্তারের কথা শেষ হইল না। এক জন ভৃত্য একখানা কার্ড আনিয়া ডিউকের হাতে দিল। ডিউকের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল! ডাক্তার কথা বন্ধ করিয়া কার্ডখানার দিকে চাহিয়া দেখিল—পরিচিত নাম! ডিউক কার্ড রাখিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "আচ্ছা, একটু বসতে বল।" ভৃত্য বিদায় লইল; পরে ডাক্তারের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "আসল কথা কি জানো, ডাক্তার, যেমন করেই হোক—অর্থাৎ বুঝেছ কি না—তোমার পার্শের মাত্রাটা না হয় কিছু বাড়িয়ে দাও, যা দিচ্ছ, তার ডবল দাও। মাথা থেকে নতুন আর কোন-একটা ওষুধ বার কর। এই রবিবারটা আমায় চাঙ্গা রাখো—বুঝতে পারছ, এই রবিবারটা আমার শরীর যেন খুব ভালো থাকে—!"

জেঙ্কিন্স একবার কাশিয়া গলাটা সাফ করিয়া লইয়া বলিল, "আপনাকে কিন্তু ভারী সাবধানে থাকতে হবে, ডিউক বাহাদুর। আপনার শরীর যা হয়েছে, তাতে আমি আপনাকে খুব যে ভরসা দিতে পারি—এ বোধ হয় না। আপনাকে স্পষ্টই বলছি, জানবেন—আমার কর্ত্তব্য বলেই এত স্পষ্ট করে বলছি—"

ডিউক হাসিয়া কহিলেন, "তোমার কর্ত্তব্য-টর্ত্তব্য ও-সব বাঁধা বুলি তুলে রাখো, ডাক্তার। আমি যাতে সুখে থাকি, যা করে সুখ পাই, তাতে তুমি বাধা দিতে এসো না—এ প্রাণটুকু যেমন ভাবেই জ্বলে শেষ হোক্ না কেন, সব থেকে বঞ্চিত করে রাখলে আমি আগেই এটুকু ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেব। সব ছেড়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সব নিয়ে একটা ঝড় তুলে মরাও যে ঢের ভালো বোধ হয়, আমার।"

বাহিরে একটা শব্দ হইল। ডিউক চাহিয়া দেখিলেন, ডচেস। সুন্দর কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছের মধ্যে সুন্দর মুখখানি লইয়া ডচেস্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডচেস্ ভৎর্সনার স্বরে কহিলেন, "এ কি—এখনও ঘরের কোণে বসে রয়েছ! বেড়াতে বেরোও নি? এই যে ডাক্তার জেঙ্কিন্স। ডাক্তার, আপনার রোগীকে বকুন ত—কিছুতেই ওঁকে পারা গেল না। এই দেখুন না, আপনাদের মানা সত্ত্বেও উনি এমন বিকেল বেলাটা বদ্ধ ঘরের কোণে বসে আছেন! কেবল কাজ, কাজ, কাজ! শরীর না থাকলে, কাজ করবে কে?"

ডিউক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "ঐ শোন, ডাক্তার।" পরে ডচেসের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কিন্তু তুমি এখনও বড় বেড়াতে যাও নি যে!"

ডচেস্ কহিলেন, "আমি ত একলা যাব না। তোমায় আজ সঙ্গে নিয়ে যাব। কাকা আমায় এক-খাঁচা পাখী পাঠিয়েছেন, তোমায় দেখাব, এস। কত রঙ-বেরঙের পাখী—ছোট ছোট চোখগুলি! যেন কে একজোড়া করে' কালো মুক্তো এঁটে দিয়েছে। ভারী সুন্দর, দেখবে এস।"

"চল" বলিয়া ডিউক উঠিয়া দাঁড়াইলেন; যাইবার সময় ডাক্তারকে বলিয়া গেলেন, "তুমি বসো, ডাক্তার—আমি এখনই আসছি।"

ডিউক চলিয়া গেলে, জেঙ্কিন্স বসিয়া সমস্ত ঘরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইল। তাহার মনের ভিতর হইতে কিসের একটা জ্বালা ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। সহসা ডিউকের চেয়ারের সম্মুখে টেবিলের ড্রয়ারের উপর তাহার নজর পড়িল। ড্রয়ারটা একটু খোলা রহিয়াছে এবং কলের মুখে রিঙে করা চাবিটা লাগানো—চাবিটা সোনার। ডিউকের এতখানি অসতর্কতার কারণ আর কিছুই নহে—শুধু একটা গর্ব্বিত অবহেলা মাত্র! জেঙ্কিন্সের মনে হইল, চাবিটা যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'কাহার এমন সাহস হইবে যে আমায় স্পর্শ করে!'

কাহার এমন সাহস! হাঁ, এত স্পর্দ্ধা! সে সাহস জেঙ্কিন্সের বিলক্ষণ আছে! কিসের ভয়!

জেঙ্কিন্স ড্রয়ার টানিল। ভিতরে বিস্তর কাগজ-পত্র, কিন্তু সবার উপরে ঐ যে একখানা চিঠি, খামে মোড়া—খামের গোড়াটা ছেঁড়া রহিয়াছে, ওটা—! খামের উপর বড় বড় পরিচিত অক্ষরে ডিউকের শিরোনামা লেখা! জেঙ্কিন্সের প্রাণে কে যেন একটা তপ্ত লোহা ঠেকাইয়া দিল, প্রাণ তাহার জ্বলিয়া

উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া কম্পিত হস্তে সে খামখানা উঠাইয়া লইল। খাম খানার গায়ে তখনও একটা মিষ্ট গন্ধ মাখা রহিয়াছে—চারিধার যেন হাজার ফুলের গন্ধে ভরিয়া উঠিল। জেঙ্কিন্স খামখানা হাতে লইয়া দেখিল, তবে সত্য—তাহার সন্দেহ সত্যই তবে! তাই আজকাল ফেলিসিয়া ডাক্তারকে এতখানি অবজ্ঞা দেখাইতেছে, তাই আজ ডাক্তারের সহিত কথা কহিবারও ফেলিসিয়ার এতটুকু অবসর মিলে না! বটে! ভিতরে ভিতরে এতখানি তোমরা গড়িয়া তুলিয়াছ! ফেলিসিয়া—রাক্ষসী!

জেঙ্কিন্সের প্রাণে কে যেন বিষ ঢালিয়া দিল—সে বিষে সর্ব্বাঙ্গ তাহার জ্বলিয়া গেল। এই অপদার্থ ডিউক—এতটুকু যাহার প্রাণ নাই, মন নাই, ধনের গর্ব্বে দুনিয়াকে যে গ্রাহ্যও করে না—নারী যাহার কাছে ভোগের, বিলাসের খেলানা মাত্র—সেই ডিউকের কোন্ গুণে মুগ্ধ হইয়া ফেলিসিয়া এমন করিয়া আপনাকে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছে! আর জেঙ্কিন্স—যে তাহার জন্য মরে—সেই জেঙ্কিন্সকে এমন নিষ্ঠুর উপেক্ষায় জর্জ্জরিত করিয়া, দগ্ধাইয়াও তোমার তৃপ্তি হইল না, ফেলিসিয়া? তাহার চেয়ে শত গুণ অযোগ্য টাকায়-গড়া প্রাণহীন একটা পুতুলকে লইয়া, জেঙ্কিন্সের এত বড় প্রাণখানার পানে তুমি চাহিয়াও দেখিলে না! যে জেঙ্কিন্স তোমার মুখে এতটুকু হাসি দেখিতে পাইলে বর্তাইয়া যায়—সেই জেঙ্কিন্সকে পরখ করিয়াও একবার দেখিলে না, নারী! হায়, রূপ, হায় যৌবন, এত অন্ধ তুমি! এমনই সহস্র চিন্তা শরের মত জেঙ্কিন্সের বুকে বিঁধিতে লাগিল। রাগে হিংসায় চোখ দুইটা তাহার জ্বলিয়া উঠিল, ভয়ে সে চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতেও পারিল না।

না জানি, চিঠিতে কত কি সে লেখা দেখিবে! প্রণয়ের কত না ললিত কাকলী, সোহাগের কত না মধুর বচন, কত না মান, কত অভিমান। এমন সময় বাহিরে জুতার শব্দ হইল। জেঙ্কিন্স চোরের মত শিহরিয়া উঠিল! তাড়াতাড়ি চিঠি-সমেত খামখানা ড্রয়ারে ফেলিয়া ড্রয়ারটা সে ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া দিল। এক আগন্তুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। জেঙ্কিন্স টেবিলের উপরকার ছোট ঘড়িটার উপর হইতে নজর ফিরাইয়া কহিল, "নবাব বাহাদুর যে, আসুন। তারপর কি মনে করে?"

"ডিউক বাহাদুর কোথায় গেলেন—আমি বাইরে ছিলুম, আমায় বলে গেলেন, এই ঘরে এসে অপেক্ষা করতে—"কথা শেষ করিয়া নবাব গর্ব্বিত শিরে ঘরের মধ্যে চারিধারে একবার দেখিয়া লইলেন। খাস-কামরা! ডিউকের খাস-কামরা! এ ঘরে ডিউক তাঁহার কোন সাধারণ বন্ধুবান্ধবকে কখনও আনিয়া বসান না—এ ঘরে নবাব আজ এই প্রথম আসিবার অধিকার পাইয়াছেন। কৃতার্থতার গৌরব-গর্ব্বে নবাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

নবাবের উপর ডিউকের ইদানীং যথার্থই একটা আন্তরিক টান পড়িয়াছিল। তাহার কারণও ছিল,—নবাবের মত এই সাহস ও ভাগ্য গড়িবার শক্তিকে বরাবরই তিনি

পছন্দ করিতেন। আরও বিশেষ পারির এই কায়দা-মাফিক সম্ভ্রান্ত সমাজের পার্শ্বে নবাবের এই উগ্র প্রকৃতি, শিশু-সুলভ সারল্য ও সীমাহীন শ্রদ্ধা ডিউককে একান্ত মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর নবাব তাস খেলিতে সিদ্ধহস্ত—বাজী হারিয়াও দমিতে জানে না; ডিউকের ছবি চড়া-দরে কিনিতেও অত্যন্ত আগ্রহান্বিত—এই সব কারণেও নবাবের উপর ডিউকের স্নেহ জন্মিয়াছিল। মায়াও পড়িল, যখন ডিউক দেখিলেন, এই নিরীহ নবাবের বিরুদ্ধে সমস্ত পারি একটা ভীষণ বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে প্রতি পদে লাঞ্ছিত করিবার জন্য দারুণ চক্রান্ত করিয়াছে। তাহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে কেহ দাঁড়ায় না! নবাব একা —কেহ তাহার সহায় নাই। ডিউক মোরা অবশ্য এ চক্রান্তকারীর দলে যোগ দিলেন না।

জেঙ্কিন্স ও নবাব দুইজনেই ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন। কে কি কথা কহিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া দুইজনেই বিপদে পড়িলেন। অথচ আলাপ-পরিচয়ও আছে—চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও ভাল দেখায় না। কাজেই দুইজনে নিতান্তই অবান্তর দুই-একটা কথা কহিলেন মাত্র। সম্প্রতি উভয়ের সৌহার্দ্দ্যও হ্রাস পাইয়াছিল—জাঁসুলে জেঙ্কিন্সকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, বেথলিহাম আশ্রমে তিনি আর একটি পয়সাও দিবেন না। নবাব এখন স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি আজ ডিউককে যে কথা বলিতে আসিয়াছেন, সে কথাটা জেঙ্কিন্সের সম্মুখে তোলা সঙ্গত হইবে কি না! মেসেঞ্জার কাগজখানা কয়দিন ধরিয়া তাঁহাকে যে বিশ্রী গালি দিতে সুরু করিয়াছে, ডিউক তাহা দেখিয়াছেন কি না এবং দেখিয়া থাকিলে নবাবের প্রতি ডিউকের ধারণার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্যই নবাব আজ এখানে আসিয়াছেন। জানিবার প্রয়োজনও ছিল। কারণ নির্ব্বাচন-মঞ্জুরির সময়টা একেবারে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন যে অভ্যর্থনা নবাবের অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল, তাহা পর্য্যাপ্ত হইলেও নবাব আজ ডিউকের আশ্বাস-লাভের জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন।

এমন সময় ডিউক কক্ষে প্রবেশ করিলেন, নবাবের পানে সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আন্তরিকতার সহিত তাঁহার কর-কম্পন করিয়া কহিলেন, "জাঁসুলে, আমার ভয় হচ্ছে, পারি তোমায় ঠিক উচিতমত আদর করছে না—দারুণ ঘৃণা আর কুৎসা নিয়ে পারি আজ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।"

নবাবের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কিন্তু যা বলছে, সব মিথ্যা! আপনি যদি দেখ্‌তেন—"

"আমি জানি—আমি সে নতুন গালাগালটা পড়েওছি।"

"আপনি কি ও-সব বিশ্বাস করেন? সেই কথাটাই আমি জানতে এসেছি। সে জানলে আমি ঠাণ্ডা হতে পারি—আমি তার প্রমাণও এনেছি, আজ।"

ফিতায় বাঁধা একটা কাগজের বাণ্ডিল নবাবের হাতে ছিল। ফিতা খুলিয়া সেই

বাণ্ডিলটা নবাব টেবিলের উপর ধরিলেন। ডিউক কহিলেন, "এ সব দলিল-প্রমাণের কোনই দরকার নেই, জাঁস্থলে। আমি ও গালাগালের কথা বিশ্বাসও করি না। আমি বুঝতে পারছি, অপর কোন লোকের সঙ্গে তোমাকে ওরা ভুল করে জড়িয়ে দিচ্ছে।"

ডিউক হাসিলেন, হাসিয়া আবার বলিলেন, "এ-সব খপর রাখার দরকার আমার আছে, তাই খোঁজও নিয়েছিলুম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার নির্ব্বাচন, কারও সাধ্য নেই, বন্ধ করে। তার পর একবার এটা কৌন্সিলের মঞ্জুর হয়ে যাক না—"

জাঁস্থলে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তিনি কহিলেন, "যদি আমার এ নির্ব্বাচন ঘটে, তবে সে আপনার দয়াতেই ঘটবে। আমার কিন্তু সব বিশ্বাস সরে যাচ্ছে। বিশেষ শত্রুর দল ক্রমেই বাড়ছে। তার উপর, লি মার্কারই আমার সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবে।"

"লি মার্কার! ঐ পাজীটা!"

"হাঁ, লি মার্কার—হেমারলিঙের চেলা। ব্যারণেস হেমারলিঙ্ ত আগে ওরই হাতে খেলার পুতুল ছিল। সে মুসলমান ছিল বলেই লি মার্কার তাকে প্রকাশ্যভাবে বিয়ে করতে পারেনি—নাহলে ওদের কথা টিউনিসের লোকের মুখে মুখে ফিরত। লি মার্কারের জোরেই ত হেমারলিঙের আজ এত জোর!"

"জাঁস্থলে—"

নবাব কহিলেন, "এ কথা তোলবার প্রয়োজনও ছিল না, আমার। এক হপ্তা আগেই ত আমার নির্ব্বাচন মঞ্জুর হবার কথা ছিল। কিন্তু ঐ লি মার্কারের রিপোর্ট তোয়ের হয়নি বলেই দিন পেছিয়ে গেল। প্রতি মুহূর্ত্তেই এখন আমার ভয় বাড়ছে—আমার অবস্থাটা ভাবুন, একবার। আমার সমস্ত সম্পত্তি এই নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করছে। বে শুধু অপেক্ষা করে আছে, কি হয়! তাহলেই সে লুঠের উদ্যোগ করে! টিউনিসে আমার প্রায় আট লক্ষ টাকা পড়ে আছে—ডেপুটি হতে যদি না পারি ত বে তার সব হাত করবে। আমায় তখন পথের ভিখিরী হতে হবে।"

কথা শেষ করিয়া নবাব ললাটের ঘর্ম্ম মুছিলেন। ডিউক কহিলেন, "ডেপুটি তোমায় করবই, আমি। আমার চেষ্টায় যতদূর হয়, তার কোন ক্রুটি হবে না। আমি যদি সে সময় রোগে শয্যাগতও থাকি, তবুও আমি যেমন করে পারি, কৌন্সিলের সে মিটিংয়ে যাবই। আমায় দেখলে তোমার শত্রু-পক্ষ অনেকটা দমে যাবে, জাঁস্থলে, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।"

নবাব এ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, "ডিউক বাহাদুরের শরীর কি ভালো যাচ্ছে না?"

ডিউক হাসিয়া কহিলেন, "ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে যখন এখানে দেখছ, তখন তা বুঝতে পাচ্ছ না? কি বল, ডাক্তার? নাঃ, তবে অসুখ এমন কিছু নয়, শুধু কিছু কাহিল বলে নিজেকে মনে হচ্ছে। রক্ত নেই—তা ডাক্তার খানিকটা তাজা রক্ত দেবে বলে ভরসা দিচ্ছে। কি বল ডাক্তার, দেবে ত?"

নবাব কহিলেন, "যদি আমার শরীর থেকে রক্ত দিলে আপনার কোন উপকার হয়—এমন কি আমার সব রক্ত দিলেও যদি আপনাকে—"

ডিউক নবাবের মুখের পানে চাহিলেন—সে মুখে অকপট আন্তরিকতা জল্ জল্ করিতেছিল। ডিউক তাহা দেখিয়া প্রীত হইলেন, মুগ্ধ হইলেন। ডিউক কহিলেন, "তা যদি নেওয়া যেত, জাঁস্থলে, ত দুজনেরই ভাল হত। তুমি এই যে এ-সময় এতখানি উত্তেজিত হয়েছ, খানিকটা রক্ত দিলে তুমিও শান্ত হতে পারতে। কিন্তু সাবধান জাঁস্থলে—রাগের সময় চট্ করে একটা বেফাঁস কিছু করে ফেলো না যেন। তারা এখন ঐটেই চায়। কিন্তু না, তোমায় খুব সাবধান হতে হবে। তুমি এখন দশের একজন—'পাব্লিকম্যান'! তোমার প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গীটি অবধি লোকে এখন দূর থেকে লক্ষ্য করবে, তোমার চাউনিটি অবধি তারা বাদ দেবে না। আর ঐ খপরের কাগজে গালা-গাল! খপরের কাগজ পড়ো না, একেবারে পড়ো না। যদি পড়ে নিজেকে ঠিক রাখতে না পারো, চঞ্চল হও, তাহলে কাগজ পড়া বন্ধ করে দাও। অসভ্যগুলো আচ্ছা জব্দ হবে, দেখবে। জান, আমি কি করেছিলুম—ঐ কন্কর্দ্দ বলে লোকটাকে নিয়ে? সে ক্লারিওনেট বাজাত। দশ বছর আমার পিছনে তার সে বাঁশী নিয়ে সে বাজিয়ে বেড়িয়েছে। রাত নেই, দিন নেই, বাঁশীর আওয়াজ। জ্বালাতন হয়ে গেলুম। তাকে বিদায় করবার জন্য তাকে কত টাকা দিয়েছি, ভয়ও দেখিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। পুলিশ? তাতে উল্টো উৎপত্তি হয়। শত্রুপক্ষ কাগজে অমনি বড় বড় প্যারা বার করতে থাকে। শেষে আমি একেবারে চুপ হয়ে গেলুম। তার দিকে ভ্রূক্ষেপও নয়। বাজাক সে, যত পারে, চেঁচাক্ সে!—আমি এতটুকু টলব না—ব্যস্! শেষে তাকে পাত-তাড়ি গুটোতে হল। এই কাগজওলাদের সঙ্গেও ঠিক সেই চাল ধর। যতক্ষণ অবধি ওরা বুঝবে, যে ওদের এই সব লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরামিতে তুমি কাতর চঞ্চল হচ্ছ, ততক্ষণ ওরা পিছনে ঘেউ ঘেউ করে মরবে, কিছুতে ছাড়বে না। তার পর তুমি আমার চাল ধর দেখি,—ওরা যখন বুঝবে,—না, যত গালই দি, লোকটা ভ্রূক্ষেপও করে না, তখন আপনা-আপনিই সব থেমে যাবে। যাক্, এখন আমার এই কথা মেনে চলে দেখ দেখি! তারপর—হাঁ মনে আছে, কাল তিনটের সময় কমিটির মিটিং আছে? তাতে যেয়ো—নিশ্চয়।"

তারপর জেঙ্কিন্সের দিকে চাহিয়া ডিউক কহিলেন, "এখন ডাক্তার, তুমি শোন, আমার ওষুধের ভাল রকম ব্যবস্থা করে দাও। বেশ শক্ত গোছ কিছু—"

জেঙ্কিন্স সহসা চমকিয়া উঠিল—এতক্ষণ সে যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিল। জেঙ্কিন্স কহিল, "হাঁ আমি তাই ভাবছিলুমও। বেশ দেখে শুনে নতুন একটা ওষুধেরই ব্যবস্থা এবার করব।"

নবাব ও জেঙ্কিন্স উভয়েই বিদায় গ্রহণ করিলে ডিউক ড্রয়ার খুলিয়া ফেলিসিয়ার পত্র-খানা বাহির করিলেন। ডিউকের মুখে হাসি দেখা দিল। ডিউক আবার চিঠিখানা পড়িতে লাগিলেন।

* * * *

পরদিন কমিটির মিটিং সারিয়া নবাব যখন বাহিরে আসিলেন, তখন রোদ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণ-রশ্মিতে চারিধার রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে --বেশ শান্ত শীতল বাতাস বহিতেছিল। নবাব গাড়ী ঘোড়া বিদায় করিয়া পদব্রজেই চলিলেন। দুই-চারিটা পথ বাঁকিয়া পার্কের সম্মুখে আসিয়া নবাব শুনিলেন, ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছে, "মেসেঞ্জার। আজ সন্ধ্যার মেসেঞ্জার।" নবাবকে দেখিয়া কাগজের প্রকাণ্ড বোঝা পিঠে ফেলিয়া ফিরিওয়ালা তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল, একখানা কাগজ আগাইয়া ধরিয়া কহিল, "আজকের মেসেঞ্জার, সাহেব—"

নবাব একবার ইতস্তত করিলেন, না, কিনিবেন না। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, সে কি—তিনি না দশের একজন! একটা ক্ষুদ্রলোকের ক্ষুদ্র কুৎসাকে এতখানি ভয় করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত নয় ত! এ দুর্ব্বলতার উর্দ্ধে তাঁহাকে উঠিতেই হইবে! নবাব পয়সা দিয়া একখানা কাগজ কিনিলেন। নিকটে পার্কের রেলিঙের ধারে একখানা বেঞ্চ ছিল। সেই বেঞ্চে বসিয়া নবাব কাগজ খুলিলেন। প্রাপ্ত-পত্র-কলমে তাঁহার নজর পড়িল। ঐ যে আবার নূতন গালি বাহির হইয়াছে। নবাবের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তিনি পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। হাত দুইটা পৈশাচিক ক্রোধে নিষপিষ করিতে লাগিল। একবার, —একবার সে পাষণ্ডকে যদি হাতের কাছে পাওয়া যায় ত—

নবাব চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। পথে অনেক লোক চলিয়াছে—সকলেই নিজেদের লইয়া ব্যস্ত। নবাবের পানে চাহিবার কাহারও অবসর ছিল না। নবাব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পার্কের চারিধারে তখন অসংখ্য গাড়ী আসিয়া জমিতেছে—ভিক্টোরিয়া, ব্রুহাম মৃদু গতিতে চলিতেছে। ভিতরে আরোহীদের সস্মিত প্রসন্ন মুখ। নবাব ভাবিলেন, কি সুখী ইহারা! কি নিশ্চিন্ত আরামে সব গ্রীষ্মের এ মাধুরী উপভোগ করিতেছে! আহা!

নবাব একদিকে চলিতে লাগিলেন। ও কি! সম্মুখে একটা কেব্রিয়লেটে এক তরুণী—রঙ-করা বিশ্রী মুখ, আর তাহারই পাশে ঐ যে মশার্দ—মশার্দ ই ত!

নবাব ছুটিয়া গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বজ্রগম্ভীর স্বরে হাঁকিলেন, "রোখো—"

নারীর হাতে ঘোড়ার রাশ ছিল। নারী সে হুঙ্কারে স্তম্ভিত হইল। গাড়ী থামিয়া পড়িল। মশার্দ কহিল, "চালাও।" নারী তখন আবার রাশ ধরিয়া টানিল। ঘোড়া চলিবার উপক্রম করিল। নবাব আসিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিলেন। ঘোড়া পা তুলিয়া পিছু হটিবার চেষ্টা পাইল।

মশার্দ দেখিল, ব্যাপার সহজ নহে। তাহার ভয়ও হইল। সে কহিল, "ও নবাব। চালাও তুমি—আমি বলছি। চালাও—"

রাশে আবার টান পড়িল। ঘোড়া কিন্তু অগ্রসর হয় না—নবাব তাঁহার সমস্ত শক্তি লইয়া ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী

রুখিয়াছেন। মশাদ´ কহিল, "লাগাও চাবুক—" নারী তখন দ্বিধামাত্র না করিয়া ঘোড়ার দীর্ঘ চাবুকটা লইয়া নবাবের মুখের উপর শপাৎ করিয়া এক ঘা বসাইয়া দিল। নবাবের মাথা হইতে টুপিটা ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। নবাব তখন পাগলের মত ক্ষেপিয়া উঠিয়া ঘোড়াকে দুই হাতে পিছনে ঠেলিয়া ধরিলেন। গাড়ী উলটিয়া যাইবার মত হইল। পথে ভিড় জমিয়া গেল। নবাব তখন ঘোড়ার মুখ ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর উপর উঠিলেন। নারী রাশ ছাড়িয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িল। নবাব তখন মশাদে´র মুখখানা কাগজে চাপিয়া ধরিয়া প্রবলভাবে তাহাকে নাড়া দিলেন। পরে হিঁচড়াইয়া টানিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও লাফাইয়া পড়িলেন। মশাদ´ উঠিবার চেষ্টা পাইতেছিল—নবাব বাঘের মতই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; অজস্র কিল-চড় বর্ষণ করিয়া শেষে পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নবাব হাঁকিলেন, "রাস্কেল, এবার তোমার আস্পর্দ্ধার শোধ হয়েছে ত?" মশাদ´ কথা কহিতে পারিল না—ধূলায় গড়াইয়া পড়িল। নবাব তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; নিশ্বাস সজোরে বহিতেছিল। একজন কনষ্টেবল আসিয়া নবাবের পার্শ্বে দাঁড়াইল। নবাব তাহার হাতে নিজের কার্ড দিয়া কহিলেন, "বাগার্ড জাঁমুলে—কর্সিকার ডেপুটি!"

উপস্থিত জনসঙ্ঘ বিচলিত হইয়া উঠিল। ডেপুটি! যে-সে লোক নহে তবে, দশের একজন!

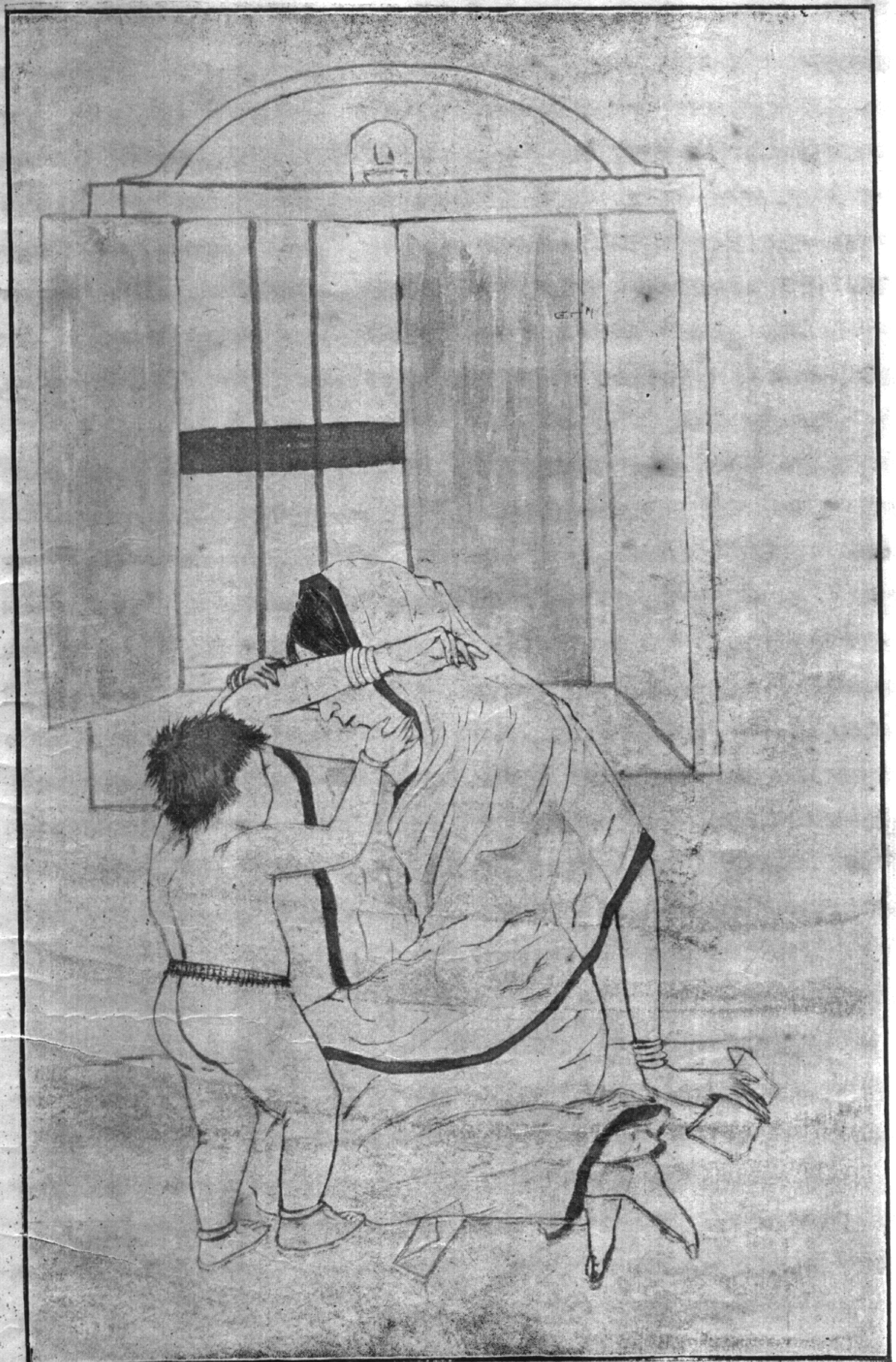
জনতার সে বিস্ময়-কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্য তিলার্দ্ধও সেখানে অপেক্ষা না করিয়া নবাব ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইলেন। মশাদ´ তখন গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া সঙ্গিনীর সন্ধানে চোখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছড়িয়া গিয়াছে, নাক দিয়া গল্ গল্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে। পোষাক ছিঁড়িয়া কাদায় গা ভরিয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাগর

ওগো অকূল অতল স্নিগ্ধ শীতল সুনীল সাগর-জল,
তোমায় মথিতে আসি নাই আজি
নাহি চাহে প্রাণ মণি-রত্নরাজী,
না করি গণনা জুটিলে কপালে অমিয়া বা হলাহল।
আমি কেবলি ডুবিব কেবলি ভুলিব,
দিবস রজনী কেবলি গলিব,
অতল হইতে অতলে তলাব, পাবনা কোথাও তল।
না রবে তপন, নাহি রবে শশী,
বিশ্ব পড়িবে প্রাণ হ'তে খসি,
তোমারি স্নিগ্ধ নীলিমা কেবল জাগি র'বে অচপল।
মাথার উপরে অগাধ সে তুমি,
সারা দেহ মোর তুমি র'বে চুমি',
চরণের তলে যতদুর চাই নীল জল নিরমল।
নয়নে তোমারি নীলিমা রাজিবে,
তব কলতান শ্রবণে বাজিবে,
তোমারি শীতল রসের পরশে তনু মোর ঢলঢল।
অকূলের পারে কি আছে কি জানি,
অতলের তলে কার পুরীখানি,
তার লাগি মোর নাহি জাগে প্রাণে এক কণা কুতূহল।
যখনি দেখেছি ওই বুকখানি
ঝাঁপ দিতে হবে এই শুধু জানি,
ওই ডাকে মোরে আকুল ভাষায় ছলছল কলকল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি।



কান্নার সুখ

শ্রীরমা দেবী অঙ্কিত চিত্র হইতে

পাগল ?

(রুশ ঔপন্যাসিক লিওনিডাস আণ্ড্রীভ হইতে)

[১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বারে, ডাক্তার আণ্টনী ইগ্‌নাটিভিচ কার্জেণ্টজেফ, একজন লোককে খুন করেন। এই অপরাধের বিবরণ ও তাঁহার পরের কতগুলি ঘটনা হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, হত্যাকারীর মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ !

কার্জেণ্টজেফ্‌কে "এলিজাবেথ মনোবিজ্ঞানমূলক চিকিৎসালয়ে" পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। সেখানে কয়েকজন বহুদর্শী মস্তিষ্কবিশেষজ্ঞ তাঁহাকে যত্নসহকারে পরীক্ষা করেন।

হাসপাতালে একমাসকাল কাটিয়া গেলে, ডাক্তার কার্জেণ্টজেফ্‌ উক্ত বিশেষজ্ঞদের হাতে আপনার নোটবহিখানি দেন। তাহাতে আসল ঘটনার কথাগুলি খুলিয়া লিখা ছিল। আমরা নীচে তাহার কয়েকস্থান তুলিয়া দিলাম।]

(১)

মহাশয়গণ,

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সত্যগোপন করিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু এখন আমাকে বাধ্য হইয়া সব কথা খুলিয়া বলিতে হইল। যখন আপনারা সমস্ত ব্যাপারটা জানিতে পারিবেন, তখন বুঝিবেন যে, এ ব্যাপারটা যতটা সহজ বলিয়া মনে হইতেছে, আসলে এটি তত সহজ নয়।

আলেক্‌জিস,—যাকে আমি খুন করিয়াছি, আমার বিদ্যালয়ের সহপাঠী ছিল। সে উকীল আর আমি ডাক্তার হইলেও, আমরা বরাবর একসঙ্গে পড়াশুনা করিয়া আসিয়াছি। আমি যে তাকে অপছন্দ করিতাম, তাও নয়। সে আমার দরদের দরদী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। কিন্তু তবু,—কেন জানি না,—তার উপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা ছিল না। তাহার বিনীত ও মধুর প্রকৃতি, তাহার সদা চঞ্চল ভাব ও কল্পনা, তাহার নানাবিষয়ের একগুঁয়ে মতামতের জন্য তাহাকে একটা শিশু বা রমণী বলিয়া মনে হইত। যে-সকল লোক তাহার মরমের মরমী ছিল, তাহারা সর্ব্বদাই তাহার স্বভাবের জন্য ব্যথা পাইত। কিন্তু সকলেই তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। তাহারা বলিত, সে 'কলা-কুশল'। তাই তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কেহ আমোলে আনিত না। মানব-চরিত্র কি যুক্তিহীন !

সময়ে সময়ে আমিও সকলের 'রায়ে রায়' দিয়া এই 'কলা-কুশল' বন্ধুটির ছোট-খাটো দোষগুলিকে গ্রাহ্যের ভিতর আনিতাম না। 'ছোটখাটো দোষ' বলিলাম এইজন্য যে, আলেক্সিস বৃহৎ কোন কিছুর উপযুক্ত ছিল না! এমন কি,—সে যা দোষ করিত, —তাও ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ! আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ আমি তাহার সাহিত্য-সাধনার কথা তুলিতে পারি। যে-সকল ম্লানদৃষ্টি সমালোচক চিরকাল ধরিয়া নূতন-কোন প্রতিভা আবিষ্কার করিবার ফিকিরে আছে,

আলেক্সিসের তুচ্ছ রচনা হইতে তাহারাও মহৎ কিছু বাহির করিতে পারিত না। আলেক্সিসের মত, তাহার লেখাতেও কোন একটা বিশেষ গুণ ছিল না।

আলেক্সিস বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু বিধবা হইয়া তাহার স্ত্রীর সকল রূপ-সৌন্দর্য্যই এখন মুছিয়া গিয়াছে। আগে যে তাকে দেখিয়াছে, এখন সে তাকে আর চিনিতে পারিবে না। স্বামীকে সে বড় ভালবাসিত। স্বামী হারাইয়া তার কপোলের গোলাপী আভা আর এখন নাই। অনেক-দিন-পরা দস্তানার মত, তার মুখে এখন কুঞ্চন-রেখা পড়িয়াছে। আর, তার সেই চোখ দুটি! আগে যে চোখ সর্ব্বদাই হাসিত, এখন সে চোখ হাসি-খুসি সব ভুলিয়াছে। আমি সেদিন পুলিশ-কোর্টে তাকে একটি-বারের জন্য দেখিয়া তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়া-ছিলাম। তার ভিতরে তখন এমন জোরও ছিল না যে, সে কুপিত-নেত্রে আমার দিকে চাহিতে পারে! এখন সে অতীতের কঙ্কাল! অভাগা রমণী!

আলেক্সিসের স্ত্রীর নাম তাসিয়ানা। পাঁচবছর আগে আমি তাসিয়ানার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এ কথা, আমি, তাসিয়ানা ও আলেক্সিস ছাড়া দুনিয়ার আর কেহ জানে না। কিন্তু তাসিয়ানা আমার প্রস্তাবে মত দেয় নাই।

আমার প্রস্তাবে তাসিয়ানা তখন হাসিয়াছিল। সে হাসি কি এখন তার মনে আছে? বোধ হয়—না। কারণ, তারপরে সে কতবার হাসিবার অবকাশ পাইয়াছে। এত হাসির মাঝে সেদিনকার সে হাসি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, আপনারা তাহাকে মনে করিয়া দিবেন যে, "৫ই সেপ্টেম্বারে সে হাসিয়াছিল!" যদি সে অস্বীকার করে,—এবং সে অস্বীকার করিবেই-করিবে—তবে তাকে আবার মনে করাইয়া দিবেন যে, সে হাসিয়াছিল!

যে-আমি এমন সবল পুরুষ, যে-আমি আর কখনও চোখের জল ফেলি নাই, সেই-আমি তাহার সুমুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলাম। আমি দেখিলাম, তাসিয়ানা তাহার ওষ্ঠ দংশন করিল। আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য হাতদুটি বাড়াইয়া দিলাম। সে তাহার চোখ তুলিয়া চাহিল—সে চোখদুটি হাসিয়া উঠিল। আমার দুহাত নিসাড় হইয়া আবার পড়িয়া গেল। সে হাসিতে লাগিল এবং অনেক—অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিল। যতক্ষণ না তার সাধ মিটিল, ততক্ষণ তার হাসিও থামিল না। অবশ্য, তারপরে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

"দয়া করে আমাকে মাপ কর!"—তার চোখ তখনও হাসিতেছিল।

আমি—এমন-কি আমিও মৃদু মৃদু হাসিলাম। তাহার হাস্যের জন্য যদিও আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম,—কিন্তু আমার সে মৃদু হাস্যের জন্য আমাকে আমি কখনও ক্ষমা করিতে পারিব না!

৫ই সেপ্টেম্বার এই ঘটনা ঘটে। সহরের ঘড়ীতে তখন বেলা ছয়টা। আমি

এখনও সেই প্রকাণ্ড ঘড়ীর বৃহৎ, কালো কাঁটাদুটি পর্য্যন্ত চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—একটি কাঁটা উপর দিকে, আর একটি নীচের দিকে। আলেক্সিসও ঠিক ছয়টার সময়ে খুন হয়। কোন তীক্ষ্ণদৃষ্টির লোক এই সাদৃশ্য হইতে অনেক ব্যাপারের সঙ্কেত পাইবেন।

আজ যে আমি পাগলা-গারদে আছি, তাহার একটি কারণ এই যে, আমার অপরাধের কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নাই। এতক্ষণে কি আপনারা আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন? না—ইহা হিংসা নয়। আমার মত বুদ্ধিমান লোক তুচ্ছ হিংসায় জন্য কোন কাজ করে না।

প্রতিহিংসা? হাঁ, একটি পুরানো কথা দিয়া একটি নূতন ও অজানা ভাবকে যদি কতকটা তবু ফুটাইতে হয়, তবে 'প্রতিহিংসা' বলিলেও বলা যায়।

তাসিয়ানা দ্বিতীয়বার আমাকে ঠকাইল। সে কথা ভাবিলেও আমার রাগ হয়। আলেক্সিসকে আমি খুব ভালরকমেই জানিতাম। আমি তাই ঠাওরাইয়াছিলাম যে, আলেক্সিসের সঙ্গে আমি যদি তাসিয়ানার বিবাহ দিতে পারি, তবে সে অত্যন্ত অসুখী হইবে। আমাকে বিমুখ করিয়াছে বলিয়া তাসিয়ানা তখন অনুতাপ করিবে। এই কারণে আমি তাহাদিগকে বিবাহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তাহারা তখনই পরস্পরকে ভালবাসিত। সুতরাং বিবাহ হইয়া গেল।

মৃত্যুর একমাসমাত্র আগে আলেক্সিস একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিল, "তোমার জন্যেই আজ আমি এত সুখী। না তাসিয়ানা?" বলিয়া, সে তার স্ত্রীর দিকে ফিরিল।

তাসিয়ানা আমার দিকে চাহিল। মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁ।" তার চোখদুটি হাসিয়া উঠিল। আমিও মৃদুহাস্য করিলাম। আলেক্সিসও হাসিল। তারপরে তাসিয়ানাকে আলিঙ্গন করিল। আমার সুমুখে তাদের লজ্জাসরম কিছুই ছিল না।

আলেক্সিস বলিল, "তুমি কিন্তু হেরে গেছ বন্ধু, হেরে গেছ!"

এই যে কৌতুক—ইহা স্থানকালের যেমন অনুপযোগী, তেমনি কৌশলশূন্য। এই কৌতুক তাহার জীবনকে মৃত্যুর দিকে এক সপ্তাহ অগ্রসর করিয়া দিল। কারণ, আমি তাহাকে ডিসেম্বার মাসের আঠারোই তারিখের আগে মারিব না ঠিক করিয়াছিলাম।

হাঁ, বিবাহ করিয়া তারা দুটিতে বড় সুখে দিনযাপন করিতেছিল। বিশেষ, তাসিয়ানার আনন্দের মাত্রাটাই যেন বেশী ছিল। আলেক্সিস কিন্তু ততটা আবেগভরে তাকে ভালবাসিত না। সে কোনরূপ গভীর স্নেহপ্রকাশে একেবারেই অপারগ ছিল। তার একমাত্র বাতিক ছিল, সাহিত্য। তাই লইয়া সে ভুলিয়া থাকিত। সংসারের দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। কিন্তু তাসিয়ানা! স্বামী বৈ আর কিছু সে জানিত না—সে একেবারে তৎসমর্পিতপ্রাণ! আলেক্সিসের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। সে প্রায়ই অসুখবিসুখে পড়িত। সে-সময়ে তাসিয়ানা

প্রাণপণে স্বামীসেবা করিয়া আপনাকে যেন ধন্যজ্ঞান করিত। কারণ, রমণী যখন ভালবাসে, তখন তাহার নিজত্ব সম্পূর্ণ-রূপে ডুবিয়া যায়।

এমনি, প্রতিদিন আমি তার হাস্য-রঞ্জিত মুখ দেখিতাম,—তাহা যৌবনপুষ্ট, অযত্নশোভন, পরমসুন্দর! আমি দেখিতাম, আর ভাবিতাম, "এর কারণ হচ্ছি আমি! মাণিক ফেলে সে কাঁচ পেয়েচে, এটা তাকে বোঝাবার জন্যে তার সঙ্গে আলেক্সিসের বিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সব উল্টো হল—আমার ধূলো-মুঠি তার কাছে সোনা-মুঠি হয়ে দাঁড়াল',—যাকে সে ভাল-বাস্‌ত, তাকেই সে পেয়েছে! চমৎকার!"

আলিক্সিসকে খুন করিবার মৎলোব আমার মাথায় কখন ঢুকিল, সে কথা আমার মনে নাই। আমার মনে হইত, এ ইচ্ছা জন্মাবধি আমার সঙ্গে আছে। তাসিয়ানাকে যাতনা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাই আমি প্রথম-প্রথম এমন সব উপায় খুঁজিতাম, যাতে বেচারা আলেক্সিস যতটা-সম্ভব কম কষ্ট পাইয়া মরিতে পারে। আমি সর্ব্বদাই অনর্থক নিষ্ঠুরতার বিরোধী।

নিজের জন্য আমার কোন ভয়-ভাবনা ছিল না—এটা একটা মস্ত কথা। যে দোষী, যে খুনী, তার কাছে পুলিশের ভয়, বিচারকের ভয়, দণ্ডের ভয়ই বড় ভয় নয়! সকলের চেয়ে বড় ভয় তার নিজের জন্য, তার বিবেক-বুদ্ধির বিদ্রোহের জন্য। এ বিষয় নিয়া আমি নাড়াচাড়া করিয়াছি। খুনের পরে আমার মনের ভাবকে আমি তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

আমি যাতনা পাইয়াছি সত্য,—ভীষণ যাতনা! তেমন যাতনা পৃথিবীর আর কেহ কখনও পায় নাই। আমার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে হচ্ছে আলাদা জিনিষ। একেবারে আলাদা জিনিষ। সে যে কি, তা জানি না—একটা ভয়ানক, আশাতিরিক্ত, স্বাভাবিক অথচ অসম্ভব কিছু! তবু—আমি যাতনা পাইয়াছি বটে, কিন্তু একটুও অনুতপ্ত হই নাই।

২

আমাকে এখন এই সমস্যা সমাধান করিতে হইবে, আলেক্সিসকে কি করিয়া খুন করি? আমি তাসিয়ানাকে জানাতে চাই যে, তার স্বামীকে মারিয়াছি আমি। সেই সঙ্গে আমি আইনের হাতও এড়াইতে চাই। খুণ করিয়া আমি জেলে গেলে তাসিয়ানা বড় খুসি হইবে। বিশেষ, (অন্যান্য সকলের মত) জেলে পচিয়া মরিবার জন্য আমার কোনই আগ্রহ ছিল না। জীবনকে আমি ভালবাসি,—অত্যন্ত!

জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া সুরার মত রাঙা ঐযে নবীন রবিকর আসিতেছে, আমি উহা দেখিতে ভালবাসি। নরম বিছানার উপরে আমি আমার শ্রান্ত তনুকে বিছাইয়া দিতে ভালবাসি। বসন্ত-বাতাসের উষ্ণ শ্বাসকে আমি ভালবাসি, অস্তসূর্য্যের মহিমময় শোভার ভিতরে আপনাকে আমি ডুবাইয়া দিতে ভালবাসি, সুলিখিত চিত্তা-কর্ষক পুস্তক পড়িতে আমি ভালবাসি। আমি ভালবাসি—আপনাকে, আমার এই মাংস পেশীর দৃঢ়তাকে, আমার এই নির্ম্মল, নির্ভুল চিন্তাধারাকে! আমি আমার

নিঃসঙ্গতাকে উপভোগ করিতে ভালবাসি—আমার এই আত্মার গভীরতাকে (এই কৃষ্ণদহ, যাহার তটে মস্তিষ্কের কল্পনা নৃত্য করে) কোন কৌতূহলী দৃষ্টি যে স্পর্শ করিতে পারে না, আমি ইহা অনুভব করিতে ভালবাসি। জীবনে অবসাদ? লোকে কেন যে এ-কথা বলে, তা কে-জানে!

আইন এড়ানো, আমার পক্ষে খুব সহজ। লুকাইয়া লোক মারিবার হাজার রকম উপায় আছে। বিশেষ, তুমি যদি, ডাক্তার হও, তাহা হইলে ত' কথাই নাই। আমিও ডাক্তার। আমি অনেক ফন্দী আঁটিলাম। একবার ভাবিলাম, আলেক্সিসকে কোন লুকানো অসুখে অসুখী করিয়া মারিব। কথাটা লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিলাম। কিন্তু, তার অসুখের সময়ে সেবা করিয়াও তাসিয়ানা ত' কতকটা সুখী হইতে পারে! না, তা হইবে না। আমি তাসিয়ানাকে জানাইতে চাই,কে তার স্বামীকে মারিয়াছে। এটা যে বিশেষ দরকার!

বুদ্ধিমানের পরমবন্ধু—দৈব, আমার সহায় হইল। খবরের কাগজে একদিন আমি একটি ঘটনা পড়িলাম। কোন কারবারের কেসিয়ার মৃগীরোগের ভাণ করে। সেই সময়ে তার কাছ থেকে অফিসের টাকা চুরি যায়। কিন্তু, আসলে টাকা চুরি করিয়াছিল সে নিজেই। লোকটা কাপুরুষ। কারণ, পরে সে আপনার দোষ মানিয়াছিল। কিন্তু, এই দৈব ঘটনা আমাকে পথ দেখাইল।

পাগল সাজিয়া আলেক্সিসকে খুণ করিলে কেমন হয়? ঠিক কথা! আমি এক বৎসর ধরিয়া মনোবিজ্ঞান-সম্বন্ধে যত বই বাহির হইয়াছিল, সমস্ত পড়িয়া ফেলিলাম।

বিশেষজ্ঞের মতে উন্মাদ বংশানুক্রমিক। আমার পিতা মদে আসক্ত ছিলেন। আমার এক খুড়া পাগলা-গারদে মরেন। আমার এক ভগ্নী মৃগীরোগে মারা যায়।

দেখিলাম, পাগলামির অভিনয় করা আমার পক্ষে কিছু শক্ত নয়। বই থেকে আমি অনেক পাগলের লক্ষণ জানিয়াছিলাম। এগুলিকে আমি কাজে লাগাইব। আমি সুপটু অভিনেতার মত অভিনয় করিব।

আমার মাথায় এক দুর্ভাবনা আসিল,—কোন পাগলের মাথায় যাহা আসে না। আমার এই পরীক্ষার ভীষণ বিপদের কথা মনে হইল। আপনারা আমার কথার মানে বুঝিতেছেন? পাগলামি, আগুনের মত; তাহা নিয়া খেলা করিলে সর্ব্বনাশের ভয় আছে। গুহার ভিতরে বারুদ পূরিয়া তুমি যদি তাতে আগুন দাও, তাহা হইলে হয়ত তুমি নিরাপদে থাকিতেও পার; কিন্তু উন্মাদ-ভীতির এককণাও যদি তোমার মাথায় কোনগতিকে ঢুকিয়া পড়ে, তবে তুমি একেবারেই গিয়াছ। আমি ইহা জানিতাম! আমি ইহা জানিতাম! কিন্তু, বিপদভয়ে কোন সাহসীর বুক দমে?

৩

সেদিনকার নিমন্ত্রণ-সভায় আমি বদ্ধ পাগলের মত যে কেলেঙ্কারিটা করিয়াছিলাম, তার কারণ আর বোধ করি, খুলিয়া বলিতে হইবে না। কারগুয়ানফের

বাড়ীতে আমার প্রথম পরীক্ষাটা আশাতীত-রূপে সফল হইয়াছিল।

তাসিয়ানা ও আলেক্সিস সেদিনকার আসরে উপস্থিত ছিল না। আমি আগে থাকিতেই জানিতাম, তারা আসিবে না। তারা থাকিলে আমি পাগলামি করিতাম না। কারণ, তাসিয়ানা হয়ত' তাহা হইলে ভীত ও সন্দিগ্ধ হইত। পৃথিবীতে যদি কেহ এমন লোক থাকে, যে আমাকে চিনিয়াছে,—তবে সে তাসিয়ানা।

ঠিক করিয়াছিলাম, খাইতে বসিয়া আমি পাগলামি করিব—নিমন্ত্রিতেরা তখন সুরা পানে উত্তেজিত থাকিবে। টেবিলের যে দিকটায় ল্যাম্প ছিল, সেদিকটায় আমি বসিলাম না। কারণ, সেদিকে গোলমাল করিলে হঠাৎ একটা অগ্নিকাণ্ড হইয়া আমার নিজেরই পুড়িয়া মরিবার ভয় ছিল।

আমি পেট্রোভিচের পাশে গিয়া বসিলাম। এই মোটা ও ঘৃণিত জীবটাকে কিছু শিক্ষা দি,—আমার বরাবর এমন একটা সাধ ছিল। এ-লোকটা যখন খাইতে বসিত, বিশেষ করিয়া তখনই সে বিরক্তিকর হইয়া উঠিত। প্রথম যেদিন তাহাকে আহার করিতে দেখি, সেদিন আমার মনে হইয়াছিল যে, ভোজন করাটাও ব্যভিচাররূপে গণ্য হইতে পারে।

প্রথমে আমি হাত ঘুরাইয়া পেট্রোভিচের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা কহিতে কহিতে পাগলামি সুরু করিলাম। পেট্রোভিচ্ তার ছোট্ট কুৎকুতে চোখদুটো যতটা-পারা-যায় ডাগর করিয়া অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপরে আমি দুঃখিত ও হতাশের মত ভাবধারণ করিলাম।

শ্রীমতী প্যাভ্লোভনা, মিষ্টস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ আণ্টনি, তোমার কি হয়েচে? তুমি অমনধারা বিষণ্ন হয়ে আছ কেন?"

যখন সকলের চোখ আমার উপরে পড়িল, আমি তখন একটু বিষাদের হাসি হাসিলাম।

"তোমার শরীর কি ভাল নেই?"

"না, বড় ভাল বোধ করছি না। আমার গা কেমন-কেমন করচে—মাথা ঘুরচে। কিন্তু আমার জন্যে তোমরা কেউ ব্যস্ত হয়ো না। আমি এখনি ভাল হয়ে উঠব।"

কিন্তু, গাধা পেট্রোভিচ্ আমার কথায় তেমন আশ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে ও অপছন্দের সহিত চোখের এক-কোণ-দিয়া ঘন ঘন আমার দিকে তাকাইতে লাগিল। একটু পরেই, যেমনি সে একান্ত পরিতৃপ্তের মত এক গেলাস্ মদ ঠোঁটের কাছে তুলিয়া ধরিল, অমনি আমি তার নাকের ঠিক তলা থেকে ঘুসি মারিয়া গেলাসটি চুরমার্ করিয়া দিলাম। তারপরে আমি মেজের উপরে সশব্দে আর এক ঘুসি মারিয়া কাঁচের থালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। পাছে কাঁচের টুক্‌রা লাগিয়া আমার হাত কাটিয়া যায়, সেই ভয়ে আমি মুখ মুছিবার তোয়ালেখানা আগে থালার উপরে রাখিয়া তবে ঘুসি মারিয়াছিলাম। আমার এ চালাকি কারুর নজরে ঠেকিল না।

ভাঙ্গা কাঁচগুলা চারিদিকে ছিট্‌কিয়া পড়িল। পেট্রোভিচ্ মহা খাপ্পা হইয়া,

শুয়ারের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করিতে করিতে বিষম গোলমাল বাধাইয়া দিল। স্ত্রীলোকেরা সরু গলায় চীৎকার সুরু করিল। আমি দাঁতে দাঁত লাগাইয়া মেজ-ঢাকা চাদরখানা সমস্ত জিনিষের সঙ্গে টান মারিয়া ফেলিয়া দিলাম। সে এক মজার ব্যাপার—একেবারে প্রহসনের দৃশ্য!

সকলে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কেহ আমার জন্য জল আনিয়া দিল, কেহ আমাকে লইয়া গিয়া একখানা আরাম কেদারায় বসাইয়া দিল। আমি চোখ পাকাইয়া বাঘের মত গোঁ-গোঁ করিতে লাগিলাম। লোকগুলো এতটা নির্ব্বোধ যে, আমার ন্যাকামি তারা মোটে বুঝিতেই পারিল না। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, সেই বোকাগুলোর নাক ঘুসির চোটে থ্যাৎলাইয়া দি! কিন্তু এ প্রলোভন আমি সংবরণ করিলাম।

তারপর আমি ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলাম। প্রথমে আমি টানিয়া টানিয়া নিঃশ্বাস ফেলিলাম, তারপর দাঁত কিড়্মিড়্ করিলাম, তারপরে অজ্ঞান হইয়া গেলাম। সব-শেষে অস্পষ্টস্বরে দস্তুর-মাফিক জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কোথায়? কি হয়েচে?"

হাব্লা লোকগুলো আমার চালাকি টের্ পাইল না।

একমাস পরে, আমার দ্বিতীয় পাগলামির অভিনয় হইল। এবারে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু অনুকূল অবস্থা পাইয়া, সে সুযোগ ছাড়িয়া দিয়া আমি বোকামি করিলাম না। সেদিন যা যা ঘটেছিল, আমার সব ঠিক্ঠাক্ মনে আছে।

সেদিনও আমি এক বন্ধুর বাড়ীতে জম্‌কালো আসরে বসিয়াছিলাম।

একঘর লোক। বসিয়া বসিয়া সবাই গল্পগুজব করিতেছে। হঠাৎ আমার মনটা কেমন উদাস হইয়া গেল। আমার মনে হইল, দুনিয়ায় আমি একা—আমি একা। সকলের কাছে আমি অচেনা আগন্তুকমাত্র। একাকী আমি আপনার ভিতরে চিরকালের তরে বন্দী হইয়া আছি। তারপরে আমি আমার চারিদিককার লোকগুলার উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলাম। আমার মনে ভয়ানক রাগ হইল। আমি মুঠা করিয়া হাত ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে অভদ্র ভাষায় চেঁচাইতে লাগিলাম। সকলের মুখে আতঙ্কের চিহ্ন দেখিয়া আমার প্রাণমন খুসি হইয়া উঠিল।

চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ওরে অভাগার দল! ওরে আত্মতুষ্ট, পাপী পশুর দল! ওরে কলঙ্কী সব! আমি তোদের ঘৃণা করি! আমি তোদের ঘৃণা করি!"

আমি নির্দ্দয়ভাবে প্রথমে অতিথিদের, তারপরে তাদের কোচম্যান ও ভৃত্যদের উপরে কিল-চড়-ঘুসি চালাইতে লাগিলাম। তাদের মুখের উপরে তারা যে কি, স্পষ্টাস্পষ্টি সব খুলিয়া বলিয়া আমার ভারি আনন্দ হইল।

যে সত্য বলে, সে কি পাগল?

সে রাতে একলা বাড়ীতে ফিরিয়া সমস্ত কথা মনে করিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম।

আপনা-আপনি বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য অভিনেতা আমি!"

তারপরে আমি একখানা বই হাতে করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। সেখানা কি বই? আমি গ্রন্থকারের নাম বলিতে পারি—গী দে মোঁপাসা। মোঁপাসার লেখা আমার বড় ভাল লাগে।

গল্প শেষ করিয়া, শিশুর মত নিশ্চিন্ত ভাবে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। পাগলে কি বই পড়ে? বই পড়িয়া তারা কি আনন্দ পায়? পড়া শেষ হইলে তারা কি শিশুর মত ঘুমাইতে পারে?

পাগলে ঘুমায় না। তারা কষ্ট পায়। মস্তিষ্কের ভিতরেই তাদের যত গোলযোগ। হ্যাঁ, তাদের সুমুখে সব গোলমেলে, ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা ও টল্‌মলে। তারা চেঁচাইতে চায়, আঁচ্‌ড়াইতে চায়, হাত কামড়াইতে চায়। তারা চার হাতপায়ে আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিতে চায় এবং তারপরে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে চায়, "হাঃ! হাঃ!"

এবং তারা হাসিতে চায়। আবার চেঁচাইতে চায়। তাহারা গর্জ্জন করিতে চায়,—দুঃখিতের মত, দুঃখিতের মত!

হাঁ,—হাঁ!

আমি শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়িলাম। পাগলে কি ঘুমায়?

৪

আমার দ্বিতীয়বারের পাগলামির পরে লোকে আমাকে ভয় করিতে আরম্ভ করিল। তারা আর আমাকে নিমন্ত্রণ করিত না। দৈবাৎ কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, সে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, অর্থসূচক স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, "কি বন্ধু, কেমন আছ?"

তখন অবস্থাটা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, আমি কোনরূপ অত্যাচার করিলে, সে জন্য আমাকে কেহ দোষী করিত না। কিন্তু আমার অতীত ও ভবিষ্য পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সরকারি হুকুম পাইলে ঢের সুবিধা হইবে। অতএব, আমি তখন সেই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কোন ডাক্তারের অনুকুল অভিমত পাইলেই আমার চলিয়া যাইবে। আমি সুযোগের অপেক্ষায় রহিলাম।

বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না। তাসিয়ানা ও আলেক্সিসই সে সুবিধা করিয়া দিল।

তাসিয়ানা বলিল, "প্রিয় আণ্টনি, আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে বলি।"

এর আগে তাসিয়ানা আমাকে কখনও "প্রিয়" ডাকে ডাকে নাই। এ-হেন অনুগ্রহ পাইবার জন্য আমাকে আগে পাগল বনিতে হইয়াছে!

"বেশ ত, আমি যাব অখুনি।"

তাসিয়ানা, আলেক্সিস ও আমি,—এই তিনজনে তখন পাঠগৃহে দাঁড়াইয়া ছিলাম। এই ঘরেই পরে হত্যার অভিনয় হইবে।

আলেক্সিস মুরুব্বিআনা চালে কহিল, "হাঁ, তোমার আর কালবিলম্ব না করে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। নইলে, তুমি যে কখন কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বস্‌বে, তা ভগবানই জানেন।"

দোষ থেকে আপনাকে খালাষ রাখিবার

জন্ত আমি দুর্ব্বল ও বিনীত স্বরে কহিলাম, "আমি আর এমন কি করতে পারি?"

"কে জানে তুমি কি কর্ব্বে! হয় ত' কোনদিন কার মাথাই ভেঙ্গে চুর্ফাক্ করে দেবে!"

আমি টেবিলের উপর হইতে একটা ধাতুনির্ম্মিত ভারি কাগজচাপা তুলিয়া লইলাম। একেবার আলেক্সিসের দিকে, আর একবার কাগজচাপার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কারুর মাথা ভাঙ্গব বল্‌চ'? মাথা?"

"হ্যাঁ, তা নয়ত' আর কি! তুমি কোন দিন হঠাৎ ঐ কাগজ-চাপাটার মত একটা কিছু হাতে করে তুলে নেবে, আর কাজও তখনি ফর্সা হয়ে যাবে!"

ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিতেছে। আমি এই কাগজ-চাপাটা দিয়েই যে-মাথাটা ভাঙ্গব ঠিক করেচি, চূর্ণ হবার আগে ঠিক সেই মাথার ভেতরেই ঠিক্ সেই চিন্তাটাই ঢুকেচে! তথাপি, এমন লোকও আছে, যে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে বিশ্বাস করে না! কি ভ্রম!

আমি বলিলাম, "এই কাগজ চাপাটা দিয়ে মার্‌লে কারুর বেশী কিছু লাগ্‌বে না।"

"ক্যানো, তুমি কি বলতে চাও এটা খুব হাল্‌কা?" বলিয়া, আলেক্সিস আমার হাত থেকে কাগজ চাপাটা নিয়া তার হাতল ধরিয়া দু'একবার দুলাইয়া দেখিল। তারপর কহিল, "আচ্ছা, তুমি একবার পরীক্ষা করে দেখ।"

আমি কহিলাম, "আমি বেশ ভাল করেই দেখেচি।"

"না, না—একবার গ্যাখই না কেন! তাহলেই তুমি বুঝ্‌তে পারবে।"

অপ্রসন্ন ভাবে, অথচ মৃদুহাস্তের সহিত আমি তার হাত থেকে সেই ভারি কাগজ-চাপাটা লইলাম। এমন সময়ে তাসিয়ানা আসিয়া বাধা দিল। কম্পমান ওষ্ঠে; বিবর্ণ মুখে সে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিল, "আলেক্সিস, থাম—থাম! ওসব কথায় কাজ নেই!"

আলেক্সিস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ক্যানো, হয়েচে কি?"

"তোমরা কি-সব ছাই কথা বল্‌চ? জান, ও-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না!"

তখন আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। কাগজ চাপাটা যেখানে ছিল, সেইখানেই আবার রাখিয়া দেওয়া হইল।

প্রফেসর টি—র কাছে গেলাম।

আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। তিনি খোঁজ নিলেন যে, আমাকে যত্ন করিতে পারেন, আমার এমন আত্মীয় আছেন কিনা! তিনি উপদেশ দিলেন, আমি যেন এখন চুপচাপ বাড়ীতে বসিয়া বিশ্রাম করি। আমি নিজে ডাক্তার বলিয়া, অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিলাম। ফলে, আমার পাগলামির বিষয়ে তাঁহার যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাহাও ঘুচিয়া গেল। তিনি বলিলেন, আমার আর কোন আশা নাই—আমি বদ্ধপাগল। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আলেক্সিসের জীবন আমার মুঠার ভিতরে আসিল।

আলেক্সিস নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি

অত্যন্ত অমনোযোগী ছিল। তাসিয়ানা একদিন আমার কাছে আসিল। আমি আলেক্সিসের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে ভালই আছে। আমার মুঠার ভিতর হইতে পাছে যম তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া যায়, আমার এই এক ভয় ছিল। তাসিয়ানা যাহাতে সন্দেহ না করিতে পারে, সেইজন্য এ-সময়টা আমি খুব সহজ-ভাবে ব্যবহার করিলাম। আলেক্সিস বা তাসিয়ানা,—কেহই আমার পাগলামির অভিনয় দেখে নাই। আমি যে পাগল, একথা মনে করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

তাসিয়ানা যাইবার সময়ে বলিল, "আমাদের বাড়ীতে গিয়ে একবার দেখা কোরো।"

আমি বলিলাম, "সে ত আমি পার্‌ব না—ডাক্তারের নিষেধ যে!"

"বোকার মত কি তুমি বল্‌চ! না, তুমি আসতে চাও। তোমার আর আমাদের বাড়ীতে তফাৎ কি? বিশেষ, আলেক্সিস তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেচে।"

কথা দিলাম, যাইব। আমি যে কথা রাখিব, তাহাত' নিশ্চয়! কথা-রাখা সম্বন্ধে এতটা নিঃসন্দেহ আমি এর আগে আর কখনও হই নাই।

১১ই ডিসেম্বার, সন্ধ্যা পাঁচটার সময়ে আমি যখন আলেক্সিসের পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম, তখন সেই কাগজচাপাটা ঠিক স্বস্থানেই ছিল। সেখানে আলেক্সিস ও তাসিয়ানা—দুজনেই বসিয়া ছিল। আমাকে দেখিয়া তারা খুব খুসি হইল।

আলেক্সিস আমার হাত ধরিয়া বলিল, "তাসিয়ানার মুখে শুন্‌লাম, তুমি বেশ ভাল রকমেই সেরে উঠেচ। নইলে, আমি নিজেই তোমাকে দেখ্‌তে যেতাম। আজ আমরা থিয়েটারে যাব। তুমিও যাচ্চ ত?"

তারপর আমরা গল্পগুজবে মাতিয়া উঠিলাম। আমি দিব্য ভাল-মানুষের মত পরিষ্কার ভাষায় কথা কহিতে লাগিলাম। কিন্তু কথা কহিতে কহিতে আমি বরাবর ঘড়ির ছোট কাঁটাটির দিকে চাহিয়া ছিলাম। ঐ কাঁটা যখন ছ'য়ের ঘরে ঠেকিবে, আমি তখন হত্যাকারী হইব!

ছয়টা বাজিতে সাত মিনিট দেরি। আলেক্সিস, আলস্যভরে সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আমি এখনি ফিরে আস্‌চি।" বলিতে বলিতে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তাসিয়ানার সঙ্গে চোখোচোখি হয়, এ আমার ইচ্ছা নয়। আমি জানালার কাছে গেলাম। পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া, বাহিরের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি দেখিতে না পাইলেও বুঝিলাম যে, তাসিয়ানা আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনিলাম। এবং বুঝিলাম যে, সে জানালার দিকে তাকাইয়া নাই—সে চাহিয়া আছে, আমার দিকেই! আমি তবু চুপ করিয়া রহিলাম। তাসিয়ানা বলিল, "বাইরে বরফ কেমন চক্‌চক্ কর্‌চে!"

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

"আণ্টনি!" আমাকে ডাকিয়াই সে থামিয়া গেল।

আমি তখনও স্তব্ধ।

সে কম্পিতস্বরে আবার ডাকিল, "অ্যাণ্টনি!"

আমি তার দিকে চাহিলাম।

সে টলিতে টলিতে পড়িয়া যায়-যায় হইল—যেন আমার চক্ষু হইতে একটা তীব্র তেজ তাহাকে ধাক্কা মারিয়াছে। এমনি সময়ে আলেক্সিস ঘরে ঢুকিল। তাসিয়ানা এক লাফে তার স্বামীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

অস্ফুটস্বরে সে বলিল, "আলেক্সিস! আলেক্সিস! আণ্টনি—"

"একি?"

হাস্যহীন মুখে এবং মনের আনন্দকে ঢাকা দিবার জন্য আমার স্বরকে নীচু করিয়া বলিলাম, "তাসিয়ানার বিশ্বাস হয়েচে যে, এই জিনিষটা দিয়ে আমি তোমাকে খুণ কর্ত্তে চাই।"—বলিয়া, অত্যন্ত শান্ত ভাবে, আমি সোজাসুজি টেবিলের কাছে গিয়া কাগজচাপাটা তুলিয়া নিলাম এবং আলেক্সিসের নিকটস্থ হইলাম।

আলেক্সিস বিবর্ণ, নিস্পলকনেত্রে আমার দিকে চাহিল। আমার কথাকে আবৃত্তি করিয়া বলিল, "তাসিয়ানার বিশ্বাস—"

"হ্যাঁ, তার বিশ্বাস হয়েচে!"

আস্তে আস্তে সহজ ভঙ্গীতে আমি আমার হাত তুলিলাম,—সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সিসও তার হাত তুলিতে লাগিল। তখনও সে আমার মুখের দিকে, তেমনি চাহিয়া আছে।

কঠিন কণ্ঠে আমি বলিলাম, "নামাও হাত!"

তার হাত অবশ হইয়া পড়িয়া গেল। অপলক চোখে তখনও সে আমার দিকে চাহিয়া ছিল। তার ওষ্ঠে কেবল একটা পাণ্ডুর, সন্দেহপূর্ণ হাসির রেখা দেখা যাইতেছিল। তাসিয়ানা কি বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—কিন্তু, তখন আর সময় ছিল না! কাগজচাপার তীক্ষ্ণ দিকটা দিয়া, আলেক্সিসের চোখের উপরে নহে—তার ভুরুর কাছে, রগ্ ঘেঁসিয়া আমি আঘাত করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি তাহাকে অনেকবার আঘাত করিয়াছি,—কারণ, তার মাথা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল। ইহা সত্য নহে। আমি আলেক্সিসকে তিনবার আঘাত করিয়াছি,—তিনবার মাত্র! প্রথম আঘাত যখন সে দাঁড়াছিল, বাকী দুবার সে পড়িয়া গেলে পর মারিয়াছি।

একথা সত্য যে, আঘাত অতি সজোরে হইয়াছিল। কিন্তু, তিনবারের বেশী মারি নাই। সব কথা আমার বেশ মনে আছে। আলেক্সিসকে আমি তিনবার মারিয়াছি।

(৫)

রাত্রির অন্ধকার শ্রান্ত স্নায়ু-যন্ত্রকে অত্যন্ত অভিভূত করে। এইজন্য, সে সময়ে এমন-সব ভাবনা আমাদের মনে আসে, যাতে আমরা ভয় পাই। খুণের পরে যখন রাত আসিল, তখন আমার প্রাণমন স্বভাবতঃই অসাধারণ উত্তেজনার বশীভূত হইয়া পড়িল। আমার অবস্থায় পড়িলে খুব বেশী আত্ম-সংযম থাকা দরকার; একটা লোক খুণ করা ত বড় যে-সে কথা নয়!

কাপড়-চোপড় বদলাইয়া, পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন হইয়া আমি চা-পান করিতে বসিয়া, আমার দাসী মেরিয়াকে ডাকিলাম। তার সঙ্গে আমি বরাবর সদয় ব্যবহার করিতাম। আমার পাগলামির কথা সে কিছু জানিত না। তবু সে,—কেন জানিনা—আমাকে দেখিয়া ভয় পাইল। আমার কাছে আসিতে চাহিল না।

আমি মনে-মনে বলিলাম, "হু! তাহলে দেখ্‌চি আমার ভেতরে এমন-কিছু আছে, যা সাধারণের ভেতরে নেই—যার জন্যে লোকে আমাকে দেখে ভয় পায়।

পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া, আমি শুইয়া পড়িলাম। আমার তখন আদোপেই বই পড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আমার শ্রান্ত দেহ তখন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। আপনার ভূমিকা সুন্দররূপে অভিনয় করিবার পর কোন অভিনেতার যেমন দশা হয়,—আমার দশাটাও তখন অনেকটা সেই রকম।

আমার চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিল। আমি ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে আমার মস্তিষ্কে এক নূতন ভাবনা আসিয়া জুটিল। আমার অন্যান্য চিন্তার মত ইহাও পরিষ্কার, নিখুঁত, সরল! এ চিন্তা ধীরে ধীরে আমার ভিতর ঢুকিল। সে যেন কোন লোকের মত বলিল:—

"খুব সম্ভব, ডাক্তার কারজেণ্টযেফ সত্যই পাগল। তিনি পাগলামির অভিনয় করিতেছেন বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু আসলে তিনি নিজেই পাগল। এখনই তিনি পাগল।"

আমার মস্তিষ্কে এই চিন্তাটা ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হাসিতে লাগিলাম।

"তিনি পাগলামির অভিনয় করিতেছেন বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু তিনি সত্যই পাগল। এখন,—এই মুহূর্ত্তেই তিনি পাগল।"

প্রথমে ভাবিলাম, আমার দাসী মেরিয়া এই কথাগুলি বলিতেছে;—কারণ, আমি যেন একটা স্বর শুনিতে পাইতেছিলাম; আর, সে স্বর মেরিয়ার। তারপরে ভাবিলাম, সে স্বর আলেক্সিসের। হাঁ, নিহত আলেক্সিসের। শেষটা বুঝিলাম, না,—এ আমারই চিন্তা। কি ভয়ানক কল্পনা!

আমি মুঠা করিয়া আমার চুল চাপিয়া ধরিলাম—আমি লাফাইয়া উঠিলাম। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া—কেন জানি না—আমি বলিলাম:—

"বটে—এমনধারা! তাহলে সব শেষ! আমি যা ভয় কর্‌ছিলাম, তাই হল। আমি একেবারে সীমার কাছে সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিলাম,—এখন ভবিষ্যৎ আমাকে উন্মত্ততা দান করতে চাইচে!"

আমাকে যখন গ্রেপ্তার করিতে আসিল, আমার অবস্থা তখন ভয়ানক। আমার কাপড়চোপড় সব ছেঁড়াখোড়া; কিন্তু, ভগবান দোহাই, সেদিনকার মত সন্ধ্যাকালটা তেমন অবস্থার ভিতরে কাটাইয়াও আমি যে পাগল হইয়া যাই নাই,—ইহাতেই কি আমার মস্তিষ্কের স্থিরতা প্রমাণিত হইতেছে না? আমি সেদিন

কাপড়-চোপড় ছেঁড়া ও আয়নাগুলি ভাঙ্গা ছাড়া আর কোন অন্যায় কাজ করি নাই। কিন্তু, এই সঙ্গে তোমাদের আর একটা কথাও বলিয়া রাখি। সে রাত্রে আমাকে যে-রকম যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, যদি কখনও তোমাদের কারুকে সে-রকম যাতনা ভোগ করিতে হয়, তবে তোমার ঘরের আয়নাগুলিকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়ো। ঢাকিয়া রাখিয়ো—ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়ো!

তারপর, যতক্ষণ না পুলিশ আসিল, ততক্ষণ-পর্য্যন্ত আর কি হইয়াছিল,সে সব কথা আমার কিছুই মনে নাই। আমি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম, কটা বাজিয়াছে?

"বেলা ন'টা।"

আলেক্সিসের মৃত্যুর পরে যে সবে তিন ঘণ্টা কাটিয়াছে, একথা আমি সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

কিন্তু, একটা ব্যাপার আমার বেশ মনে আছে। আমার সেই চিন্তা—কিংবা—সেই স্বর! অন্ততঃ,—সেটা সত্য।

"ডাক্তার কারজেণ্টযেফ ভাবিয়াছেন যে, তিনি পাগলামির ভাণ করিয়াছেন। কিন্তু আসলে তিনি পাগল।"

আমি এইমাত্র আমার নাড়ী পরীক্ষা করিলাম,—একশো আশীবার কাঁপিল। সেই স্বরের স্মৃতি মনে হইবামাত্র আমার হৃদয় এইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে!

(৬)

মহাশয়গণ,

আপনারা সকলেই বৈজ্ঞানিক। অতএব, আপনাদের কাছেই আমি একটা উত্তর চাই। আপনারা স্বভাবতঃই পরস্পরের সঙ্গে একমত হইবেন না। কিন্তু আমি আপনাদের সকলকার কথাই বিশ্বাস করিব। কেবল, আমার এই প্রার্থনা যে, আপনারা আপনাদের মত প্রকাশ করুন! এখানে আমি আর একটি তুচ্ছ, কিন্তু চিত্তাকর্ষক ঘটনা বলিব। ইহাতে আপনাদের মতগঠনের সুবিধা হইতে পারিবে।

আমি এখন পাগলা-গারদে। এক শান্ত প্রভাতে, এখানে একদিন আমার শুশ্রূষা-কারিণী ধাত্রী হঠাৎ আমার কাছে থেকে সরিয়া গেল। তার ভাব দেখিলে মনে হয়, সে যেন হঠাৎ কি-একটা অজানা কারণে ভয় পাইয়াছে।

আমি তখন বিছানার উপর বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, অতঃপর, কি করা যায়! তারপরে দেখিলাম, আমি এক অদ্ভুত কাজ করিতে চাই। আমি,—ডাঃ কারজেণ্টযেফ্—কুকুরের মত চীৎকার করিতে চাই!

আমার সাধ হইতেছিল, কাপড়-জামা ছিঁড়িয়া ফেলিতে ও আপনাকে আপনি আঁচড়াইতে! জামার কলারে প্রথমটা আস্তে আস্তে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিয়া তারপর হঠাৎ একটানে কলার থেকে নীচে পর্য্যন্ত পড়্ পড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছিল! আমার বাসনা হইল,—আমি ডাক্তার কারজেণ্টযেফ্,—আমার বাসনা হইল, হাঁটু ও হাত পাতিয়া হামাগুড়ি দি!

চারিদিক তখন স্তব্ধ। জানালার সার্শিতে তুষার-কণা ঝক্‌মক্ করিতেছিল।

অদূরেই আমার ধাত্রী নীরবে প্রার্থনারত। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা ভাবিলাম। আমি যদি ঘেউ-ঘেউ করি, তবে একটা শোর্‌গোল পড়িয়া যাইবে ও আমার দুর্ণাম রটিবে। যদি আমি জামা ছিঁড়ি, কাল সকলে তাহা টের্ পাইবে। আচ্ছা, তবে সুধু হামাগুড়িই দেওয়া যাক্! তাহাহইলে, কেহ কিছু শুনিতে পাইবে না। আর সে সময়ে যদি কেহ আমার ঘরের ভিতর আসিয়া পড়ে, তবে বলিলেই চলিবে যে, আমার একটা বোতাম হারাইয়া গিয়াছে, আমি তাহাই খুজিতেছি।

তারপরে ভাবিলাম, "আচ্ছা, সুধুসুধু আমি হামাগুড়িই বা দিতে চাই কেন? তবে, সত্যই কি আমি পাগল?"

ভয়ে আমার গায়ে কাটা দিয়া উঠিল। আমার প্রাণে একটা আকস্মিক দুর্দ্দম বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল যে, হাঁ—একসঙ্গে আমি তিনটা কাজই করিব,—আমি ঘেউ-ঘেউ করিব, হামাগুড়ি দিব, আপনাকে-আপনি আঁচ্‌ড়াইব। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি হামাগুড়ি দিতে চাও?"

কোন উত্তর নাই!

"তুমি হামাগুড়ি দিতে চাও?"

তখনও উত্তর নাই।

"দাও তবে হামাগুড়ি!"

জামার আস্তিন উল্টাইয়া আমি চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিতে লাগিলাম; ঘরের আধখানা-বরাবর এমনি হামাগুড়ি দিয়া আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া, যেখানে ছিলাম সেইখানেই বসিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম, হাসিতে লাগিলাম, হাসিতে লাগিলাম।

হঠাৎ আমার এমন নির্ব্বুদ্ধির মত ইচ্ছা হইল কেন, আমি বসিয়া-বসিয়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। আমার কপট পাগলামির কল্পনা হইতেই এই উন্মত্তের মত ইচ্ছার উদয় হইয়াছে। এ ইচ্ছা যেই পূর্ণ হইল, অমনি বুঝিলাম যে, আমি পাগলা নৈ। আমি যে কারণ দেখাইলাম, তাহা অতি সরল ও যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু—

কিন্তু তবু আমি হামাগুড়ি দিয়াছি ত'! আমি কি পাগলের মত আত্মপ্রবোধ দিতেছি, না, বিচার-বুদ্ধিমান হইয়াও পাগল হইতে বসিয়াছি?

মহাশয়গণ, আমাকে সাহায্য করুন। এই ভীষণ, এই নির্দ্দয় সমস্যা পূরণ করুন। আপনাদের মত শুনিবার জন্য আমি অতি ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছি। বলুন—আমি কি? পাগল?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল*

[টিকীন্দ্রজিদ্দেবতা। টিকি দাসো ঋষিঃ। টিক্‌টিক্ ছন্দঃ। টিট্‌কার্য্যাং বিনিয়োগঃ]

মূল গায়েন।—

ভো ভোঃ কারণ-সলিলে কুঁকুড়িস্থকুড়ি
ডিম্বে যেমন হংস,
আহা ছিল চইতন চুট্‌কি আদিতে
টিকি হয় যার বংশ!
তারে 'চই' 'চই' করি আদিম আঁধারে
ডাকিল সপ্ত ঋষি গো,
তাই 'চইতন' নাম হইল তাহার
যে নামে ভরিল দিশি গো!
তারে ব্রহ্মা কহিলা "টিকিয়া থাকহ"
তাই তারে "টিকি" কয়,
আহা মগজ-আগুন-অঙ্গার টিকি
টিকি সামান্য নয়।

দোহার কী-গোহার।—

এ-রি-ন্নুম্!—তেরি না!—
টিকি রাখ,—দেরী না-আ আ!

মূল গায়েন।—

হাঁ হাঁ টিকির প্রভাবে টিকিয়া রয়েছি
টিকিতেই বাঁধা বিশ্ব,
আর টিকি না থাকিলে হইত দুনিয়া
টিক্‌টিকি চেয়ে নিঃস্ব!
ওগো টিকি যেই রাখে ধর্ম্ম মোক্ষ
পায় সেই হাতে হাতে,
দেখ বিপুল টিকির বহরে উড়িয়া
বেঁধেছে জগন্নাথে!
তবে দোফলা টিকির চাষ কর ভাই,
টিকি মূলে ঢাল তৈল,
আহা যেতে ভবপার বিনা পয়সার
টিকিট যে টিকি হৈল!

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-ন্নুম্!—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

আহা কামনা-বহ্নি অন্তরে যার
প্রেমিক হইবে যেবা,
ওগো সেইজন জানে টিকির কদর,
সেই করে টিকি সেবা।
আর টিকি না রাখিলে প্রেমিকই হয় না
শাস্ত্রে রয়েছে লেখা,
যখন প্রেমে হাবুডুবু লোকে বলে "আহা
টিকিও না যায় দেখা!"
টিকি রোমিয়োরও ছিল, হোমিয়প্যাথিক
ইথে নাই কোনো ভুল,
পোড়ো মগজ-মহলে মাকোষা ঢুকিলে
বেরুবেই টিকি ঝুল।
ওগো মোক্ষ ও কাম পূরা হ'বে,—হও
থরকাটা প্রেমচাঁদ,
ওরে টিকি রাখ্ তোরা ভব-দরিয়ায়
টিকির জাঙাল বাঁধ।

---

* জঙ্গল মহলের অন্তর্গত রামটিকি পর্ব্বতের 'আঠারো ঘা' নামক গুহা হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-স্থম্!—টেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

ওগো টিকি রাখ যদি অর্থও পাবে
অর্থ ই যদি চাও,
তখন চোরাই চাল্‌তা টিকিতে বাঁধিয়া
হাত নাড়া দিয়া যাও।
আর টাকাটা সিকিটা দক্ষিণা পাবে
হজ্‌মী টিকির জোরে,
আর রাতের ফাউল্ প্রভাত না হতে
ফেলিবে হজম ক'রে।
কহ— কুড়ি দরে তুমি মুর্গী কিনিতে?
বয়স যখন কাঁচা?—
বাপু! অধম-তারণ টিকি রাখ মাথে
ভগ্ন কি তোমার বাছা?
দেখ ধর্ম্ম মোক্ষ অর্থ ও কাম
সকলই টিকির স্থাওটা
ওগো বেচাল ঘটিলে টিকি বিনা আর
কে ধরে তখন ম্যাওটা?

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-স্থম্—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

ওগো শুধু 'এক' লেখ অর্থ হবে না
এলেক্‌টি দাও দিকি,
তখন একের অর্থ হবে এক টাকা
অঙ্কে এলেক্—টিকি।
ওই এলেক্-টিকির দোহাই না দিলে
তারের খবর বন্ধ
তোমরা এলেক্-টিকি তো দিব্যি মান হে
টিকির বেলাই সন্দ'?
দেখ বৃক্ষের টিকি শিকড়,—সটিকি
ডিগ্‌বাজী খায় বৃক্ষ,
আর বৃত্তের টিকি 'ট্যাঞ্জেণ্ট',—কোথি
নাই টিকি দুর্ভিক্ষ।
ওগো আমরা টিকির, টিকি আমাদের
চাল তেল টিকিমূলে,
আর টাকে যদি টিকি নেহাৎ ঘোচায়
(টিকি) বানাইব পরচুলে।

দোহার-কী গোহার।—

এ-রি-স্থম্!—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

দেখ দেবতার টিকি ছিল কিনা ছিল
শাস্ত্রে লেখে না তাহা,
তবে বিচারের মুখে সূক্ষ্ম টানিলে
বাহিরিবে টিকি ডাহা।
যথা ব্রহ্মার টিকি নাভির মৃণাল,
তৃতীয় চরণ বিষ্ণুর,
আর মহেশের টিকি জটাজালে ঢাকা,
টিকি প্রতি শিব নিষ্ঠুর।
আর গণেশদাদার শুঁড়ময়ী-টিকি
দাদার টিকিটি খাসা;
আর আদি বৈষ্ণব গরুড়ের টিকি
তার সে টিকল নাসা!
আর সূর্য্যের টিকি রাহুর মুঠায়
রাহুর টিকি সে কোথা গো?

বুঝি স্নাহুর টিকিটি অন্তঃশীলা
যেন ফল্গুর সোঁতা গো !
তবে দোফলা টিকির চাষ কর ভাই
টিকি কভু নয় তুচ্ছ,
ওগো কানুর টিকি সে তৃতীয় চরণ
হনুর টিকি সে পুচ্ছ !

দোহার-কী-গোহার।—
এ-রি-মুম্ !—তেরি না !—
টিকি রাখ !—দেরী না-আ-আ !

মূল গায়েন।—
দেখ অসুরপুরের শুম্ভাসুরের
টিকি ছিল তাই রক্ষে,
হুঁহুঁ নহিলে তাহারে বাগানো কঠিন
হ'ত কালিকার পক্ষে।
আহা সুরাসুর হন টিকির বাহন
ত্রিলোক টিকি-ব্রত,
ওরে টিকি আছে ব'লে ট্রামগাড়ী চলে
নইলে অচল হ'ত।
জড়- বিজ্ঞানে যাহা মাধ্যাকর্ষ
টিকি সেই পৃথিবীর,
সেই টিকিটি ধরিয়া সূর্য্য তাহারে
শূন্যে রেখেছে থির।
তোরা টিকির মূল্য বুঝিতে নারিস্
এযে অতি অদ্ভুত,
আরে টিকি যদি হায় না থাকে মাথায়
কি ধরিবে যমদূত ?

দোহার-কী-গোহার।—
এ-রি-মুম !—তেরি না !—
টিকি রাখ !—দেরী না-আ আ !

মূল গায়েন।—
আহা ! টিকি সে স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ
টিকি সে মোক্ষ কাম,
ও চা মুর্গীর মাথে টিকি আছে ব'লে
রামপাখী তার নাম।
হায় ম্লেচ্ছেরা এরে 'পিগ্‌টেল' বলে
অহহ শূকর-পুচ্ছ,
ওগো ! তোমরা আর্য্য মর্য্যাদা রেখো
টিকিরে ক'রো না তুচ্ছ।
দেখ বানর টিকির গরিমা বোঝেনি
রাখিয়াছে টিকি পুচ্ছে,
তাই নরের মতন হ'তে সে পারেনি
উঠিতে পারেনি উচ্চে।
মোরা পুচ্ছেরে শিরোধার্য্য করেছি
মহৎ হ'য়েছি তাই,
আর ডারুইন ওই তত্ত্ব লিপিয়া
করিয়াছে একজাই।
এখন টিকি রেখে পায়া ভারি হ'ল ভায়া
আর কে মোদের পায় হে,
দেখ নরে ও বানরে তফাৎ যা' শুধু
টিকিরই মর্য্যাদায় হে !
তবে মিলি' কলু তেলি এস ভিড় ঠেলি'
(এই) টিকি মূলে ঢাল তৈল ;
আহা যেতে সশরীরে স্বর্গেতে টিকি
রাবণের সিঁড়ি হৈল।

দোহার-কী-গোহার !
এ-রি-মুম্ !– তেরি না !—
টিকি রাখ !—দেরী না-আ আ !

মূল গায়েন।—
দেখ শ্রীশ্রীটিকির অপমান করি
চীনের কি দুর্গতি,

আহা বুড়া বয়সেতে আফিম ত্যজিল
হ'ল তার ভীমরতি।
যাঁহা টিকি গেল খোয়া রাজা হল ধোঁয়া
অবাজক হ'ল দেশ,
যত গোঁয়ারে মিলিয়া করিল দেখ না
খোয়ারের একশেষ!
দেখ আকাশের টিকি বিদ্যুৎ আর
পাতালের টিকি সর্প,
আর তোমরা ভেবেছ টিকি রাখিবে না
ভারি তোমাদের দর্প।

দোহার-কী-গোহার।—
এরি-নুম্!—টেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—
ওগো যেই শোনে আর যে জন শোনায়
টিকি-মঙ্গল-গান,
কভু টাক-অসুরের কোপে তার টিকি
নাহি হয় তিরোধান।
যত টিকি-ঘেঁসা টাক সারিবে বেবাক
এ গান শুনিলে কানে,
আর টিকি-বর্জ্জিত বৃথা টাকে চুল
গজাবে টিকি-স্থানে।
ওগো টিকি-মঙ্গল গাহিবার কালে
যে ক'রে বাহির দন্ত,
ওগো দন্ত তাহার টিকিবে না,—ঠিক
বুড়াকালে হবে অন্ত।
ওগো জনমে জনমে পোকা হবে দাঁতে
যুগে যুগে হবে শাস্তি,
এই হাসির জন্য কাঁদিতে হইবে
মার্জ্জনা এর নাস্তি!

দোহার-কী-গোহার।—
এরি-নুম!—তেরি না!
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

নালক

১

দেবল ঋষি যোগে বসেছিলেন। নালক—সে একটি ছোটো ছেলে, ঋষির সেবা করছিল। অন্ধকার বর্দ্ধনের বন, অন্ধকার বট গাছের তলা, অন্ধকার এপার-গঙ্গা ওপার-গঙ্গা, নিশুতি রাতে কালো আকাশে তারা ফুটেছে, বাতাস ঘুমিয়ে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা নড়ছে না! এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুট্‌লো—ফুল যেমন কোরে ফোটে, চাঁদ যেমন কোরে ওঠে,—একটু একটু আরো একটু। সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠ্‌লো,—পদ্মপাতায় জল যেমন দুল্‌তে থাকে—এদিক্ ওদিক্ সেদিক্, এধার ওধার সেধার। ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন, আকাশে এক আশ্চর্য্য আলো!—চাঁদের আলো নয়, সূর্য্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক আলোর আলো! এমন আলো কেউ কখনো দেখেনি! আকাশ জুড়ে কে যেন

সাত-রঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। কোন্ দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপরে আলোর একটি একটি ধাপ গেঁথে গিয়েছে!

সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নালককে বল্লেন—কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন, আমি তাঁর দর্শন করতে চল্লেম, তুমি সাবধানে থেকো।

বনের মাঝ দিয়ে আঁকা-বাঁকা সরু পথ, সন্ন্যাসী সেই পথে উত্তর-মুখে চলে গেলেন। নালক চুপটি কোরে বটতলায় ধ্যানে বসে দেখতে লাগলো—একটির পর একটি ছবি।

২

কপিলবাস্তুর রাজবাড়ি। রাজরাণী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সাম্‌নে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, সহর, মন্দির, মঠ। আরো ওধারে—অনেক দূরে হিমালয় পর্ব্বত—সাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওপারে আকাশ জুড়ে আশ্চর্য্য এক সাদা আলো; তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মত সূর্য্য উঠ্‌ছেন! রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন—মহারাজ কি চমৎকার স্বপ্নই দেখলেম! এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেম না! আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মত কেমন একটি টিপ ছিল।

রাজারাণী স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ির নবৎখানার বাঁশী বাজছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাঁকঘণ্টার শব্দ আসছে, অন্দর-মহলে রাজদাসীরা সোনার কলসীতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আন্‌ছে, মালিনীরা সোনার থালায় পূজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। রাণীর পোষা ময়ূর ছাদে এসে উড়ে বসলো, সোনার খাঁচায় শুকশারী খাবারের জন্যে দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া সুরু করে দিলে, ভিখিরী এসে, জয় রাণীমা!—বলে দরজায় দাঁড়ালো। দেখতে দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রাণীর স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি কোরতে লাগলো।

৩

কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, মাথায় মাণিকের মুকুট, পরণে লাল চেলী, সকালে সূর্য্যের মতো রাজা শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তাঁর পাশে দণ্ডধর—সোনার ছড়ি হাতে, ওপাশে ছত্রধর—শ্বেতছত্তর খুলে, তার ওপাশে নগরপাল—ঢালখাঁড়া নিয়ে।

রাজার দুইদিকে দুই দালান;—একদিকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত আর-এক দিকে দেশবিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাদের ঘিরে যত দুয়ারী;—মোটা রায়বাঁশের লাঠি আর কেবল লাল পাগড়ির ভিড়!

রাজসভার ঠিক মাঝখানে লাল চাঁদোয়ার নীচে আটখানি রক্তকম্বলের আসন; তারি

উপরে রাজার আট গণৎকার খড়ি-হাতে পুঁথি খুলে রাণীর স্বপ্নের কথা গণনা করতে বসেছেন। তাঁদের কারু মাথায় পাকা চুল, কারু মাথায় টাক্‌, কারু বা ঝুঁটি বাঁধা, কারু বা ঝাঁটা গোঁফ! সকলের হাতে এক এক শামুক নস্যি। আট পণ্ডিত কেউ কলমে লিখে, কেউ খড়িতে দেগে, রাণীর স্বপ্নের ফল গুণে বলছেন—

—সূর্য্য স্বপ্নে রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র মহাতেজস্বী।
চন্দ্রে তথা রূপবান গুণবান রাজাধিরাজ দীর্ঘজীবী।
শ্বেতহস্তীর স্বপ্নে শান্ত গম্ভীর জগৎদুর্ল্লভ এবং
জীবের দুঃখহারী মহাধার্ম্মিক ও মহাবুদ্ধ পুত্রলাভ।

—এবার নিশ্চয় মহারাজ, এক মহাপুরুষ এই শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না। আনন্দ কর।

চারিদিকে অমনি রব উঠলো আনন্দ কর, আনন্দ কর! অন্নদান কর, বস্ত্রদান কর, দীপদান, ধূপদান, ভূমিদান, ভূরিদান কর। কপিলবাস্তুতে রাজার ঘরে, প্রজার ঘরে, হাটে মাঠে ঘাটে আনন্দের বাজনা বেজে উঠলো, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগলো, বাতাস আনন্দে বইতে লাগলো। রাজমুকুটের মাণিকের দুল রাজছত্তরের মুক্তোর ঝালোর, মন্ত্রীর গলায় রাজার দেওয়া কণ্ঠমালা, পণ্ডিতদের গায়ে রাণীর দান ভোটকম্বল, দাসদাসী দীনদুঃখী ছেলে বুড়োর মাথায় রাজবাড়ির লাল চেলী আনন্দে দুলতে থাক্‌লো।

৪

প্রকাণ্ড বাগান; বাগানের শেষ দেখা যায় না, কেবলি গাছ, গাছের পর গাছ, আর সবুজ ঘাস, জলের হাওয়া, ঠাণ্ডা ছাওয়া, পাখীদের গান আর ফুলের গন্ধ। বাগানের মাঝে এক প্রকাণ্ড পদ্মপুকুর! পদ্মপুকুরের ধারে আকাশপ্রমাণ এক শাল গাছ, তার ডালে ডালে পাতায় পাতায় ফুল ধরেছে; দখিনে বাতাসে সেই ফুল, গাছের তলায় একটি শ্বেত পাথরের চৌকির উপরে উড়ে পড়ছে।

সন্ধ্যা হোয়ে এল। সুরূপা যত পাড়ার মেয়ে পদ্মপুকুরে গা ধুয়ে উঠে গেল। উবু ঝুঁটি, গলায় কাঁটি, দুই কানে সোনার মাক্‌ড়ি একদল মালিমালিনী শুক্‌নো পাতা ঝাঁট দিতে দিতে, ফুলের গাছে জল দিতে দিতে, বেলাশেষে বাগানের কাজ সেরে চলে গেল;—সবুজ ঘাসে, পুকুর পাড়ে, গাছের তলায়, কোনোখানে, কোনো কোণে একটু ধুলো, একটি কুটোও রেখে গেল না।

রাত আস্‌ছে,—বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত! পশ্চিমে সূর্য্য ডুবছেন, পূবে চাঁদ উঠি-উঠি করছেন। পৃথিবীর একপারে সোনার শিখা, আর-একপারে রূপার রেখা দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর নীল আকাশ লক্ষকোটী তারায় আর সন্ধিপূজোর শাঁখ ঘণ্টায় ভরে উঠ্‌ছে। এমন সময় মায়াদেবী রূপোর জালে ঘেরা সোনার পাল্কীতে সহচরী সঙ্গে বাগান-বেড়াতে এলেন;—রাণীকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা, পানের বাটা নিয়ে। প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, ছায়ায় ছায়ায় চলে ফিরে, রাণী এসে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড সেই শালগাছের তলায় দাঁড়ালেন—বাঁ হাতখানি ফুলে ফুলে ভরা শালগাছের ডালে, ডান হাতখানি কোমরে রেখে।

অমনি দিন শেষ হলো, পাখীরা একবার কলরব করে উঠ্‌লো, বাতাসে, অনেক ফুলের গন্ধ, আকাশে অনেক তারার আলো ছড়িয়ে পড়লো। পূবে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন—শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা! ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন—যেন একটি সোনার পুতুল, যেন চাঁপাফুলে ঘেরা পৃথিবীতে যেন আর-এক চাঁদ! চারিদিকে আলোয় আলো হয়ে গেল; —কোনোখানে আর অন্ধকার রইল না, মায়া মায়ের কোলে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, —যেন পদ্মফুলের উপর একটি ফোঁটা শিশির,—নির্ম্মল সুন্দর এতটুকু। দেখতে দেখতে লুম্বিনী বাগান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো, পাত্র মিত্র অনুচর সভাসদ্ সঙ্গে রাজা শুদ্ধোদন রাজপুত্রকে দেখতে এলেন, রাজদাসীরা মিলে শাঁখ বাজাতে লাগলো, উলু দিতে থাকলো।

স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে মেঘে মেঘে দেবতার দুন্দুভি বাজ্‌ছে, মর্ত্ত্যের ঘরে ঘরে শাঁখ ঘণ্টা, পাতালের তলে তলে জগঝম্প, জয়ডঙ্কা বেজে উঠছে। বুদ্ধদেব তিনলোক-জোড়া তুমুল আনন্দের মাঝখানে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর উপরে প্রথম সাত পা চলে যাচ্ছেন! সুন্দর পা দুখানি যেখানে যেখানে পড়লো, সেখানে সেখানে অতল সুতল রসাতল ভেদ করে একটি একটি সোনার পদ্ম আগুনের চরকার মত মাটির উপরে ফুটে উঠলো; আর স্বর্গ থেকে সাতখানি মেঘ এসে সাত সমুদ্রের জল সেই সেই সাতটি পদ্মের উপরে ঝির্‌ঝির্ কোরে ঢাল্‌তে লাগলো!

নালক আশ্চর্য্য হয়ে দেখছে, দেব দানব মানবে মিলে সেই সাত-পদ্মের মাঝখানে বুদ্ধদেবকে অভিষেক করছেন! এমন সময় নালকের মা এসে ডাক্‌লেন—দস্যি ছেলে ঋষি। এখানে নেই আর তুমি একা এই বনে বসে রয়েছো! না ঘুম, না খাওয়া, না লেখা পড়া,—কেবল চোখ বুজে ধ্যান করা হচ্ছে! এই বয়েসে উনি আবার সন্ন্যাসী হয়েছেন! চল্ বাড়ি চল্।

মা নালকের হাত ধোরে টেনে নিয়ে চল্লেন, নালক মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌তে লাগলো—ছেড়ে দাও মা, তার পর কি হোলো দেখি। একটি বার ছাড়ো। মাগো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! সমস্ত বন নালকের দুঃখে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল,—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!

আর ছেড়ে দে! একেবারে ঘরে এনে তালা বন্ধ!

৫

নালককে তারা জোর কোরে গুরু-মশায়ের পাঠশালে দিয়েছে। সেখানে গুরু বল্‌ছেন—ওকাস অহং ভন্তে। নালক পড়ে যাচ্ছে—ভন্তে। গুরু বল্‌ছেন লেখ্— অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। নালক বড় বড় কোরে তালপাতায় লিখে যাচ্ছে—সীলং দেথ মে ভন্তে। কিন্তু তার লেখাতেও মন নেই, পড়াতেও মন নেই। তার প্রাণ বর্দ্ধনের বনে সেই বটতলায় আর সেই কপিলবাস্তুর রাজধানীতে পড়ে আছে।

পাঠশালের খোড়ো ঘরের জান্‌লা দিয়ে

একটা তিন্তিড়ি গাছ, খানিকটা কাশ আর কাঁটাবন একটা বাঁশঝাড় আর একটি পুকুর দেখা যায়। দুপুরবেলা একটুখানি রোদ সেখানটায় এসে পড়ে, একটা লাল-ঝুঁটি কুবোপাখী ঝুপ করে ডালে এসে বসে আর কুব্‌কুব্ কোরে ডাকতে থাকে. কাঁটা গাছের ফুলের উপরে একটা কালো ভোমরা ভন্-ভন্ কোরে করে উড়ে বেড়ায়, একবার জানলার কাছে আসে আবার উড়ে যায়, নালক সেইদিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে—আহা, ওদের মত যদি ডানা পেতেম তবে আর কি মা আমায় ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারতেন? একদৌড়ে বনে চলে যেতেম। এমন সময় গুরু বলে ওঠেন—লেখ্ রে লেখ্! অমনি বনের পাখী উড়ে পালায়, তাল-পাতার উপরে আবার খস্ খস্ কোরে ছেলেদের কলম চল্‌তে থাকে। নালক যে কি কষ্টে আছে তা সেই জানে! হাত চল্‌ছে না তবু পাতাড়ি-লেখা বন্ধ করবার জো নেই, কান্না আসুক্ তবু পড়ে যেতে হবে—য র ল, শ ষ স—বাদলের দিনেও, গরমের দিনেও, সকালেও, দুপুরেও।

নালক পাঠশাল থেকে মায়ের হাত ধোরে যখন বাড়ী ফেরে হয়তো শালগাছের উপরে তখন কালো মেঘ আঁধার করে আসে, মাঠের উপরে তালগাছগুলোর মাথা দুলিয়ে পুবে হাওয়া বইতে থাকে, বাঁশঝাড়ে কাকগুলো ভয়ে কা কা করে ডেকে ওঠে; নালক মনে মনে ভাবে আজ যদি এমন একটা ঝড় ওঠে যে আমাদের গ্রামখানা ঐ পাঠশালের খোড়ো চাল্‌টাসুদ্ধ একে-বারে ভেঙে-চুরে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে বনে গিয়ে আমাদের থাক্‌তেই হয়, তখন আর আমাকে ঘরে বন্ধ করবার উপায় থাকে না। রাতের বেলায় ঘরের বাইরে বাতাস্ শন্ শন্ বইতে থাকে, বিদ্যুতের আলো যতই ঝিক্‌মিক্ চম্‌কাতে থাকে, নালক ততই মনে মনে ডাকৃতে থাকে—ঝড় আসুক, আসুক বৃষ্টি! মাটির দেওয়াল গলে যাক্, কপাটের খিল ভেঙে যাক্! ঝড়ও আসে, বৃষ্টিও নামে, চারিদিক জলে জলময় হয়ে যায় কিন্তু হায় কোনদিন কপাটও খোলে না, দেওয়ালও পড়ে না, যে বন্ধ সেই বন্ধ! খোলা মাঠ খোলা আকাশে ঘেরা বর্দ্ধনের সেই তপোবনে নালক আর কেমন করে ফিরে যাবে?—যেখানে পাখীরা আনন্দে উড়ে বেড়ায়, হরিণ আনন্দে খেলে বেড়ায়, গাছের তলায় মাঠের বাতাসে যেখানে ধোরে রাখবার কেউ নেই, ধরা দেবারও কেউ নেই;—সবাই ইচ্ছামতো খেলে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে। ঋষির আশাপথ চেয়ে, নালক দিন গুন্‌ছে, ওদিকে দেবল ঋষি কপিলবাস্তু থেকে বুদ্ধদেবের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে, আনন্দে দুই হাত তুলে নাচতে নাচতে পথে আস্‌ছেন আর গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে চলেছেন—"নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়, নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়, নমো অনন্তগুণার্ণবায়, নমো শাক্যনন্দনায়।"

শরৎকাল। আকাশে সোনার আলো। পথের দুইধারে মাঠে মাঠে সোনার ধান। লোকের মন আর ঘরে থাকতে চায় না। রাজারা ঘোড়া সাজিয়ে দিগ্বিজয়ে চলেছেন, প্রজারা দলে দলে ঘর ছেড়ে হাটে মাঠে ঘাটে কেউ পসরা মাথায়, কেউ ধানক্ষেত নিড়োতে,

কেউবা সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী-পারে বাণিজ্য কর্‌তে চলেছে। যাদের কোনো কাজ নেই তারাও দল-বেঁধে ঋষির সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে চলেছে—"নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়।"

সন্ধ্যাবেলা নীল আকাশে কোনখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশ-গঙ্গা একটুক্‌রো আলোর জালের মত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত দেখা দিয়েছে, দেবল ঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন—"নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়।" মায়ের কোলে ছেলে শুন্‌ছে—"নমো গোতম চন্দ্রিমায়"; ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন—"নমো নমো"; বুড়িদিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনেছেন—"নমো"; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন—"ওরে নোমো কর্‌, নোমো কর্‌।" গ্রামের ঠাকুরবাড়ীর শাঁখ ঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে একতানে বেজে উঠ্‌ছে—নমো নমো নমো। আকাশে বাতাসে শব্দ উঠ্‌ছে—নমো নমো নমো! রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম যখন বল্‌ছে—নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন—নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যখন বল্‌ছেন—নমো, সেই সময়ে ঘুম ভেঙে নালক উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন! আগড় খুলে গেছে! খোলা দরজায় সোনার রোদ একেবারে ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত এসে নালকের মাথার উপরে পড়েছে, নালক উঠে ঋষিকে প্রণাম করেছে আর ঋষি নালককে আশীর্ব্বাদ করছেন—সুখী হও, মুক্ত হও।

ঋষির হাত ধোরে নালক পথে এসে দাঁড়িয়েছে, নালকের মা দুই চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঋষিকে বল্‌ছেন—নালক ছাড়া আমার কেউ নেই, ওকে নিয়ে যাবেন না।

ঋষি বল্‌ছেন—দুঃখ কোরোনা, আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে নালককে ফিরে পাবে। ভয় কোরোনা; এস তোমার নালককে বুদ্ধদেবের পায়ে সঁপে দাও। ঋষি মন্ত্র পড়তে থাকলেন আর নালকের মা ছেলের দুই হাত ধোরে বল্‌তে লাগলেন—

কুসুমং ফুল্লিতং এতং পগ্‌গহেত্বান অঞ্জলিং
বুদ্ধ সেট্ঠং সবিত্বান আকাসেমপিপুজয়ে।—

—নির্ম্মল আকাশের নীচে বুদ্ধদেবের পূজা করি, সুন্দর আমার (নালক) ফুল তাকে দিয়ে পূজা করি।

ঋষি নালকের হাত ধোরে বনের দিকে চলে গেলেন।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যুদ্ধ-সাহিত্য

যে য়ুরোপ খৃষ্টের প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়াছে, সেই য়ুরোপ আজ অদৃষ্টপূর্ব্ব হত্যাশালায় পরিণত। তাহার শিল্প, তাহার সাহিত্য, তাহার বিজ্ঞান ও দর্শন হইতে সেই প্রেমের মধুর রাগিণীটি থামিয়া গিয়াছে, সমস্তই আজ হত্যার রুদ্র আনন্দে এবং বিভীষিকায় পরিপূর্ণ। কলাবিদ্ ভাবের কল্পনা ভুলিয়া, কবি কবিতা-সাধনা ভুলিয়া, দার্শনিক জ্ঞানের ভাবনা ভুলিয়া আধুনিক কুরুক্ষেত্রের শোণিত-পাথারে ভাসিয়া চলিয়াছেন। একদা যে নগর শান্তশ্রী এবং সৌন্দর্য্যে ভরিয়া ছিল আজ তাহা বিরাট ধূলি-স্তূপ মাত্র। শান্তির আশ্রয় ধর্ম্মমন্দিরগুলি আজ হত্যাকারী সৈন্যগণের আশ্রয়স্থান; শিল্পবিচিত্র স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের বিবিধ কারুকার্য্য আজ পদদলিত ও ধূলিলুণ্ঠিত।

প্রতীচ্যের অসামরিক ব্যক্তিরাও এখন যুদ্ধের কথা ভিন্ন আর কিছু শুনিতে চাহে না, আর কিছু পড়িতে চাহে না। সেখানকার লেখকেরাও জনসাধারণের মনের ক্ষুধা মিটাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাই অতি অল্পদিনের ভিতরেই য়ুরোপে রীতিমত একটি যুদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই যুদ্ধসাহিত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বর্ত্তমান সমর-সূচনার পূর্ব্ব হইতেই! আমরা আবশ্যকবোধে তথাকথিত সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচয় দিলাম।

জার্ম্মেণীর বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিক-সৈনিক জেনারেল ফ্রেডারিক ভন্ বার্ণহার্ডি, তাঁহার "Britain as Germany's Vassal" নামক পুস্তকে য়ুরোপে জার্ম্মেণীর অবস্থা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, অনেক কথা বলিয়াছেন। আমরা তাহার স্থানবিশেষ উদ্ধার করিলাম।:—

বার্ণহার্ডি

"রোম-সাম্রাজ্য যাহারা ধ্বংস করিয়াছে, তাহারা জার্ম্মান। প্রাচীন গল, স্পেন, আফ্রিকা ও বলক্যান উপদ্বীপে এবং বিশেষ করিয়া ইতালীতে তাহারা দুর্ব্বার বন্যাপ্রবাহের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সত্য বটে, তাহারা যে সকল রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, সেগুলি বহুকালস্থায়ী হয় নাই; কারণ, পৃথিবীর সেই প্রাচীন যুগের অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিদের সংশ্রবে আসিয়া, তাহারা আপনাদের চারিত্রিক-বিশেষত্ব রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছিল। তথাপি তাহারা শ্রান্ত ও মরণোন্মুখ জাতিদের ধমনীতে এমন নূতন রক্ত-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিয়াছিল যে, তাহার ফলে নব-শক্তিতে উৎসাহিত এবং নব-বলে বলীয়ান একশ্রেণীর মানব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখনকার নূতন জাতিদের ভিতরে, তাহারাই অধিক বলী, সক্ষম ও সভ্যতায় উন্নতিকারক হইতে পারিয়াছিল,—যাহাদের ভিতরে 'জার্ম্মেনিক' রক্ত অধিক পরিমাণে ছিল। য়ুরোপের পশ্চিমভাগের জাতিরাই, এদিকে প্রধান। কারণ, তাহাদের ভিতরে সকলের চেয়ে-বেশী জার্ম্মান রক্ত আছে।

কিন্তু, য়ুরোপের পশ্চিমভাগে জার্ম্মানরা কখনও প্রবল হইতে পারে নাই। তাই

সেখানকার বাসিন্দারাও প্রথমতঃ ধ্বংসপ্রায় গ্রীক-সভ্যতার মহিমায় এবং তাহার পরে ইস্লামের বজ্রমুষ্টির ভিতরে পড়িয়া, অসভ্যতার গভীর পঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছিল।

সভ্যতা ও মানবের উন্নতি-বিধানে পশ্চিম-য়ুরোপই প্রধান হইল। সেখানে দুইটি পরস্পর-বিমুখ জাতি গাত্রোত্থান করিল। প্রথম হইতেছে লাতিন জাতি। ইতালিয়ান, গল ও আইবেরিয়ান জাতির সহিত জার্ম্মান জাতির মিলনে ইহার সৃষ্টি। দ্বিতীয় হইতেছে, জার্ম্মাণ জাতি। যে দেশে এই জাতি আপনাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা জার্ম্মেনী এবং স্কান্দিনেভিা নামে পরিচিত। কাল-পরিবর্ত্তনে এই জার্ম্মান ও লাতিন জাতিদের ভিতরে রাজনৈতিক এবং জাতীয় বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল। জার্ম্মানরা রোম্যানদের মত একটি পৃথ্বী-সাম্রাজ্য গঠন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্যদিকে রোমীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ইতালীর শক্তিতে নির্ভর ও রোম সহরকে কেন্দ্রস্থানীয় করিয়া এক ঈশ্বরশাসিত ও আধ্যাত্মিক পৃথ্বী-সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে, জার্ম্মানজাতির সহিত রোমীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষের বিরোধ উপস্থিত হইল। এইরূপে পৃথিবীর এক বিখ্যাত দ্বন্দ্বের আরম্ভ। কিন্তু, সে দ্বন্দ্ব বরাবর একটানা চলিল না। কারণ, আরম্ভেই জার্ম্মেনী পরাজিত হইল। কিন্তু সেই পরাজয়েই বিরোধ শেষ হইয়া গেল না।"

বার্ণহার্ডির কথা হইতে ইহাই বোঝা যায় যে, সসাগরা-পৃথিবী শাসন করাই জার্ম্মেনীর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। প্রথমবারের চেষ্টায় তাহার সে আশা ফলবতী হয় নাই বলিয়া, সংপ্রতি সে দ্বিতীয়বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয়বারের চেষ্টার ভিতরে যে বহুযুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে জার্ম্মেণীর দুর্ব্বলতার অনেক ইতিহাস আছে। সে সময়টায় জার্ম্মেনী পৃথিবী-শাসনের স্বপ্ন না দেখিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে মনোযোগী হইয়াছিল। মধ্যযুগে 'ফ্রেডারিক দি গ্রেটে'র সময়ে জার্ম্মেনী একবার কিছুদিনের জন্য মাথা তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। তাহার পর, প্রথম নেপোলিয়ানের হাতে গোলাম বনিয়া জার্ম্মেনীর চোখ আবার খুলিয়া গেল। তৎফলে, দ্বিতীয় নেপোলিয়ানকে পরাজিত করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেনী পুনরায় য়ুরোপে প্রধান হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয়ে আবার নূতন করিয়া পৃথিবী-শাসনের আশা জাগ্রৎ হইল।

বার্ণহার্ডি বলিতেছেন :—"১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের পর হইতে জার্ম্মেনীর জন-সংখ্যা আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া আসিতেছে। জার্ম্মেনীর জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক চল্লিশবৎসরের ভিতরে চারি কোটি হইতে সাড়ে ছয় কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ জার্ম্মেনীতে ফি বৎসরে লোক বাড়িয়াছে প্রায় দশলক্ষ করিয়া। অন্যদিকে, অর্থশাস্ত্রসম্বন্ধীয় এবং মানসিক উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে।

সংপ্রতি জার্ম্মেনী একটি প্রথম-শ্রেণীর শ্রমশিল্পপ্রধান রাজ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জার্ম্মেনীর বাণিজ্য-

নৌ-বহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না; কিন্তু আজ ঐ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে জার্ম্মেনী দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মেনীর বৈদেশিক বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। এক্ষেত্রেও সে দ্বিতীয় স্থানীয়।

জার্ম্মেনীর জনসংখ্যার অনুপাতে, অথবা তাহার প্রয়োজন-হিসাবে তাহার ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলিকে যথেষ্ট বলা চলে না। পরন্তু, উপনিবেশগুলির সহিত তাহার সম্বন্ধও তেমন দৃঢ় নহে,—যে-কোন-মুহূর্ত্তে সে সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। জার্ম্মেনীকে তখন একান্ত অসহায় হইয়া থাকিতে হইবে। আমরা যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং—এমন কি—ক্ষুদ্র বেলজিয়মের ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর ভাল ভাল দেশগুলি ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া জার্ম্মেনীকে রদ্দী মাল দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মেনী যখনই তাহার ক্রম-বর্দ্ধমান প্রজাগণের জন্য কোন দেশ দখল করিতে গিয়াছে, তখনই তাহাকে সশস্ত্র প্রবল শত্রুগণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। হয় তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, নয় তাহাকে Triple Ententeর ইচ্ছাধীন থাকিতে হইবে! Triple Entente এখন সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতেছে। এবং ইংলণ্ড এখন উহার সর্ব্বেসর্ব্বা।"

বার্ণহার্ডি যাহা বলিতেছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই:—জার্ম্মেনীর লোক এত বাড়িয়াছে যে তাহার স্বরাজ্যে আর কুলাইতেছে না। অতএব রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে। জার্ম্মেনীর বাণিজ্য ক্রমেই বাড়িতেছে, তাহার জিনিষ বিক্রী করিবার জন্য নূতন জায়গা চাই। অতএব রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে। সমগ্র পৃথিবীকে আপনার পায়ের তলায় চাপিয়া রাখাই তাহার সুখের স্বপ্ন। অতএব রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে। "বিশ্বশক্তি অথবা অধঃপতন"—ইহাই তাহার মূলমন্ত্র।

ভন ডার গল্‌টজ্‌

জার্ম্মেনীর সেনাপতি ব্যারণ ভন ডার গল্‌টজ "Nation in Arms" নামে এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহাতে যুদ্ধসম্বন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, আমরা তাহার কয়েক জায়গা তুলিয়া দিলাম:—

"যতকাল মানবজাতি ইহ-লৌকিক সম্পদলাভের জন্য চেষ্টা করিবে, যতকাল তাহারা আপনাদের উত্তরাধিকারিগণের জন্য অবস্থান-ক্ষেত্র-বিস্তৃতি, শান্তি এবং সম্মান লাভের চেষ্টা করিবে, যতকাল তাহারা আপনাদের প্রতিদিনকার তুচ্ছ খুটি-নাটির সংকীর্ণতা পার হইয়া রাজনীতি এবং সভ্যতার যথার্থ আদর্শ অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর হইবে, ততকাল পৃথিবীতে যুদ্ধের মৃদঙ্গ বাজিবেই বাজিবে। যুদ্ধে মানবজাতির উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, এ কথা নিয়া আলোচনা করিবার দরকার কি? ত্রিশ বৎসরব্যাপী সমরে জার্ম্মেনী একবার অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। তাহার ভিতরে যেরূপ নীতিভ্রষ্টতা আসিয়াছিল,

তাহার তুলনা মেলা ভার। আবার অন্য দিকে, অবনতির এত নিম্নস্তরে নামিয়া, প্রুসিয়া যখন স্বাধীনতালাভের জন্য অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিল, সেই যুগকে আমরা তাহার যথার্থ গৌরবের যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করি।

যুগধর্ম্ম এবং শেষ পরিণাম অনুসারে যুদ্ধের নৈতিক ফল বিভিন্ন রূপধারণ করে। ভগবান যাহা দেন, আমরা অবশ্য তাহাকে লইব। তবে এটা ঠিক যে,—যুদ্ধ হইতেছে মানবজাতির নিয়তি,—জাতিসকলের অনিবার্য্য অদৃষ্টফল। এবং পৃথিবীর নশ্বরগণের অধিকারে অবিনশ্বর শান্তি কখনও থাকিতে পারে না।

এ যুগে কেবল রাজারা যুদ্ধবিদ্যা শিখিলেই চলিবে না। প্রজাদেরও যুদ্ধের জ্ঞান থাকা চাই। কিরূপে অস্ত্র চালাইতে হয়, শক্তির অনুশীলন করিয়া কিরূপে তাহা ব্যবহার করিতে হয় সে কথা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। পরন্তু, দেশের জন্য বিরোধ উপস্থিত হইলে, জাতিকে যে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়, তাহা সহ্য করিবার নিমিত্ত, সকলকে হৃদয় পাষাণে পরিণত করিয়া, প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

প্রশ্ন হয় যে:—"সাধারণ লোক যখন রণরত হইয়া বিপদে পড়ে এবং আপনার মরণ আপনি ডাকিয়া আনে, তখন তাহার পক্ষে যুদ্ধ-শিক্ষা কি এতই আবশ্যকীয়" ?—নিশ্চয়ই!

যাহার ভিতরে সামরিক তেজ আছে, সে সুযোগের আহ্বান শুনিবামাত্র সকল সঙ্কোচ ভুলিয়া, সেনাপতির দণ্ডগ্রহণে ইতস্ততঃ করে না। কারণ, পরিণামে সে অমূল্য পুরস্কার পায়। তাহা অমরতা। এই যে অমরতা,—এ কথাটির ভিতরে একটা পরম লোভনীয় মোহিনী শক্তি আছে। ভাগ্যবান সৈনিক তাহার নামকে বিস্মৃতির অন্ধকার গুহা হইতে উদ্ধার করে। ফ্রেডারিক ও নেপোলিয়নের নাম ততদিন থাকিবে, যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে।

"কিন্তু একজনকে অমর করিবার জন্য সাধারণ জনগণের উপরে এমন কঠোর পরীক্ষার পাষাণ-ভার চাপানো কি উচিত? একজন বিখ্যাত সেনাপতির গৌরব-রক্ষার জন্য শত সহস্র মানব আপনাদের প্রাণ বলি দেয়,—কে তাহাদের নাম করে? তাহারা ত' কোন পুরস্কার পায় নাই!"—ইহা স্থূল-দৃষ্টি প্রজ্ঞার মত হইতে পারে, কিন্তু এ ব্যাপারটাকে আমরা ভিন্ন চোখে দেখি। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি,—তাঁহারও সক্ষম, বিশ্বাসী ও সাহসী সহচরের দরকার! তাহারাও তাঁহার যশের অংশী হয়।

আলেকজান্দারের সঙ্গে গ্রেণিকাসে যাত্রা করিয়াছিল, এমন কোন সৈনিক বর্ত্তমান যুগে যদি কবর হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়,—তাহা হইলে আমরা তাহাকে সাধারণ সৈনিকের মত দেখিব না,—কিন্তু এমন কল্পনা করিব, যেন স্বয়ং আলেকজান্দারই আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।"

গোয়েন্দা ডাঃ গ্রেভস্

"জার্ম্মান গুপ্ত-কার্য্য-বিভাগ" পৃথিবীর সর্ব্বত্র গোয়েন্দা ছড়াইয়া দিয়াছে। পৃথিবীর

কোথায় রাজনৈতিক কি ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে জার্ম্মানজাতির উপকার না অপকার হইতেছে ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য জার্ম্মান গবর্মেণ্ট এই সকল ছদ্মবেশী গোয়েন্দাকে দেশবিদেশে প্রেরণ করেন। গোয়েন্দাদের ভিতরে স্ত্রী-পুরুষ দুই আছে। এমন কি, অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক, অনেক কাউণ্ট ও কাউণ্টেসও এই গোয়েন্দাদলভুক্ত। ডাক্তার আর্মগার্ড কার্ল গ্রেভস্ উক্ত গোয়েন্দাদলে কাজ করিয়া আজ বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যাবলীর কথা The Secrets of the German War Office নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ উপন্যাস অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক। আমরা তাঁহার কাহিনীর অল্পস্বল্প পরিচয় দিলাম:—

"১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন তারিখের সকালে সার্ভিয়ার রাজা, রাণী, মন্ত্রী ও রাজপরিষদবর্গ গুপ্তহন্তাদের চক্রান্তে নিহত হন। চক্রান্তকারীদের সর্দ্দার কে বা কাহারা, আমি তাহা জানিবার জন্য প্রেরিত হইলাম। আমাদের সন্দেহ কর্ণেল মাসিন ও ষষ্ঠসংখ্যক সৈন্যদলের জনকত উচ্চতন কর্ম্মচারীর উপরে পড়িয়াছিল। এই সকল রাজহন্তা, রুশদের অর্থে পুষ্ট হইয়া, চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিল। সার্ভিয়ার রাজা, অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন করিয়া রুষিয়ার বিষনজরে পড়িয়াছিলেন।

আমি ছদ্মবেশে এক আসল বোল্তার চাকের ভিতরে গিয়া পড়িলাম। এবং অবিলম্বেই আমার বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলাম। জাল দস্তক লইয়া ভ্রমণ করিবার অপরাধে, লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল লিগলিট্সজ্ আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন। সার্ভিয়ার ভিতরকার অবস্থা তখন ভয়ানক। গ্রেপ্তার ও প্রাণদণ্ড তখনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার কাছে কোন সন্দেহজনক কাগজপত্র পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু অস্থায়ী গবর্মেণ্টের বিরোধী-পক্ষের সহিত সংস্রব রাখাতে, আমাকে কোর্ট-মার্শেলে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইল।

একদল সৈন্য আসিয়া আমাকে কফিখানা হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। পরদিন সকালে আমাকে কর্ণেলের পোষাক-পরা তিনজন লোকের সুমুখে হাজির করা হইল। আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল না। আমি একেবারেই শুনিলাম,

"তোমাকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিশিতে দেখা গিয়াছে। তুমি জাল দস্তক ব্যবহার করিয়াছ। সূর্য্যাস্তের সময়ে তোমাকে গুলি করিয়া মারা হইবে।"

প্রথমটা আমি ভাবিলাম, বোধ হয় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করা হইতেছে। কিন্তু লোকগুলার মুখের দিকে তাকাইয়া ঠাট্টার কোন আঁচ দেখিতে পাইলাম না। তখন আপনার বিপদ বুঝিয়া এবং মনের উদ্বেগ মনেই চাপিয়া, আমি শান্তভাবে বলিলাম, "কাউণ্ট যোলেরাভিচ্‌কে (সমর-সচিব) আপনারা জানিয়ে আসুন যে, কাউণ্ট ওয়েরিংগ্রোড তাঁকে সেলাম দিয়েচেন।"

তাহারা অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। তারপর, এক ব্যক্তি আমার উপরে অশ্রান্ত প্রশ্ন বৃষ্টি করিতে লাগিল। আমি সে-সকল প্রশ্নের কোন

জবাব না দিয়া শুধু কহিলাম, "মশাই, আমার যা বলবার আছে, তা বলেচি।"

আমাকে আবার কারাগারে পাঠানো হইল। বেলা চারিটার সময়ে আমার বিচার-কর্ত্তাদের একজন আসিয়া আমাকে বলিল, "তোমার সংবাদ পাঠানো হয় নি। আমার সঙ্গীদের তা মত নয়। যোলেরাভিচের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আছে। যদি তুমি কারণ দেখাতে পার, তাহলে তোমার সংবাদ দেবার ভার আমি নেব।"

আমি তাহাকে কারণ দেখাইলাম। সে বিবর্ণমুখে, ব্যাকুলভাবে ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারটা নিয়া আমি বড় বেশী মাথা ঘামাইলাম না। কিন্তু আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময়ে যখন আমার কারাগারের দরজা খুলিয়া গেল এবং দুইজন রক্ষী সঙ্গীণ খাড়া করিয়া ঘরে ঢুকিয়া, আমাকে অঙ্গনে—যেখানে আরও কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল—লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল, তখন আমি চিন্তিত হইলাম। বুঝিলাম, এই হট্টগোলের দিনে আমার সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছায় নাই। দুর্গের পশ্চিমে একটি পাহাড়ের দিকে তাহারা আমাকে লইয়া গেল।

একটি পুরানো পাথরের বাড়ীর কাছে আমার বধ্যভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল। একটা দেয়ালের পাশে গিয়া আমরা দাঁড়াইলাম। প্রধান কর্ম্মচারী একখানা দলিল বাহির করিয়া সার্ভিয়ান ভাষায় পড়িতে আরম্ভ করিল। দলিলের ভূমিকাটা আমার কাছে অনাবশ্যক দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল।

দলিল-পড়া শেষ হইয়া গেলে আমি বলিলাম যে, আমি সার্ব্বজাতীয় নই, সুতরাং দলিলের একবর্ণও বুঝিতে পারি নাই।

কর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল যে, সে আমাকে সার্ব্ব বলিয়াই জানে।

আমি জোরালো জার্ম্মাণ ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাহাকে জানাইলাম, এ ব্যাপারটায় নিশ্চয়ই কোথাও গলদ হইয়াছে, এর জন্যে পরে তাহাদের যথেষ্ট বিপদভয় আছে।

সে কিছু বিচলিত হইল বটে, কিন্তু বলিল, "আমি যে আদেশ পেয়েছি তা পালন কর্ব্বই।"

আমি বলিলাম, "আমি মন্ত্রীর কাছে খবর পাঠিয়েচি।"

তাহারা আমাকে মারিবার জন্য তেমন তাড়াহুড়া করিল না। পাঁচ মিনিট কাটিল। দশ মিনিট কাটিল। কর্ম্মচারী ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিল, আটটা বাজিতে আর পাঁচমিনিট আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছে।

কর্ম্মচারী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আর দেরি কর্ত্তে পারি না।"

একটা লোক আসিয়া আমাকে দেয়াল ঠেসাইয়া দাঁড় করাইয়া দিল। তারপর রুমাল দিয়া আমার চোখ বাঁধিতে আসিল। আমি বলিলাম আমার রুমালের দরকার নাই।

তখনই হুকুম দেওয়া হইল। বারোটা বন্দুকের কুৎসিত কালো নাক আমার দিকে ফিরিল।

সে-সময়টা আমার মনের ভিতরে যেরূপ উত্তেজনার উদয় হইয়াছিল, সে কথা বলিতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। তখন কিছুই

আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছিলাম না। তবে একটা কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। দ্বিতীয় সারির তৃতীয় লোকটা কিছু অসাবধানতার সহিত বন্দুক ধরিয়াছিল। প্রথমটা সে আমার পেট ও বুকের মাঝা-মাঝি জায়গায় লক্ষ্য করিল; তারপর আমার নাকের পানে টিপ্ করিল,—সেটা আমি একেবারেই পছন্দ করিলাম না, বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আমরা কতক্ষণ যে এমনি দাঁড়াইয়াছিলাম, তা আমি জানিনা। তারপরে যা হইল, তা আমি ভুলি নাই। কিছুদূরে দুইজন কর্ম্মচারীকে আসিতে দেখা গেল। তাহারা হাত নাড়িয়া ঘাতকদের কি বলিতেছিল। হঠাৎ অস্ত্রের ঝঞ্চনা উঠিল।

তাহারা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন আমাকে ভদ্রভাবে অভিবাদন করিয়া এক পাত্র মদ্য পান করিতে দিল। ইচ্ছা থাকিলেও, আমি তাহা পান করিলাম না। আমি বরাবর বুকের উপরে দুহাত রাখিয়া, সিধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। একজনকে আমি বলিতে শুনিলাম, "লোকটা কাপুরুষ নয়।"

* * *

গোয়েন্দার কাজে দায়িত্ব যথেষ্ট। কিন্তু কৃতকার্য্য হইলে পুরস্কারের পরিমাণটাও খুব বেশী। কৃতকার্য্য না হইলে সাধারণ মাহিনা পাওয়া যায়। আমরা গভর্মেণ্টের কাজ করিলেও, বিপদে পড়িলে আমাদিগকে গবর্মেণ্ট কোনরকম সাহায্য করিতে অপারগ। যাহারা ঘটনাবহুল জীবন যাপন করিতে ভালবাসে, এ কাজটা তাহাদের ভাল লাগে। দুর্ব্বল-প্রকৃতি লোকের পক্ষে জীবিকাস্বরূপ গোয়েন্দার কার্য্য গ্রহণ করা উচিত নয়। যে-সকল স্ত্রী বা পুরুষ-গোয়েন্দা দুঃসাহসিক কার্য্য গ্রহণ করে,—সময়ে সময়ে তাহারা কি মানুষ কি সয়তান কাহাকেও ভয় করে না। একটু-কোন খুঁৎ হইলে স্বাধীনতা বা জীবনে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, এ ভাবনা বড় যে-সে ভাবনা নয়। আমি এমন অনেক সাহসী লোককে জানি, যাহারা এই প্রবল উদ্যমের চাপে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমি এমন জন-বারো নর-নারীকে জানি, যাহারা ভেল্কী বাজীর মত অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়াছে, ধরা পড়িয়াছে বা মরিয়াছে। তাহাদের এমন বিপদ অনেক সময়ে শত্রুর কবলে পড়িয়া হয় না। আমি দুইটি দৃষ্টান্ত দিব;—একটি রমণীর ও আর একটি পুরুষের।

ওল্গা ক্রুডার একজন মেয়ে-গোয়েন্দা। সে জার্ম্মেনীর তরফ হইতে ব্রুসেল্‌সে গোয়েন্দাগিরির কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কয়েক বৎসর আগে য়ুরোপীয় খবরের কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, রুষিয়া-সীমান্তে 'মেমেলের'র এক হোটেলে ওল্গা ক্রুডার নামে এক রমণী আত্মহত্যা করিয়াছে। একটি রুষীয় কেল্লার নক্সার জন্য ক্রুডারকে পাঠানো হইয়াছিল। বার্লিনে বসিয়া কর্ত্তৃপক্ষ টের্ পাইলেন যে, সে নক্সা পাইয়াছে। কিন্তু একজন রুশ কর্ম্মচারীর প্রেমে পড়িয়া, নক্সাগুলি তাহাকে আবার সে ফিরাইয়া দিবার মৎলোব আঁটিতেছে। অতএব, ওল্গা ক্রুডার আত্মহত্যা করিল। অর্থাৎ—তাহাকে বিষ দিয়া হত্যা করা হইল।

লেফ্‌টেনাণ্ট ভন য্যাস্‌ট্রভ, সৈন্যদল ছাড়িয়া গোয়েন্দাগিরির কার্য্যে নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধে। তিনি রুসিয়ান চরের সঙ্গে ভাব করিয়াছিলেন, এইরূপ সন্দেহ করা হইয়াছিল; —সন্দেহমাত্র! তাঁহাকে কয়েদ করা চলিল না,—কারণ, তিনি অনেক লুকানো খবর জানিতেন। তিনি অসামরিক কর্ম্মচারী, অতএব, জার্ম্মান আইন অনুসারে তাঁহাকে দণ্ড দিতে হইলে, সাধারণ বিচারালয়ে সে কাজ করিতে হইত। সুতরাং য্যাসট্রভকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা হইল। গোয়েন্দা-সর্দ্দার প্রথম যে লোকটিকে পাঠাইয়াছিলেন, য্যাসট্রভ দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে নিহত করিলেন। প্রথম লোকটি মারা যাইবামাত্র, আর একজন লোক আসিল। সেবারে য্যাসট্রভ নিজেই মরিলেন।"

আমরা ডাক্তার গ্রেভসের হৃদয়গ্রাহী ও চমকপ্রদ পুস্তক হইতে ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি স্থান উদ্ধার করিব।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

গুলবদন

[গুলবদন, ভারতের প্রথম মোগল বাদশাহ বাবরের কন্যা। আকবর আবুলফজলের "আকবরনামার" উপাদান-সংগ্রহের জন্য গুলবদনের সহায়তা গ্রহণ করেন। বাবর ও হুমায়ুনের জীবনবৃত্তের আখ্যায়িকাগুলি গুলবদনের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল;—"হুমায়ুননামা" তাহারই ফলস্বরূপ। আবুলফজল, সম্রাট কর্ত্তৃক বাবর ও হুমায়ুনের জীবন-চরিত সংগ্রহের আদেশ প্রচারের কথা (১) লিখিয়াছেন সত্য, তবে তাহা গুলবদনের উপর ছিল কি না, তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, "হুমায়ুননামা" ১৫৮৭ (৯৯৫ হিঃ) খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। গুলবদনের "হুমায়ুননামা" সম্বন্ধে আবুলফজল নীরব; তবে তিনি যে বেগমের পুস্তকের সাহায্য লইয়াছিলেন, এ বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

যে সমস্ত ইংরাজ-ঐতিহাসিক মোগল-রাজত্বের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা গুলবদন যে এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এ কথা কেহ কোথাও উল্লেখ করেন নাই। ব্লকম্যান-সাহেবের "আইন-ই-আকবরীতে" গুলবদনসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গুলবদনকে তিনি একস্থলে (২) আকবরের বেগম বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাবরের "আত্মজীবন-চরিত"-সম্পাদক Erskine-সাহেবও "হুমায়ুননামা" দেখেন নাই। গুলবদনসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, "হুমায়ুন-নামাই" প্রধান অবলম্বন।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে-রক্ষিত হস্তলিখিত "হুমায়ুন-নামা"খানি লক্ষ্ণৌ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল জর্জ্জ উইলিয়াম হ্যামিলটনের বিধবার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল। এই মহামূল্য গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া বেভারিজ-পত্নী আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

"হুমায়ুন-নামার" প্রথমাংশে বাবরের কথা। ইহার অধিকাংশই গুলবদন, বাবরের আত্মজীবন-চরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; কারণ পিতার মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৮ বৎসর ছিল; কাজেই তাঁহার নিকট হইতে বাবরের সময়ের কথাগুলি আমরা জানিবার আশা করিতে পারি না। "হুমায়ুন-নামায়" বাবরের পুত্র কন্যা, বেগম ও আত্মীয় স্বজনের বেশ একটী সঠিক বৃত্তান্ত আছে। দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ মিউজিয়মের এই পাণ্ডুলিপিখানি অসম্পূর্ণ—শেষের কয়েক পৃষ্ঠা ইহাতে নাই। হুমায়ুনের দ্বিতীয়বার ভারতবিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস ইহাতে আছে। এক্ষণে আমরা গুলবদনের জীবন-কাহিনী কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব।]

---

(১) Akbar-nama—Bib. Indica. Vol. I, p. 29-30.

(২) Ain-i-Akbari—Blockmann. Vol. I, p. 48.

গুলবদন আনুমানিক ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মসময়ে বাবর সিন্ধুনদী অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থান জয় করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। গুলবদনের মাতা—দিলদার বেগম। গুলবদন তাঁহাকে আজাম বলিয়া ডাকিতেন। দিলদারের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন—

১। গুলরাং

২। গুলচিরা

৩। আবুনসির—ইতিহাসে ইনি হিন্দাল নামে অভিহিত।

৪। গুলবদন

৫। আলওয়ার

গুলবদন শৈশবে 'আতুনের' নিকট শিক্ষা-প্রাপ্ত হন। মোগল-অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রীর নাম আতুন।

১৫২৫ খৃষ্টাব্দে বাবর পরিবারবর্গকে পুত্র কামরণের হস্তে সমর্পণ করিয়া সিন্ধু অতিক্রম করিবার জন্য কাবুল ত্যাগ করেন। পিতার কাবুল ত্যাগ করিবার অনতিকাল পূর্ব্ব হইতেই গুলবদন তাঁহার বিমাতা হুমায়ুন-জননী মহমের হস্তে ন্যস্ত হন। অতি শৈশবেই মহমের তিনটী পুত্র ও একটী কন্যার মৃত্যু হওয়ায় তিনি গুলবদনের লালনপালন ও শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল বাবর পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন। পরবৎসর (১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ্চ) তিনি খানওয়ার (শিক্রী) যুদ্ধে রাণা সঙ্গকে পরাজিত করিয়া নিরাপদে রাজ্যলাভ করেন।

কাবুল ত্যাগ করিবার পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি পরিবারবর্গের সহিত একত্র থাকিবার সুবিধা পান নাই। এক্ষণে (১৫২৮ খৃষ্টাব্দে) তাহাদিগকে হিন্দুস্থানে আসিবার আদেশ পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাবুল হইতে যাত্রা করিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। আলিগড়ের নিকট বাবরের লোকজনের সহিত মহমের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারা সম্রাটের নিয়োগানুসারে বেগমকে মহা সমাদরে আগ্রায় আনয়ন করেন (১৫২৯ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন)। শিশু গুলবদন সে রাত্রে মহমের সহিত আগ্রায় গমন করেন নাই। তিনি পরদিন দিবাভাগে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সম্রাটের খলিফা মীর নিজামুদ্দিন আলি ও তাঁহার পত্নী সুলতানাম, কুলজলালীতে (আলিগড়ে) গুলবদনকে বিশেষ আদর যত্ন করেন। গুলবদন আগ্রায় আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করেন।

বহুদিন পরে বাবর, পত্নী ও পুত্রকন্যার মুখ দেখিলেন। কিছুদিন পরে তিনি পরিবারবর্গসহ ঢোলপুর ও শিক্রী যাত্রা করেন। শিক্রীতে গুলবদনের এক আকস্মিক বিপদ সংঘটিত হয়। মহম যখন প্রার্থনায় ব্যাপৃতা ও সম্রাট যখন অন্যতমা পত্নী বিবি মুবারিকার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় শিশুসুলভ চাপল্যবশতঃ গুলবদন মুবারিকাকে বহুবার তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে অনুযোগ করেন। বালিকার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে ঐ কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, কিন্তু পার্ব্বত্য মুবারিকার বলপ্রয়োগে গুলবদনের হাতের হাড় স্থানান্তরিত হইয়া যায়। সুচিকিৎসার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই হাড় পুনরায় যথাস্থানে ন্যস্ত হয়। এই ঘটনার

পর তাঁহারা সকলে আগ্রা প্রত্যাগমন করেন।

বাবরের অদৃষ্টে বহুদিন সুখভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সম্ভালে অবস্থানকালে হুমায়ুন পীড়িত হন। বাবর তাঁহাকে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে বলেন; কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায়। কোনরূপ ঔষধে ফললাভ না হওয়ায় মৌলবীদের পরামর্শে কিরূপে বাবর পুত্রের পীড়া স্বীয় শরীরে সঞ্চালিত করিয়া তাহাকে নিরাময় করেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। ইহার অল্পদিন পরেই ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর বাবর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাবরের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীশোক-বিহ্বলা মহমেরও মৃত্যু হয়। গুলবদন তাঁহার মৃত্যুতে শোকাভিভূতা হইয়া লিখিয়াছেন,—"দিনের পর দিন আমি আকামের (মহম) জন্য ক্রন্দন করিতাম—শোকপ্রকাশ করিতাম ও শুকাইয়া যাইতাম। সম্রাট্ (হুমায়ুন) বহুবার সান্ত্বনা করিবার জন্য আমার নিকট আসিতেন। যখন আমার বয়স দুই বৎসর, তখন আকাম আমাকে স্বীয় সংসারে লইয়া গিয়া লালনপালন করেন—আমার ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি আমাদের ফেলিয়া ইহজগৎ হইতে বিদায় লন।"

মহমের মৃত্যুর পর গুলবদন আরও এক-বৎসর হুমায়ুনের সংসারে ছিলেন। পরে দিলদার স্বীয় কন্যা ও পুত্র হিন্দালের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট চোসা নামক স্থানে পরাজিত হন। হুমায়ুন পরাজিত হইয়া কোনক্রমে আগ্রায় ফিরিয়া আসেন; তথায় গুলবদনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন গুলবদনের বয়ঃক্রম সপ্তদশ। হুমায়ুন তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই; কারণ যখন তিনি ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে অভিযান করেন, সে সময়েও তিনি গুলবদনকে 'তাক্' (টুপি) পরিতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি তাঁহাকে বিবাহিতা রমণীর চিহ্ন 'লাচাক্' পরিতে দেখেন। ইহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে গুলবদন তখন বিবাহিতা। তবে কখন তিনি প্রথম বিবাহিতা হন, তাঁহার পুস্তকের কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। হুমায়ুন গুলবদনকে বলিলেন,—"হায় গুলবদন! অধিকাংশ সময়ই আমি তোমার কথা ভাবিতাম। তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার আমার বড় ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ভাগ্যে যখন পরাজয় ঘটিল তখন তোমাকে যে সঙ্গে লইয়া আসি নাই, এইজন্য ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছি। হায়! আকুইকাকে (হুমায়ুন-পত্নী হাজিবেগমের গর্ভজাত কন্যা) সঙ্গে লইয়া গিয়া কি ভুলই করিয়াছি! যদিও সে শিশু, তবুও তাহার অভাবে আমার প্রাণ কাতর হইতেছে।"

হুমায়ুন এই পরাজয়ের প্রতিশোধ দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কামরাণ আগ্রায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। আগ্রা তাঁহার ভাল লাগিল না। তাই তিনি লাহোরে ফিরিয়া গেলেন। লাহোরে পৌঁছিয়া তিনি হুমায়ুনকে বারংবার লিখিয়া পাঠাইতে

লাগিলেন—"আমি বড় অসুস্থ, আমাকে দেখিবার কেহ নাই; অতএব সত্বর গুলবদনকে পাঠাইয়া দিলে আমার প্রতি যথেষ্ট উপকার করা হইবে।" হুমায়ুন গুলবদনকে যাইতে বলিলেন। গুলবদনের কিন্তু কামরাণের নিকট যাইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। হুমায়ুন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইলে কি হয়, গুলবদন তাঁহাকে আপনার সহোদর অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন। গুলবদন অভিমানপূর্ণ স্বরে হুমায়ুনকে বলিলেন,—"ভাই! ইহা আমার কখনও ধারণা ছিল না যে, তুমি কোন কালে আমাকে তোমার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া কামরাণের নিকট যাইতে বলিবে। আমি কখনও মাতা, ভগিনী বা আত্মীয়বর্গ—যাঁহাদের অঙ্কে প্রতিপালিতা হইয়াছি—তাঁহাদের ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিব না।" হুমায়ুন তাঁহাকে বুঝাইলেন,—"ভগিনী! তোমার সাহচর্য্য ত্যাগ করা আমারও আদৌ অভিপ্রেত নহে; তবে কামরাণ বিপন্ন—বার বার তোমাকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ-পত্র পাঠাইতেছে, আর আমিও বিপদগ্রস্ত—সিংহাসন লইয়া বিশেষ চিন্তান্বিত; এই বিপদ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলেই পুনরায় আমি তোমাকে কামরাণের নিকট হইতে লইয়া আসিব।" অবশেষে হুমায়ুনের অনুরোধে গুলবদন কামরাণের নিকট গমন করেন।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কণৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনের আশা-ভরসা সমস্ত নির্ম্মূল হইয়া যায়। তিনি পরিবারবর্গকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবিলম্বে হিন্দালের উপর তাহাদিগকে লাহোরে লইয়া যাইবার ভার প্রদান করেন। এই সময়ে, বিতাড়িত হুমায়ুন কয়েক বৎসর ধরিয়া মরুভূমির মধ্যে কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরসহ স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া যে কতদূর নির্যাতিত হইয়াছিলেন, ও কিরূপে মুলতানে শিবিরে দিলদার ও হিন্দালের নিকট হামিদাবাণুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও বিবাহ হয় (১৫৪১ খৃষ্টাব্দ), ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই।

ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হুমায়ুন ভ্রাতাদের নিকট কোনরূপ সাহায্য বা সহানুভূতি পান নাই। তিনি কাবুলের দিকে গমন করিবার চেষ্টা করিলে, কামরাণ স্বয়ং অগ্রে কাবুলে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন; যাহা হউক, অনেক কষ্টের পর হুমায়ুনই প্রথমে কাবুলে প্রবেশ করেন।

এই সময়ে গুলবদন কামরাণের সহিত কাবুলে গিয়াছিলেন কি না, গুলবদন কোথাও তাহার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু তিনি যে কাবুলে গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

গুলবদন কাবুলে তাঁহার পুত্রকন্যা লইয়া গৃহকর্ম্মে দিনগুলি বেশ মনের আনন্দে যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার কয়টি পুত্রকন্যা ছিল, তাহা নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই। তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থে সদাৎইয়ার নামে এক পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কামরাণ যদিও অপরাপর আত্মীয়াদের উপর অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু গুলবদনের উপর কখন দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই। তিনি গুলবদনকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

কামরাণ হিন্দালের হস্ত হইতে কান্দাহার কাড়িয়া লইলে, হিন্দাল নজরবন্দী হইয়া কাবুলে মাতার নিকট ফিরিয়া আসেন। সেই সময়ে (১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ) গুলবদনের সহিত হিন্দালের একবার সাক্ষাৎ হয়।

কিছুদিন পরে হুমায়ুন পারস্য হইতে শাহের সৈন্যদল লইয়া ভারতাভিমুখে লুপ্ত-রাজ্যের উদ্ধারের জন্য অভিযান করেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি কামরাণের নিকট হইতে কাবুল অধিকার করিয়া লন। গুলবদন লিখিয়াছেন,—"পাঁচ বৎসর দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার আমরা প্রিয়ভ্রাতা হুমায়ুনকে পাইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিলাম।" ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কামরাণের নিকটেই ছিলেন।

পরাজিত কামরাণ অগত্যা হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিলেন বটে; কিন্তু ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে যখন হুমায়ুন আস্কারীর সহিত কাবুল ত্যাগ করিয়া বাদাক্সানাভিমুখে অভিযান করেন, সেই অবসরে তিনি কাবুলে উপস্থিত হইয়া বিমাতা দিলদারের গৃহ দখল করেন ও তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে বলেন। এই সময়েও কামরাণ গুলবদনের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করেন নাই। তিনি গুলবদনকে বলেন—"তুমি এখানে অবস্থান কর,—মনে করিও ইহা তোমার আপনার গৃহ।" উত্তরে গুলবদন বলিয়াছিলেন—"কেন আমি এখানে থাকিব? যেখানে আমার মা থাকিবেন আমিও সেখানে থাকিব।" তৎপরে কামরাণ স্বীয় সাহায্যের জন্য গুলবদনকে স্বামী খিজির খাঁকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করেন। গুলবদন তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এ যাবৎ তিনি স্বামীকে কোন পত্র লেখেন নাই; এক্ষণে যদি তিনি তাঁহাকে পত্র লেখেন, তাহা হইলে তাঁহার হস্তাক্ষর না জানার দরুন তিনি এই পত্রকে জালপত্র ভাবিতে পারেন। আরও বলিলেন, "খাঁ যখন অন্যত্র অবস্থান করেন, তখন পুত্রের জবানীতে আমাকে পত্র লেখেন—স্বয়ং পত্র লেখেন না!" গুলবদন কামরাণকেই পত্র লিখিতে বলিলেন। এই সময় গুলবদনের বয়স ২৫ বৎসর ছিল। কামরাণ অবিলম্বে খিজিরের নিকট তাঁহার ভ্রাতা মেহেদীসুলতানকে পাঠাইলেন ও তাঁহাকে সসম্মানে কাবুলে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

গুলবদন চিরদিনই হুমায়ুনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তিনিও ইহার বহু পূর্ব্বে বহুবার স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"তোমার অপরাপর ভ্রাতারা কামরাণের স্বপক্ষে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু, ভগবান করুন, কামরাণের দলভুক্ত হইবার চিন্তা ঘূণাক্ষরেও যেন তোমার মনে উদয় না হয়। সাবধান! সহস্রবার সাবধান! কখনও যেন সম্রাট্ হুমায়ুনের সঙ্গ ত্যাগ করিও না।" খাঁর মনোমধ্যে পত্নীর অনুযোগ-বাণী জাগরুক থাকায় তিনি কামরাণের নিকট গমন করেন নাই।

হুমায়ুন বলসংগ্রহ করিয়া পুনরায় কামরাণের হস্ত হইতে কাবুল উদ্ধার করেন। ভীত কামরাণ হুমায়ুনের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার সহায়তা

করিতে প্রতিশ্রুত হন। সরলহৃদয় হুমায়ুনও তাঁহাকে আন্তরিক ক্ষমা করিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৫৪৮ খৃঃ) তলিকান্ নামক স্থানে হুমায়ুন,—হিন্দাল, আস্কারী ও কামরাণের সহিত সৌভ্রাতৃত্ব স্থায়ী করিবার জন্য এক মিলন-উৎসবের আয়োজন করেন। সম্রাট্ ভ্রাতাদের বলেন—"লাহোরে গুলবদন প্রায়ই বলিত 'আমার বড় ইচ্ছা, আমি চারি ভ্রাতাকে একবার একত্রে দেখি,' আজ আমরা প্রাতঃকাল হইতে সকলে একত্রে রহিয়াছি এবং ভগবান করুন আমরা চির দিনই যেন এইরূপ আত্মীয়তা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারি।"

এই সময়ে বেগমদের আগ্রহাতিশয্যে হুমায়ুন,—গুলবদন, হামিদা, মাচূচাক্ বেগম প্রভৃতিকে লইয়া সুগন্ধী পার্ব্বত্যলতা 'রিয়াজ' দেখিবার জন্য কোইডামান্ উপত্যকায় গমন করিয়াছিলেন। বসন্তকালে পার্ব্বত্য প্রদেশে রিয়াজের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠে। (৩)

দুর্ব্বৃত্ত কামরাণ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবার জন্য গোপনে পুনরায় সৈন্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। হুমায়ুন এই সংবাদে হিন্দালকে লইয়া তাঁহাকে দমন করিবার মানসে পুনরায় অভিযান করেন। কামরাণ ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর রাত্রিযোগে জিরবর নামক স্থানে হুমায়ুনের শিবির আক্রমণ করেন। হিন্দাল স্বীয় প্রাণদান করিয়া হুমায়ুনের প্রাণরক্ষা করেন।

হিন্দালের এই আকস্মিক মৃত্যু গুলবদনের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিয়াছিল। তিনি শোকোচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন,—"জানি না কোন্ নির্ম্মম নিষ্ঠুর এই নিরপরাধ যুবককে তাহার তরবারি দিয়া হত্যা করিল। হায়! ভগবান যদি ইহার পরিবর্ত্তে আমাকে বা আমার পুত্র সদাৎ ইয়ার বা স্বামী খিজিরকে লইতেন!"

ইহার পর কামরাণ নানাস্থানে পলায়ন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বন্দী হইয়া সম্রাটের নিকট আনীত হন। হিন্দালের মৃত্যু-যন্ত্রণা ও আপনার প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ-স্পৃহা হুমায়ুনের মনোমধ্যে জাগরূক থাকিলেও তিনি কামরাণকে বন্দী রাখিবার পরামর্শ দেন; কিন্তু পারিষদ্‌বর্গের প্ররোচনায় স্বীয় অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তিনি তাহাকে অন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ মিউজিয়ম-রক্ষিত এই "হুমায়ুন-নামা"-খানি হইতে গুলবদন সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর হুমায়ুন দ্বিতীয়বার হিন্দুস্থান অধিকার করিবার জন্য কাবুল ত্যাগ করেন ও ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তিনি আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। শেরমণ্ডলের পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী হুমায়ুন প্রাণত্যাগ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর আকবর সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। এক বৎসর ধরিয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি কাবুল হইতে পরিবারবর্গকে আনয়ন করেন।

(৩) Humayun-nama—P. 189-90.

১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে সম্রাট্-জননী হামিদাবানু, গুলবদন সলিমা, হাজি ও গুলচিরা বেগম মানকোটে রাজশিবিরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। আকবর আত্মীয়-স্বজনের মুখদর্শনে আনন্দোৎফুল্ল হন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা সকলে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ভারতে আগমন হইতে (১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে) তীর্থভ্রমণে বহির্গত হওয়া পর্য্যন্ত গুলবদনের কোন ঘটনা আমরা ইতিহাস সাহায্যে জানিতে পারি না।

গুলবদন এক্ষণে ৫০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি মুসলমান রমণীর পবিত্র হজব্রত পালনের জন্য মক্কা যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। আকবর প্রথমে এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। যে সমস্ত রমণী গুলবদনের সহিত তীর্থযাত্রা করেন, আবুলফজল তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন। গুলবদনের সহিত যাঁহারা মক্কা গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার আত্মীয়ার সংখ্যাই অধিক। আমরা নিম্নে কয়েকজনের নাম উদ্ধার করিয়া দিলাম :—

১। আকবর-পত্নী সলিমা সুলতান বেগম
২। আস্করীর, বিধবা-পত্নী সুলতানাম্
৩। কামরাণের দুইকন্যা—হাজি ও গুলিজার বেগম
৪। উম্ কুলসম—গুলবদনের পৌত্রী

আকবর এই তীর্থযাত্রার সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদান করেন। কয়েকজন বিশ্বস্ত আমীর এই তীর্থযাত্রীদলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ফতেপুর শিক্রী হইতে যাত্রা করেন। আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের উপর বেগমগণকে সুরাট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিবার ভার ন্যস্ত হয়; কিন্তু গুলবদন শিশু মুরাদকে নানারূপে বুঝাইয়া এই শ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। যাত্রীদলের মধ্যে নানারূপ বাধা বিপত্তি ঘটায় সমুদ্র-যাত্রা করিতে তাঁহাদের কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে তাঁহারা যাত্রা করেন। আরবে পৌঁছিয়া (৪) গুলবদন তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং চারিবার 'হজ' করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। (৫)

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বদাউনীর বন্ধু খাজা ইহাহার উপর বেগমদিগকে ভারতে ফিরাইয়া আনিবার ভার অর্পিত হয়। ফিরিবার কালে তাঁহাদিগকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এডেনের নিকট তাঁহারা পোতমগ্ন হওয়ায় ৭ মাস অতীব কষ্টে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু তথাকার শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগের সহিত

(৪) বদাউনী বলেন, তাঁহারা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (৯৮২ হিঃ) আগ্রা ত্যাগ করেন। গুজরাটে তাঁহাদের এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে (৯৮৩ হিঃ ৫ সাবান, অর্থাৎ অষ্টমা মাস) তাঁহারা মক্কা পৌঁছান।

Muntakhab-ut-Tawarikh—Al-Badaoni—W. H. Lowe, Vol. II. p. 216

(৫) লো সাহেব (Badaoni—Vol. II—217) বলেন, গুলবদন,—কারবেলা, কাম্, মাসাদ্ ও মক্কা এই চারি তীর্থস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

ভাল ব্যবহার করেন নাই। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ হইতে একখানি জাহাজ আসিতে দেখিয়া গুলবদন, গুলিজার ও খাজা সকলে পরামর্শ করিয়া একখানি নৌকা উহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত জাহাজখানি বায়াজিদ্ বায়াতের (৬) ছিল ;— তিনি মক্কা যাইতেছিলেন। বায়াজিদ্ বেগমদের নিকটে আসিয়া সমস্তই শুনিলেন। ইহা হইতে আমরা ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গুলবদন প্রভৃতির এডেনে থাকিবার সংবাদ পাইতেছি। সম্ভবতঃ বায়াজিদই বেগমদের ভারতে ফিরিবার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

কোন্ সময়ে বেগমেরা এডেন ত্যাগ করেন, অথবা কখন তাঁহারা সুরাটে পৌছান, তাহা নির্দ্ধারিতরূপে বলিবার উপায় নাই। সুরাটে তখন অতিরিক্ত বৃষ্টিপতন ও সম্রাটের কাবুলে অবস্থান দরুণ পুনরায় তাঁহাদের আগ্রায় আসিতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। রাজধানীতে আসিবার মুখে বেগমেরা আজমীরে চিস্তি ফকীরদিগের পুণ্যপীঠ দেখিতে গিয়াছিলেন। কুমার সেলিমও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আজমীরে উপস্থিত হন। সম্রাট্ খানওয়া নামক স্থানে বেগমদের সহিত মিলিত হন। বদাউনীর মতে এক বৎসর গুলবদনকে এডেনে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে (৯৯০ হিঃ) হিন্দুস্থানে পৌছান।

ফতেপুর শিক্রীতে পৌছিয়া গুলবদন দেখিলেন—মিশনরী পাদরী একোয়াভাইভা কুমার মুরাদকে খৃষ্টধর্ম্মের নানা নীতিকথা বুঝাইতেছেন। ইহাতে গুলবদন ও হামিদা বিরক্ত হইয়া নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। (৭)

আগ্রায় উপনীত হইয়া গুলবদন প্রাগুক্ত "হুমায়ুন-নামা" রচনা করেন। ইহাতে তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন ও বিশ্বস্তসূত্রে যাহা অবগত হইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা নহে। তিনি ইহা ব্যতীত বহু পারস্য কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। মীর মাদী সিরাজী "তাজখিরাতুল্-খাতীনে" তাঁহার একটী কবিতার এই দুইটী চরণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন :—

"হর পরী কি ও বা আশক্ খুদ ইয়ার নিস্ত।
তু ইয়াকীন মদান্ কি হেচ অজ উমর বর-খুর-দার নিস্ত।"

অর্থাৎ :—

"প্রেমাস্পদের প্রতি অনাসক্তা হে পরী! তুমি বড়ই মূর্খ—

"অভাগিনী! নিশ্চয় জানিও সারাজীবনে তুমি কখনও সুখী হইবে না।"

ইহার পর গুলবদনের জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা অতি সামান্য। আবুল-

(৬) বায়াজিদও গুলবদনের ন্যায় আকবরের আদেশে "হুমায়ুন-নামা" রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের রন্ধনশালার পরিদর্শক ছিলেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট্ হুমায়ুন সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য ঘটনা বায়াজিদের পুস্তকে আছে।

(৭) Father Goldie's "First Christian Mission to the Great Mughal." (Dublin :

ফজল লিখিয়াছেন—তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ৭০ বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার দৌহিত্র মহম্মদ-ইয়ার কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া সম্রাটের বিরাগভাজন হইলে বেগমের মধ্যস্থতায় তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন। হুমায়ুনের ন্যায় আকবরও গুলবদনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। বাদশাহ বহুবার তাঁহাকে বহুমূল্য রত্নরাজি উপহার দিয়াছিলেন। (৮) পরে গুলবদন ও সলিমা কুমার সেলিমের হইয়া বাদসাহের নিকট মার্জ্জনাভিক্ষা করিয়াছিলেন সম্রাট্ যখনই রাজধানী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র শিবির সংস্থাপন করিতেন, তথনই স্বীয় জননী হামিদাবাণুর শিবিরের সন্নিকটেই গুলবদনের তাঁবু সন্নিবিষ্ট হইত।

গুলবদন বহু দানধান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি মুক্তহস্তে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করিয়া-ছিলেন।

এদিকে তাঁহার 'গণাদিন' ফুরাইয়া আসিল। ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকদিনের জ্বরে তিনি শয্যা গ্রহণ করেন।

হামিদা গুলবদনকে বড়ই শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। গুলবদনের শেষ-সময় পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার পাশে ছিলেন। হামিদা আদর করিয়া ননদিনীকে "জিউ" (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা ভগিনী) বলিয়া ডাকিতেন। যখন তিনি দেখিলেন—রোগিণীর চক্ষে মৃত্যুর করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি একবার স্নেহভরে ডাকিলেন,—'জিউ ?' কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় ডাকিলেন,—'গুলবদন ?' মুমূর্ষু গুলবদন ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বহুকষ্টে বলিলেন, —"আমি মরিতেছি, তুমি চিরজীবিনী হও।" তারপর সমস্ত নিস্তব্ধ।

আকবর পিতৃস্বসার মৃত্যুতে অতীব সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য স্বয়ং তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য বহু সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সগুণ ঈশ্বরের বিকাশ ও প্রচার

বেদ ও উপনিষদে নিগুর্ণ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বই প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। বেদের দেব-বাদের মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্বের সূচনা থাকিলেও বেদের দেবতা ব্রহ্ম-ভাবেরই দ্বারা অনু-প্রাণিত। সুতরাং প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্বের বিকাশ, তন্ত্রে হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

বেদোপনিষদের নিগুর্ণ ব্রহ্ম, জ্ঞানীরই বোধগম্য ও সাধনীয়—ইহা সাধারণের

(৮) Al-Badaoni—Vol. II, p. 332

অনধিগম্য। সাধারণের জ্ঞান ও সাধনার জন্যই সগুণ ঈশ্বরের বিকাশ। ব্রহ্মের সহিত বিশ্বের প্রত্যক্ষগোচর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই বিশ্বের সাক্ষাৎ নিয়ামকরূপে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হইয়াছে। তন্ত্রে নূতন ভাবে এই বিশ্বনিয়ন্তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে। 'তন্ত্র' শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ 'প্রধান।' নূতন ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাধান্য প্রাপ্ত হওয়াতেই 'তন্ত্র' আপনার প্রাধান্য বাচক এই নাম ধারণ করিয়াছে। এই নামের দ্বারা 'তন্ত্র' বেদ হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্যই প্রখ্যাপন করিতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

'তন্ত্র' শিবেরই উক্তি। সুতরাং শিবই যে তন্ত্রের প্রধান দেবতা, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই শিবই সগুণ-ঈশ্বরের প্রথম বিকাশ। শিবের 'ঈশ্বর' 'ঈশ' 'ঈশান' (১) প্রভৃতি অনন্যসাধারণ নামেই ইহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

বেদের দেবতায় ঈশ্বরতত্ত্বের সূচনা দেখা যায় বলিয়া আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই দেবভাবের পূর্ণ পরিণতি যেমন শিবে হইয়াছে—তেমনই ইহার ঈশ্বরভাবের পূর্ণ পরিণতিও তাঁহাতেই হইয়াছে। তিনি যেমন একদিকে 'দেবদেব' বা 'মহাদেব'—তেমনই অপরদিকে 'মহেশ' বা 'মহেশ্বর'।

শিবের ধ্যানমন্ত্র ও নমস্কার-মন্ত্রের আলোচনা করিলে, বেদোপনিষদের ব্রহ্ম-ভাবকে মূল করিয়াই যে তাঁহার ঈশ্বর-ভাবের বিকাশ হইয়াছে—তাহা পরিষ্কার রূপেই বুঝিতে পারা যায়। এস্থলে আমরা উক্ত মন্ত্র দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভম্।
চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গম্।
পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্র
কৃত্তিংবসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজম্ নিখিলভয়
হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"
"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥"

ধ্যানমন্ত্রে 'বিশ্বাদ্যং' 'বিশ্ববীজং' স্বরূপে শিব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদ্বৈত মূলতত্ত্বরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। নমস্কার-মন্ত্রে 'কারণ-ত্রয়হেতবে' বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় তিনি বিশ্বের 'আদি-কারণ' রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। এইগুলি যে আদি-তত্ত্বরূপে তাঁহার নির্গুণ ভাবেরই বর্ণনা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ধ্যানে তিনি 'মহেশ' ও নমস্কার-মন্ত্রে 'পরমেশ্বর' নামে আখ্যাত হওয়ায় নির্গুণ ঈশ্বর-ভাবের মধ্য হইতেই যে তাঁহার সগুণ ঈশ্বর-ভাবের বিকাশ হইয়াছে এবং এই সগুণ ঈশ্বর-ভাব যে চরম ঈশ্বর-ভাব, তাহা পরিষ্কারই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তদীয় 'বিশ্বেশ্বর', 'বিশ্বনাথ' 'বিশ্বম্ভর' প্রভৃতি নামে সেই চরম ঈশ্বর-ভাব আরও স্পষ্টরূপে প্রকটিত।

উপরে শিবকে আমরা সগুণ ঈশ্বরের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি—এক্ষণে ঈশ্বরের গুণ সকলের পূর্ণ

(১) শম্ভুরীশঃ পশুপতি শিবঃ শূলী মহেশ্বরঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ঈশানঃ শঙ্করশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ অমরকোষ।

সমাবেশ যে তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

শিবের আরাধনার উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ে তাঁহার যে, সমস্ত গুণের পরিচয় পাওয়া যায় প্রথমতঃ আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব। তিনি যে 'মহেশ' ও 'পরমেশ্বর' নামে আখ্যাত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রমাণই পাওয়া যায়। কারণ 'মহেশ' ও 'পরমেশ্বর' শব্দের মূল ঈশ-ধাতু, প্রভাব ও শক্তির অর্থই প্রকাশিত করিয়া থাকে। তিনি যে 'ত্রিনেত্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি 'ত্রিকালদর্শী, অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী ইহাই বুঝাইতেছে (২)। 'শিব' বলিয়া উক্ত হওয়ায় তিনি যে মঙ্গলময়, তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। 'বরাভীতিহস্ত' 'নিখিলভয়হর' 'প্রসন্ন' ও 'শান্ত' বলিয়া উক্ত হওয়ায় তিনি যে রক্ষাকর্ত্তা, করুণাময়, আনন্দ ও শান্তির আধার তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। 'পঞ্চবক্ত্র' বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় পঞ্চভূত যে তাঁহারই অভিব্যক্তি তাহাই সূচিত হইতেছে। ইহাতে তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই জানিতে পারা যায়। তাঁহার 'সর্ব্ব' বলিয়া যে একটী নাম আছে, তাহাতেও তাঁহাকে সর্ব্বময় বা বিশ্বময় বলিয়াই বুঝা যায়। তাঁহাকে 'কারণত্রয় হেতবে' বলিয়া বর্ণনা করায় তাঁহার বিশ্ব-কর্তৃত্ব বিশেষরূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে শিবেই যে বিশেষরূপে জগৎপিতৃত্ব আরোপিত, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেই পিতৃত্বভাবের বন্দনা করিয়াই কালিদাস রঘুবংশের সূচনা করিয়াছেন ; যথা—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥

উপরে সর্ব্বকর্তৃত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বপালকত্ব প্রভৃতি সমস্ত ঐশ্বরিক গুণের বিকাশই যে শিবে হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম।

শিবে ঈশ্বরাদর্শের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে বলিয়াই কেবল তাঁহারই 'ঈশ্বর' 'মহেশ্বর' নাম হইয়াছে—আর কোনও দেবতার এই নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। শিবের ঈশ্বরাদর্শ কেবল হিন্দুধর্ম্মেরই সগুণ ঈশ্বরের আদর্শ হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু অন্যান্য প্রধান ধর্ম্মের ঈশ্বরাদর্শেও ইহা প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহুদিদিগের ধর্ম্মে ঈশ্বর "জেহোভা" (Jehova) নামে আখ্যাত। Jehova শব্দ কোন কোন শাব্দিক, হিব্রু অস্ত্যর্থক হাওয়া hawah (to be) হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করেন। শিবের 'ভব' নামের মূলেও আমরা এইরূপ সত্ত্বাবাচক ভূ ধাতুরই যোগ দেখিতে পাই। Lord শব্দ বাইবেলে যেমন ইহুদিদিগের Jehovaকে বুঝায়, তেমনই খ্রীষ্টানদিগের পরমেশ্বরকেও বুঝায়। ইহা 'ঈশ্বর' শব্দেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ।

খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর যে পিতা (God the Father) রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাতে শিবের পিতৃভাবেরই অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেলের ঈশ্বর স্বর্গের সিংহাসনে সমাসীন, আর দেবগণ (Angels) চতুর্দ্দিকে অনবরত তাঁহার স্তুতি-গানে নিরত (Singing eternal Hallelujah) এইরূপ

(২) শিবের 'সর্ব্বজ্ঞ' নামেও এই সর্ব্বদর্শীর অর্থই প্রকাশিত হয়।

যে বর্ণনা পাওয়া যায়, উহা 'পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈঃ' বলিয়া শিবের ধ্যানে শিবের যে বর্ণনা আমরা প্রাপ্ত হই, তাহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়।

বাইবেল-ধর্ম্মের আদর্শে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গঠিত। সুতরাং মহম্মদীয় ধর্ম্মেও যে শিবের ঈশ্বরাদর্শই অনুসৃত হইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

শিব ও দুর্গাই তন্ত্রের প্রধান দেবতা। মহম্মদীয় ধর্ম্মের পরমেশ্বরের 'আল্লা' নাম যে দুর্গার নাম হইতেই গৃহীত, অনুসন্ধান করিলে তাহার বিশেষ প্রমাণই আমরা পাইতে পারি। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মেতিহাস-প্রণেতা অধ্যাপক টিল্ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আরবের প্রাথমিক ধর্ম্মে দেবতার নাম 'অল্লাৎ' ছিল। এই নাম ও আসিরীয় দেবতার অল্লাৎ নাম একই নাম।

"In Arabia her name, as Professor Tiele shows, was Allah (৩) where she became the lightmoon or the heavenly ship of light. This is the same name as that of the Assyrian goddess Allat, meaning the unwearied one." The Ruling Races of Prehistoric Times : by J. F. Hewitt Vol I. p. 23.

দুর্গার এক নামও 'অল্লা' পাওয়া যায়। তাঁহার ধ্যানে তাঁহাকে "অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তিনি "শক্তিরূপিণী"। সুতরাং আরবদিগের আদি দেবী 'অল্লাৎ' যে "শুক্লপক্ষীয় চন্দ্ররূপিণী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং আসিরীয় দেবী যে "অশ্রান্তিরূপা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে আমরা দুর্গারূপেরই প্রতিরূপ দেখিতে পাইতেছি। বিশেষতঃ "আসিরীয়" অসুর নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অথচ শিবদুর্গা অসুরদিগের পরম দেবতা বলিয়াই পরিজ্ঞাত। সুতরাং 'অল্লাৎ' যে দুর্গার অল্লা নামেরই অপভ্রংশ, তাহাতে অল্পই সন্দেহ থাকিতেছে।

ইজিপ্তের 'ঈশীশ' দেবতার নাম শিব এবং দুর্গার ঈশা ও ঈশ নামের যোগদ্বারা গঠিত বলিয়াই বোধ হয়। কালীমূর্ত্তিতে উভয়েরই সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। বৃষ দেবতা ওসিরিসেও আমরা শিবের বৃষবাহনেরই নিদর্শন দেখিতে পাই।

এই প্রকারে শিবে সগুণ ঈশ্বরভাবের বিকাশের প্রমাণ যে কেবল ভারতীয় ধর্ম্মেই পাওয়া যায়, তাহা নহে, পরন্তু বাইবেল কোরাণ ও অন্য প্রধান প্রাচীন ধর্ম্মেও পাওয়া যায়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(৩) Tiel—Outline of the History of Ancient Religions Primitive Arabian Religion. pp. 63-64.

অকূলে

(গল্প)

সেদিন কোর্টে পৌঁছিতেই সুশীলের সঙ্গে দেখা। সুশীল কহিল, "লাইব্রেরীতেই চলেছেন ত! একটি মক্কেল এনেছি—এক খানা দরখাস্ত করতে হবে।"

"এস" বলিয়া অগ্রসর হইলাম। সুশীল আমার অনুসরণ করিল।

লাইব্রেরীর সম্মুখেই একটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল। সুশীল তাহাকে কহিল, "এস গো, উঠে এস।" স্ত্রীলোকটি উঠিয়া আসিল।

চেয়ারে বসিয়া স্ত্রীলোকটির পানে চাহিলাম,—তাহার পরণে একখানি রঙ-করা মলিন বস্ত্র, মুখ ঘোমটায় ঈষৎ ঢাকা। স্ত্রীলোকটি সুন্দরী, বয়সে কিশোরী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি তোমার নালিশ, বল।"

সুশীল কহিল, "সারদা বাড়ী-উলির নামে নালিশ। কাল রাত্রে সে ওকে মেরেছে, তবে'গে ওর গহনা-পত্তর কেড়ে নিয়ে ওকে রাস্তায় বার করে দেছে।"

সুশীলকে চুপ করিতে বলিয়া স্ত্রীলোক-টিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি— ?" সে কোন কথা কহিল না। সুশীল কহিল, সে পতিতা। আজ দুই বৎসরমাত্র সে এ পথে পা দিয়াছে; নাহিলে পূর্ব্বে সে গৃহস্থ-ঘরেরই বধূ ছিল।

আমি সুশীলকে বাধা দিলাম, কহিলাম, "তুমি চুপ কর। ওর নালিশ আমি ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই। তুমি ততক্ষণ যাও, একখানা আট আনার ষ্ট্যাম্প আর দরখাস্ত লেখবার কাগজ কিনে আনো। হাঁ্যা, তাহলে আমার ফীটা ?

সুশীল কহিল, "ও বড় গরিব, মশায়। আপনার পুরো ফী দিতে পারবে না, একটু দয়া করবেন।"

তখন আমার জুনিয়ারির যুগ; ফীয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট মাত্রা ছিল না। আট হইতে সুরু করিয়া একটা টাকাও হাত পাতিয়া লই। আমি কহিলাম, "চারটে টাকা চাই।"

সুশীল কহিল, "তা দেবে'খন। তবে টাকাটা এখন হাতে নেই! আমি এসে দিয়ে যাব'। আমি তার জামিনও রইলুম।"

সুশীলের জামিন মঞ্জুর করিলাম। প্রায়ই সে দুই-চারিটা 'কেশ্' আনিয়া দেয়; ফীয়ের টাকাও কখনও বাকী পড়িয়া থাকে না।

আমি কহিলাম, "আচ্ছা, তাহলে এর নালিশটা এখন শুনি।"

সুশীল চলিয়া গেল। আমি স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি ?"

বেশ শান্ত নম্র স্বরেই সে কহিল, "সরযু—"

"নালিশ তোমার সারদা বাড়ী-উলির নামে ? তোমার গহনা-পত্তর কেড়ে নিয়েছে,

দিচ্ছে না—সেইগুলো তুমি উদ্ধার করতে চাও, কেমন?"

সরযু কহিল, "সে আর আমি চাই না।"

আমি কহিলাম, "তার ঘরের ভাড়া-টাড়া কিছু ধারো?"

নত মুখেই সে কহিল, "না।"

আমি কহিলাম, "তবে কি মেরেছে বলে নালিশ করতে চাও?"

সরযু কহিল, "মেরেছে বটে, কিন্তু তার জন্যও আমি নালিশ করতে চাই না।"

বিরক্ত হইলাম। ভাল আপদ! কহিলাম, —স্বরে একটু ঝাঁজও ছিল—"এ নয়, ও নয়, তবে নালিশটা কিসের? আদালতে এসেছ কেন?"

আমার সে স্বরে সরযু কেমন দমিয়া গেল। আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম; একটু অপ্রতিভও হইলাম। তখন তাহাকে বুঝাইতে বসিলাম। নিজের পকেট-পূর্ত্তির সম্ভাবনায় নহে; মানুষের প্রতি মানুষের যে একটা স্বাভাবিক সহানুভূতির টান আছে, সেই টানে! আমি কহিলাম, "তোমায় মেরেছে সে, তবে সে গহনা-পত্তরও কেড়ে নিয়েছে, অথচ তার জন্য তুমি নালিশ করতে চাও না! তবে আমার কাছে এসেছ কেন? আমি তোমায় কি সাহায্য করতে পারি, আর কি সাহায্যই বা চাও তুমি?"

সরযু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, "আমায় সে ভয় দেখাচ্ছে, বলছে, মিথ্যে নালিশ করে সে আমায় জেল খাটাবে। তাই—"

সুশীল কাগজ ও ষ্ট্যাম্প লইয়া আসিল। সরযুর মুখের কথা লুফিয়া লইয়া সে কহিল, "সে সব গহনা-পত্তর ও আর চায় না। আদালতে এসে ঘটা করে সে মকর্দ্দমা চালাবার সামর্থ্যও ওর নেই। বাড়ী-উলি মাগী ভারী পাজী। সে ওকে শাসাচ্ছে, ওর ঘরে কোকেন ফেলে ওকে ধরিয়ে দেবে, তবে মিছে করে পুলিশে খপর দেবে, ও মদ বেচে, এই রকম কোন ফ্যাসাদে ফেলবে—বুঝেছেন? পাছে সেই সব কিছু করে, তাই তারই একটা প্রতিকার আপনি করে দিন, মশায়।"

ব্যাপারটা জলের মতই সাফ বুঝিয়া ফেলিলাম। শত্রুঞ্চ গৃহমাগতম্! কহিলাম, "তাই বল। বেশ, এখনই দরখাস্ত লিখে ফেলছি। কিন্তু একটা কথা বল দেখি, আগে। এর সঙ্গে তোমার আলাপই বা হল কি করে, আর কেনই বা তোমায় কাল রাত্রে এমন ভাবে ও পথে তাড়িয়ে দিলে? বল, সব খুলে বল—লজ্জা করলে চলবে না।"

এত কথা জানিবার আমার প্রয়োজনও ছিল না। তবে তাহার পরিচয়ে সুশীল যেটুকু ইঙ্গিত দিল, তাহা হইতেই আমার মনে একটা কৌতূহল জাগিয়াছিল,—এই দুর্ভাগিনী নারীর অতীত ইতিহাস জানিবার জন্য একটা অধীর আগ্রহ!

নারী দ্বিধা করিতেছিল। সুশীল কহিল, "বল না, সব কথা খুলে। উকিলের কাছে, ডাক্তারের কাছে কোন কথা লুকোনো ঠিক নয়। বল সব। শুনে উনি বেশ গুছিয়ে দরখাস্তখানা লিখে দেবেন'খন।"

সরযু একবার আমার মুখের পানে

চাহিল—বেশ ডাগর দুটি চোখে করুণ কাতর দৃষ্টি, ব্যাকুল নিবেদনে ভরা !

তারপর সঙ্কোচ কাটাইয়া সে বলিতে লাগিল :—

২

"আমার বাপের বাড়ী ছিল, পাড়া-গাঁয়। তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর, বাবার মৃত্যু হইল। মা আমাকে লইয়া অকূল পাথারে পড়িলেন। বাপ ছিলেন, গাঁয়ের বাঙলা স্কুলের মাষ্টার। বড় বোনের বিবাহ দিতে ভিটাখানি বাঁধা পড়িয়াছিল—বাবার মৃত্যু হইলে পাওনা-দারেরা আসিয়া নালিশ করিয়া সে ভিটা কাড়িয়া লইল। আমায় লইয়া মা পথে বসিলেন।

কলিকাতায় দূর-সম্পর্কে মার এক মাতুল ছিলেন—তাঁহার স্ত্রীর শরীর ভাল ছিল না, মাতুল চাকুরি করিয়া মাসে পঞ্চাশটি মাত্র টাকা ঘরে আনিতেন। স্ত্রীর অসুখ, অথচ সচ্ছলতার অভাবে বামুন রাখিবারও তাঁহার সামর্থ্য ছিল না, কাজেই মাকে তিনি লইয়া গেলেন, রাঁধিবার জন্য। আমিও অগত্যা সেখানে আশ্রয় পাইলাম। মা রাঁধিতেন, বাড়িতেন, আমি তাঁহার মাতুলের ছেলেমেয়েদের সহিত খেলা করিতাম, গল্প করিতাম, ক্রমে পড়া-শুনাও সুরু করিলাম। তাহার পর চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হইল।

স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষ—প্রথম পক্ষের তিন-চারিটি পুত্র-কন্যা ছিল ; শ্বশুর-শাশুড়ীও ছিলেন। আমায় দেখিয়া পছন্দ করিয়া একশোখানি টাকা মাত্র লইয়া পরগৃহ-বাসিনী বিধবা মাকে তিনি কন্যাদায় হইতে মুক্তি দিলেন। এক পাটের অফিসে স্বামী কাজ করিতেন, রোজগার বেশই ছিল।

প্রথম বৎসরটা স্বামীর গৃহে মন্দ কাটিল না। তাঁহার পুত্র-কন্যার যত্ন করিয়া, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিয়া সহজেই সকলের মন পাইলাম। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ—সে সুখ সহিবে কেন ? এক বৎসর পরে শ্বশুরের মৃত্যু এবং আমারও দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল। শাশুড়ী কিছুই দেখিতেন না; কাজেই সংসার এবং ছেলে-পিলে, সব দেখার ভার পড়িল, আমার উপর। আমার বয়স অল্প—সব দিক ঠিক সামলাইয়া উঠিতে পারিতাম না। ছেলেগুলাও ছিল তেমনই, কিছুতে বশ মানিবে না। অনর্থক বাজে আব্দার লইয়া তাহারা বিষম উৎপাত বাধাইয়া তুলিত—কাঁদিয়া, চীৎকার করিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোককে পাগল করিয়া দিত। আমার গায়ে হাত তুলিতেও তাহারা দ্বিধা করিত না। কিন্তু তাহাতে আমি কোন দিনই রাগ করি নাই।

শাশুড়ীর কিন্তু অসহ্য বোধ হইল। একে সদ্য স্বামি-শোক, তাহার উপর পুত্রের ইদানীংকার ব্যবহার তাঁহাকে নিতান্তই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। আমার বিবাহের পূর্ব্বেই স্বামীর চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছিল। মদ্যপান ছিলই, তাহার উপর বাহিরের দোষগুলাও বিলক্ষণ বাড়িয়া গেল। শ্বশুর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন এ-সবগুলা তিনি সাধ্যপক্ষে গোপন করিয়া চলিতেন। এখন আর মাথার উপর কেহ নাই—কাজেই বাড়ীতে আসাও তাঁহার বড়-একটা ঘটিয়া উঠিত না। যদি-বা আসিতেন,

সহজ অবস্থায় নহে। আসিয়া গালি-গালাজ ও অন্য দুর্ব্যবহারেরও একশেষ করিতেন। একে পয়সা-কড়িতে টান ধরিয়াছে, তাহার উপর এই উপদ্রব, শাশুড়ীর যত রাগ পড়িল, আমার উপর। কিন্তু আমি কি করিব? আমার কি শক্তি, কি সামর্থ্য আছে যে একটা বয়স্ক পুরুষের মতি ফিরাইব! একবার কথাটা পাড়িয়া ছিলাম। স্বামী লাথি মারিয়া উপদেশ দিলেন, গরিবের মেয়ের এত স্পর্দ্ধা কেন! গৃহে তাহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, এই যথেষ্ট! ছেলে-মেয়ের দাসীত্ব করিয়া, বাড়ীর কাজ সারিয়া ঘরের কোণে মুখ গুঁজিয়া সে দাসী পড়িয়া থাকুক! ছোট মুখে বড় কথার ধার তিনি ধারিবেন না—স্পষ্টই বলিয়া দিলেন। সে উপদেশের পর আবার আমি কথা কহিব, এত সাহস আমার ছিল না।

শাশুড়ীর বিরক্তি বাড়িল। ছেলের রাগ আমার উপর ঝাড়িয়া পোঁটলা-পুঁটুলি বাঁধিয়া একদিন তিনি বিদেশে এক আত্মীয়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন। ঘরের কোণে কাঁদিয়াই আমি পড়িয়া রহিলাম। ছেলে-মেয়ে আসিয়া উপদ্রব জুড়িল, ভাত কৈ, খাবার কৈ! কোথা হইতে দিব? গৃহে একটা দারুণ রিক্ততা রি-রি করিতেছিল। পয়সা কোথায় পাইব যে, তাহাদের খাবার কিনিয়া দিব? প্রাণে মায়াও হইল, আহা, ইহারা যে শিশু, বড় অসহায়! কিন্তু উপায় ছিল না। ছেলে-মেয়েরা কাঁদিল, আমায় গালি দিল, মারিল, আমি চুপ করিয়া কাঠের মত পড়িয়া রহিলাম। তারপর তাহারা চলিয়া গেল। কোথায় গেল, জানি না।

দুইদিন পরে সন্ধ্যার সময় স্বামী আসিলেন—মত্ত অবস্থা। আসিয়াই তিনি হাঁকিলেন, "বাঁদী—"

আমি উঠিলাম, কাছে আসিলাম, জল-গামছা আগাইয়া দিলাম! তিনি দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কহিলেন, "ছেলেগুলো মরেছে না কি? সাড়া পাচ্ছি না যে—!" ভয়ে ভয়ে সব কথা আমি খুলিয়া বলিলাম! কথা সব শেষ করিবার পূর্ব্বেই পাঁজরায় প্রকাণ্ড লাথি পড়িল। দুই দিন আহার নাই, শরীরটাও বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল, সে লাথি সহ্য করিতে না পারিয়া রকের উপর আমি পড়িয়া গেলাম। সন্ধ্যার সমস্ত আলো আমার চোখে নিবিয়া গেল। আমি চোখ বুজিলাম।

যখন চোখ মেলিলাম, জ্যোৎস্নায় ছোট রক তখন ভরিয়া গিয়াছে! মাথা তুলিয়া দেখি, এক প্রৌঢ়া আমার পাশে বসিয়া আছে। সে সারদা—"

আমি বাধা দিলাম, কহিলাম, "এই বাড়ী-উলি সারদা না কি?" সরযু কহিল, "হাঁ, এই বাড়ী-উলি সারদাই। সে আমার শ্বশুর-বাড়ীর কাছেই কোথা থাকিত—প্রায়ই আমার শাশুড়ীর কাছে আসিত, আনাজটা তরকারীটা মাগিয়া লইয়া যাইত, আর সময়ে অসময়ে আমার কাছে বসিয়া সান্ত্বনা দিত, সহানুভূতি জানাইত। সেদিন সন্ধ্যায় সে-ই আসিয়াছিল। আমি উঠিয়া বসিতে সারদা কহিল, "আবার কি সেই কাণ্ড না কি?" আমি মৃদু হাসিলাম, এ ত আর নূতন কথা নয়! আমার অদৃষ্টের ভোগ এ, কে খণ্ডাইবে? সারদার

তীক্ষ্ণ চক্ষু যেন আমার মনের ভিতরটা পাতি-পাতি করিয়া দেখিয়া লইল।

সে কহিল, "আহা, একেই বলে, বরাত! নইলে এমন লক্ষ্মী পিরতিমে তুমি—বড়লোকের ঘরে পড়বার সামিগ্রী—সোনা-রূপোয় গা অমনি জম্‌জম্‌ করবে, এই রূপে রাজ্যির ঘর আলো করবে! তা না, কোথাকার এক হতভাগা বওয়াটের হাতে পড়ে চিরটা কাল মার খেয়েই কাটল!"

আমি কোন কথা বলিলাম না। আমার প্রাণের মধ্যে যেন অশ্রুর সাগর উথলিয়া উঠিয়াছিল। মার উপর রাগ ধরিল। আমার মেয়ে-জন্মের কোন সাধ পূর্ণ হইতে দিল না। এমন করিয়াই আমার জীবনটাকে নষ্ট করিয়া দিল! যে স্বামীকে শাস্ত্র দেবতা বলিয়া তাহার পূজা করিতে আদেশ দিয়াছে, আমার অদৃষ্টে সেই স্বামী কি এ রাক্ষস মূর্ত্তি ধরিয়া উদয় হইয়াছে! রূপ-কথায় শুনিয়াছিলাম, রাক্ষস রাজার মেয়েকে বন্দী করিয়া রাখিয়া ছিল। আমার সেদিন প্রথম মনে হইল, আমিই যেন সেই রাজার মেয়ে! কেন নই? এমন রূপ, এমন দেহ, এই যৌবন,—রাজার মেয়ের ইহার বেশী কি ছিল? এই রাক্ষসের তপ্ত নিশ্বাসে এমনই ভাবে এ-সব শুকাইয়া যাইবে? ইহার কি কোন প্রতিকার নাই!

সারদা নিজের মনেই বকিয়া চলিয়াছিল। একটা কথা আমার কানে গেল। সারদা বলিতেছিল, "ঐ ঘোষালদের বৌটো! মাগো, যেন কাকপেঁচা! অত টাকার উপর রাজত্বি করা কি মানায়? যেমন রূপ, মুখের কথাও কি ছাই, তেমনি! তা তার বরাতে হল কি না, অমন সোনার চাঁদ সোয়ামী, আর কুবেরের ঐশ্বয্যি! আর তোর এই এত রূপ, এত গুণ—দু'বেলা দু'মুঠো খেতেও পাস্‌নে, তার উপর এই হেনস্থা, এই মার ধোর! এতেই ত বলি, মা, পোড়া বিধেতা কি আছে—না, সে মরেছে!"

নাই, সত্যই নাই, বিধাতা নাই! কে বলে, বিশ্বের মাথার উপর একজন ভগবান আছেন! আমি ত কিছুই চাহি নাই—শুধু একটু স্নেহ, একটু আরাম! এই স্বামীই—অর্থ তাঁর নাই থাকিল,—যদি একটু হাসি-মুখে আমার সঙ্গে কথা কহিতেন, একটু স্নেহের চোখে চাহিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে—

সারদা নিজের মনে তখনও বকিতেছিল। সে কহিল, "এখন কি করবে? ছেলেমেয়ে-গুলোকে ত তাদের মামা এসে নিয়ে গেছে—তারা জুড়িয়েছে—এর ত এই দশা! উপোস্ করে এমন গুমরে থেকে কি করবি, বল্! তার চেয়ে চ', তোর মার কাছে তোকে রেখে আসিগে। মার বাছা, মার কাছে জুড়িয়ে বাঁচবি। নাহলে এই জন-হীন পুরীতে একলাটি থাকবি কি করে? বিশেষ তোর এই বয়স, এই রূপ নিয়ে—"

এ দুঃখেও হায় রূপ, আর বয়সের কথা! নাঃ, আমায় পাগল করিয়া দিবে! জ্যোৎস্নার আলোয় হাতখানার দিকে চাহিয়া দেখিলাম! মনে হইল, হাঁ, রূপ বটে! নধর নিটোল হাত! চাঁপার মত রঙ! সোনার চুড়ি কয় গাছা আঁটিয়া বসিয়াছে, সবুজ কাচের চুড়িগুলাতেও কি চমৎকার মানাইয়াছে! কিন্তু হায়, যাহার জন্য এ রূপ, সে তাহা

দেখিলও না। জানি না, বাহিরে কি লইয়া সে মজিয়া আছে! মনের কথা ছাড়িয়া দিই, এমন রূপও কি সে বাহিরে পাইয়াছে? না, পাইবার আশা রাখে!

সেই রাত্রেই নিজের যে দুই-চারিখানা গহনা-পত্র, কাপড়-চোপড় ছিল, পুঁটুলিতে বাঁধিয়া সারদার সহিত ঘরের বাহির হইলাম। সারদা কহিল, সে মার মাতুলের বাড়ী চিনে—ঐ যে ও-পাড়ায়। এখনই সে আমায় সেখানে পৌঁছাইয়া দিবে! মার কোলে গিয়া আমি জুড়াইয়া বাঁচিব!

পথে বাহির হইলাম। নির্জ্জন পথ। সারা গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। পথে অত রাত্রেও একটা লোক শুধু "কুল্‌পী বরফ" হাঁকিয়া চলিয়াছিল। আমার পায়ে পায়ে কেবলই বাধিয়া যাইতেছিল। একটা খোয়ায় হুঁচট্ লাগিল—বুড়া আঙ্গুলের নখের কাছটা ছিঁড়িয়া গেল—রগ্ অবধি ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। প্রাণের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুতের হল্‌কা ছুটিয়া গেল—পা কাঁপিয়া টলিয়া উঠিল। আমি সবলে সারদার হাতটা চাপিয়া ধরিলাম।

৩

"সেই রাত্রে কত পথ ঘুরিলাম, কত মোড় বাঁকিলাম—কিন্তু একটুও ক্লান্তি বোধ হয় নাই। কেবলই মনে হইতেছিল, এখনই মাকে দেখিব—মার কোলে পড়িয়া মার মেয়ে জুড়াইয়া বাঁচিব!

সহসা একখানা একতালা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সারদা কহিল, "না বাছা, রাতে কেমন দিশে-হারা হয়ে পড়েছি। সে বাড়ী ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। বেশ মনে আছে, আবার নতুন কলি ফিরিয়েছে, সাদা ধব্‌ধব্ করছে অমনি বাড়ী—মা-লক্ষ্মী যেন দাঁতগুলি মেলে হাসছেন! তা রাতে আর কত ঘুরব, বল্ বাছা,—বিশেষ তোর মত সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে! শেষে কি একটা হাঙ্গামে পড়ব? তার চেয়ে আমার বাড়ীতে আজ থাকো। কাল দিনের বেলা তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে আসব'খন—তার পর মায়ে-ঝীয়ে একসঙ্গে যেয়ো। কেমন?"

আমি আপত্তি করিলাম। সারদা বক্তব্যের জের বাড়াইয়া কহিল, "তার উপর কদিন খাওয়া-দাওয়া নেই, আজ রাতে বরং খেয়ে-দেয়ে আমার বাড়ীতেই পড়ে থাকো—" সারদা দ্বারের কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে এক তরুণী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা ভিতরে গেলাম। আমায় ঘরে বসাইয়া হাত-পা ধুইতে বলিয়া সারদা কোথায় বাহির হইয়া গেল। আমি হাত-পা ধুইলাম, কাপড় কাচিলাম—তরুণী একখানা শাড়ী দিল—পরিয়া ঘরে আসিয়া বসিলাম; তরুণীর সহিত আলাপ করিলাম। পরিচয়ে জানিলাম, সে সারদার সম্পর্কে বোনঝি।

তাহার সহিত গল্প-সল্প করিতেছি, এমন সময় সারদা একটা ঠোঙা হাতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "নাও, এত রাত্রে আর কোথায় কি পাব? দোকান থেকে গরম লুচি আর আলুর দম কিনে আনলুম, খেয়ে ফেলো, বাছা।" আমি কহিলাম, "দোকানের তরকারীটা?"

সারদা কহিল, "সধবা মানুষ—তোদের

আবার অত বাচ বিচার কেন? তা-ছাড়া এ বামুনের দোকান থেকে এনেছি।"

অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল। লুচি-গুলা নিঃশেষ করিয়া এক ঘটি জল খাইয়া জুড়াইয়া বাঁচিলাম। সারদা কহিল, "বিন্দী, তোর ঘরে ওকে শুতে দে—তুই আজ আমার কাছে শুস্‌'খন।" পরে আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "যাও গো, শুয়ে পড় বাছা,—কাল তোমার ব্যবস্থা করব।"

আমি গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালেই সারদা বাহির হইয়া গেল। বিন্দু মৃদু হাসিয়া কহিল, "তোমার মাকে আনতে গেছে।" সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই—পরে বুঝিলাম।

সারাদিন সারদা ফিরিল না। আমার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। খাঁচার পাখীর মতই সারাদিন ছট্‌ফট্ করিলাম। মনে একটা ভাবনাও হইল, কেন হায়, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম! যদি সারদা এখন মাকে খুঁজিয়া না পায়, তাহা হইলে যে আমার সব গেল! দাঁড়াইবার এতটুকু ঠাঁইও রহিল না যে!

সন্ধ্যার সময় বিন্দু খোঁপা বাঁধিল, সাবান দিয়া মুখ-হাত ধুইল, আমাকেও টানিয়া মাথায় তেল ঢালিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিল। দীপের আলোয় সারদার পথ চাহিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। অনেক ক্ষণ কাটিল। পরে বাহিরে কে দ্বারে কড়া নাড়িল। বিন্দু গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আমি উঁকি মারিয়া দেখি, সারদা ফিরিয়াছে, সঙ্গে একটি পুরুষ। আমি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বিন্দুর ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সারদা পুরুষটিকে লইয়া সেই ঘরেরই দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "সে কোথা গেল?"

বিন্দু কহিল, "ঘরে।"

সারদা আমার ঘরে আসিল, কহিল, "এই যে। দেখ দেখি, এ মানুষটীকে চিন্‌তে পারো কি না? কৈ গো বাবু, এদিকে এস না।" পুরুষটা সটান্ অমনি ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। তখন সারদা অতি ইতরের মত কি একটা কথা বলিল। শুনিয়া আমার মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গে কে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। আমি দুই পা পিছাইয়া তক্তাপোষে বসিয়া পড়িলাম। সারদা বাহির হইতে শিকল টানিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। পুরুষটা তখন আমার দিকে আগাইয়া আসিল, তক্তা-পোষের কাছে আসিয়া কহিল, "তোমার নামটী কি,—সরযূ?"

সে ডাকে যেন হাজার বাজ হাঁকিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া কহিলাম, "সরে যান, আপনি।"

পুরুষটা ভড়কাইয়া সরিয়া গেল। আমি উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলাম। লোকটা তখন একটা তামাসা করিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিল। সবলে আমি হাত ছিনাইয়া লইলাম—কঠিন স্বরে কহিলাম, "খবরদার, আমার গায়ে হাত দেবেন না। তাহলে—"

"তাহলে কি, শুনি"—বলিয়া লোকটা হাসিয়া উঠিল। দুই চোখে আগুন জ্বালাইয়া আমি তখন তাহার পানে চাহিলাম—তখনও তাহার মুখে সে দুষ্ট হাসি লাগিয়া ছিল! সে আমার কাছে আসিল, আমার আঁচল ধরিয়া টানিল। আঁচল

ছাড়াইয়া সবেগে আমি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম; দুই হাতে অজস্র কিল-চাপড় বর্ষণ করিলাম। লোকটা এক-কোণে সরিয়া গেল। আমি তখন সবলে দ্বারে আসিয়া ধাক্কা দিলাম—দ্বার ধরিয়া কত নাড়িলাম। দ্বার বন্ধ! আমার মনে হইল, পৃথিবীটা যেন ভূমিকম্পের বেগে সহসা প্রচণ্ড দুলিয়া উঠিয়াছে—পায়ের তলায় মেঝেটা যেন কোন্ পাতালে নামিয়া চলিয়াছে! কেমন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, জানি না। দ্বারে সবলে ধাক্কা দিতে লাগিলাম। সারদা দ্বার ঠেলিয়া পশুর মতই আক্রোশে ঘরে ঢুকিল, আমাকে ধরিয়া দুই হাতে প্রবল-ভাবে ঝাঁকানি দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "মনে ঠাউরেছিস্ কি, বল্ ত দেখি! ঘর-দরজা সব ভেঙ্গে ফেলবি না কি, আমার?"

পুরুষটা ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে অপদার্থ বলিয়া গালি দিয়া সারদা তাহার দিকে আমায় ঠেলিয়া দিল। টাল্ সামলাইতে না পারিয়া আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম, লোকটা দুই হাতে ধরিয়া ফেলিল। আমার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমি তাহাকে সবলে দংশন করিলাম। চীৎকার করিয়া সে ভূমে লুটাইয়া পড়িল। তার পর ছুটিয়া আমি বাহিরের দালানে আসিলাম—দালানের দ্বার খোলা ছিল—সেই খোলা দ্বার-পথে ছুটিয়া একেবারে পথে আসিয়া পড়িলাম। পিছনে চাহিবার অবসর ছিল না। দুই-চারিজন লোক নিজের মনে পথে চলিয়াছে—আমায় কেহ লক্ষ্যও করিল না। আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া একটা দিকে আমি চলিতে লাগিলাম!

কে যেন আমায় উড়াইয়া লইয়া চলিল। এ-পথ, ও-পথ ঘুরিয়া দেখি, এ কি, এ যে সেই পরিচিত ঘর—স্বামীর ঘর! গা-টা শিহরিয়া উঠিল। কে আমায় এখানে লইয়া আসিল? কে পথ দেখাইল? আনন্দে আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। বাড়ীর দ্বার খোলা ছিল। দ্বারের সম্মুখেই গাভীটা দাঁড়াইয়া ছিল—ফোঁস্ করিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। আমি উঠানে আসিয়া পড়িলাম। উঠানের দাহিনেই খোলার ঘর। এইটাই ছিল, বাহিরের বৈঠকখানা। অন্ধকারে বসিয়া কাহারা কথা কহিতেছিল—আমার চোখে পড়িল, কলিকার আগুনটুকু। সেদিকে না যাইয়া উড়িয়া যেন আমি অন্দরের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম। চৌকাটে পা বাধিয়া গেল। একজন কহিল, "কে?" এ যে পরিচিত স্বর! আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আমি ভিতরে ঢুকিয়া গেলাম—একেবারে সেই অন্দরের রকে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। পা দুইটা তখন ধুলায় ভরা, ঘামে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে।

বাহিরে একটা মহা-সোরগোল পড়িয়া গেল। "কে ও—কে যায়?" আমার তখন জ্ঞান ছিল না। ক্রমে সে কোলাহল কাছে আসিল। আমি দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিলাম—চোখে একটা আলো লাগিল। আমি মুখ তুলিলাম। চাহিয়া দেখি, সম্মুখে—স্বামী, আমার যম!

স্বামী গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কোথা

থেকে আবার এখানে মরতে এলি? বেরো, বেরো বলছি, এখান থেকে।”

আমি কাঁদিয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিলাম; পায়ে মাথা ঘসিয়া, মুখ রগড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পিঠে দুই-চারিটা লাথি পড়িল। সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করিলাম না, শুধু কাতর স্বরে কহিলাম, “ওগো, আমায় রাখো, ঠাঁই দাও, তাড়িয়ে দিয়ো না—” কঠিন গালি দিয়া স্বামী কহিল, “হবে না—তা কিছুতেই হবে না—একরাত্তির যেখানে কাটিয়ে এলি, সেইখানে ফিরে যা। এখানে তোর ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই!” কাঁদিয়া মিনতি করিয়া কত বুঝাইলাম, ওগো, আমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক—আমায় ঘরে ঠাঁই দিলে কোন দোষ হইবে না, কোন পাপ নয়! শুধু মুহূর্ত্তের ভুলে একবার পথে বাহির হইয়াছিমাত্র—শুধু সেই পাপ—তাহার কি মার্জ্জনা নাই? ওগো, মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর! নহিলে কোথায় দাঁড়াইব?

কিন্তু হায়, স্বামীর মন কিছুতেই গলিল না। চুলের মুঠি ধরিয়া সেই রাত্রে আবার সে আমায় পথে বাহির করিয়া দিল—দিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল। আমার মনে হইল, পাষাণ দিয়া কে যেন আমার সমস্ত পৃথিবীটাতে আড়াল তুলিয়া দিল। সব অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল।

সেই দ্বারের গোড়ায় পড়িয়া আমি মাথা খুঁড়িলাম—কত মিনতি করিলাম, কত কাঁদিলাম—মূক কাঠের দ্বার টলিল না, হেলিলও না। কঠিন অবজ্ঞায় নিশ্চল স্থির চক্ষে শুধু সে চাহিয়া রহিল।

কে আসিয়া হাত ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া দেখি, সারদা! আবার! সে যেন কি মন্ত্র পড়িল—আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কোন কথা না বলিয়া আবার তাহারই সঙ্গে আসিলাম। আবার সেই ঘর—সেই গারদ!

পতঙ্গকে যতই ফিরাও, আগুন লক্ষ্য করিয়াই সে ছুটিবে। আমার মনে কি ছিল, জানি না, আবার আমি সারদার ঘরে আসিয়া উঠিলাম।

ঘরে আমায় টানিয়া ফেলিয়া সারদা গালির বন্যা ছুটাইয়া দিল। পাথরের মতই আমি পড়িয়া রহিলাম। এ যেন কে কাহাকে কি-সব বলিতেছে! আমার কোন হুঁসও ছিল না। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কেবল থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

সারদা কথা শেষ করিয়া একটা লাথি মারিল। কিছু বলিলাম না। পদাহত কুকুরের মতই পড়িয়া রহিলাম। সারদা চলিয়া গেল—বাহির হইতে শিকলটা সে টানিয়া দিল।

তার পর কয়দিন ধরিয়া কি সে যুদ্ধ চলিল। প্রাণটা যেন শতখান্ হইয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। কখনও মনে হয়, আর পারি না, যাহা হয়, হোক্,—যে ঝড় আসে, আসুক—আর বাধা নয়! বাধা দিবার শক্তিও নাই! আবার মনে হয়, না, একবার সমস্ত তেজে জ্বলিয়া উঠি! নারীর সকল শক্তি জাগাইয়া তুলি! প্রাণপণ চেষ্টা করি! দেখি, কাহার সাধ্য, আমায় ধরিয়া রাখে! কিন্তু যাইব কোথায়? কোথায় ঘর—? কোথায় ঠাঁই? কে আমায় আশ্রয় দিয়া বাঁচাইবে?

সাত দিন অনাহারে পড়িয়া রহিলাম। শরীর দুর্ব্বল—মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে—কানের কাছে দিবারাত্র যেন প্রলয়ের হুঙ্কার ছুটিয়াছে! আমার মনে হইল, আমি মরিব। না খাইয়াই মরিব। মরিয়া ইহাদের সব দুরাশায় আগুন ধরাইয়া দিব—সব দুর্ব্যবহার, সব অপমানের শেষ হইয়া যাইবে।

কিন্তু অদৃষ্টে যাহার নরকের দাহ, সে মরিবে কি করিয়া! না খাইয়াও মরিলাম না। একদিন মনে হইল, এই কাপড়ের আঁচল গলায় বাঁধিয়া সব শেষ করিয়া দিই। গলায় আঁচল জড়াইলাম, ফাঁস কষিলাম, টানিলামও। কেমন আতঙ্ক হইল, আবার সে ফাঁস খুলিয়া ফেলিলাম—মরিতে পারিলাম না। মরিলে এ পাপের ভরা বহিয়া বেড়াইবে কে?

৪

"আকাশে সেদিন মেঘের বড় ঘন-ঘটা! খোলা জানালা দিয়া জলো হাওয়া হু-হু করিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। চোখ মেলিয়া আকাশের পানে আমি চাহিয়া ছিলাম। মেঘের পর মেঘ আসিয়া জমিতেছে—আকাশটার গায় কে যেন গাঢ় কালো কালি লেপিয়া দিতেছে। পৃথিবীর গায় যেটুকু আলো খেলিয়া বেড়াইতেছিল, সে আলোর রেখাটুকু এ কালির ঘন আঁধারে বুঝি সব মুছিয়া যায়! আমার প্রাণ যেন সে আঁধারে হাঁপাইয়া উঠিল! এমন সময় সারদা আসিল, ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "কি গো ঠাকরুণ, কাল ত খুব ঘোড়-দৌড় করালে। বলি, এমন করে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, কিন্তু বাছা। তাহলে পথ দেখ।"

এ-ও বলে, পথ দেখ! কোথায় কি পথ দেখিব, আর? কখনও ঘরের বাহির হই নাই। নারী-জন্ম লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই চিরটা কাল সারা পৃথিবীকে বসাইয়া কল্পনা করিয়া আসিয়াছি! জানালার ধারে দাঁড়াইয়া, ছাদে দাঁড়াইয়া, বাহিরের যেটুকু দেখিতে পাইতাম—যে ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকু—সেটুকু ত মুক্ত উদার আলোর উচ্ছ্বাসেই ভরা দেখিতাম—যেমন নিরালা, তেমনই উজ্জ্বল! জানিতাম না, সে ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে এমন নিষ্ঠুর বর্ব্বর জগৎ শুধু ধ্বংশ আর গ্রাসের ক্ষুধা লইয়া দারুণ ফুঁসিয়া বেড়াইতেছে! সে গণ্ডীর বাহিরে আসিলেই,—সর্ব্বনাশ!

সারদার কথায় ভয় পাইয়া দুই চোখে মিনতি ভরিয়া আমি তাহার পানে চাহিলাম। সারদা কহিল, "কিছু মুখে-টুখে দেবে না কি? এ ত ভাল আপদে পড়লুম, গা।" আমি ক্ষীণ স্বরে কহিলাম, "সে সব কথা আর আমায় বলো না, মাসী, তোমার পায়ে পড়ি—" আরও কি বলিতাম, জানি না। সারদা বাধা দিয়া কহিল, "মুখে কিছু দাও দেখি, বাছা! এমন করে কি মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিতে আছে? ছি—অবুঝ হয়ো না—"

পিপাসায় আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছিল। সারদাকে কহিলাম, "একটু জল দাও।"

সারদা কহিল, "খালি পেটে শুধু জলটা খাবে? তা আচ্ছা,—এনে দি, খাও। জিবটা গলাটা তবু ভিজুক। আজ সাত দিন ত দাঁতে কুটোটি কাটনি!"

সারদা জল আনিয়া দিল—পান করিলাম। বুকটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সজোরে পাত্রটা ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম,

"এ আমায় কি খাওয়ালে, তুমি?" সারদা হাসিয়া উঠিল, কহিল, "শুধু জলটা খাবে—তাই একটু সরবৎ—"

আমি কহিলাম, "কি এ সরবৎ! আমার বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠছে—পুড়ে যাচ্ছে! এ আমায় কি খাওয়ালে, তুমি? কি এ?" মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, ঘুমে চোখ ঢুলিয়া আসিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন চোখ চাহিলাম, বাহিরে তখন প্রলয়-কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। রুদ্ধ জানালার বাহিরে অধীর বায়ু ভীম গর্জ্জনে অট্টহাস্য করিয়া নাচিয়া ফিরিতেছিল। মুহুর্মুহু হাঁকিয়া বাজ উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতেছিল। আমি উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলাম। জলের ঝাট আসিয়া আমায় একেবারে ভিজাইয়া দিল। সমস্ত জ্বালা যেন সে শীতল স্পর্শে জুড়াইয়া গেল। ঠাণ্ডা জলো হাওয়ায় মাথার চুল এলাইয়া দিয়া বসিয়া আমি প্রলয়ের সে তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে লাগিলাম।

আবার সারদা আসিয়া দেখা দিল। সে কহিল, "তোমার জন্য গরম লুচি ভেজেছি, এনে দি। খানকতক খাও। ছি মা, আমার কথা শোন দেখি।"

আমি আপত্তি করিলাম না—আপত্তি করিবার শক্তি ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। সারদা খাবারের থালা লইয়া আসিল। আমি খাইতে বসিলাম। সারদা বকিতে সুরু করিল, "আহা, তোমার জন্য মরে লোকটা! সেদিন অত মার-ধোর করলে, উপদ্রব করলে, তবুও মুখে অষ্টপ্রহর তোমারই কথা লেগে আছে! তারও এ ক'দিন খাওয়া-দাওয়া ঘুচে গেছে! অত টাকার মানুষ—মনে করলে কত ফ্যাসাদ বাধাতে পারত—তা কিছু নয়—! সে দিন থেকে তোমার নাম-জপ সার করে সে বসে আছে।" আমি কোন কথা কহিলাম না। খাওয়া শেষ হইলে সারদা উচ্ছিষ্ট পাড়িয়া বিদায় লইল। আমিও তখন বাহিরের সে উদ্দাম বাতাসে আমার মনের রাশ ছাড়িয়া দিয়া উদ্দাম গতিতে ভাসিয়া চলিলাম।

আমায় ভালবাসে! কেন, দোষ কি! আমার ত নারী-জন্মের কোন সাধ, কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই। মনে কত-কি যে গড়িয়া রাখিয়াছিলাম! একটা বর্ব্বর পশুর হাতে পড়িয়া তাসের ঘরের মতই সে সব কোথায় উড়িয়া পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল! নূতন করিয়া সে ঘরটাকে যদি আবার বাঁধিতে চাহি ত তাহাতে কি ক্ষতি! আমার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিয়াছিল। দাউ দাউ করিয়া তাহার রক্ত শিখা শিরায় শিরায় নাচিয়া ছুটিয়াছিল। আমার ভিতর হইতে কে যেন গর্জ্জন করিয়া কহিতেছিল, এ আগুনে প্রলয়-যজ্ঞ সাধিয়া তোল্! সমস্ত বিশ্ব আজ তোরই-জ্বালা এ আগুনে জ্বলিয়া যাক! আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। তাড়াতাড়ি এলো চুলটা জড়াইয়া লইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। নিকটেই কোথা প্রচণ্ড হুঙ্কারে বাজ পড়িল। সারদার জীর্ণ গৃহ সে শব্দে ঝন্‌ঝন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

পিছনে কে ডাকিল, "সরযু—" চাহিয়া দেখি, সে রাত্রের পুরুষ-বেশী সেই পশুটা। আমি কিছু বলিলাম না। আমার মনে

হইল, বলিবার আজ কিছু নাই। এমন হেয় নির্লজ্জ পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেও ঘৃণা জন্মিল।

তার পর এক-নিশ্বাসে কম্পিত স্বরে অনেক কথা সে বলিয়া গেল! উপন্যাসে গল্পে কবিতায় নাটকে যে কথা কতবার পড়িয়াছি, বুঝিয়াও যে সব কথা বুঝিতে পারি নাই—ছায়ার মতই যে সব কথাগুলা মনের উপর দিয়া ভাসিয়া সরিয়া যাইত—হেঁয়ালির মতই সেই সব দুর্ব্বোধ অর্থহীন কথা! চুপ করিয়া সব আমি শুনিয়া গেলাম! গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল—প্রাণে একটা শিহরণ ছুটিয়া গেল। লোকটা বকিয়া শেষে কাঁদিয়া আমার পায়ে আসিয়া মাথা লুটাইল। আমি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। আমার এই পদ্মের মত সুন্দর কোমল পায়ে কি এ একটা কদর্য্য সামগ্রী পড়িয়া আছে!

আমার মনে হইতেছিল, স্বপ্ন—এ যেন স্বপ্নে কি-একটা সুর ভাসিয়া আসিতেছে! আহা, সে সুর বড় করুণ! সহসা কণ্ঠে করস্পর্শ অনুভব করিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, সজোরে কহিলাম, "সরে যাও—"

সে সরিয়া গেল। তার পর বেদনার, মিনতির কি সে কাতর অনুনয় ঝরিয়া পড়িল। বাহিরে প্রলয়ের বিকট হুঙ্কার তাহার সে কাতর অনুনয়ের মধ্যে কোথায় ডুবিয়া গেল। পরে আমার সব গোল হইয়া গেল। আমি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

যখন জ্ঞান হইল, তখন বুঝিলাম, ভিতরটা আমার এক-নিমেষে পাথর হইয়া গিয়াছে। ছোট যে দীপটি জ্বালিয়া নিজের ছোট মনটিকে আলো করিয়া রাখিয়াছিলাম, নিজেরই অসতর্কতায় সে দীপ উল্‌টাইয়া দিয়া ভিতরটাকে পুড়াইয়া একেবারে ছাই করিয়া ফেলিয়াছি! আমার ভিতরে যে নারী তাহার সকল গর্ব্ব, সকল ঐশ্বর্য্য লইয়া রাণীর সাজে বসিয়াছিল, একদণ্ডে তাহার সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়া তাহাকে একান্তই রিক্তা, পথের ভিখারিণী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। যে সরযু মার কোলে সহস্র আদরে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সে সরযু স্বামীর গৃহে সহস্র অনাদরেও মরে নাই, গলা-টিপিয়া সে সরযুকে আমি মারিয়া ফেলিয়াছি। মানুষ সরযু মরিয়াছে, আর তাহার অস্থি-কঙ্কাল পরিয়া এ একটা প্রেতিনী আজ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

অনুশোচনা হইল। মনের মধ্যে তীব্র আক্রোশ জাগিল। ঘরের কোণে মাটির দীপ জ্বলিতেছিল—তাহারই ক্ষীণ আলোয় দেখিলাম, সেই নরপশুটা আমারই পাশে পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে! একটা হাত আমার গায়ে পড়িয়া আছে। অত্যন্ত কদর্য্য ঘৃণ্য পদার্থের মতই হাতটা তাহার আমার অঙ্গ হইতে সরাইয়া দিলাম। তখন বসিয়া আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। সমস্ত পৃথিবীর উপর বিকট রাগ ধরিয়াছিল। মনে হইল, এমন একটা অভিশাপ যদি দিতে পারি আজ—এমন শাপ—উঠুক্, সারা বিশ্ব জ্বলিয়া উঠুক! যেখানে যত নর-নারী আছে, ঘর-দ্বার সমাজ-শ্মশান, পাপ-পুণ্য, আমার এই অবহেলিত অপমানিত নারীত্বের অভিশাপে সে সমস্ত জ্বলিয়া উঠুক—সমস্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যাক্। বাহিরে কড়কড় শব্দে বাজ গর্জ্জিয়া উঠিল। জীর্ণ

জানালার ফাটল দিয়া একটা আলোর ঢেউ ছুটিয়া ঘরে আসিয়া চকিতে নিবিয়া গেল। আমার মনে হইল, ঐ যে, বিশ্বের এক কোণে আগুন তবে লাগিয়াছে! আমার অভিশাপ ফলিয়াছে! এখনই সারা পৃথিবী ও আগুনে জ্বলিয়া উঠিবে—সঙ্গে সঙ্গে এই পশুটাও! আঃ, কি উল্লাস—কি আনন্দ! তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলাম। কিন্তু কোথায় কি—! চারিধারে নিবিড় অন্ধকার! আর ঝম্ ঝম্ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে! হায়, নারীত্ব! তাহার আবার অপমান! ও-সব কথার কথা, পাগলের রচা উপকথা!"

৫

সরযু বলিতে লাগিল, "তার পর পা যখন একবার পিছলাইয়াছে, তখন এক ধাপ হইতে অন্য ধাপে গড়াইতে বিলম্ব হইল না! আমারও তাই ঘটিল। সারদা তখন আমাকে আর বিন্দুকে আনিয়া একেবারে সহরের বুকে আসিয়া বসিল। ক্রমে আমার মত দুর্ভাগিনী সে আরও জড়ো করিল। আমার আর তখন চেতনা ছিল না। কোথায় চলিয়াছি, কোথায় গিয়া এ যাত্রার শেষ হইবে, পরিণামে কি হইবে, সে সব ভাবিবার অবসরও ছিল না। সারাদিন গল্প-গুজব, হাসি-তামাসা ও নিদ্রায় কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় সাজিয়া গুজিয়া দোকানের পণ্যের মতই খরিদদারের মন কাড়িবার চেষ্টায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সারদা দুই হাতে পয়সা লুটিতে লাগিল। এমনই ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে আমার আক্রোশ জন্মিল। এই দেহ দিয়া, মন দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া যে পয়সা উপার্জ্জন করিতেছি, কিছুই তাহার ভোগে আসে না—আর একজন দিব্য আরামে সে সব কুড়াইয়া লয়! না, ইহা ঘটিতে দিব না। এ পথে যখন আসিয়াছিই, তখন ভোগের পূর্ণ তৃপ্তি সাধিয়া লই! সারদাকে একদিন কথাটা বলিলাম—গালি দিয়া প্রথমে সে তাহা উড়াইয়া দিল। পরে আমি কাজেও যখন আমার সঙ্কল্প হাড়ে হাড়ে তাহাকে জানাইয়া দিলাম, তখন সে আর কোন শাসন বাকী রাখিল না। অন্ন কাড়িয়া, প্রহার করিয়া শোধ তুলিতে লাগিল। কাল রাত্রে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। মারিয়া সে আমার সব কাড়িয়া দুপর রাত্রেই পথে তাড়াইয়া দিয়াছে। শাসাইয়াছে, যদি কখনও আমি গহনাপত্র আদায়ের চেষ্টা করি ত আমাকে সে সহজে ছাড়িবে না—মিথ্যা মামলা সাজাইয়া জেল অবধি ঘুরাইয়া আনিবে!

কাল সেই রাত্রে পথে দাঁড়াইয়া আমার ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। কাল বুঝিয়াছি, আমি কোথায় ছিলাম, কি ছিলাম, আর আজ কি হইয়াছি! ঘরেই যাহার একমাত্র স্থান, ঘর ছাড়িয়া তাহার পক্ষে বাহির হওয়ার মত পাপ আর কিছু নাই! ঘরের মধ্যে লাথি খাইয়া পড়িয়া মরাতেও ঢের সুখ, ঢের গৌরব ছিল! কিন্তু বাহিরের এ বাতাস,—না, অসহ্য এ! যাই হোক, আমি আমার গহনা চাহি না, কিছু চাহি না—পাছে সে আবার কোন ফ্যাসাদ বাঁধায়, ইহাই আমার ভয়। আপনি তাহারই একট

কিনারা করিয়া দিন। ভগবান আপনার ভাল করিবেন।"

আমি কেমন তন্ময়ভাবে সরযুর কাহিনী শুনিয়া চলিয়াছিলাম। আমার মনে হইতেছিল, এ যেন একটা রচা গল্প শুনিতেছি! এ কি সত্য! নালিশ, মকর্দ্দমা, কাছারি, হাকিম, কোন কথাই আমার মনে ছিল না। শুধু কানের কাছে বাজিতেছিল, বেদনার এক গভীর সুর,—এক দুর্ভাগিনী নারীর করুণ আর্ত্তনাদ! অপমানিত নারীত্বের তীব্র হাহাকার!

সহসা বাহিরে কে হাঁকিল,—"কো-ই নালিশওয়ালা—" আমার চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি সরযুর দরখাস্ত লিখিয়া তাহাতে তাহার সহি করাইয়া হাকিমের এজলাসে ছুটিলাম।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পাখী বলে চোখ গেল

করুক রৌদ্র যতই ঝাঁঝাঁ, এমন খাসা নীলে মাজা
আকাশখানার ছাউনি তলে, সবুজকুঞ্জের কোমল তরুণ
পল্লবেতে আঁখি ঢেকে, সুরটি তুলে অতি করুণ,
পাখী বলে,—চোখ গেল।

বিলাপ-গাথায় বন-দূতীর নাড়ীগুলি অনুভূতির
মোচড় খেয়ে বুকে ঢালে অশ্রু-রক্ত ফোঁটা ফোঁটা;
দপ্‌দপিয়ে কেঁপে ওঠে স্নায়ু শিরা সরু মোটা।
পাখী বলে,—চোখ গেল।

পথের পানে চেয়ে বঁধুর চোখের কথাই, গীতি-চতুর!
গাইছ তুমি নিছক্ মধুর সুরটি ভেঁজে লতায় পাতায়।
অপার পারের পথটি চেয়ে, আমি কি গান গাইব গাথায়?
পাখী বলে,—চোখ গেল।

চোখের জ্বালার নীচে জ্বলে প্রাণটা; তা-ত কেউনা বলে!
মাটির কথাই ফুটুক গানে, খাঁটিটুকু সুরে ঢেকে।
মর্ম্ম-কথা বুঝবে বঁধু, গাওরে পাখী ডেকে ডেকে।
পাখী বলে,—চোখ গেল

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

চয়ন

লিওনিডাস আণ্ড্রীভ্

বর্ত্তমান যুগে, রুষ-সাহিত্যের দুইজন বিখ্যাত রথী আছেন। লিওনিডাস আণ্ড্রীভ্ ও ম্যাক্সিম গোর্কি। এই দুই জনের ভিতরে, ম্যাক্সিম গোর্কির নাম এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে! কিন্তু, সমধিক শক্তিধর হইয়াও, আণ্ড্রীভের নাম এখনও দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হইবার সুযোগলাভ করে নাই।

ওরেল্ নামক স্থানে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আণ্ড্রীভ্, এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন কলেজের ছাত্র, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ফলে, তাঁহার পরিবারবর্গ দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া উঠেন। আণ্ড্রীভ্, অতি অল্প মাহিনায় মাষ্টারি করিয়া আপনার লেখা-পড়া ও পেট চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেই আপনার তখনকার অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন :—"সেণ্টপিটার্স বার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কয় বৎসর, দারিদ্র্যের অন্ধকার যে কি জিনিষ, তাহা আমি ভাল করিয়াই টের্ পাইয়াছিলাম। আমি সর্ব্বদাই ক্ষুধার্ত্ত থাকিতাম এবং কখনও-কখনও আমার এমন সময়ও গিয়াছে, যখন আমি উপর-উপরি দুইদিন কিছুই খাইতে পাই নাই।"

তাঁহার প্রাথমিক সাহিত্য-সাধনা ফলবতী হয় নাই। পরন্তু, দারিদ্র্যের পাষাণ-ভার ক্রমে তাঁহার উপরে এতটা চাপিয়া বসিল যে, জীবনে তাঁহার ধিক্কার জন্মিল। তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন। আণ্ড্রীভ্ বলিতেছেন :—"১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, আমি নিজের মাথা টিপ্ করিয়া রিভলভার ছুড়িয়া নিস্ফল হইয়াছিলাম। আমি আহত হইলাম বটে, কিন্তু মরিলাম না। আরোগ্যলাভ করিবার সময়ে আমি আবার সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হইলাম, কিন্তু, তাহাও নিস্ফল হইল। আবাল্য আমি চিত্রাঙ্কন করিতে ভালবাসিতাম। চিত্রাঙ্কন করিয়া আমি যাহা রোজগার করিতে লাগিলাম,—তাহা তবু মন্দের ভাল। আমি কয়খানি মূর্ত্তি-চিত্র আঁকিলাম। সেগুলির প্রত্যেকখানি পাঁচ হইতে দশ রুবলে বিক্রী হইল।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মস্কো নগরে আইন-ব্যবসা অবলম্বন করিলেন, কিন্তু ভাগ্যদেবী সেখানেও তাঁহার প্রতি নির্দ্দয়তার পরিচয় দিলেন। তারপর, কিছুকাল ধরিয়া তিনি খবরের কাগজের রিপোর্টারের কাজ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তাঁহার লেখার উপরে সম্পাদকদের সদয় দৃষ্টি পড়িল। তিনি "Was He Mad?"* নামক গল্প প্রকাশ করিলেন। এই গল্পপ্রকাশ হইতেই তাঁহার দুঃখকষ্টের সমাপ্তি এবং যশের আরম্ভ।

* ভারতীর বর্ত্তমান সংখ্যায় এই গল্পটির অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

উক্ত গল্পটি, "Problem Story"। কঠোরতায় উহা এড্‌গার আলেন পো'র অপেক্ষা হীন নহে। এই অদ্ভুত গল্পটির জন্য সেন্টপিটার্স বার্গের মস্তিস্ক-বিশেষজ্ঞগণ, একটি বিশেষ সভার অধিবেশন করেন। গল্পের প্রধান নায়কের মানসিক অবস্থা লইয়া তাঁহাদের ভিতরে দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা চলিয়াছিল। চিকিৎসক-সমাজের মধ্যে পরস্পরের মতামতে বিশেষ বিভেদ ছিল। অবশেষে, সাময়িক-পত্রাদিতেও ঐরূপ আলোচনার সূত্রপাত হইল। ফলে, তাহা হ্যামলেটের মানসিক অবস্থা আলোচনার মত সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

এমিল ভার্‌হারেণ্‌

যে বেলজিয়ম আজ প্রতীচ্যের কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহার সন্তানগণ সুধু দেশভক্ত, সাহসী ও মহাবীর নহে; পরন্তু, তাহাদের উপরে কাব্য-লক্ষ্মীর করুণাও বড় অল্প নয়। ভার্‌হারেণ্‌, রোদেনবাচ্‌, চার্লস ভ্যান্‌ লার্বার্গ, মরিস্‌ মেটারলিঙ্ক ও গ্রিগর লে রয় প্রভৃতির মত প্রতিভাবানের জন্মভূমি হইয়া বেলজিয়ম আজ বিশ্বের দৃষ্টিপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেটারলিঙ্কের নাম পৃথিবীর কে না জানে? আবার, আধুনিক কাব্যের যাহা-কিছু সুমহান, যাহা-কিছু সুন্দর, ভার্‌হারেণের কাব্যের ভিতরে তাহা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে।

উপরে যাঁহাদের নাম করা গেল, তাঁহারা সকলেই ঘেন্টের College of Sainte-Barleeতে শিক্ষিত হইয়াছেন। ভার্‌হারেণ্‌ ও রোদেনবাচ্‌ উক্ত বিদ্যালয়ে একই সময়ে পড়াশুনা করিয়াছেন। অন্যান্য সকলে তাঁহাদের পর-যুগের ছাত্র। ভার্‌হারেণের জন্ম হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। আন্তওয়ার্পের পূর্ব্বে, স্কেল্‌ড্‌ নদীর তীরবর্ত্তী সেন্ট আম্যাণ্ড নামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান তিনি লুভেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-পড়া শেষ করিয়া ব্রুসেল্‌স্‌ নগরে কিছুদিন ওকালতির বৃথা-চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সেই আইনের মরুভূমি ভেদ করিয়া অবশেষে



এমিল্‌ ভারহারেণ্‌

কাব্য-কমলের অমল শোভা ফুটিয়া উঠিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়।

ভারহারেণের প্রতিভা যে কতটা উচ্চাদর্শের, তাহা লইয়া তাঁহার অনেক কবি-ভ্রাতা এবং বহু সমালোচক অনেক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তাঁহাদের সকলকেই একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যাঁহারা এখন ফরাসী-ভাষায় ভাবপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একজন সমালোচক এই বলিয়া তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি "অতীত ও বর্ত্তমান কালের তাবৎ ফরাসী কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" আর-একজন কহিয়াছেন যে, তিনি "আধুনিক মহাকাব্য-প্রণেতা কবির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।"

এমন কি টলষ্টয় পর্য্যন্ত,—তাঁহাকে মাতৃভাষা ত্যাগের জন্য উন্মার্গগামীদের দলে ফেলিয়া সাধারণের সুমুখে হাস্যাস্পদ করিবার সময়েও—"সম্মানিত নবীন কবি" বলিয়া তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারহারেণ্ বাল্যকালে স্বাস্থ্যকর 'ফ্লেমিস' মাঠ-ময়দানের ভিতরে জীবনযাপন করিয়াছিলেন; এবং একটা বলিষ্ঠ জাতির যে সকল গুণ থাকে তাহা তিনি জন্মকাল হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ও আজন্ম একটা প্রবল আবেগে পূর্ণ ছিল। যৌবনে তিনি অমিতাচারের বাসনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। তিনি সকল দিকেই নিজেকে একেবারে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন,—সঙ্গীদের ভিতরে, পড়াশুনার ভিতরে, শিল্পের ভিতরে, এমন-কি কামিতা ও পান-মত্ততার ভিতরেও তাঁহার একটা উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল। তাঁহার দেহ ও মনের শক্তিকে তিনি একেবারে শেষসীমা পর্য্যন্ত টানিয়া না লইয়া গিয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু তাঁহার এমন একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল যাহাতে তিনি চরম উচ্ছৃঙ্খলতার সঙিন মুহূর্ত্তে নিজের স্বরূপের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিতে পারিতেন। আজ তাঁহার ভিতরে সঙ্গীতের যে স্বরমিল পাওয়া যায় তাহা তিনি অদৃষ্টগুণে বা আকস্মিক ভাবে লাভ করেন নাই। পরন্তু, নিজের এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি সে পুরস্কার আদায় করিয়া লইয়াছেন।

উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তিনি আপনার পরিবারিক-জীবনের প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি আরও গভীর এবং তাঁহার আদর্শ আরও উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের সর্ব্বকালের ঐহিক ও নিজস্ব আকাংকে ভারহারেণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—শতাব্দী-পরিবর্ত্তনকালের য়ুরোপ, ভারহারেণের কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহা আমাদিগকে ও আমাদের যুগকে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছে; তাহা জীবনের সকল অংশের সমগ্র পরিধিকে সুক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে; তাহা আমাদের যুগের একটি গীতকাব্যময় 'বিশ্বকোষ' রচনা করিয়াছে। দর্শন কখনও কারুকে কবি করিতে পারে না বটে, কিন্তু কাব্যের ভিতরে দর্শন থাকিতে পারে। ভারহারেণের ভিতরেও তাহা আছে। আমরা কয়েকটি জায়গা তুলিলাম:—

"জ্ঞান ও দর্-কষার চেয়ে ভালবাসা ঢের্ ভালো। সব বিষয় জানিবার কৌতূহলের চেয়ে বিশ্বপ্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করার বেশী দাম। কারণ, সকলরকম জ্ঞানের মাঝে স্বার্থপরতা আছে, ব্যক্তিগত অভিমানের ঝাঁক্ আছে। কিন্তু প্রেমের মাঝে সে-সব কিছু নাই। আছে সুধু বিনয়—মহৎ বিনয়। অনেক জিনিষের সুমুখেই জ্ঞানকে একেবারে থামিয়া যাইতে হয়,—অন্ধকারে তাহার পথরোধ হয়। কিন্তু, প্রেম এবং আনন্দের ভিতরে থাকিলে আমাদের মানস-আদর্শ সীমার নাগপাশে বাঁধা পড়ে না। জ্ঞানের সাম্‌নে দরজা যার বন্ধ, প্রেমের সাম্‌নে তাহা একেবারে মুক্ত; এমন-কি, যাহা ক্ষুদ্র, প্রেম-গুণে তাহাও মহৎ হইয়া উঠে। এবং ক্ষুদ্রকে আমরা মহৎ হইবার যত অবকাশ দিব, আমাদের জীবন ততই অলঙ্কৃত হইয়া উঠিবে।"

ভাস্কর ট্রাউবেট্‌যকয়

প্রিন্স পল ট্রাউবেটযকয়ের পিতা স্লাভ জাতীয় এবং তাঁহার মাতা আমেরিকান। তিনি অতি সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিল্প-বিদ্যালয়ে গমন করেন। আপনার প্রতিভাগুণে তিনি চিত্র ও ভাস্কর্য্য,—এই উভয়বিধ কলাতেই পারদর্শী হইয়া য়ুরোপের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

যদিও ভাস্কর্য্যের প্রতি তাঁহার অধিক অনুরাগ, তথাপি তিনি যে-কয়খানি ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা প্রথমশ্রেণীর কলাবিদের উপযুক্ত। চিত্রকলার প্রতি তিনি যদি বেশী মনোযোগ দিতেন, তাহাহইলে অনায়াসেই এ-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি-চিত্রকর সার্জেন্টের বিষম প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইতেন।

ট্রাউবেটযকয়ের হস্তগঠিত মূর্ত্তিগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা একেবারে জীবন্ত। তিনি ললিতকলার নির্দ্ধারিত রীতি-পদ্ধতির একান্ত বিরোধী। "এ-রকম করিতে হইবেই, নহিলে বে-নিয়ম কাজ করা হইবে"—এ-সব কথাকে তিনি কিছুতেই আমোল দেন না। যেমন করিয়াই হোক,—যথার্থ প্রাণ-জিনিষটিকে ফুটাইতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত!

আধুনিক য়ুরোপের বহু বিখ্যাত প্রতিভাবানের নশ্বর মূর্ত্তি তাঁহার ভাস্কর্য্য-কলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া অবিনশ্বর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার করগঠিত টলষ্টয়, রোদাঁ ও আনাতোল ফ্রান্স প্রভৃতির মূর্ত্তি, প্রস্তর-পটে চিরকাল জীবন্ত থাকিয়া আমাদের বংশধরগণকে আনন্দদান করিবে।

"The Moscow Academy of Fine Art's"এর জন্য একজন প্রফেসরের আবশ্যক হওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে আহ্বান করেন। প্রথমটা তিনি এই অজুহাত দেখাইয়া নারাজ হন যে,—"যখন আমি নিজে কখনো শিক্ষকের সাহায্য পাই নাই, তখন আমি পরকে শিক্ষা দিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিনা।"

কিন্তু, পরে তিনি উক্ত শিল্পবিদ্যালয়ে



ট্রাউবেটর্‌কয় কর্ত্তৃক গঠিত তিনটি মূর্ত্তি

উপরে—নর্ত্তকী। মধ্যে—কামিনীমূর্ত্তি। নীচে—বার্ণার্ড শর প্রতিমূর্ত্তি।

কার্য্যগ্রহণ করিতে সম্মত হন। এই মত-পরিবর্ত্তনের কারণও তিনি নিজেই বলিয়াছেন:—"হঠাৎ আমার মনে হইল যে, বাঁধা আইনকানুনে ছেলেদের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়া যায়। আমি চেষ্টা করিলে, হয় ত তাহা নিবারণ করিতে পারি। শিল্পবিদ্যালয়ে গিয়া আমি দেখিলাম, প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতিতে শিল্পশালাটি এমন ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে যে, ছাত্রদের আর নড়িবার-চড়িবার ফাঁকটুকুও নাই। আমি তখনি সে-সমস্ত সরাইয়া ফেলিবার হুকুম দিলাম। ছাত্রদের বলিলাম, তাহারা যদি ক্ষমতার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে চায়, তবে আদর্শের জন্য একেবারে যেন প্রকৃতির কাছে যায়। প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতির বদলে, তাহাদিগকে আমি জীবন্ত আদর্শ দিলাম এবং তারপর তাহাদের কথা নিয়া আর আমার মাথা ঘামাইলাম না।"

পরিণামটা খুব চমৎকার হইল! ট্রাউবেটেযকয় যখন প্রফেসরের পদলাভ করেন, তখন তাঁহার ছাত্রসংখ্যা ছিল, পঞ্চাশজন। একবৎসর পরে দেখা গেল, ক্লাশে তিনজন মাত্র ছাত্র আছে।

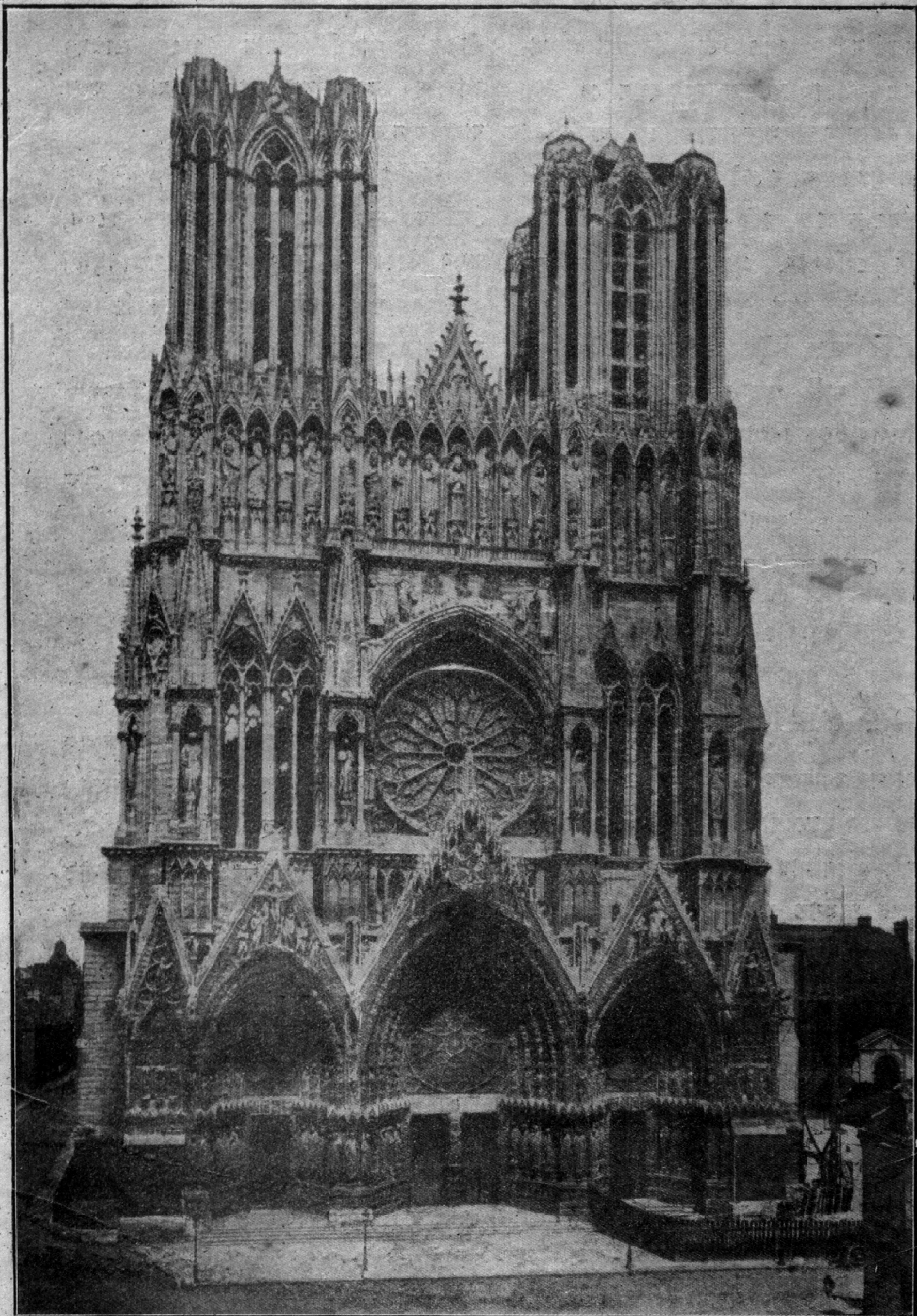
কিন্তু ট্রাউবেটযকয় ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া, আনন্দিতই হইলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন যে, নীর-ভাগ গিয়া ক্ষীরটুকুই অবশিষ্ট আছে!

রিম্‌সের মন্দির

রিম্‌সের মন্দির আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। য়ুরোপের মধ্যযুগের একটি অদ্বিতীয় শিল্পের নমুনা আজ ছদ্মবেশী বর্ব্বরতার কবলে পড়িয়া, কামানের গোলায় খণ্ডবিখণ্ড এবং অগ্নিশিখায় অঙ্গারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। অনেককে বলিতে শুনা যায় যে, রিম্‌সের মন্দির আবার মেরামত—এবং দরকার হয় ত, আবার নূতন করিয়া গড়া হইবে। হইতে পারে তাহা সম্ভব। কিন্তু, সে নূতন-গড়া মন্দির পুরাতনের একটি হুবহু নকল হইবে মাত্র। একালের কোন মিস্ত্রী, সেই নব সংস্করণের ভিতরে পুরাতনের প্রাণবস্তুটিকে ফুটাইতে পারিবে না। মধ্যযুগ যাহা দিতে পারিত, বিদ্যমান যুগ তাহা দিতে পারে না। পরন্তু, মধ্যযুগও আর আসিবে না।

এই মন্দিরের সঙ্গে ইতিহাসের অনেক অতীত-কাহিনী লূতাতন্তুর মত জড়ান আছে। ফরাসী-ইতিহাসের বহু বিচিত্র সমারোহ, ইহার খিলান-করা ছাদের তলায় অভিনীত হইয়াছিল। ফ্রান্সের রাজন্যবর্গ ইহারই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া, মুকুটধারণ করিতেন।

অনেক সমালোচকের মতে, গোথিক মন্দিরগুলির মধ্যে রিম্‌সের মন্দিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রিম্‌সের কারুকার্য্যের ভিতর ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ণ-বিকসিত রচনা-ভঙ্গী পাওয়া যায়। মধ্যযুগের প্রধান গির্জ্জাগুলি সব একই-রকম দেখিতে। খৃষ্টিয় ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসারেই সেগুলি তৈয়ারি হইত। এ হিসাবে রিম্‌সের মন্দিরের বিশেষ কোনও নূতনত্ব নাই। কিন্তু, রিম্‌সের সঙ্গে অন্যান্য



রিম্‌সের মন্দির

মন্দিরগুলির তুলনা চলে না। কারণ, মধ্যযুগের অন্যান্য মন্দির শতাব্দীব্যাপী পরিশ্রমের ফল। তাই তাহাদের ক্রমোন্নত দেহে নানাযুগের নানা রচনাভঙ্গীর লীলা দেখা যায়। আজকালকার মত, উক্ত মন্দিরগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট 'প্ল্যানে' গঠিত হয় নাই। শিল্পীরাও, এই পরিবর্ত্তনকে লুকাইতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু, রিম্‌সের মন্দিরে এরূপ বিভিন্ন রচনা-ভঙ্গীর ছাপ্ পাওয়া যায় না।

রিম্‌সের মন্দির বরাবর অসমাপ্ত আছে। মধ্যযুগে ইহার রচনাকার্য্য সমাপ্ত হইবার অবকাশ পায় নাই। যাহা অসমাপ্ত ছিল, তাহা সমাপ্ত করিবার জন্ম পরযুগে কোন চেষ্টাও হয় নাই। বেশীর ভাগ, ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে আগুন লাগিয়া, ইহার চূড়াগুলির উচ্চতা গৌরব খর্ব্ব করিয়াছিল।

ভাল লেখার কায়দা

গদ্য-রচনার কারু-কৌশলে ব্যালজ্যাক্ অপেক্ষা ফ্লবেয়ার যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যালজ্যাক্ অত্যন্ত অমনোযোগী লেখক। তাঁহার গদ্য একেবারেই সুশ্রী নহে। ভাষান্তরিত হইলেও তাঁহার রচনার ক্ষতি হয় না।

কিন্তু ফ্লবেয়ার গদ্যের মাঝে গীতধ্বনি ফুটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানটিতে যেমন সাজে, অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত তিনি ঠিক তেমনি শব্দটি বাছিয়া বসাইয়াছেন। পাঠকেরা ধরিতে-ছুঁইতে পারিবে না, এমন লুকানো তাল-লয়-ছন্দে তিনি তাঁহার গদ্যের সুর বাঁধিয়া দিতে চাহিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপ বলা হইত যে; 'পদ্য হইবে কিরূপ? না, সুন্দর গদ্যের মত।' কিন্তু, ফ্লবেয়ার গদ্যকে তখনই সুন্দর বলিয়া মানিতেন, যখন তাহা কবিতা না হইয়াও, সুন্দর পদ্যের মত হইয়া উঠিত।

কবিতার মত গদ্য রচনার জন্য তাঁহার যে চমৎকার পদ্ধতি ছিল, লেখকমাত্রেরই তাহার অনুসরণ করা উচিত। তিনি যাহা লিখিতেন, আপনি উচ্চস্বরে তাহা পাঠ করিয়া আপনিই শুনিতেন—কোথাও ছন্দভঙ্গ, কিংবা নীরস ধ্বনির সমাবেশ, কিংবা শব্দদ্বারা শব্দ ব্যাহত হইয়াছে কিনা।

মোপাশা বলিয়াছেন, "ফ্লবেয়ার, লেখা কাগজগুলি চোখের সুমুখে দৃষ্টি-রেখায় তুলিয়া ধরিয়া, কনুয়ে ভর দিয়া, আস্তে আস্তে তীক্ষ্ণস্বরে পড়িতে সুরু করিতেন। তিনি কান পাতিয়া আপনার গদ্যের ছন্দলীলা শুনিতেন। পরস্পরের সহিত জড়িতধ্বনি বা এমনি অন্য-কোন খুঁৎ তাঁহার কান এড়াইয়া গেল কিনা, তাহা বুঝিবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি থামিয়া যাইতেন। অনুপ্রাস উঠাইয়া দিতেন। দীর্ঘ পংক্তির মধ্যে মধ্যে কমা বসাইতেন।"

ফ্লবেয়ার নিজে বলিয়াছেন যে, "শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুযায়ী হইতে পারিলে বাক্যের সার্থকতা। বাক্যের ধারা তখনই ভাল যখন তাহা চেঁচাইয়া পড়িতে পার

যায়। খারাপভাবে লেখা পদ এ পরীক্ষায় টিঁকিতে পারে না; তোমার বুকে তাহা পাথরের মত চাপ দিবে, তোমার বুকের স্পন্দনকে তাহা বাধা দিবে,—এবং, এইরূপে, তাহা প্রাণহীন হইয়া পড়িবে।"

সকল লেখকেরই মনে রাখা দরকার যে, যখন চেঁচাইয়া পড়া যায়, ভাল গদ্যকে তখনই ভালভাবে উপভোগ করা যায়। চার্লস ল্যাম্বও বলিয়াছেন, "তুমি নিজেকে শ্রোতারূপ কল্পনা করিয়া লইয়া, যাহা-কিছু উচ্চ, তাহা আবৃত্তি করিয়া যাইবে।"

স্রোতের ফুল

(২৬)

কালীতারার খোকাকেও বাঁচাইয়া রাখা গেল না।

তাহার চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষা ঔষধ পথ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েকদিন ধরিয়া বিপিনকে অষ্টপ্রহর মালতীর কাছে-কাছেই থাকিতে হইতেছিল। খোকা মারা গেলে মালতী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাড়ীতে কেহ তাহাকে একটি সান্ত্বনাবাক্য বলিবে না জানিয়া বিপিন মালতীর কাছেকাছে থাকিয়া বই জোগাইয়া গল্প করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছিল।

গিন্নি বিপিনের এইসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখিয়া একদিন হরিবিহারীকে বলিলেন—তুমি ত কিছু দেখবে শুনবে না। বিপিন ত ছোট বৌএর বোনঝির কাছ-ছাড়া একদণ্ড হয় না; এখনো তাঁর বিয়ে না দেওয়া ভালো হচ্ছে না।

হরিবিহারী একখানা চিঠি দেখাইয়া বলিলেন—ঝিনুকপোতার হরিশবাবু এই চিঠি লিখেছেন; মাঘ মাসেই মেয়ের বিয়ে দিতে চান। ৯ই একটা দিন আছে, সেই দিনই বিয়ে হয়ে যাক, কি বল?

—হ্যাঁ, তা আর বলতে, শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব করা নয়। ভালো এক আপদ এসে জুটেছে বাড়ীতে।

হরিবিহারী বলিলেন—কতবার ত বলছি দাও না ঐ আপদ ঝাড়ে মূলে দূর করে চুকিয়ে।

—বাপরে! তা কি হবার জো আছে, তা হলে ছেলেও দেশত্যাগী হবে।

—হ্যাঃ অমন সব বেটাই দেশত্যাগী হয়।

—না না, তুমি বিপিনকে জান না। দুরন্ত একগুঁয়ে। ওকে ঘেঁটিয়ে কাজ নেই। শিগগির বিয়েটা দিয়ে ফেল, তখন যার জিনিষ সে বুঝে নেবে এখন।

—একবার ডাকাও ত বিপিনকে, তাকে একবার সব বলি।

সেইখান দিয়া বিনোদ একটা খরগোশ কোলে করিয়া লাফাইতে লাফাইতে যাইতে-

ছিল। গিন্নি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—ওরে ও বিনো, তোর দাদাকে ডেকে দে ত।

বিনোদ খরগোশের মতন তিন লাফে গিয়া বিপিনকে ডাকিয়া আনিল।

বিপিন আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেহই কোনো কথা বলিলেন না। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিপিন বলিল—আমাকে কি ডেকেছিলেন।

তখন হরিবিহারী বলিলেন—হ্যাঁ, বলছিলাম কি সমস্ত দিন বাড়ীর মধ্যে বসে বসে কি কর, একটু আধটু জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখলেও ত হয়।

বিপিন বলিল—আপনি বললেই দেখতে পারি। কিন্তু সে কি সুবিধা হবে? আমি কারো অন্যায় সহ্য করে চলতে পারব না। আমায় জমিদারীর ভার দিলে আমি দেওয়ান থেকে মুহুরী পর্য্যন্ত সব চোরগুলোকে জব্দ করে তবে ছাড়ব। প্রজাশাসনের নামে যে গরীবের ওপর অত্যাচার সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না। এই সমস্ত ক্ষমতা আমায় দিলে, আমি জমিদারী হাতে নিতে পারি।

—সে পরে যখন যেমন হবে বোঝা যাবে। এখন সুরু ত কর। কাল থেকে কাছারীতে যেও।

বিপিন বলিল—যে আজ্ঞে।

বিপিন চলিয়া যাইতেছিল, হরিবিহারী বলিলেন—ঝিনুকপোঁতার হরিশবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করেছি। ৯ই মাঘ একটা দিন আছে, সেই দিনেই বিয়ে হবে। তোমার কি চাই না-চাই দেওয়ানজিকে একটা ফর্দ্দ করে দিয়ো।

বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমার বিয়ে? এত শিগগির?

—হ্যাঁ! তাতে হয়েছে কি? তুমি এমন ভাব দেখালে যেন তোমায় ফাঁশির খবর শোনানো হল।

বিপিন বলিল—আমি ত এখন বিয়ে করতে পারব না।

—কেন? এর মধ্যে কঠিন ব্যাপারটা কি? পুরুষানুক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক যে কাজটা করে আসছে, তুমিই বা সেটা পারবে না কেন? তোমায় বিয়ে করতে হবে।

—বিয়ে আমি করব, কিন্তু ঝিনুকপোঁতায় নয়।

—কারণ?

—সে মেয়ে শুনেছি বড় ছোট।

—আরে ও কি চিরকালই ঐ রকম ছোট থাকবে নাকি? ছোট মেয়েই বড় হয়, না, একেবারেই বড় মেয়েই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়? আমি হরিশ বাবুকে কথা দিয়েছি। তোমাকে তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে।

বিপিন দৃঢ়স্বরে বলিল—তা আমি পারব না।

বিপিনের একবার মনে হইল বলিয়া ফেলে যে সে মালতীকে বিবাহ করিবে। কিন্তু তাহার প্রতি মালতীর মনের ভাব কিরূপ, মালতী তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে কি না, তাহা ত যাচাই করা হয় নাই। সুতরাং সে সঙ্কল্প তাহার দমন করিতে হইল এবং সেই সঙ্গে এ সঙ্কল্পও তাহার মনে উঠিল যে শীঘ্রই

মালতীর অভিমত জানিয়া লইতে হইবে। আর কোনো কথা না বলিয়া বিপিন সেখান হইতে প্রস্থান করিল। হরিবিহারী ও গিন্নি বিপিনের আচরণে অবাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে গিন্নি বলিলেন—ও পাগলের কথা তুমি শুনো না, সব ঠিক করে ফেলগে। ঝকমেরে ওকে বিয়ে করতে হবে।

হরিবিহারীর আহত অভিমান মনের মধ্যে গর্জ্জন করিতেছিল। তিনি বলিলেন—হাঁ, যাই দেওয়ানজিকে বলিগে সব ঠিকঠাক করতে।

হরিবিহারী বহির্বাটীতে প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দেশময় রাষ্ট হইয়া গেল ৯ই মাঘ বিপিনের বিয়ে।

আর ত সময় নাই। বিয়ের জোগাড়ের তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। কয় কাঠা চালের লাড়ু হইবে, কয় মণ হলুদ কোটা হইবে, কে পিঁড়িতে আলপনা দিবে, কে ছিরি গড়িবে, বিয়ের সময় কে কি বকশিশ পাইবে, ইহারই আলোচনায় অন্তঃপুর সরগরম হইয়া উঠিল। গিন্নি চীৎকার করিতে লাগিলেন—ওরে ডাক একবার ভুবন সরকারকে, জিনিষের ফর্দ্দ করে নিয়ে যাক। মটরা গয়লার বাড়ী দুধ দইয়ের বায়না করে আসুক। বংশী বাড়ীতে ক্ষীর করবে। মাছ কোটবার জন্যে পাটনী-পাড়ার লোক ঠিক করে আসুক। বিদেশিয়া হাড়ীর বৌ যেন সমস্ত দিন ধরে এই কদিন এইখানে হাজির থাকে। দাতা হাড়িকে পাতার কথা বলে দে। দেওয়ানজিকে বলে আয় মহলে মহলে পাতা, লকড়ি, ডালা, টুকরির চিঠি করে দেবে। আর দিন নেই যে, চটপট চটপট। যা যা সব, দাঁড়িয়ে হাঁ করে কি শুনছিস··· কিন্তু বিয়ে দেবে কে? ভট্‌চায্যি বট্‌ঠাকুর যে একঘরে। ওঁকে বলতে হবে যদি এখন জাতের ঘোঁট মিটিয়ে ফেলতে পারেন। তিনি বিয়ে না দিলে মন খুঁতখুঁত করবে। যদি একান্তই না হয়, ভাটপাড়া থেকে পুরুত আনতে হবে। সেও ত আর সময় নেই, আজকালের মধ্যেই সব ঠিক করে ফেলতে হবে যে। আমি একা যে কদ্দিক দেখি তার ঠিক নেই! কেউ যে দেখে শুনে করে কম্মে নেবে তা ত হবে না, সবই আমায় দেখতে হবে।··· ও ভাই ছোট বৌ, তুমি ভাই একটু দেখে শুনে করে কর্ম্মে নেও, তোমার কি পরের মতন আড়ষ্ট হয়ে থাকলে মানায়? যাও যাও।··· এমন দিনে কোথাকার একটা কুড়ুনে ছেলের শোকে মালতী ঘরে বন্ধ হয়ে রইল, সে বাইরের কাজকম্মগুনো ত করতে পারত।···

গিন্নির বকুনির বিশ্রাম নাই, ব্যস্ততার অন্ত নাই। তিনি দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঠাকুরঘরে গিয়া গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুরের দিকে গদগদভাবে চাহিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে ঠাকুর, শুভ কর্ম্মটি সুভালাভালি হয়ে যাক, তোমাকে ঘৃতপরমান্ন দেবো, হে লক্ষ্মীদনার্দ্দন, ডবল ভোগ দেবো।

সকল আনন্দ-কোলাহলের উপরে বিনির কোমল কণ্ঠের বাঁশি বড় উচ্চরবে বাজিতেছিল—ওলে বলদার বিয়ে হবে লে,

বৌ আচবে লে। ঢোল বাজবে লে। মজা হবে, মজা হবে!

বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া মায়ের হাত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া বলিল —মা বড়দার বিয়ে হচ্ছে, আমার কবে হবে?

গিন্নি হাসিয়া বলিলেন—এবার তুই মিতবর হবি, তারপর দাদার মতন ডাগর হলে বর হবি।

বিনোদের আনন্দ উপচিয়া পড়িতে লাগিল। সে লাফাইয়া লাফাইয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল—ওরে আমি মিতবর হব রে, বৌদিদিকে বিয়ে করতে যাব রে।

বিনি মুখ ফুলাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল —আমালো বিয়ে হবে, বল আসবে ড্যাংড্যাংশো হেঁইও, ড্যাংড্যাংশো হেঁইও!

আজ সকলেই আনন্দ করিতেছে। কিন্তু যাহার বিবাহ তাহার মুখ বড় গম্ভীর, বড় কালো, আষাঢ় মাসের অমাবস্তার মতো। শুভবিবাহের আশঙ্কায় তাহার মুখ এতটুকু হইয়া গিয়াছে। বিপিন পিতার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া লাইব্রেরীতে চলিয়া গেল, মালতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিল না। ইজি চেয়ারে শুইয়া হাতের কাছে যে একখানা বই পাইল তাহারই মধ্যস্থল খুলিয়া চোখের সম্মুখে ধরিল। সমস্ত বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি তাহার নিজেরই মনেরই মতো কালো কালো দাগে ভরা, সেখানে কোনো শৃঙ্খলা, কোনো অর্থ সে খুঁজিয়া পাইল না। বইয়ের পাতায় চোখ নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু কোনোটাই তাহার সম্ভবপর বোধ হইতেছিল না। সে চিন্তা করিতে লাগিল —এখন কর্ত্তব্য কি? জীবন-মরণের সমস্যা যখন উপস্থিত তখন লজ্জা করিলে ত আর চলিবে না, বিলম্ব করিলেও চলিবে না। বলিতে হইবে মালতীকে—সে ছাড়া আমাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। সে যদি স্বীকৃত হয়, উত্তম। নয় ত? ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ আপনি করিয়া লইবে।... নবকিশোর যদি এখন থাকিত।...লিখি একখানা চিঠি, সে যদি আসিয়া কোনো সদুপায় করিতে পারে।

বিপিন নবকিশোরকে চিঠি লিখিতে বসিল।

দাদাবাবুর বিয়ে—এতবড় সুখবরটা মালতীকে না শুনাইয়া রোহিণী কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিল না। আহা! সকলেই আনন্দ করিতেছে আর সেই বেচারী পরের একটা ছেলের শোকে এককোণে একলাটি পড়িয়া আছে, ইহা রোহিণীর স্বভাবসদয় হৃদয়ে সহ্য হইতে ছিল না। সে তাড়াতাড়ি মালতীর ঘরের কাছে আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল বিপিন আছে কিনা। যখন দেখিল বিপিন নাই তখন সে হাসিতে হাসিতে মালতীর ঘরের দ্বারদেশে হাত ছড়াইয়া চৌকাঠের দুদিক ধরিয়া দাঁড়াইল।

রোহিণীর এই আনন্দাতিশয্য দেখিয়া মালতীর হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল। রোহিণীর বিকশিত দন্ত-

আছে শূন্যদৃষ্টিতে মালতী তাহাই খুঁজিতে লাগিল।

রোহিণী চাপা গলায় বলিল—শুনেছ দিদিমণি, সুখবর!

মালতী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ভয়কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কি?

রোহিণী চোখ মিটমিট করিয়া ঘাড় দুলাইয়া বলিল—দাদাবাবুর বিয়ে!

মালতীর মুখ একেবারে রক্তহীন শাদা মৃত্যুবিবর্ণ হইয়া গেল। তথাপি চেষ্টা করিয়া হাসিয়া উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কবে রে? কোথায়?

—এই নউই। ঝিনুকপোঁতার জমিদারের মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি তোমার চেয়েও সুন্দরী! দাদাবাবুর খুব পছন্দ হয়েছে।

মালতী একথার কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই আনন্দসংবাদে তাহার মন কেন যে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, চোখ ফাটিয়া কেন যে জল বাহির হইতে চাহিতেছিল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—এমন আনন্দের দিনে আমিই শুধু আমোদ করতে পারব না। বিধাতা আমায় একলা থাকতেই পাঠিয়েছেন।

মালতীর গলা ধরিয়া আসিল। চোখ ফাটিয়া জল পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল—দূর হোক রোহিণী এখান থেকে, আমি একটু কাঁদিয়া বাঁচি।

এমন সময় বিপিনের পদশব্দ শোনা গেল। রোহিণী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মালতী চোখ মুছিয়া সংবৃত হইয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি একখানা বই খুলিয়া তাহারই উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

বিপিন ঘরের মধ্যে আসিল। তবু মালতী মাথা তুলিল না। বিপিন ডাকিল—মালতী!

আর রোধ মানিল না। মালতী উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিপিন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মালতী তুমি কাঁদছ কেন?

একথার উত্তর সে কি দিবে? সে কাঁদে কেন সেই যে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না।

বিপিন মনে করিল কেহ বোধ হয় মালতীকে কোনো কটু কথা কহিয়াছে। তাহাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া সে বলিল—দেখ মালতী, তোমায় যে লোকে বাক্যযন্ত্রণা দেয় তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু এ নিবারণ করবার একটি মাত্র উপায় আছে। সে উপায় তোমারি হাতে।

মালতী অশ্রুজালের মধ্য দিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। বিপিন বলিতে লাগিল—আমি যা বলতে যাচ্ছি তা হয়ত আমার বলা উচিত হচ্ছে না, তবু না বলে থাকতে পারছিনে। যদি তোমার মনে হয় অন্যায় বলেছি, তবে আমায় ক্ষমা কোরো, আর এ কথা যে আমি বলেছি তা তুমিও ভুলে যেও, আমিও ভুলে যাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করব...

মালতী বুঝিতে পারিতেছিল না বিপিন এমনতর ভূমিকা করিয়া কি বলিতে চাহিতেছে। সে আবার মাথা তুলিয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিল।

যখন আসল কথা বলিবার সময় আসিল তখন বিপিন খুঁজিয়া পাইতেছিল না কেমন করিয়া মালতীকে নিজের প্রণয় নিবেদন করিবে। মালতীর কেমন যেন একটা দূরত্ব আছে, তাহাকে কোনো কথা যেন অসঙ্কোচে বলা চলে না, তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। বিপিন একটু ইতস্তত করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—আমার বিয়ের কথা হচ্ছে......

বলিয়াই বিপিন বুঝিল কথাটা বড় বেমানান বলা হইল।

মালতীর বুকে খাঁত করিয়া আঘাত লাগিল। শক্ত হইয়া বলিল—শুনেছি।

বিপিন উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—জান কি মালতী, আমি কাকে আমার সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত মনে করি?

মালতীর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল; হৃদয় বুঝিবা ফাটিয়া পড়ে। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বিপিন ক্ষণেক থামিয়া মালতীর কোনো উত্তর না পাইয়া বলিতে লাগিল—মালতী, তুমি কি আমার সহধর্ম্মিণী হবে?

মালতী নির্বাক নিশ্চল। বিপিন মালতীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সাহস ও আশা পাইয়া মালতীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া মিনতির স্বরে বলিল—তবে মালতী, তুমি স্বীকার করছ?

আশায়, আনন্দে, প্রেয়সী রমণীর প্রথম করস্পর্শে বিপিনের অন্তরের রক্তপ্রবাহ চনচন করিয়া বহিতেছিল, মদের উত্তেজনায় যেন তাহার সমস্ত দেহযন্ত্র সজীব সজাগ হইয়া মালতীর একটি স্বীকারবাণী শুনিবার জন্য একাগ্র ব্যাকুলতায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। বিপিনের আবেগমত্ত পীড়নে মালতীর করপল্লব আলোহিত হইয়া ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মালতী আস্তে আস্তে বিপিনের হাত হইতে নিজের হাত সরাইয়া লইয়া বলিল—না।

এই অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া বিপিন স্তম্ভিত অবাক হইয়া গেল। আজ এক নিমেষে একটি না তাহার এতদিনকার পলে পলে সঞ্চিত সমস্ত আশা ছারখার করিয়া দিয়া গেল।

বিপিন অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—মালতী, আমার নিবেদনের নিষ্পত্তি কি এই চূড়ান্ত, না, আর-একবার ভেবে দেখবে?

মালতীর বোধ হইতে লাগিল যেন বিপিনের দৃষ্টি হইতে সকরুণ বেদনাভরা প্রণয় ক্ষরিত হইতেছে, যেন সে শুনিতে পাইতেছে বিপিনের কণ্ঠস্বরে তাহার অন্তরের অশ্রুগুলিই গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে এবং সে যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাহার আর্দ্র স্পর্শ অনুভব করিতেছে।

মালতী তাহার বড় বড় চোখ দুটি নীরব সান্ত্বনায় ভরিয়া বিপিনের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—আমি ভেবেই বলেছি।

বিপিন আর কিছু বলিবার পাইল না। দুজনেই নিঃশব্দ। উভয়ের মধ্যে যে একটি নিস্তব্ধতার পর্দ্দা পড়িয়া গেল তাহা কেহই সরাইতে পারিতেছিল না। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া বিপিন হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিপিন চলিয়া যাইবামাত্র মালতী বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় খুড়িমা সেখানে আসিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বিরক্ত ও আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—মালতী, অমন করে কাঁদচিস কেন? তুই ত' পেটে ধরিসনি, তবে তার জন্যে এত কান্নাকাটি কেন? তোর সকলই কি বাড়াবাড়ি বাপু?

খুড়িমার সাড়া পাইয়া মালতী তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল, যেন এ ব্যক্তি এখনি ক্রন্দনে লুণ্ঠিত হইতেছিল না। খুড়িমা বলিলেন—কার-না-কার ছেলে, তাকে দুদিন একটু নেড়েছিস বৈ ত না, তার জন্যে এত কেন রে বাপু! বিপিনের বিয়ে, চ কাজকর্ম্ম করবি, ঘরের কোণে বসে বসে আর রাতদিন কাঁদতে হবে না।

মালতী চুপ করিয়া রহিল, তাহার নড়িবার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া খুড়িমা বলিলেন—ভ্যালা একগুঁয়ে মেয়ে তুই যা হোক! এমন মেয়ে আমি বাপের জন্মেও দেখিনি!

এই বলিয়া খুড়িমা চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে মালতীর দুঃখের সমবেদনার আঘাতে যে দুঃখের তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে তাঁহারও চক্ষু দিয়া অশ্রু-ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

(২৭)

এদিকে যখন এইরূপ কান্নাকাটি চলিতেছিল তখন বিপিন ম্লানমুখে দ্রুতপদ-ক্ষেপে নিবারণ মুখুয্যের বাড়ীর উদ্দেশে যাইতেছিল।

নিবারণ মুখুয্যে তখন চণ্ডীমণ্ডপে ছেঁড়া মাদুরখানি বিছাইয়া অতিমলিন একটি ছোট তাকিয়া কোলে করিয়া তাহারই উপর ঝুঁকিয়া তামাক খাইতেছিল এবং গোবর্দ্ধন নূতন চিলিমে তামাক ভরিতে ভরিতে বলিতে-ছিল—হেঁঃ ভারি ত তোমার ক্ষ্যামতা! বিপনে আর কিশরে আমাদের কি নাকাল-টাই না করছে,—পথ চলতে গা ছমছম করে, ভয় হয় কখন মাথাটা ধরে গুঁড়িয়ে বা ফ্যালে। বাপ! সেদিন কি বাঁচনটাই বেঁচে গেছি!

নিবারণ বলিল—দাঁড়া না, এর শোধ তুলব তবে আমার নাম নিবারণ মুখুয্যে। ভটচায্যিদের একঘরে করেছি...

গোবর্দ্ধন বাধা দিয়া বলিল—হেঁঃ ভারি একঘরে করেছ! ভটচায্যি আর কিশরে দিব্যি জমিদারবাড়ী আনাগোনা করছে, এ আবার একঘরে কিসের?

নিবারণ বলিল—আহা দাঁড়ানা, সবুরে মেওয়া ফলে। বিপনেটা হল জমিদারের ছেলে, ওকে কি সহজে দাবানো যাবে। আগে এই বিয়েটিতে ভাঙচি দেবো, শিশু-পালের দশা করে ছাড়ব। বাছাধন বিয়ে করতে গিয়ে দেখবেন সে-মেয়ের বিয়ে অন্য জায়গায় হয়ে গেছে; আর অমনি মুখখানি আমসিপানা করে ফিরে আসতে হবে। আমি ঝিনুকপোঁতার হরিশবাবুকে চিঠি লিখব যে বিপনের জাত নেই, ও মোছলমানের ছোঁয়া মুরগী খায়; আরো দুচারটে মৃত্যুবাণ আজকে রাত্তিরে ভেবে ঠিক করতে হবে। হরিশচাটুয্যে যে হিঁদু, এ শুনে সে ককখনো মেয়ে দেবে না। তারপর এই সূত্র ধরে ওকে

একঘরে করা সহজ হবে। তখন বাপ কিছু আর ছেলের জন্যে সমাজে ঠেলা হয়ে থাকবে না, সে ছেলেকে দূর করে দেবে। এ আমি করব করব করব।

এমন সময় বিপিন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিবামাত্রই নিবারণের শরীর এমন কম্পিত হইয়া উঠিল যে হুকার আগুন ছড়াইয়া পড়িল। গোবর্দ্ধন চকমকিতে ঘা দিতে গিয়া লোহা দিয়া নিজের হাতেই নির্ম্মম আঘাত করিয়া ফেলিল। তাহাদের উভয়েরই মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কেহ কোনো কথা না বলিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল, আগুন পড়িয়া তাকিয়া মাদুর যে পুড়িতেছিল সে দিকেও কাহারো দৃষ্টি দিবার সাহসে কুলাইতেছিল না।

বিপিন তাহাদিগের ভয়বিহ্বল ভাব লক্ষ্য না করিয়াই উচ্চস্বরে বলিল—মুখুয্যে মশায়, আমাকে একঘরে করুন, আমি মোছলমানের ছোঁয়া খাই, আপনারা যাকে ধর্ম্ম বলেন তার কিছুই আমি মানিনে।

বিপিন মালতীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া অন্তরে যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহার বেদনা সে কিছুতেই কাহারো কাছে প্রকাশ করিতে পারে না, এমন কি সে নিজের কাছে পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল; এজন্য তাহার চিত্ত আর-একটা নূতন আঘাত পাইয়া নিজেকে বেদনায় প্রকাশ করিয়া ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেই-জন্যই সে তাড়াতাড়ি নিবারণের কাছে আসিয়া এমন জোর করিয়া একঘরে হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল। কিন্তু নিবারণ অতশত না বুঝিয়া মনে করিল, সর্ব্বনাশ! ছোঁড়াটা নিশ্চয় তাহার সব কথা শুনিয়াছে। তথাপি সাহস করিয়া প্রকাশ্যে বলিল—হেঁহেঁহেঁহেঁ, তোমায় কি একঘরে করতে পারি ভায়া? তোমাদের নিয়েই ত আমাদের সমাজ! তা তা যৌবনকালে ওরকম একটু আধটু অনাচার সকলেরই ঘটে থাকে, সেটা—ওর নাম কি—বয়েসের দোষ—বুঝলে কিনা ভায়া। ওটা বয়েস হলে—বুঝলে কিনা—সেরে যাবে।

—কিছুতে সারবে না মুখুয্যে মশায়, সে আশা করবেন না। আর যৌবনের ধর্ম্ম বলে আমায় রেহাই দিচ্ছেন, কিন্তু কিশোরের ত বার্দ্ধক্যের লক্ষণ দেখা যায়নি। তাকে ত একঘরে করেছেন? আমাকেও করুন, দোহাই আপনার।

—এঁ এঁ এঁ তা তা বুঝেছ কিনা, তাতে আর তোমাতে কি সমান হল? হেঁ হেঁ সে হল—বুঝলে কিনা— খোলাকাটা বামুনের ছেলে, আর তুমি হলে—ওর নাম কি—রাজরাজেশ্বর। তা তা—ওর নাম কি—তুমি যদি বল, তা হলে ভটচাযিদের—বুঝলে কিনা—আজই জাতে তুলে নি।

—না না না, অমন কাজ করবেন না, মুখুয্যে মশায়। বেশ করেছেন একঘরে করেছেন। আপনাদের সঙ্গে এক দলে থাকার চেয়ে একঘরে হয়ে থাকা ঢের ভালো। দোহাই আপনার, আমাকেও একঘরে করুন, বাবাকে বুঝিয়ে রাজি করুন—তিনি আমাকে বাড়ী থেকে দুর করে তাড়িয়ে দিন। আর আমার এই বিয়েটা যাতে না হয় তার চেষ্টাও আপনাকে একটু করতে হবে। এই

দুটো কাজই আপনি অনায়াসে করতে পারবেন।

নিবারণ মনে মনে বলিল—এইরে সব শুনেছে! প্রকাশ্যে বলিল—রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! শুভকর্ম্মে হন্তারক—বুঝলে কিনা—আমি কি হতে পারি। ওর নাম কি—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি, তোমরা যতটা মনে কর আমি তত বড় পাপিষ্ঠ নই—বুঝলে কি না ভায়া! আর আমার ক্ষমতাই বা কি যে আমি তোমার বিয়ে রোধ করব। রামচন্দ্র! রামচন্দ্র!

—আপনার ক্ষমতা খুব আছে মুখুয্যে মশায়, খুব আছে। আপনি হয়ত কস্তুরী মৃগের মতো নিজের গুণ নিজে জানেন না, কিন্তু আপনার মহিমা ত আমাদের কাছে ছাপা নেই। আপনি একখানা চিঠি লিখে দিলেই ত তারা পিছিয়ে যাবে।

—রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! আমি তত বড় পাষণ্ড নই—বুঝলে কিনা ভায়া। এও কি একটা কথা হল? রামচন্দ্র! আমি এদিকে চিঠি লিখি, আর—বুঝলে কিনা—তার পরদিন—ওর নাম কি—তোমার বাবার লেঠেল এসে আমার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে দিয়ে যাক আর কি! এত বড় বোকা নই আমি, বুঝলে কিনা ভায়া!

—আহা! আপনি চিঠিতে নাম দেবেন কেন? বেনামী চিঠি চালানোটাও ত আপনার একেবারে অনভ্যাস নেই।

—হেঁঃহেঁ ওর নাম কি জান, ও সমস্ত লোকের রচা কথা, কেউ ত কারো ভালো দেখতে পারে না। বেনামী চিঠি! রামঃ, রামঃ!

—তা হলে আপনি আমাকে এই অনুগ্রহটুকু করচেন না কিছুতেই।

নিবারণ মনে মনে বলিল—তুমি যখন এত ব্যস্ত হয়েছ তখন কিছুতেই একাজ আমার করা হবে না। তোমার যখন ওখানে বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই তখন ঐখানেই তোমার বিয়ে দিইয়ে তোমায় নাকের জলে চোখের জলে করব। কিন্তু শ্বশুরের মস্ত জমিদারীটা পাবে সেইটে যা অসহ্য। আচ্ছা দেখা যাবে, হরিশচাটুয্যেকে পুষ্যিপুত্তুর নেওয়াতে পারি কিনা। আমার ছোট ছেলেটাকে পুষ্যিপুত্তুর করে দিতে পারি তবে ঠিক রোগের মতন ওষুধ হয়।

নিবারণকে নিরুত্তর দেখিয়া বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল—ভাবছেন কি মুখুয্যে মশায়! যমের প্রাণীবধে সঙ্কোচ আজ এই নতুন দেখছি।

নিবারণ বলিল—না ভায়া, এমন অধর্ম্ম এ বুড়ো বয়সে আমা হতে হবে না, তা তুমি গালই দাও আর মন্দই বল—বুঝলে কিনা।

—আচ্ছা, তবে বসুন। আমি অন্য চেষ্টা দেখিগে—বলিয়া বিপিন প্রস্থান করিল।

খানিকক্ষণ পিতাপুত্র উভয়েই আড়ষ্ট নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া যখন আর বিপিনের কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, তখন নিবারণ একটু নড়িয়া বসিল, গোবর্দ্ধন একটু কাশিল। নিবারণ হস্তসঙ্কেতের সহিত চাপা গলায় বলিল—দেখ ত, দেখ ত, ছোঁড়াটা গেল কি না।

গোবর্দ্ধন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—হ্যাঁ, আমি যাই আর আমায় ক্যাঁক করে

ধরুক আর কি। তুমি উঠে গিয়ে দেখে এস না ?

—আরে না না, ভয় নেই, ও কিছু বলবে না ; বলত ত এসেই ধমাধম লাগিয়ে দিত।

এ কথার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গোবর্দ্ধন আস্তে আস্তে উঠানে নামিয়া দেখিতে লাগিল বিপিন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। তখন পিতাকে হস্ত সঙ্কেতে বিপিনের দূরে গমন জানাইয়া বলিল—ওঃ চলে গেছে।

তখন নিবারণ সাহস সঞ্চয় করিয়া কোমরের কাপড় একটু কষিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কাছাটা খুলিয়া গিয়াছিল, ঝুলিয়া পড়িল। তখন বাম পদের এক আঘাতে লম্বমান কাছাটিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দুই হাতে ধরিয়া লইল এবং যথাস্থানে গুঁজিতে গুঁজিতে উঠানে নামিয়া আসিল। যখন দেখিল বিপিন দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে তখন নিজের মনেই প্রকাশ্যে চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিল—হুঁ, এখন একবার হরিবিহারীর কাছে যেতে হচ্ছে। সে যেন আবার ছেলের আব্দার শুনে বেঁকে না বসে।

তখন তাহার পুরাতন বন্ধু আধময়লা সুতো সরা জ্যালজেলে চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া, ধনুকাকৃতি চটজোড়া পায়ে দিয়া ও কালো চিরকুট গামোছা ও একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া নিবারণ যাত্রা করিল।

বাড়ীর বাহিরে নিবারণের ভৃত্য ছিরে একটা আগড় মেরামত করিতেছিল। সে প্রভুকে দেখিয়া দন্তবিকাশ করিয়া বলিল—মুখুয্যে মশায়, কোয়ানে যাচ্ছ, দেখ ত ঠিক বাঁধেছি কি না ?

নিবারণ তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল—পাজি বেটা, নচ্ছার বেটা, শুভকাজে যাচ্ছি তুই পিছু ডাকাল। হারামজাদা, আজ তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন।

এই বলিয়া নিবারণ তাড়া করিয়া ছিরেকে মারিতে গেল। ছিরে দেয়ালের ধারে বসিয়া বেড়া বাঁধিতেছিল, পলায়নের উপায় না দেখিয়া আগড়খানা উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহার পাশে লুকাইল। নিবারণ অগ্রসর হইয়া তাহার লাঠি দিয়া ছিরেকে খোঁচা দিতে আরম্ভ করিল। দু একটা খোঁচা খাইয়াই ছিরে 'আউ' করিয়া আগড়খানা ছাড়িয়া দিল এবং সেই আগড় সজোরে নিবারণের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। নিবারণ সে আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না, আগড়ের ধাক্কায় একেবারে চিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং আগড়খানা তাহার উপর চাপিয়া পড়িল। নিবারণ পড়িয়া পড়িয়া মহা চীৎকার সোরগোল আরম্ভ করিল, কিন্তু ছিরে প্রভুকে সাহায্য না করিয়া সেখান হইতে চোঁচা দৌড় দিল। সেই সময় হীরালাল ধোবা সেই-খান দিয়া যাইতেছিল। সে মুখুয্যে মশায়কে তদবস্থ দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড়ের মোট ফেলিয়া আগড় তুলিয়া ধরিল। মুখুয্যে উঠিয়াই হীরালালের গালে এক চড়। হীরালাল থতমত খাইয়া আপনার অজ্ঞাত অপরাধ নির্দ্ধারণের জন্য মুখুয্যে মশায়ের

মুখের দিকে চাহিল। মুখুয্যে আস্ফালন করিয়া বলিল—ব্যাটা ধোবা, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা তুই আমাকে ছুঁলি? আমি শুভকর্ম্মে যাত্রা করে বেরিয়েছি তুই বেটা কোন্ আক্কেলে আমায় মুখ দেখালি!

হীরালাল অপ্রতিভ হইয়া অপরাধীর মতো হাতজোড় করিয়া বলিতে লাগিল —আজ্ঞে আমি জানতাম না যে আপনি কোথাও যাচ্ছেন। তাহলে কি কখনো আপনার সামনে আসি? ঘাট হয়েছে। মুখুয্যে মশায়, মাপ করুন।

নিবারণ অঙ্গের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—যা বেটা যা। মাপ করলেম।

হীরালাল যেন নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল। বাপরে! ব্রহ্মকোপ কি সামান্য!

গোলমাল শুনিয়া গোবর্দ্ধন বাহির হইয়া আসিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিল— বাবা, একটু বসে যাও।

নিবারণ সেইখানেই একটু উবু হইয়া বসিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গা দুর্গা শ্রীহরি শ্রীহরি বলিয়া উঠিয়া যাত্রা করিল।

বিপিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরিতেছে, পথে হীরালালের সহিত দেখা হইল। বিপিন হাসিয়া বলিল—কি হীরে কাকা ভালো আছ? তোমার মুখ এমন শুকনো কেন?

হীরালাল তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া সমস্ত কথা বলিল। বিপিন চক্ষু অগ্নিবর্ণ করিয়া বলিল—তোমায় নিবারণ শুধুশুধু মারলে আর তুমি অমনি চুপটি করে ফিরে এলে? তুমিও তাকে এক চড় কষিয়ে দিতে পারলে না?

হীরালাল জিভ কাটিয়া বলিল—এঁজ্ঞে অমন কথা বোলো না বাবা, আমার অপরাধ হবে, তিনি হল বেরাহ্মোণ! আর আমি নীচ জাত। পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করে এজন্মে ময়লা সাফ করে মরছি। আবার?

বিপিন বলিল—এই ত তোমাদের ভুল হীরেকা। জাতের আবার উঁচু নীচু কি? কাজেরই আবার ছোট বড় কি? তোমরা সব নিজেরা মাথা হেঁট করে কথাটি না বলে লোকের লাথি ঝাঁটা খাবে ত নীচ হয়ে থাকবে না? একবার মাথা তুলে দাঁড়াও দেখি, অন্যায় সহ্য না করবার মতো বল একবার করে নাও দেখি, তখন দেখবে তোমরা নিবারণ গোবরার মতন বামুনের চেয়ে ভালো বই মন্দ নও। ব্রাহ্মণ ত ভটচায্যি জ্যাঠা, তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকতে হয়। আর ওগুলো কি বামুন—ওগুলো চণ্ডালেরও অধম।…চল তুমি ফিরে…আমি দাঁড়িয়ে থাকব আর তুমি নিবারণের চুলের টিকি ধরে এক চড় কষিয়ে দেবে। আগড়চাপা পড়েছিল, তুমি তুলে উপকার করলে, তার পুরস্কার হল কিনা গালাগালি আর চড়!…চল তুমি।

—না বাবা আমি বামুনের সঙ্গে কাজিয়া করতে পারব না।—বলিয়া হীরা ধোপা সেখান হইতে দৌড় দিল।

বিপিন রাগে ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে যখন নিবারণের বাড়ীতে গেল, তখন বহু পুণ্যের জোরে নিবারণ হরিবিহারীর বৈঠকখানায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

নিবারণকে সমাগত দেখিয়া হরিবিহারী

গড়গড়ার নল ফরাশের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—এস এস খুড়ো এস। এই আমি মনে করছিলাম তোমাকে ডেকে পাঠাই। তুমি বাঁচবে অনেক দিন।

নিবারণ উদাসীন ভাবে বলিল—না বাপু, এ কলিকালে সংসারে বেঁচে সুখ নেই। যেকালে লোকে জাত মানে না, ধর্ম্ম মানে না, সেকালে কি থাকতে আছে।

হরিবিহারী হাসিয়া বলিলেন—না থেকেই বা করছ কি বল? মরেও ত নিস্তার নেই?—যমালয় আছে, যমদূত আছে, নরক আছে; তার চেয়ে ভালো জায়গায় ভালো লোকের হেফাজতে ত থাকা তোমার আমার ভাগ্যে হবে না। তারপর পুনর্জন্ম হলেও এই কলিকালেই ত জন্ম নিতে হবে! ফিরে জন্মে যে ব্রাহ্মণ হব, এমন কি মানুষই যে হব, তারই বা ঠিক কি? তার চেয়ে খুড়ো যে ক'টা দিন পারা যায় বেঁচে থাকাই ভালো, তাতে লাভ বৈ অলাভ নেই। এ জন্মটার সুখদুঃখ ওরই মধ্যে একরকম গা-সহা হয়ে অভ্যেস হয়ে এসেছে, আবার নতুন জীবনে নতুন ল্যাঠার কাজ কি?

নিবারণ দন্তবিকাশ করিয়া বলিল—হেঁহেঁহেঁ বলেছ ভালো বাবাজী, বলেছ ভালো। হাজার হোক রাজবুদ্ধি কি না! তবে ওর নাম কি ধর্ম্মের গ্লানি শুনলে বড় মনকষ্ট হয়—বুঝলে কি না, তাইতে খেদে মরণের কথা বেরোয়, নইলে বাঁচতে কার অসাধ বল। এই দেখ না এই অল্পক্ষণ আগে—ওর নাম কি—বিপিন ভায়া আমার বাড়ী গিয়ে—বুঝলে কি না—বড় গলা করে বলতে লাগলেন আমি মুরগি খাই, গরু খাই, মোছলমানের এঁটো খাই! রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! এসব শুনলে গায়ে জ্বর আসে কি না বল ত বাবাজী?

হরিবিহারী এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পাল্টা প্রশ্ন করিলেন—কেন কেন? বিপিন আজ হঠাৎ তোমার বাড়ী গিছল যে?

নিবারণ তুড়ি দিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিল—আ হা হা হা—সে বাবাজী অনেক কথা, তাই বলতেই ত এসেছি। ভায়া আমায় গিয়ে ধরে বসেছিলেন যে দাদা মশায়, আমি ত বাবাকে বলতে পারব না, আপনি একবার বাবাকে বলবেন এ বিয়েতে আমার মত নেই। আমি মালতীকে বিয়ে করব ঠিক করেছি।—আমি বললাম, আরে পাগল, তাও কি কখনো হয়, সব ঠিক-ঠাক, কর্ত্তা কথা দিয়েছেন, এখন কি পাগলামি করতে আছে? তখন ভায়া রেগে চটেই বললেন আপনি একবার বাবাকে বলবেন ত, তারপর বাবা না শোনেন ত আমি দেখে নেব। যে বিয়েতে—ওর নাম কি—ব্রজকিশোর স্মৃতিরত্ন পুরোহিত হবে না, ওর নাম কি নবকিশোর বরযাত্র যাবে না; সে বিয়ে আমি কখনো করব না। আমি ঝিনোকপোঁতায় হরিশ বাবুকে বেনামি করে লিখে দেবো যে আমি গরু খাই, মুছলমানের এঁটো খাই!... বল্লে না পেত্যয় যাবে বাবাজী, ভায়ার সে কুহুনি কি? এই মারে ত এই মারে। তখন—বুঝলে কি না—আমি স্বীকার করলুম যে তোমার বাবাকে বলব। তখন—ওর নাম কি—একটু ঠাণ্ডা হয়ে ভটচাযিদের বাড়ীর দিকে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি তোমায় খবর দিতে

এসেছি, সাবধান, শুভকর্ম্ম পণ্ড করে না দেয়। এর ভেতরে নিশ্চয় ঐ ভটচাযিদের টিপ আছে, আর ভায়ারও বোধ হয় মালতীর ওপর মন পড়েছে। দেখো বাবাজী শেষ কালটায় যেন তাকেই বিয়ে না করে ফেলে।

হরিবিহারী চিন্তিত হইয়া অন্যমনস্কভাবে বলিতে লাগিলেন—আমি যার তোমায় ডেকে পাঠাচ্ছিলাম তোমায় বলব বলে যে ভটচায্যিদের জাতে তুলে নেওয়া যাক। কিন্তু এ যে একটা কেমন খটকা লাগছে। ঐ গোঁয়ারগোবিন্দ কিশোর ছোঁড়া কি কাণ্ডখানাই না করছে বিপিনকে নিয়ে! তাহলে ভটচাযিরা যেমন আছে তেমনি থাক, কি বল?

—হ্যাঁ সে আর বলতে? এখন কি ওদের জাতে তুলতে আছে?

—কিন্তু পুরুতের কি হবে?

—তার আর ভাবনা কি? ভাটপাড়ায় হাজার গণ্ডা পুরুত জিয়ানো রয়েছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ বলেছ। তাহলে তুমিই যা হোক দেওয়ানজির সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিকঠাক করে দিয়ো খুড়ো।

—এ আর অত করে বলতে হবে কেন? এ ত আমাদেরই কর্ত্তব্য।

নির্ঝঞ্ঝাটপ্রিয় হরিবিহারী নিজেকে কোনো চেষ্টা করিতে হইবে না জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপর বলিলেন—কিন্তু এদিকে বিপিনকে কি করা যায়?

নিবারণ বলিল—বিপিনকে ডেকে তুমি খুব কড়া করে ধমকে দাও। ছোটগিন্নি আর মালতীকে বাড়ী থেকে কোথাও সরিয়ে ফেল। ছোটগিন্নির টিপেই এই সব হচ্ছে। কিন্তু খবরদার বাবাজী আমি যে তোমায় কিছু বলেছি তা যেন সে টের না পায়, তাহলে আমার ধড়ে প্রাণ থাকবে না। হতভাগা ছোঁড়াগুলো বলে কি না যে, গোবধ হবে বলে আমায় কিছু বলে না। তা গরুও যা ব্রাহ্মণও ত তাই, শাস্ত্রেই আছে গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ। কিন্তু গরুই যখন খেয়ে ফেলছে, তখন গো হয়েও ত এদের হাতে নিস্তার নেই। দোহাই বাবাজী আমার নাম কোরো না। আর এক কাজ কর, আমায় বরং ঝিনুকপোঁতায় পাঠিয়ে দাও, আমি সেখানে বসে বসে সে দিকটা আগলাব এখন।

হরিবিহারী উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—এ অতি উত্তম পরামর্শ। তুমি দেওয়ানজির কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে কালই রওনা হয়ে যাও। দেওয়ানজিকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

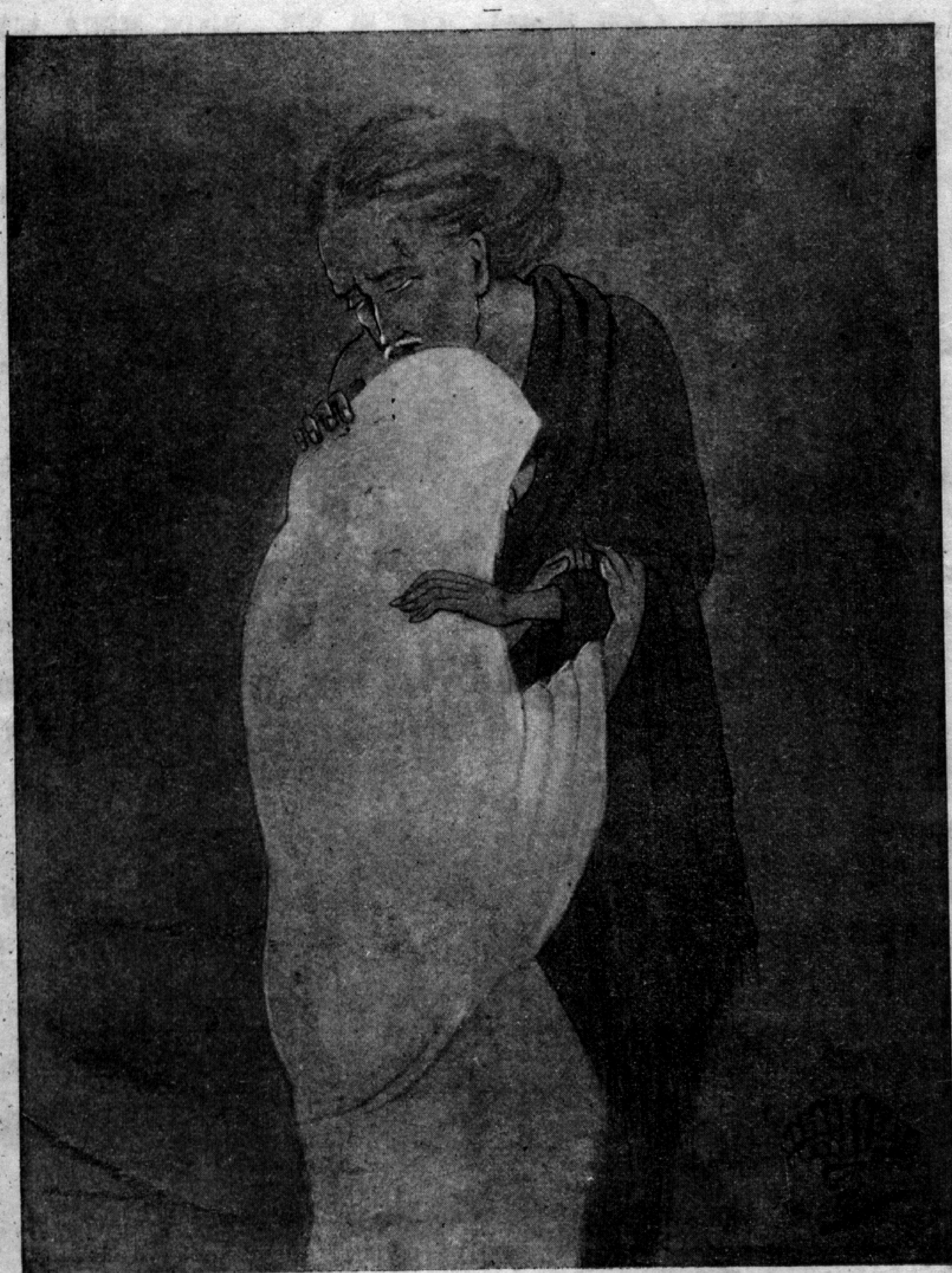
হরিবিহারী একটু চিরকুট লিখিয়া দিলে 'হরি হে তোমারি ইচ্ছা' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া নিবারণ এক ঢিলে অনেকগুলি পাখী মারিয়া উৎফুল্ল মনে প্রস্থান করিল।

নিবারণ চলিয়া গেলে হরিবিহারী বলিলেন—রামধন, যা ত একবার ছোট বাবুকে ডেকে আন ত।

রামধন বিপিনকে ডাকিয়া আনিল।

বিপিন ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বাবা ডাকছেন?

—হ্যাঁ। এসব কি ছেলেমানুষী হচ্ছে, বিয়ে করব না, বিয়ে ভেঙে দেব, হ্যান ত্যান? এসব কি?



প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

বিপিন নীরব। হরিবিহারী বলিতে লাগিলেন—বাপের সুপুত্তুর হয়ে বিয়েটা করে এস, তার পর যা খুসি কোরো না, তাতে ত তোমায় কেউ বারণ করবে না। একটা বিয়ে ত করতে হবে।

বিপিন বলিল—এ বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না।

হরিবিহারী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—শুনছি ছোট বৌএর বোনঝিকে বিয়ে করবার জন্তে ক্ষেপেছিস। এ সমস্তই ছোট বৌএর কারসাজি! দিচ্ছি এখুনি ওদের বাড়ী থেকে খেদিয়ে......

বিপিন বলিল—আপনি খুড়িমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছেন। আপনি তাঁদের প্রতি-পালন করতে বাধ্য। আমি আপনাকে এ অন্যায় কখনো করতে দেবো না। আপনি তাঁদের তাড়িয়ে দিলে আমাকেও আপনার বাড়ী ছেড়ে ওঁদের সঙ্গেই যেতে হবে!

হরিবিহারী একেবারে উন্মত্তের মতো হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কী! আমার মুখের ওপর উত্তুর! যা না তুই শুদ্ধ আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে! আমায় কী ভয় দেখাচ্ছিস! আজই দূর হয়ে যা!

অভিমানী বিপিনের চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, তাই হবে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সম্মিলন

[এবার বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মিলনকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস। উক্ত চারি বিভাগে চারিজন সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনের মূল অধিবেশনের সভাপতি মহাশয়ের এবং শাখা বিভাগসমূহের সভাপতি মহাশয়গণের অভিভাষণ সঙ্ক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হইল।]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বোধন

আমাদের বাঙ্গলার প্রাচীন গৌরবের কতকগুলি কথা লইয়া আলোচনা করিব। পুরাণ কথা শুনিতে সকলেরই ভাল লাগে। সেই ভরসাতেই আমার এই সম্বোধনে আমি কেবল প্রাচীন গৌরবেরই আলোচনা করিব। কারণ, সুখের স্মৃতি সকল সময়ই মধুর।

* হস্তি-চিকিৎসা

খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী পোষা খুব চলিত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। তাঁহার ভাই দেবদত্তেরও হাতী ছিল। উদয়ন রাজার "নলাগিরি" নামে একটি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। তাঁহার

নিজের ও চণ্ডপ্রদ্যোতের বড় বড় হাতীশালা ছিল, হাতী ধরারও খুব ব্যবস্থা ছিল।

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ বঙ্গবাসীর সুপরিচিত। তিনি রাজা দশরথের জামাই ছিলেন। তাঁহার একবার সখ হইল, 'হাতী আমার বাহন হইবে।' কিন্তু হাতী কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। খোজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা এক প্রকাণ্ড আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম "শৈলরাজাশ্রিত", "পুণ্য" এবং সেখানে "লৌহিত্য সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে।" সেখানে তাহারা অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিকেও দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীর দল রক্ষা করেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে খবর দিল। রাজা হাতীর দলটি তাড়াইয়া লইয়া চম্পানগরে উপস্থিত হইলেন এবং হাতীদের বাঁধিয়া রাখিয়া ও খাবার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ঋষি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাতীগুলি নাই। অনেক দিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাঁধা আছে, তাহারা রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে, নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতা, পাতা, শিকড়, মাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়া তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানারূপে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর পরস্পর মিলনে, তাঁহার ও তাঁহার হাতীদের মহা আনন্দ। রাজা সব শুনিলেন,—তিনি কে, কি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর মুনি আপনার পরিচয় দিলেন। "আমি হাতীদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য। আমি হাতীদের পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম, সেই জন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পালকাপ্য বলে। আমি হস্তি-চিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।" তাহার পর রাজা তাঁহাকে হাতীদের বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হস্তীর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রের নাম "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" বা "পালকাপ্য"। উহা প্রাচীন সূত্রের আকারে লেখা। পালকাপ্য বঙ্গদেশের লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের ধারে, সমুদ্র ও হিমালয়ের মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি ও শিক্ষার স্থান। যদিও অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরে তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ লেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসলে বাঙ্গলা দেশেরই লোক। এই যে প্রকাণ্ড জন্তু হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া মানুষের কাজে লাগান, ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা—এ সমস্তই বাঙ্গলা দেশে হইয়াছিল।

ম্যাক্সমূলার যাহাকে "Suttra period" বলেন, সেই সময়েই পালকাপ্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিউলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব ও বোধায়ন খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সূত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহারও

আগে বশিষ্ঠ ও গোতমের সূত্র লেখা হয়। পালকাপ্যও সেই সময়েরই লোক বলিয়া বোধ হয়।

খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যদি বাঙ্গলা দেশে হস্তি-চিকিৎসার এত উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়।

২। নানা ধর্ম্ম-মত

পূর্ব্বে অনেক জায়গায় আভাস দিয়াছি যে, জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, আজীবক ধর্ম্ম এবং যে সকল ধর্ম্মকে বৌদ্ধেরা তৈর্থিক মত বলিত, সে সকল ধর্ম্মই বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন আচার, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন রীতি, প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। আর্য্য জাতির ধর্ম্মের উপর উহা ততটা নির্ভর করে না। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়। এরূপ মনে করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। এই সকল ধর্ম্মেরই উৎপত্তি পূর্ব্ব-ভারতে বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির অধিকারের মধ্যে, যে সকল দেশের সহিত আর্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—সে সকল দেশের বাহিরে। এ সকল ধর্ম্মই বৈরাগ্যের ধর্ম্ম। বৈদিক আর্য্যদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের ধর্ম্ম। ঋগ্বেদে বৈরাগ্যের নাম গন্ধও নাই। অন্যান্য বেদেও যাগযজ্ঞের কথাই অধিক, সেও গৃহস্থেরই ধর্ম্ম। সূত্রগুলিতেও গৃহস্থের ধর্ম্মের কথা। কিন্তু আমরা যে সকল ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, তাহাদের সকলেই [illegible] আশ্রম ত্যাগ কর। গৃহস্থ-আশ্রমে কেবল দুঃখ। গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম, জরা, মরণ—এই ত্রিতাপ নাশ হয় তাহারই ব্যবস্থা কর। এ সব ত গেল দর্শনের কথা, চিন্তা-শক্তির কথা, যোগের কথা।

বাহিরের দিক হইতেও দেখিতে গেলে, এই সকল ধর্ম্মের ও আর্য্যধর্ম্মের আচার-ব্যবহারে মিল নাই।

ইহারা এত নূতন জিনিস কোথা হইতে পাইল? এ সকল নূতন জিনিস যখন আর্য্যদের মতের বিরোধী, তখন তাহারা আর্য্যদের নিকট হইতে সে সব পায় নাই। উত্তর হইতে তাহারা এই সব জিনিস পাইতে পারে না, কেননা উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত। হিমালয়ের উত্তর দেশের লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। দক্ষিণ হইতেও ঐ সব জিনিস আসিতে পারে না, কেননা দক্ষিণের সহিত তাহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই; বরং বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যাহা কিছু উহারা পাইয়াছে, পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে এবং পূর্ব্বাঞ্চলেই আমরা এই সকল নূতন জিনিস কতক কতক এখনও দেখিতে পাই।

জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর পূর্ব্বাঞ্চলেই ভ্রমণ করিতেন। বার বৎসরের পর তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া বৈশালিতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারও পূর্ব্বের তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ নানা দেশে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণও পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক। শেষ জীবনে তিনি সমেতগিরিতে বাস করেন—সমেতগিরি

পরেশনাথ পাহাড়। তাঁহারও পূর্ব্বে যে ২২ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতেই বাস করিতেন ও সেইখানেই দেহ রক্ষা করেন।

সাংখ্য-মত এই সকল ধর্ম্মেরই আদি। সাংখ্যের দেখাদেখিই জৈনেরা কেবলী হইতে চাহিত—কৈবল্য চাহিত। বৌদ্ধেরা বলেন, তাঁহারা সাংখ্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সাংখ্য-মত আর্য্য-মত নহে, উহার উৎপত্তি পূর্ব্বদেশে। সাংখ্যকার কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে, পঞ্চশিখের বাড়ীও পূর্ব্বাঞ্চলে।

৩। রেসম

বাঙ্গলার তৃতীয় গৌরব রেসমের কাজ। ইউরোপীয়েরা চীন দেশ হইতে রেসমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেসমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার চীনই রেসমের জন্মস্থান, চীনেরাও তাহাই বলে। তাহারা বলে খৃষ্টের ২৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে চীনের রাণী তুঁত গাছের চাস আরম্ভ করেন।

কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাঙ্গলা দেশে খৃষ্টের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রেসমের চাষ খুব হইত। রেসমের খুব ভাল কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ" অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে সেই পশমের কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ"। সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত—মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণ-কুড্যে। এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুড্যের "পত্রোর্ণ" সকলের চেয়ে ভাল। ইহা হইতেই কৌষেয় বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনের পট্ট-বস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল।

মগধ—দক্ষিণ-বেহার আর পৌণ্ড—বারেন্দ্রভূমি। সুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেসম এখন হয়, তাহা ভেরেণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণ-সুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও মুর্শিদাবাদ ও রাজ-মহল লইয়া। এখানকার মাটী সোণার মত রাঙ্গা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণসুবর্ণ, কিরণ-সুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেসমের চাষ হয় এবং এখানকার রেসম খুব ভাল। কৌটিল্য যে ভাবে চীন দেশের পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি চীন দেশের রেসমী কাপড় অপেক্ষা বাঙ্গলার রেসমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেসমী কাপড় যে চীন হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না! চীনের রেসম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাঙ্গলার রেসমের তুঁতগাছের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং বাঙ্গালী যে, রেসমের চাষ চীন হইতে পাইয়াছে একথা বলিবার যো নাই। রেসমের চাষ বাঙ্গলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। ভারতবর্ষের অন্তত্র যে, রেসমের চাষ ছিল, একথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাঙ্গলায় ও মগধেই রেসমের চাষ ছিল। কারণ, পৌণ্ড ও বাঙ্গলায়, সুবর্ণকুড্যও বাঙ্গলায়। যদি বাঙ্গালীরা সকলের আগে রেসমের চাষ আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহাদের গৌরবের

সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্ব্বপ্রথম উহার চাষ আরম্ভ হয়, তথাপি বাঙ্গালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

৪। বাকলের কাপড়

বাঙ্গলার চতুর্থ গৌরব বাকলের কাপড়। প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। কটকের জঙ্গল-মহলে এখনও দু এক জায়গায় লোকে পাতা পরিয়া থাকে। তাহার পর লোকে বাকল পরিত; গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিত এবং কাঁধের উপর একখানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। তাহার পর লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে সূতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত; বাকল হইতে যে কাপড় হইত, তাহার নাম "ক্ষৌম," উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম "দুকূল।"

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বাঙ্গলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা হইত। বঙ্গে "দুকূল" হইত, উহা শ্বেত ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। পৌণ্ড্রেও দুকূল হইত, উহা শ্যামবর্ণ ও মণির মত উজ্জ্বল। সুবর্ণকুড্যে যে দুকূল হইত, তাহার বর্ণ সূর্য্যের মত এবং মণির মত উজ্জ্বল।

৫। থিয়েটার

প্রাচীন বাঙ্গলার পঞ্চম গৌরব থিয়েটার। থিয়েটারের সেকালের নাম "প্রেক্ষাগৃহ" বা "পেক্‌খা ঘরঅ"।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রবৃত্তির অনুসারে নাটকের প্রবৃত্তি চারিরকম ছিল। সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওড়মাগধী। দাক্ষিণাত্যের লোকে নাটকে নৃত্য, গীত, বাদ্য বেশী বেশী দেখিতে ভালবাসিত, তাহারা অভিনয়ও ভালবাসিত, কিন্তু উহা চতুর, মধুর ও ললিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরও একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওড্র মাগধী। ওড়মাগধী প্রবৃত্তি যে সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ বঙ্গদেশ হইতেই মলচ, মল্ল, বর্ধক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহারা প্রহসন ভালবাসিত, ছোট ছোট নাটক ভালবাসিত, পূর্ব্বরঙ্গে আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভালবাসিত, কথোপকথন ভালবাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভালবাসিত; স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান, বাজনা, নাচ—এ সব ভালবাসিত না।

খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও যদি বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা নয়।

৬। নৌকা ও জাহাজ

বাঙ্গলায় যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙ্গালীরা যে অতি প্রাচীনকালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই

নৌকাও অনেকরূপ ছিল—দোণা, ডুণি, ডিঙ্গি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ূর-পঙ্খী ইত্যাদি। এ সকলই ছোট ছোট নৌকা সকল দেশেই আছে। বাঙ্গলায় কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।

বাঙ্গালী রাজা সিংহবাহু আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহার অনেকগুলি ছেলেপিলে হইল। বড় ছেলের নাম হইল বিজয়। সে বড় দুরন্ত. লোকের উপর বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল, "ছেলেটিকে মারিয়া ফেল।" রাজা ৭০০ অনুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া নামিল।

৭০০ লোক যে নৌকায় যায়—সে ত জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে ঐরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় যে জাহাজে লঙ্কা যান, সে জাহাজের একখানি ছবি অজন্তা-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তুল ছিল, পাল ছিল, ষ্টীম এঞ্জিন হইবার আগে যে সব জিনিষ তাহাতে দরকার, সবই ছিল। অনেকে মনে করেন যে, এ সব কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই ছবিটা ত এখনও আছে, তাহা ত অবিশ্বাস করা যায় না। সে ছবিও অল্প দিনের নয়, অন্তত ১৪০০ বৎসর হইয়া গিয়াছে। তখনও লোকে মনে করিত, বিজয় এই ভাবে এইরূপ নৌকায় লঙ্কায় নামিয়াছিলেন।

দশকুমারচরিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন যে, উহা খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে করেন, উহা খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। উহাতে তাম্রলিপ্তি নগরের বিবরণ আছে। সেখান হইতে অনেক পোত বঙ্গসাগরে যাইত।

খৃষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি হইতে এক জাহাজে চড়িয়া চীনযাত্রা করিয়াছিলেন।

তাহার পরও তাম্রলিপ্তি হইতে চীন ও জাপানে জাহাজ যাইত শুনা যায়। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, মগধ হইতে অনেকবার লোকে যাইয়া ব্রহ্মদেশ দখল করে ও তথায় সভ্যতা বিস্তার করে। ড্রুসেল সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ যে, পেগানে বহু পূর্ব্বে মগধ হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল।

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিমপুরে ধর্ম্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত, একথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, একথা রামচরিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে।

কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুথিতেই আমরা বাঙ্গলা দেশের নৌকাযাত্রার খুব জাঁকাল খবর পাই,—চৌদ্দ, পোনের, ষোল খানি জাহাজ একজন সদাগর একজন

সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও ১৪।১৫ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদসদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোন কোন পুথিতে লেখে যে, মধুকরের ১২০০ শত দাঁড় ছিল। এই সকল বই লেখার পরও যখন কেদাররায় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সর্ব্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, অনেক সময় দূর দূরান্তরও যাইতেন।

৭। বৌদ্ধ শীলভদ্র

চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, য়ুয়াং চুয়াং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময় জাপান, কোরিয়া, মঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। য়ুয়াং চুয়াং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়া ছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইঁহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। য়ুয়াং চুয়াং গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রের ও বৌদ্ধযোগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার যে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল এবং সে সময় উহার যে সকল টীকা-টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদ্য গ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি য়ুয়াং চুয়াংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

য়ুয়াং চুয়াং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দশ কুড়িখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার এবং তাহার ভাষা অতি সরল।

৮। বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব

আমি মনে করি যে, যিনি বৌদ্ধধর্ম্মের কয়েকখানি খুব চলিত পুথি লিখিয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্মা শান্তিদেব বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু তারানাথ আমার বিরোধী। তিনি বলেন, শান্তিদেবের বাড়ী সৌরাষ্ট্রে ছিল। তাঁহার লীলাক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালন্দা।

তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। নালন্দায় তাঁহার একটি 'কুটী' বা কুঁড়ে ঘর ছিল। লোকে দেখিত, তিনি যখন ভোজন করিতে বসিতেন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত; যখন

শয়ন করিতেন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত; যখন কুটীতে বসিয়া থাকিতেন তখনও তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত; সেইজন্য :—

"ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ
সুপ্তোপি প্রভাস্বরঃ
কুটীং গতোপি প্রভাস্বরঃ।"

এই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল "ভুসুকু"। তিনি যখন মগধের রাজধানীতে থাকিতেন, তখন তিনি "রাউতের" কার্য্য করিতেন। এমন কতগুলি বাঙ্গলা গান আছে, যাহার ভণিতায় লেখা আছে "রাউতু ভণই কট, ভুসুকু ভণই কট।" এখন এই রাউতু, ভুসুকু ও শান্তিদেব একই ব্যক্তি কি না, ইহা ভাবিবার কথা। তিনজনই এক, ইহাই অধিক সম্ভব।

আরও এক কথা, শান্তিদেব তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন :—

(১) সূত্র-সমুচ্চয়, (২) শিক্ষা-সমুচ্চয় ও (৩) বোধিচর্য্যাবতার। শেষ দুইখানি পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। প্রথম খানি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ভুসুকুর নামে আমরা আর একখানি বই পাইয়াছি, সেখানি ভুসুকুর লেখা। উপরের দুইখানির মত এইখানিও সংস্কৃতে লেখা, তবে মাঝে মাঝে বাঙ্গলা আছে। উপরের দুইখানির মধ্যেও আবার শিক্ষা-সমুচ্চয়ে অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর এক ভাষায় লেখা।

বোধিচর্য্যাবতারে শান্তিদেব বার বার বিপক্ষদের একটি কথা বলিয়া গালি দিয়াছেন। সে গালিটি কিন্তু বাঙ্গলা ছাড়া আর কোথাও শুনি নাই—সে কথাটি 'গুথ-ভক্ষক'। আমাদের দেশে দিনরাত্রি এই গালিটি শুনা যায়।

আরও কথা, একটি ভুসুকুর গানে আছে :—

"আজ ভুসুকু তু ভৈলি বাঙ্গালী।
নিজ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥"

আজ ভুসুকু তুই সত্য সত্য বাঙ্গালী হইয়াছিল ইত্যাদি।

এই সকল কারণে আমি শান্তিদেবকে আমাদের অষ্টম গৌরব মনে করি।

৯। নাথ-পন্থ

আমাদের দেশে এখন যে সব যোগীরা আছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপাধি নাথ। তাঁহারা বলেন, "আমরা এদেশে রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে।" তাই এখন আবার তাঁহারা পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। নাথেদের আচার-ব্যবহার কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত নয়। এই জাতি কোথা হইতে আসিল, অনেক বৎসর ধরিয়া আমি অনুসন্ধান করিতেছি। রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণালের পুরাণ-পর্য্যায়ে ১৬শ খণ্ডে হজ্‌সন সাহেবের মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমার প্রথম ধারণা হয় যে নাথ-পন্থ (Nathism) নামে এক প্রবল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় এবং পূর্ব্ব-ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে।

নাথেরা যে বাঙ্গলা দেশের বা পূর্ব্ব ভারতের লোক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ—মীন-নাথের একটি পদ পাইয়াছি, সেটি খাঁটি

বাঙ্গলা। গোরক্ষনাথের লীলাক্ষেত্র বাঙ্গলাতেই অধিক। তাঁহারই চেলা হাড়িপা আমাদের ময়নামতীর গানের নায়ক। মীননাথ যখন তাঁহার নিজের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, গোরক্ষনাথই তখন তাঁহাকে সে কথা মনে করাইয়া দেন। মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেক সময় মচ্ছন্দ্রনাথ বলে, অর্থাৎ তিনি জেলের ছেলে ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার বাঙ্গলা দেশের লোক হওয়াই সম্ভব।

ক্রমে নাথ-পন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধেরা ও হিন্দুরা নাথেদের উপাসনা করিত। মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম গন্ধ না থাকিলেও, তিনিই এখন নেপালী বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা। তাঁহার রথযাত্রায় নেপালে যেমন ধূমধাম হইয়া থাকে, এমন আর কোনও দেবতার কোনও যাত্রায় হয় না। গোরক্ষনাথের উপর নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে খুসী না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধেরা এখনও তাঁহার পূজা করে, তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়।

এই সকল কারণেই নাথ-পন্থকে আমি বাঙ্গলার নবম গৌরব বলিয়া মনে করি।

১০। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

বাঙ্গলা দেশের দশম গৌরব দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁহার নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমণীপুর। তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীলবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। সে সময় মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি বিক্রমশীল-বিহারের অধ্যক্ষ হন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে।

দীপঙ্কর অনেক সময় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও অন্য যানাবলম্বীদিগের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন। এই সময় তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে ও বনপার দল খুব প্রবল হইয়া উঠে, তাহাতে ভয় পাইয়া তিব্বত দেশের রাজা বিক্রমশীল বিহার হইতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর দুই একবার যাইতে অসম্মত হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া পরিণামে তথায় যাইতে স্বীকার করেন। পশ্চিম-তিব্বতে যে সকল বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন, সে সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে। অতিশা যখন তিব্বত দেশে যান, তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। এরূপ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আজিও সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়-দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা—এ সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই।

১১। জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র

রাইট সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি

পুথি কুড়াইয়া লইয়া গিয়া কেম্ব্রিজ ইউ-নিভার্সিটিকে দেন। তাহার মধ্যে শান্তি-দেবের শিক্ষা-সমুচ্চয় নামে একখানি পুথি থাকে। পুথিখানি কাগজের, হাতের লেখা, অধিকাংশই বাঙ্গলা। বেণ্ডল সাহেব যখন এই পুথিগুলির ক্যাটালগ করেন, তখন তিনি বলেন যে, এ পুথিখানি খৃষ্টের জন্মের ১৪শ বা ১৫শ বছর পরে লেখা।

পুথিখানির শেষে লেখা আছে :—
"দেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো জাগদ্দল পণ্ডিত-বিভূতিচন্দ্রস্য" ইত্যাদি।

বেণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন, "মহাযান-পন্থী জগদ্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র কে আমি জানি না।" ১৯০৭ সালে আমি নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথিতে জগদ্দল-মহাবিহারের নাম পাই; বিভূতিচন্দ্রেরও নাম পাই। তিনি "অমৃতকর্ণিকা" নামে "নামসংগীতির" একখানি টীকা করেন, ঐ টীকা কালচক্র-যানের মতে লিখিত হয়।

রামচরিত কাব্য ছাপাইবার সময় জানিতে পারি, রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান, "জাগদ্দল মহাবিহার" তাহারই কাছে ছিল। জগদ্দলের খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু নিতান্ত দরকার। কারণ, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কনিষ্কবিহার, কলম্বোতে যেমন দীপদত্তম বিহার, সেইরূপ বাঙ্গলার মহাবিহার জগদ্দল।

এই বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্রই প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত

যখন তিব্বত দেশে এই সকল বৌদ্ধ গ্রন্থের তর্জ্জমা হইতেছে, তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন এবং নিজেও দুই-চারিখানি পুস্তক তর্জ্জমা করিয়া-ছেন। জগদ্দলের আর একজন মহাভিক্ষুর নাম দানশীল। তিনিও এইরূপ অনেক পুস্তক তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং তিব্বতওয়ালারা যে এক সময় জগদ্দল-ভিক্ষুকের উপর অনেকটা নির্ভর করিত, সেটা বেশ বুঝা যায়।

সম্প্রতি শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে একখানি কেঙ্গুরের পুস্তক কিনিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, 'সোসাইটির' লামা বলেন, সে পুস্তকখানি হাতের লেখা, কাঠের ছাপা নয়, ১২২৬ বৎসর পূর্ব্বে পুস্তকখানি লেখা হয়, দানশীল উহা তর্জ্জমা করেন। এ দানশীল যদি জগদ্দলের দানশীল হন, তাহা হইলে জগদ্দল বিহারও পুরাণ, বিভূতিচন্দ্রও পুরাণ, আর বেণ্ডল সাহেবের পুথিও, তিনি যে সময় বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আরও তিন চারি শত বৎসর পুরাণ।

১২। লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ

বাঙ্গলার দ্বাদশ গৌরব লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ। তিনি আদি-সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার বাড়ী বাঙ্গলায় ছিল। রাঢ়দেশে এখনও তাঁহার নামে পূজা হয়, তাঁহার নামে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। ময়ুর-ভঞ্জেও তাঁহার পূজা হয়। তিব্বতীরা তাঁহাকে সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া পূজা করে।

অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনীও লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি একটি সম্প্রদায়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সম্প্রদায় হয় সহজ-যান হইবে, না হয় সহজযানেরই কোন ভাগ হইবে। সিদ্ধাচার্য্যগণ এককালে বাঙ্গলায় ও পূর্ব্ব-ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন।

সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুড়রী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর, আযদেব, ঢেণ্ঢন, দারিক, ভাদে, তাডক,—এই কয়জনের "চর্য্যাপদ" বা কীর্ত্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পদ মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বেই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সহজিয়ামতে উহার সংস্কৃত টীকা করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বহু সংখ্যক দোহাকোষ ছিল। ঐ সকল দোহা-কোষেরও সংস্কৃত টীকা ছিল। অনেকগুলি দোহাগীতিকা ছিল, তাহারও সংস্কৃত টীকা ছিল। এই সমস্তেরই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা আছে। যে কয়জন সিদ্ধাচার্য্যের নাম করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই গ্রন্থ আছে, সমস্তই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভুটিয়া ভাষাগ্রন্থ, বিশেষ তেঙ্গুর গ্রন্থ খুঁজিলে যে শুধু বাঙ্গালীদের ধর্ম্মমত পাওয়া যাইবে এমন নয়, বাঙ্গলা সাহিত্যেরও একটি ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

১৩। ভাস্করের কাজ

বাঙ্গলার ত্রয়োদশ গৌরব ভাস্কর-শিল্প। মহাযান হইতে যতই নূতন নূতন ধর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যেও যতই তন্ত্রের রূপ প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন দেবতা, নূতন নূতন বুদ্ধ, নূতন নূতন বোধিসত্ত্ব-পূজা আরম্ভ হইল। এক এক দেবতারই নানা মূর্ত্তি হইতে লাগিল, কখন ক্রোধমূর্ত্তি, কখন শান্তমূর্ত্তি, কখন করুণামূর্ত্তি—নানারূপ মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। সে সকল মুদ্রার, সে সকল মূর্ত্তির ও সে সকল দেবতার নাম অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক সাধনমালায় ২৫৬ রূপ মূর্ত্তির সাধনের কথা বলা আছে। তেঙ্গুরে ১৭৯ বাণ্ডিলে প্রায় ৬৬ দেবতার সাধন আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও এই সকল দেখিয়া মূর্ত্তি আঁকিয়া দিতে পারে। বাঙ্গলায় এরূপ আঁকিয়া দিবার লোক কত ছিল বলা যায় না। পাথর তাহারা মোমের মত ব্যবহার করিত। পাথর দিয়া যে তাহারা কত রকম মূর্ত্তি গড়িয়া দিত, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এই মূর্ত্তিবিদ্যার ইংরাজী নাম "Iconography"। সেদিন একজন প্রসিদ্ধ Iconographist এক সভায় বলিয়াছেন যে মূর্ত্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাঙ্গলা। এখনও ভাস্করেরা নানারূপ সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। দাঁইহাটের ভাস্করদের কথা ত সকলেই জানেন। চৈতন্যের সময়েও চমৎকার চমৎকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইত। পাল-রাজাদের সময়েই এই ভাস্করশিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এখানকার ভাস্করেরা কার্য্য করিত। শিল্পের এত উন্নতি অল্প সাধনার ফল নয়। বাঙ্গালী এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে। শুধু পাথরে নয়, পিতলে, তামায়, রূপায়,

সোণায়, অষ্টধাতুতে— যাহাতেই বল, মূর্ত্তিগুলি যেন সজীব।

চৈতন্যদেবের পর গরীব বৈষ্ণবেরা কাঠের ও মাটীর মূর্ত্তি তৈয়ার করিত। মহাপ্রভুর দুই একটি কাঠের মূর্ত্তি দেখিলে সত্য সত্যই মনে হয়, মহাপ্রভু কথা কহিতেছেন, ঠোঁট দুটি যেন নড়িতেছে। চৈতন্যের কীর্ত্তনমূর্ত্তি অনেকেই দেখিয়াছেন, কি সুন্দর! মাটীর মূর্ত্তিতে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এখনও বোধ হয় ভারতে অদ্বিতীয়। একজন ইউরোপের ওস্তাদ কতকগুলি মাটীর গড়া মানুষের মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহারা সত্য সত্যই অনেক দিন ধরিয়া মানুষের শিরা-ধমনী পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে।"

১৪। বাঙ্গলায় সংস্কৃত

মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ভবদেব একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে যাহা কিছু পড়িবার ছিল, তিনি যেন সবই পড়িয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার প্রশস্তি লিখিয়াছেন। সেই প্রশস্তিতে যাহা লেখা আছে, তাহা যদি চারিভাগের একভাগও সত্য হয়, তাহা হইলেও ভবদেব যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ ধন্য। তাঁহার কত পুস্তক ছিল, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে সামবেদীদের পদ্ধতি ছাড়া আরও তাঁহার দশ বারখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গলাতেই হয়। সায়ণাচার্য্যের দুই তিন শত ... সুগড়াচার্য্য এক নূতন ধরণের বেদব্যাখ্যা সৃষ্টি করেন। সুগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের পুস্তক অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। হলায়ুধ তাঁহার সম্প্রদায়ের, গুণবিষ্ণু তাঁহার সম্প্রদায়ের। ইহাদের ব্যাখ্যা বেশ পরিষ্কার ও সুগম।

দর্শনশাস্ত্রে বৌদ্ধদের সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহাদের বিচার করিতে হইত। সুতরাং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দর্শনশাস্ত্রের কিছু চর্চ্চা রাখিতে হইত। শ্রীধরের লেখা প্রশস্তপাদের টীকা এখন ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত।

স্মৃতিতে গৌড়ীয় মতই একটা স্বতন্ত্র ছিল। কাশী, মিথিলা ও নেপাল দেশের প্রাচীন স্মৃতি নিবন্ধে অনেকবার গৌড়ীয় মতের নাম করিয়াছে। মনুর টীকাকার গোবিন্দরাজ যে স্মৃতিমঞ্জরী বলিয়া এক প্রকাণ্ড স্মৃতি-নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা উহার যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহা খৃঃ ১১৪৫ সালে কাপি করা। দায়ভাগকার জীমূতবাহন, জিকন, শ্রীকর প্রভৃতি অনেক স্মৃতি-নিবন্ধকারের ও জোগ্লোক, অন্ধূক, ভট্ট প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষ-নিবন্ধকারের নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা করিয়া তুলিয়াছেন, সেই ত একটি অদ্ভুত জিনিস। সম্পত্তি পূর্ব্বে বংশগত ছিল, তিনি তাহাকে ব্যক্তিগত করিয়া গিয়াছেন, এ কাজটি ত ভারতে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বল্লালও ত নিজে দুখানি

দানসাগর ও আর একখানি অদ্ভুতসাগর। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শুদ্ধির গ্রন্থও ত স্মৃতি ও ও জ্যোতিষের একখানি ভাল বই।

১৫। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন

ধর্ম্মের গৌরব, বিদ্যার গৌরব ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বৌদ্ধগণ ও হিন্দুগণ বাঙ্গলা দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে ছিলেন। এমন সময় ঘোর বন্যার ন্যায় আফগান দেশ হইতে মুসলমানেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বন্যায় রাজা-প্রজা, বৌদ্ধ-হিন্দু, বজ্রযান-সহজযান, ন্যায়-স্মৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান---সব ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গেল।

লাভ হইল মঙ্গলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব্ব-উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা ঐ সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া ঐ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল; তাহাদের বিদ্যা বৃদ্ধি হইল, ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শিল্প বৃদ্ধি হইল; ক্ষতি যাহা হইবার তাহা বাঙ্গলারই হইয়া গেল।

দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়া আপন দেশে বাস করিতে লাগিল। এই সময় দেশের কি অবস্থা হইয়াছিল, কুলগ্রন্থই তাহার সাক্ষী। দুই শত বৎসর নিরন্তর মারামারি কাটাকাটির পর একবার একজন হিন্দু বাঙ্গলার রাজা হইয়াছিলেন। অমনি আবার হিন্দুসমাজে সংস্কৃত সাহিত্য, বাঙ্গলা সাহিত্য জাগিয়া উঠিল। যে মহাপুরুষের একান্ত আগ্রহ, একান্ত যত্ন ও দূরদর্শিতার ফলে সংস্কৃত সাহিত্য আবার বাঁচিয়া উঠে, তাঁহার নাম বৃহস্পতি, উপাধি রায়মুকুট। তিনি নিজে অনেক সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া একখানি স্মৃতি-নিবন্ধ রচনা করিয়া, অমরকোষের টীকা লিখিয়া, অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিয়া, আবার সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীকর। ইনিও বৃহস্পতির ন্যায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং দুইজনে মিলিয়া অমরকোষের আর একখানি টীকা লিখেন। শ্রীকরের পুত্র শ্রীনাথ পূরা এক সেট নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আবার হিন্দুসমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তিনি বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্য রঘুনন্দন সমাজ বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহার বাঁধা সমাজ এখনও চলিতেছে। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন আমাদের সমাজ বাঁধিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা আজিও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছি। ইঁহারা আমাদের পূজ্য, নমস্য এবং গৌরবের স্থল।

১৬। ন্যায়শাস্ত্র

মুসলমান-আক্রমণে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়, দর্শনশাস্ত্রও লোপ হইয়াছিল। রাজা গণেশের পর হইতে যে আবার সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তাহার ফলে ন্যায়ের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এই চারি শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার ন্যায়শাস্ত্র ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও,

যিনি নৈয়ায়িক, তিনি কিছু না কিছু বাঙ্গলা কথা কহিতে পারেন। নবদ্বীপে না আসিলে তাঁহাদের চলে না। সুতরাং তাঁহাদের নবদ্বীপে আসিতেও হয়, বাঙ্গলা ভাষা শিখিতেও হয়। ভারতে বাঙ্গালীর এই প্রাধান্য যাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য ও নমস্য। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম বাসুদেব সার্ব্বভৌম। ন্যায়-শাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের মধ্যে সকলের শেষ বিশ্বনাথ। তিনি কয়েকটি কারিকার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত দুরূহ সিদ্ধান্তের যেরূপ সমাবেশ করেন, তাহা দেখিয়া সকল দেশেরই লোক আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এখনও তাঁহার তিন শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার কারিকা ও তাঁহার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী চলিতেছে। বাঙ্গলায় তাঁহার টীকাকার কেহ জন্মে নাই—তাঁহার টীকাকার একজন মারহাট্টি, তাঁহার নাম মহাদেব দিনকর। এখন বলিতে গেলে, এই নৈয়ায়িকগণই এখনও ভারতে বাঙ্গলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ, বাঙ্গলার স্মার্ত্তকে অন্য দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাঙ্গলার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না।

১৭। চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর

বৌদ্ধ মতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, বিলুপ্তই বা বলি কেন, ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের কি দশা হইল? মুসলমানেরা জোর করিয়া অনেককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। বিহারগুলি শুধু যে ধ্বংস হইল এমন নহে, সেখানে মুসলমান আসিয়া বসিল এবং তাহারা অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। তাই আজ বাঙ্গলায় অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান।

বাকি যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দু হইয়া গেল। তাহাদিগকে হিন্দু করিল কে? ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ত এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছেই, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই দল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায় হইলেন। এক দলের নেতা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। আর এক দলের নেতা গৌড়ীয় শঙ্কর, ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আগম-বাগীশ। একদল বৈষ্ণব, আর একদল শাক্ত।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্যদেব একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলায় বৈষ্ণবদিগের প্রধান কীর্ত্তি—কীর্ত্তনের পদ। বৌদ্ধদিগের চর্য্যাপদের অনুকরণে এই সকল পদাবলীর সৃষ্টি। পদাবলীর পদকর্ত্তা অসংখ্য। রাধামোহন দাস ৮০০।৮৫০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দুই পুরুষ পরে বৈষ্ণবদাস ৩০০০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এখনও সংগ্রহ করিলে ২০০০০ হাজারেরও অধিক হইবে। ভাবের মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, সুরের বৈচিত্র্যে এই সকল গান সকল সমাজেরই পরম আদরের জিনিস। এই সকল পদ গান করিবার জন্য নানারূপ কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। সেকালে যেমন বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র 'প্রবৃত্তি' ছিল, এখনও কীর্ত্তনের সেইরূপ নানা রূপ 'প্রবৃত্তি' হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান—মনোহরসাহী ও রেণেটি। ভক্তিরত্নাকরে

লেখা আছে যে, শ্রীখণ্ডে যখন প্রথম কীর্ত্তন হয়, তখন স্বর্গ হইতে চৈতন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখনও বোধ হয় ভাল কীর্ত্তন জমিলে সেখানে চৈতন্য সপরিকর আবির্ভূত হন। বাঙ্গলার কীর্ত্তন একটা সত্য সত্যই উপভোগের জিনিস। তাহার জন্য চৈতন্যদেবের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আমরা সম্পূর্ণরূপে ঋণী।

১৮। তান্ত্রিকগণ

মূল তন্ত্র বড় একটা পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ। একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত দুই চারিখানি মূল তন্ত্র ও বহুসংখ্যক সংগ্রহ একত্র করিলেন, আবার তাহার উপর নিজের একখানি সংগ্রহ বাহির করিলেন। তাঁহার দলে সেই সংগ্রহ চলিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সংগ্রহ চলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলায় এই সকল সংগ্রহ-কর্ত্তাদের প্রথম ও প্রধান—গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য। সংগ্রহকারেরা মূল তন্ত্র অনেক পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। মূল তন্ত্রে অনেক প্রক্রিয়া আছে, যাহা সভ্য সমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহকারেরা উহা মার্জ্জিত করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু যে সকল মহাপুরুষেরা এই লোকায়ত তন্ত্রশাস্ত্রকে মার্জ্জিত করিয়া সভ্য সমাজের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ করায় অনেক লোক হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দু হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা যে খুব দূরদর্শী ও সমাজনীতিকুশল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক শঙ্করের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন।

তান্ত্রিক সংগ্রহকারেরা হতাবশিষ্ট বৌদ্ধগণকে নানা উপায়ে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন, আপনার করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গলা সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

তান্ত্রিক মহাশয়েরা বঙ্গ-সমাজের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা ভাষার সাহিত্য তাহার সাক্ষী। তাঁহাদের দলে বাঙ্গলা বই প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট আছে এবং সেগুলি বেশ ভাল। তাঁহাদের শ্যামাবিষয়ক গানগুলি বাঙ্গলার একটি শ্লাঘার বিষয়। আজিও কেহ সংগ্রহ করে নাই, তাই তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙ্গালী কি কেহ আছে? দেওয়ানজী মহাশয়ের ও কমলাকান্তের গান অনেক সময় হৃদয়ের নিগূঢ় তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া দেয়।

বাঙ্গালীরা জানে হিন্দু হইলেই, হয় তাহাকে বৈষ্ণব, না হয় শাক্ত হইতে হইবে। সেই জন্য যাহারা বৈষ্ণব নহে, তাহারা সকলেই শাক্ত, শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও শাক্ত। কিন্তু এই দলকে বৈষ্ণবের গান অপেক্ষা শ্যামাবিষয়ক গানেই বেশী মাতাইয়া তুলে।

১৯। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

এই যে এত বড় একটা অনার্য্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ

ধর্ম্মের এত প্রাচুর্ভাব ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন, বৌদ্ধ দেখিতেও পাওয়া যায় না, তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যন্ত লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে,—চারিদিকের লোকে জানে বাঙ্গলা হিন্দুধর্ম্মের দেশ—এটা কে করিল ? বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাই এই কাজটি করিয়াছেন। রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন, মুসলমানেরা প্রাচীন সমাজ, বিশেষ প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ, একেবারে ধ্বংস করিয়া দিলে, তাহার পর কিরূপে ব্রাহ্মণেরা আবার ধীরে ধীরে সেই সমাজ আবার গড়িয়া তুলিলেন, তাহা পুর্ব্ব পুর্ব্ব গৌরবে অনেকটা দেখাইয়াছি। স্মৃতি, দর্শন, বৈষ্ণবধর্ম্ম, শাক্ত ধর্ম্ম তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দেশীয় ভাষায় ছড়া লিখিয়া, দেশীয় ভাষায় গান গাইয়া বৌদ্ধেরা কেমন দেশটাকে মাতাইয়া তুলিত। সুতরাং দেশ মাতাইতে হইলে যে, মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, এ তাঁহাদের বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গলা করা আরম্ভ করিয়া দেন।

বাস্তবিকই স্মৃতি ও দর্শন অপেক্ষা এই সকল বাঙ্গলা তর্জ্জমায় হিন্দু সমাজের বন্ধন বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ তর্জ্জমার মূলে ব্রাহ্মণ।

২০। কায়স্থ ও রাজা

পরে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে কায়স্থদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। গুণরাজ-খাঁর কৃষ্ণমঙ্গল ও কাশীদাসের মহাভারত বাঙ্গালীকে অনেক বড় করিয়া দিয়াছে। কাশীদাসের আরও দুই ভাই গদাধর ও কৃষ্ণদাস ভাল ভাল বই লিখিয়া গিয়াছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক—বাঙ্গালী হিন্দু হউক। কায়স্থেরা শুধু বই লিখিয়াই সমাজের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। এ দেশের অনেক জমীই তাঁহাদের হাতে ছিল, জমীদারভাবেও দেশের এবং সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশ ও তাঁহার সন্তানসন্ততি বাঙ্গলার সুলতান না হইলে রায়মুকুট বড় কিছু করিতে পারিতেন না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন না থাকিলে চৈতন্য সম্প্রদায় গড়িতেই পারিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধিমন্ত খাঁ না থাকিলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজকে অর্থের জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। এইরূপে কায়স্থ-ব্রাহ্মণে মিশিয়া মুসলমানসত্ত্বেও বাঙ্গলায় একটা প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলিলেন।

সাহিত্য-শাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বোধন

আমাদের পন্থের ও কাব্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন, দীনেশবাবু যতদূর দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা আরও পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। দীনেশবাবুর মতে শূন্যপুরাণ সকলের চেয়ে পুরাণ। কিন্তু সেও মুসলমান-আক্রমণের পরে লেখা। কারণ, উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের নাথ-পন্থের যোগীরা খৃষ্টের অষ্টম শতকে বাঙ্গলায় ছড়া লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরাও সেই কালেরই লোক। তাঁহারা অনেক দোহা লিখিয়া গিয়াছেন, গীতিকা লিখিয়া গিয়াছেন, ছড়াও লিখিয়া গিয়াছেন। দোষগুণ বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, এ সকল ছড়া বা গীতিকা খুব উচ্চ অঙ্গের না হইলেও রস ও ভাবে পরিপূর্ণ। সে রস ও সে ভাব এখনকার রুচিসিদ্ধ নয়, কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্য বলিয়া তাহার আদর আছে। উহাতে আমরা আমাদের ভাষা হাজার বৎসর পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিল, তাহা বেশ দেখিতে পাই।

মুসলমান-বিজয়ের পর যখন দেশে অনেকেই মুসলমান হইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি না লিখিলে এ মুসলমানী স্রোত রোধ করা যাইবে না। তাই তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ বাঙ্গলা করিতে লাগিলেন। কাব্যের দোষগুণ সংস্কৃতে যাহা ছিল, বাঙ্গলাতেও তাহাই রহিল, বেশীর মধ্যে বাঙ্গালীর মনে যাহা লাগে, তাহাই উহাতে ঢুকাইয়া দিলেন। বাঙ্গালী হাস্যরসে পটু, তাই উহাতে হাসির জিনিষ বেশী করিয়া আসিল। বাঙ্গালী কথাকাটাকাটি ভালবাসে। উহাতে কথাকাটাকাটি বেশী আসিয়া ঢুকিল। এই জন্যই অঙ্গদ রায়বারে, লবকুশের যুদ্ধে কথাকাটাকাটি আসিল। বাঙ্গালী বড় ভক্ত, তাই রামায়ণে দুর্গোৎসব আসিল। এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি বাঙ্গালী আকারে, বাঙ্গলা ভাষায় বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর গান আপনাদের মত করিয়া বাঙ্গলা করিয়া লইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ, পাকা বৌদ্ধ যে ধর্ম্মঠাকুরের গান, তাহাও সংস্কৃত কাব্যের রসভাব দিয়া লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময় চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব হইল। কাব্য ও নাটকই তাঁহার ধর্ম্মের প্রাণ। অলঙ্কারের রস ও ভাবই তাঁহাদের দেবতা। নয় রস, বিয়াল্লিশ ভাব ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব লইয়াই তাঁহাদের কীর্ত্তন। পদকর্ত্তারা দেখিতেন এই এই ভাবের গান আছে, এই এই ভাবের গান নাই, সেইগুলি তাঁহারা জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে একজন যে ভাব দিয়া গিয়াছেন,

আর একজন তাহাতে অন্য ভাব লাগাইলেন। নানা ভাবে নানা রসের সঙ্কীর্ত্তনের গান হইতে লাগিল। তাহার পর অনেক গান জমিয়া গেলে সংগ্রহ আরম্ভ হইল। সংগ্রহে পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ ও মিলন পর্য্যন্ত গানগুলি একটির পর একটি করিয়া সাজান হইল। অনেকগুলি সংগ্রহ হইলে শেষে একজন মহাকবি সেই গানগুলি ভাঙ্গিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে যেমন কুশীলবের গানগুলি একত্র করিয়া বাল্মীকি মুনি রামায়ণ করিয়াছিলেন, আমাদের মহাকবি রঘুনন্দন সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের পদ ভাঙ্গিয়া "রাধামাধবোদয়" নামে এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। রঘুনন্দনের "রামরসায়ন" লোকে পড়ে, কিন্তু "রাধামাধবোদয়" লোকে বড় পড়ে না। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের সহিত যদি "রাধামাধবোদয়" পড়ে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কবি কিরূপ অদ্ভুত কারিকুরি করিয়া গিয়াছেন। আমার এক এক বার মনে হয়, রাধামাধবোদয়ই বৈষ্ণবধর্ম্মের একখানা বড় মহাকাব্য।

বৈষ্ণবদের এই মহাকাব্যের পর আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কতকগুলি বাঙ্গলা কাব্য দেখিতে পাই। সেগুলি ঠিক সংস্কৃত কাব্যের ছাঁচে ঢালা। এই সকল কাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্প প্রধান। গল্পটি সোজা, উহাতে ঘটনা অধিক নাই, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া রস, ভাব ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি করা হইয়াছে। ইংরাজী যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্গালীরা একটি

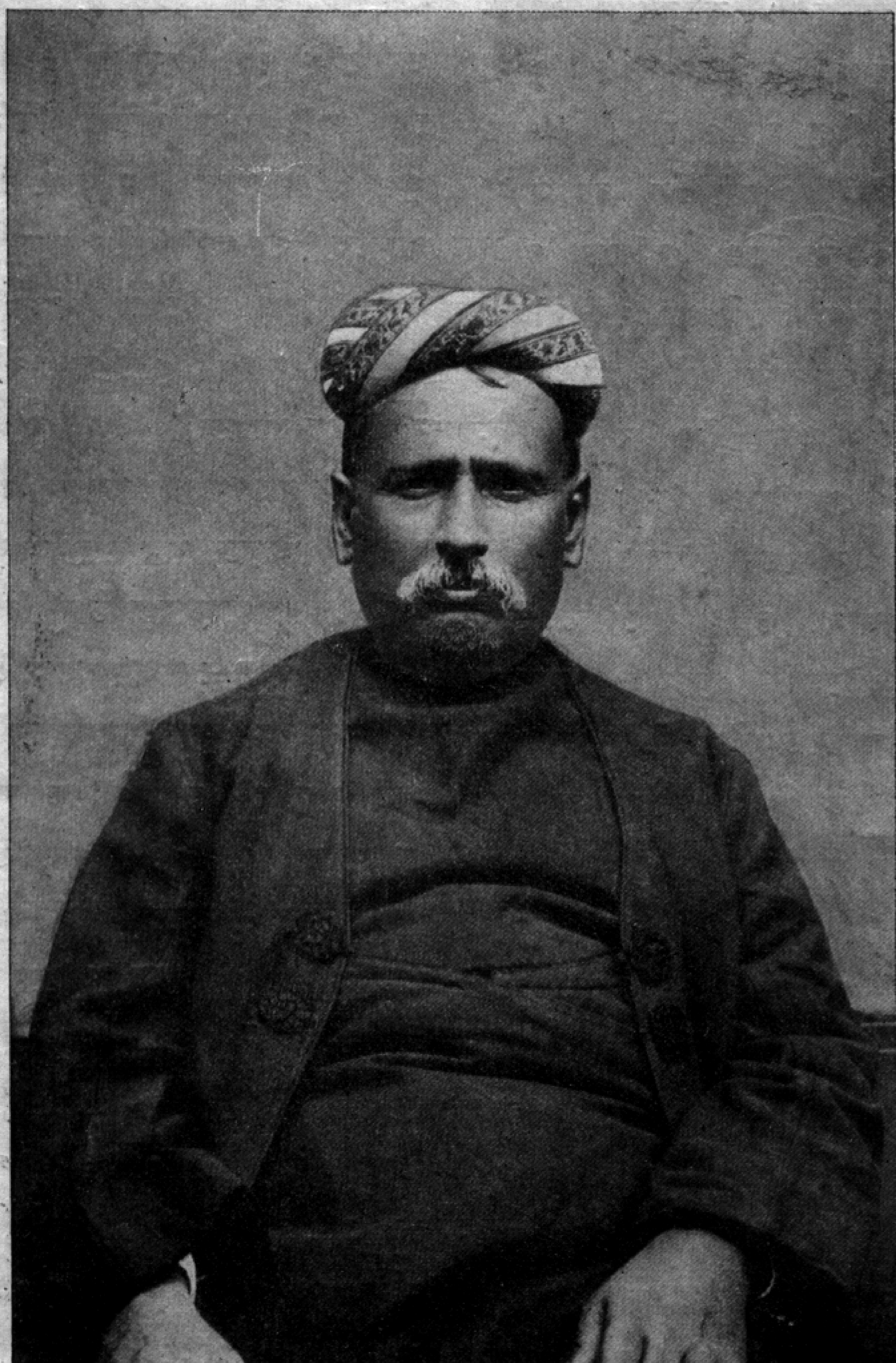
লইয়া অনেকে কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এক রামায়ণেরই অনেক রূপ বাঙ্গলা আছে, মহাভারতেরও আছে। মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ও ধর্ম্মঠাকুরের গানের ত কথাই নাই। সত্যপীরের পাঁচালী যে কত আছে, গণিয়া ঠিক করা যায় না। সব বাড়ীতেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্যপীরের গান আছে।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরাজী ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই ইংরাজী ভাবের প্রধান মহাকাব্য "মেঘনাদবধ"। কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, কাব্যের নায়ক-নায়িকা আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর সবই বিলাতী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ও সংস্কৃত কাঠামোয় সেগুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাকাব্যখানি ভালই হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই? যদি বল, মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয়? হয় না সত্য, কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই?

পদ্য ও কাব্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন হইলেও বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। ছাপাখানা হইবার অনেক পরে নাটক আরম্ভ হয়। নাটকের মহারথিগণ একে একে অন্তগত হইয়াছেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহারা প্রাচীন হইয়াছেন। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি লোকে যেন বেশী

নবেলেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেছি। বঙ্কিমবাবু দুই বৎসরের কমে একখানি নবেল লিখিতেন না। কিন্তু এখন হু হু করিয়া নবেল বাহির হইতেছে। এখানেও দেখিতে পাই, চুট্‌কীই অধিক। চুট্‌কী যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না। অনেক চুট্‌কী অতি সুন্দর, বেশ মনে লাগে। অনেক সময় চুট্‌কীতে বেশ গুণপনাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবি চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে। চুট্‌কীর একটি দোষ আছে— যখনকার তখনই, বেশী দিন থাকে না। তাই চুট্‌কীর চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এত কথা বলিতেছি।

বাঙ্গলায় রচনার বই বড় কম, নাই বলিলেও হয়। যে কখানি সেকেলে বই আছে, প্রায়ই তর্জ্জমা। বাঙ্গালী নানা



মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া হেল্প সাহেবের মত বা এডিসন সাহেবের মত রচনা লিখিতেছে—এ ত দেখা যায় না। যাহা কিছু আছে এক কমলাকান্তের দপ্তরে—অতুল্য, অমূল্য; আর ত দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, বুঝিতে পারি না।

জীবনচরিতে দিনকতক বাঙ্গালীরা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। কতকগুলি জীবন-চরিত বাস্তবিক মহামূল্য রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আরও চাই। এখনও জীবনচরিত ঠিক জীবনচরিত হয় নাই। দু চারখানি জীবনচরিতে দেখিতে পাই, কেবল জীবনের ঘটনাগুলি পর পর সাজান আছে। কিন্তু তাহাকে জীবনচরিত বলে না। ঐ সাজান ঘটনাগুলির কার্য্যকারণ-ভাবগুলি সব দেখাইতে হইবে। সমাজটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিহাস ভাল করিয়া জানা চাই। তবে ত ভাল জীবনচরিত হইবে। একজন মানুষের জীবনচরিত দেখাইতে গিয়া তিনি যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহাদ্বারা সমাজের, সাহিত্যের, ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সেগুলি সব দেখান চাই। এরূপ দেখাইবার চেষ্টা অনেক বার হইয়াছে, যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও ধন্তবাদের পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না! যিনি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের "আদিত্যস্বরূপ" ছিলেন, তাঁহার একখানি ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না।

কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই বলিলেই হয়। বঙ্কিমবাবু ও ভূদেব বাবু এ বিষয়ে দু চারটি রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। সে রচনা কোন কাব্যের কোন বিশেষ অংশ ধরিয়া। পূরা কাব্যখানি পড়িয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে হজম করিয়া, তাহার দোষ-গুণ দেখান এখনও হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর নবেলের দোষগুণ-পরীক্ষা দুই তিনবার হইয়া গিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই দুই একবার হইয়া গিয়াছে। দুই একটা রচনা পড়িয়া তিনিও অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন। মাইকেলের দোষগুণও অনেকে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সব কাব্য পড়িয়া মাইকেলের কবিতা বুঝাইবার চেষ্টা হয় নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গলার একটা মস্ত অভাব আছে।

অনেকের সংস্কার বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সংস্কৃতকে বাঙ্গলা ভাষার ঠান্‌দিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গলার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী বলি। পাণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাঁহার দেশে লোকে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিত। তাঁহার সময় আর এক ভাষা ছিল, তাহার নাম "ছন্দস্"—অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুরাণ; প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিনি কত দিনের লোক তাহা জানি না, তবে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ সপ্তম শতকের বোধ হয়। তাহার অল্প দিন পর হইতেই ভাষা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার

চুলার ছাই কুড়াইয়া এক পাথরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাষায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা, কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অশোকের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর মিশ্রভাষা; ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর এক রকম। একটি বাক্যে দু রকমই পাওয়া যায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর সুঙ্গ ও খারবেল-দিগের শিলালেখের ভাষা। তারপর সাত-কর্ণিদের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর পালি ভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সকল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। মাগধীর ও ওঢ মাগধীর সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেক দিন কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাঙ্গলা। তাহার পর চণ্ডীদাসের বাঙ্গলা। তাহার পর বৈষ্ণব কবিদের বাঙ্গলা। সব শেষে আমাদের বাঙ্গলা।

সুতরাং সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্পর্ক অনেক দূর। সংস্কৃতের গতি এক-রূপ ছিল, এতদিনে বাঙ্গলার গতি আর একরূপ হইয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা, আর গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টা একই রকম। সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস বাঙ্গলার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গলা ভাষাকে যেমন বদ্‌লাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেরূপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গালার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাড়াইবে কি করিয়া? অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। যে সকল শব্দ একেবারে আপামর সাধারণের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, লিখিবার সময় সেগুলি তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না। "কলম" মুসলমানী শব্দ, তাঁহারা কলমের বদলে "লেখনী" শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ "লেখনীর" অর্থ—উড়েদের তালপাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খুন্তি, তাহাতে কালি লাগে না। "কলম" ও "লেখনি" দুটি একেবারে ভিন্ন জিনিস। "দোয়াত" মুসলমানী কথা। দোয়াত লেখা হইবে না "মস্যাধার" লিখিতে হইবে। "পাট্টা" মুসলমানী কথা। পাট্টা লিখিবেন না, "ভোগবিধায়ক পত্র" লিখিবেন। "আদালত" লিখিবেন না, লিখিবেন—"বিচারালয়"। এইরূপে তাঁহারা বাঙ্গলাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিয়া লইতে চান। তাহাদের সে চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়।

আবার এক দল আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন; বলেন—"ওটা ইতুরে কথা।"

উহার বদলে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান। আমি বলি, "সময় আর কাটে না", তাঁহারা বলেন, "কাটেনা, ছি! —ইতুরে কথা।" বলেন, "সময় কর্ত্তন হয় না।" আমরা কথায় বলি, "বাড়িয়ে গুছিয়ে লও।" তাঁহারা বলেন, "ছি! ও ইতুরে কথা। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লও।" আমরা বলি, "দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়", তাঁহারা বলেন, "দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়।" আমরা কথায় বলি, "এটা গালগল্প", তাঁহারা বলেন, "স্বকপোলকল্পিত।" আমরা বলি, "ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল", তাঁহারা বলেন, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল।" এইরূপে তাঁহারা কেতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয় তাঁহাদের সাধু ভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়।

আর একদল আছেন, তাঁহারা পড়েন ইংরাজী, ভাবেন ইংরাজীতে, লিখিতে চান বাঙ্গলায়—সে এক রকম সাহেবী বাঙ্গলা হইয়া পড়ে।

মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে বাঙ্গলা যখন একটা ভাল ভাষার মধ্যেই দাঁড়াইতেছে, তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা করা আবশ্যক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ-যোজনার প্রণালী আছে, পদ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হইয়া দেখার দরকার, তবে ত বাঙ্গলা লেখক হইবে! নহিলে বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব তাহাই বাঙ্গলা—এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরাজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া দিলে, তাহাকেও কি বাঙ্গলা বলিব? তাহা হইলে ত এটি খাসা বাঙ্গলা—

"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।" ইহাকে কি আপনারা বাঙ্গলা বলিবেন?

এখন বাঙ্গলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। এতদিন পণ্ডিত মহাশয়েরা ইচ্ছা মত পারসী শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, কারণ বাঙ্গলার মুসলমানেরা বাঙ্গলা সাহিত্য লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এখন তাঁহারা বলিতেছেন, "চলিত মুসলমানী শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন? তাড়াইবার তোমাদের কি অধিকার আছে? যে সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ত ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তোমরা সে স্বত্ব হইতে তাড়াইবার কে?" শুধু যে এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তাহা নয়. তাঁহারা আরও বলিতেছেন, তোমরা যদি মুসলমানী শব্দ তাড়াইয়া বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর, আর যদি বুঝিতে আমাদের বেশী কষ্ট হয়, তবে আমরা বড় বড় পারসী শব্দ, আরবী শব্দ ব্যবহার

করিব; আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র করিয়া লইব—তোমাদের মুখাপেক্ষা করিব না।” সুতরাং ভাষার সমস্যাটি এখন বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় “বাঙ্গলা ভাষার গতি” নামে ঢাকায় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি সকলেরই মন দিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গলায় যখন অর্দ্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে তাহাই করিবে—এরূপ আশা করা যায় না। এখন উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গলা কি হইবে স্থির করিয়া লওয়া উচিত। উহার একটা ব্যাকরণ ও অভিধান স্থির করিয়া লওয়া উচিত। লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না। যত দিন যাইতেছে কথাটা ক্রমেই শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমি বলি, যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরাজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। “রেল্‌ওয়েকে” “লৌহবর্ত্ম” করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। একজন সে দিন বড়রাস্তাকে “রাজমার্গ” ও বাঁশ লইয়া যাওয়াকে “বংশপরিচালনা” লিখিয়া বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর একজন শ্বশুর শব্দটাকে ইতুরে মনে করিয়া তাহার বদলে “শ্বশ্রূ মহাশয়” লিখিয়া বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়াছিলেন। এরূপ করা বড়ই অন্যায়।

ভাষাকে সোজা পথে চালান উচিত, এই ত গেল এক কথা। তাহার পরে আর একটা কথা আছে—এই আমার শেষ কথা, সেটা নূতন কথা গড়া। বাঙ্গলার সমাজ এখন আর নিশ্চল নহে। যে ভাবে বহু শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সে ভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানা দেশ হইতে নানা ভাব আসিয়া বাঙ্গলায় জুটিতেছে। যে সকল ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙ্গলায় নাই, তাহার জন্য কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিত ভাষার কথা লইয়াই গোলযোগ, নূতন ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আরও বেগ পাইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পূর্ব্বে দেশে “মিউজিয়ম” ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, “চিত্রশালিকা”। কথাটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়মের ভাবও উহাতে প্রকাশ হইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং মিউজিয়ম বুঝাইল না। এ জায়গায় “মিউজিয়ম” শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে কিন্তু চট্ করিয়া উহার একটা নাম দিয়া বসিয়াছে। তাহারা উহাকে “যাদুঘর” বলে। সুদূর পশ্চিমে উহাকে “আজবঘর” বলে। চিত্রশালিকার চেয়ে এ দুটা কথাই ভাল। উহার একটা চালাইলে দোষ কি? বাঙ্গালায় আকাশে তারা মাপিবার যন্ত্রঘর ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার তর্জ্জমা করিলেন “পর্য্যবেক্ষণিকা।” কথাটা একে ত চোয়ালভাঙ্গা, তাহাতে আবার কঠিন সংস্কৃত—শুদ্ধ কি না সে বিষয়েও সন্দেহ।

হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানেরা অত শত বুঝে না, —তাহারা উহার নাম রাখিল "তারা-ঘর", মোটামুটি উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল, কথাটি শুনিতেও মিষ্ট। তবে উহা চালাইতে দোষ কি? এইরূপ অনেক নূতন জিনিস, নূতন ভাব নিত্যই আসিতেছে; তাহাদের জন্য কথা গড়া একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার বোধ হয়, বাঙ্গলা হইতেই ঐ সমস্যার পূরণ হওয়া ভাল, বাঙ্গলা কথা দিয়াই নূতন কথা গড়া উচিত। নিতান্ত না পারিলে, আসামী, উড়িয়া ও হিন্দী খুজিয়া দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে ভাষার ভাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত। আমরা ত চিরকালই তাহাই করিয়া আসিতেছি, নহিলে "বাতাবী লেবু", "মর্ত্তমান কলা", "চাঁপা কলা" কোথা হইতে পাইলাম? সেইরূপ এখনও সোজা বাঙ্গলায়, সোজা কথায় এই সকল নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত; নহিলে কতকগুলা দাঁতভাঙ্গা কট্‌কটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না। যে দিকেই হউক, ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা করাটা ঠিক নয়। ফরাসীরা যেমন একটা একাডেমী করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্ কোন্ শব্দ চলিবে না ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিত; নহিলে কথার সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভারে ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।

ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ

ইতিহাস-চর্চ্চার যাহা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা বৈজ্ঞানিক পন্থা। দেশকালভেদে বা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে এই পন্থাটি ভিন্ন হয় না, কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রের সকল বিভাগেই ইহা সমান কার্য্যকর, এবং সর্ব্ববিধ সত্যের অন্তরে ইহা নিহিত রহিয়াছে। আমরা যদি জাতীয়তার অভিমানে মত্ত হইয়া, এই প্রথা নব্য ইউরোপীয়গণ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে অবহেলা করি, তবে আমাদেরই ক্ষতি হইবে। জগৎ অগ্রসর হইবে; শুধু আমরা মধ্যযুগে পড়িয়া বিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ হইবে; এবং বিদেশীয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ইতিহাস রচনা করিয়া যাইতেছেন, তাহাই সত্যের বলে বলীয়ান্ হইয়া কিছুদিন পরে আমাদের প্রাচীন ধরণের ঐতিহাসিক জল্পনা কল্পনাকে পরাস্ত করিবেই করিবে।

ঐতিহাসিকের কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিলে ইতিহাস লিখিবার শ্রেষ্ঠ প্রণালী জানিতে পারা যায়। প্রকৃত ইতিহাস অতীতকে জীবন্ত করিয়া চোখের সামনে উপস্থিত করে। সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর

সত্য-নির্দ্ধারণের প্রণালী কি? সর্ব্বপ্রথমে নিজের মনকে এই কার্য্যের উপযোগী করিয়া তোলা।

সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশ-গৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না। প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিব না।

প্রামাণিক ঘটনা হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ। এই জন্য ইউরোপে ইতিহাস রচনায় এক ক্রমোন্নতির ধারা দেখিতে পাই। জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত



অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

পুরাতন মত, পুরাতন গ্রন্থ ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। আইনের পুস্তকের মত ইতিহাসেরও ক্রমাগত নূতন সংস্করণ কিনিতে হইতেছে। পিতামহদের সময় হইতে আগত বিশ্বাসের মূল পরীক্ষা করিয়া, সেই পুরাতন অট্টালিকাগুলি ক্রমাগত নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাদের স্থানে নূতন নূতন গৃহ রচিত হইতেছে।

সভ্যতা, সমাজ ও বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন ইতিহাসের বিষয়ের মধ্যে বটে। ইহার মানবের লিখিত সাক্ষী না পাইলেও মানবের হাতের কাজ কত যুগ ধরিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সঞ্চিত আছে। কিন্তু ইতিহাস বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহার আরম্ভ প্রামাণিক ঘটনা হইতে। প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিচার করা ঐতিহাসিকের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নানা প্রদেশে লিখিত আধুনিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় যে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম আমরা এখনও স্বীকার করি নাই।

সাক্ষ্য পাইলেই আপনারা তিনটি প্রশ্ন করেন,—(১) সর্ব্বাগ্রে কে এজাহার দিয়াছে? সেই first information-এর নকলটা সংগ্রহ হইয়াছে ত? পুলিস ডায়েরীর গোপনীয় নকল কি করিয়া পাওয়া যায়? (২) এই সাক্ষীটি ঘটনা জানিবার কি সুযোগ পাইয়াছিল? এ কি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, না পরের কথা শুনিয়া বলিতেছে? (৩) মোকদ্দমার কোন পক্ষের সহিত ইহার স্বার্থ জড়িত আছে কি?

প্রত্যেক ইতিহাস লেখককেও পদে পদে এই প্রশ্ন তিনটি করিতে হয়। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারা কিছু লিখিয়া গিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত, শ্রেণী বিভাগ, পরস্পরের উক্তির বিরোধভঞ্জন ও সমালোচনা করিয়া, তবে ইতিহাস লেখা আরম্ভ করা উচিত। প্রথমে এইরূপ তালিকা (critical bibliography) সংগ্রহ না করিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যে মহা ভ্রম তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝি না।

বর্ণিত ঘটনার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান সাক্ষীর উক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সমসাময়িক লেখক না থাকিলে, ঘটনার যত অদূরবর্ত্তী সাক্ষী পাওয়া যায় ততই ভাল। পুরাতন বিবরণ সংক্ষিপ্ত বা কর্কশভাষায় লিখিত হইলেও, আধুনিক সময়ের সুদীর্ঘ ও সুললিত বর্ণনার উপরে তাহাকে স্থান দিতে হইবে। আদি গ্রন্থ পাইলে অনুবাদ ব্যবহার করা অনুচিত।

আবার, সাক্ষীটি সত্য জানিবার কতটুকু সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা দেখা আবশ্যক।

আদি সাক্ষীর অনুসন্ধান করায় বিলাতে ইতিহাসক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রবিপ্লবের ন্যায় পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তিয়র্ (Thiers) যে ইতিহাস লিখিয়া যান, এবং যাহা আমাদের দেশে আদৃত য়্যাবটের নেপোলিয়ন-চরিতের মূল, তাহা নানা দেশের সরকারী কাগজ পত্র ও গোপনীয় চিঠি অনুসন্ধানের ফলে এখন শিক্ষিত সমাজে কাব্য বলিয়া ঘৃণায় পরিত্যক্ত হয়।

আসল গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিতে অনুবাদের উপর নির্ভর করা যে কি ভুল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্র্যাণ্ট ডফের "মারাঠাজাতির ইতিহাস" এক উপাদেয় গ্রন্থ; অথচ ডফ্ সাহেবের পণ্ডিত ভুল করায় আফ্জল খাঁর দূতের নাম শিবাজীর দূতকে দেওয়া হইয়াছে। এটি নগণ্য বিষয় নহে; আফজল খাঁর দূত যদি শিবাজীর টাকা খাইয়া নিজ প্রভুকে বধ্যভূমিতে ভুলাইয়া আনিত তবে সে বিশ্বাসঘাতক হইত; শিবাজীর দূতের পক্ষে ঐ কাজ ততদূর নীতি-গর্হিত নহে।

যেখানে অনুবাদ ব্যবহার না করিলে চলে না, সেখানে সর্ব্বশেষে রচিত অথবা সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদটি অবলম্বন করিতে হইবে।

কখন কখন বাধ্য হইয়া অনুবাদের অনুবাদ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কোটেসনের কোটেসন তস্য কোটেসন কেন ব্যবহার করিব? ইংরাজীতে একটি বড় কাজের কথা আছে, "Always verify your references", অর্থাৎ যাঁহার মত উল্লেখ করিলে, তিনি ঠিক সেই কথা গুলি বলিয়াছেন কি না তাহা ভাল করিয়া দেখিবে। আমি যে পরের বচনটি তুলিয়া দিলাম, তাহা কাহার বচন এবং কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহা নির্দ্দেশ না করিলে সাহিত্যিক অসাধুতা হয়, এবং ভ্রম সংশোধনেও বাধা পড়ে।

ইতিহাস-লেখক বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ প্রমাণ-পঞ্জী দিতে বাধ্য। ইতিহাস বর্জ্জাইস অক্ষরের ফুটনোটে আবৃত হওয়া আবশ্যক; ইহা পাণ্ডিত্য ফলাইবার উপায় নহে; ইহা ন থাকিলে গ্রন্থের মূল্যহানি হয়। প্রত্যেক প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে টীকা দিয়া তাহাতে প্রামাণিক গ্রন্থের নাম, সংস্করণ বা প্রকাশের বৎসর, পৃষ্ঠাঙ্ক প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুদ্ধ করিয়া উল্লেখ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন।

এখন ইতিহাস রচনার আরও উচ্চতর সোপানে চড়া যাউক। ইতিহাস-লেখক ব্যক্তিগত ভ্রম সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; একই ঘটনার উপর ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আলোকপাত করিবেন। শত্রুপক্ষ ইহা বলিয়াছে, মিত্রপক্ষ উহা বলিয়াছে, বিদেশী ভ্রমণকারী এরূপ দেখিয়া গিয়াছে, স্বদেশী কবি ওরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে —এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন্ সাক্ষীটি বিশ্বাসযোগ্য এবং কতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা স্থির করিলে, তবে অতীত ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। যদি ইতিহাসে কোন পক্ষ প্রথমে এক তর্ফা ডিক্রী পান, তবে তাহা এক দিন আপসেট্ হইবেই হইবে, কারণ জগতের জ্ঞানের আদালতে আপীল কখন তমেয়াদি দোষে বারিত হয় না; শত শত বৎসর পরেও অন্যায় মতের বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে; আপীলের চূড়ান্ত সীমা সত্য নির্দ্ধারণ পর্য্যন্ত গিয়া তবে থামে।

ঘটনার সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াই ঐতিহাসিকের কার্য্য শেষ হইল না। অতীত যুগের বাহ্য আবরণ, তাহার গায়ের চামড়াটি, চক্ষুর সম্মুখে সহজে আনা যায়; কিন্তু তাহার হৃদয়টি দেখাইতে না পারিলে

প্রকৃত ইতিহাস হয় না। শুধু রাজা রাজ্য পরিবর্ত্তন, যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ইতিহাস নহে। ইতিহাস দর্শন নামের যোগ্য, কিন্তু পদে পদে দৃষ্টান্ত নজীর দেখাইয়া এই দর্শন লিখিতে হয়। দার্শনিক না হইলে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না।

আমাদের সম্মিলন বঙ্গভাষা-ভাষীদিগের। সুতরাং ঐতিহাসিক চর্চ্চার অত্যাবশ্যক গ্রন্থগুলি বাঙ্গলা আকারে সাধারণের হাতে দিতে না পারিলে আমাদের কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইবে। প্রাচীন লেখমালার উদাহরণ হিন্দীতে গ্রন্থকারে একত্র ছাপা হইয়াছে; বাঙ্গলায় হয় নাই। (নব প্রকাশিত "গৌড়লেখমালা" আংশিক গ্রন্থ।) ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ রচিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং ম্যাকডনেলের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় অনুবাদ করা হয় নাই, ইহা আমাদের মণ্ডলীর পক্ষে লজ্জার বিষয়। গুজরাতী ভাষা বাঙ্গলার চেয়ে কত কম লোক বলে, অথচ গুজরাতী ভাষার সেবকগণের আগ্রহ, শ্রমশীলতা ও দূরদর্শিতার ফলে সর্ব্ববিধ বিভাগের পুস্তকের অনুবাদে গুজরাত ছাইয়া গিয়াছে। আর আমরা বঙ্কিম রবীন্দ্রের মৌলিকতার গর্ব্ব করিয়া অলস হইয়া বসিয়া আছি! লোকশিক্ষার দিকে দৃষ্টি নাই।

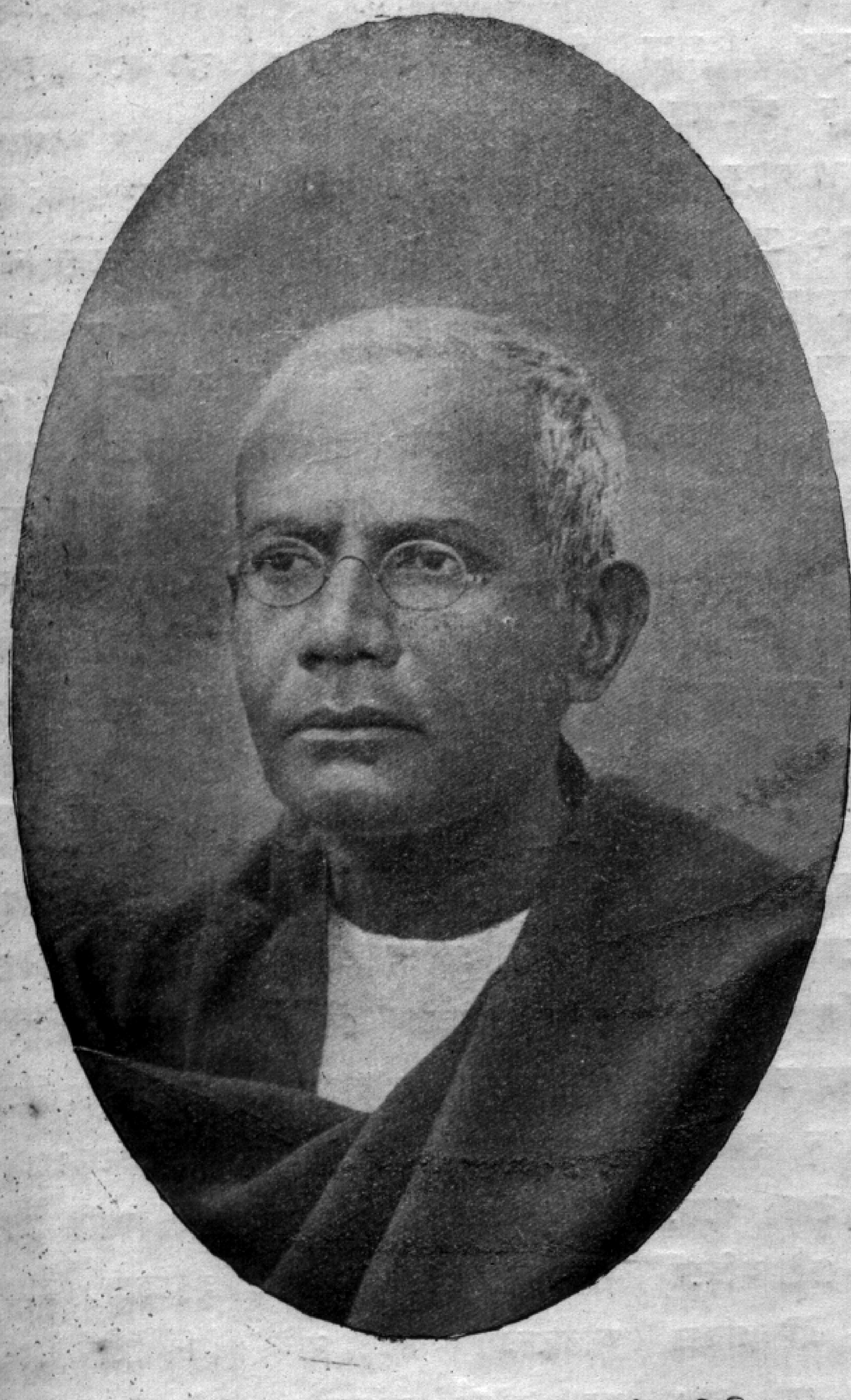
ইতিহাস কাব্য নহে। চিত্তবিনোদক ললিত আখ্যান অথবা শুষ্ক গবেষণাই ইহার চরম ফল নহে। অধ্যাপক সীলী সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন রাষ্ট্রনেতার, সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথ-প্রদর্শক মহাবন্ধু। ইতিহাসের সাহায্যে অতীত কালের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞান বর্ত্তমানে প্রয়োগ করিতে হইবে। দূরবর্ত্তী যুগে বা দেশে মানবভ্রাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি কারণে পড়িলেন, রাজ্য সমাজ ধর্ম্ম কিরূপে গঠিত হইল, কি জন্য ভাঙ্গিল, সেই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের নিজের জীবন্ত সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। অতীত হইতে উদ্ধার করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা আমাদেরই ভবিষ্যতের পথে রশ্মিপাত করিবে। ইহাই ইতিহাস চর্চ্চার চরম লাভ।

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিভাষণ

বিজ্ঞান কি তাহা বুঝা যাউক। অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ বলেন, বিরূপং জ্ঞানং বিজ্ঞানং। বিভিন্ন রূপের যে জ্ঞান তাহা বিজ্ঞান। চিত্রশিল্পে বিভিন্ন মূর্ত্তি, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে শব্দের নানা রূপ প্রদর্শিত হয়। এই কারণে শিল্প ও ব্যাকরণ বিজ্ঞান। কিন্তু এই অর্থ আমাদের আলোচ্য বিজ্ঞানের নহে। নানারূপে প্রকৃতি কার্য্য করিতেছেন; প্রকৃতির এই যে অসংখ্য রূপ, রূপ-পরিবর্ত্তন-প্রবৃত্তি তাহার জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। ক্ষিতি-অপ্‌ তেজাদি পঞ্চভূত আমাদের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়।

এই পাঁচভূতের জ্ঞান,—বিজ্ঞান, ভৌতিক বিজ্ঞান। প্রকৃতি বহুভেদবিশিষ্ট বিচিত্র। ইহার উপাদান জড় কল্পিত হইয়াছে; শক্তি জড়কে স্পন্দিত করিতেছে। এই জড়শক্তি-ময়ী জ্ঞান বিজ্ঞান, জড়-বিজ্ঞান। আমরা যে ভাবেই দেখি, সেই একেরই জ্ঞান; এই হেতু বিজ্ঞান সংজ্ঞা দ্বারা, প্রাকৃতিক, ভৌতিক বা জড়-বিজ্ঞান বুঝি।

প্রকৃতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিছুই দেন না; সব বুদ্ধিবলে কাড়িয়া লইতে হয়। আমি আহার বিনা পড়িয়া থাকি, প্রকৃতি বলেন কর কি! কিন্তু এই পর্য্যন্ত। তারপর আমাকে দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়া খুজিয়া লইতে হইবে। কোথায় কোন্ দেশে কোন্ গাছে সুমিষ্ট ফল পাকিয়াছে, তাহা আমাকে খুজিয়া লইতে হইবে। তেমন ফল আমার দেশে আমার গ্রামে বাড়ীর কাছে ফলাইতে পারি কি না, এই এষণা আসিবে। এইরূপ এষণা হইতে বিজ্ঞানের জন্ম।



রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

কিন্তু এত চেষ্টা এত গবেষণা কাহার নিমিত্ত? প্রকৃতি কার্য্য কারণের হেতু; পুরুষ সুখ দুঃখের হেতু। সেই পুরুষের সেই আমার নিমিত্ত, আমার বর্ত্তন নিমিত্ত বিজ্ঞান। আমাকে ছাড়িয়া বিজ্ঞান নহে। আমার সৌখ্যচিন্তা বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য না হইলে বিজ্ঞানে কি ফল? আজিকার কালিকার আমি নহে, এ গ্রামের সে গ্রামের স্বদেশের বিদেশের আমির সৌখ্য নহে, মানবের সৌখ্য, বিজ্ঞানের চিন্তা। ইহার দেশ বিস্তীর্ণ, কাল বিস্তীর্ণ,

পাত্র বিস্তীর্ণ। এই হেতু বিজ্ঞানের সমাদর, পূজা, বিজ্ঞানের মহত্ত্ব।

দেশে বিজ্ঞানের স্থিতি

কি কারণে এদেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, তাহার পর্য্যালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। ডাঃ বসু কিংবা ডাঃ রায় কিংবা তাঁহার দুই চারিজন ভাগ্যবান ছাত্রের দ্বারা দেশের দশা ফিরিতে পাবে না। সকল বিষয়েই মধ্যম লইয়া বিচার করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধানে ছাত্রের জ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ় হইতেছে। এখনও ইহার ফলভোগের সময় আসে নাই, কিন্তু অধিক প্রত্যাশার হেতুও দেখিতেছি না। অধিকাংশ বিজ্ঞানকর্ম্মশালায় ছাত্রেরা চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে, যে বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়াছে, যাহা ছাত্রেরা শুনিয়াছে দেখিয়াছে, তাহারই পুনরাবৃত্তি করে। ইহাতে তাহাদের হাত আসে, কিন্তু বুদ্ধি আসে না। তাহারা অনুকরণে দক্ষ হয়, প্রকরণে হয় না। বলা বাহুল্য, প্রকরণের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মে অভ্যাস জন্মিতে পারে। কলেজে প্রথম বর্ষ হইতে ছাত্রকে গবেষণায় প্রবৃত্ত করিতে পারিলে তাহার কর্ম্মশক্তি, আত্মপ্রত্যয় জন্মে, শিক্ষায় উৎসাহ হয়। কখনও কোন ছেলেকে মক্স করিতে ব্যগ্র দেখিয়াছেন কি? দেশের ছুতারের ছেলে কি বাটালি করাত লইয়া কিছুদিন হাত করে, না প্রথম হইতেই ছোট ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্য গড়ে, কিংবা পিতার সাহায্য করে? চেষ্টা করিলে আমিও পারি, আমিও মানুষ; এই প্রত্যয় দৃঢ় হইলে আর কিছু দেখিতে হয় না। অন্ততঃ জ্ঞানান্বেষণা, গবেষণার নামে ভয় ঘুচিয়া যায়। অবশ্য, কথাটা বলা যত সোজা, কথার মতন কাজ করা তত সোজা নহে। তথাপি এই আদর্শ ধরিয়া চলিতে চলিতে উপায়ও আসিতে পারিবে। আমরা যে বিজ্ঞানের অন্বেষণ করিতেছি, তাহা ধনশালী ইয়ুরোপের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যয়সাধ্য; ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় যেখানে ছাত্রের শিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা আছে, সেখানে আরও ব্যয়সাধ্য। অথচ আমরা সে দেশের সিদ্ধির সহিত এদেশের কৃত কর্ম্মের তুলনা করিতে যাই।

বিজ্ঞানার্থী ছাত্র নির্ধন, দেশও নির্ধন; ধনসাধ্য বিজ্ঞান তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানের উদ্দেশ্য—ছাত্রকে কেবল বিনয় ও জ্ঞানদান নহে। সে উদ্দেশ্য হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি দুইটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখিতেন না, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় শিখিবার, মনে রাখিবার পরীক্ষা করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণকে এক এক বিষয়ে প্রাজ্ঞ করিতে অভিলাষী। বিলাতে যাহা সম্ভাবিত হইয়াছে, এদেশেও তাহা হইবে, এই আশায় বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সে আশা সম্যক্ ফলবতী হইতেছে না। সাধারণের নিমিত্ত বিশেষ বিদ্যা বিশেষ বিজ্ঞান অনাবশ্যক মনে হইতেছে।

মূর্ত্ত-বিজ্ঞান সাহায্যে আজি কালি কি অভাবনীয় কাণ্ড সাধিত হইতেছে, তাহা আমাদের অবিদিত নাই। বিলাতী দীপশলা হইতে তড়িৎদীপের উদ্ভাবনা পর্য্যন্ত

চিন্তা করিলেই মাথা ঘুরিয়া পড়ে। শস্ত্র-চিকিৎসায়, বিষের প্রতিষেধে, অনুজীব ধ্বংসের উপায়ে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিলাতী মূর্ত্ত-বিজ্ঞান বিশেষতঃ মূর্ত্ত-রসায়ন ও চিকিৎসা-বার্ত্তার উন্নতি নিমিত্ত বহু বহু লোক অহোরাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন।

অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান হইতে মূর্ত্ত-বিজ্ঞানের জন্ম। কিন্তু মূর্ত্ত-বিজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অমূর্ত্ত বিজ্ঞানের প্রসার বাড়িয়াছে। প্রকৃতির শক্তি কাড়িয়া লইতে হইলে সে শক্তির পরিচয় প্রথমে চাই। গেলিলিও লণ্ঠন দুলিতে দেখিয়া দোলকের দোলনসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানভিক্ষু ছিলেন। তাঁহার আবিষ্কারে সংসারের কি হিত হইবে, তাহা তিনি ভাবেন নাই।

বিজ্ঞান দ্রব্য গড়ে না, কলা গড়ে। বিজ্ঞান কলা গড়িবার সন্ধান বলিয়া দেয়। বিজ্ঞান জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট, কলা-বিজ্ঞান (কলার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান) জ্ঞান ও কর্ম্মের যোগ ঘটায়। কৃষি চিকিৎসা প্রভৃতির অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান বার্ত্তা-বিজ্ঞান। কলা বিজ্ঞান ও বার্ত্তা-বিজ্ঞান মূর্ত্ত-বিজ্ঞান। অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান বিস্তীর্ণ, জগৎ-ব্যাপী; আকাশের নাড়ী নক্ষত্র হইতে পাতালের নীচে কূর্ম্ম ছিল কি না তাহার অনুসন্ধান করে। এই বিশাল বিজ্ঞানের মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। এই কারণে বিজ্ঞানের নানা শাখা-কল্পনা। ইহাদের মধ্যে কিমিতি-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অন্য শাখারও উপস্তম্ভ। এই দুই বিজ্ঞান অধিকাংশ মূর্ত্ত-বিজ্ঞানের আদি। মূর্ত্ত-বিজ্ঞান ক্ষুদ্র; আমার তোমার যাহাতে হিত হইতে পারিবে তাহার বিজ্ঞান। এই কারণে, খণ্ডিত। কিন্তু অধিকারী ভেদ ত আছে। যে জ্ঞান কেবল জ্ঞান না থাকিয়া ফলদায়ক হয় এবং যাহা লাভ করিতে ছাত্রের উৎসাহ হয়, তাহা মূর্ত্ত-বিজ্ঞান হউক, কলা-বিজ্ঞান হউক, তাহা হিতকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মেডিকাল কলেজ, টিচার-ট্রেনিং কলেজ, ল-কলেজ, এ সব কলেজের ছাত্রদিগের জ্ঞান ও বিনয় হয় না বলিতে পারি না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকাল কলেজ ধরুন। এখানে বার্ত্তার আবশ্যক নানা বিজ্ঞান শেখানা হয়, সবই খণ্ডিত; মেডিকাল কলেজে সুস্থ দেহের রক্ষা ও রুগ্ন দেহের আরোগ্য এই দুই বিষয় লইয়াই বিশাল বিজ্ঞান শেখানা হয়। কিন্তু এই দুই কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র ও অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান-কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রের তুলনা করুন। শেষোক্ত ছাত্র জীবন-সংগ্রামের যোগ্য নহে। বিশ বৎসরের যুবক বি, এ, বিস্‌সি পাশ করিয়া খণ্ডিত জ্ঞানের ফলে সংসার-ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ থাকে।

অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান যিনি শিখিতে চান শিখুন, কিন্তু মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিবার আয়োজন আবশ্যক। মূর্ত্ত-বিজ্ঞান দ্বারা অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান-জাত বিনয় লাভ হইবে, লৌকিক জ্ঞান হইবে, আর সেই জ্ঞান প্রকৃত হইবে। ইহাতে পারগ ছাত্র হাকিম হউন, উকিল হউন, এই দেশের সম্পর্কে থাকিবেন, তাঁহার অধীত বিদ্যা প্রয়োগের সুযোগ পাইবেন, এবং যত্ন করিলে মূর্ত্ত মার্গ ধরিয়া

অমূর্ত্ত মার্গে উপস্থিত হইতে পারিবেন। ফলে দেশে বিজ্ঞান-বিস্তার হইবে। এত দিন অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিক্ষার ফল দেখা গেল; এখন মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিলে কি হয়, তাহাও ত দেখা কর্ত্তব্য।

দেশে বিজ্ঞানপ্রচারের তৃতীয় অন্তরায় বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা। এই বিদেশী ভাষা, ইংরেজী ভাষা এত কঠিন যে, শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত দশ বার বৎসরের যত্নে ও শ্রমে যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত হয়। মস্তিষ্কের শক্তি অফুরন্ত নহে, আমাদের বয়সও নহে। এই ভাষা শিখিতে আমাদের কত রক্ত জল হইতেছে, কত শক্তি তাপ হইতেছে, তাহা চিন্তা করুন। অথচ এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা আমাদের কাম্য নহে; কাম্য বিজ্ঞান। কাম্যের চতুর্দ্দিকের কণ্টকের প্রাকার ভেদ করিতেই শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় হইতেছে। ইহাও সহ্য হইত; মাতৃভাষায় না শেখাতে বিদেশী বিজ্ঞান বিদেশী থাকিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু বলিতে কিছু লিখিতে হইলে বিদেশী ভাষায় বলিতে লিখিতে হইতেছে; চিন্তা করিতে হইলেও বিদেশী শব্দমূর্ত্তির উপাসনা করিতে হইতেছে। কারণ, অন্য সাধন জানা নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে, সভাসমিতি আপিশ আদালতে যাইতে হইলে গৃহবেশ ত্যাগ করিয়া যেমন সভ্যবেশ পরিধান করি, এবং সেখান হইতে আসিয়াই সে বেশ ত্যাগে সুস্থ বোধ করি, আমাদের পক্ষে বিজ্ঞানও তেমন হইয়াছে। উহা দেশের ধাতুতে মিশিতেছে না, বাহিরে বাহিরে শোভা-সম্পাদনের নিমিত্ত থাকিতেছে। ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিতে ছাত্রের যত বৎসর লাগিতেছে, মাতৃভাষায় শিখিলে অর্দ্ধেক সময় লাগিত না।

*　　*　　*

কৃষিবার্ত্তা দ্বারা বিজ্ঞান প্রচার

কৃষিকর্ম্মে যে বিজ্ঞান আবশ্যক, অথবা কৃষিকর্ম্মের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ইহা মূর্ত্ত-বিজ্ঞান, এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ইহার অমূর্ত্ত আকার। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানেও অপর সমুদয় বিজ্ঞান আবশ্যক হয়। আকাশ হইতে পাতালের স্থাবর অস্থাবর সকল দ্রব্যের, কোন স্থলে গভীর কোন স্থলে অগভীর জ্ঞান আবশ্যক হয়। মৃত্তিকা-জল-বায়ুর ভৌতিক বিজ্ঞান, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের স্বভাব নির্ণয় প্রভৃতি হইতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান পৃথক্ করিতে পারা যায় না। বৃক্ষের জীবনধারণ, বর্দ্ধন, পোষণ, সন্তান-জনন প্রভৃতি ব্যাপার ভৌতিক জড়ধর্ম্ম বলিয়া অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই। বস্তুতঃ যখনই জন্মমরণ বলি তখনই এক অজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট, বোধ হয় চির অজ্ঞেয়, সত্ত্ব স্মরণ হয়। বাহ্য-প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষেত্র জীবকে কতদিকে নিয়মিত করিতেছে, তাহারই মধ্যে জীব জন্মিতেছে বাড়িতেছে মরিতেছে, কিছু রাখিয়াও যাইতেছে। ইহার তুলনায় ভানুমতী-বাজি কিছুই নয়। আচার্য্য বসুর জগৎবিখ্যাত আবিষ্কারে জঙ্গমের সহিত উদ্ভিদের বিলক্ষণ সাদৃশ্য স্পষ্ট হইতেছে। রাসায়নিকের গোটা দশ বার মূল পদার্থ পাইলে এক একটা বৃক্ষ জীবিত বর্দ্ধিত

ফলপ্রসূ হইতে পারে, কিন্তু রসায়নবিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু আছে।

সেটা কি, কে জানে। কিন্তু জানি সর্ষপবীজ ও বটবীজ একক্ষেত্রে উপ্ত হইলেও সর্ষপ ও বটবৃক্ষ এক হয় না। কৃষক ভূয়োদর্শনে ভর করিয়া শস্য জন্মাইতেছে, বীজ সংগ্রহ করিতেছে, মাটি বিচার করিতেছে, বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিতেছে, ক্ষেত্র বীজাঙ্কুরোৎপত্তির যোগ্য করিতেছে, বৃক্ষের শত্রু বিনাশ করিতেছে, নবজাত বৃক্ষশিশু পালন করিতেছে। মাটি জল বায়ু রবিকর তেজ অব্যাহত রাখিয়া ফলের প্রত্যাশা করিতেছে, একটী বীজ হইতে বহু পাইতেছে। বীজের সেটা কি শক্তি যাহাতে তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াও পূর্ণ থাকিতেছে? যে সর্ষপ সে সর্ষপ, যে বট সে বট থাকিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বহু হইতেছে। জীবন ত দ্রব্যগুণ বলিতে পারা যায় না। অথচ সরিষা ক্ষেতের দুইটি সরিষা গাছ অবিকল এক নহে, আম-বাগানের সব গাছের আম সমান বড়, সমান মিষ্ট নহে। তবে, বৃক্ষের আকার-প্রকার স্বভাব চরিত্র পরিবৃত্তিশীলও বটে। দেখিলে বোধ হয়, প্রকৃতি জাতিভেদ করেন নাই, আমরা করিয়াছি। আমাদের স্বল্প জ্ঞানে ভেদাভেদ আসিয়াছে। যাহা বিজ্ঞান বলি, বিজ্ঞানের সূত্র বলি, তন্ত্র বলি, তাহা মানুষের কল্পিত রচিত; প্রকৃতির তন্ত্র আমরা জানিতে চাই, জানিতে পারিতেছি না।

ফলোৎপত্তির পক্ষে বীজ প্রধান কি ক্ষেত্র প্রধান, তাহা লইয়া পূর্ব্বকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত বিলক্ষণ বিতর্ক চলিতেছে বৃক্ষের, ইহা ডালপালার ফুলফলের বীজের স্থিরতা আছে, নাই-ও। ইহা নিত্য দেখিতেছি। একের মধ্যে বহুরূপতার দৃষ্টান্ত জীবেই পাই। যখন ডাল হইতে গাছ হয়, এবং বহু বৃক্ষ বীজ বিনা অরণ্য হইয়া পড়ে, তখন বীজোৎপত্তির বিচিত্র ব্যবস্থা কেন হইয়াছে?

বস্তুতঃ—কৃষিকর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, বীজকর্ম্ম ও ক্ষেত্রকর্ম্ম। বীজকর্ম্মে বীজ নির্ব্বাচন, বপন, অঙ্কুরোদ্গমন, জাত বৃক্ষের পালন, এবং শেষে বীজ রক্ষণ। ক্ষেত্রকর্ম্মে মাটির উৎপত্তি স্থিতি জলবায়ু ও রবি তেজ নির্ব্বাহ, বৃক্ষের শত্রুর বিনাশ প্রভৃতির নিমিত্ত কর্ম্ম। ইহার এক এক কর্ম্মে প্রচুর বিজ্ঞান আছে, অনেক গবেষণা করিবার আছে।

বস্তুতঃ, কৃষি-বিজ্ঞান এত অজ্ঞাত যে ভূয়োদর্শন ব্যতীত কৃষি চলিতে পারে না। এ কারণ, জমি নূতন, বীজ নূতন হইলে অর্থাৎ ক্ষেত্র ও বীজ দুইই অজ্ঞাত হইলে ভাবী ফলও অজ্ঞাত থাকে। মৃৎকুণ্ডে দুই চারিটা আখ্ গাছ যত্নে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিতে পারা যায়; কিন্তু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, এবং সেটা কাজের কথা, কৃষকের বর্ত্তমান সহায়-সম্পত্তি লইয়া পারা যায় কি না, সেটাই গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যার পূরণ না হইলে কৃষি-বিজ্ঞান আর উদ্ভিদ-বিজ্ঞান প্রায় এক থাকিয়া যায়, কৃষি-বার্ত্তা দাঁড়াইতে পারে না। দেশের কৃষক জানে, গোবর জমির "সার", এ কারণ সারকুড়ে সারগাদা করিয়া রাখে। গোবরের উপাদান কি, তাহা জানে না; কিন্তু জানে কোন্ মাটিতে কোন্ ফসলের পক্ষে গোবর হিতকর, কিসের

পক্ষে থইল হিতকর। মাঠের মাটি পরীক্ষা করিয়া জানি, জমিতে নাইট্রোজেন ফস্‌ফরস্‌ ও পটাসিয়মের ন্যূনতা আশঙ্কা করিবার কথা। সব মাটিতেই কিছু না কিছু আছে, কিন্তু একটার ন্যূনতায় বৃক্ষ-জীবন-ক্রিয়া আটকাইয়া যায়। নাইট্রোজেনের সদ্ভাব কদাচিৎ হয়, এ বৎসর সদ্ভাব হইলেও পর বৎসর হয় না। কারণ বৃক্ষকে যে সোরা আকারে নাইট্রোজেন লইতে হয়, তাহা জলে ধুইয়া চলিয়া যায়, জমিতে থাকে না, এ কারণ কৃষক গোবর, গোমূত্র, অন্য পশুর বিষ্ঠা মূত্র চর্ম্ম ও শৃঙ্গ চূর্ণ, গাছ-পচা প্রভৃতি দ্বারা নাইট্রোজেন নির্ব্বাহ করে। বরাহের বৃহৎ-সংহিতায়, অগ্নিপুরাণে শুক্রনীতিতে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ আছে। পূর্ব্বকালে দ্রব্যগুণ প্রচুর আলোচিত হইয়াছিল। আমাদের আয়ুর্ব্বেদে যে দ্রব্যগুণ বর্ণিত আছে, তাহা যে কত ভূয়োদর্শনের ফল তাহা ভাবিলে এই বিজ্ঞানের দিনেও পূর্ব্বপিতামহদিগের প্রতি মস্তক আপনি নত হয়। দ্রব্যগুণ জানিলে লৌকিক কাজ চলে বটে বিজ্ঞান এষণা তৃপ্ত হয় না।

কৃষিবার্ত্তা দৃষ্টান্ত করিবার উদ্দেশ্য আছে। (১) দেখা যায় এই বার্ত্তা ধরিয়া দুরূহ বিজ্ঞানে প্রবেশ করিতে পারা যায়। যে সকল ছাত্র মূর্ত্ত-বিজ্ঞান সহজ মনে করেন, তাঁহারা দেখিবেন কৃষিকর্ম্মের এক এক বিজ্ঞান অদ্যাপি অজ্ঞাত। (২) গবেষণা জাগ্রত করিবার পক্ষে কৃষি-বার্ত্তাও সুন্দর উপায়। গবেষণা শব্দের মূলার্থ নাকি গরু খোঁজা। গরু হারাইলে লোক খুঁজিতে বাহির হয়। কৃষি-বার্ত্তায় অসংখ্য গরু, মূল্যবান্‌ গরু খুঁজিবার আছে, যেগুলা পাইলে আমাদের বহু মঙ্গল হইবে। চাণক্য নাকি বলিয়াছেন,—

কৃষির্যস্য ন বাণিজ্যং গাবো যস্য ন ধেনবঃ।
দারিদ্র্যং সততং তস্য গৃহে তস্য কুভোজনম্‌॥

আমাদের গৃহে যে কুভোজন হইতেছে, তাহা পল্লীতে প্রবেশ করিলেই প্রত্যক্ষ হয়।

এই যে অভাব-বোধ হইতে গবেষণা তাহাই প্রকৃত; অন্যের দেখাদেখি যাহা তাহা কৃত্রিম। আরও দেখিতেছি কৃষি ধরিয়া প্রায় যাবতীয় বিজ্ঞান শিখাইতে পারা যায়। বিজ্ঞানের এমন শাখা মনে হইতেছে না যাহা ইহাতে কিছু না কিছু না লাগে। ইহাই ত প্রজাসাধারণের আবশ্যক। বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব প্রচারিত হউক, পরিচিত কৃষি-বার্ত্তার দৃষ্টান্তে প্রচারিত হউক। দেশের আপামর সাধারণে প্রচারিত হউক; পুস্তক দ্বারা হউক, কথা দ্বারা হউক। কিন্তু দেখিবেন যেন পুস্তক ও কথা দ্বারা পাঠক ও শ্রোতার মনে বিজ্ঞানের প্রতি আদর জন্মে। তাহাদের জ্ঞাত বিষয় লইয়া বিজ্ঞান প্রচার করিবেন; কেননা তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। উহ উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু তদ্‌ দ্বারা অজ্ঞতা ঢাকিতে চেষ্টা করিবেন না। পাঠক ও শ্রোতা হাজার বিষয়ে অজ্ঞ হউন, তাঁহারা মানুষ, বুদ্ধিশালী মানুষ, এ কথা কদাপি ভুলিবেন না।

কিন্তু বিজ্ঞান প্রচারের কথা উঠিলেই ইহার ভাষা পরিভাষার প্রশ্ন উপস্থিত হয়। গত বৎসর রামেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে বলিয়াছেন। আমারও মনে হয় আমরা পরিভাষা-সমস্যা যত কঠিন মনে করি, বস্তুতঃ তত নহে। এ বিষয়ে দুই চারি কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

ব্যাকরণের শব্দের চারি প্রবৃত্তি বা অর্থ ধরিয়া শব্দসমূহ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জাতি শব্দ, গুণ শব্দ, দ্রব্য বা সংজ্ঞা শব্দ, এবং ক্রিয়া শব্দ।—এই চতুর্ব্বিধ শব্দের মধ্যে দ্রব্য শব্দ সম্বন্ধে সঙ্কট মনে হইয়াছে। কথাটা এই, অক্সিজেন, হাইড্রো-জেন বলিব, না অন্য নামে বলিব? এরূপ বিতর্ক ওঠে কেন, তাহা বুঝা কঠিন। গরুকে গরু বলিব, না অন্য কিছু বলিব, এই বিতর্ক যেমন, অক্সিজেনকে অক্সিজেন বলিব, না অম্লজান বলিব, সে বিতর্কও তেমন। নূতন দ্রব্য যাহার নিকট পাই, সে যে নাম বলে, সে নামেই তাহা পরিচিত হয়। সকল ভাষাতেই ইহা সাধারণ নিয়ম। ইয়ুরোপে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়; আমরা সে বিজ্ঞান ইংরেজীতে শিখিতেছি। সুধু বাঙ্গালী নহে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক শিখিতেছে। সকল প্রদেশের সহিত মিলিয়া ভারতবর্ষের নিমিত্ত সংজ্ঞা শব্দ নির্ণয় করিতে পারিলে অন্ততঃ কিছু সুবিধা হইত। কোন্ প্রদেশে অক্সিজেনকে কি বলা হইতেছে তাহা জানা নাই। মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষে কেবল সংস্কৃতমূলক ভাষা নহে, মুসলমানী ভাষা ও দ্রবিড় ভাষা চলিত আছে। যদি বিভিন্ন প্রদেশে অক্সিজেনের বিভিন্ন নাম হয়, তাহা হইলে এক ইংরেজী নাম স্থানে পঁচিশ নাম আসিয়া জুটিবে। যদি অধিকাংশ প্রদেশে অক্সিজেন কিংবা ইহার কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত নাম চলে, তাহাতে আমাদের সকলের সুবিধা। প্রদেশভেদে বিভিন্ন নাম না হইলে মাতৃভাষা ছাড়িয়া ইংরেজী পড়িতে গেলে নূতন নাম শিখিতে হয় না। ইয়ুরোপের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বৈজ্ঞানিক নাম কিন্তু এক রহিয়াছে। যে নাম পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, সে নাম আছে, বৈজ্ঞানিক নামও আছে।

একটা কথা এই, কোন কোন ইংরেজী নাম আমাদের মুখে সহজে উচ্চারিত হয় না, আমাদের কানে ভাল শোনায় না। বড় বড় শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, ইংরেজী শব্দ, আরবী ফারসী শব্দ বাঙ্গলাতে কিছু কিছু বিকৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু বিকারের সূত্র জানা আছে। সেই সূত্র ধরিয়া ইংরেজী নাম শব্দের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে বাঙ্গলা ভাষায় স্বচ্ছন্দে মিশিয়া যাইবে।

দর্শন-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অভিভাষণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে অভি-ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—প্রথমেই তিনি দর্শন শব্দের নিরুক্ত নির্ণয়ের চেষ্টা পাইয়াছেন। মাধবা-চার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" পনেরোটি দর্শনের [illegible] দর্শন সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের শিরোমণি। মাধবাচার্য্য যে এস্থলে পারিভাষিক অর্থে দর্শন শব্দের প্রয়োগ করিলেন, হীরেন্দ্রবাবু প্রাচীন শাস্ত্রাদির মধ্যে তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়াছেন। আর্য্যজাতির আদিম গ্রন্থ বেদবেদাদির আলোচনা করিয়া তিনি

দেখাইয়াছেন, সেখানে 'দর্শন' শব্দের কোন পারিভাষিক অর্থ নাই—তথায় 'দর্শন' শব্দের অর্থ 'সম্যক দর্শন' মাত্র। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক বা উপনিষদেও এরূপ পারিভাষিক অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ নাই। সূত্রাকারে যে ষড়দর্শন প্রচলিত আছে, তাহাতেও পারিভাষিক অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ নাই —ব্রহ্মসূত্রে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ আছে কিন্তু তাহাও Philosophy অর্থে নহে। মাধবাচার্য্য যখন 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ' রচনা করেন, তখন 'দর্শন' শব্দ নিষ্কপটে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহেও (যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত) 'দর্শন' শব্দের Philosophy অর্থ বিস্পষ্ট। এই সংগ্রহ-গ্রন্থ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিরচিত কিনা, সে বিষয়ে সংশয় থাকিলেও শঙ্করাচার্য্যের সময়ে 'দর্শন' শব্দ যে পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইত, ইহা নিঃসংশয়। কারণ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তকে উপনিষদ দর্শন বলিয়াছেন।



শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন

২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কৌটিল্যের সময়েও 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। কৌটিল্য মহাভারতের সহিত পরিচিত ছিলেন; অথচ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দর্শন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। হীরেন্দ্রবাবু বলেন, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণ করা দুরূহ; সেইজন্য 'দর্শন' শব্দের এই প্রয়োগ সত্ত্বেও কোনরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং 'দর্শন' শব্দের নিরুক্ত নির্দ্ধারণ করা যায় না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে উপসন্ন শিষ্যকে নির্জ্জনে গুরু যে রহস্য উপদেশ

দিতেন, তাহাকে প্রাচীনেরা উপনিষদ বলিতেন। ঐ সকল রহস্য উপদেশ (গুহ্য আদেশাঃ) সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে রক্ষিত হইত। ইহাদিগের সাধারণ নাম ছিল, উপনিষদ। 'উপনিষদ' শব্দের এই নিরুক্তে সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু 'দর্শন' শব্দের নিরুক্ত তমসাচ্ছন্ন; সে অন্ধকারে পথ নির্ণয় করিতে হইলে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়।

প্রাচীনেরা সত্যের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন। সত্যের সার্ব্বভৌম ভাবের যে ভাবাংশ যে ঋষি অনুভূতি করিয়াছেন, সত্যের সর্ব্বতোমুখ স্বরূপের যে মুখ যাঁহার মানস দৃষ্টির গোচর হইয়াছে, তাহাই তাঁহার 'দর্শন'। সত্য একরূপ। জ্ঞান বিজ্ঞানের উপরিতন যে প্রজ্ঞান, সত্য সেই প্রজ্ঞানলব্ধ। বাদী বিবাদী দর্শনসমূহ সেই সত্যকে অনেকরূপে দর্শন করে। কিন্তু দর্শন অনেক হইলেও যাহা দৃশ্য, যাহা সত্য, তাহা একই। তাহাই যদি হয় তবে দার্শনিকগণের এত বাদ-বিসম্বাদ কেন? সত্য সর্ব্বতোমুখ; সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখা যায়। সকল বাদীরই একথা স্মরণ রাখা উচিত। এক্ষেত্রে যিনি স্বমতকে প্রবদন করেন, যিনি নান্যদস্তি-বাদী—তিনি নিশ্চয়ই অবিপশ্চিৎ।

এই বিরোধী মতবাদের সমন্বয়সাধনের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ, ভগবদ্গীতা। গীতার আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, গীতা প্রচারের সময় ভারতবর্ষে মোক্ষলাভের জন্য চারিটি বিভিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল। সেই মার্গ চতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে—কর্ম্মমার্গ, জ্ঞান-মার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। গীতা ঐ সকল বিভিন্ন সাধনমার্গের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। এই সমন্বয়বাদ গীতার নিজস্ব। গীতা দেখাইয়াছেন যে, জীবের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য কেবল কর্ম্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ধ্যান, কেবল ভক্তি যথেষ্ট নহে। জীবকে ব্রহ্মে বিকশিত করিতে হইলে, এ মার্গ-চতুষ্টয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা আত্মার আংশিক, ঐকদেশিক বিকাশমাত্র হইবে।

কেবল সাধনাসম্বন্ধে নহে, দার্শনিক বাদ বিবাদসম্বন্ধেও গীতাতে এই সমন্বয়ের ভাব অত্যুজ্জ্বল। তাহার ফলে সাংখ্য ও বেদান্ত, দ্বৈত ও অদ্বৈত, বিবর্ত্ত ও পরিণাম—সত্য দৃষ্টির মিলন ভূমিতে সমন্বিত হইয়া গীতা-রূপ কল্পবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

তাহার পর হীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, তত্ত্বদর্শনের কারণ বুদ্ধি নহে—বোধি। মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা তর্কবিচার নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু বোধি ভিন্ন তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না। উপনিষদ যাহাকে 'গুহা,' 'হৃদয়,' 'দহর' আখ্যা দিয়াছেন, তাহাই 'বোধি'। পাশ্চাত্য দর্শন ইহাকে বলিয়াছেন, "Gemuth"—"It is the core of personality. There God and man initialiy meet," বুদ্ধির কোলাহল নিবৃত্ত না হইলে বোধির বাণী শ্রুতিগোচর হয় না।

সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতির জীবনে দুইটি যুগ পর্য্যায়ক্রমে ক্রীড়া করে; এক বোধির যুগ, অপর বুদ্ধির যুগ। বোধির যুগে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়, সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, এবং বুদ্ধির যুগে তত্ত্বের বিচার হয়, সত্যের বিতণ্ডা হয়। বোধির যুগ ঋষির যুগ, বুদ্ধির যুগ ভাষ্যকারের যুগ। ভারতবর্ষে

বোধির যুগ ঋষিদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলে তর্কযুগের আরম্ভ হইয়াছিল, সে যুগের এখনও অবসান হয় নাই। ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, নিবন্ধ, অনুবন্ধ ইত্যাদি এই যুগের কীর্ত্তি। বিতণ্ডার কিন্তু শেষ নাই। বিতণ্ডা ছাড়িয়া আমাদিগকে সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। অভেদে ভেদ না দেখিয়া ভেদে অভেদ দেখিতে হইবে।

এদেশের দার্শনিক সমাজে জীবের স্বরূপ লইয়া যথেষ্ট বাদ বিবাদ আছে। জীব কি অণু না বিভু? জীব কি ব্রহ্মের অংশ না ছায়া? জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? ইহা দর্শনের এক মুল সমস্যা। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। বাদ বিবাদ বিচিত্র নহে। কিন্তু সমন্বয় দৃষ্টিতে দেখিলে ইহার সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব নহে। গীতার মতে পুরুষ তিন:—ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষ = পরমাত্মা। অক্ষর পুরুষ = অধ্যাত্মা এবং ক্ষর পুরুষ = জীবাত্মা। উত্তম পুরুষকে শাস্ত্রে চিদাকাশ বলে; অক্ষর পুরুষ = চিন্মাত্র, যাহাকে কূটস্থ বলে; এবং ক্ষর পুরুষ = চিদাভাস। চিদাকাশ সিন্ধু, চিন্মাত্র যেন বিন্দু। এই ভাবে জীব ব্রহ্মের অংশ।

ইহার পর হীরেন্দ্রবাবু দর্শনালোচনার প্রকার ও প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বঙ্গদেশে সম্প্রতি যেভাবে দর্শনালোচনা হইতেছে তাহা সন্তোষজনক নহে। একপক্ষে প্রাচ্যদর্শনের আলোচনা মন্দীভূত, অপর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্যদর্শনের আলোচনাও আশানুরূপ হইতেছে না। এ ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিতে হইলে আমাদের একটি প্রধান কার্য্য দার্শনিক পরিভাষা-সংকলন। বাংলা ভাষায় দর্শনের পঠনপাঠন এবং রীতিমত দর্শনচর্চ্চা দেশ মধ্যে প্রচলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পরিভাষার প্রয়োগ করিবেন। সেই সকল শব্দের মধ্যে যাহা যোগ্যতম, তাহাই টিঁকিয়া যাইবে। এই সঙ্গে আমাদিগকে বহু আয়াস ও সময় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত দর্শনসাহিত্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের সূচী সংকলন করিতে হইবে।

পরিভাষা রচনা ও শব্দসূচী সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামীয় দর্শনশাস্ত্রেরও অনুবাদ প্রয়োজন। পাশ্চাত্য ভাষায় যেমন নানা প্রকারের Philosophical Series প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বঙ্গভাষাতেও সেইরূপ চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রধান প্রধান দার্শনিকের দার্শনিক মতের পরিচায়ক নিবন্ধ এবং দার্শনিক মতবাদের ইতিহাস বঙ্গভাষায় রচনা করিবার ব্যবস্থা হৌক। ভারতীয় ও য়ুরোপীয় Logic Ethics ও Psychologyর সার সঙ্কলন ও সমন্বয় করিয়া এক এক খানি উৎকৃষ্ট তর্কবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও কর্ত্তব্য-বিজ্ঞান রচনা করিবার উদ্যোগ করা হৌক।

সম্প্রতি বঙ্গদেশে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন মৌলিক অনুসন্ধানসমিতি গঠিত হইয়াছে, দর্শন ক্ষেত্রেও তেমনই সমিতি গঠিত হৌক। ভারতীয় দর্শনের বিবিধ

মতবাদের আদি গ্রন্থের অনুসন্ধান চলুক। সূত্র, ভাষ্য প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া অনুসন্ধান হৌক! বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন এই সকল গুরুতর অথচ অত্যাবশ্যক কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন। এ সম্মিলন উৎসবক্ষেত্র নহে, কর্ম্ম-ক্ষেত্র। কর্ম্মের সফলতায় মণ্ডিত করিয়া সম্মিলনকে সার্থক ও সমৃদ্ধ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

আধুনিক ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

***

সেই একই সময়ে, ইংরাজ সরকার প্রথমে সংস্কৃত ফারসী ও আরবী ভাষায়, পরে ইংরাজি ভাষায়, পরিশেষে হিন্দী বাঙ্গালা তামুল প্রভৃতি লোক প্রচলিত ভাষায় শিক্ষাবিস্তার করিতে লাগিলেন; মুসলমান ও হিন্দু এবং নীচবর্ণের সকল লোকই সকল ধাপের শিক্ষাই লাভ করিতে লাগিল। এই রূপে, লোকপ্রিয় লেখকেরা, বৈষ্ণব সংস্কারকেরা এবং মুসলমান অধিপতিরা যে বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইংরাজ সেই বিপ্লব সম্পূর্ণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরের মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে, ব্রাহ্মণ শিক্ষালাভ করিত ও ব্রাহ্মণেতর লোকদিগের শিক্ষা-লাভের অধিকার পর্য্যন্ত ছিল না। এক্ষণে এই বৈষম্যের স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট রহিল।

অবশ্য, এই শিক্ষার সংস্কারসাধন বহু বৎসর সাপেক্ষ। কেবলমাত্র ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি, এই শিক্ষাদানের কতকগুলি মূলসূত্র নির্দ্ধারিত হয়:—গৌণশিক্ষা ইংরাজি ভাষায় দেওয়া হইবে, মুখ্যশিক্ষা লৌকিক ভাষায় দেওয়া হইবে। অবশ্য, কৃষিজীবীদিগের অধিকাংশই এখনও অনক্ষর এবং লোক-সংখ্যার মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যা দশভাগের নয়-ভাগ। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী যুবকেরা এই শিক্ষার সুযোগ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল। ইংরাজি শিখিবার জন্য তাহারা যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ১১৩৮ অব্দে Sir Charles Trevelyan লিখিয়াছিলেন যে, "পুস্তকের কাঙ্গাল বালক-গণ, গঙ্গার নৌকাগুলাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।" ১৮৩৪ অব্দে স্কুলগ্রন্থ-সমিতি কর্ত্তৃক ৩১,৫০০ ইংরাজি গ্রন্থ এবং ৫২ খানা মাত্র আর্বি ও সংস্কৃত গ্রন্থ বিক্রীত হয়। (১)

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন, ইংরাজি মুদ্রাযন্ত্রের ও দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করিল। বঙ্গদেশে, কতকগুলি সাময়িক পত্রের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি হইল; যথা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "সংবাদ প্রভাকর" ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক পরিচালিত "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা।"

এই শিক্ষার আন্দোলন হইতে কতকগুলি গুরুতর ফল প্রসূত হইল। ধর্ম্ম-বিভাগে, রাজা রামমোহন রায় একেশ্বরবাদ প্রচার

---

(১) ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজকর্ম্মে ফার্সিভাষার ব্যবহার রহিত হয়। আদালতে দেশের চলিত

করিলেন, হিন্দুদিগের অন্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাষ্ট্রনীতি বিভাগে অনেকগুলি হিন্দু উদার প্রতিষ্ঠানাদির দাবী করিল; এবং আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কতকগুলি যুবক জাতিভেদ প্রথা পরিত্যাগ করিল, য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিল, গোমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল, এবং স্ত্রীলোকদিগকে গৃহ হইতে বাহির করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল (কিন্তু উহারা এই প্রতিজ্ঞা খুব কমই পালন করিল!)

১৮৪০—১৮৫০ পর্য্যন্ত, যে কেহ একটু লেখাপড়া জানিত, সেই যাহা কিছু ইংরাজি তাহাই ভাল বলিত। মধুসূদন, যিনি কিয়ৎকাল পরে বাঙ্গলার একজন বড় কবি হইয়াছিলেন —তিনি এই ইংরাজি পদ্যটি রচনা করেন:—

"I sigh for Albion's distant shore
Its valleys green, its mountains high;
Though friends, relations I have none.
In that far clime! yet oh! I sigh
To cross the vast Atlantic wave.
For glory or a nameless grave."

দূর-শ্বেতদ্বীপ তরে, পড়ে মোর আকুল নিশ্বাস,
যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ
নাহি সেথা আত্মজন, তবু, লঙ্ঘি' অপার জলধি
সাধ যায় লভিবারে যশ কিম্বা অ-নামা সমাধি॥

***

যে দিগ্‌বিজয়ে সামরিক অভিযান ও রাষ্ট্র-নৈতিক বন্দোবস্ত হয় আরম্ভ এবং শিক্ষার পরিপুষ্টি, মুদ্রাযন্ত্র ও গ্রন্থাদির উন্নতি সাধিত হয়, সেই বিজয়কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য ইংরাজেরা বুঝিলেন, বড়বড় সরকারী-পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক। বহুব্যয় সাপেক্ষ পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ঋণগ্রস্ত হইবার ভয়ে কোম্পানী বহুকাল পর্য্যন্ত উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ভ্রমণের জন্য ভারতে ভাল রাস্তা ছিল না। বর্ষাকালে কেহ ভ্রমণে বাহির হইত না। গ্রীষ্মকালে লোকেরা মাঠ দিয়া চলিত; কখন গরুরগাড়ীতে কখন পাল্কীতে, কখন অশ্বপৃষ্ঠে, উষ্ট্রপৃষ্ঠে বা হস্তিপৃষ্ঠে যাতায়াত করিত। পক্ষান্তরে, Lord Dalhousie কতকগুলি রাস্তা নির্ম্মাণ করাইলেন, লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণ করাইলেন, বৈদ্যুতিক তারের পথ প্রস্তুত করাইলেন, গ্রীষ্মের প্রখরতাপে দগ্ধ বিস্তৃত ভূখণ্ডসমূহ যাহাতে কৃষিকর্ম্মের জন্য কর্ষিত হইতে পারে তজ্জন্য খাল কাটাইলেন।

এই তৃতীয়যুগে ইংলণ্ড এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। এই যুগে ইংলণ্ড সমস্ত ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বাহুবলের প্রাধান্য। ভারতের সমস্ত খণ্ড-রাজ্য বিজিত হইল। দ্বিতীয়তঃ শাসন কার্য্যের প্রাধান্য। কোম্পানীর অধীনস্থ সমস্ত রাজ্যে য়ুরোপীয় শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ভারতীয় রাজারাও এই শাসন-প্রণালীর কতকগুলি মূলসূত্র গ্রহণ করিল। তৃতীয়তঃ নৈতিক প্রভাবের প্রাধান্য। শিক্ষার বিস্তার হইল, মুদ্রাযন্ত্র ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইল; শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরাজিতে কথা কহা, ইংরাজি লেখা, ইংরাজি আচার-ব্যবহার ও ইংরাজি মতামত গ্রহণ করা, সম্মানের বিষয় মনে করিতে লাগিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



অশোকের রাণী ও তাঁহার সতিন বোধিদ্রুম

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

এই ছবির মালিক—শ্রীশ্রীমতী ভারত-সম্রাজ্ঞী মেরী।

Color Blocks & Printing by
K.V. SEYNE & Bros. CALCUTTA

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]　　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২　　　[২য় সংখ্যা

আধুনিক ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় যুগ

১৮৫৭-৫৮ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ

এই সমস্ত অনুষ্ঠান যতই চটকদার হউক না,—একটু যেন বেশী তাড়াতাড়ি, একটু যেন হঠাৎ আরম্ভ করা হইয়াছিল। এই সমস্ত অনুষ্ঠান, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে একটা মারাত্মক সংঘর্ষ আনিয়া উপস্থিত করিল। ভৌতিক ও নৈতিক বাধাসমূহ, এসিয়ার ক্রমবিকাশের গতিরোধ করায়, য়ুরোপ এই সমস্ত বাধা সত্বর অপসারিত করা আবশ্যক মনে করিল। তাছাড়া, ভারতবাসীরা স্বদেশের আবহাওয়া, ভূমি, আচার ব্যবহারের ইতিহাস, বিশেষ-বিশেষ প্রীতি ও ভক্তির জিনিষ—এই সমস্তের প্রতি দৃঢ়রূপে আসক্ত ছিল। য়ুরোপীয় সভ্যতা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে হইলেও, কত মতবিশ্বাস, কত আচার ব্যবহার উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে?

যে সকল সাক্ষাৎ কারণে এই সংঘর্ষ সত্বর উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নৈতিক কারণ, রাষ্ট্রিক কারণ ও আর্থিক কারণ—এই তিন ভেদের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

১

নৈতিক কারণ।—য়ুরোপের প্রভাবে ভারত-সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের উদারপন্থীদিগের সমাজসংস্কার, কতকগুলি হিন্দু সাদরে গ্রহণ করায়, এই সকল সংস্কার-কার্য্য এই বিক্ষোভকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। শিক্ষার প্রসার, বড় বড় পূর্ত্তকর্ম্ম, য়ুরোপের সহিত বাণিজ্যবিস্তার—ইহাই গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত কার্য্যতালিকা ছিল। কোন কোন প্রদেশে, বিশেষত বঙ্গদেশে, শিক্ষিত যুবকেরা এই কার্য্যতালিকা উৎসাহের সহিত সাদরে গ্রহণ করিল।

উহারা পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিল, রেলগাড়ী ও বাষ্প-জাহাজ ব্যবহার

করিতে লাগিল, ইংরাজী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে লাগিল, য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় আহার করিতে লাগিল, য়ুরোপীয় পোষাক পরিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্টের কাজ, ব্যাঙ্কের কাজ, বণিক কোম্পানীদিগের কাজ পাইবার জন্য আপনাদিগের মধ্যে রিষারিষি হইতে লাগিল। য়ুরোপে, এইরূপ আচরণ এত সাধারণ যে উহা উল্লেখযোগ্যই নহে। কিন্তু ভারতে এইরূপ প্রত্যেক কার্য্য, বিপ্লবের নিদর্শন বলিয়া উপলব্ধি হয়। গৃহের বন্ধন ছিন্ন হইল:—পৈত্রিক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পুত্র দূরদেশে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। আর সে, বংশানুক্রমিক পরিচ্ছদ ধারণ করিল না, এমন জিনিস আহার করিতে লাগিল যাহা তাহার পিতা কখন স্পর্শ করিত না, এমন কাজ করিতে লাগিল যাহা তাহার পিতা কখন করিত না, এমন বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, যাহা চিন্তা করাও তাহার পিতা, পাপ বলিয়া মনে করিত। জাত ভাঙ্গিয়া গেল:—যে বদ্ধ সমাজের মধ্যে কোন নূতন জিনিসের স্থান ছিল না, সেই সমাজে নূতন নূতন কাজ-কর্ম্ম, নূতন নূতন ব্যবসায় প্রবেশ করিল। গবর্ণমেণ্টের কাজে হাউসওয়ালাদের কাজে, সকল জাতের লোক আসিয়া একত্র মিলিত হইল; রেলগাড়িতে, বাষ্প-জাহাজে পরস্পরের সহিত মেশামিশি হইতে লাগিল। নীচু জাতের লোকেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত একই শিক্ষা পাইতে লাগিল, ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে লাগিল, পরীক্ষায় ব্রাহ্মণদিগকে ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল, এবং তাহার পর গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হাকিম হইয়া ব্রাহ্মণকে হুকুম করিতে লাগিল। ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা হইল। নানাপ্রকারে এই আশঙ্কার উদ্রেক হইল। পারিবারিক বিধিব্যবস্থা লঙ্ঘিত হইল। জাতিভেদের নিয়ম লঙ্ঘিত হইল। এই সকল বিধিব্যবস্থা ও নিয়ম অতীব পবিত্র বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। কেহ কেহ নিষিদ্ধ জিনিস আহার করিয়া তাহার উচ্ছিষ্ট নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের গৃহে নিক্ষেপ করিত। আবার কেহ কেহ, এরূপ য়ুরোপীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিত, যাহা অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত উপাদানে অপরিচিত লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। আবার সাক্ষাৎভাবেও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা ছিল। গভর্ণমেণ্ট, ইংরেজ-সমাজ, এবং রামমোহন রায়ের ন্যায় নব্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংস্থাপকগণ, য়ুরোপীয় মিশনারিদিগের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গভর্ণমেণ্ট আরও কিছু বেশী করিলেন। গবর্ণমেণ্ট লোকপ্রচলিত কতকগুলি প্রথা উঠাইয়া দিলেন। সতীদাহ উঠাইয়া দিলেন, স্বধর্ম্মোপদিষ্ট আত্মহত্যা ও ধর্ম্মোন্মত্ত সন্ন্যাসীদিগের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত রহিত করিলেন। Lord Palmerston কোন এক বক্তৃতায় এইরূপ বলিয়াছিলেন:—

"মানবিক বিজ্ঞান অপেক্ষা আরও এক মহত্তর ও উন্নততর জিনিস দান করিয়া অসংখ্য ভারতবাসীদিগের হিতসাধন করা বোধ হয় আমাদেরি কার্য্য; কিন্তু এ কাজ কেবল কালের সাহায্যে এবং লোকের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংসাধিত হইবে।" সংবাদপত্র সমূহ আর একটু অসংযতভাবে এই মতই সমর্থন করিতে লাগিল। ইহা হইতেই মুসলমান ও হিন্দুদিগের ধারণা হইল যে,

ইংরাজ বলপূর্ব্বক উহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সংকল্প করিয়াছে। উহাদের উৎকট কল্পনা ইংরাজের ষড়যন্ত্রের একটা চিত্র মানস-পটে অঙ্কিত করিল:—সরকারী কাজকর্ম্ম, য়ুরোপীয়দিগের চাক্‌রী, রেলগাড়ী, বাষ্প-জাহাজ, অস্পৃশ্য উপাদানে প্রস্তুত য়ুরোপীয় দ্রব্যসামগ্রী—এ সমস্তই সরলমতি বিশ্বস্ত ভারতবাসীদের জন্য যেন ফাঁদ পাতা হইয়াছে; যাহাতে তাহাদের ধর্ম্মনাশ হয়, জাত যায়, তাহারি এই সমস্ত আয়োজন হইয়াছে।

***

রাষ্ট্রিক কারণ।—পাঁচ বৎসরের মধ্যে Lord Dalhousie ১৫ লক্ষ Kilometre square ভূমি স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সিন্ধু পঞ্জাব অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইলে, লোকের আশঙ্কা হইল বুঝি ইংলণ্ড সমস্ত ভারতকে গ্রাস করিবে। এবং ব্রহ্মদেশ ও পেশোয়ারবিজয়ে এবং আফ্‌গানিস্থানে হস্তক্ষেপ করায় লোকেরা ভাবিতে লাগিল, ইংলণ্ড এমন একটা বৃহৎ এসিয়িক সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, যাহার অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারত স্বকীয় শাসন-স্বাতন্ত্র্য হারাইবে।

এই চিত্তচাঞ্চল্য প্রথমে রাজাদিগের মধ্যে প্রকাশ পাইল। মোগলসম্রাটের অবস্থা অনির্দ্দিষ্ট ছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদিগের উৎপীড়ন অত্যাচার হইতে সম্রাটকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, ইংরাজেরা দিল্লি অধিকার করিয়াছিল। ইংরাজেরা সম্রাটের নামে রাজ্য শাসন করিতে লাগিল, সম্রাটের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া নিজের মুদ্রা বাহির করিতে লাগিল। আরও কিছুকাল পরে, কোম্পানীর রাষ্ট্রনীতি বদলাইয়া গেল; কোম্পানী স্বয়ং ভারতের অধিপতি এইরূপ ঘোষণা করিলেন; উহাদের মুদ্রার উপর ইংলণ্ডেশ্বরের ছবি মুদ্রিত হইল। তথাপি, তৈমুরের বংশধর তখনও স্বকীয় উপাধি, স্বকীয় অবসরবৃত্তি, স্বকীয় প্রাসাদ বজায় রাখিয়াছিলেন। তখনও তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদত্ত হইত। Lord Dalhousie চাহিয়াছিলেন, মোগল সম্রাটকে দিল্লি হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীকে সম্রাট উপাধি আর না দেওয়া হয়। একটা কিছু নিশ্চিত স্থির করিতে না পারিয়া ডিরেক্‌টরগণ, সম্রাট বাহাদুর-শার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না, তাঁহার একজন উত্তরাধিকারী স্বীকার করিলেন; কিন্তু মোগল-সম্রাট্ যাহাকে উত্তরাধিকারী করিতে চাহিলেন, তাহাকে তাঁহারা উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। উত্তরাধিকার পাইবা মাত্র ঐ উত্তরাধিকারীকে দিল্লি ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এইরূপ আদেশ হইল। কোম্পানীর এই আচরণ, মোগলসম্রাটকে শত্রু করিয়া তুলিল, অথচ মোগল সম্রাটের প্রভাব অক্ষত রহিল।

পেশোয়ার উত্তরাধিকারী নানা-সাহেবের সহিত ব্যবহারেও কোম্পানী একই প্রকার অ-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।(১) নানা

(১) নানা সাহেব নামে খ্যাত, ধুন্দুপন্থ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বাজিরাও (১৭৯৫-১৮১৮) তাঁহাকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ অব্দে বাজিরাওর মৃত্যু হয়।

সাহেব স্বকীয় পদ ও অবসর-বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকার বজায় রহিল। কানপুর ও লক্ষ্ণৌ-এর মধ্যে অবস্থিত তাঁহার বিথুর-রাজ্যে তিনি রাজার ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দুইটি বড় বড় ভারতীয় উপাধি, সম্মানের উপাধি ছিল। কিন্তু ছোট, বড় এরূপ ৬০০ রাজা ছিল যাহারা ১৫ লক্ষ Kelometre square ভূমির অধিকারী। লর্ড ড্যালহৌসি দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার রহিত করায়, ঐ আইনে এই সকল রাজা ভীত হইয়া পড়িল। ঔরসপুত্রের অভাবে তাহাদের রাজ্য কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করিবেন, এই আশঙ্কা হইল।

লর্ড ড্যালহৌসির রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে শুধু যে রাজারাই প্রতিবাদ করিল তাহা নহে, রাজাদিগের প্রজাবর্গও স্বরাজশাসন বজায় রাখিবার জন্য ইচ্ছুক ছিল। অযোধ্যার নবাব মুসলমান হইলেও, নবাবের স্বেচ্ছাচারিতা দুঃসহ হইলেও, নবাব সিংহাসনচ্যুত হওয়ায়, অযোধ্যাবাসী হিন্দুরা দুঃখিত হইয়াছিল।

তাছাড়া, কোম্পানীর শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ অভিযোগ ছিল। প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মুসলমানদিগের কষ্ট হইয়াছিল। মুসলমানেরা ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে,—বিশেষতঃ হিন্দুকর্ম্মচারীদিগকে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না। আবার নিজেও শিক্ষালাভ করিবে না, সরকারী কাজকর্ম্মে প্রবেশ করিবে না, নূতন সভ্যতার সহিত বনিয়া চলিবে না। কোন প্রকার রাজবিদ্রোহ বাধিয়া উঠিলে, অথবা পারস্যের দ্বারা ভারত আক্রমণ হইলে তাহাদের হৃত আধিপত্য আবার তাহারা ফিরিয়া পাইবে,—ইহাই তাহাদের একমাত্র আশা ছিল।

পক্ষান্তরে, শিক্ষিত হিন্দুরা—বিশেষত শিক্ষিত বাঙ্গালী ও শিক্ষিত তামুলরা, সরকারী কাজকর্ম্ম পাইবার জন্য লালায়িত হইল। কিন্তু এই সকল কাজ যৎসামান্য, উহাতে যেরূপ খাটুনী তদনুরূপ লভ্য নাই। তাই তাহারা দাবী করিল যে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের আইনের পাণ্ডুলিপি পূরাপূরি কার্য্যে পরিণত করা হয়; শাসন বিভাগের সকল পদের জন্য, এমন কি উচ্চতম পদের জন্যও যেন ভারতবাসীরা ইংরাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার লাভ করে।

ইংরাজের ভারত-অধিকারে এক শ্রেণীর লোক বিশেষরূপে কষ্ট অনুভব করিয়াছিল। তাহারা সামন্ততন্ত্রাধীন অভিজাতবর্গ—সেই সব আমীর, সেই সব মনসব্‌দার, সেই সব হিন্দু ও মুসলমান জমিদার যাহারা নিজ অধিকারে, রাজার ন্যায় প্রজাশাসন করিত এবং নিজ গিরি-দুর্গ সকলকে অবরোধ-সহ করিয়া রাখিত। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী অনেক সময় ভূস্বামিত্ব হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করিত। Lord Cornwallis বঙ্গদেশের জমিদারদিগকে ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়া একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন,—ইহা কোম্পানী বুঝিতে পারায়, ভূমির স্বামীত্ব স্বয়ং চাষীদিগকে অর্পণ করিবার জন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের একটা ঝোঁক হইল।

কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মন্‌সব্‌দারের অবস্থা, বাঙ্গালী জমিদারের অবস্থা হইতে অনেকটা তফাৎ। মন্‌সব্‌দারের ভূস্বামিত্ব রহিত করা একটা বিপ্লবের সামিল। উঁহাদের ভূস্বামিত্ব রহিত করা আর ভূমি বাজেয়াপ্ত করা—উহা একই কথা। যে প্রদেশ সম্প্রতি বিজিত হইয়াছিল সেই অযোধ্যায়, একটা অতীব গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। এই রাজ্যের সামন্ত-শাসনতন্ত্র অক্ষত ছিল। ইংরেজ কর্ম্মচারী-গণ সকল অবস্থাতেই, তালুকদারদিগের বিরুদ্ধে রায়ৎদিগের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিলেন। তালুকদারদিগের বিশেষাধিকার হইতে, এমন কি কখন কখন তাহাদিগের সম্পত্তি হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত করা হইতে লাগিল।

তা ছাড়া, ভারতে নিযুক্ত সমস্ত ইংরেজ-কর্ম্মচারীই, কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রবণতা ও টোরিদিগের পুরাতন মনোভাবটা বজায় রাখিয়াছিল। কেবল ইংরাজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ২৫ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করিতে হইবে—ইহাই টোরিদিগের মূলমন্ত্র ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তখনও উদারনীতির পক্ষপাতী ছিল। অনেক সময় গভর্ণর জেনেরাল ও কতকগুলি উচ্চপদের রাজপুরুষ উদারমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু শাসনকার্য্যে, ধর্ম্ম ও জাতিগত অন্ধ-সংস্কারের ন্যায় চিরাগত পুরাতন প্রথাই কার্য্যতঃ বলবৎ থাকিত।

*
* *

আর্থিক কারণ।—অষ্টাদশ শতাব্দীতে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী বিশেষবিশেষ ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। কিন্তু ভারতীয় শ্রমশিল্পের যে অভ্যুদয় হইয়াছিল সে কৃত্রিম অভ্যুদয়। দৈন্যগ্রস্ত জনসাধারণ আপনআপন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী নিজেই প্রস্তুত করিত। অভি-জাতবর্গ একমাত্র খরিদ্দার হওয়ায় কারিগরেরা অভিজাতবর্গের ভৃত্য—তাহার পর গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল মন্‌সব্‌দারেরা ও বড় বড় দোকানদার মাল রপ্তানি করিয়া লাভ করিত। কার্পাস বস্ত্র ছাড়া ভারতীয় আর সমস্ত দ্রব্যজাত বিলাস-সামগ্রী ছিল। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল সে অরাজকতার সময়, ভারতীয় শ্রমশিল্পের ধ্বংস আরম্ভ হয়, এবং ইংরেজের প্রতি-যোগিতা সেই ধ্বংসকার্য্যটাকে সম্পূর্ণ করিল। শুল্কস্থাপনের অধিকার সত্ত্বেও অসমানরূপে পরিপুষ্ট এই দুই দেশের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া যুঝাযুঝি চলিতে পারিল না। একদিকে, ইংলণ্ড অতীব স্বাধীন জাতি, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী ও যন্ত্রাদির দ্বারা সুসম্পন্ন। অন্য দিকে, মোগলের কর-ভারে ও মন্‌সব্‌দারদিগের অতিরিক্ত অর্থশোষনের ফলে দৈন্যদশাগ্রস্ত ভারত;—সেই ভারত, যেখানে শ্রমজীবিরা জাতিভেদের বন্ধনে আবদ্ধ;—ব্যবসায় পরি-বর্ত্তন করা, এমন কি স্বকীয় ব্যবসায়ের যন্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করাও যাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় শ্রমশিল্প অন্তর্হিত হইল। নগরের লোকেরা কৃষিকর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। এবং পল্লীগ্রাম

লোকাকীর্ণ হওয়ায় করিগরেরা অগত্যা নিকৃষ্ট ভূমিতে চাষ আরম্ভ করিল।

কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, কোম্পানী উহাদের দুর্দ্দশার লাঘব করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। "সমস্ত ভূমিই সরকারের"—এই নীতি বজায় রাখিয়াও কোম্পানী, বাস্তবপক্ষে কৃষকদিগকেই ভূমির স্বামিত্ব প্রদান করিলেন; কারণ কোম্পানী রাজস্ব ও ভূমি-কর এক সামিল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কোন কোন প্রদেশে কোম্পানী শুধু ষ্টেট্‌কে বঞ্চিত করিলেন না, স্বকীয় ন্যায্য অধিকার হইতে মন্‌সব্‌দারদিগকেও বঞ্চিত করিলেন, অন্যায্য হইলেও জমিদারেরা যে সকল অধিকার বহুদিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছিল, কোম্পানী সেই সকল অধিকার হইতে জমিদারদিগকেও বঞ্চিত করিলেন। Bernier বর্ণনা করিয়াছেন, ঔরংজেবের আমলে, ভারতীয় কৃষকেরা গোলামের ন্যায় জমির সহিত অবদ্ধ থাকিত। কোন প্রকারে খাওয়াটা চলে, এই পরিমাণ ফসলের একটা অংশ, ভূস্বামী, কৃষককে ছাড়িয়া দিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, বোম্বাই-অঞ্চলে, পঞ্জাবে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন অংশে কৃষকই ভূমির, স্বগৃহের ও স্বকীয় গোমহিষাদির মালিক ছিল। কৃষক কোন কর দিত না, জমির খাজনা খুব কমই ছিল।

১৬ বৎসরের মধ্যে, ইংরাজেরা এমন এক আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব বাধাইলেন যাহাতে কৃষকের লাভ হইল কিন্তু জায়গীরদার অভিজাতবর্গের বিলক্ষণ ক্ষতি হইল। যে আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জাপানকে হঠাৎ রূপান্তরিত করে, ইহা কতকটা তাহারই অনুরূপ।

উভয় বিপ্লবই, প্রথমে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করিয়াছিল, কিন্তু পরে,—মনে হয়, উহার দ্বারা উহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছিল। অজ্ঞ, অদূরদর্শী, জড়ভাবাপন্ন, প্রাচ্যদেশের কৃষক, আধুনিক রাষ্ট্রের নিয়মবদ্ধ কার্য্য-প্রণালীর সহিত কখনই বনিয়া চলিতে পারে না। ধনবৃদ্ধির হিসাব ধরিতে গেলে, এসিয়িক অধিপতিদিগের আদায়ের তুলনায়, এখনকার ভূমি-কর স্বল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু পক্ষান্তরে সেকালে রাজকর রেয়াৎ করা হইত, ছাড় দেওয়া হইত, এবং উহা ক্রমাগত অনিয়মিতরূপে নির্দ্ধারিত হইত। এখনকার রাজকর স্থিরনির্দ্দিষ্ট, একটা বিশেষ সময়ে পরিশোধ করিতে হয়, এবং কৃষকের যেরূপ অবস্থাই হউক, ফসলের মূল্য যাহাই হউক, এই রাজকর কৃষককে মুদ্রার আকারে দিতে হয়। অবশ্য প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইলে, তাহা হইতে কিয়দংশ কৃষকের সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভারতীয় কৃষকের মন নিতান্ত শিশুর ন্যায় লঘু। তাহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, খারাপ বৎসরে য়ুরোপীয় কৃষক যে সুখ ভোগ করে, ভারতীয় কৃষক খুব ভাল বৎসরেও সে সুখের মুখ দেখিতে পায় না। তাই সে দিন-মজুরের মত দিন আনে, দিন খায়; এবং হাজা-শুখা হইলে, খাজানা পরিশোধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া টাকা ধার করে। যে উত্তমর্ণ সৎপথাবলম্বী সে

নির্দ্দিষ্ট দিনে সুদের দাবী করে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসল টাকা ফিরিয়া চাহে; এই সমস্ত সর্ত্তের দায় এড়াইবার জন্য কৃষক, কুসীদজীবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; কুসীদজীবী অতিরিক্ত পরিমাণ সুদ চাহে কিন্তু সুদের জন্য তাগিদ করে না। তাই কৃষক আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইয়া, ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যায়। যেমন জাপানে, সেইরূপ আজকাল ভারতেও কুসীদজীবীরাই অধিকাংশ জমির স্বত্বাধিকারী। কেবল, মিতব্যয়িতা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টির শিক্ষা লাভ করিয়া এবং বিমা-সমিতি ও সহযোগিতার সমিতিসমূহ স্থাপন করিয়াই, প্রাচ্যদেশের কৃষকেরা আধুনিক সভ্যতার উপকার লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে তাহারা কেবল উহার কঠোরতারই পরিচয় পাইয়াছে।

১৮৫৭ অব্দে ভারতের কৃষক, রাজস্বের বাঁধাবাঁধি নিয়মে আবদ্ধ হইয়া, কুসীদজীবী মহাজনের কবলে পতিত হইয়া, সে-কালের জন্য এই বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিল যে, তখন তাহার ততটা পরিশ্রম করিতে হইত না, ততটা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করিতে হইত না।

ভারত যে আর্থিক অশান্তি ভোগ করিতেছিল, এই সমস্তই তাহার কারণ।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সমস্ত য়ুরোপ যেরূপ নবসভ্যতার আবির্ভাবে দারুণ কষ্ট অনুভব করিয়াছিল, সেইরূপ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর, দিগ্‌বিজয়, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, সহসা অল্প কালের মধ্যেই টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে নির্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতও দারুণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। এখন যেমন এই সকল ব্যাপারে চীনদেশে মধ্যে মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তখন ভারতে সেইরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল।

২

বিশেষত সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তখন কোম্পানী, একটি সামরিক শক্তিরূপেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। ড্যালহৌসির যুদ্ধ বিগ্রহে সিপাহীরা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সেই সব যুদ্ধের গৌরব তাহারা আপনাদের উপরে আরোপ করিতে লাগিল। যাহারা পাঁচ বৎসরের মধ্যে একটা সাম্রাজ্য জয় করিল, সেই সিপাহীদিগের মনোভাব পেশাদার সৈনিকের মনোভাব ছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যেমন একদিকে তাহারা দাবীদাওয়া করিতে লাগিল, আবার এই যুদ্ধজয়েই তাহারা ভীত হইয়া উঠিল। এই পেশাদার সৈন্য স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল; তাহাদের প্রতিও কি বিজিতের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে না? যে বঙ্গ-সৈন্যের অধিকাংশ লোক অযোধ্যা হইতে সংগৃহীত, অযোধ্যাকে ইংরেজ-অধিকার-ভুক্ত করা তাহাদের অভিমত ছিল না। সিপাহীরা অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিকে বশীভূত করিবার জন্য ইংরেজকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু স্বজাতিকে বশীভূত করিবার জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের জাত, তাহাদের প্রথাদির উচ্ছেদ করিবার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করা হইবে না কি? অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও রাজপুতই বঙ্গসৈন্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সমস্ত কারণে তাহারা ভীত হইয়া

উঠিল। উহাদিগকে ব্রহ্মদেশে পাঠান হইল; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। উহাদিগকে নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রী, যুদ্ধোপকরণ, ও আসবাবপত্র দেওয়া হইয়াছিল। একটু কিছু ভুল করিলেই, তাহাদের জাত যাইবার সম্ভাবনা; তাহা হইলে তাহারা ইহলোকে জাত্যন্তরিত হইবে এবং পরলোকেও নরকস্থ হইবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সৈন্যমণ্ডলী নূতন এক প্রকার বন্দুক প্রাপ্ত হইল। গরু ও শূকরের চর্ব্বি মাখানো এই বন্দুকের টোটাগুলা দমদমের কারখানা হইতে বাহির হয়। হিন্দুদিগের নিকট গরু আরাধ্য এবং মুসলমানদিগের নিকট শূকরের মাংস অস্পৃশ্য। সিপাহীরা এই ভুল বুঝিতে পারিল এবং প্রতিবাদ করিল। উহার বদলে অন্য টোটা দেওয়া হইল। কিন্তু সিপাহীদিগের মন হইতে সন্দেহ দূর হইল না; সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে উহারা বলিতে লাগিল, অস্পৃশ্য সামগ্রীর দ্বারা ঐ টোটার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে। নূতন বন্দুক উহাদের হাতে দিবার জন্য তখন উহাদের প্রতি কঠোর শাসন আবশ্যক হইল।

*
* *

এইরূপ ভুল বুঝা তখন অপরিহার্য্য ছিল। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই দুই বিরুদ্ধ সমাজের মধ্যে কখনই মিলন ঘটান যাইতে পারে না। তাছাড়া সৈন্যমণ্ডলীর গঠন-প্রণালীর দোষে এই আন্দোলনটা বেশীদিন টিকিয়া ছিল।

ইংরেজ-সৈন্য ৪৫,৩২২; আর দেশীয় সৈন্য ২৩৩,০০০।

সৈন্যসংগ্রহের প্রণালীতেও একটু দোষ ছিল। সিপাহীরা সামরিক জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কি হিন্দু, কি মুসলমান—উহারা স্বকীয় পুত্রদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করিবার জন্য দাবী করিত। ঐ সকল সামরিক জাতির বহির্ভূত কোন লোক, সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না; পাছে তাহারা সাদরে গৃহীত না হয়, ইহাই তাহাদের আশঙ্কা ছিল। স্বাধীনভাবে সৈন্য সংগ্রহের কাজটা যাহারা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সিপাহীরা কোম্পানীকে কোন প্রকারে রক্ষা করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিল। কোম্পানীও তাহাদের মনে এই ভাবটি উদ্রেক করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন। এমন কোন বিশেষ অধিকার ছিল না যাহা কোম্পানী তাহাদিগকে প্রদান করেন নাই। এমন কোন অনুগ্রহ ছিল না যাহা তাহারা স্বকীয় ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইত না। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষদিগেরও বিশ্বাস ছিল, সিপাহীরা তাহাদের একান্ত অনুরক্ত। তথাপি মৌখিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সিপাহীরা তাহাদের নেতাদিগকে আদৌ ভাল বাসিত না। জমাদার, হাবল্দার প্রভৃতি দেশীয় সৈন্য-নায়কদিগকে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষেরা অবজ্ঞা করিত। যে সকল ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ দেশীয় ভাষা ভাল জানিতেন, তাঁহারা সৈনিকবৃত্তি ছাড়িয়া শাসনবিভাগের কোন পদ গ্রহণ করিয়া

ডালহৌসি কর্ত্তৃক যে সকল প্রদেশ বিজিত হইয়াছিল, সেই সকল প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি নূতন কর্ম্মচারী আবশ্যক হইয়াছিল।

*
* *

এইরূপে, অশান্তির যে সকল কারণ রাষ্ট্রের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল, তৎসমস্তই পুনর্ব্বার সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রকাশ পাইল। অনেকবার ভারতে সিপাহিবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। হয় ভারতীয় সৈন্যদলকে যথেচ্ছা করিতে দেওয়া, নয় ইংরেজ সৈন্যদলের দ্বারা উহাদিগকে একেবারে নিষ্পেষিত করা—এই দুয়ের মধ্যে একটা করা আবশ্যক হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, নিয়মশাসন ও বশ্যতার ভাব সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই সময়ে সৈন্যমণ্ডলী বিদ্রোহের পতাকা ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। (২)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নালক

৬

আবার সেই বর্দ্ধনের বন, সেই বট গাছের তলা! গাছের নীচে দেবল ঋষি আর সন্ন্যাসীর দল আগুনের চারিদিকে ঘিরে বসেছেন, আগুনের তেজে সন্ন্যাসীদের হাতের ত্রিশূল ঝক্‌-ঝক্‌ করছে! নিবিড় বন। চারিদিকে কাজল অন্ধকার, কিছু আর দেখা যায় না, কেবল গোছা গোছা অশথ-পাতায়, মোটা মোটা গাছের শিকড়ে আর সন্ন্যাসীদের জটায়, তপ্ত সোনার মত রাঙা আলো ঝিক্‌ ঝিক্‌ করছে—যেন বাদলের বিদ্যুৎ!

এই অন্ধকারে নালক চুপটি করে আবার ধ্যান করছে। মাথার উপরে নীলাম্বরী আকাশ, বনের তলায় স্থির অন্ধকার। কোনো দিকে কোনো সাড়া নেই, কারো মুখে কোনো কথা নেই; কেবল এক একবার দেবল-ঋষি বল্‌ছেন—তারপরে? আর নালকের চোখের সামনে ছবি আস্‌ছে আর সে বোলে যাচ্ছে:—

রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে কোলে নিয়ে হরিণের ছাল-ঢাকা গজদন্তের সিংহাসনে বসেছেন, রাজার দুই পাশে চার চার গণৎকার, রাজার ঠিক সাম্‌নে হোমের আগুন, ওদিকে গোতমী মা, তাঁর চারিদিকে ধান-দূর্ব্বা, শাঁক-ঘণ্টা, ফুল-চন্দন, ধূপ-ধুনো।

পূজো শেষ হয়েছে। রাজা ব্রাহ্মণদের

(২) সিপাহী-বিদ্রোহের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

ভেলোরে (মান্দ্রাজের এক প্রদেশ) (১৮০৬)। ব্যারাকপুরে (লাট সাহেবের পল্লীনিবাস) (১৮২৪)। পঞ্জাব সৈন্যমণ্ডলীর দুই রেজিমেণ্টে (১৮৪৯)। যে দুর্গ, অমৃতসরকে দমনে রাখে সেই গোবিন্দগড়ে (১৮৫০)। [illegible] ইত্যাদি।

বল্‌ছেন—রাজপুত্রের নাম হলো কি? ব্রাহ্মণেরা বল্‌ছেন—এই রাজকুমার হ'তে পৃথিবীর লোক যত অর্থ, যত সিদ্ধি লাভ করবে—সেইজন্য এঁর নাম রইলো সিদ্ধার্থ। রাজা হলে এই রাজকুমার জীবনে সকল অর্থ আর রাজা না হলে বুদ্ধত্ব লাভ কোরে জগৎকে কৃতার্থ করবেন আর মরণের পরে নির্ব্বাণ পেয়ে নিজেও চরিতার্থ হবেন—সেইজন্যে এঁর নাম হল সিদ্ধার্থ।

রাজা বল্‌ছেন, কুমার সিদ্ধার্থ রাজা হয়ে রাজত্ব করবেন, কি রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে বুদ্ধত্ব পাবার জন্যে তপস্যা করবেন—সেই কথা আপনারা স্থির কোরে বলুন।

রাজার আট গণৎকার খড়ি পেতে গণনা কোরে বল্‌ছেন। প্রথম—শ্রীরাম আচার্য্য, তিনি রাজাকে দুই আঙুল দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, ইনি রাজাও হোতে পারেন, সন্ন্যাসীও হোতে পারেন, ঠিক বলা কঠিন, দুদিকেই সমান টান দেখছি। রামের ভাই লক্ষ্মণ অমনি দুই চোখ বুজে বল্‌ছেন—দাদা যা বলেছেন সেই ঠিক। জয়ধ্বজ দুই হাত ঘুরিয়ে বল্‌ছেন—হাঁও বটে, নাও বটে। শ্রীমন্তিন্ দুদিকেই ঘাড় নেড়ে বলছেন—আমারও ওই কথা। ভোজ দুই চোখ পাক্‌ল কোরে বল্‌ছেন—এটাও দেখ্‌ছি ওটাও দেখছি। সুদত্ত বল্‌ছেন ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে—এদিকও দেখ্‌লেম, ওদিকও দেখলেম। সুদত্তের ভাই সুবাম দুই নাকে নস্যি টেনে বল্‌ছেন—দাদার দিক্‌টাই ঠিক্ দেখছি। কেবল সবার ছোট অথচ বিদ্যের সকলের বড় কৌণ্ডিন্য এক আঙুল রাজার দিকে দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ এদিক কি ওদিক, এটা কি ওটা নয়,—এই রাজকুমার বুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো দিকেই যাবেন না স্থির নিশ্চয়। ইনি কিছুতেই ঘরে থাক্‌বেন না। যেদিন এঁর চোখে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ, রোগশীর্ণ দুঃখী মানুষ, একটি মরা মানুষ, আর এক সন্ন্যাসী ভিখারী পড়বে, সেদিন আপনার সোনার সংসার অন্ধকার কোরে কুমার সিদ্ধার্থ চলে যাবেন,—সোনার শিকল কেটে পাখী যেমন উড়ে যায়।

সন্ন্যাসীর দল হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নালক চেয়ে দেখে সকাল হয়েছে।

৭

আর কিছু দেখা যায় না। সেদিন থেকে নালক যখনি ধ্যান করে তখনি দেখে সূর্য্যের আলোয় আগুনের মত ঝক্ ঝক্ করছে—আকাশের নীল ঢেকে, বাতাসের চলা বন্ধ করে—সোনার ইঁটে-বাঁধানো প্রচণ্ড প্রকাণ্ড এক সোনার দেওয়াল। তার শেষ নাই, আরম্ভও দেখা যায় না। নালকের মন-পাখী উড়ে উড়ে চলে আর সেই দেওয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে ফিরে আসে। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটছে। সোনার দেওয়ালের ওপারে রয়েছেন সিদ্ধার্থ আর এপারে রয়েছে নালক;—যেন খাঁচার পাখী আর বনের পাখী!

ছেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায় সেই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন সোনার

স্বপন দিয়ে, হাসি আর বাঁশি, আমোদ আর আহ্লাদের মায়া দিয়ে সিদ্ধার্থকে বদ্ধ রেখেছেন—সোনার খাঁচায় পাখীটির মত। যখন গরমের দিনে রোদের তেজ বাড়ে, জল শুকিয়ে যায়, তপ্ত বাতাসে চারিদিক যেন জ্বলতে থাকে; বর্ষায় যখন নতুন মেঘ দেখা দেয়, জলের ধারায় পৃথিবী ভেসে যায়, নদীতে স্রোত বাড়ে; শরতে আকাশ যখন নীল হয়ে ওঠে, সাদা মেঘ পাতলা হাওয়ায় উড়ে চলে, নদীর জল সরে গিয়ে বালির চড়া জেগে ওঠে; শীতে যখন বরফে আর কুয়াশায় চারিদিকে ঢাকা পড়ে, পাতা খসে যায়, ফুল ঝরে যায়, আবার বসন্তে যখন ফুলে ফুলে পৃথিবী ছেয়ে যায় গন্ধে আকাশ ভরে ওঠে, দখিনে বাতাসে চাঁদের আলোয় পাখীর গানে আনন্দ ফুটে ফুটে পড়তে থাকে—তখন খাঁচার পাখীর মন যেমন করে, সোনার দেওয়ালে ঘেরা রাজমন্দিরে বুদ্ধদেবেরও মন তেমনি করে—এই সোনার খাঁচা ভেঙে বাইরে আসতে। তিনি যেন শোনেন—সমস্ত জগৎ, সারা পৃথিবী গরমের দিনে বাদলা রাতে শরতের সন্ধ্যায় শীতের সকালে বসন্তের পহরে পহরে কখনো কোকিলের কুহু কখনো বাতাসের হু হু কখনো বা বিষ্টির ঝর ঝর শীতের থর থর পাতার মর্মর দিয়ে কেঁদে কেঁদে মিনতি করে তাঁকে ডাকছে—বাহিরে এস, বাহিরে এস, নিস্তার কর, নিস্তার কর, ত্রিভুবনে দুঃখের আগুন জ্বলছে, মরণের আগুন জ্বলছে, শোকে তাপে জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে, দেখো চোখের জলে বুক ভেসে গেল, দুঃখের বান মনের বাঁধ ধ্বসিয়ে দিয়ে গেল, আনন্দ,—সে তো আকাশের বিদ্যুতের মত, —এই আছে এই নেই, সুখ—সে তো শরতের মেঘের মত, ভেসে যায়, থাকে না, জীবন —সে তো শীতের শিশিরে শিউলি ফুলের মত ঝরে পড়ে, বসন্তকাল সুখের কাল সে ত চিরদিন থাকে না; হায়রে সারা পৃথিবীতে দুঃখের আগুন মরণের চিতা দিনরাত্রি জ্বলছে, সে আগুন, কে নেবায়? পৃথিবী থেকে ভয়কে দূর করে এমন আর কে আছে—তুমি ছাড়া? মায়ায় আর ভুলে থেকো না, ফুলের ফাঁস ছিঁড়ে ফেল, বাহিরে এস,—নিস্তার কর! জীবকে অভয় দাও!

নালকের প্রাণ, সারা পৃথিবীর লোকের প্রাণ, আকাশের প্রাণ, বাতাসের প্রাণ বুদ্ধদেবকে দেখবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করছে। তাদের মনের দুঃখু কখন বিষ্টির মত ঝরে পড়ছে, কখন ঝড়ের মত এসে সোনার দেওয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে। আলো হয়ে ডাকছে—এসো! অন্ধকার হয়ে বলছে—নিস্তার কর! রাঙা ফুল হয়ে ফুটে উঠছে, আবার শুকনো পাতা হয়ে ঝরে পড়ছে—সিদ্ধার্থের চারিদিকে চোখের সামনে জগৎ-সংসারের হাসি-কান্না জীবন-মরণ রাতে দিনে মাসে মাসে বছরে-বছরে নানা ভাবে নানা দিকে।

একদিন তিনি দেখছেন—নীল আকাশের গায়ে পারিজাত ফুলের মালার মত একদল হাঁস সারি বেঁধে উড়ে চলেছে—কী তাদের আনন্দ! হাজার হাজার ডানা একসঙ্গে তালে তালে উঠছে পড়ছে, একসুরে হাজার হাঁস ডেকে চলেছে—চল্, চল্, চল্রে চল্!

আকাশ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। মেঘ চলছে সাদা পাল তুলে, বাতাস চলছে মেঘের পর মেঘ ঠেলে, পৃথিবী তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্র আসছে নদীর দিকে—পাহাড় ভেঙে বালি ঠেলে। আনন্দে এত চলা এত বলা এত খেলার মাঝে কার হাতের তীর বিদ্যুতের মত গিয়ে একটি হাঁসের ডানায় বিঁধলো, অমনি যন্ত্রণার চীৎকারে দশদিক শিউরে উঠল! রক্তের ছিটেয় সকল গা ভাসিয়ে দিয়ে ছেঁড়া মালার ফুলের মত তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল—তীরে বেঁধা রাজহংস! কোথায় গেল তার এত আনন্দ, সেই বাতাস দিয়ে ভেসে চলা, নীল আকাশে ডেকে চলা! এক-নিমেষে ফুরিয়ে গেল পৃথিবীর সব আনন্দ, সব প্রাণ! আকাশ খালি হয়ে গেল, বাতাসের চলা বন্ধ হয়ে গেল; সব বলা সব চলা সব খেলা শেষ হয়ে গেল—একটি তীরের ঘা পেয়ে! কেবল দূর থেকে—অনেক দূর থেকে—সিদ্ধার্থের কানের কাছে, প্রাণের কাছে বাজতে লাগল—কান্না আর কান্না! বুক ফেটে কান্না! থেকে থেকে কান্না, গুম্‌রে গুম্‌রে রয়ে রয়ে কান্না! দিনে রাতে, যেতে আস্‌তে, চলতে ফিরতে সুখের মাঝে শান্তির মাঝে কাজে কর্ম্মে আমোদে আহ্লাদে তিনি শুন্‌তে থাক্‌লেন—কান্না আর কান্না! জগৎ-জোড়া কান্না! ছোটর ছোট তাদের কান্না, বড়র বড় তাদেরও কান্না।

দিনরাত্রি ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারের পরে সেদিন মেঘ কেটে গিয়ে সকালের আলো পূব দিকে দেখা দিয়েছে, আকাশ আজ আনন্দে হাসছে, বাতাস আনন্দে বইছে, মেঘের গায়ে গায়ে মধুপিঙ্গল আলো পড়েছে, বনে বনে পাখীরা, গ্রামে গ্রামে চাষীরা, ঘরে ঘরে ছেলেরা মেয়েরা আজ মধুমঙ্গল গান গাইছে। পূবের দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছেন, আজ যেন কোথাও দুঃখু নেই, কান্না নেই! যতদূর দেখা যায় যতখানি শোনা যায় সকলি আনন্দ। মাঠের মাঝে আনন্দ সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে; বনে উপবনে আনন্দ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে; ঘরে ঘরে আনন্দ—ছেলেমেয়ের হাসিমুখে রঙিন কাপড়ে নতুন খেলেনায় ঝিক্‌ঝিক্ করছে, ঝুমঝুম বাজছে; আনন্দ—পুষ্পবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে—লতা থেকে পাতা থেকে; আনন্দ—সে সোনার ধূলো হয়ে উড়ে চলেছে পথে পথে—যেন আবির খেলে।

সিদ্ধার্থের মনোরথ সিদ্ধার্থের সোনার রথ আজ আনন্দের মাঝ দিয়ে পূবের পথ ধরে সকালের আলোর দিকে অন্ধকারের শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে—আস্তে আস্তে। মনে হচ্ছে—পৃথিবীতে আজ যেন দুঃখ নেই, শোক নেই, কান্না নেই;—রয়েছে কেবল আনন্দ, ঘুমের পরে জেগে ওঠার আনন্দ, অন্ধকারের পরে আলো পাওয়ার আনন্দ, ফুলের মত ফুটে ওঠা, মালার মত দুলে ওঠা, গানে গানে বাঁশীর তানে জেগে ওঠার আনন্দ। পৃথিবীতে কিছু যেন আজ ঝড়ে পড়ছে না, ঝুরে মরছে না। এমন সময় সকালের এত আলো এত আনন্দ ঝড়ের মুখে যেন প্রদীপের মত নিভিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থের রথের আগে

কে জানে কোথা থেকে এসে দাঁড়াল— অন্তহীন দন্তহীন একটা বুড়ো মানুষ—লাঠিতে ভর দিয়ে। তার গায়ে একটু মাংস নেই, কেবল ক'খানা হাড়! বয়েসের ভারে সে কুঁজো হয়ে পড়েছে, তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপ্‌ছে, ঘাড় কাঁপ্‌ছে, কথা বলতে কথাও তার কেঁপে যাচ্ছে। চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কানে সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না;—কেবল দুখানা পোড়া কাঠের মত রোগা হাত সাম্‌নে বাড়িয়ে সে আলোর দিক থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে—গুটি গুটি, একা! তার শক্তি নেই সামর্থ্য নেই, তার আনন্দ নেই আরাম নেই, নেই তার একটি আপনার লোক, নেই তার সংসারে ছেলে মেয়ে বন্ধুবান্ধব—সব মরে গেছে সব ঝরে গেছে—জীবনের সব রঙ্গ রস শুকিয়ে গেছে,—সব খেলা শেষ করে! আলো তার চোখে এখন দুঃখ দেয়, সুর তার কানে বেসুরো বাজে, আনন্দ তার কাছে নিরানন্দ ঠেকে। সে নিজের চারিদিকে অনেকখানি অন্ধকার, অনেক দুঃখ শোক অনেক জ্বালা যন্ত্রণা শতকুটি কাঁথার মত জড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে—একা, একদিকে —আনন্দ থেকে দূরে, আলো থেকে দূরে। প্রাণ তার কাছ থেকে সরে পালাচ্ছে; গান তার সাড়া পেয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছে, সুখ তার ত্রিসীমানায় আসছে না, সুন্দর তাকে দেখে ভয়ে মরছে! সকালের আলোর উপরে কালো ছায়া ফেলে অদন্তের বিকট হাসি হেসে পিশাচের মত সেই মূর্ত্তি সিদ্ধার্থের সাম্‌নে পথ আগ্‌লে বল্লে— আমাকে দেখ, আমি জরা, আমার হাতে কারো নিস্তার নেই,—আমি সব শুকিয়ে দিই, সব ঝরিয়ে দিই, সব শুষে নিই, সব লুটে নি! আমাকে চিনে রাখ হে রাজকুমার! তোমাকেও আমার হাতে একদিন পড়তে হবে—রাজপুত্র বোলে তুমি জরার হাত থেকে নিস্তার পাবে না! দশদিকে সে একবার বিকট হাসি হেসে চেয়ে দেখলে অমনি আকাশের আলো পৃথিবীর সবুজ তার দৃষ্টিতে একনিমেষে মুছে গেল, ক্ষেত জ্বলে গেল, নদী শুকিয়ে গেল;—নতুন যা কিছু পুরানো হয়ে গেল, টাট্‌কা যা কিছু বাসি হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ দেখলেন পাহাড় ধ্বসে পড়ছে গাছ ভেঙে পড়ছে সব ধুলো হয়ে যাচ্ছে সব গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—তার মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছে সাদা চুল বাতাসে উড়িয়ে, ছেঁড়া কাঁথা মাটিতে লুটিয়ে, পায়ে পায়ে গুটি গুটি অন্তহীন দন্তহীন বিকটমূর্ত্তি জরা—সংসারের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে সব আনন্দ ঘুচিয়ে দিয়ে সব শুষে নিয়ে সব লুটে নিয়ে একলা হাড়ে হাড়ে কর্ত্তাল বাজিয়ে।

আর একদিন সে সিদ্ধার্থের মনোরথ সিদ্ধার্থের সোনার রথ মৃদু মন্দ বাতাসে ধ্বজা পতাকা উড়িয়ে দিয়ে কপিলবাস্তুর দক্ষিণ-দুয়ার দিয়ে আস্তে আস্তে বার্ হয়েছে। মলয় বাতাস কত ফুলের গন্ধ, কত চন্দনবনের শীতল পরশে ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে লাগ্‌ছে— সব তাপ সব জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে। ফুল-ফুটানো মধুর বাতাস, প্রাণ-জুড়ানো দখিন বাতাস! কত দূরের মাঠে মাঠে রাখাল ছেলের বাঁশীর সুর, কত দূরের বনে বনে পাপিয়ার পিউ গান, সেই বাতাসে, ভেসে

আস্‌ছে—কানের কাছে প্রাণের কাছে। সবাই বার্ হয়েছে সবাই গেয়ে চলেছে খোলা হাওয়ার মাঝে তারার আলোর নীচে—দুয়ার খুলে, ঘর ছেড়ে! আকাশের উপরে ঠাণ্ডা নীল আলো, পৃথিবীর উপরে ঠাণ্ডা আলো, ছায়া তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ মলয় বাতাস—ফুর ফুরে দখিন বাতাস—জলে স্থলে বনে উপবনে ঘরে বাহিরে সুখের পরশ দিয়ে আনন্দের বাঁশী বাজিয়ে। সে বাতাসে আনন্দে বুক দুলে উঠ্‌ছে, মনের পাল ভরে উঠ্‌ছে;—মনোরথ আজ ভেসে চলেছে নেচে চলেছে—দুঃখের পারে সুখের ঘাটে, সারি-গানের তালে তালে সুখ-সাগরের থির জলে। স্বপ্নের ফুলের মত শুক তারাটি আকাশ থেকে চেয়ে রয়েছে—পৃথিবীর দিকে। সুখের আলো ঝরে পড়েছে সুখের বাতাস ধীরে বইছে—পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। মনে হচ্ছে—আজ অসুখ যেন দূরে পালিয়েছে অসোয়াস্তি যেন কোথাও নেই, জগৎসংসারে সবই যেন সবাই যেন আরামে রয়েছে সুখে রয়েছে শান্তিতে রয়েছে। এমন সময় আলোর পর্দ্দা সরিয়ে দিয়ে সুখের স্বপন ভেঙে দিয়ে সিদ্ধার্থের চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠল—একটা পাঙাশ মূর্ত্তি—জ্বরে জর্জ্জর রোগে কাতর। সে দাঁড়াতে পাচ্ছে না—ঘুরে পড়ছে। সে চলতে পাচ্ছে না—ধুলোর উপরে কাদার উপরে শুয়ে রয়েছে। কখনো সে শীতে কাঁপছে—কখনো বা গায়ের জ্বালায় সে জল জল করে চীৎকার করছে। তার সমস্ত গায়ের রক্ত তার চোখ দুটো দিয়ে ঠিক্‌রে পড়ছে। সেই চোখের দৃষ্টিতে আকাশ আগুনের মত রাঙা হয়ে উঠেছে। সমস্ত গায়ের রক্ত জল হয়ে তার কাগজের মত পাঙাশ হিম অঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে। তাকে ছুঁয়ে বাতাস বরফের মত হিম হয়ে যাচ্ছে। সে নিশ্বাস টান্‌ছে যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রাণকে শুষে নিতে চাচ্ছে। সে নিশ্বাস ছাড়ছে যেন নিজের প্রাণ নিজের জ্বালাযন্ত্রণা সারা সংসারে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধার্থ দেখলেন, সংসারের আলো নিভে গেছে, বাতাস মরে গেছে, সব কথা সব গান চুপ হয়ে গেছে। কেবল ধুলোকাদা-মাখা জ্বরের সেই পাঙাশ মূর্ত্তির বুকের ভিতর থেকে একটা শব্দ আসছে—কে যেন পাথরের দেওয়ালে হাতুড়ি পিট্‌ছে—ধ্বক্ ধ্বক্! তারি তালে তালে আকাশের সব তারা একবার নিভ্‌ছে একবার জ্বল্‌ছে; বাতাস একবার আস্‌ছে একবার যাচ্ছে।

জ্বরের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখে সিদ্ধার্থ ঘরে এসেছেন, রাজ-ঐশ্বর্য্যের মাঝে ফিরে এসেছেন, সুখসাগরের ঘাটে ফিরে এসেছেন, কিন্তু তখনও তিনি শুন্‌ছেন যেন তাঁর বুকের ভিতরে পাঁজরায় পাঁজরায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ উঠ্‌ছে—ধ্বক্ ধ্বক্!

এবার পশ্চিমের দুয়ার দিয়ে অস্তাচলের পথ দিয়ে পশ্চিম মুখে মনোরথ চলেছে—সোণার রথ চলেছে, যেদিকে দিন শেষ হচ্ছে, যেদিকে সূর্য্যের আলো অস্তে যাচ্ছে। সেদিক থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে আসছে নিজের নিজের ঘরের দিকে। পাখীরা ফিরে আসছে কলরব করে নিজের বাসায়, গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। গাই সব ফিরে আস্‌ছে মাঠের ধার দিয়ে নদীর

পার দিয়ে নিজের নিজের গোঠে, গোধূলির সোনার ধূলো মেখে। রাখাল-ছেলেরা ফিরে অসেছে গাঁয়ের পথে বেণু বাজিয়ে মাটির ঘরে মায়ের কোলে। সবাই ফিরে আস্‌ছে ভিন্‌ গাঁয়ের হাট সেরে দূর পাটনে বিকি-কিনির পরে। সবাই ঘরে আস্‌ছে—যারা দূরে ছিল তারা, যারা কাছে ছিল তারাও। ঘরের মাথায় আকাশ পিদিম্‌, যাদের ঘর নেই দুয়োর নেই তাদের আলো ধরেছে। তুলসী তলায় দুগ্‌গো পিদিম—যারা কাজে ছিল কর্ম্মে ছিল, পড়া পড়ছিল, খেলা খেলছিল, তাদের জন্যে আলো ধরেছে। সবাই আজ মায়ের দুই চোখের মত অনিমিষ্‌ দুটি আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ফিরে আসছে —মায়ের কোলে ভাইবোনের পাশে, বন্ধু বান্ধবের মাঝখানে। ভিখারী যে সেও আজ মনের আনন্দে একতারায় আগমনী বাজিয়ে গেয়ে চলেছে "এল মা ওমা ঘরে এল মা।" মিলনের শাঁখ ঘরে ঘরে বেজে উঠেছে। আগমনীর সুর, ফিরে আসার সুর, বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুর, কোলে এসে গলা-ধরার সুর, আকাশ দিয়ে ছুটে আসছে বাতাস দিয়ে ছুটে আসছে খোলা দুয়োরে উঁকি মারছে। খালি ঘরে সাড়া দিচ্ছে শূন্য প্রাণ খালি বুক ভরে উঠছে আজ ফিরে-পাওয়া সুরে, বুকে-পাওয়া সুরে, হারানিধি খুঁজে পাওয়া সুরে। সিদ্ধার্থ দেখছেন সুখের আজ কোথাও অভাব নেই, আনন্দের মাঝে এমন একটু ফাঁক নেই যেখান দিয়ে দুঃখু আজ আসতে পারে, ভরা নদীর মত ভরপূর আনন্দ, পূর্ণিমার চাঁদের মত পরি-পূর্ণ আনন্দ জগৎসংসার আলোয় ভাসিয়ে রসে ভরে দিয়েছে। আনন্দের বান এসেছে। আর কোথাও কিছু শুক্‌নো নেই, কোনো ঠাঁই খালি নেই। সিদ্ধার্থ দেখতে দেখতে চলেছেন, মিলনের আনন্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে আনন্দ আজ জোর করে দোর ঠেলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গলা জড়িয়ে ধরছে;—কেউ আজ কাউকে ভুলে থাক্‌ছে না ছেড়ে থাকছে না ছেড়ে যাচ্ছে না ছেড়ে দিচ্ছে না! আনন্দ কার নেই, আনন্দ নেই কোন্‌খানে! কে আজ দুঃখে আছে, চোখের জল কে ফেল্‌ছে, মুখ শুকিয়ে কে বেড়াচ্ছে? যেন তাঁর কথায় উত্তর দিয়ে কোন্‌ এক ভাঙা মন্দিরের ফাটা কাঁসরে খণ্‌ খণ্‌ করে তিনবার ঘা পড়ল—আছে আছে দুঃখু আছে! অমনি সমস্ত সংসারের ঘুম যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে একটা বুকফাটা কান্না উঠল—হায় হায় হাহা! আকাশ ফাটিয়ে সে কান্না, বাতাস চিরে সে কান্না বুকের ভিতরে বত্রিশ নাড়ি ধরে যেন টান্‌ দিতে থাক্‌ল—সে কান্না! সিদ্ধার্থ সুখের স্বপ্ন থেকে যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, সব কটি তারার আলো যেন মরা-মানুষের চোখের মত ঘোলা হয়ে গেছে! পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলেন রাত আড়াই-পহরে জলে স্থলে পাঙাস কুয়াশার জাল পড়ে আসছে, কে যেন সাদা একখানা চাদর পৃথিবীর মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে টেনে দিচ্ছে। ঘরে ঘরে যত পিদিম্‌ জ্বলছিল সবগুলো জ্বল্‌তে নিভ্‌তে, নিভ্‌তে জ্বলতে, হঠাৎ এক সময় দপ করে নিভে গেল, আর জ্বল্লো না,

কোথাও আর আলো রইল না। কিছু আর সাড়া দিচ্ছে না শব্দ করছে না—আকাশের আধখানা জুড়ে জলে-ভরা কালো মেঘ, কাঁদো-কাঁদো তুখানি চোখের পাতার মত নুয়ে পড়েছে। চোখের জলের মত বিষ্টির একএকটি ফোঁটা ঝরে পড়ছে,—আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর, তারি মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন দলে দলে লোক চলেছে সাদা চাদরে ঢাকা হাজার হাজার মরা-মানুষ কাঁধে নিয়ে কোলে করে বুকে ধরে। তাদের পা মাটিতে পড়ছে কিন্তু কোনো শব্দ করছে না, তাদের বুক ফুলে ফুলে উঠছে বুকফাটা কান্নায়, কিন্তু কোন কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না! নদীর পারে—যেদিকে সূর্য্য ডোবে যেদিকে আলো নেভে দিন ফুরিয়ে যায়, সেই দিকে তুই উদাস চোখ রেখে হন্ হন্ করে তারা এগিয়ে চলেছে মহাশ্মশানের ঘাটের মুখে মুখে, দূরে দূরে, অনেক দূরে, ঘর থেকে অনেক দূরে, বুকের কাছ থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে, ঘরে আসা ফিরে আসা বুকে আসা কোলে আসার পথ থেকে অনেক দূরে,—চলে যাবার পথে ছেড়ে যাবার পথে ফেলে যাবার কাঁদিয়ে যাবার পথে।

এপারে ওপারে মরণের কান্না আর চিতার আগুন, মাঝ দিয়ে চলে যাবার পথ—কেঁদে চলে যাবার পথ, কাঁদিয়ে চলে যাবার পথ। থেকে থেকে গরম নিশ্বাসের মত এক একটা দম্কা বাতাসে রাশি-রাশি ছাই উড়ে সেই মরণ-পথের যত যাত্রীর, শ্মশান-ঘাটের যত যাত্রীর মুখে লাগ্ছে, চোখে লাগ্ছে! সিদ্ধার্থ দেখছেন, ছাই উড়ে এসে মাথার চুল সাদা করে দিচ্ছে, গায়ের বরণ পাঙাস করে দিচ্ছে! ছাই উড়ছে—সব-জ্বালানো সব-পোড়ানো গরম ছাই! আগুন নিভে ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, আলো নিভে ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, জীবন ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, মরণ সেও ছাই হয়ে উড়ে চলেছে। সুখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, তুঃখু ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, সংসারের যা কিছু যত কিছু সব ছাই-ভস্ম হয়ে উড়ে চলেছে—দূরে দূরে, মাথার উপরে ঘোলা আকাশ দিয়ে পাঙাস একখানা মেঘের মত। তারি তলায় বুদ্ধদেব দেখলেন—মরা ছেলেকে তুই হাতে তুলে ধরে এক মা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন;—বাতাস চারিদিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে হায় হায় হায় রে হায়। সেদিন ঘরে এসে সিদ্ধার্থ দেখলেন তাঁর সোনার পুষ্পপাত্রে ফুটন্ত পদ্ম ফুলটির জায়গায় রয়েছে—একমুঠো ছাই আর মরা-মানুষের আধপোড়া একখানা বুকের হাড়।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ক্ষত্রিয় নামের প্রকৃত রহস্য

ক্ষত্রিয় নামটী আমাদের নিকট যেরূপ সুপরিচিত ইহার অর্থ তেমন সুগম নহে। সেই জন্য ক্ষত্রিয় নামের প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের নিমিত্ত আমরা এইস্থলে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ক্ষত্রিয় নামের সহিত আমরা বলবীর্য্যেরই সাধারণতঃ সংযোগ দেখিতে পাই, কিন্তু অনুসন্ধানের দ্বারা বলবীর্য্য অপেক্ষাও মহত্তর গুণ, ক্ষত্রিয় নামের সহিত সংযুক্ত থাকার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই।

ভারতীয় আর্য্যদিগের জাতিভেদ উৎপত্তির মূল রহস্য কর্ম্ম বলিয়াই শাস্ত্র-নির্দ্দেশ হইতে জানিতে পারা যায় যথা "কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতঃ।" ইহা হইতেই অনেকে ভারতীয় জাতিভেদের অর্থ "কর্ম্মবিভাগ" (distribution of work) করিয়া থাকেন। সুতরাং ক্ষত্রিয় জাতির আদি পুরুষদিগের মধ্যে প্রথম কর্ম্মের ইতিহাস অনুসরণ করিলে আমরা তাহাদিগের জাতীয় নাম সম্বন্ধে আভাস পাওয়ার আশা করিতে পারি। এই প্রকারে বেদধর্ম্মের চর্চ্চা ও অনুষ্ঠান রূপ কর্ম্ম দ্বারা, ব্রাহ্মণ জাতির নাম বেদের "ব্রহ্ম" নামানুসারে "ব্রাহ্মণ" হইয়াছে।

বেদে আর্য্যদিগের পুরোহিত ও রাজা এই দুই প্রকারের কার্য্যই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় দেখা যায়। পুরোহিত যজ্ঞকার্য্য ও স্তোত্র দ্বারা যজমান রাজার হিতকামনা করিতেছেন এবং যজমান রাজা বাহুবলের দ্বারা শত্রুর উপর বিজয়সাধন করিয়া আর্য্যাধিকার বিস্তার করিতেছেন। ইহাতে পুরোহিতের স্তোত্র বা 'ব্রহ্ম' হইতেই পুরোহিতের সম্প্রদায় 'ব্রাহ্মণ' নামে আর্য্যদিগের স্বতন্ত্র শাখারূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে পুরোহিত ও রাজারূপে আর্য্যদিগের মধ্যে প্রথম জাতিভেদের সূচনা হইল।

পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্যবিভাগ নির্দিষ্ট হওয়ায় পূর্ব্বে যে ঋষিগণ একাধারেই পুরোহিত ও রাজা ছিলেন তাহাই অনুমান করা যাইতে পারে। মনু, বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে আমরা এইরূপ ঋষিরই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

আদিতে একাধারে সম্মিলিত পুরোহিত ও রাজার কর্ত্তব্য ব্যবচ্ছেদের দ্বারাই যে পুরোহিত সম্প্রদায় ও রাজ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় এবং ইহারাই যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির মূল আদর্শ, পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার মতই প্রকাশ করিয়াছেন:—

"The king and "purohita," orginally holders of a joint office,* stood apart and separate in their functions both a type of the class or caste division into nobles and priests of those who held power ever the labouring Community"† Literary History of India by R. W. Frazer L L B.

* Frazer, "Golden Bough," Vol. I P 224.

† Senart, Castes dans l' Inde," p 149

"রাজা ও তাহার পুরোহিতের কর্ত্তব্য আদিতে সম্মিলিত ছিল—কিন্তু এক্ষণে ইহারা পৃথগ্‌ভূত হইল ও উভয়ই সম্ভ্রান্ত ও পুরোহিত শ্রেণী বা জাতির আদর্শ হইল। ইঁহারা শ্রমজীবিদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিল।"

বলা বাহুল্য এস্থলে সম্ভ্রান্ত ও পুরোহিত শ্রেণীর দ্বারা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং শ্রমজীবি শ্রেণী দ্বারা বৈশ্যগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইহা হইতে রাজসম্প্রদায়ই যে ক্ষত্রিয় জাতির প্রকৃত মূল তাহাই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। বেদের সুপ্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্তে যে 'ক্ষত্রিয়' শব্দের পরিবর্ত্তে "রাজন্য" শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ-রূপে আমাদের বক্তব্যেরই সমর্থন করে। 'রাজন্য' শব্দটী 'রাজন্‌' শব্দের উত্তর 'য' প্রত্যয় করিয়াই সিদ্ধ হয়। ইহার প্রকৃতি-গত অর্থ 'রাজার সন্ততি।' সুতরাং 'রাজার জাতি' ইহাই রাজন্য শব্দের অর্থ হইতেছে। এই রাজার জাতি, বিশেষরূপে বল বা 'ক্ষত্রের' অধিকারী বলিয়াই 'ক্ষত্রিয়' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপেই 'রাজন্য' ও 'ক্ষত্রিয়' একার্থবাচক হইয়াছে।

রাজা হইতেই যে 'রাজন্য'রূপ ক্ষত্রিয় জাতি-বাচক নামের উৎপত্তি হইয়াছে—অথর্ব্ববেদের একটী স্থল হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায় যথা :—

"প্রিয়ং মাকৃণু দেবেষু মাকৃণু প্রিয়ং রাজসু মাকৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উতশূদ্র উত আর্য্যে॥"

অথর্ব্ব বেদসংহিতা—১৯শ অধ্যায় ৬২।৩

এস্থলে দেব যে "ব্রাহ্মণ" বুঝাইতেছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং উদ্ধৃত স্থলের অনুবাদ এইরূপ হইবে :—

"ব্রাহ্মণদিগের প্রিয় করিবে, রাজাদিগের প্রিয় করিবে। শূদ্রই হউক আর আর্য্যই হউক সকলেরই প্রিয় দেখিবে।"

এখানে রাজা দ্বারা যে ক্ষত্রিয়ই উল্লিখিত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়।

কেবল বেদেই যে ক্ষত্রিয় বুঝাইতে রাজা শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; অন্য শাস্ত্রেও ক্ষত্রিয় বুঝাইতে রাজা বা তদর্থক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় যথা উপনয়ন-বিধানে :—

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্তোপনয়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞঃ গর্ভাত্তু দ্বাদশেবিশঃ"

"ব্রাহ্মণের উপনয়ন গর্ভ হইতে অষ্টম বৎসরে সম্পাদন করিবে—রাজা বা ক্ষত্রিয়ের গর্ভ হইতে একাদশ বৎসরে এবং বৈশ্যের গর্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসরে সম্পাদন করিবে।"

"শুধ্যেদ্বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥"

"ব্রাহ্মণ দশদিনে অশৌচ হইতে শুদ্ধ হয়—ভূমিপ বা ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে শুদ্ধ হয় এবং বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে ও শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়।"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে রাজার বংশ হইতেই যে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা পরিষ্কার রূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

ক্ষত্রিয় জাতির এই প্রকারে রাজার সহিত আদিতে সম্বন্ধ হইতে ক্ষত্রিয় শব্দের মূল 'ক্ষত্র'শব্দকে বিশেষ অর্থ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইতেই দেখা যায়। পূর্ব্বের 'বল' অর্থের স্থলে, 'ক্ষত্র' শব্দে রক্ষা অর্থেরই বিশেষ যোগ লক্ষিত হয়। শব্দকল্পদ্রুমে

'ক্ষত্রিয়' শব্দ যেরূপ ভাবে সাধিত ও ব্যুৎপাদিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বক্তব্যেরই যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে—"ক্ষদতি রক্ষতি জনান্, ক্ষত্রঃ ক্ষদসংবৃতৌ সৌত্রঃ ততস্ত্রাসুসিতিত্রঃ। ক্ষত্র এব ক্ষত্রিয়ঃ স্বার্থে ইয়ঃ।"

অধ্যাপক মেকৃডনেল্ (Macdonell) কৃত সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানে (Sanskrit English Dictionary) যে, 'ক্ষত্র' শব্দ রাজ্য (dominion) ও 'ক্ষত্রিয়' শব্দ 'রাজ্যকারী' ও 'রাজা' (ruling, ruler) অর্থে ব্যাখ্যাত দেখা যায়—তাহাতেও 'ক্ষদ্' ধাতুর সহিত উল্লিখিত সংবরণ বা রক্ষা অর্থের বিশেষ সংযোগই প্রমাণিত হয়।

পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বেল্‌ফোর্ (Balfour) ও তদীয় "ভারতকল্পদ্রুম" (Cyclopædia of India) নামক গ্রন্থে ক্ষত্রিয় শব্দের মূল 'ক্ষত্র' শব্দে কেবল 'রাজত্ব' ও 'রাজ্য' অর্থ দেখিতে পাইয়াছেন তাহা নহে—কিন্তু এই 'ক্ষত্র' শব্দ উক্ত উভয় অর্থে বৈদিক সংস্কৃত জেন্দ ভাষায় ও পারসীক শিলালিপিতে প্রযুক্ত হওয়ার প্রমাণও তিনি পাইয়াছেন ; যথা :—

"The word is an adjective from the ancient noun Kshatra, which, as meaning rule, dominion. occurs in all the three languages of the Veda, the Avesta, and the Persian inscriptions ; orginally it simply denoted possessed of authority and is so sometimes applied in the Veda even to the gods." Cyclopaedia of India by Edward Balfour.

"এই (ক্ষত্রিয়) শব্দটী ক্ষত্রশব্দেরই বিশেষরূপ। বেদ, আবেস্তা ও পারস্য শিলালিপি এই তিনের ভাষা ত্রিতয়েই রাজত্ব, রাজ্য অর্থে ইহার (ক্ষত্র শব্দের) প্রয়োগ পাওয়া যায়। আদিতে ইহা কেবল শক্তির (বলের) অধিকারীরূপ অর্থ প্রকাশ করিত এবং এই অর্থে বেদে দেবতাদিগের সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে।

এস্থলে আমরা 'ক্ষত্রিয়' শব্দ গঠনের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাসই প্রাপ্ত হইতেছি এবং মূল বল হইতেই যে রাজত্ব ও রাজ্য অর্থের বিকাশ হইয়াছে—তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি।

'ক্ষত্রিয়' শব্দের মধ্যে 'রাজত্ব' ও 'রাজ্য' অর্থের সম্প্রবেশ হইতে রাজন্ শব্দজাত 'রাজন্য' শব্দ হইতে যে ইহার পূর্ব্বোক্তার্থ গৃহীত হইয়াছে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। পূর্ব্বোল্লিখিত সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানে অধ্যাপক মেকৃডনেল্ ক্ষত্রিয় জাতির বাচক শব্দ সকলের মধ্যে রাজন্য শব্দকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। 'রাজন্য' শব্দের অর্থ যোদ্ধ-জাতীয় লোক বলিয়া লিখিয়া ইহার সম্বন্ধে বন্ধনী মধ্যে তিনি এই শব্দ উক্ত জাতির প্রাচীনতম অভিধা এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যথা :—

"রাজন্য man of the warrior caste (of which this is the oldest designation.)

ইহা হইতে রাজবংশ হইতেই যে ক্ষত্রিয় জাতির প্রথম উদ্ভব এবং রাজন্য শব্দই যে ক্ষত্রিয় জাতিবাচক প্রথম শব্দ ইহা নিঃসন্দেহরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

সুতরাং ক্ষত্রিয় নামে যুদ্ধের উগ্রভাব অপেক্ষা রক্ষার মহিমাময় ভাবই যে অধিক প্রকটিত তাহাই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসও ক্ষত্রিয় শব্দের এই মহিমাময় ভাবই তদীয় অমর লেখনীতে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন :—

"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্র ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষুরূঢ়ঃ।"

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নবাব

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ছায়া

সেদিন রবিবার। ভোরের আলো ভাল করিয়া না ফুটিতেই বৃদ্ধ জুজের উল্লাস-চীৎকারে সারা গৃহে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। "ও হেনরিতা, ওরে ও এলিস্, আয়, তোরা শীগ্‌গির আয়। মারানের নাটক থিয়েটার-ওলারা নিয়েছে। আঁদ্রে নিজে খপর দিতে এসেছে। ওঠ্, ওঠ্, ওরে এদিকে আয়।"

আঁদ্রে কাল রাত্রেই এ সংবাদ পাইয়াছিল। ম্যুভোঁ থিয়েটারের ম্যানেজার কার্দ্দিলাক কাল তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিয়াছে, নাটকখানি তাহাদের পছন্দ হইয়াছে; শীঘ্রই রিহার্সাল সুরু হইবে এবং এক মাসের মধ্যেই যাহাতে অভিনয় হয়, তাহারও বন্দোবস্ত চলিতেছে। তাহার পর দুইজনে বসিয়া কতক্ষণ ধরিয়া এই নাটক-অভিনয়েরই আলোচনা হইয়াছে। কি কি দৃশ্যপট নূতন করিয়া আঁকিতে হইবে, কাহাকে কি ভূমিকা দিলে ঠিক হয়, পোষাক-পরিচ্ছদই বা কেমন তৈয়ার করানো প্রয়োজন, এমনই সব প্রয়োজনীয় কথা। তাহার পর থিয়েটার হইতে আঁদ্রে যখন গৃহে ফিরিল, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। কাজেই এত বড় সুখপরটা জুজের গৃহে আর দেওয়া ঘটে নাই। তবুও নিজের ঘরে যাইবার সময় আঁদ্রে জুজের দ্বারে কাণ পাতিয়া গিয়াছে, কেহ জাগিয়া আছে কি না! কিন্তু সে গৃহে জাগরণের কোনই সাড়া পাওয়া যায় নাই। কেহ জাগিয়া থাকিলে সেই রাত্রেই যে আঁদ্রে এ খপরটুকু নিশ্চয় দিয়া ফেলিত, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। সারা রাত্রিটাই তাহার নিতান্ত অধীরভাবে কাটিয়া গিয়াছে। কখন্ ভোর হইবে, কখন সে গিয়া স্নেহশীল জুজের গৃহে এ সংবাদটুকু দিয়া বুকটা খালি করিবে! রাত্রে নিদ্রাও ভাল হয় নাই। কেবলই সে ভাবিয়াছে, এ আনন্দ একা আর ভোগ করা যাইতেছে না—এলিস, আলিন, জুজ, সকলের মধ্যে বাঁটিয়া না দিলেই নয়!

তাই সে প্রত্যূষে যে মুহূর্ত্তে শুনিল, নীচে জুজের গৃহের জানালা খোলা হইতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল। জুজ দাড়ি কামাইতেছিল। একটা গাল সাফ হইয়াছে, অপর গালে তখনও সাবান লাগিয়া রহিয়াছে—এমন সময় আঁদ্রে

আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ জুজ চমকিয়া উঠিল। এত ভোরে—আঁদ্রে? তাই ত? কি মনে করিয়া সে আসিল! কোন অসুখ করে নাই ত! আঁদ্রে কহিল, "না, না, অসুখ নয়। আমার নাটকখানা থিয়েটারওলারা নিয়েছে, ম্যসিয়ো—আর এক মাসের মধ্যেই তারা নাটকখানা প্লে করবে।" জুজ আনন্দে যেন শিহরিয়া উঠিল। এঁ্যা, সত্য না কি! চীৎকার করিয়া সে তখন মেয়েদের ডাক দিল।

আঁদ্রের এতখানি আনন্দের যথেষ্ট কারণ ছিল। উপেক্ষিত যুবক নিভৃতে এককোণে পড়িয়া থাকিয়া আপনার প্রাণ ঢালিয়া এই নাটকখানি লিখিয়া শেষ করিয়াছে। সাহিত্যের নেশা ভূতের মতই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইহারই জন্য নিজের মাকে অবধি সে ছাড়িয়া আসিয়াছে—ইহারই জন্য জেঙ্কিন্সের বিলাস-প্রচুর সজ্জিত-সুন্দর গৃহে তাহার আজ আর স্থান নাই। ভক্ত যেমন সর্ব্বত্যাগী হইয়া আপনার দেবতার তপস্যা করে, তেমনই ভাবে আঁদ্রে এক কঠোর তপস্যায় আপনাকে মগ্ন তন্ময় রাখিয়াছিল! আজ মিলিয়াছে, সিদ্ধি মিলিয়াছে—দেবীর প্রসাদ আজ সে লাভ করিয়াছে। এইবার তাহার নাটকের অভিনয় হইবে! পারির লোক থিয়েটারে আসিয়া জড়ো হইয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করিবে—গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া সাদরে তাহাকে অভিনন্দন করিবে! কিন্তু শুধুই কি এ অভিনন্দনের জন্যই সে কাতর! না—এ নাটক-অভিনয়ের অর্থ, তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন। চপলা লক্ষ্মীও এবার তাহার জীর্ণ গৃহে আসিয়া দেখা দিবেন—তাঁহার সস্মিত মুখের হাসির ছটায় দারিদ্র্যের আঁধারে-ঘেরা ঘর আলোয় ভরিয়া উঠিবে। আর এলিস্—তাহার জীবনের ধ্রুবতারা, যাহার পানে চাহিয়া শত বিপদেও আপনাকে সে অটল অচপল রাখিয়াছে—সেই এলিসও এবার—

মেয়েরা ছুটিয়া আসিল। আলিন আসিয়া কহিল, "কি হয়েছে, বাবা, ডাকছ কেন? এই যে ম্যসিয়ো আঁদ্রে—খপর কি?" আলিনের পিছনে এলিসও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—অধরের কোণে মৃদু হাসির রেখা, নয়নে সরমের কম্পিত দৃষ্টি!

জুজ কহিল, "আঁদ্রের নাটক বিদ্রোহ এবার থিয়েটারে প্লে হবে।"

আলিন কহিল, "বাঃ,—তা আমাদের কি দিচ্ছেন, ম্যসিয়ো আঁদ্রে? আমি ত গোড়া থেকেই বলছি, আপনার বই থিয়েটার-ওলারা নেবেই—কেমন, বলিনি?"

আলিনকে মৃদুস্বরে ধন্যবাদ দিয়া আঁদ্রে এলিসের পানে চকিতের জন্য একবার চাহিয়া দেখিল। সে মুখ সরমে রক্তিম, নয়ন-পল্লব সঘন কম্পিত, দৃষ্টি নত! আঁদ্রের শিরার মধ্য দিয়া বিদ্যুতের একটা মৃদু প্রবাহ ছুটিয়া গেল। আঁদ্রে জুজের পানে কোনমতে চোখ তুলিয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে আর একটা কথা আছে, আমার—"

"গোপনীয়—?" জুজ কহিল, "তাই ত, আমায় যে ভাবিয়ে দিলে হে—" তাহার পর আঁদ্রের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে জুজ কহিল, "এদের যেতে বলব?"

আঁদ্রে কহিল, "সকলের সরবার

দরকার নেই। এলিস বোধ হয়, এর কিছু জানে। আলিন সঠিক না জানলেও কতক বোঝে। তবে এরা—”

জুজ কহিল, “বেশ, এলিস আর আলিন থাকুক। তোরা একবার যা ত মা—আবার ডাকলে আসিস্।”

সকলে কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেলে ঘর স্তব্ধ হইল। জুজ অধীর আগ্রহে আঁদ্রের পানে চাহিয়া রহিল। আঁদ্রে একবার চারিধারে চাহিয়া লইল—তারপর সে আপনার মনের গোপন কথাটি আজীবন-সঞ্চিত আশার কথা জুজের কাছে প্রকাশ করিল। আয়োজন দেখিয়া এলিসের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! বুঝি, সেই কথা! না জানি, শুনিয়া জুজ কি বলিবে,—কি মত দিবে? তাহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তবু সে শুনিল, আঁদ্রে আজ জুজের করুণার ভিখারী; তাহারই করুণার উপর আঁদ্রের সব—সব নির্ভর করিতেছে! আর কিছু নহে, সে শুধু এলিসের পাণিপ্রার্থী!

শুনিয়া জুজ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, “এ কি সম্ভব! আরে মাষ্টার আঁদ্রে—তাই ত, এ কথাটা স্বপ্নেও যে কোনদিন ভাবতে পারিনি। এ্যাঁ!” কিন্তু না, বৃদ্ধ রহস্য করিতেছে। জুজ কহিল, “আঁদ্রে, এ’ত খুব ভাল কথা! তোমার মত জামাই পাওয়া, বলতে কি,—এর কতকটা আভাষ আমি আগেই পেয়েছিলুম! তাহলে ত আমি ঠিকই আঁচ করেছিলুম—অবশ্য অপরের কাছে এ-সম্বন্ধে কিছু শুনেও ছিলুম—”

পড়িল। জুজ তাহা হইলে সবই জানে! ছি, কি লজ্জা! সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাহার লজ্জা হইতে লাগিল, অথচ চলিয়া যাইতেও শক্তি নাই। পা দুইটা সরিতে চাহে না! তবে কথাটা জুজকে বলিল কে? আলিন নয় ত!

আলিন হাসিয়া কহিল, “তাহলে আমি বলি! আমিই এ আভাষটুকু বাবার কাণে তুলেছিলুম। কেমন বাবা, নয় কি?” কথা শেষ করিয়া আলিন দুই হাতে এলিসকে জড়াইয়া ধরিল। আলিনের বুকে মুখ লুকাইবার আশ্রয় পাইয়া এলিস যেন বর্ত্তাইয়া গেল।

তাহার পর জুজের সহিত আঁদ্রের আরও দুই-চারিটা কথা হইল। বিবাহের পর আঁদ্রে ও এলিস উপরতলার ঐ ঘরটিতেই থাকিবে, এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না। আঁদ্রে ফটোগ্রাফির ব্যবসায় উঠাইয়া দিবে না—এবং ‘বিদ্রোহের’ অভিনয় হইতে যেরূপ লাভের আশা সে করিতেছে, তাহার যদি ব্যতিক্রম না হয়, তাহা হইলে সে কার-বারটাকেও সে ঐ টাকায় আরও বাড়াইয়া ফেলিতে পারিবে। অর্থাৎ সংসার-সমুদ্রে তাহাদের দুইজনের জীবন-তরী দুইখানি দিব্য তাহারা বাহিয়া যাইবে—এই প্রসন্ন বায়ু ও অনুকূল স্রোত-টুকু সহায় থাকিলে কোনই ভয় নাই!

জুজের একটা ভাবনা হইল। সে কহিল, “কিন্তু তোমার মা-বাপ এ বিয়েতে মত দেবেন কি? ডাক্তার জেঙ্কিন্সের অত পয়সা, অমন মান-সম্ভ্রম!”

ফুটিল। সে কহিল, "ওঁর কথা আর তুলবেন না, মশায়। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি—আমি তাঁর কি ধার ধারি যে তাঁকে ভয় করে চলতে হবে?" তাহার পর একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "তবে আমার মা! তা মা আমায় মাঝে মাঝে এখানে দেখতে আসেন—যদিও ডাক্তার জেঙ্কিন্স তাঁকে এখানে আসতে মানা করেছে, তবুও মা সে মানা শোনেন নি। এলিসকে মা খুব পছন্দ করেন। আর আমার মা কেমন লোক, আপনিও দেখবেন পরে। এলিসকে বরং জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তবে আমার এই বড় দুঃখ হয় যে, ঐ পিশাচটা মার উপর এত অত্যাচার করে, আমি তার কোন প্রতিকার করতে পারি না—" আঁদ্রের মর্ম্মের ভিতর হইতে একটা তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস উঠিল—তাহার প্রাণের মধ্যে যে জ্বালা, তাহা সে-ই জানে। সে জ্বালা জুড়াইতে পারে, শুধু এলিসের ঐ সুন্দর মুখের স্নিগ্ধ বাণী,—ঐ চপল নয়নের সস্মিত চাহনিটুকু!

আলিন কহিল, "বাবা, আজ তাহলে এক কাজ করা যাক, এস। এঁর নতুন নাটকের খাতিরে আজ আমরা লঙ্-সাম্পে বেড়াতে যাই, চল। কি বল? ওখানে চড়ি-ভাতি করব। আপনি কি বলেন, ম্যাসিয়ো আঁদ্রে?"

হেনরিতা, ইয়া প্রভৃতিও ইতিমধ্যে আসিয়া জুটিল। তাহারা কহিল, "আমরাও বেড়াতে যাব, দিদি। ও বাবা—"

জুজ কহিল, "বেশ মা—সবাই যাবে। তাহলে আলিন চড়ি-ভাতির গোছগাছ করে নাও। আঁদ্রের কোন অসুবিধা হবে না ত?"

এলিসের সঙ্গলাভ হইবে! অসুবিধা! আঁদ্রে কহিল, "কিছু না!"

জুজ কহিল, "তাহলে তুমি তৈরী হয়ে এস। আমরাও ঠিক হয়ে নি। তার পর একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ব—রোদ ওঠবার আগেই।"

আঁদ্রে বিদায় লইল। মেয়েরাও আপনাদিগকে সজ্জিত করিয়া সমস্ত গুছাইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় পল আসিয়া উপস্থিত হইল। জুজ কহিল, "শুনেছ হে! একটা সুখপর আছে—কার্দ্দিলাকরা আঁদ্রের নাটক অভিনয় করতে নিয়েছে।"

এ সংবাদ সকলের পূর্ব্বে পলই প্রথম পাইয়াছে! এ বিষয়ে সে কি কম পরিশ্রম করিয়াছে। কার্দ্দিলাককে ধরিয়া পলই ত নাটকখানি আগাগোড়া পড়াইয়াছে! আবার পড়াইয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই, অভিনয়-আয়োজনে অর্থ-সাহায্যও বিশেষরূপ করিবে বলিয়া আশা দিয়াছে! তাই কার্দ্দিলাক এই নূতন লেখকের প্রথম নাটক-অভিনয়ে এতখানি ব্যগ্রতা ও উৎসাহ দেখাইতে উদ্যত হইয়াছে!

কিন্তু এ কথা পল কাহারও কাছে ভাঙ্গে নাই; এখানেও সে ভাঙ্গিল না। কার্দ্দিলাককেও সে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে, এ কথা যেন আর তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণে প্রবেশ না করে! তাই পল জুজের কথায় সহর্ষ বিস্ময় মাত্র প্রকাশ করিয়া নূতন নাটক ও তাহার লেখকের শুভ কামনা

করিল। জুজ কহিল, "তুমি বসো, পল, আমি দু-একটা কাজ সেরে নি। আমরা আজ আঁদ্রের নতুন বইয়ের সম্মানের জন্য লঙ সাম্পে চড়ি-ভাতি করতে চলেছি। আলিনের সাধ, নতুন নাটকের খাতির করা। আসলে কিন্তু অন্য কারণ আছে। আজ আঁদ্রে আমার কাছে তার সঙ্গে এলিসের বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিল—আমিও তাতে মত দিয়েছি। তা তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে কি, না, কোন অসুবিধা হবে?"

"অসুবিধা আর কি! বেশ, তাহলে আমিও যাব।" তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া পল কহিল, "তবে আমি শুধু বলতে এসেছিলুম, কিছু দিনের জন্য আপাততঃ আমি টিউনিসে চলেছি,—"

জুজ কহিল, "টিউনিসে,—হঠাৎ?"

পল কহিল, হাঁ, সে টিউনিসে চলিয়াছে। তাহাকে যাইতেই হইবে। নবাবকে এই ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রগুলার মুখের সম্মুখে রাখিয়াই তাহাকে যাইতে হইবে—উপায় নাই! না গেলে নয়! এখানে ডিউক মোরা আছেন, তিনি নবাবকে ইহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, এ আশা বিলক্ষণ আছে।

এমন সময় আলিন আসিয়া ডাকিল, "বাবা—" পরে পল্‌কে দেখিয়া থমকিয়া সে থামিয়া গেল। জুজ কহিল, "কি মা? এই যে পলও আমাদের সঙ্গে যাবে, চড়ি-ভাতিতে যোগ দেবে।" আলিন কোন কথা বলিল না—তাহার মুখে স্বর ফুটিল না। পল তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আমায় তোমাদের চড়ি ভাতির দলে নেবে, আলিন?"

আলিন কোনমতে কহিল, "বেশ ত।"

জুজ কহিল, "পল টিউনিস যাচ্ছে, আলিন। কতদিন বাদে যে ফিরবে—"

আলিনকে কে যেন অতর্কিতে নিষ্ঠুর আঘাত করিল। মনের সে বেদনা চাপিয়া আলিন একেবারে পলের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টিউনিসে?"

পল কহিল, "হাঁ, আলিন।"

আলিনের বুকের মধ্যে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল। টিউনিসে! তাহার অর্থ, কতদিনের অদর্শন! কতদিনের—!

জুজ কহিল, "হাঁ, ভাল কথা, তোমাদের টেরিটোরিয়েলের কি হল? কর্সিকার সে কারবার চলছে কেমন? এখনও যে নবাবের নাম দেখছি,—বোর্ডের চেয়ারম্যান আছেন। এই আলিবাবার গুহা থেকে নবাবকে টেনে বার করতে পারছ না? বার করা ভারী দরকার হয়ে পড়েছে, মোদ্দা—"

"আমি বুঝি, ম্যসিয়ো জুজ। কিন্তু মান নিয়ে ওখান থেকে এখন বেরুতে হলে ওতে অনেক টাকা ঢালতে হয়—প্রায় তিন লাখ! অত টাকা এখন হাতেও নেই। টিউনিসে তাই আমি যাচ্ছি ত—টাকার জোগাড় করতে শুধু। বে ত সর্ব্বস্ব গ্রাস করবার উদ্যোগ করেছে—দেখি, যদি তার গ্রাস থেকে কিছুও বার করে আনতে পারি! এখন তবু কিছু আদায়ের ভরসা আছে—নাহলে পরে—"

বাধা দিয়া জুজ কহিল, "না, তাহলে তুমি যাও, দু-একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, থলি ভরে টাকা আনো—আর সেই টাকায়

নবাব বেচারাকে ঐ জোচ্চোরদের আড্ডা, পাগানেত্তিদের দল থেকে উদ্ধার কর। মোদ্দা, আমি ভাবছি, হেমারলিঙ যে তোমাদের অমন শত্রু, সে ওতে লুকিয়ে খানকতক শেয়ার কিনলে না যে—?"

আলিন এবার কথা কহিল, গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "বাবা—"

"কেন মা ?"

আলিন কহিল, "আজ সকালে আমাদের এই আনন্দের মাঝখানে ও লোকটার নাম আর এনো না, বাবা।"

জুল্ন উত্তেজিতভাবে কহিল, "ঠিক বলেছিস মা। সে রাস্কেলটা,—তার কথা মনে হলে আমার যেন আর মোটেই জ্ঞান থাকে না। ভগবান এতও সইছেন ত! আশ্চর্য্য!"

সহরের শেষে নদীর বালুময় উপকূলে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এক ধারে গাড়ী চলিবার পাকা রাস্তা। বেলা পড়িলে এই পথে ধনী ও বিলাসীর শকটের সমারোহ লাগে—দলে দলে সব গাড়ী চড়িয়া এখানে বেড়াইতে আসে। পল এধারে ইহার পূর্ব্বে আর কখনও আসে নাই।

একটা ঝোপের ধারে চড়ি-ভাতির আয়োজন হইয়াছিল। সে আনন্দ শেষ করিয়া সকলে এই পথেই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। পল ও আলিন সকলকে আগাইয়া আসিয়াছিল। এই বিচিত্র শোভায় দুইজনের প্রাণের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চারিয়া উঠিয়াছিল। এমন সুখের স্বাদ পল পূর্ব্বে আর কখনও পায় নাই। এত সুখ পৃথিবীতে আছে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। আলিনের কোমল হাতখানি পলের হাতে মালার মত বিছাইয়া পড়িয়াছিল—ফুলের মালার মতই তেমনই মৃদু স্পর্শটুকু! দুইজনে ধীরপদে চারিধারের বিচিত্র শোভার মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছিল। জুল্, এলিস, আঁদ্রে, হেনরিতা প্রভৃতি পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। এই দীর্ঘ সরল পথে বেড়াইতে বেড়াইতে পলের মনে হইল, তাহাদের সম্মুখে সংসারের দীর্ঘ পথটাও এমনই সরল পড়িয়া রহিয়াছে! কোথাও বাঁক নাই! সে পথে তাহারা দুইজনে এমনই শান্তি বুকে লইয়া, মিলনের নিবিড় বাহুপাশে পরস্পরকে এমনই বাঁধিয়া—দুইজনের প্রাণের সমস্ত প্রেমের ছায়ায় ঢাকা এমনই শ্যামল স্নিগ্ধ পথে চলিয়া যাইবে! আলিনের বুকের মধ্যে এক নূতন রাগিণী সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল—এক নূতন আবেশ! তাহার মন হইতে সকল দুর্ভাবনা আজ দূর হইয়া গিয়াছিল।

সহসা চলিতে চলিতে দুইজনে দেখিল, দূরে ছায়া-মূর্ত্তির মত দুইজন অশ্বারোহী পাশাপাশি চলিয়াছে। ক্রমে মূর্ত্তি একটু স্পষ্ট হইলে, উভয়েই বুঝিল, তাহাদের একজন পুরুষ অপরটি নারী। ঘোড়া ধীর পদে চলিয়াছে। ক্রমে মূর্ত্তি আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—অশ্বারোহী দুইজন ক্রমে আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া গাছের অন্তরাল দিয়া প্রান্তর-মধ্যে প্রবেশ করিল—তখন তাহাদের আর চিনিতে বাকী রহিল না। পুরুষটি ডিউক মোরা, আর নারী ফেলিসিয়া।

পলের মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল। সে আলিনকে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "চিনতে পারলে?"

আলিন চিনিয়াছে—তাহার সমস্ত প্রাণ সুগভীর লজ্জায়, দারুণ বেদনায় ভরিয়া উঠিল। যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহাকে অন্যায় কিছু করিতে দেখিলে মনে যে ভাব হয়, আলিনেরও সেইরূপ হইল। সে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "বেচারী ফেলিসিয়া!"

ফেলিসিয়াকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইলেও কথাটা পলের মনে কাঁটার মতই বিঁধিল। এই ফেলিসিয়ার উপর কতখানি তাহার বিশ্বাস ছিল! সে বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে, আজ! তবুও এ বেদনার মধ্যে একটা আরাম ইহাই ছিল যে দুর্ভাগিনী ফেলিসিয়ার জন্য আলিনের নির্ম্মল প্রাণ এতখানি কাতর, পীড়িত! এ সমবেদনায় পল আজ আলিনের প্রাণের যে পরিচয় পাইল, তাহাতে সে জুড়াইয়া গেল।

বেদনাময় এই শুষ্ক ভাবটা কাটাইবার অভিপ্রায়ে পল নবাবের কথা ও সেই-প্রসঙ্গে তাহার নিজের টিউনিস যাইবার কথা পাড়িল। আলিন কহিল, "তুমি চিঠি লিখো কিন্তু, পল, বেশ বড় বড় চিঠি। যা দেখবে শুনবে, সব খুলে লিখো। আমরা এখানে বসে তোমার চিঠি থেকে সে দেশের পরিচয় নেব। বাবাকেই কিন্তু চিঠি লিখো।"

এই সতর্কতায় পল আর একটা গোপন বিষয়ের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাইল। সে কথাটা স্পষ্ট করিয়া কোনদিন সে জানিতে পারে নাই। আজ এ সতর্কতার আয়োজন দেখিয়া তাহার অনেকখানি দ্বিধা অনেকখানি সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। সে সাহস পাইয়া অলিনের হাতখানি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমি কি ভাবছিলুম, জানো, আলিন? আমার মনে বড় অশান্তি। তুমিই শুধু তা ঘুচোতে পার। যদি তোমার দয়া হয়, যদি তুমি আমায় তোমার দয়ার অযোগ্য না ভাব, আলিন—তাহলে আরও একটা কথা বলি, শোন। আমি একটা গুরুতর অন্যায় করেছি। আমার বুক ভেঙ্গে যেত, কিন্তু একটা জিনিষ এ বুকটাকে ঠিক রেখেছে। সে কি জিনিষ, জানো—?"

পল বুকের পকেট হইতে ফ্রেমে বাঁধা ছোট একখানি ছবি বাহির করিল—পেন্সিলে আঁকা সুন্দর একখানি মুখের আভাষ! আলিন মুহূর্ত্তে সে মুখ চিনিতে পারিল। তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এ তাহারই মুখ! ফেলিসিয়া একদিন তাহাকে বসাইয়া পেন্সিল দিয়া আঁকিয়া লইয়া ছিল। আড়ম্বরহীন সারল্যে মণ্ডিত ছোট সুন্দর মুখখানি!

পল কহিল, "এ ছবি আমার—ফেলিসিয়া আমায় দিয়েছে। আজ আমি চলে যাচ্ছি, তাই বলছি, এ ছবি কাছে রাখতে আমার বড় আনন্দ হয়, যদি নিজের হাতে এ ছবি আমার বুকে তুমি তুলে দাও; অপরের কাছ থেকে এ ছবি পাবার কোন অধিকার নেই আমার। সে আমি চাই-ও না। নাও, আলিন—তোমায় আজ এ ছবি আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। তোমার অনুমতি না পেলে এ ছবি রাখবার অধিকার আমার থাকতেও পারে

না। যদি তুমি আমার চেয়ে যোগ্যতর কোন বন্ধুকে এ ছবি দিলে সুখী হও, তাহলে এ ছবি তাকেই দিয়ো। আর, আর যদি তোমার মনে হয়—"

পল কথাটা শেষ করিতে পারিল না। আলিনেরও সব কেমন গোল হইয়া যাইতেছিল। গেরির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল, "যদি আমার মনের কথা জানতে, পল—তাহলে এর উত্তরের জন্য কখনই তোমায় এমন ভাবে অপেক্ষা করতে হত না। তুমি যদি আমায় ভাল বেসে থাক, যেমন তুমি বলছ, তাহলে আমিই বা তোমায় না ভালবেসে থাকি কি করে, পল? তবে তুমি ত জান, আমি স্বাধীন নই—আমাকে আর একটা সংসার মাথায় করে থাকতে হয়েছে। দেখ, চেয়ে দেখ—"

পিছনে অদূরে জুজ, এলিস, হেনরিতা প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আলিন তাহাদের পানে লক্ষ্য করিল।

পল কহিল, "আমিও স্বাধীন নই, আলিন। তোমার মত আমারও শত কাজ শত দায়িত্ব আছে। তোমার সংসার থেকে আমি তোমায় বিচ্যুত করতে চাই না, আলিন। তুমি যেমন আছ, তেমনই থেকো, তবে শুধু আমায়—আমায়—"

কৃতজ্ঞতায় আলিনের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "এঁ্যা, এত দয়া! পল, আমি বড় ভাবনায় পড়েছিলুম, সে ভাবনার হাত থেকে আজ তুমি আমায় মুক্তি দিলে। তোমার আলিন তোমার কাছে আলিন, আর এ সংসারে সবার কর্ত্রী—তাই থাকবে? তবে ও ছবি তোমার কাছেই রাখো—আমি নিজের হাতে তোমায় দিচ্ছি। শুধু ছবি নয়—আমি নিজেকেও আজ তোমায় দিয়ে দিলুম—যদি তোমার নিতে কোন আপত্তি না থাকে! নাও পল, আমায় নাও। আমার সর্ব্বস্ব, আমার প্রাণ, আমার মন, সব আজ থেকে তোমার—তোমারই শুধু।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্রোতের ফুল

(২৮)

বিপিন পিতার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বরাবর লাইব্রেরীতে গেল। দেখিল সেখানে দুই হাঁটু হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া নিধিরাম ঘুমাইতেছে। বিপিন আসিয়া বেদনা-কাতর কণ্ঠে ডাকিল—নিধিদা।

নিধিরাম চমকিয়া জাগ্রত হইয়া বলিল —কেন ভাই?

বিপিন বলিল—আমি কলকাতায় যাব আমার জিনিষপত্তর গুছিয়ে দে।

নিধিরাম বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে কোনো কথা না

বলিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বিপিন আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। সে কোথায় যাইবে, কি করিবে, কোথায় সে একটু সান্ত্বনা পাইবে? এই চিন্তার মধ্যে সে যতই ডুবিতে লাগিল দেখিল ইহার তল নাই, পার নাই। তাহার পিতা খুড়িমা ও মালতীকে শুদ্ধ তাড়াইতে চাহিয়াছেন, শুধু তাহারই জন্য। বিপিন ভাবিতেছিল সে চলিয়া গেলে তাঁহাদের বিপদ কাটিয়া যাইবে। অতএব তাহাকে যাইতেই হইবে।

নিধিরাম তাড়াতাড়ি গিয়া গিন্নিকে বলিল—মুনিবমা, ছোটবাবুর কি হয়েছে। মুখ একেবারে কালবৈশাখীর মতো আঁধার! আমায় বল্লে, নিধিদা আমি কলকাতায় যাব জিনিষপত্তর গুছিয়ে দে।

গিন্নি চিন্তিত হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে তুই কিছু জানিসনে?

—না। এখনি রামধন এসে মহারাজের কাছে ছোটবাবুকে ডেকে নিয়ে গিছল। সেখান থেকে ফিরে এসেই আমায় ঐ কথা বললে।

—ডাক দেখি একবার রামধনকে শুনি কি হয়েছে।

নিধিরাম রামধনকে ডাকিয়া আনিল। রামধন আসিয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। তখন গিন্নি বলিলেন—আমি আর পারি না বাপু। আমারই হাড় ভাজা-ভাজা করে তুললে! কোথায় বেটার বিয়ে দিয়ে বরণ করে বৌ ঘরে তুলব, না, বেটাই চললেন বিবাগী হয়ে। কি কুক্ষণে মালতী ভিটেয় পা দিয়েছিল যে কোনো দিকে ভালাই নেই! চ দেখি, বিপিন কোথায়।

গিন্নি লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—বাবা বিপিন।

বিপিন মাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার দুই চোখ দিয়া বড়বড় অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গিন্নি তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বসিলেন। বিপিন মার বুকে মুখ লুকাইয়া দারুণ অভিমানে ও দুঃখে শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল। গিন্নিরও অশ্রুধারা বিপিনের মাথায় শুভাশীর্ব্বাদ ও পরম সান্ত্বনার রূপে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক ক্রন্দনের পর গিন্নি বলিলেন—বাবা বিপিন, কি ছেলেমানুষী করছিস বাবা। নিজেও কষ্ট পাচ্ছিস, সকলকেই কষ্ট দিচ্ছিস। তুই ত কখনো এমন ছিলিনে।

বিপিন বলিল—আর তোমাদের কষ্ট দেবো না মা, আমি এইবার জন্মের মত যাচ্ছি।

—বালাই ষাট, বংশের দুলাল তুই, তুই কোথায় যাবি বাবা? সবার আগে তোকেই যে আমি কোলে পেয়ে মা হয়েছিলাম; সে কোল তুই ইচ্ছে করে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে যেতে পারবি?

—কি করব মা, তোমায় ছেড়ে আমি কখনো বেশিদিন কোথাও থাকিনি, তবু থাকতে হবে। নিয়তি আমায় টানছে। বুক ভেঙে যাবে, তবু আমায় থাকতে হবে।

—ছি বাবা অমন কথা বলতে নেই। আমায় ছেড়ে তুই কোথায় যাবি?

—যেতেই হবে মা, বাবার হুকুম। আর থেকেও ত কোনো লাভ নেই, আমি ত পদে পদে তোমাদের জ্বালাতন করছি। আমি যে-অবধি এবার বাড়ীতে এসেছি সে-

অবধি ত আমার জন্যে তোমাদের সুখ নেই। আমার মত যখন তোমাদের মতের সঙ্গে শুধু বিরোধ বাধাতেই আছে, তখন আমার দূর হওয়াই ভালো।

—বালাই বালাই ষাট ষাট! শত্রু দূর হোক! অকল্যাণ দূর হোক। তুই চিরজীবী হয়ে আমায় বিরক্ত কর—তাইতেই আমার আনন্দ, তাইতেই আমার সুখ।

বিপিন এই স্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতেছিল। কিন্তু তখনি তাহার মনে পড়িল এবাড়ীতে মালতী আছে। তখন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—না মা, এবাড়ীতে আমার আর থাকা হবে না, আমায় অন্যত্র যেতেই হবে।

গিন্নি পুত্রের দৃঢ়তায় স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—বিপিন, তোর মুখ চেয়েই আমি পুত্রশোক ভুলেছিলাম। আমি কাঁদলেই তুই কাঁদতিস বলে আমি প্রাণ খুলে কাঁদিনি। আমায় কাঁদিয়ে যদি তুই যেতে পারিস, যা। তুই যেখানেই থাক আমার আশীর্ব্বাদে তোর মঙ্গল হবে।...তোর যদি মন খারাপ হয়ে থাকে ত কিছুদিন না হয় অন্যত্রে গিয়ে থাক; কিন্তু এই পোষ মাসে বাড়ী থেকে কি বেরুতে আছে? লোকে কুকুর শেয়াল বাড়ীর বার করে না, ঝাঁটা কাড়ে না, আর তুই ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে যাবি?

—মা, যে নিজেই অলক্ষণ তার আবার লক্ষণ করে যাত্রার দরকার কি? আমি আর থাকতে পারব না মা।

—যা খুসি কর। তুই আমার পেটের ছেলে হলে কখনো আমায় এমন করে দুঃখ দিতে পারতিস নে।—বলিয়া গিন্নি পরিপূর্ণ বেদনায় চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন। বিপিন একাকী বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল বিপিন বিতাড়িত হইয়া কলিকাতা যাইতেছে। পুরস্ত্রীগণ অজ্ঞাত আশঙ্কায় অসমাপ্ত কর্ম্ম ফেলিয়া স্তম্ভিত হইয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছিল। গিন্নি যখন চোখ মুছিতে মুছিতে অসময়ে ঘরে গিয়া শয্যা আশ্রয় করিলেন, তখন খুড়িমা বিপিনের এবং রোহিণী মালতীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

খুড়িমা আসিয়া দেখিলেন বিপিন চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে। খুড়িমা বলিলেন—বাবা বিপিন, আমাদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে বাবা?

বিপিন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—এখানে আর থাকা পোষাল না খুড়িমা।

—সে কি বাবা? তোমার বাড়ী তোমার ঘর, তোমার পোষাল না, একি একটা কথা? তুমি গেলে আমরা কার ভরসায় থাকব? আমাদের মতন হত-ভাগিনীদের কথা একবার ভাবছ না বাবা?

—ভেবেছি খুড়িমা। আমি এসেই নানা গণ্ডগোল বাধিয়ে তুলেছি। আমি গেলেই সব আবার শান্ত হয়ে যাবে। যদি না হয় তবে তখন আমার কাছে যেয়ো। নিরাশ্রয় আমার আশ্রয় তোমাদের সুখে না রাখুক শান্তিতে রাখবে।

—কিন্তু বাবা, আমি শুধু নিজের

স্বার্থের জন্যে বলছিনে। দিদির যে তুমি-অন্ত প্রাণ! সৎমা এমন দেখিনি, দেখব না!

—খুড়িমা, আমার মার মন কি আমি জানি না। তবু যেতে হবে।

—থাকা কি এতই কঠিন বাবা?

—হ্যাঁ খুড়িমা। বাবা বলেছেন হয় ঝিনুকপোঁতায় বিয়ে করতে হবে, নয় এবাড়ী থেকে যেতে হবে।

—ঝিনুকপোঁতায় বিয়ে করাটা কি এতই শক্ত বাবা?

—হ্যাঁ খুড়িমা। যে কাজে মন প্রসন্ন হয়ে অগ্রসর না হয় সে কাজ করতে নেই। আমার বাপ মার জেদের জন্যে একটি শিশু বালিকার সর্ব্বনাশ করবার আমার কি অধিকার আছে?

—বড়ঠাকুরকে একটু বুঝিয়ে বল না, তোমার পছন্দ-মত পাত্রী সন্ধান করুন।

বিপিন হাসিয়া বলিল—সে হবার জো নেই খুড়িমা। আমার যেমন পছন্দ আছে, পাত্রীরও ত তেমনি একটা পছন্দ আছে? আমি তাকে পছন্দ করলেই যে সে পছন্দ করবে তার ত কোনো মানে নেই। কাজেই ওসব চেষ্টা আমি ছেড়েই দিয়েছি।

খুড়িমা বলিলেন—মেয়েমানুষের আবার পছন্দ অপছন্দ কি?

বিপিন হাসিয়া বলিল—এই জন্যেই ত বরাবর আমার সঙ্গে বিরোধ বেধে আসছে। তোমরা মেয়েমানুষকে মানুষ মনে কর না। কিন্তু তাদেরও ভালো মন্দ বিচার আছে, পছন্দ অপছন্দ আছে, প্রাণ আছে।

—কি জানি বাবা! তোমাদের মতন ত আমরা পণ্ডিত নই। যা ভালো বোঝ কর।—বলিয়া খুড়িমা বিষণ্ণ মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পাশের ঘরে বসিয়া মালতী সব শুনিতেছিল।

এমন সময় রোহিণী আসিয়া দাঁত বাহির করিয়া চাপা গলায় বলিল—দিদিমণি, শুনেছ? দাদাবাবু কলকাতা চলে যাচ্ছে!

মালতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রূঢ়ভাবে বলিল—হাঁ শুনেছি! তা যাচ্ছেন ত আমার কি?

রোহিণী গালে হাত দিয়া ন্যাকামির স্বরে বলিল—ওমা, এমন সুন্দর দাদাবাবু আমাদের, ঘড়বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

মালতী দৃঢ়স্বরে বলিল—না। তোমাদের দাদাবাবু, আমার কে? আমি তাঁকে বেশিদিন দেখেছি, না ভালো করে চিনি, যে, আমার কষ্ট হবে? একটা মানুষ ঝগড়া করে যাচ্ছে এই বলেই একটু যা খারাপ লাগছে।

রোহিণী একেবারে হতাশ হইয়া মুষড়িয়া পড়িল। সে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে দেখিবে মালতী ফোঁস-ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছে, কাটা কইমাছের মতো অ-শেষ বেদনায় ছটফট করিতেছে। কিন্তু তাহার কোনো লক্ষণ ত দেখিলই না, অধিকন্তু তাহার উল্টাভাব দেখিয়া রোহিণীর এতকালের সব পোষা ধারণাগুলা যেন ওলটপালট হইয়া গেল। সে নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে প্রস্থান করিল।

পাশের ঘরে যতই মোটমাটরি কথা হইতে লাগিল মালতীর মনের উপর ততই টান পড়িতে লাগিল। আজ সে পুনরায় নিজেকে নিরাশ্রয় মনে করিতে লাগিল। আজ যে আর কিছুতেই অশ্রু রোধ করিয়া রাখা যায় না। সে ক্রমশ আসন্নবর্ষণ মেঘের মতন গম্ভীর থমথমে হইয়া উঠিল। চড়া-বাঁধা সেতারের মতো তাহার সমস্ত হৃদয় বেদনায় ঝনঝন করিয়া উঠিতে লাগিল, কথা বলিতে গলা কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় যখন বিপিনের যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন আর সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। অবশেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সে যতই চক্ষু মুছিয়া আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করে অশ্রু ততই উচ্ছসিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যার সময় রোহিণী ঘরে প্রদীপ দিতে আসিল। মালতী তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া, অধর দংশন করিয়া বসিয়া রহিল। রোহিণী দেখিল মালতীর মুখখানি সন্ধ্যার পদ্মের মতো আলোহিত ম্লানিমায় ভরিয়া উঠিয়াছে; তাহার উপর প্রদীপের সোনালি আভা যেন অস্তসূর্য্যের করস্পর্শের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রোহিণীর নয়ন মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল, প্রদীপ রাখিতে সে ভুলিয়া গেল। খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া তাহার অত্যন্ত করুণা বোধ হইল, সে সান্ত্বনার স্বরে বলিল —দিদিমণি তুমি ভেবনি, দাদাবাবুর হয়ত যাওয়া হবে না, রাণীমা রাজাবাবুকে বলতে গেছেন।

মালতী আর নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিল না। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রোহিণীর সম্মুখে তাহার এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়াতে সে যতই লজ্জা বোধ করিতে লাগিল ততই তাহার কান্না রোধ করা দায় হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল —পোড়ারমুখী তুই বেরো আমার সামনে থেকে। আমাকে তুই এমন করে কেন জ্বালাস, কেন দগ্ধাস? আমি তোর কি করেছি? আমি শুনতে চাইনে চাইনে তোর দাদাবাবুর কথা! আমায় অপমান করিসনে! তোর পায়ে পড়ি তুই যা! তুই যা!

রোহিণী অবাক হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া প্রদীপ রাখিয়া প্রস্থান করিল, সে বুঝিতেই পারিল না মালতীর এরূপ ব্যবহারের অর্থ কি? মালতীর এই কাণ্ড দেখিয়া তাহার হাসা উচিত, না, রাগ করা উচিত, না, কাঁদাই উচিত! এমন রহস্যময়ী জটিলচরিত্র নারী যে সে বাপের জন্মেও দেখে নাই ইহা সে অকপটেই স্বীকার করিল এবং ইহা তাহার সরলতা ও সত্যবাদিতার একমাত্র নিদর্শন বলিয়া বাড়ীর সকলেই তাহার কথায় বেশ জোরের সহিত সায় দিল।

মালতী যখন শুনিল যে বিপিনের যাওয়া সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে এবং সকলেই তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিতেছে তখন তাহার অন্তরে একটি অস্বীকৃত আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং আনন্দ উল্লাসের অনুভব যখন ক্রমশ অস্বীকার

করা অসম্ভব হইল তখন সে গলায় কাপড় দিয়া হাত জোড় করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে প্রার্থনা করিতে লাগিল—হে ঠাকুর, তাঁর যেন থাকা না হয়, তাঁর যেন থাকা না হয়। তাঁর মনে বল দাও, তিনি যেন সকল বাধা অতিক্রম করতে পারেন। আমার কাছে থেকে তাঁকে দূরে নিয়ে যাও হে ঠাকুর!

এমন সময় হরিবিহারীর খড়মের পশ্চাতে গিন্নির বাঁকমলের শব্দ শোনা গেল।

গিন্নি পুত্রের নিকট পরাস্ত হইয়া স্বামীর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে বলিলেন—আমার বিপিনকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ, আমি এই শূন্য পুরীতে কি করে থাকব? আমাকে সুদ্ধ পাঠিয়ে দাও।

হরিবিহারী বলিলেন আরে ক্ষেপছ কেন? বিপিন যাবে কোথায়? কোথাও যাবে না, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকগে।

গিন্নি বলিলেন—তার মোট-মাটরি বাঁধা হয়ে গেল, তুমি বলছ সে যাবে না! তুমি নিষ্ঠুর পাষাণ নিশ্চিন্ত থাকতে পার, কিন্তু মায়ের প্রাণ নিশ্চিন্ত হবে কি করে?

হরিবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—চল, আমি এক কথায় বিপিনের যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছি। সে আর যাবার নামটি করবে না।

গিন্নি আশ্বস্ত হইয়া স্বামীর সহিত পুত্রের কক্ষদ্বারে আসিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে আশায় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। পুত্র পিতার কথায় প্রতিনিবৃত্ত হইলে মাতা পুত্রকে কি কি স্নেহের অনুযোগ করিবেন গিন্নি তাহাই উৎফুল্ল মনে চিন্তা করিতেছিলেন।

হরিবিহারী বলিলেন—বিপিন, আমার ওপর রাগ করে ত চলে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমার জিনিষগুলির প্রতি ত যথেষ্ট অনুরাগ দেখছি। ঘর সর্ব্বস্বই ত বেঁধে জড়ো করেছ। আমার কোনো জিনিষ তুমি নিয়ে যেতে পারবে না, বলে দিচ্ছি।

বিপিন অবাক হইয়া পিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—বেশ তাই হবে, আমি এক কাপড়েই যাব।

হরিবিহারী মনে করিয়াছিলেন তাঁর এই জমিদারী চালটি একেবারে অকাট্য, বিপিনকে জিনিষ লইয়া যাইতে বারণ করিলে বিপিন আর একপাও নড়িতে পারিবে না। কিন্তু বিপিনের দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহার সে ভুল একেবারে ভাঙিয়া গেল। এর পর আর পুত্রকে ঘরে থাকিতে অনুনয় করাও চলে না। সুতরাং পুত্রের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া এবং গৃহিণীর নিকট তিরস্কৃত হইবার ভয়ে হরিবিহারী সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে পলায়ন করিলেন।

গিন্নি তাড়াতাড়ি গিয়া বিপিনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিপিনও কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অশ্রুবর্ষণের পর গিন্নি বলিলেন—কর্ত্তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে, কি বলেন কি করেন তার ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি এলেন, আমি মনে করলাম সান্ত্বনা করতেই আসছেন। পোড়া কপাল ওঁর বুদ্ধির!......মাথা খাস বাবা

রাগ করিসনে। ও তোর বাপই ত, রাগের মাথায় যদি কিছু বলে থাকে ত কিছু মনে করিস নে। ওর হয়ে আমি তোর কাছে ঘাট মানছি।

বিপিন চোখ মুছিয়া বলিল—ওকি মা, ওতে আমার অকল্যাণ হবে। বাবা বলেছেন বলে আমি রাগ করছি নে; কিন্তু মা এবাড়ীর কোনো জিনিষই আমি আর ব্যবহার করতে পারব না। স্নেহের দানে অযোগ্যকেও অধিকারী করে তোলে; শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে অযোগ্য অক্ষম, কিন্তু মায়ের অজস্র দান স্নেহে সহজ বলে তার নিতে লজ্জা নেই; কিন্তু কেউ যদি দেওয়ার অহঙ্কারেই দান করে তবে সে দান মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে তোলে—দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই।

—তা তুই পৈতৃক বিষয় ছেড়ে দিবি?

—হলই বা মা পৈতৃক? আর হলই বা তা বিষয়? যেখানে স্নেহের সম্পর্ক দেনাপাওনার জমাখরচ কাটে সেখানে বিষয় বিষ হয়ে ওঠে। এ সম্পত্তিতে আমার আর অধিকার নেই। আমার অংশ আমি বিনিকে লেখাপড়া করে ছেড়ে দেবো।

—ছি বাবা, এসব কি পাগলামি করছিস। যা তুই কিছুদিন পশ্চিমে বেড়িয়ে আয়। পোষ মাস বলে আমি আর আপত্তি করব না। তবে কি তুই কালই যাবি? কি নিতে থুতে হবে বল জোগাড় করে দি।

—কালই যাব মা, কিন্তু জোগাড় কিছুই করতে হবে না। এক কাপড়েই যাব আমি। এবাড়ীর কোনো জিনিষ আমার অস্পৃশ্য।

—আবার পাগলামি করে। আচ্ছা তুই বাপের জিনিষ না নিস, আমার জিনিষ ত নিতে পারিস। এসমস্ত জিনিষ আমি তোকে আমার স্ত্রীধন থেকে দিয়েছি মনে কর। আর তোরও ত নিজের যৌতুক-পাওয়া জমিদারি আছে।

—সে মা, আমি কিশোরের পাঠ-শালার জন্যে দান করে দিয়েছি।

—কি সর্ব্বনাশ! তিন তিনখানা তালুক পাঠশালায় দান! যা খুসি তোর করগে যা। তোকে অলক্ষ্মীতে পেয়েছে, আমরা কি করব আপনার সর্ব্বনাশ যদি তুই আপনি ডেকে আনিস।

পুত্রের এতবড় অর্বাচীনতায় গিন্নি বিস্মিত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া হনহন করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল—কালই যাওয়া ঠিক হল ভাই?

বিপিন বলিল—হাঁ নিধিদা।

নিধিরাম আবার পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিতে ব্যস্ত হইল। বিপিন বলিল—ওসব আর তোর বাঁধাবাঁধি করতে হবে না নিধিদা; আমার কিছুরই দরকার নেই।

নিধিরাম বোচকা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—তোমার না দরকার হতে পারে, কিন্তু আমার ত হবে।

বিপিন বলিল—না না, তোর যেতে হবে না। আমি একলাই যাব।

—আমার যেতে হবে কি হবে না, সেটা তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি। তোমাকে

এতবড়টা কর্‌লে কে? তোমার নিধিদা যেদিন মরবে সেদিনই তোমার কাছ ছাড়বে; তার আগে নয়।

বিপিন এই স্নেহশীল ভৃত্যের স্নেহের দাবী অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় বিনি ঘরে আসিয়া বিপিনের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বলদা, মা বলথিল তুমি কলকাতায় পালিয়ে দাথ। মা কাঁদতে, আমি দেতে দেবো না।

এই বলিয়া বিনি বিপিনের গলা জড়াইয়া ধরিল। বিপিনও তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশু বাহিরে দেখিয়া আসিয়াছে মা কাঁদিতেছে, এখানে আসিয়া দেখিল দাদা কাঁদিতেছে, সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অপরিস্ফুট বেদনায় ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিপিন চোখ মুছিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। বালিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার বুকের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

পাশের ঘরে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া বসিয়া মালতী যখন শুনিল যে বিপিনের যাওয়া স্থগিত হইল না, তখন দুঃখ ও আনন্দের ঘাত প্রতিঘাতে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া শতখান হইবার উপক্রম হইল। সে সমস্ত রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ লাল করিয়া তুলিল। এখন তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহার জন্যই বিপিন দেশত্যাগী হইতেছে।

সমস্ত রাত্রি দুর্ভাবনায় জাগিয়া থাকিয়া অতি প্রত্যূষে মালতী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনো দেবকন্যা উষা আসিয়া আকাশের আঙিনা হইতে সমস্ত রাতের ঝরা বাসি তারার ফুল ঝাঁট দিয়া সোনার ছড়া দেয় নাই। অন্দরের পুকুর-পাড়ের ষষ্ঠীপূজার অশ্বত্থ-গাছে সবে মাত্র বুলবুল দোয়েল শ্যামা জাগিয়া উঠিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া প্রকৃতিকে জাগাইতেছিল; প্রকৃতি তখনো কোয়াসার চাদরে মুখ ঢাকা দিয়া নীরবে ঘুমাইতেছে; দীঘির শাদা জলের স্ফটিক মেঝের উপর লঘু চরণ ফেলিয়া বাতাস তখনো নাচিতে আরম্ভ করে নাই। সুবৃহৎ পুষ্করিণী যেন বনদেবীর দর্পণের মতো পড়িয়া রহিয়াছে,—ঘন সবুজ রঙের একখানি প্রকাণ্ড ফ্রেমে আঁটা। বেগুনী রঙের আকাশ তখনো নিদ্রায় অচেতন, তাহার হৃৎস্পন্দন নাড়ীর গতি গ্রহতারকায় দপদপ করিতেছিল। পশ্চিম দিগন্তে কমলা রঙের পাল মেলিয়া চন্দ্র তখনো অস্ত সাগরে পাড়ি দিতেছিল। কিন্তু তখনই বৃদ্ধ দুবেজী পুকুরপাড়ের বাগানে পুষ্পচয়ন করিতে করিতে মধুর উদাত্ত স্বরে ভজন গাহিতেছিল।—

আয় ইয়ার তুয়ে ন যায় ভুল!
পাত পাতমে তু-ই রঙিলে,
তু-ই রঙিলে ফুল!

মালতী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া শুনিতে লাগিল, বিপিনও জাগ্রত হইয়া পাশের ঘরে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে। মালতী একপা একপা করিয়া বিপিনের ঘরের দিকে যায় আর থামে। অনেক ইতস্তত করিয়া মালতী বিপিনের ঘরের দরজার সামনে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিপিন তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

মালতী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল—আপনার যাওয়া কি একেবারে ঠিক?

বিপিন গম্ভীর ভাবে বলিল—হাঁ।

—কবে ফিরবেন?

—এ বাড়ীতে আর আমার ফেরবার জো নেই। এই আমার অগস্ত্য-যাত্রা।

মালতী মাথা নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমি আপনার সঙ্গে যাব।

বিপিন বিস্মিত হইয়া বলিল—তুমি কোথায় যাবে মালতী?

—যেখানে নিয়ে যাবেন।

বিপিন মালতীর দিকে চাহিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—তবে কাল আমায় অমন করে দুঃখ দিলে কেন মালতী?

মালতী মৃদুস্বরে বলিল—পাছে আপনাকে আমার জন্যে মা বাপকে ত্যাগ করতে হয়।

বিপিন বলিল—আজকে আমি সব ছেড়ে তবে তোমায় পেলাম। তোমার মূল্য এতদিন আমি বুঝিনি।

মালতী নত হইয়া বিপিনকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল। বিপিন তাহাকে বাহু বেষ্টনে তুলিয়া ধরিয়া ফুলের মতো তাহার মুখখানিতে চুম্বনের পর চুম্বন করিল। তখন লজ্জা আসিয়া মালতীর চোখ দুটি চাপিয়া ধরিল, যেন লজ্জাবতী লতা স্পর্শ পাইয়া ঢলিয়া পড়িল, যেন মুক্তাগর্ভ শুক্তি মুদ্রিত হইল, যেন অস্তরবির শেষ কিরণটি বুকে করিয়া কমলদল বন্ধ হইল! উষার অরুণরাগ তখন সমস্ত ঘরখানিকে নববিবাহের রক্তিম-চ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল; মালতীর হাসির মতো সেই লালিমা বিপিনের অন্তর বাহিরের মতো সেই ঘরখানিকে বিবাহের রঙে রাঙাইয়া তুলিয়া বিপিনের অনির্ব্বচনীয় ভাবনায় বাসনায় সোনা মাখাইয়া দিতেছিল।

প্রণয়-বেদনার তাড়নায় উপযাচিকা হইয়া আপনাকে দান করার লজ্জায় মালতীর চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। দুর্লভ প্রার্থিতকে পাইয়া বিপিনের আনন্দ তাহাকে বিমূঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। হঠাৎ তাহাদের সুখের আবেশ ভাঙিয়া গেল—তাহারা দেখিল, গিন্নি ও খুড়িমা আসিয়া দরজার সামনে স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বিপিন মালতীর হাত ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে প্রণাম করিল।

গিন্নি চীৎকার করিয়া বলিলেন—ছোট বৌ, এমনি করেই কি শোধ তুলতে হয়?

খুড়িমা সে কথায় কান না দিয়া বিপিনকে কঠোর স্বরে বলিলেন—বিপিন, তোমার ওপরে আমার বড় বিশ্বাস ছিল। তোমরা বাপে বেটায় মিলে আমার ধন মান দু-ই নষ্ট করলে!

বিপিন বলিল—খুড়িমা, তুমি আমায় ভুল বুঝো না, মালতী আমার স্ত্রী, মালতীকে আমি বিয়ে করব।

খুড়িমা গিন্নির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—দিদি, বড়ঠাকুরকে বলে আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি আর এ বাড়ীতে থাকব না।

গিন্নি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—মনস্কামনা সিদ্ধ হল, আর থাকবে কেন?

দেখিতে দেখিতে বাড়ীর সকল লোক আসিয়া সেখানে ভিড় জমাইয়া তুলিল।

হরিবিহারী দ্রুতপদে আসিয়া বলিলেন—পাল্কী এসেছে তোমরা সব এখনি দূর হও। তোমরা মনে করেছ এমনি ষড়যন্ত্র করে হরিবিহারী রায়কে জব্দ করবে? হরিবিহারী রায় জব্দ হবার পাত্র নয়। তোমরা শিগগির দূর হও।

সেই সময়ে প্রভু-পরিবারে বিপ্লবের সংবাদ না জানিয়া বৃদ্ধ দুবেজি তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেছিল—

প্রমুদিত পুরনরনারী সব সজহিঁ সুমঙ্গলচার।
এক প্রবিসহিঁ এক নির্গমহিঁ ভীর ভূপদরবার॥

হরিবিহারী দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

—মা, এ বাড়ীতে থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছে। তবে আমরা যাই।—বলিয়া বিপিন মালতীকে লইয়া গিন্নিকে আবার প্রণাম করিল। পরে খুড়িমাও প্রণাম করিয়া সরোদনে বলিলেন—দিদি, আমি জন্মের মতো তোমার চরণ ছেড়ে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে; জেনে হোক না জেনে হোক, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তোমার কাছে যে অপরাধ করেছি তা মার্জ্জনা করে আমায় বিদায় দাও।

গিন্নি সে কথার কোনো জবাব না দিয়া জনান্তিকে ধনুষ্টঙ্কারের মতো বাজিয়া বলিলেন—আমার যে সর্ব্বনাশ করে যাচ্ছে তারও যেন ভাল না হয়, ইহপরকাল নষ্ট হয়। ভগবান আছেন!

খুড়িমা বলিলেন—হাঁ দিদি ভগবান আছেন। আমি যদি কখনো তোমার অনিষ্ট-কামনা করে থাকি তবে আমার ইহকাল ত নেই-ই, পরকালেও যেন অশেষ দুর্গতি হয়,—এ কথা আমি তীর্থে যাত্রা করে তীর্থের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলছি, বাবা বিশ্বেশ্বর যেন আমায় চরণে স্থান না দেন।

গিন্নি আর কোনো কথাই বলিলেন না। পুত্রের আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মাতার চক্ষু অশ্রুসিক্তও হইল না, একটি নিষেধ বাণীও উচ্চারিত হইল না—পুত্রের বারবার বিদ্রোহাচরণে মাতার মনও এমনি প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছিল। বিধবার বিয়ে! এত-বড় অনাচার কেহ কখনো দেখে নাই শুনে নাই। আজ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখিয়া বাড়ী-সুদ্ধ সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় বিনি আসিয়া মালতীর হাত ধরিয়া তাহার কচি মুখ-খানি তুলিয়া আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—মাতীদি, তোল বিয়ে? বল্‌দার ছঙ্গে তুই ছছুল-বাড়ী দাচ্ছিস? আমিও তোল ছঙ্গে ছছুলবাড়ী দাবো!—বলিয়া ঘাড় কাত করিয়া সে মালতীর সম্মতির অপেক্ষা করিতে লাগিল। মালতী তাহাকে কোলে তুলিয়া অশ্রুসিক্ত চুম্বন করিল।

বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া—মালতীদি, তুমি আমার বৌদি! আমি বৌদির মিতবর!—বলিয়া বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মালতী ও বিপিনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

হায়! শিশুরা জানে না যে এই বিবাহ আনন্দের দ্বারা অভিনন্দিত নহে, ইহা দুঃখের দ্বারা অভিশপ্ত। এ বিবাহে মঙ্গলশঙ্খ বাজিল না, পুরাঙ্গনারা হুলুধ্বনি করিয়া বরবধূকে সম্বর্দ্ধনা করিল না, কেহ আশীর্ব্বাদ করিয়া

বরবধূকে বরণ করিল না। কিন্তু তবু ইহা বিবাহ!

পাল্কীর কাছে আসিয়া মালতী বিনিকে নামাইয়া পাল্কীতে উঠিল। বিনিও ছুটিয়া পাল্কীতে চড়িতে যাইতেছিল, রোহিণী ধরিয়া কোলে তুলিল। বিনোদকে হাবার মা গ্রেপ্তার করিল। বিনি বিনোদ দাসীদের কোলে বন্দী হইয়া মুক্ত হইবার জন্য ছটফট করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল—আমি যাব! আমি যাব! দাদার বিয়ে দেখতে আমি যাব!

পাল্কীতে মালতী ও খুড়িমা চড়িয়াছেন। হাতীতে বিপিন চড়িবে; এমন সময় নবকিশোর আসিয়া হাসিয়া বলিল—বিপিন ঠিক সময়ে এসে জুটে গেছি।

তাহারা যাত্রা করিল। এই দুপ্রহর সময়ে পৌষ মাসে অভুক্ত অবস্থায় তাহারা বাড়ী হইতে বিদায় লইল, কিন্তু ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া, বা গৃহস্থের অকল্যাণের ভয়ে কেহই ইহাদিগকে আহার করিয়া যাইতেও অনুরোধ করিল না। তাহারা শূন্য উদর ও ভরা দুঃখ লইয়া যাত্রা করিল। তাহারা সকলেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ। তখন সমস্ত প্রকৃতি মধ্যাহ্ন-বিশ্রামে স্তব্ধ। শুধু বিনোদ আর বিনির তীক্ষ্ণ চীৎকারধ্বনি বিবাহ-উৎসবের সানাইয়ের শব্দের মতো দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। ক্রমে তাহাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া স্বজন-সম্পর্কের ক্ষীণ স্মৃতিটির মতো মিলাইয়া গেল। তখন বিপিন ও মালতী ভাবিতেছিল—এই আমাদের বিবাহ! কী ভীষণ সকরুণ এই উৎসব!

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলো

এ আলো কোথায় পেলে স্বজনি?
নয়নে বয়ানে ফুটে, শিরায় শিরায় ছুটে,
অলকে ঝলকে দিন রজনী!
এ আলো কিসের আলো স্বজনি?

দেখেছি রবির আলো আকাশে,
কোথা তাহে ঢল ঢল এ লাবণ্য সুকোমল
সে যে তীব্র উগ্র জ্যোতি বিকাশে।

শশীর তারার আলো আঁধারে সে লাগে ভালো
চোখে দেয় ঘুমঘোর লাগিয়ে
সকল ফুটায়ে তোলা এ যে নব বিশ্ব খোলা
সকল পরাণ দেয় জাগিয়ে।

মেঘে দামিনীর আলো সে ত নহে স্থির আলো
ক্ষণে আছে ক্ষণে নাই অমনি
এ আলো কোথায় পেলে রমণী?

শুনেছি মাণিক জ্বলে পাতালে।
সে আলো দেখিনি কভু, মনে মোর হয় তবু,
এই যে আলোর প্রাণ মাতালে,

মনের পাতাল তলে যে প্রেমমাণিক জ্বলে
তারি আলো ছুটে দিন রজনী।
এই সে প্রেমের আলো স্বজনি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

চয়ন

রাজ-ভাস্কর ষ্টিফ্যান্ সিণ্ডিং

ষ্টিফ্যান্ সিণ্ডিং যুবক নন,—তাঁহার বয়স এখন উনসত্তর বৎসর। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা এখন পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং, তাঁহাকে লইয়া দু-চারিটা কথা বলিবারও সময় আসিয়াছে। World's Work-এ তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; আমরা তার সার-সংকলন করিয়া দিলাম।

নরওয়ের ডোনথিম্ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অদৃষ্টে কলাবিদের পক্ষে সুদুর্লভ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের অবকাশ ঘটিয়াছিল। কলাবিদেরা প্রায়ই আপনাদের প্রতিভাকে শিশুকাল হইতেই কাজে লাগাইয়া দেন,—পুঁথিগত বিদ্যার দিকে তাঁহাদের মন বড় একটা যাইতে চাহে না। কিন্তু সিণ্ডিং আগে জীবনের জ্ঞান এবং চরিত্র অনুশীলনের দিকে মনোযোগ দিয়া পরে ললিতকলার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

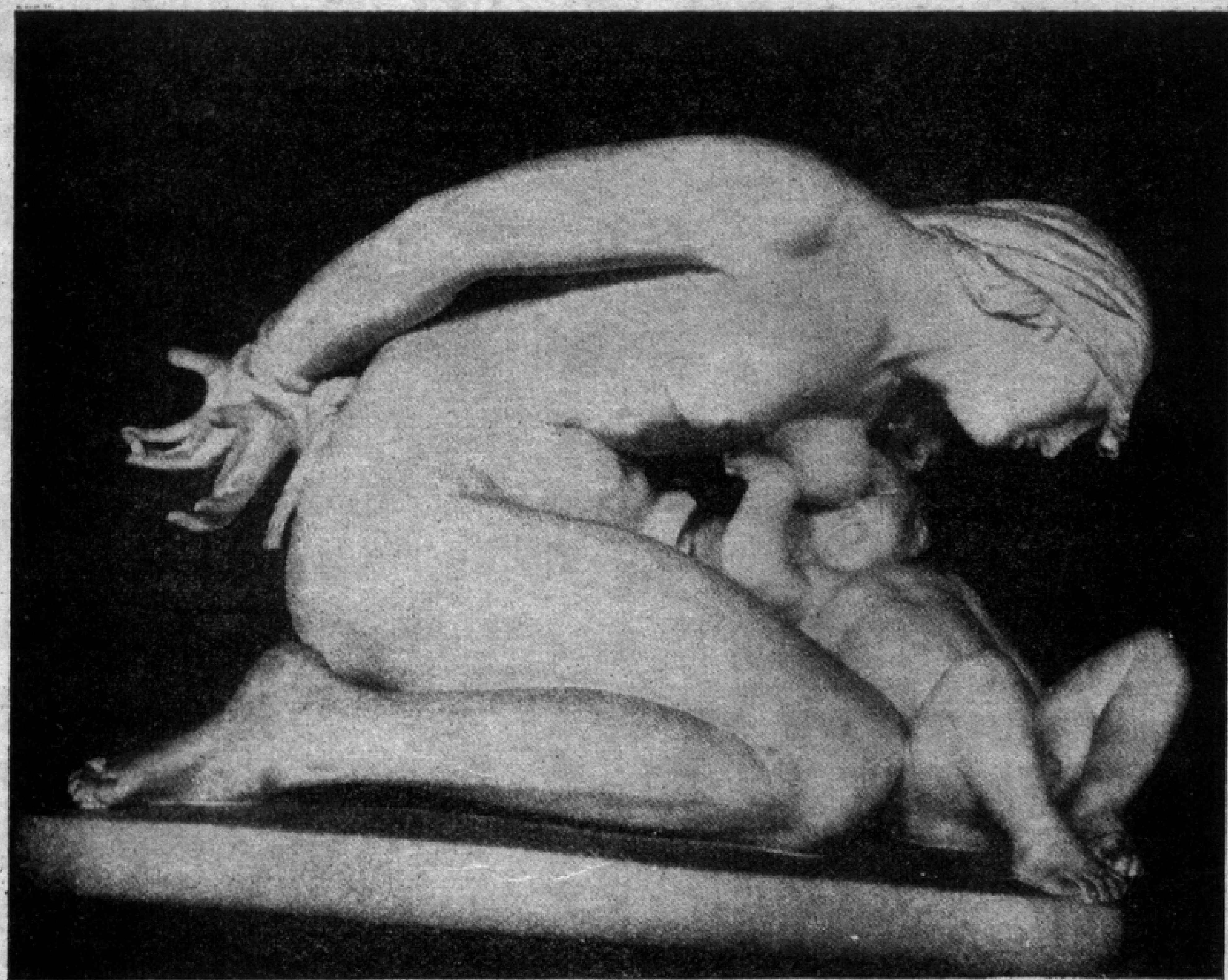
ছাব্বিশ বৎসর বয়সে অধিকাংশ শিল্পীরই জীবনের গতি স্থিরনির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়, ললিত কলাতেও তাঁহাদের হাত তখন নিপুণ হইয়া ওঠে, শিল্পক্ষেত্রে তাঁহাদের মক্স করিবার সময় আর থাকে না। কিন্তু সিণ্ডিং, এই পরিণত বয়সেই, পাঠশালার পড়া সাঙ্গ করিয়া, ললিতকলাকে আপন জীবনের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করেন।

কিছুকাল তিনি নিজের ঘরে বসিয়াই শিল্পশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর, তিনি বার্লিনে গিয়া একজন ওস্তাদের ছাত্র হইলেন। এখানে তাঁহার প্রতিভা এত শীঘ্র বিকসিত হইয়া উঠিল যে, ছয়মাস কাল শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়াই তিনি পাকা হইয়া উঠিলেন এবং নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হইল। তখন তিনি আপনার জন্মভূমিতে আবার ফিরিয়া আসিলেন।

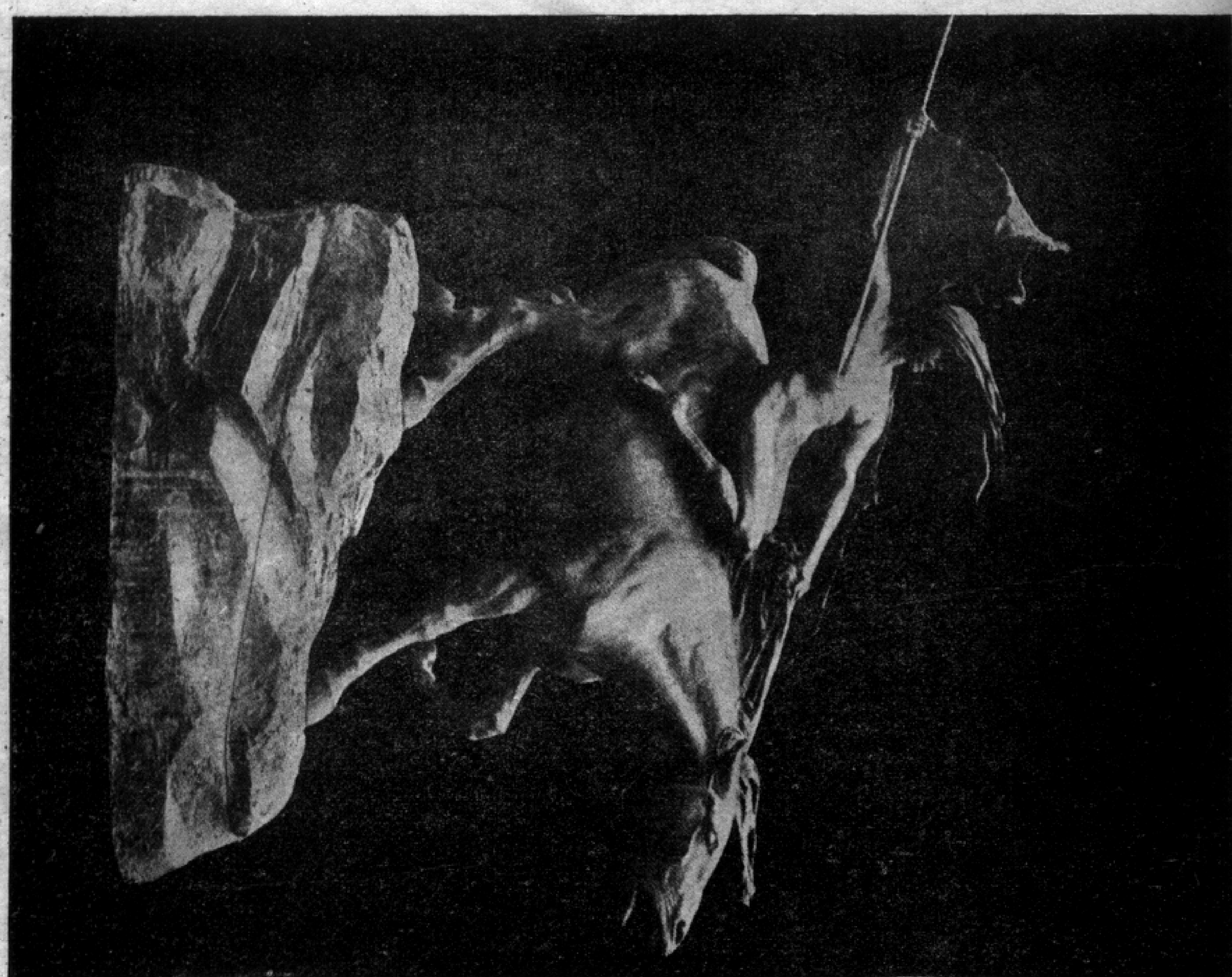
তাহার পর, তিনি দশবৎসর কাল ফ্রান্স ও ইতালী দেশের প্রাচীন শিল্প দেখিবার জন্য বিখ্যাত স্থানগুলিতে ভ্রমণ করিয়া আপনার কলাভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কোপেনহেগেন নগরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার বিকসিত প্রতিভার খ্যাতি শীঘ্রই দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। এখানে তিনি ডাঃ কার্ল জ্যাকবসন নামে একজন কলারসজ্ঞ ধনবানের সহিত পরিচিত হইলেন। সিণ্ডিং যে-সকল মূর্ত্তি তৈয়ারি করিতেন, এই ধনী বন্ধু সেগুলি যথোপযুক্ত মূল্য দিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সিণ্ডিংও ডেনমার্কেই স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গেলেন।

সিণ্ডিংএর আর্টের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা অতীত যুগের অনুসারী হইয়াও বিদ্যমান যুগের এবং কলাবিদের নিজস্ব বিশেষত্বের পরিচয় দিতে পারে। গ্রীক ভাস্কর্য্যের অনুকরণ বা তাহার



বন্দিনী মা



রণ-রঙ্গিণী

ভিতরে জীবনসঞ্চার করা এ যুগে অসম্ভব। কারণ, তাহার মূলে যে প্রাণটি ছিল, এখন তাহা নাই। সিণ্ডিংও সে ধার দিয়া যান নাই।

গ্রীক ভাস্করেরা মনে করিতেন যে, মানবের সগোত্রজ হইলেও প্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, চির-নন্দিতা, চিরস্থিরা; প্রকৃতিতে দুঃখ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। গ্রীক ভাস্কর জীবন্তবৎ আকারের মধ্যে এই দুঃখজরামৃত্যুহীনা সুন্দরী প্রকৃতিকে ফুটাইতে চাহিতেন। সেইজন্য, যাহা-কিছু কুশ্রী, অস্থির, বিকৃতাঙ্গ বা মৃতবৎ, তাহা গ্রীক আদর্শের পরিপন্থক ছিল।

কিন্তু এ যুগের ললিতকলা মানবতার ভিতরে, অপূর্ব্বতার ভিতরে, রহস্যের ভিতরে, দুঃখ, মৃত্যু ও কুৎসিতের ভিতরেও আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে। সিণ্ডিং এই শ্রেণীর ললিতকলাকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

সিণ্ডিংয়ের বিখ্যাত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে "অসভ্য মাতা" ও "বিপত্নীক"ই সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের বিখ্যাত প্রদর্শনীতে তাঁহার "অসভ্য মাতা" এবং "মানব-মানবী" নামক কারুকার্য্যদুটির নমুনা সর্ব্বসাধারণের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্যারী-প্রদর্শনীতে তাঁহার "বন্দিনী মাতা" প্রদর্শিত হইয়া Grand Prix পুরস্কার লাভ করে। তাঁহার "বন্দিনী মাতা" রোমক যুগের একটি সাধারণ 'ট্রাজেডী'কে মূর্ত্তিমান করিয়াছে। যুদ্ধে পরাজিত পুরুষেরা নিহত হইলে, তখন রমণী ও শিশুদের ধরিয়া দাসরূপে বিক্রী করা হইত। সিণ্ডিংয়ের চিত্রবস্তু এই:—বিক্রীতা ও বন্দিনী মাতার সুমুখে তাঁহার শিশুপুত্র শায়িত। ছেলে মায়ের স্তন চায়। কিন্তু মার হাত বাঁধা। ছেলের কান্নায় তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু ছেলেকে তিনি আপনার বুকের ভিতরে টানিয়া লইতে পারিতেছেন না। তাই তিনি অতি কষ্টে সামনে হেঁট হইয়া, কোনরকমে ছেলের মুখের কাছে আপনার বুকটি আগাইয়া দিতেছেন। জননীর মুখে একটি অসহায় কাতরতার ভাব, কলাবিদ অতি নিপুণতার সহিত পরিস্ফুট করিয়াছেন।

ইহার পর সিণ্ডিং "রণ রঙ্গিণী" "জননী বসুমতী" ও "প্রপিতামহী" নামে তিনটি অতি চমৎকার মূর্ত্তি গঠন করেন। এই সময়েই তিনি স্কান্দিনেভিয়ার "রাজ-ভাস্করে"র গৌরব লাভ করিলেন।

রণ-রঙ্গিণী নামক অদ্ভুত স্ত্রী-মূর্ত্তিতে, অচল পাষাণের মাঝে গতি কিরূপ ফুটিয়াছে, তাহা শিল্পরসজ্ঞগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। ঘোড়াটি পাহাড়ের উপর হইতে সগর্ব্বে ছুটিয়া নামিয়া আসিতেছে—মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ—এমন কি,—তাহার দেহের প্রতি রেখাটি পর্য্যন্ত যেন নড়িতেছে! হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে, এ যেন শরীরী বিদ্যুৎ!—তেমনি চপল, তেমনি গতিময়! পাথরের ভিতরে গতির এমন বিচিত্র লীলা সচরাচর চোখে পড়ে না।

সিণ্ডিংয়ের "প্রপিতামহী"র মূর্ত্তিটি চমৎকার।

জীবনের সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ প্রায়,—সম্মুখে অনন্ত রজনী ধীরে ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর কর্ম্মভার এখন

পৃথিবীতেই নামাইয়া রাখিবার সময় আসিয়াছে। এই শ্রান্ত অথচ শান্ত বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিলে মনে হয়, অতীতের দিকে পিছন ফিরিয়া তিনি যেন আপনার মনকে চারিদিক হইতে টানিয়া আনিয়া সেই পরমপুরুষের চরণে একাগ্র করিয়া বলিতেছেন, "বেলা গেল প্রভু! আমাকে তোমার কাছে ডাকিয়া নাও, ডাকিয়া নাও!"

বই-পড়ার কথা

মার্কিন যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ থিয়োডোর রুজভেল্টের নাম, বোধ করি পাঠকদের কাছে অপরিচিত নহে। তাঁহার মত অনেক-বই-পড়া লোক শুধু যুক্তরাজ্যে নয়,—পৃথিবীতেও খুব বেশী দেখা যায় না। সংপ্রতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কখন্, কেমন করিয়া, তিনি কি-কি বই পড়েন? মিঃ রুজভেল্ট উত্তরে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা আমেরিকার The Ladies Home Journalএর এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

"যাঁহারা লঘু-সাহিত্যের ভক্ত, যাঁহারা কোন গভীর বিষয় পড়িতে ভালবাসেন না, যাঁহারা খালি বাজে ও খেলো লেখা নিয়া মাতিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ ভাল বই পড়িবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। যুবজনের পক্ষে দুর্ব্বলতাজন্য শারীরিক অক্ষমতা যেমন অন্যায়, মনের পক্ষেও তেমনি মানসিক পরিশ্রমে অপারগতা থাকা উচিত নহে।

কোন পুরুষ বা স্ত্রী, যুবক বা যুবতী যদি ভাল পুস্তক উপভোগ করিবার জন্য আপনার মনকে প্রস্তুত রাখিতে চান, তবে প্রথমে গিবন বা মেকলে বা এমনি-কোন শক্তিশালী লেখকের লেখা পড়িতে সুরু করুন; যতদিন না তাঁহাদের রসবোধ হয়, ততদিন তাঁহারা উঁহাদের রচনাপাঠে যেন বিরত না হন। এই পরীক্ষা পার হইতে পারিলেই, তাঁহারা আপনাদের উপযোগী সারালো পুস্তক, আপনারাই বাছিয়া লইতে পারিবেন।

খাওয়ার মত পড়াতেও রুচি একটা মস্ত ব্যাপার। আমি 'অমুক' জিনিষটা খাইতে ভালবাসি, 'অমুক' জিনিষটা ভালবাসি না। এই ভাল বাসা না বাসার উপরে কারুর জোর খাটে না। পড়াতেও এইরূপ। Guy Mannering, The Antiquary, Pendennis, Vanity Fair, Our Mutual Friend ও Pickwick Papers আমি বারংবার পড়িয়াছি। কিন্তু Fortunes of Nigel, Esmond ও Old Curiosity Shop এর অধিকাংশ স্থান পড়িতে গিয়া আমাকে গলদঘর্ম্ম হইতে হইয়াছে। প্রথম ছয়খানি বইএর মত শেষের বই তিনখানিও যে খুব ভাল বই, তাতে আমার সন্দেহ নাই। কোন কোন লোক হয়ত' শেষের তিনখানিকেই বেশী ভাল বলিবেন; কিন্তু আমি যেমন 'অমুক' খাবার খাইতে ভালবাসি না, তেমনি ঐ বইগুলিকেও পছন্দ করি না।

কিন্তু আসলে যেগুলি সত্যসত্যই রদ্দী মাল, সে-গুলিকেও ভাল বলিলে ঠিক বলা হইবে না। Bel Ami নামক খেলো বইএর উপরে যদি কাহারো ভক্তি থাকে, তবে তাঁহার সাবধান হওয়া উচিত। যদি কেহ Anna Karenina, War and Peace, Sebastopol ও The Cossacks কে অপছন্দ করিয়া Krentzer Sonata পছন্দ করেন, তবে অনেক খাঁটি জিনিষ তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইবে। এমন-কি তাঁহার পক্ষে টলষ্টয়কে একেবারে ত্যাগ করাই উচিত। টলষ্টয় একজন চিত্তগ্রাহী ও হৃদয়োত্তেজক লেখক হইতে পারেন; কিন্তু নীতি-উপদেশকরূপে তাঁহাকে দেখাটা আদৌ নিরাপদ নহে।

কেবল আনন্দের জন্য যা-তা বাজে বই-পড়ার উৎসাহ কমাইতে হইবে। দুনিয়ায় বই আছে অগুন্তি,—তার-মাঝ-থেকে কতকগুলি বইমাত্র পড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাওয়া যায়। পড়ুয়ারা নিজেদের রুচিমত বই বাছিয়া লইয়া পড়িবেন। "অমুক এক-শো-খানা বই ভাল" বলিয়া অপর কোন লোক যদি পুস্তক-নির্ব্বাচন করিয়া দেন, তবে সে নির্ব্বাচন নিষ্ফল হইবে-ই-হইবে। এরূপ নির্ব্বাচন কোন বিশেষ অবস্থার ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ফল-দায়ক হওয়া সম্ভব; কিন্তু ইহাতে সার্ব্বজনীনতা নাই।"

প্রেম-ধর্ম্মে হিংসাবাদ

আমেরিকার Everybody's Magazine-এ "When Christians Fight, Are They Christians" নামে একটি যুক্তিসঙ্গত নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; তার সারমর্ম্ম এই :—

পৃথিবীতে খৃষ্টের অনুসারী অনেক আছেন; কিন্তু, আমাদের ভিতরে ক্রীশ্চান কে?

খৃষ্টের আদেশে আছে যে, তোমার ডান গালে কেউ চড় মারিলে তুমি তখনি তার সামনে বাঁ গালটিও পাতিয়া দিবে। যদি কেউ তোমার জামাটি কাড়িয়া নিয়া যায়, তবে তুমি তাকে তোমার কাপড়-খানিও কাড়িয়া নিতে দিও। 'প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে ও শত্রুকে ঘৃণা করিবে'—এ কথা ভুল। তোমার যে শত্রু তাকেও ভালবাসিবে, তোমাকে যে অভিশাপ দিবে, তাকেও আশীর্ব্বাদ করিবে, তোমাকে যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, তার প্রতিও ভাল ব্যবহার করিবে।

এগুলি হইতেছে খৃষ্টধর্ম্মের নিয়ম।

আজ খৃষ্টানে খৃষ্টানে যে মহাযুদ্ধ বাধিয়াছে, আজ খৃষ্টানকে মারিবার জন্য সকলে যেরূপে অখৃষ্টানকে আপন আপন দলে টানিতেছে, আজ য়ুরোপের শতকরা পঁচানব্বই জন বাসিন্দা খৃষ্টান হইয়াও যেরূপ হিংসার রক্তস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, তাহা যদি খৃষ্টধর্ম্মের আদি সাধুগণ দেখিতে পাইতেন, তবে বিংশ শতাব্দীর খৃষ্টান-ধর্ম্মকে তাঁহারা কি ভাবিতেন?

পৃথিবীতে খৃষ্টানের সংখ্যা ৪৯,৪২,৫০,০০০ জন। য়ুরোপের কোন দেশে কত খৃষ্টান আছে, তাহারও তালিকা দিতেছি। *

এই হিসাব ১৯০০ খৃষ্টাব্দের। গত কয় বৎসরে য়ুরোপের লোকসংখ্যা অবশ্য কিছু বাড়িয়াছে। এই কোটি কোটি মানব, যাহারা খৃষ্টের প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই আজ পরস্পরকে হত্যা করিবার জন্য অস্ত্র তুলিয়াছে বা তুলিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে।

কথা উঠিয়াছে এই যে, একালে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়াছে বলিয়াই এত ঘৃণা, এত অশান্তি ও এত সংক্ষোভের অভিনয় দেখা যায়। য়ুরোপে খৃষ্টের প্রেম-ধর্ম্মের ব্যর্থতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, অনেকে এই কথাটাই তুলিবেন—"য়ুরোপে খৃষ্টধর্ম্মের আধিপত্য অল্প"; কিন্তু Religious Statistics হইতে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, য়ুরোপে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব কমিয়াছে।

আসল কথা, য়ুরোপেই বল, বা অন্য কোথাও বল, আপনার সুযোগ-সুবিধার জন্য মানুষ যখন অপরের গলায় ছুরি বসাইবার ফিকির করিয়াছে, খৃষ্টধর্ম্ম তখন কিছুতেই শান্তি বজায় রাখিতে পারে নাই। ইহার প্রমাণ আছে।

১৫৭১ খৃষ্টাব্দে লেপ্যাণ্টোর যুদ্ধে খৃষ্টানদের হাতে তুর্কীরা পরাজিত হওয়ায় য়ুরোপের আকাশে ইস্লামের অর্দ্ধচন্দ্র উদয় হইবার আশা একরকম লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে পঁচাশিটি বড় বড় যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, উহার ভিতর কেবল খৃষ্টানে-খৃষ্টানে বিয়াল্লিশটি যুদ্ধ হইয়াছে। খৃষ্টানে-অখৃষ্টানে যুদ্ধ হইয়াছে—আটাইস বার। এবং অখৃষ্টানে-অখৃষ্টানে যুদ্ধ হইয়াছে, মাত্র পনেরো বার!

ইতিহাসের আরও প্রাচীন যুগের যবনিকা সরাইলে দেখা যায়, তখন অখৃষ্টান ও পৌত্তলিকেরাই যুদ্ধে মাতিত বেশী, এবং খৃষ্টানেরা কম। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মমূলক প্রতীচ্য সভ্যতার উত্থানের পরে এখন দেখা যাইতেছে যে, অখৃষ্টান ও পৌত্তলিক অপেক্ষা খৃষ্টানেরই রণোন্মাদ অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

---

*		মোট জন সংখ্যা	খৃষ্টান	পারশেণ্ট
যুক্তরাজ্যের	...	৪,২২,০০০০০	৪,২০,০০০০০	৯৯.৫
ফ্রান্স	...	৩,৯০,০০০০০	৩,৮৮,০০০০০০	৯৯'৪
জার্ম্মেনী	...	৫,৬৪,০০০০০	৫,৫৭,০০০০০	৯৮.৭
বেলজিয়ম	...	৬৭,২৪০০০	৬৭,২০০০০	৯৯.৯
অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী	...	৪,৭১,০০০০০	৪,৩৯,০০০০০	৯৩'০
ইটালী	...	৩,২৫,০০০০০	৩,২৫,০০০০০	১০০'০
রুসিয়া	...	১০,৯৭,০০০০০	১০,০২০০০০০	৯১'৩
রুমেনিয়া	...	৬২,০০০০০	৫৯,০০০০০	৯৫'১
বলকান রাজ্য	...	৯০,০০০০০	৮৩,১০০০০	৯২'২

জার্ম্মেনীর বিষম ধ্বংসবাদী দার্শনিক ফ্রেডারিক নিট্‌যে তাই বলিয়াছেন— "যীশু যেমন উপদেশ দিয়াছেন, খৃষ্টান কখনই তেমন ভাবে জীবনযাপন করে নাই।"

নৃত্য-কলায় গীতিকাব্য

লিডিয়া কিয়াবট্‌ য়ুরোপের বিখ্যাত নর্ত্তকী। অপূর্ব্ব নৃত্যকলাকুশল বলিয়া রুশ নর্ত্তকীরা আজকাল জগতে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। লিডিয়াও রুশজাতীয়া। Nash's and Pall Mall Magazineএ সংপ্রতি লিডিয়ার আত্ম-উক্তি বাহির হইয়াছে। তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

—রুশ নর্ত্তকীরা আজকাল অন্যজাতীয় নর্ত্তকীদের চেয়ে বেশী কলাকুশল। ইহাতে আমাদের অধিক শক্তি এবং অধিক নিপুণতা যে প্রমাণিত হয় তাহা নয়। শৈশব হইতেই ভঙ্গী-প্রধান নৃত্যকলায় একাগ্র প্রাণে ব্রতী হই বলিয়াই আমরা আর আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারি। রঙ্গমঞ্চে এখন ইতালীয় পদ্ধতির চলন বড় বেশী। কিন্তু, আমরা সে পদ্ধতি উল্টাইয়া দিয়াছি। ইতালীয় গীতিনাট্যের মত ইতালীয় নৃত্য-কলাতেও এখন কেবল কৃত্রিমতা ও বাঁধি গৎ দেখা যায়। গড়ন ও চেহারা ভাল হইলেই যে-কোন রমণী ইতালীয় নৃত্যকলায় সুনর্ত্তকী বলিয়া নাম কিনিতে পারে। কারণ, তাহাতে কেবল বাহিরের চেহারাকেই প্রধান বলিয়া ধরা হয়। সেখানে আগে রূপ, পরে নাচ। আমাদের কাছে কিন্তু, —আগে, পরে নাই,—সবসময়েই নৃত্য-নিপুণতাই প্রধান বিচার্য্য।

নাচ আছে দুরকম। এক হচ্ছে নাট্য-প্রধান। আনা প্যাভ্‌লোভা (পৃথিবীর ভিতরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রুশজাতীয়া নর্ত্তকী) এই নৃত্যে সুনিপুণ। আর এক নৃত্য রস-প্রধান—গীতি-কবিতার মত। এই শ্রেণীর নৃত্যে আমার কিঞ্চিৎ দক্ষতা জন্মিয়াছে। অবশ্য, নাটকীয় নৃত্যের ভিতরে রস-প্রধান নৃত্যকেও গণ্য করা যায়। দুই শ্রেণীর নৃত্যেরই মূলতত্ত্ব এক। দুইশ্রেণীর নটই আপনাকে সঙ্গীতের সঙ্গে অভেদাত্মা জানিয়া নৃত্যরত হন। কিন্তু, তবু এই দুইজনের ভিতরে একটু বিভেদ আছে। কোন মধুর গীতিকাব্য একাকী কেহ গান করিলে যেমন শুনিতে হয়, রস-প্রধান নৃত্য অনেকটা সেইরকম। বহুকণ্ঠে মহাকাব্য গীত হওয়ার সঙ্গে নাট্য-প্রধান নৃত্যের তুলনা হয়।

নির্দ্দোষ নৃত্যের নমুনা কেবল রুসিয়ায় পাওয়া যাইতে পারে। কেমন উপাদানে সেখানকার নটেরা প্রস্তুত, তাহা জানি বলিয়াই এ কথা বলিলাম। আমি অত্যুক্তি করিতেছি না। রুসিয়ার সকল বড় সহরেই নৃত্য-শিক্ষার জন্য গবর্মেণ্ট স্কুল আছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ছয় কিংবা আট হাজারের কম হইবে না। পঁচিশ বৎসর অন্তর, ঐ হাজার-হাজার ছাত্রের ভিতর হইতে বড়-জোর বারো জন করিয়া যদি প্রথম শ্রেণীর নর্ত্তক পাওয়া যায়,

তাহা হইলেই আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

শ্রীযুত নিজিনিসকী, এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তক। খুব ভাল কবিতার মত, তাঁহার নাচের কথাও অমরতা লাভ করিবে। তাঁহার নিখুত দৈহিক ভঙ্গীমধুর অভিনয়ে কাব্য-সঙ্কেত ফুটিয়া ওঠে। সঙ্গীতের নানা রাগিনীর মধ্যে যেমন বিভিন্নতা থাকে, তাঁহার প্রত্যেক নাচের ভিতরেও সেইরূপ বিভিন্নতা আছে—একটির সহিত অপরটির মিল নাই এবং তাহার প্রত্যেকটিই নয়নমোহন ছবির মত সুন্দর।

রুসিয়ার গীত-বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে, এখানে মনের ভিতর দিয়াই দেহকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সৎসঙ্গ ও সৎ-আলোচনা আমাদিগকে সেই ভাবটির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়া দেয় যাহা পরে নৃত্যকলায় আমরা মূর্ত্ত করিয়া ফুটাইয়া তুলি। সুতরাং একথা বলা বাহুল্য যে, শিক্ষাগুণে আমরা এমন একটা অবলম্বন লাভ করি, বৃদ্ধ অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর বয়সে, যাহার উপরে নির্ভর করিয়া আমরা রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইতে পারি।

আমাদের পা কি সুন্দর?

মানুষের পায়ের উপরে The Strand Magazine-এ একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ বাহির হইয়াছে।

মানুষের মুখের গড়ন যেমন নানান ধাঁজের, তার পায়ের গড়নও তেমনি। এটা বোধ হয়, আমাদের সকলের চোখে ঠেকে না।

পায়ের গড়ন সাধারণতঃ তিনরকম হয়। প্রথম শ্রেণীর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী অন্য সকল আঙ্গুলের চেয়ে লম্বা হয়। এ-রকম পায়ের 'কড়ে' আঙ্গুল থেকে 'বুড়ো' আঙ্গুলের ডগা পর্য্যন্ত একটি রেখা টানিলে রেখাটি ঠিক সোজা থাকে। অতএব, এ-শ্রেণীর পদকে সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পায়ের দ্বিতীয় অঙ্গুলীটি বৃদ্ধাঙ্গুলীর চেয়ে দীর্ঘ হয়। এ-রকম পায়ের আঙ্গুলের ডগা ধরিয়া রেখা টানিয়া গেলে তাহা সোজা থাকে না। অতএব এ-শ্রেণীর পদকে অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ বলিতে পারি। তৃতীয় শ্রেণীর পায়ের প্রথম আঙ্গুল দুটি এক রকমের হয়। অতএব, এরূপ পদকে আমরা তুল্য-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ বলিয়া ডাকিব।

যে-সব জাতির রক্ত অবিকৃত, তাহাদের এক এক জাতির পদ এক এক বিশেষ গড়ন পায়। সেই বিশেষ, নিজস্ব ভঙ্গীটি জাতীয় বিশেষত্বকে ফুটাইয়া তোলে। যুলু ও কেল্ট প্রভৃতি জাতীয় লোকেদের সাধারণতঃ সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ হয়। আফ্রিকার পাপুয়ান ও বোস্‌ম্যেন প্রভৃতি জাতির এবং প্রাচীন ও আধুনিক ঈজিপশিয়ানদের ভিতরে প্রধানতঃ অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ দেখা যায়। য়ুরোপের অনেক জাতির পায়ের গড়ন পাঁচমিশালী। তবে ইংরেজ এবং সম্ভবতঃ জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ ও গ্রীক জাতীয় লোকের মধ্যে সম অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদই আকছার নজরে পড়ে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইংরাজদের শতকরা উননব্বই জন পুরুষের ও এক-আশী জন স্ত্রীলোকের পদ সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট। বাদবাকী শতকরা এগারো জন পুরুষের ও উনিশ জন স্ত্রীলোকের পদ অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট।

অপরিপক্ক পদ নিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গর্ভস্থ সন্তান ও এক বা দেড় বৎসর বয়সের শিশুর পা প্রায়ই অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট। শিশুরা যখন হাঁটিতে শেখে, তখন তাহাদের জাতীয় বিশেষত্বব্যঞ্জক পদের আদর্শ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

ভাল পায়ের গড়ন কি-রকম হওয়া উচিত, আমরা তাহা ঠিকমত জানি না। তাই আমাদের মনে কুসংস্কার আছে যে, শিশুদের পা ছাড়া আমাদের আর সকলকার পা কু-শ্রী; এবং সুশ্রী পা দেখা যায় কেবল গ্রীক ভাস্কর্যে।

গ্রীক ভাস্কর্যে, প্রস্তর-মূর্ত্তি সকলের পদ সাধারণতঃ অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট। ইহাকে আদর্শ পদ বলা চলে না। গ্রীক ভাস্কর্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাতেই আদর্শ পদ সম্বন্ধে আমাদের মনে কুসংস্কার আসিয়াছে। ইজিপশিয়ান শিল্পে অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ দেখা যায়। গ্রীক শিল্প তাহারই অনুকারী। প্রাচীন গ্রীক শিল্পীগণ স্বজাতীয়-দের পদ-আদর্শকে শিল্পে ফুটাইতেন না। একালের অনেক কলাবিদও এমন করেন। যেমন, বার্ণ-জোন্স "Sibylia Delphicaর যেরূপ পা আঁকিয়াছেন তাহার আদর্শ কোন জাতির ভিতরে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন গ্রীকদের পদ যে অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট ছিল, গ্রীক ভাস্কর্য্য দেখিয়াই তাহা প্রমাণিত করা চলে না। কারণ, ভাস্কর্য্যের পায়ের আদর্শ আধুনিক গ্রীক জাতির মধ্যে নাই। আধুনিক গ্রীকদের পদ সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট।

"সাহসের জন্য!"

রণক্ষেত্রে কোন সৈনিক অসাধারণ বীরত্ব ও সাহস দেখাইলে, পদক উপহার দিয়া তাহাকে সম্মানিত করা হয়। পৃথিবীর সকল স্বাধীন জাতির ভিতরে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

ক্রিমিয়ান যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আমাদের পরলোকগতা স্বর্গীয়া মহারাণী, Victoria Crossএর প্রচলন করেন। শত্রুর সম্মুখীন হইয়া স্বদেশের অনুরাগ ব্যঞ্জক কোন অসমসাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে যে-কোন সৈনিক এই সম্মানের অধিকারী হয়। ইংরাজ-প্রজার কাছে এর চেয়ে বড় সম্মান আর নাই। বিপক্ষের নিকট হইতে ইংরাজেরা যে সকল কামান কাড়িয়া নেন, সেই কামানের ধাতু গলাইয়া এই পদক প্রস্তুত হয়। পদকের আসল দাম কয়েক আনা মাত্র। ইহার মূল্য অল্প বলিয়া ইহা অবহেলার সামগ্রী নহে।

এই পদক যিনি পান, তিনি সরকার হইতে দেড় শত টাকার বাৎসরিক বৃত্তিরও অধিকারী হন।

ইংরাজদের আর একটি বিখ্যাত মেডেল আছে, তাহার নাম—The Distinguished Service Order। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহার সৃষ্টি করেন। সৈন্যদল ও নৌবিভাগে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারিগণ যুদ্ধকালে কোন প্রশংসনীয় বা উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিলে এই পদক লাভের অধিকারী হন।

ফরাসীদের জন্য প্রথম নেপোলিয়ন The Cross of the Order of the Legion of Honour নামক বিখ্যাত পদকের সৃষ্টি করেন। এ পদক কেবল যুদ্ধের মধ্যে বীরত্বের জন্য বা কেবল সৈনিকদিগের জন্য সৃষ্ট হয় নাই; যে-কোন অসামরিক বা বিদেশীয় ব্যক্তি বীরোচিত কার্য্য করিয়া এই পদক পাইতে পারেন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন Medaille Militaire নামক পদকের সৃষ্টি করেন। রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইলে যে-কোন সৈনিক ইহা পাইতে পারে। ইহা সামরিক পদক বলিয়া, সৈনিকদের কাছে The cross of the order of the Legion of Honour অপেক্ষাও ইহার অধিক আদর। কোন উচ্চপদস্থ সৈনিকের বুকে এই পদক দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি রণক্ষেত্রে সেনাপতি ছিলেন এবং তিনি এমন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন যে, Legion of Honour তাঁহাকে উপযুক্ত গৌরব দান করিতে পারে না। গত সেপ্টেম্বর মাসে বেলজিয়মের রাজা এই পদক পাইয়াছেন।

রুষ-রাজ্যে যিনি The Cross of the Russian Order of St. George নামক পদক পান, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী হন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইন দি গ্রেট নিজে এই পদক পান। ক্রিমিয়ান ও ককেশাস যুদ্ধের পরে গ্রাণ্ড ডিউক মাইকেল নিকোলেইভিচ এই পদকের নিম্নশ্রেণীর সম্মান লাভ করেন। দেড়শত বৎসরের ভিতরে কেবল চারিজন মাত্র রুশ-বীর, উক্ত পদকের প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, এই সম্মান কিরূপ দুর্লভ।

বেলজিয়মে ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং রণক্ষেত্রে বীরত্বের জন্য The Order of Leopold নামক পদক দেওয়া হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম প্রচলন হয়।

জাপানের সম্রাট যিমু তেন্নোর দুই হাজার পাঁচ শত পঞ্চান্ন বৎসরের রাজ্যাভিষেক উৎসবকে স্মরণীয় করিবার জন্য মিকাডো কর্ত্তৃক পঁচিশ বৎসর আগে The Order of the Golden Kite নামক পদকের সৃষ্টি হয়। বিপক্ষের সম্মুখে বীরত্ব দেখাইতে পারিলে সৈন্যদল ও নৌবিভাগের সকলেই এই সম্মানের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই পদক অত্যন্ত দুর্লভ।

সার্ভিয়ায় সাহসের জন্য The Medal for Bravery দেওয়া হয়। ইহা সকল পদের কর্ম্মচারীই পাইতে পারে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার সৃষ্টি। এই পদকের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া ক্রশের মত কোন বৃত্তি নাই।

প্রুশিয়ার Iron Cross ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম সৃষ্টি করেন। জার্ম্মাণীতে সম্রাট হইতে কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই এই পদক লাভ করিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সম্রাট, যেরূপ মুক্তহস্তে এই পদক ছড়াইতেছেন, তাহাতে মনে হয়, এই পদকের গৌরব শীঘ্রই একান্ত সাধারণ হইয়া পড়িবে।

জার্ম্মেণীতে ফ্রেডারিক দি গ্রেট কর্ত্তৃক সৃষ্ট আর একটি গৌরবকর পদক আছে। তাহার নাম "Pour le Me'rite"। ইহা কেবল নৌবিভাগ ও সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণকেই দেওয়া হয়।

অষ্ট্রিয়ায় বীরত্বের জন্য The Grand Cross of Maria Theresa নামক পদক দেওয়া হয়। এই পদকের সঙ্গে বাৎসরিক অনেক টাকার পুরস্কার আছে। কোলিনের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রুসিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে পরাজিত করায় অষ্ট্রীয়ার বীর সৈনিকগণকে সম্মানিত করিবার জন্য ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসাকর্ত্তৃক এই পদক প্রথম প্রচলিত হয়। গত আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত কেবল আটান্ন জন অষ্ট্রিয়ান এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

রিকার্ডা হুক

জর্ম্মণীর লেখিকাগণের মধ্যে আমরা ক্লারা ভাইবীগের নামই সমধিক শুনিতে পাই। কিন্তু সম্প্রতি এক নূতন মহিলা কবি, উপন্যাসিক ও নাট্যকার ইংরাজি সাহিত্যের আসরে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জর্ম্মণ উপন্যাস-রচয়িতা হের কেলারকেও পরাজিত করিয়াছেন। এই শক্তিশালিনী লেখিকাব আসল নাম মিসেস সিকনী; কিন্তু তিনি সাধারণে রিকার্ডা হুক বলিয়াই পরিচিত।

জর্ম্মণীর প্রধান প্রধান সমালোচক ও সাহিত্য-সেবীগণের বিশ্বাস, তাঁহার মত লেখিকা এ পর্য্যন্ত জর্ম্মণীতে আর হয় নাই।

রিকার্ডা হুক ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ব্রান্সউইক সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুইজার-ল্যাণ্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তত্রত্য বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল মহিলা উক্ত উপাধি পাইয়াছেন, রিকার্ডা হুক তাঁহাদের অগ্রণী। তিনি যে কেবল পি, এইচ, ডি উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহা নহে, উক্ত উপাধির জন্য তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল, যে, তাঁহারা উপাধির সঙ্গে "Magna cum landa", এই কয়েটী প্রসংশাসূচক কথা যোগ করিয়া দেন। এরূপ প্রশংসা অতি অল্প পুরুষেরই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা শেষ

করিবার পর তিনি কিছুদিন জুরিচ সহরের সাধারণ পাঠাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন; তৎপরে ট্রীয়েষ্ট, মিউনিখ্, ব্রান্সউইক, ভিনিস ও ফ্লোরেন্স প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইউরোপের দর্শন ও সাহিত্য ক্রমাগত অধ্যয়ন করিতেন। মধ্যে মধ্যে কবিতাও লিখিতেন বটে, কিন্তু, তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সাহিত্য-সাধনা পূরাদস্তর আরম্ভ হয় নাই।

ভিনিসে অবস্থানকালে রিকার্ডা ভাবী পতির সাক্ষাৎলাভ করেন। পরে তাঁহার জন্মভূমি ব্রান্সউইকে আসিয়া তিনি তাঁহার সহিত বিবাহিত হন। এই বিবাহের মধ্যে একটি চমৎকার 'রোমান্স' আছে। রিকার্ডা হুকের সমস্ত জীবনটাই একটা রোমান্স বলিলে অত্যুক্তি হয় না; এই জন্য জর্ম্মণীতে তাঁহার নাম The living Romance বা জীবন্ত 'রোমান্স'। বাস্তবিক, তাঁহার জীবনের মধ্যে এত অধিক সুখ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত, এত অসংখ্য ভাবের সমাবেশ হইয়াছে যে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। রিকার্ডা হুক যে জর্ম্মণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'রোমান্স'রচয়িত্রী—ইহাই তাহার অন্যতম কারণ।

রোমিও সিকনীর সহিত তাঁহার প্রথম দেখা ভিনিসে। সে দিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। রিকার্ডা হুক তখন গণ্ডোলায় বসিয়া জলবিহার করিতেছিলেন। চারিদিকে অসংখ্য তরণী নাচিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের আরোহী অগণ্য নরনারী আনন্দে বিভোর হইয়া গীত-বাদ্যে চারিদিক



রিকার্ডা হুক

মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। মিস হুকের কিন্তু সে দিকে হুঁস ছিল না, তিনি সেই পরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় কবিতা রচনায় বিভোর ছিলেন। হঠাৎ এক অতি করুণ মর্ম্মস্পর্শী বাঁশরী-তান তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত ভাব-হিল্লোল একেবারে নিস্তব্ধ করিয়া দিল। কবিতা লেখা বন্ধ হইয়া গেল, তিনি দেখিলেন, দূরে একখানি গণ্ডোলায় একটীমাত্র যুবক বসিয়া আপনার বাঁশীর তানে আপনিই বিভোর হইয়া আছে। সে কি করুণ রাগিণী! সমস্ত নৈশ আকাশ ভরিয়া যেন কোন্ চিরদুঃখিনীর বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না প্রাণের সমস্ত সুপ্তবেদনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছিল। যুবকের কোনও খেয়াল ছিল না, তাহার দৃষ্টি উদাস, ঘন-

কৃষ্ণ কেশ আলুথালু। তখন সেখানকার সমস্ত আনন্দ কল্লোল থামিয়া গিয়াছিল, চঞ্চল নরনারী মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চল নিষ্পন্দ ভাবে বসিয়াছিল। রিকার্ডা হুক শৈশব হইতেই সঙ্গীত-প্রিয়া, বাঁশীর সেই অপূর্ব্ব স্বর-লহরী তাঁহাকে মর্ত্তলোক হইতে যেন বহুদূরে টানিয়া লইয়া গেল। তাঁহার নৌকা ধীরে ধীরে নিজের খেয়ালে এদিকে ওদিকে বহিয়া যাইতেছিল। কখন যে তাহা কেমন করিয়া যুবকের নৌকার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। তার পরে অতি নিকটে বাঁশীর সুর শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিতেই তিনি দেখিলেন, সম্মুখে নরবেশে যেন এক দেবকুমার বসিয়া আছেন! ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ ও চোখের তারা দেখিয়া চেনা গেল তিনি ইতালীয়। কেমন-একটা গভীর বিষাদের ছায়া, যুবকের চোখ দুইটি দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বাঁশীর করুণ তানে যুবকের প্রাণের সমস্ত সঞ্চিত হাহাকার যেন গলিয়া বাহির হইতেছিল। রিকার্ডা হুক মুগ্ধপ্রাণে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবকের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর গান থামিয়া গেল। রিকার্ডা হুকের প্রতিভামণ্ডিত মুখখানির উপরে তাঁহার বেদনাহত হৃদয়টি উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যকে অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। যুবকও দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। যুবতীর দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া যুবকও তন্ময় হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে আত্মসংবরণ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বাঁশীর পর্দ্দাগুলি আবার টিপিতে লাগিল, কিন্তু বাঁশী আর বাজিল না।

যৌবনের স্বপ্নময় অতীতে রিকার্ডা এক চঞ্চলমতি জর্ম্মণ যুবককে ভালবাসিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। এই প্রতিভাশালিনী কুমারীর প্রাণের কামনাকে উপেক্ষা করিয়া সে কোনও ধনী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। সে অবহেলা রিকার্ডার প্রাণকে এমন উদাস করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন জীবনে আর কখনও কাহারও চরণে আত্মসমর্পণ করিবেন না। কিন্তু আজ সে প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া যাইবার মত হইল। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া নৌকার মুখ ফিরাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। কিন্তু তবু মনের চাঞ্চল্য দূর হইল না। কয়েকদিন দিবা-রাত্রি মনের মধ্যে একটা ঝড় ও সংগ্রাম চলিতে লাগিল। হৃদয় কিছুতেই বশ মানিতে চাহিতেছিল না। তাঁহার কঠোর শাসনে সে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

অনিদ্রায় কয়রাত্রি কাটিয়া গেল। তার পর, একদিন সকালে, পথে বাহির হইতেই তিনি দেখিলেন,—সম্মুখে সেই যুবক! তার কেশ তেমনি আলুথালু, তার বেশ তেমনি অসংযত, আর,—আর, তার হাতে সেই বাঁশীটি! যুবক তাঁহাকে দেখিয়া একটু হাসিল, কি বিষাদ-মাখা করুণ সে হাসি! তাঁহার সমস্ত প্রাণটা তখন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া সকল বাধা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। এই সময় হইতে প্রত্যহ সেই রহস্যময় যুবক রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, সমস্ত

দিন তাঁহার বাসস্থানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঁশীটি হাতে করিয়া জানালার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, তিনি যখন বাহিরে যাইতেন তখন দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিত, কিন্তু কোনও দিন আলাপের চেষ্টা করিত না, কেবল দেখা হইলে একটু খানি বিষাদের ম্লান হাসি হাসিত মাত্র। তাহার রকম সকম দেখিয়া পুলিসের লোকে অনেকবার তাহ'কে তাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে তাঁহার বাটীর সম্মুখ হইতে নড়ে নাই, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহাতে হুকের চিত্তের অবস্থাটা কেমনতর হইয়া উঠিত তাহার বর্ণনার আবশ্যক করে না। এই সময় তিনি মনকে অন্যদিকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি যে কখনও গ্রন্থকর্ত্রী হইবেন এ কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ একখানি নাটক—"ইভো" (Evol), ইতালীর 'রেনেসাঁস' যুগের কাহিনী। নাটকখানির মধ্যে তাঁহার প্রতিভার ছাপ যথেষ্ট থাকিলেও ইহা সেক্সপীয়রের প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্য যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিলেও সুধী সমাজে বইখানি তেমন প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিল না। এই পাগল যুবক তখনও ঠিক তেমনই ভাবে প্রত্যহ তাঁহার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকেও যেন পাগল করিয়া তুলিত। তিনি তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া অবশেষে ভিনিস ত্যাগ করিয়া ফ্লোরেন্সে আসিলেন। কিন্তু সেখানেও তাহার হাত এড়াইতে পারিলেন না। ফ্লোরেন্সে পৌঁছিবার পরদিনই উঠিয়া দেখিলেন, সেই যুবক হোটেলের বাগানে বসিয়া আপন মনে বাঁশীটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সে হাসিল,—সেই বিষাদের হাসি!

এই সময়ে তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক রচিত হয়। এইখানিই তাঁহার প্রথম উপন্যাস। ইহাতে তাঁহার জীবনের সেই ঝড় ও ভীষণ সংগ্রামের অনেক ছায়া পড়িয়াছিল। এই বইখানির নাম—"The Memories of Ludolf Urslev the Younger"

উপন্যাসের নায়ক লুডল্‌ফ্ উরশ্লেভ জর্ম্মণ অভিজাতবংশীয়, এক্ষণে অদৃষ্টের পীড়নে নিপীড়িত। সে সুইর্জ্জারল্যাণ্ডের কারাগারে বন্দী হইয়া আপনার দুঃখময় জীবনের মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনী বর্ণনা করিতেছে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র এক্কার্ড, গ্যালেড নাম্নী এক কুমারীকে ভালবাসে, কিন্তু দুইজনে বিবাহ হইবার উপায় নাই। তাহাদের উভয়ের ভীষণ মানসিক সংগ্রাম-কাহিনীর ভিতরে আমরা লেখিকার নিজ জীবনের অনেকটা আভাস পাই।

এই বইখানি প্রকাশিত হইতেই রিকার্ডা হুকের নাম সমস্ত জর্ম্মণীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার সঙ্গীতময়ী ভাষা, বর্ণনার কলা-নৈপুণ্য, নিখুঁত চরিত্র চিত্রণ, জটিল মনস্তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ দেখিয়া সমালোচকগণ একবাক্যে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "রোমান্স" রচয়িত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। অবশ্য, তাঁহার প্রথম পুস্তকে কেলারের প্রভাব অনেক স্থানে দেখা যায়। তাহার

কারণ এই যে, তিনি জর্ম্মণীর এই সাহিত্য-সম্রাটের পরম ভক্ত এবং সর্ব্বদাই তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে সেই বংশীবাদক যুবকটির সহিত তাঁহার আলাপ হইয়া গিয়াছে। সে তাঁহার সহিত একই হোটেলে বাস করে। তিনি তাহাকে বহুদিন আপনার মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজের সেই প্রতিজ্ঞা মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। যুবকও এতাবৎ কাল তাঁহার সহিত অনুরাগের কোনও কথা কহে নাই। সে যেন খালি তাঁহার সঙ্গ পাইলেই খুসী হইত। সে অবসর পাইলে তাঁহার পাশে আসিয়া বসিত, সেই বিষাদময় হাসি হাসিত, এবং মধ্যে মধ্যে বাঁশী বাজাইত; কিন্তু অধিকাংশ সময়েই চুপটি করিয়া বসিয়া বাঁশী নাড়া-চাড়া করিত, কোনও কথা কহিত না।

প্রথম উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইবার পর তিনি আবার ভিনিসে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে একদিন সন্ধ্যার সময় গণ্ডোলায় চাপিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ তিনি জলে পড়িয়া গেলেন। তিনি সাঁতার জানিতেন না, কাজেই তৎক্ষণাৎ তলাইয়া গেলেন। কিন্তু কোথা হইতে রোমিও সিক্কনী হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া জলে ঝম্পপ্রদান করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিল। জল হইতে উঠিয়া পুনরায় তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইলে তিনি যখন সমস্ত শুনিলেন, তখন আর প্রতিজ্ঞার কঠিন বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে জন্মস্থান ব্রান্স-উইকে রোমিও সিক্কনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

রোমীও সিক্কনী বাঁশী লইয়াই মত্ত থাকিত, সে কাহারও সহিত মিশিত না, সমাজ-সভ্যতার কোনও ধার ধারিত না, তাহার বেশভূষায় সামাজিক প্রথা বা পারিপাট্যের কোন চিহ্নই ছিল না। দুনিয়ার মধ্যে তাহার একমাত্র কার্য্য ছিল, বাঁশী বাজানো, সে কখনও আপনার বাঁশীটিকে কাছছাড়া করিত না, এই বাঁশীতেই শেষটা তাহার মৃত্যু হয়। রিকার্ডাকে সে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত, তিনি কাছে আসিলে তাহার মুখ এমন একটী উজ্জ্বলতায় ভরিয়া উঠিত যে, তাহার স্বাভাবিক সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইত।

বিবাহের পর রিকার্ডা অনেক দিন অবধি কোনও উপন্যাস লিখেন নাই, মধ্যে মধ্যে ছোট গল্প ও কবিতা লিখিতেন।

তাঁহার কবিতাগুলির প্রতি অক্ষরে যেন তাঁহার পরিপূর্ণ হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ছোট গল্পগুলিতে কল্পনা ও বাস্তব এমনই সুন্দরভাবে পুঞ্জীভূত ও এতটুকু স্থানের মধ্যে চরিত্রগুলি এমন নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট, যে তাহা পাঠককে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়। তাঁহার লিপি-কৌশল হৃদয়ের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনার সৃষ্টি করিয়া গল্পগুলিকে একেবারে স্মৃতির সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়া যায়।

রিকার্ডা হুকের ভাষা যেন সঙ্গীতের মত। তাঁহার গদ্যের মধ্যে এমন একটা ঝঙ্কার আছে যে, তাহা পড়িতে বসিলে কবিতার মত শুনায়। মানব-চরিত্রে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। জটিল মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁহার রচনা সকলকে একেবারে অভিভূত

করে। তাঁহার রচনায় রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত, মোহন নন্দন হইতে নরকের বীভৎস দৃশ্য অবধি এমনই নির্দ্দোষভাবে বর্ণিত যে, সমস্ত যেন একেবারে বাস্তব বলিয়া মনে হয়। রিকার্ডা হুকের আর্টে কোথাও "Crude-ness" বলিয়া কোনও জিনিস নাই। এই সকল শক্তি তাঁহার প্রথম বইখানিতেই বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তকে এই শক্তি যেন অধিকতর বিকসিত।

দ্বিতায় পুস্তকখানির নাম, From out the Street of Triumph",—ইহা তাঁহার প্রথম পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার আট বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক যখন লিখিত হইতেছিল, তখন রোমিও সিঙ্গনীর মৃত্যু হয়। প্রিয়তমের মৃত্যুতে রিকার্ডা যে ভীষণ আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা পুস্তকের ছত্রে ছত্রে ফুঠিয়া উঠিয়াছে। একদিন ইতালীর সমুদ্রতীরে বসিয়া তিনি দিনান্তের নিসর্গ শোভা দর্শন করিতেছিলেন এবং রোমিও তাঁহার পাশে বসিয়া আপন মনে বাঁশী বাজাইতেছিল। রোমিও যখনই বাঁশী বাজাইত, তখনই একেবারে মাতিয়া উঠিত। তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান আর থাকিত না। সেদিনও সে এমনই বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল যে, উত্তেজনার বশে হঠাৎ তাহার রগের শিরা ছিঁড়িয়া গেল। জীবনসঙ্গিনীর বুকের উপরে তাহার মরণাহত ললাট এলাইয়া পড়িল। আকাশ-সমুদ্রের চুম্বন-রেখায় দিনান্তের সূর্য্য ডুবিয়া গেল। সেই সঙ্গে রোমিওর সৌন্দর্য্যবিলাসী প্রাণের শিখাটি নিবিয়া গেল

প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইতেই রিকার্ডা হুকের নাম দেশব্যাপী হইয়া গিয়াছিল। এখন দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশবাসীর নয়নপুত্তলি হইয়া উঠিলেন।

ইহার এক বৎসর পরেই রিকার্ডার তৃতীয় উপন্যাস, "Vita Somnium Breve" প্রকাশিত হয়। তার পরের বৎসর রিকার্ডা হুকের বীরত্ব ও যুদ্ধের বর্ণনাপূর্ণ উপন্যাস গুলি প্রকাশিত হয়। রিকার্ডা হুক যেমন প্রেম, দারিদ্র, দুঃখ ও কষ্ট প্রভৃতির উপরেই অধিকাংশ পুস্তক লিখিয়াছেন, তেমনই বীরত্বের প্রতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার একটা আন্তরিক টান থাকাতে তিনি এ সম্বন্ধেও কয়েকখানি উপন্যাসও লিখিয়াছেন। সে গুলিও তাঁহার গার্হস্থ্য উপন্যাস-গুলির মত পাঠকদের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিয়াছিল। তাঁহার চতুর্থ পুস্তক "Of Kings and Crowns" প্রকাশিত হইবার পরেই যুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রথম উপন্যাস, "The Conquest of Rome" প্রকাশিত হয়। তিনি ইতালীকে বিশেষ ভালবাসেন, এবং গ্যারিবল্ডীকে দেবতার মত ভক্তি করেন। এই পুস্তকে ইতালীর কথা ও গ্যারিবল্ডীর কীর্ত্তি-কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। গ্যারি-বল্ডীর জীবন ও ইতালীর স্বাধীনতা লাভের কাহিনী তিনি যে তিনখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, The Conquest of Rome তাহার মধ্যে প্রথম। ইহা ছাড়া রিকার্ডা হুক জর্ম্মনীর যুদ্ধ সম্বন্ধেও উপন্যাস লিখিয়া-ছেন—তাহার নাম, "The Great German War!" এই বইখানি একসঙ্গে চিত্তকে উত্তেজিত ও মুগ্ধ করে। এই

সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই প্রশ্ন করিতেছেন যে, এখনকার এই মহাবিপ্লবের হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী কি তাঁহার কল্পনাকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে?

পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্রের রক্তপ্রবাহ যে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এখন তাঁহার বয়স পূর্ণ পঞ্চাশ বৎসর। এই প্রাচীন বয়সেও তিনি জর্ম্মন রেডক্রস দলের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও আর্ত্তের সেবা করিতেছেন।

শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত।

অন্ধ

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

কি বল্‌চেন?—হাস্‌চি কেন? হুঃ—হাস্‌চি কেন!—কে জানে! হয় ত' কাঁদ্‌তে পার্‌চি না বলেই হাস্‌চি! আমার বুকের ভিতরে বালির চড়া পড়ে গেছে কিনা! সব্ জল শুকিয়ে গেছে গো, শুকিয়ে গেছে। চোখ দিয়ে তাই আর জল আসে না। আমি কান্নার বদলে তাই সুধু হাস্‌চি আর হাস্‌চি!

—হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলুম। বাবা ত' কিছুতেই আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন না। আমার হয়ে বল্‌তে গিয়ে উল্টে মা তাঁর কাছে ধমক খেলেন।

বাবা বল্লেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি কখনো চোখেও দেখিনি। মেয়ে অন্ধ, তা হয়েচে কি! এতগুলো টাকা কি ছাড়া যায়?"

মেয়ে চোখে দেখ্‌তে পায় না, বাবাও পঞ্চাশ হাজার টাকা কখনো চোখে দেখেন নি। বিয়ে হলে মেয়ে যদিও চোখে দেখ্‌তে পাবে না, কিন্তু বাবা ত' এতগুলো টাকা চোখে দেখ্‌তে পাবেন!—ব্যস, তাহলেই হল, তাহলেই হল! তাঁকে টাকা দ্যাখাবার জন্যে আমাকে বিয়ে কর্ত্তে হবে।

মা বড় অবুঝ; স্ত্রীলোক কিনা! বল্লেন, "তবু ছেলেটার দিকেও ত' একবার তাকাতে হয়!"

বাবা রেগে বল্লেন, "ভগবান যাকে মেরেচেন, আগে তার দিকে তাকানো উচিত! জান সে অন্ধ!"

হাঃ হাঃ—বাবার কি ধর্ম্মজ্ঞান! কিন্তু বাবা আমার এ সহজ কথাটা ইচ্ছে করেই বুঝলেন না যে, ভগবান যাকে মেরেচেন, দুনিয়ায় আমি ছাড়া তার দিকে তাকাবার জন্যে আরও ঢের্ লোক আছে। এ বাঙ্গলা যে দয়ায় ভরা! পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পারলে এখানে অন্ধ হলেও বিয়ে বন্ধ থাকে না; বাঙ্গালী বরের বাপ টাকা পেলে চিতা থেকেও মরা মেয়েকে ছাঁদ্‌নাতলায় টেনে নিয়ে যেতে পারে!

বাবা আবার বল্লেন, "আমার যদি বয়স থাক্‌তো, এ মেয়েকে তাহলে আমিই বিয়ে—"

মা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্লেন, "চুপ কর, চুপ কর! কি বল্‌চ তুমি!"

বাবা ঠিকই বল্‌চেন। তিনি যে পরম হিন্দু। দুবেলা সন্ধ্যাহ্নিক করেন, মাথায় টিকি, গলায় পৈতে রাখেন, ভগবান যাকে মেরেচেন তার দিকে তিনি তাকাবেন না?

হাহাঃ!—

আমারও,—তাতে আপত্তি ছিল না।

খ

দুঃখের কথা, পঞ্চাশ হাজার টাকা চোখে ভাখ্‌বার অবকাশ বাবা বেশীদিন পেলেন না। মৃত্যু এসে আমার এই অন্ধবধূর মত বাবাকেও অন্ধ করে অন্ধকারে নিয়ে গেল। জানিনা, ইহলোকের এই পঞ্চাশ হাজার টাকার আওয়াজ তিনি তাঁর বৈতরণীর পরপার থেকে শুনতে পাচ্চেন কিনা!

হাহাঃ!—আর, আর—আমার এই হাসির শব্দ! এও কি তাঁর কাণে যাচ্চে? এ হাসির শব্দ কি তাঁর বুকের হাড়ে-হাড়ে, তাঁর পাঁজরে-পাঁজরে গিয়ে ঘা মার্‌চে, মার্‌চে, মার্‌চে? আমি এটা জান্‌তে চাই। কেউ বল্‌তে পার?

বেণু স্বধু অন্ধ নয়। ভগবান তাকে অন্ধকারের মত কালো করে, আমার মুখের সামনে বিষের পাত্র পূর্ণ করে রেখেচেন।

কিন্তু তার নাম রাখ্‌লে কে? নামের এমন সার্থকতা আমি আর কখনো দেখিনি! আশ্চর্য্য! তার সমস্ত রূপের অভাব, চোখের অভাব যেন এই মধুর, কোমল অথচ বিষাদমাথা স্বরের ভিতরে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

কিন্তু, সে অন্ধ। সে কালো। তার দিকে চাইতে আমার ঘৃণা হোত; আমার রাগ হোত। আপনার চির-অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে কেন সে আমার জীবনকেও অন্ধকার করে দিলে? কেন দিলে—কেন?

সে, বাড়ীর অন্য অন্য সকলকার পায়ের শব্দের ভিতর থেকে আমার পায়ের শব্দ ঠিক চিনে নিতে পারত। এটা আমি লক্ষ্য করে দেখেচি। আমার পদশব্দ শুনলেই সে মুখ তুলে উৎকর্ণ হয়ে থাকৃত। কিন্তু, আমি যে তাকে ঘৃণা করি, এটা সে বুঝ্‌তে পার্‌ত। কারণ, আমি তার কাছে গেলে সে সরে যেত। নয় ত কেমন যেন জড়সড় হয়ে অপরাধীর মত বসে থাকৃত। আর এক আশ্চর্য্যের কথা, আমার সঙ্গে এতদিন সে একটাও কথা বলে নি। এক অন্ধ, অন্ধকার মৌনের মত সে আমার প্রাণমনের উপরে চেপে বসেছিল।

তাকে কথা কওয়াবার জন্যে আমিও কিছু ব্যস্ত ছিলাম না। আমিও তার সঙ্গে কথা কই নি।

এমনি ভাবে এক বছর গেল। এই এক বছর আমরা কেউ কারুর সঙ্গে একটাও কথা কই নি। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন নীরবতা যে থাকৃতে পারে, আগে আমার এ জ্ঞান ছিল না। ওঃ! তোমরা এ কল্পনা করতে পার্‌বে না। এ নীরবতা অসহ্য—অসহ্য—অসহ্য!—হ্যাঁ, অসহ্য বটে,

—তবু এ নীরবতা ভঙ্গ কর্‌বার সাহস আমাদের কারুর ছিল না।

গ

আমি জীবনটাকে উপভোগ কর্‌ছিলাম। আমার যৌবনের ভিতরে অনেকখানি ফাঁক্ থেকে গিয়েছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যার পূর্ণ যৌবনের তপ্ত রক্তধারা অপব্যয় হয়, তার কষ্ট সকলে বুঝ্‌তে পার্‌বেন না।

বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, ক্ষতিপূরণ কর। লোহার সিন্ধুকে পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ মজুৎ রেখে, বাবা (অনিচ্ছাসত্বে কিনা, জানি না!) পরলোকে প্রস্থান করেছিলেন।—কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিন্ধুকের চাবীটি তিনি ট্যাঁকে করে নিয়ে যেতে পারেন নি।

সেই পঞ্চাশ হাজার টাকায় আমি আমার জীবনের ফাঁকটুকু ভরিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম। প্রায়ই আমার বৈঠকখানায় বাইজীর "ছিলি-মিলি-পানিয়া"র সঙ্গে মদের পিয়ালায় ঠিনি-ঠিনি সুর বেজে উঠ্‌তে সুরু হোল। ফলে, আমার জীবনের ফাঁকটুকু যতই ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, বাবার লোহার সিন্ধুকও ক্রমে ততই খালি হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

বেণুর চোখ ছিল না, কিন্তু কাণ ছিল। সে কিছু দেখ্‌তে না পেলেও শুনতে পেত সব। আমাকে মুখ ফুটে কিছু না বল্লেও, তার মনে যে ঝড় উঠেচে, এটা আমি তার মুখ দেখে বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু, বুঝেও আমার প্রাণে দয়া হোত না,—বরং একটা নিষ্ঠুর আনন্দের ভাব জেগে উঠ্‌ত।

রাত্রে আমি প্রায়ই বাড়ীতে থাক্‌তাম না। বাড়ীতে থাক্‌লেও বেণুর কাছে যেতাম না। তার প্রতি আমার ঘৃণা ও রাগ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছিল।

সেদিন হঠাৎ আমার জ্বর হোল। বাইরের ঘরে জ্বরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর, কখন যে আমার প্রাণের ইয়ারেরা আমার কাছে থাকাটা অনাবশ্যক মনে করে আস্তে আস্তে সরে পড়েছিল, আর কখন যে চাকরেরা আমাকে ধরাধরি করে অন্দরে শুইয়ে দিয়ে এসেছিল, সে খেয়াল আমার আদোপেই ছিল না।

* * *

স্তব্ধ রাত্রে, ঘরের ঘড়ীটা হঠাৎ বেজে উঠ্‌ল। সেই শব্দে আমার জ্ঞান হোল। আমি শুন্‌লাম একটা, দুটো, তিনটে, চারটে! শেষ রাতের থম্‌থমে নিস্তব্ধতাকে অকস্মাৎ জাগ্রৎ করে দিয়ে ঘড়ীটা আবার থেমে গেল। কেবল, রজনীর হৃৎপিণ্ডের শব্দের মত, সেই চির-জাগন্ত ঘড়ীটা ক্রমাগত মৃদুস্বরে করতে লাগ্‌ল টিক্-টিক্-টিক্!

মনে হোল, কে-যেন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে,—খুব আল্‌তভাবে। আমার মাথার ভিতরটা তখন জ্বলে-পুড়ে যেন খাক্ হয়ে যাচ্ছিল,—কে আমার সেবা কর্‌চে সে কথা আমি বুঝতেও পার্‌লাম না, বুঝবার চেষ্টাও কর্‌লাম না।

"বড় তেষ্টা—একটু জল।"

আমার মুখের কাছে কে জলের গেলাস ধর্‌লে।

জল পান করে আমি অনেকক্ষণ শুয়ে রৈলাম। অন্ধকারে দেখতে পেলাম না,—কিন্তু, কে আমাকে পাখার বাতাস কর্‌ছিল।

* * *

হঠাৎ আমার কপালে দু ফোটা জল পড়্‌ল। এ কিসের জল? আবার,—এক, দুই, তিন ফোঁটা! এক ফোঁটা আমার ঠোঁটে পড়্‌ল,—বুঝলাম, সে চোখের জল! এই রাতে আমার শিয়রে বসে কাঁদে কে?

তখন, একজনকে মনে হোল। হ্যাঁ,—একজনকে! কিন্তু—কিন্তু, কেন কাঁদে সে?

পীড়ায় বোধ করি, মানুষের মনকে পল্‌কা করে ফেলে। নইলে, ক-ফোঁটা অশ্রুজলে আমার অমন পাথরের মত মন ভিজে নরম হয়ে গেল কেন?

আস্তে আস্তে ডাক্‌লাম, "বেণু?"

উত্তর পেলাম না।

"বেণু?"

পাখার হাওয়া থেমে গেল।

"বেণু, কথা কও!"

অতি মৃদু—কম্পিত স্বরে উত্তর পেলাম, "কি বলচ?"

"তুমি কাঁদ্‌চ কেন?"

"কাঁদি নি।"

"মিছে কথা বোল না।"

ভয়ে ভয়ে বাধো-বাধো গলায় বেণু বল্‌লে, "আর,—আর কাঁদ্‌ব না।"

আমি চুপ করে রৈলাম। তখন কি ভাবছিলাম, তা আর আমার মনে নেই।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "এত রাত পর্য্যন্ত তুমি জেগে আছ কেন?"

"তোমার যে জ্বর হয়েছে!"

"আমার জ্বর, তাতে তোমার কি?"

উত্তর পেলাম না। তার বদলে আমার কপালে আবার দু-ফোঁটা জল পড়্‌ল। যে চোখে দৃষ্টি নেই, সে চোখেও ব্যথার অশ্রু থাকে! ভগবান! দু-বিন্দু অশ্রু মনের কথা এমন করে খুলে বল্‌তে পারে?

আমার মনটা কি-রকম হয়ে গেল,—আমি দুহাত বাড়িয়ে বেণুকে আমার বুকের উপরে টেনে নিলাম। তার মুখে আমার মুখ রেখে চুম্বন কর্‌লাম। বেণু অস্ফুটস্বরে কি বল্‌লে। তার সারা দেহ থর্‌ থর্‌ করে একবার কেঁপে উঠল। তার মাথাটি আমার কাঁধের উপরে এলিয়ে পড়্‌ল। তারপর, প্রাণপণে আমার বুক দুহাতে জড়িয়ে ধরে সে স্থির হয়ে পড়ে রৈল।

* * *

প্রাতঃসন্ধ্যার স্বর্ণ চিতা যখন পূর্ব্বমেঘে জ্বলে উঠল, তখন তার আলো বেণুর অন্ধনেত্রে, কৃষ্ণ দেহের উপরে এসে পড়্‌ল।

অন্ধ বেণু—কালো বেণু!

তখনও সে আমার বুকের উপরে তেমনি নিসাড় হয়ে পড়ে ছিল। ভোরের আধা আলোয়, আধা ছায়ায় বেণুর অন্ধ চোখ ও কালো দেহের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লাম। তেমন করে আগে কখন' তাকে দেখি-নি, পরেও কখন' দেখ্‌বার সময় পাইনি।

তার চোখের পাতাদুটির উপরে আস্তে

আস্তে হাত বুলিয়ে দিলাম। পদ্মপুটে বন্দী বৃষ্টিবিন্দু নাড়া পেলে যেমন ঝরে পড়ে, বেণুর চোখ থেকেও তেমনি ঝর-ঝর করে আবার অশ্রু ঝরে পড়্‌ল।

"বেণু!"

"ওগো নাগো না, আর অমন কর্‌ব না!"

"কি কর্‌বে না?"

"আর কাঁদ্‌ব না!"

আমার অবরুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ করে বলে উঠলুম—"না,—কাঁদ তুমি। আমিও কাঁদি।"

ঘ

তারপর? তারপর আমার জ্বর বসন্ত রোগে দাঁড়াল। বসন্ত আমাকে প্রাণে মার্‌লে না, কিন্তু আমার চোখদুটো উপড়ে নিয়ে গেল।

বেণুর মত আমিও অন্ধ!

বেণুকে জীবনে সেই একবার মাত্র দেখেছিলুম। তাকে দেখার আশা মিটল কৈ? এই ঘন অন্ধকার ঠেলে তার একটা ছায়ামূর্ত্তি বিদ্যুতের মত এক একবার চম্‌কে ওঠে বটে, কিন্তু তাতে যে তৃপ্তি হয়না গো, তৃপ্তি হয় না!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পথে পথে

নালাটি হচ্ছে মানুষের হাতে কাটা, সুতরাং নালার জল সোজা পথটি বেয়ে গাছের গোড়ায় বা ধানের ক্ষেতে এসে পড়তে বাধ্য। কিন্তু নদী—যেটা সৃষ্টি হচ্ছে—তার জন্যে কেউ পথ কেটে রাখে না; সে নিজের পথ নিজেই করে নেয়। দিনে দিনে তিলে তিলে সে শক্তি সঞ্চয় কোরে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন গতিতে পথের বাধা অতিক্রম করে ক্রমশঃ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

স্বাধীন যে পথ, স্বাভাবিক যে পথ, তাতে প্রাণ আছে, বৈচিত্র্য আছে, শক্তি আছে, গতি-স্থিতির ছন্দ আছে; আর মানুষের হাতে-বাঁধা পথটিতে এ সকলের একটাও নাই—স্থিতিটুকু ছাড়া। বাঁধা জল সে এক জায়গায় বাঁধা পোড়ে মরে; আর পাষাণের কোলে যে জলটুকুর সৃষ্টি—সে বাঁধ ভেঙে জীবন-প্রবাহে দুই কূল ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায়।

কোন্ পথে যাবে—কোন্ পথে যাবে—আমাদের শিল্প কোন পথে যাবে? বাঁধের পথে কি বাঁধ-ভাঙা স্বাভাবিক পথে?—এই প্রশ্নই চারিদিকে শুন্‌তে পাচ্ছি। মহাজন-দের পদাঙ্কচিহ্নিত বাঁধা পথটি আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে—এবং নীতি ও শিল্প-শাস্ত্রের সাইন্‌বোর্ডখানি সেই পথের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে বল্‌ছে—'নান্যেন মার্গেন। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'।

পথ যখন সম্মুখে পরিষ্কার পড়ে রয়েছে

তখন শিল্পটাকে এই পথেই চালাও—এই কথা হচ্ছে যারা প্রাচীন তাদের কথা, যারা পাণ্ডা তাদের কথা আর তাদের সঙ্গে যে যাত্রীরা দারু-ব্রহ্মের ঝাঁকি দর্শনে দল বেঁধে যাচ্ছে-আস্‌ছে তাদের কথা। তাদের মধ্যে কেউ তোমাকে স্বাধীন পথে যথা-সুখে নিজের বাঞ্ছিতের উদ্দেশে যাত্রা করতে উপদেশ দেবে না।

তারা বলবে, পণ্ডিতদের অভিমত যে শিল্প, তাই শিল্প; এবং মনুসংহিতার মতো শিল্পসংহিতার বচনগুলোই পালন করে চলাই প্রশস্ত। পণ্ডিতেরা লিখছেন দেবতার ধ্যান, আর পণ্ডিতদের চেয়ে জাত্যংশে খাটো শিল্পীগুলো সেই ধ্যানমূর্ত্তিসকল ফুটিয়ে তুল্‌ছে পাষাণের অক্ষরে;—এমন কি, লেখার ছাঁদটুকুর সম্বন্ধেও শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, পণ্ডিতের দেওয়া মান-পরিমাণের নাগ-পাশে শিল্পীর সমস্ত শক্তি এবং স্ফূর্ত্তি মূর্চ্ছাহত! প্রাচীন ভারতের লক্ষকোটী শিল্পী, যাদের প্রাণের অভাব ছিল না, পণ্ডিতদের অপেক্ষা সুকুমার মনোবৃত্তি-সকলেরও অভাব ছিল না, তারা একাসনে একমনে বসে শুক্র-নীতি ও মানসারের পুঁথির রেখাগণিত ও অগণিত সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞাসকল পূর্ণ করছে এবং তারি ফলগুলি স্তূপাকার করে সাজিয়ে যাচ্ছে—কখনো রাজমন্দিরের মতো, কখনো বা তেত্রিশ কোটী মূর্ত্তির বত্রিশ-সিংহাসনের মতো। এই মন্দিরে এই সিংহাসনে ভারত-শিল্পীরা তাদের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে বল্লে ভুল হয়, কেন না, সিংহাসন কি মন্দির, যা-কিছু তারা গড়েছে, সে তাদের হৃদয়-দেবতার জন্য, নিজের মনোমত করে গড়তে তাদের অনুমতি ছিল না। গড়েছে তারা অনুশাসন এবং হুকুমের চাকর, দেশের বিক্রমাদিত্যসকলের জন্য—যারা প্রাচীনের ছদ্মবেশে আজও সমান-বিক্রমে রাজত্ব করছে—আমাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে শিক্ষা দীক্ষায়।

প্রাচীন ভারতে শিল্পীও ছিল, শিল্পসামগ্রীর আদর করবার মানুষও ছিল। যদি কেবল এই দুই দলই থাকতো তবে আমাদের শিল্প হয়তো পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে যথার্থরূপে দেখা দিত—যেমন দেখা দিয়েছে চীন-শিল্প, জাপান-শিল্প। কিন্তু তা হয়নি। এই দুই জাতিকে দুই পায়ে চেপে দাঁড়িয়ে আছে দেখি আর এক বলবান জাতি, বুক ফুলিয়ে যে বল্‌ছে, 'নান্যেন মার্গেন'—আমরা যে পথ বেঁধে দিলেম শিল্পের জন্য এই পথই একমাত্র বাঞ্ছনীয়, তোমার নিজের যদি কোন বাঞ্ছা কি বাঞ্ছিত থাকে থাক্‌, আমরা যা চাই, যে রূপটা চাই, সেইটাই দাও; তোমরা তো শিল্পী আর আমরা পণ্ডিত, আমরা কুলপুত্র, দুষ্কুল থেকে স্ত্রী-রত্নের মতো শিল্পলক্ষ্মীকে আমরা জাতে তুল্লে তবেই সে কৃতকৃতার্থ হবে।

ভারতবর্ষে শিল্প, শিল্প-আচার্য্যগণের শাস্ত্রসংহিতার তুলসীমঞ্চে বাঁধা পড়ে কৃতকৃতার্থ হল কিনা সেটা তর্কের বিষয় কিন্তু এটা ঠিক যে, সেটা সম্পূর্ণ বাড়তে পারেনি। তাতে পাতাও ধরেছে, ফুলও ফুটেছে কিন্তু মঞ্চে-বাঁধা পঞ্চবটির মতো সে যে কোনদিন অনেকখানি ছায়া দেই নি বা দেশের অন্তরের অন্তরেও শিকড় গাড়েনি একথা কে না স্বীকার করবে?

জাপানের মালীরা যে কৌশলে তাল-প্রমাণ গাছকে তিল-প্রমাণের 'স্কুপ' বা বামন-রূপে বর্ত্তমান রাখে, আমাদের দেশের শিল্পটাকে তেমনি কৌশলেই আচার্য্য উপাচার্য্য দেবতা উপদেবতা মিলে মুঠোম হাতের তুলসীমঞ্চে যাদুকরের ফুস্‌মন্তরের আম গাছের মতো রেখে গেছেন। সেটাথেকে আমরা শিল্পাচার্য্যের কলাবিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করি; আর লাভ করি—শিল্পীর স্বাধীনতার উপরে শিল্পাচার্য্যগণের হস্তক্ষেপ করার আদ্যন্ত একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস!

পণ্ডিতগণের অভিমত ভারতশিল্পের এই ধ্যানী মূর্ত্তি, আচার-বিচার মান-পরিমাণের যজ্ঞসূত্র গলায় বেঁধে জাত্যভিমানের গর্ব্বে যতই স্ফীত হয়ে উঠে থাক-না কেন এবং যতই আমাদের গৌরবের সামগ্রী বলে আমরা তাকে পূজা দিই-না-কেন, সেগুলো যে আমাদের শিল্পের নিজস্ব নয়,—পণ্ডিতানাং সর্ব্বস্ব, সেটা আমরা কিছুতে ভুলতে পারি না। পণ্ডিতগণের দিক থেকে দেখতে গেলে যেটা 'পণ্ডিতানাং মতম্' সেটারই গুরুত্ব অধিক; কিন্তু শিল্প এবং শিল্পীর দিক দিয়ে দেখলে বলতেই হবে যে, শিল্পের পক্ষে শিল্পীর অভিমত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত এবং সেই পথই শ্রেষ্ঠপথ, যে পথ শিল্পের জন্যে শিল্পী নিজে আবিষ্কার করে।

"নাধিকাঙ্গা ন হীনাঙ্গা কর্ত্তব্যা দেবতা কচ্চিৎ"—এই বচনটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়ে শিল্প-দেবতা যে মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছেন সে মূর্ত্তি দর্জ্জির দোকানের কাটা-ছাঁটা মানান-সই কোটটার মত দরবারি কিংবা পোষাকি;—একেবারেই আটপহুরে নয়। সে এক জাতীয় শিল্প কিন্তু আমাদের জাতীয় শিল্প বোলে সেটাকে ভ্রম করলে চলবে না। কৃত্তদাসের কাজগুলোকে ভক্তের সেবার সঙ্গে তুলনা কল্লে যে ভুলটি করা হয়, আমাদের হ্যাট্‌কোটের ফ্যাসন্‌টাকে মায়ের হাতের কাঁথাখানি বলে ভুল কল্লে যে মূর্খতাটা করা হয়, পণ্ডিতানাং মতম্ যেটা সেটাকে শিল্পীরও অভিমত বল্লে ঠিক সেই ভুল আমাদের করা হবে। পণ্ডিতেরা খুব উচ্চজাতি হতে পারেন এবং তাঁদের অভিমত শিল্পটাও খুব বড়-দরেরও হতে পারে কিন্তু সে বা সে জাতির শিল্প এত বড় নয় যে আমাদের বোলে, শিল্পীর নিজস্ব বোলে পরিচয় দেওয়া চলে। প্রাচীন ভারতে পণ্ডিতেরা—আচার্য্যেরা ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা এবং তাঁদের বচনই ছিল সব। শিল্পটাও তাঁদেরই বচনগুলির তেত্রিশ-কোটী পাষাণ মূর্ত্তি,—দুই পায়ে শিল্পীর হৃদ্‌পদ্ম দলিত করে বরাভয়ের অভিনয় করছে। প্রাচীন ভারত শিল্পে এই করুণ রসটুকুই সত্যকার, কেন না এইটুকুর সঙ্গেই শিল্পীর প্রাণের যোগ ছিল; আর যে রসগুলো পাষাণের ভাণে ধরা যাচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে শাস্ত্র-বচনের যোগ, শাস্ত্রীগণের যোগ;—যথার্থ রসের উৎপত্তির যোগাযোগ সেখানে নাই। নদীর সব জল—সমস্ত প্রবাহ একটিমাত্র গণ্ডুষে বাঁধা পড়েছে, আর একুল ওকুল দুকুল জুড়ে নদীর বুকে বালির চর ধু-ধু করছে। প্রাচীনেরা মিলে ভারতশিল্পের উর্ব্বরতার শক্তি হরণ করে নিয়ে, দিয়ে গেলেন তাকে উষরতার বিরাট অবকাশ।

আমরা যখন চলতে চাচ্ছি, পথ চাচ্ছি, তখন গোড়া-থেকেই প্রাচীনের এই ভয়ঙ্কর বোঝাটাকে আমাদের কাঁধ থেকে নামাতে হবেই হবে, গণ্ডুষের বাঁধ ভাঙতে হবে, প্রবীণতার কুক্ষী ভেদ করে আমাদের আর-একবার আমাদের সেইখানে বেরিয়ে দাঁড়াতে হবে যেখানে আমরা শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন, যেখানে আমাদের পুরাতনটা আমাদের বাধা দেবে না, অন্যের নতুনটাও আমাদের ভুলিয়ে রাখতে পারবে না ;—এক-কথায় প্রাচ্য প্রবীনতার তৈলকটাহ এবং পাশ্চাত্য নূতনতার অগ্নিকুণ্ড এ দুই থেকেই দূরে এমন একমুখে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে, যে-মুখে আমাদের চোখের দৃষ্টি মনের প্রসার আনন্দের প্রবাহ অপ্রতিহত। নিজের মনের নবীনতা সজীবতা অক্ষুণ্ণ রেখে চলাই হচ্ছে চলবার শ্রেষ্ঠ উপায় এবং নিজের দুখানা পা সুখ-দুঃখ আলো আঁধারের তালে-তালে যেখান দিয়ে উঠে-পড়ে চলে যায় সেই পথই হচ্ছে আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ। শাস্ত্রগড়া শিল্প নয়, শিল্পীর মনগড়া শিল্পই হচ্ছে উত্তম শিল্প—একথা সপ্রমাণ করতে আমরাই যে নতুন করে উদ্যত হয়েছি তা নয়, প্রাচীন কালেও শিল্পীরা প্রাচীনতার বোঝা বারবার নামিয়েছেন এবং পণ্ডিতানাং মতম্ ঠেলে নিজের মতকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করেছেন। শিল্প-শাস্ত্রকার শুক্রাচার্য্য সেটাকে 'একেষাং মতম্' বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেও পারেন নি। এই যে 'একেষাং মতম্'—যার মূল মন্ত্র হচ্ছে 'লগ্নং যত্র চ যস্য হৃদ্' বা মনোমত পথে যাওয়া—তাকে ঠেলে রাখা পণ্ডিতদের সাধ্য হয় নি, হবেও না। মনের সোনার কাঠি, শাস্ত্রকারের রূপোর কাঠিকে জয় করে প্রাচীনকালেও এতটা কাজ করেছিল যে, পণ্ডিতকেও সেটার জন্য দুই ছত্র শ্লোক রচনা করতে হয়েছে এবং সেই শ্লোকটাকে শিল্পশাস্ত্রের ভিতরে স্থান দিতে হয়েছে।

হৃদয় হৃদয়, যে পথে সে চলে সেইই পথ, যাকে সে চায় তাকেই পাওয়া, যা সে দেয় সেই দানই শিল্পে শ্রেষ্ঠদান। মন্দিরের বাহিরে যেখানে শিল্পীর আনন্দ, মৃদঙ্গ বাজিয়ে মহা রাসলীলায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সেইখানেই যথার্থ পথের সন্ধান আমরা পাবো, আর মন্দিরের ভিতরে—সেখানে মূর্ত্তিমান শাস্ত্র বরাভয়ের অভিনয় দেখাচ্ছে, সেখানে অন্ধকারে প্রদক্ষিণের একটি আবর্ত্ত ছাড়া অন্য পথ পণ্ডিতেরা রাখেননি। "কহহিঁ কবীর তেঈভো দুখিয়া, যিন য়হ রাহ চলাঈ।'—এ পথে চিরদুঃখী ঘানির বলদেরাই ঘুরে মরে!

এই যে 'পণ্ডিতানাং মতম্' ঠেলে আমরা শিল্পীর মনোমত শিল্পকে বরণ করতে চাচ্ছি এর জন্য বিজ্ঞদের কাছ থেকে, প্রাচীনদের কাছ থেকে, এবং দেখতে নবীন হলেও সমস্ত মনটি যাদের জরায় সাদা হয়ে গেছে—কোন রং যাতে নেই—এমন সব মানবকদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কথা শুনতে হবে। সমভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, অতিভঙ্গ, উরুভঙ্গ ইত্যাদির একটিকেও পছন্দ না করে আমরা যে নিজেদের সহজ ভঙ্গীতে বল্‌তে চল্‌তে এবং লিখতে চাই এটা

ওদের প্রাণে সইবে না। আমরা যে গণপতির শুঁড়টিতে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে শুঁড়টির আধ্যাত্মিক অর্থের চিন্তা করতে ব্যস্ত নই, কিন্তু সেটাকে দিয়ে আঁক্শীর কাজ করিয়ে নিতে চাচ্ছি এই সব ছেলেমানুষির্ জন্য, এই লতার মতো মনোমত পথে লতিয়ে ওঠার জন্য, এই আমাদের টেরছা চোখের ইঙ্গিত আভাষ পণ্ডিতগণের উপরে নিক্ষেপ করার জন্য ওঁরা আমাদের কিছুতে ক্ষমা কর্‌বেন না। আমরা যে শাস্ত্রকারকে জানি না, শাস্ত্রকে মানি না, চাইনা যে আমরা anatomical accuracy বা Law of perspective! আমরা আমাদের নিজস্বটা,—তা সে যতটাই হোকনা—বিশ্বমানবের পাদপীঠরূপ খুব একটা বড় এবং পণ্ডিতগণের অভিমত জায়গায় সযত্নে হাজির না করে দিয়ে এই যে অবাধে ফুটে উঠতে চাচ্ছি, আনন্দের বীজ মুঠো মুঠো আবীরের মত যথা-তথা বিকীর্ণ করে মর্‌তে চাচ্ছি, আমরা বাবাজীদের তুলসীমঞ্চে বাবুদের সখের মাণঞ্চে যে বাঁধা পড়তে চাচ্ছিনে, এই যে আমাদের যা-তা নিয়ে আমরা যা-খুসি-তাই করতে চাচ্ছি এর জন্য কথা আমাদের অনেক শুনতে হবে;—শিল্পাচার-ভ্রষ্টতা মূর্খতা ইত্যাদি অনেক কথার ইট্-পাট্‌কেল এবং আরো কত কি তার ঠিকানা কি! কিন্তু আমরা যেন ভুলি না যে আমাদের প্রাণের একতারা প্রাণেশের হাতে দিলে তবেই তাতে নিত্যসুরের ঝঙ্কারটি উঠবে, নইলে কেবলি ওস্তাদি হুঙ্কার। "প্রেম হদ্দ তজী জব ভাই, সত্তলোক কী হদ্দ পুর্ণি আই।"—প্রেম যখন সীমাকে ত্যাগ করে তখন সে সত্যলোকের সীমায় আসে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গোয়েন্দা গ্রেভস্

"জার্ম্মাণ-গুপ্ত-কার্য্য-বিভাগের" বিখ্যাত গোয়েন্দা আর্মগার্ড কার্ল গ্রেভসের চমকপ্রদ গুপ্ত কার্য্যাবলীর একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ গত মাসের "ভারতীতে" দেওয়া হইয়াছে। এই সংখ্যায় আমরা গ্রেভসের নবপ্রকাশিত পুস্তক হইতে তাঁহার আর একটী গোয়েন্দা-গিরির বিবরণ দিতেছি।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ফ্রান্সের উপনিবেশ মরক্কো লইয়া জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের মধ্যে মনোমালিন্য এবং সেই সূত্রে ইংলণ্ডেরও সহিত জার্ম্মাণির যুদ্ধ-সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু কাইসার উইলিয়মের আদেশে এবং গোয়েন্দা গ্রেভসের কার্য্য-তৎপরতায় কি করিয়া এই বিষম যুদ্ধের আশঙ্কা দূর হইয়া যায়—এই প্রবন্ধটী তাহারই বিবরণ। গ্রেভস্ লিখিতেছেন:—

আজ কয়েকদিন হইল বার্লিনে আসিয়াছি। খাটিয়া খাটিয়া জানটাও যায়-যায় হইয়া

উঠিয়াছে। এখন আর অন্য কোন কাজকর্ম্ম নয়—দিনকয়েক খুব ফুর্ত্তিতে আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া ভারগ্রস্ত মনটাকে হাল্‌কা করিয়া ফেলিতে হইবে।

কিন্তু সেদিন একটা ভোজনালয়ে আহার করিয়া বাড়ীর সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে আমার 'বয়'টী তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়াই বলিল, "অনেকক্ষণ হ'ল টেলিফোনে আপনার ডাক পড়েছে—১১ নম্বর থেকে ক্রমাগত ডাক আসচে।"

১১ নম্বর! আমি চমকিয়া উঠিলাম—সে যে Foreign Officeএর টেলিফোন নম্বর! নিমেষে আমার মাথা হইতে আমোদ প্রমোদের সুখস্বপ্ন কর্পূরের মত উবিয়া গেল—পৃথিবীর কোন্ অংশে আমাকে যাইতে হইবে, সেই চিন্তাই তখন আমার মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তখন ১৯১১ খৃষ্টাব্দের জুন মাস—ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন—জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ একেবারে আসন্ন; 'জনবুল'ও নিশ্চেষ্ট হইয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া নাই। এদিকে জার্ম্মাণিতেও মরক্কো লইয়া দিনরাত তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। চারিদিকে সকলেই যুদ্ধং দেহি বলিয়া ক্ষেপিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমি Foreign Officeএর দিকে চলিলাম; সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রিভিকাউনসিলের সভ্য কাউণ্ট ওয়েডেলের সম্মুখে লইয়া গিয়া আমাকে হাজির করা হইল।

নমস্কারের পর কাউণ্ট বলিলেন—"সাড়ে ১১ টার সময় তোমাকে আর একটী ঘরে লইয়া যাওয়া হইবে—সেখানে তোমাকে যে সকল প্রশ্ন করা হইবে তুমি তাহার উত্তর দিবে,—কিন্তু সাবধান, নিজে যেন কোন প্রশ্ন করিয়া বসিওনা—এখন বুঝিতে পারিতেছ?"

'হাঁ" বলিয়া আমি কাউণ্টকে পুনর্ব্বার নমস্কার করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই আর একটি লোকের সঙ্গে আমি সিঁড়ি ও দরদালান পার হইয়া এক সশস্ত্র প্রহরীরক্ষিত বৃহৎ কক্ষের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরটি দুইভাগে বিভক্ত। তাহার একদিকটা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত,—আমরা সেই দিকেই দাঁড়াইয়াছিলাম। অন্যদিকটা প্রায় অন্ধকার। কেবল একটা প্রকাণ্ড টেবিলের উপরে একটি দীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল মাত্র। আমার সঙ্গী টেবিলের দিকে চাহিল। এবং চাহিয়াই, সচকিত হইয়া যেন শ্বাসরোধ করিয়া সে জড়সড়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই আকস্মিক উত্তেজনার কোন সঙ্গত কারণ না পাইয়া আমিও ফিরিয়া দেখিলাম। একি! সেই প্রকাণ্ড টেবিলের পিছনে স্তিমিত দীপালোকে স্বয়ং জার্ম্মাণ-সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেল্‌ম্ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন!

পাঁচমিনিট কাটিয়া গেল—তথাপি সেই নিস্তব্ধ-গম্ভীর মূর্ত্তিটী একাগ্রচিত্তে ক্রমাগত কি লিখিয়া যাইতেছিল। আমাদের দিকে সম্রাট একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। আমি ভীরু নই! যে কাজ আমি করি, সে কাজে লোহার মত শক্ত বুকের দরকার। কিন্তু আমার জান্ কড়া হইলেও, আজ পৃথিবীর

এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের নীরব অবহেলার সুমুখে এইরূপ একা নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে আমার মনেও কেমন একটা অজানা ভয়ের সঞ্চার হইল।

চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। হঠাৎ সম্রাট তাঁহার চেয়ারের উপরে ঘুরিয়া বসিলেন এবং উগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "আমি গ্রেভস্‌কে দেখ্‌তে চাই।"

আমার সঙ্গীকে ঘর থেকে সরাইয়া দেওয়া হইল। আমি একেবারে সম্রাটের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। য়ুরোপের এই যুদ্ধ-বিধাতাকে এর আগে এত কাছে আমি আর কখনও পাই নাই। তিনি যেন তখন অত্যন্ত চিন্তান্বিত। তাঁহার দেহ বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ হইলেও, তাঁহার ফটোর চেহারার চেয়েও তাঁহাকে যেন বৃদ্ধ দেখাইতেছিল। তাঁহার আকৃতির সহিত ফ্রেডারিক দি গ্রেটের একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাইলাম। সম্রাটের যে চোখ আমি আজ দেখিলাম, তাঁহার কোন তুস্‌বিরে আমি তাহা দেখি নাই। সেই নীলাভ ধূসর চক্ষের শীতল দৃষ্টিতে একটা গাম্ভীর্য্য, একটা হৃদয়স্পর্শী ভাব ছিল। লর্ড কিচেনার ও লি হাং চাং প্রভৃতি যাঁহারা পৃথিবী-শাসনে সুপটু, তাঁহাদেরও চোখ এই রকম।

ইতিমধ্যে সম্রাট মুখ তুলিয়া চাহিলেন ও কিঞ্চিৎ কর্কশ স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বিভাগে তুমি কতদিন হইল, কাজ করিতেছ?

"আজ্ঞে, তিন বৎসর।"

"তুমি "মরক্কো" জান?"

"আজ্ঞে, হাঁ হুজুর!"

"সেখানে কতদিন ছিলে?"

"তিন বৎসর।"

ইহার পর সম্রাট কাউণ্ট ওয়েডেলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা একে দিয়াই কাজ চলিবে, চিঠিপত্র প্রস্তুত কর।" সম্রাট তাঁহার স্বভাবগত আকস্মিকতার সহিত হঠাৎ চেয়ারের পিছনে হেলিয়া পড়িয়া আমার দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন—"কাগজে যা লেখা আছে মুখস্থ কর—অন্যান্য চিঠিপত্র ছাড়া, এই মৌখিক সংবাদটী তোমার যুদ্ধজাহাজ Pantherএর কাপ্তেনকে দিতে হইবে।" সম্রাট আমার হাতে এক টুকরা কাগজ দিলেন।

Panther—জার্ম্মাণির বিখ্যাত যুদ্ধ-জাহাজ—স্পেনের উপকূলে অবস্থান করিতেছিল—এবং ঠিক ছিল, এই Panther মরক্কোয় গিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবে।

আমি আর কোন কথা না বলিয়া প্রাণপণে সম্রাটের লিখিত আদেশ মুখস্থ করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সম্রাট বলিলেন—

"মুখস্থ হইয়াছে?"

আমি বলিলাম—"হাঁ।"

সম্রাট তখন আমার হাত হইতে কাগজখানি লইয়া দিয়াশলায়ের শিখায় ধরিলেন; নিমেষের মধ্যে কাগজখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

সম্রাটকে নমস্কার করিয়া আমি কাউণ্ট ওয়েডেলের কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। তিনি আমার হাতে শিলমোহর করা এক-তাড়া কাগজ দিয়া বলিলেন, "গ্রেভস্, আজ

তুমি এক অতি গুরুতর ব্যাপারে হাত দিয়াছ। চারিদিকে এখন যুদ্ধের কিরূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছে সে কথা বোধ করি তোমাকে আর বেশী বুঝাইতে হইবে না; যে কাগজ দিলাম, তা তুমি আসচে কাল বেলা ১২ টার সময় প্যারির জার্ম্মাণ রাজদূতকে দিবে। সেখান থেকে আবার অন্য কাগজ লইয়া মাদ্রিদের জার্ম্মাণ-রাজদূতকে দিতে হইবে—তারপর একেবারে বার্সিলোনা;—বার্সিলোনার কিছুদূরে আমাদের যুদ্ধজাহাজ Panther আছে—জাহাজের কাপ্তেনকে সম্রাটের মৌখিক খবরটী দিবে। সেখান হইতে তোমাকে জিব্রালটার গিয়া ইংরাজের নৌশক্তির খবর আনিতে হইবে। এখনি তোমাকে টাকা পাঠাইয়া দিতেছি—মনে থাকে যেন, এ টাকা সম্রাট নিজে দিতেছেন—গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে দেওয়া হইতেছে না।”

আমি বাড়ীতে আসিয়া দেখি, আমার চালাক চাকরটী চটপট্ সব ঠিকঠাক্ করিয়া রাখিয়াছে—মোটবহর সমস্ত প্রস্তুত; গাড়ীতে উঠিলেই হয়। সঙ্গে cayenne pepper-এর গুঁড়া ও আর দুই একটী রাসায়নিক পদার্থ লইতেও ভুলিলাম না। কারণ, বিপদে পড়িলে আমি কখনও পিস্তল ব্যবহার করি না—লোকের চোখে-মুখে আচ্ছা করিয়া এই গুঁড়া ঝাড়িয়া দিয়া লোককে মুহূর্ত্তের মধ্যে অজ্ঞান করিয়া ফেলি।

আমি যে কামরায় উঠিলাম, সেই কামরায় একটী মহিলা ও দুটী ভদ্রলোকও উঠিলেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে কিছুক্ষণ পরে মহিলাটী কাতর স্বরে হঠাৎ আমাকে বলিলেন যে, একজন ভদ্রলোক তাহাকে অনেকক্ষণ হইতে অপমান করিতেছে। মহিলাটীর মান রক্ষা করিবার জন্য আমি তাহার জিনিষপত্র আমার নিকটে লইয়া আসিলাম। কিন্তু ভদ্রলোকটী হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া বলিল, “কিহে বাপু, আমার স্ত্রীর জিনিষপত্র কার হুকুমে তুমি সরিয়ে এনেছ?” মহিলাটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে দুষ্টামির হাসি হাসিতেছে। আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইহারা ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে বিপদে ফেলিবার মৎলোবে আছে! তাইত! তবে কি ইতিমধ্যেই এরা আমার গুপ্তকার্য্যের খবর পাইয়াছে!

এমন সময়ে “গার্ড” আসিয়া উপস্থিত হইল। ভদ্রলোকটীর কাছে সব কথা শুনিয়া সে আমাকে একটী কামরায় বন্দী করিয়া রাখিল এবং সিধা ভাষায় স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল যে, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই সে আমাকে ষ্টেশনমাষ্টারের হাতে সঁপিয়া দিতে কিছুতেই ভুলিবে না!

আমি ত' মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। যেমন করিয়া হউক, আমাকে প্যারিতে যে পৌঁছিতেই হইবে! তারপর, Panther এর কাপ্তেনের নিকট সংবাদ না লইয়া গেলে, যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী। পথে যদি পাঁচ ছয় ঘণ্টা দেরী হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ বন্ধ করিবার আর কোন উপায় থাকিবেনা।

ট্রেন কোলনে আসিলে আমি ষ্টেসন মাষ্টারকে বলিলাম, “আমাকে আটক করিয়া রাখুন, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মনে থাকে যেন জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের

কোন বিশেষ দরকারি রাজকার্য্যে আমি যাইতেছি—ক্ষতি হইলে আপনি দায়ী।"

ষ্টেসনমাষ্টার আমার কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে মুক্তি দিলেন। পথিমধ্যে আর কোন বিপদ হয় নাই। কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, সেই লোক-গুলা কেমন করিয়া আমার গতিবিধির সন্ধান পাইয়াছিল!

যাহা হউক, প্যারি এবং মাদ্রিদের কার্য্য শেষ করিয়া আমি বার্সিলোনায় উপস্থিত হইলাম। তাহার পর অনেক কষ্টে Panther এর কাপ্তেনের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সম্রাটের আদেশ জানাইলাম। সে আদেশ এই:—"পান্থার যখন মরক্কোয় গমন করিবে, তখন যেন সে কোন কারণেই ইংরাজ কিম্বা ফ্রান্সের সহিত অসদ্ব্যবহার না করে। ইংরাজ কিম্বা ফরাসীরা অপমান করিলেও তাহাকে তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। কোনমতেই 'পান্থার' যেন যুদ্ধঘোষণা না করে।"

'পান্থারে'র কাপ্তেন এ আদেশ পাইয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। কারণ, পুর্ব্বের আদেশের সহিত বর্ত্তমান আদেশের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আগে হুকুম ছিল যুদ্ধঘোষণা করা, আর এখনকার হুকুম হইতেছে যুদ্ধ থামাইয়া দেওয়া।

ইহার পরের ঘটনা ইতিহাস-পাঠকের জানা আছে। ৭ই জুলাই 'পান্থার' মরক্কোর Agadir এ আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আগুন জ্বলিয়া উঠিল—জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতেই হইবে। 'পান্থারে'র সম্মুখে একখানা ইংরাজ ও আর একখানা ফরাসী যুদ্ধজাহাজ আসিয়া তাহাকে আদেশ করিল, "এই মুহূর্ত্তে 'আগাডির' ত্যাগ কর, নতুবা বল-প্রয়োগ করা হইবে।"

'পান্থার' যদি তাহাদের হুকুম না মানিত! তাহা হইলে 'আগাডিরে' যে আগুন জ্বলিত, তাহা সমস্ত ইউরোপকে একেবারে ছারখার করিয়া ফেলিত। কিন্তু 'পান্থার' ভালমানুষের মত 'আগাডির' হইতে তৎক্ষণাৎ বিদায়গ্রহণ করিল।

এই বিরাট যুদ্ধ বন্ধ করা জার্ম্মাণ সম্রাটের পক্ষে এক বহুদর্শিতার কার্য্য বলিতে হইবে। আর, এই গুরুতর কার্য্যের প্রধান সহায়ক ছিলাম আমি! সম্রাট সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, ফরাসীর সহিত ইংরাজেরা কোন গুপ্ত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ আছে। কিন্তু, সেই সন্ধির বন্ধন কতটা দৃঢ়, এবং ফরাসীরা বিপদে পড়িলে ইংরাজেরা বাস্তবিকই তাহা-দিগকে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিবে কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। জার্ম্মাণ-সম্রাট মরক্কোতে 'পান্থার'কে পাঠাইয়া এক চালেই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। জানা গেল যে, ইংরাজেরা সত্যসত্যই ফরাসীদের সহিত লুকাইয়া সন্ধি করিয়াছেন। এবং ফরাসীরা বিপাকে পড়িলে ইংরাজেরা কায়-মনোবাক্যে সাহায্য করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

রাজা ভড়ং

(সুর—"I am a marvellous eastern king").

পায়েতে লপেটা, শিরেতে তাজ
অধুনা শ্রীশ্রী—শ্রীমহারাজ—হুম্!
রাজা ভড়ং!

গদি পাওয়াবধি খুব কড়া
নিছি নিজহাতে—গড়গড়া—হুম্!
রাজা ভড়ং!

মম কুল বুঝি সূর্য্যকুল্—
তাই তো গোলালো—নাইক ভুল—ভ্রম্
রাজা ভড়ং!

ঘোম্টা-পুঁটুলি রাণীরা মোর
চলে দাপটিয়া ঝম্ ঝমর—ঝম্
রাজা ভড়ং!

বিষম-সমর-জবর-জং
ইঁদুর নড়িলে গা করে ছম্—ছম্!
রাজা ভড়ং!

তাকিয়াটি ভারি দরকারী
আমি ট্যাঁড়সের তরকারীর—যম
রাজা ভড়ং!

সফরে যখনি চলি স্বয়ং
ফটাফট্ ফোটে পটকা চম্—চম্!
রাজা ভড়ং!

হাতী চ'ড়ে ফিরি পাই খাতির
আমাতে ছেলেরা দেখে হাতীর—ঢং
রাজা ভড়ং!

জঙ্গলে থাকি জংলী নই
চাঁদা সই করে দিতে না হই—গম্
রাজা ভড়ং!

বাজাতে জানি মাদল অহং
হাঁকাইতে আমি পারি গো টম্—টম্
রাজা ভড়ং!

বিদ্যে "কুড়ো বা লিজো" গো
হুনর দেখাতে ইচ্ছে গো,—কম্?
রাজা ভড়ং!

ভুঁড়ি নিয়ে কিছু আছি কাবু
পাশ ফিরে শুতে যায় বাপু—দম্!
রাজা ভড়ং!

লাগিনে কোনো প্রয়োজনেই
বাড়িয়া চলেছি ওজনেই—হুম্!
রাজা ভড়ং।

মির্চ্চা ছাতুতে কচরকুট
শিরেতে মুরেঠা চরণে বুট—সং।
রাজা ভড়ং!

ভাংচিতে ভুলে ছাড়িনি ভাং
না চ'লে চলেছি সোজা জাহান্—নম্
রাজা ভড়ং!

আমি স্বয়ং রাজা ভড়ং
ভাড়াটে ভড়ঙ্ ও ভাঙেতে ভম্
যদিচ খেতাবী প্রতাপী তথাপি
বেশক্ই পোসাকী—রাজা ভড়ং!



—"মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য,—" রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

গান্ধী-পত্নীর সম্বর্দ্ধনা

গান্ধীপত্নী শ্রীযুক্তা কস্তুরাবাই দেবীর সম্বর্দ্ধনার জন্য মেরি কার্পেন্টার হলে বিগত চৈত্র মাসে বঙ্গরমণীগণের যে সভা হয়, সেই সভায় শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলির ইংরাজী অভিভাষণের পর শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নিম্নলিখিত অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন।— *

যাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে, যাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আজ এই নারীমণ্ডলী এখানে সমবেত, এই ভারত-রমণী কস্তুরাবাই দেবী, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের একটি জ্বলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত; আত্মোৎসর্গের আদর্শে ইনি সমগ্র জগতের বরণীয়া। ইঁহাকে অভিনন্দনের সুযোগ পাইয়া আজ আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

ইঁহার স্বামী ভারতগৌরব শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী, গান্ধী নামেই বিশ্ববিখ্যাত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বদেশবাসীর সম্মান রক্ষা এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার সমর্থন উদ্দেশ্যে ইনি যেরূপ অসহ্য কষ্টদুঃখ অকাতরে সহ্য করিয়াছেন, তাহা যেন কল্পনা-চিত্রেও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। অথচ তাহার এক কণাও কল্পিত নহে, সকলি সত্য।

আপনারা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় এক ভারত-সম্রাটের প্রজা হইয়াও, জাতি-বিদ্বেষ এবং শাদা কালোর পার্থক্যবিচারে ভারতবাসীর কষ্ট দুঃখের সীমা ছিল না। সেখানে বসবাসের জন্য আফ্রিকানিবাসী ভারতসন্তানকে প্রতি পদে লাঞ্ছিত অপমানিত হইতে হইত। গোরা প্রজার প্রতি সেখানে আইন আদালতের ব্যবস্থা ছিল এক রকম, আর কালো ভারতবাসীর প্রতি অন্য রকম,—লগুড়াঘাতই তাহার পক্ষে ছিল বৈধ ব্যবস্থা।

এই অবিচারের বিরুদ্ধে গান্ধী ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এ যুদ্ধে অস্ত্র নাই শস্ত্র নাই, বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন বা অত্যাচার নাই,— ইহাতে যত কষ্ট দুঃখ কেবল নিজের। 'আমি এই অন্যায় আইন মতে চলিব না, আমাকে তোমরা মার ধর যাহা ইচ্ছা কর, তথাপি এ অন্যায় আইন মানিব না; আইন বদল হৌক এই আমার প্রার্থনা।—' এই তাঁহার যুদ্ধের মূলমন্ত্র। ভারতবাসী অনেকেই সেদেশে তাঁহার পথ অনুসরণ করিল—তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।—কতিপয় সদাশয় বিদেশীও তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে সহায় হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে পুণ্যপ্রাণ পোলক মহোদয়ের সহিত আমরা সুপরিচিত। তিনি একাধিকবার এই বিষয়ে সহানুভূতি লাভ উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় গোখলেও গান্ধীকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। গান্ধী গোখলে প্রভৃতি মহারাষ্ট্র সন্তানগণ আত্মোৎসর্গের মহত্ত্বে ভারতের শীর্ষস্থানীয়।

গোখলে বলিয়া গিয়াছেন, 'বঙ্গদেশ ধন্য কেননা, জগদীশ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।' আমরা বলিব, মহারাষ্ট্র ধন্য; কেননা গান্ধী, গোখলে, রাণাডে প্রভৃতি মহাত্মাগণের জন্মভূমি মহারাষ্ট্র দেশ। ইঁহারা আত্মোৎসর্গের মহিমায় সমগ্র ভারতভূমিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। যেদিন দেখিব বঙ্গবালকগণ, বঙ্গযুবকগণ, হত্যা-মন্ত্র ভুলিয়া, অত্যাচারব্রত ত্যাগ করিয়া গান্ধীর আদর্শে নির্ভীকভাবে সহিষ্ণু ধর্ম্মব্রত অবলম্বন করিয়াছে; সেইদিন বুঝিব বঙ্গদেশের কল্যাণদ্বার সত্যই আমাদের নিকট উন্মুক্ত।

গান্ধীর সাধনা প্রকৃতই ঋষিজনোচিত। তাঁহার সংকল্পের ফলে অসংখ্যবার তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে, বন্দীরূপে রাজপথে ধাঙ্গড় মেথরের কাজ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু কোন কষ্টই কোন অপমানই এই সাহসী পুরুষকে তাঁহার দৃঢ় সংকল্পে তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। গান্ধী-প্রমুখ ভারতবাসীর নিরত্যাচার সাধনার বলে অবশেষে

---

* স্থানাভাবে বৈশাখের ভারতীতে ইহা প্রকাশের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। — ভাঃ সং।

এখন আফ্রিকা-গভর্ণমেণ্ট অনেকাংশে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। স্বদেশবাসীর দুঃখ হরণে তাঁহাদের দুঃখ কষ্ট আজি সার্থক; তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ আজি সমগ্র ভারতের আনন্দের কারণ।

কিন্তু গান্ধীর সেই দুঃখের দিনে, অসম-সংকল্পে, সহিষ্ণুতাব্রতে কে তখন তাঁহাকে অটল বল দিয়াছিলেন! অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার সাহায্য করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সহজ-পালনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন যিনি, তিনি কে? তিনি তাঁহার এই সাধ্বী পত্নী, সুখ দুঃখের, ব্রত সংকল্পের ভাগী, জীবনের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, মহারমণী কস্তুরাবাই। স্ত্রী যদি স্বামীর সৎসাহস ও সৎকার্য্যের সহায় হন তবেই পুরুষের জীবন সর্ব্বতোভাবে সার্থক হয়। শিক্ষার অভাবে চরিত্রবলের অভাবে স্ত্রী কত সময় স্বামীর সহায় না হইয়া তাঁহার সদনুষ্ঠানে বাধাপ্রদান করেন—এ দৃষ্টান্ত এদেশে কেন, সকল দেশেই বিদ্যমান। শ্রীমতী কস্তুরাবাই সুযোগ্য স্বামীর সুযোগ্যা পত্নী। ইনি সেই সুদূর প্রবাসে নিরন্তর অত্যাচার কারাবাস লাঞ্ছনা প্রভৃতি সহ্য করিয়াও স্বদেশবাসীর হিতসাধনায় স্বামীর সহিত কায়মনে এক হইয়া কাজ করিয়াছেন। এই সকল ক্ষণজন্মা নর নারী কোন দেশের বা কালের বিশেষ সম্পত্তি নহেন, ইঁহারা জগৎগৌরব। তবে ইঁহাদিগকে আত্মীয় জ্ঞানে দেশবাসী ক্ষুদ্র আমরাও গৌরব অনুভব করি। এই মহারমণী জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় যেরূপ অটল ধৈর্য্যের সহিত কষ্টে দুঃখে, অভাব-দৈন্যে আপনার মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া প্রসন্ন অন্তঃকরণে স্বামীর অনুবর্ত্তী হইয়াছেন তাহা পুরাতন দিনের গল্পের কথা নহে, আজিকার দিনের সত্য ঘটনা, সত্য চিত্র।

সেই মহিমময়ী রমণীকে মুগ্ধ অভিভূতচিত্তে শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে বারবার অভিবাদন করি।

হে বরনারি, তোমার দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত কর। তোমার আদর্শ মহিমায় ভারতের প্রত্যেক গৃহ ক্ষুদ্রতর এবং উচ্চতর কর্ত্তব্য পালনে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

দৈব-পরীক্ষা।

ব্যবহার-শাস্ত্রই সভ্যতার প্রধান পরিমাপক। অপরাধ নিরূপণ করিয়া দোষীকে শাস্তিপ্রদানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, যে সমাজে আছে, সেই সমাজের লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি নিরাপদ। এবং ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির প্রচুর অবসরও সেখানেই বর্ত্তমান। কেবল তাহাই নহে, সমাজের অস্তিত্বও ঐ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি সমাজস্থ ব্যক্তিগণ অসঙ্গত উপায়ে পরস্পরের ধন প্রাণ নষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, তবে অল্পকালের মধ্যেই সমাজশরীর ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই মনুষ্যসমাজে দোষনিরূপণ করিয়া অপরাধীকে শাস্তি দিবার বহুবিধ নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু অনেক সময় দোষ নির্দ্দেশ করা এত কঠিন হয় যে, মনুষ্যবুদ্ধি উহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে না। এমন কি, অনেক বিষয়ে আধুনিক ব্যবহারবিদ্ মনীষীগণকেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠিতে হয়; অতএব, যখন একালের মত বিস্তৃত ও নির্দোষ ব্যবহার-শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, অনুসন্ধেয় বিষয়ের জটিলতা যখন সহজে লোকের বোধগম্য হইত না, তখন অপরাধী নির্ণয় যে কত দুষ্কর ছিল তাহা

সহজেই অনুমেয়। যে জাতি এই বিষয়ে যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, সভ্যতার গৌরব-লাভে তাহার ততই অধিকার।

প্রাচীন অনেক জাতির মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষগুণ পরীক্ষা করিবার কতকগুলি অদ্ভুত এবং অতিকঠোর নিয়ম প্রচলিত ছিল। বিচারকেরা যখন কোন মতেই অপরাধের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারিতেন না, তখন উহার মীমাংসার ভার দৈবসহায়ের উপর ছাড়িয়া দিতেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষ হয়, তবে তাহাকে বিপদে ফেলিয়া দিলে দৈবই রক্ষা করিবেন, নতুবা করিবেন না—এই বিশ্বাসই তখন বিচারকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিত। এই শ্রেণীর অপরাধ-পরীক্ষাকে দৈবপরীক্ষা বলা যাইতে পারে। বোধ হয় তখন মানুষের এ জ্ঞান জন্মায় নাই যে প্রাকৃতিক নিয়মের কোথাও নড়চড় নাই। অগ্নির দাহিকাশক্তি, বিষ-প্রয়োগের শোচনীয় পরিণাম প্রভৃতি যে সকল নিয়ম আমরা এখন অনিবার্য্য বলিয়া জানি, মানবসমাজের বাল্যকালে, ঐ নিয়মগুলি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ব্যর্থ হইতে পারে এই ধারণা প্রবল ছিল।

প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও দৈব-পরীক্ষা প্রচলিত ছিল, কেহ কেহ এমন অনুমান করেন। তাঁহারা বলেন যে সফোক্লীসের (Sophocles) Antigone নামক গ্রন্থে উহার আভাস আছে। (Chamber's Encyclopædia।) প্রাচীন ইহুদিদিগের মধ্যেও যে দৈবপরীক্ষায় বিশ্বাস ছিল তাহা বাইবেলের 'Number, V' অধ্যায়ে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানে ব্যভিচারে অভিযুক্ত একটী স্ত্রীলোককে মন্ত্রপূত জলদান করিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে বলা হইয়াছে। Livingstone বলেন যে, আফ্রিকার নিগ্রোজাতির মধ্যে ঐরূপ এক নিয়ম প্রচলিত আছে। কোন নিগ্রো নিজের পত্নীর সতীত্বে সন্দিহান হইলে, তাহাকে এক প্রকার ভেষজরস পান করিতে দেওয়া হয়। যে স্ত্রী দোষী, ঐ রস পান করিলে তাহার রক্তবমন হইবে, যে নির্দ্দোষ তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না। নিগ্রোদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন রকমে ঐ প্রথা লক্ষিত হয়। এক শ্রেণীর লোকেরা কুক্কুট বা সারমেয়কে ঐ রস পান ও তাহাকে বমন করাইয়া অপরাধী নির্ণয় করে। ইউরোপের মধ্যযুগে অনেক প্রকারের দৈব পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ অগ্নি পরীক্ষা। ইহা কেবল সম্ভ্রান্ত অভিজাতগণের প্রতি প্রযুক্ত হইত। সন্দেহ-যুক্ত ব্যক্তিকে উত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ লৌহখণ্ড করতলে রাখিয়া কিয়দ্দূর অতিক্রম করিতে হইত; অথবা উত্তপ্ত লাঙ্গলের ফলক কতকগুলি মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় উত্তমরূপে বাঁধিয়া উহার উপর দিয়া তাহাকে নগ্নপদে হাঁটিয়া যাইতে বলা হইত। তাহার পর তাহার হস্ত অথবা পদ বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া তিনদিন পরে খোলা হইত। Hume বলেন যে, হাত পা বাঁধিয়া শীলমোহর করিয়া রাখা হইত (History of England vol I, p 175)। অতঃপর বন্ধন খুলিলে যদি ক্ষত বা কোন পোড়াদাগ না দেখা যাইত তবে আসামী নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। কাহারও

কাহারও মতে আসামীকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া গমন করিয়া আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে হইত। (Brand's Popular Antiquities, Vol. I. p. 309) লোকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবতারা নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে অগ্নির গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন।

তারপর জল-পরীক্ষা। ইহা সাধারণ লোকের জন্য। ইহা দুই প্রকার। ফুটন্ত জলের মধ্যে একখণ্ড পাথর রাখিয়া আসামীকে অনাবৃত হস্তে উহা তুলিতে বলা হইত। সময় সময় কনুই পর্য্যন্ত ডুবাইতে বাধ্য করা হইত। ইহাতে হাতের কোন অনিষ্ট না হইলে তাহাকে নিরপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইত।

আর একপ্রকার পরীক্ষা শীতল জলে হইত। আসামীকে কোন জলাশয়ের মধ্যে ফেলিয়া দিলে, যদি ভাসিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে হাত পা নাড়িতে দেখা যাইত, তবে সে দোষী; আর বিনাচেষ্টায় ভাসিলে সে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইত। এই পরীক্ষার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বড় কেহ নিস্তার পাইত না। কারণ জলে পড়িলে কেহ হাত-পা না নাড়িয়া থাকিতে পারে না। কোন কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিলে দোষী ও ডুবিয়া গেলে নির্দ্দোষ বলিয়া অব্যাহতি পাইত। কিন্তু অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেও ডুবিয়া মরার হাত হইতে নিস্তার ছিল না। ব্যাপারটা অনেকটা আগে ফাঁসি দিয়া পরে প্রাণদানের পরিহাসের মত!

ডাইনীদের বিচার জলপরীক্ষা দ্বারাও হইত। যাহার উপর লোকের সন্দেহ হইত, তাহাকে উলঙ্গ করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর সহিত এবং বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। (Brand's Popular Antiquities Vol. III) বলাবাহুল্য এরূপ অবস্থায় ডাইনীর আর বাঁচোয়া ছিলনা। ভাসিলে নিশ্চয়ই ডাইনী বলিয়া তাহাকে পুড়াইয়া মারা হইত, এবং ডুবিয়া গেলে আর তাহাকে উঠিতে হইত না; কারণ অনেকদূর না ডুবিলে লোকে মনে করিত সে ডুবিবার ভাণ করিতেছে। সাধারণের বিশ্বাস ছিল, ডাইনীরা সোলার মত জলে ভাসে, কিছুতেই ডুবিতে পারে না। ডাইনী পরীক্ষার আরও কতকগুলি বিচিত্র উপায় ছিল। নিকটস্থ কোন গির্জ্জার বাইবেল একদিকে আর তাহাকে একদিকে রাখিয়া ওজন করিলে যদি বাইবেল ভারী হইত তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইত। আবার ডাইনী সন্দেহে ধৃত স্ত্রীলোককে কাঁদাইয়া পরীক্ষা করা হইত। কারণ, লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ডাইনীরা তিন ফোঁটার বেশী চক্ষের জল ফেলিতে পারে না; তাহাও আবার বামচক্ষে, ডাইনীর ডান চক্ষে জল থাকে না! (Brand's Popular Antiquities Vol III).

যাহা হউক, সাধারণ অপরাধ বিচারের আরও অনেকপ্রকার উপায় অবলম্বন করা হইত। নরহত্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিমাত্রকেই মৃতদেহ স্পর্শ করিতে হইত। লোকে বিশ্বাস করিত গুপ্তঘাতক স্পর্শ করিবামাত্র মৃতদেহের ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব হইবে। ক্রমশঃ

দ্বারা একপ্রকার পরীক্ষা হইত। বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ে ক্রুশের সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। যে আগে নড়িত অথবা পড়িয়া যাইত, সেই দোষী বিবেচিত হইত। ক্রুশের আর এক প্রকার পরীক্ষাও ছিল। দুইখণ্ড কাঠ লইয়া একখানিতে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত করা হইত; পরে দুইখানিই পশমের মধ্যে জড়াইয়া গির্জ্জার বেদীর উপর রাখা হইত; তাহার পর পুরোহিত অথবা কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক একখণ্ড কাঠ উঠাইয়া লইত; যদি ক্রুশাঙ্কিত কাষ্ঠখণ্ড উঠিত, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইত। নচেৎ সেই দোষী। (Hume's History of England).

মন্ত্রপূত পিষ্টক খাইতে দিয়া আর এক প্রকার পরীক্ষা হইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী হইলে পিষ্টক তাহার গলায় আট্‌কাইয়া যাইত। কথিত আছে, কেণ্ট প্রদেশের এক ভূম্যধিকারী (Godwin, Earl of Kent) রাজভ্রাতাকে গোয়ালের ভিতরে হত্যা করিয়াছেন এই সন্দেহে ধৃত হইলে মন্ত্রপূত পিষ্টকদ্বারা তাঁহার পরীক্ষা হয়। ফলে উহা গলায় আটকাইয়া যাওয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তিনি মারা যান।

এই সকল অদ্ভুত প্রথাদ্বারা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে অনেক লোকের জীবন-মরণ নির্ণীত হইত। তৎপরে ক্রমে ক্রমে উহার লোপ হয়। ইউরোপের অন্যত্র ঐ প্রথা আগেই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে দৈবপরীক্ষা প্রচলিত ছিল। বৈদিকযুগে এই প্রথাদ্বারা অপরাধ নির্ণয় হইত। আসামীকে আনিয়া, উত্তপ্ত কুঠার হাতদিয়া ধরিয়া থাকিতে বলা হইত। সে নির্দ্দোষ হইলে তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না, আর অপরাধী হইলে হাত পুড়িয়া যাইবে। (R. C. Dutt's History of Indian Civilisation. p. 187.)

রামায়ণ মহাভারতেও তখনকার লোকের দৈবপরীক্ষায় বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে দুইটী প্রধান দৃষ্টান্ত ঐ দুই গ্রন্থে আছে। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহাভারতে দেখিতে পাইবেন, পাণ্ডবগণ যখন কাম্যকবনে ছিলেন, তখন অর্জ্জুন একটি গাছের ফল মাটিতে ফেলিয়া দেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলিলেন যে, ঐ ফল আবার বৃন্তলগ্ন না হইলে সকলের অমঙ্গল হইবে। প্রত্যেকে মনের কথা সত্য করিয়া ব্যক্ত করিলেই উহা যথাস্থানে গিয়া উঠিবে, নতুবা নহে। তখন সকলে তাহাই করিলেন। দ্রৌপদীর প্রথমে মিথ্যাকথার জন্য ফলটী বৃন্তের কিছু নিম্নে আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। কিন্তু পরে সমস্ত সত্য বলিলে উহা আবার যথাস্থানে সংলগ্ন হইল। এইরূপ অলৌকিক উপায়েও ধার্ম্মিক লোকের নির্ম্মলতা প্রমাণিত হইতে পারে, সেকালে লোকের এই বিশ্বাস ছিল; উপাখ্যানটী বোধ হয় তাহারই প্রমাণ।

মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে জল ও অগ্নি পরীক্ষার বিধান আছে :—

"পঞ্চাশৎ পলপরিমিত এবং অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ অগ্নিসন্নিভ উত্তপ্ত অয়ংপিণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সপ্তপদ গমন করাইবে। উহাতে হস্ত দগ্ধ না হইলে

এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জল যদি তাহাকে ভাসাইয়া না তোলে, তবে সে নির্দ্দোষ জানিবে।” কিন্তু এই বিধান কেবল শূদ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইত। Vincent Smithএর মতে মনুসংহিতা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সময়েই যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশে ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপ বুদ্ধির গল্পেও আধিদৈবিক উপায়ে ন্যায় বিচার সম্পন্ন করিতে দেখা যায়। পাপবুদ্ধি ধনাপহারক স্থির করিবার জন্য অরণ্য-দেবতাকে সাক্ষ্য মানিয়াছিল এবং রাজ-পুরুষেরা উহাতে বিশ্বাস করিয়া দেবতার বাণী শুনিবার জন্য অরণ্যে গমন করিয়া-ছিলেন।

বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের বিবরণ পাঠ করিলে দৈবপরীক্ষার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের বিবরণে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু তাহার পরে এই বিষয় বৈদেশিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এক গ্রীক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য এক হ্রদ আছে। উহার জল সর্ব্বত্র জানু পর্য্যন্ত গভীর। বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ে ঐ জলে নামিয়া এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। যে নির্দ্দোষ তাহার জানুর উপর জল উঠে না, কিন্তু যে প্রকৃত দোষী সে কিছুদূর গেলেই তাহার মাথা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যায়। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন যে, ভারতবর্ষে এক পর্ব্বতের মধ্যে এক প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। উহার অভ্যন্তরে দ্বাদশহস্ত উচ্চ এক দেবমূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তির অর্দ্ধভাগ স্ত্রী ও অপরার্দ্ধ পুরুষের মত। উহার পশ্চাতে বহুদূর পর্য্যন্ত অন্ধকারময় পথ। তাহার পর এক দ্বার; তাহার মধ্য দিয়া নির্ম্মল জল-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। যাহারা ন্যায়ান্যায় পরীক্ষা করিতে আসে, তাহারা মশাল লইয়া ঐ অন্ধকার পথ দিয়া দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। যে নিষ্পাপ সে অনায়াসে দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করে, আর যে পাপী সে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেই দ্বার আপনা-আপনি রুদ্ধ হইয়া যায়। এই প্রকারে পাপ-পুণ্যের মীমাংসা হয় এবং অপরাধী ধরা পড়ে (M'crindle's Ancient India p. 173).। উক্ত গ্রন্থকার খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক বটে, কিন্তু তিনি যে গ্রন্থ হইতে আপনার উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, উহা পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

যুয়ন্‌চুয়াঙ চারিপ্রকার দৈবপরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম পরীক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থলির মধ্যে পুরিয়া একটি ভারি প্রস্তর-পাত্রের সহিত ঐ থলিটি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গভীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। যদি থলিটি ভাসে এবং পাথর ডুবিয়া যায় তবে আসামী নিরপরাধ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। যদি পাথর ভাসে আর লোকটী ডুবিয়া যায়, তবে সে-ই দোষী।

দ্বিতীয়তঃ অগ্নিদ্বারা পরীক্ষা। আসামীকে উত্তপ্ত লৌহাসনে বসান হইবে, উত্তপ্ত লৌহখণ্ড তাহার পায়ে এবং হাতের তলায় লাগাইয়া দেওয়া হইবে, অধিকন্তু তাহাকে জিহ্বাদ্বারা ঐ লৌহখণ্ড চাটিতে

হইবে, ইহাতে যদি শরীরের কোন স্থানে কোন দাগ বা ক্ষত হয় তবে সে দোষী সাব্যস্ত হইবে, নচেৎ নয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি রুগ্ন হইলে একটি ফুলের কুঁড়ি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যদি উহা ফুটিয়া ফুল হয়, তবে আসামী নির্দ্দোষ। পুড়িয়া গেলে সে দোষী।

তৃতীয় পরীক্ষা তুলাদণ্ডের সহায়তায়। আসামীকে একদিকে ও অপর দিকে একখণ্ড প্রস্তর দিয়া তুলাদণ্ড সমান করিয়া ওজন করিলে যদি আসামী নির্দ্দোষ হয় তবে তাহার দিক ঝুলিয়া পড়িবে, অন্যথায় বিপরীত হইবে।

চতুর্থ উপায় বিষপ্রয়োগ। একটী মেষের দক্ষিণ উরুতে ক্ষত করিয়া উহার মধ্যে নানাবিধ বিষ ও আসামীর খাদ্য একত্র করিয়া মিশাইয়া রাখা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি নিরপরাধ হয়, তবে ঐ মেষের কোন অনিষ্ট হইবে না, নতুবা তাহার মৃত্যু হইবে। (Beal, Western Records. Vol. II)

এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের নিকট উল্লিখিত বিচার-প্রণালী অদ্ভুত এবং বর্ব্বরোচিত বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর হিন্দুগণ এবং য়ুয়নচুয়াঙ নিজেও উহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখিতে পান নাই। কিন্তু, প্রাচীন সাক্সন-দিগের মধ্যে অগ্নিপরীক্ষা ও তৎপ্রকার অন্যান্য ব্যাপারে সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুরোহিতগণ যেরূপ নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিতেন, সেইরূপ এদেশেও হইত কি না তাহা বিবেচনার বিষয়।

য়ুয়নচুয়াঙের চারিশত বৎসর পরে আর এক বিদেশীর মুখে দৈবপরীক্ষার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। আলবেরুণী একাদশ শতাব্দীতে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের সপ্ততীতম অধ্যায়ে ছয় প্রকার কঠোর পরীক্ষার বর্ণনা আছে। (Sachace's Translation P 159.)

প্রথম উপায় এই। আসামীকে এক প্রকার বিষ পান করিতে দেওয়া হয়। তাহার কোন দোষ না থাকিলে, উহাতে অনিষ্ট হইবে না। আলবেরুণী বলেন, ঐ বিষের নাম "ব্রাহ্মণ" এবং উহা প্রাণ-নাশক। নামসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু বিষের গুণবিষয়ে ভ্রম না হওয়াই সম্ভব।

দ্বিতীয় উপায় পূর্ব্বকথিত জলে ডুবাইয়া মারারই রূপান্তর। আসামী কোন গভীর নদী অথবা কূপের নিকট গিয়া জলকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, "হে জল, তুমি দেবতাদিগের অধিকারস্থ। গুপ্ত ও ব্যক্ত সকল বিষয় তুমি অবগত আছ। অতএব আমি নিষ্পাপ হইলে আমার জীবন রক্ষা করিও, আর দোষী হইলে আমাকে সংহার করিও।" অতঃপর পাঁচজন লোকে তাহাকে ধরিয়া সবলে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পুণ্যবল থাকিলে তাহার রক্ষা, নচেৎ জল আর কোন কথা শুনিবে না।

এইরকম পরীক্ষায় নিরপরাধ লোকে কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাইত তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর; পক্ষান্তরে প্রকৃত অপরাধীর অব্যাহতি লাভের অতি সহজ উপায় ছিল।

একটু সাহস দেখাইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইত। আলবেরুণী অপরাধী সাব্যস্ত করিবার তৃতীয় উপায় এইরূপ বলিয়াছেন।

বাদী ও প্রতিবাদী উভয়কেই এক দেবমন্দিরে লইয়া যাওয়া হইত। প্রতিবাদী পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া বাদীর সহিত দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইত। তাহার পর পুরোহিত দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া সেই জল উভয়কে পান করিতে দিতেন। সে অপরাধী হইলে রক্তবমন হইত, নচেৎ কিছুই হইত না।

চতুর্থ পরীক্ষা অতি বিচিত্র। আসামীকে দাঁড়িপাল্লায় বসাইয়া ওজন করিবে। তারপর সে নামিয়া আসিয়া তেত্রিশকোটী দেবতার মধ্য হইতে যত জনের ইচ্ছা দোহাই দিবে এবং তাঁহাদের নাম একখণ্ড কাগজে লিখিয়া মাথায় বাঁধিবে। পুনরায় ওজন করিয়া যদি সে পূর্ব্বাপেক্ষা ভারী হয়, তবে সসম্মানে মুক্তিলাভ করিত তাহা না হইলে সে দোষী।

পঞ্চম পরীক্ষায় যে পড়িত তাহাকেই দাগী হইতে হইত। মাখন ও তিলের তৈল সমপরিমাণে লইয়া এক কটাহে রাখিয়া আগুনে ফুটাইবে। পরে একটী টাট্‌কা পাতা উহাতে ফেলিয়া দিলে যদি দেখা যায় যে উহা তৎক্ষণাৎ তৈল মধ্যে পুড়িয়া গিয়াছে, তবে পরীক্ষার সময় হইয়াছে জানিবে এবং একখণ্ড স্বর্ণ উহাতে ফেলিয়া দিয়া আসামীকে হাত দিয়া তুলিতে বলিবে। হাত যদি পোড়ে তবে তাহাকে অপরাধের শাস্তিগ্রহণ করিতেই হইবে।

আলবেরুণী ষষ্ঠ পরীক্ষাকেই কঠোরতম বলিয়াছেন। একখণ্ড লৌহকে এত উত্তপ্ত করা হইবে যে, উহা প্রায় গলিয়া যাইবার উপক্রম করিবে। তখন আসামীর হাতে কয়েকটী ধান রাখিয়া তদুপরি একটি বৃক্ষপত্র রাখিবে এবং তাহার উপরে ঐ অগ্নিবর্ণ লৌহ স্থাপন করিবে। আসামী উহা লইয়া সাত পা চলিলে যদি তাহার হাতের কোন অনিষ্ট না হয়, তবে সে নিরপরাধ। এই পরীক্ষা মনুতে বর্ণিত আছে। কিন্তু তখন শূদ্রের জন্যই ইহার ব্যবস্থা ছিল।

আবুলফজেলের মতে হিন্দুদিগের মধ্যে আট প্রকার দৈবপরীক্ষা প্রচলিত ছিল। (Gladwin's Ain-i-Akbari P. 740)। কাহারও কাহারও মতে বাদীই উক্ত পরীক্ষাদ্বারা নিজের অভিযোগের সত্যাসত্য নিরূপণ করিবে। প্রথম পরীক্ষা ব্রাহ্মণদিগের জন্য। আসামীকে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া নামাইয়া দিবে এবং কতিপয় ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া তাহাকে পুনরায় ওজন করিবে। যদি সে পূর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা হয় তবে সে নির্দ্দোষ, আর যদি ভারী হয় অথবা তুলাদণ্ড সমান থাকে, তবে সে-ই প্রকৃত অপরাধী।

দ্বিতীয় পরীক্ষা তপ্ত লৌহের, কিন্তু একটু নূতন রকমের। ষোল আঙ্গুল অন্তর রাখিয়া ৭টী বা ৯টী বৃত্ত মাটিতে অঙ্কিত করা হয়। যাহাকে পরীক্ষা করা হইবে সে স্নাত হইয়া আচারানুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করিলে তাহার দুই হাতের তালু একত্র করিয়া ৭টী অশ্বত্থ পত্র রাখিয়া রেশম দ্বারা ভাল করিয়া হাতদুটি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সেই অবস্থায় সাড়ে তিন সের ওজনের অগ্নিবর্ণ লৌহখণ্ড হাতে লইয়া আসামী একে একে

ঐ বৃত্তগুলির মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইবে। শেষবৃত্তে আসিলে লৌহদণ্ড ফেলিয়া দিতে পারিবে, কিন্তু যদি সে কিছুদূর আসিয়াই ফেলিয়া দেয়, তবে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। ইহাতে কোন অনিষ্ট না হইলে বিচারে তাহারই জয় হইল।

আবুল্‌ফজলের তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে অনেকক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ করিয়া রাখার অভ্যাস দরকার। যে এই পরীক্ষায় পড়িবে, তাহাকে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া নাভি পর্য্যন্ত জলে নামিয়া ডুব দিয়া থাকিতে হইবে। এদিকে এক ব্যক্তি ১০৬ আঙ্গুল দীর্ঘ এক ধনুকে তীর যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিবে এবং আর এক ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া উহা লইয়া আসিবে। এই সময় পর্য্যন্ত যে ডুব দিয়া থাকিতে পারিবে, বিচারে তাহারই জয় লাভ হইবে। এই পরীক্ষা কেবল বৈশ্যদের জন্য।

চতুর্থ পরীক্ষা বিষপ্রয়োগ, শূদ্রের প্রতি প্রযুজ্য। ঋতুবিশেষে বিষের পরিমাণের তারতম্য আছে। বিষের সহিত ত্রিশগুণ পরিমাণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া আসামীকে দক্ষিণমুখে দাঁড় করাইয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ করা হইলে অপর একব্যক্তি পূর্ব্ব অথবা উত্তরমুখী হইয়া তাহাকে উহা খাওয়াইয়া দিবে। দর্শকেরা পাঁচশতবার করতালি দিবার মধ্যে যদি বিষের কোন ক্রিয়া না হয় তবে আসামী মুক্তি পাইবে এবং বিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করা হইবে।

পঞ্চম উপায় দেবমূর্ত্তির স্নানের জলপান। চৌদ্দ দিনের মধ্যে কোন অপকার না হইলে আসামী নির্দ্দোষ জানিবে।

ষষ্ঠ পরীক্ষা এই প্রকার। মাটীর পাত্রে ষাটী (বা আশু) ধানের চাউল একরাত্রি রাখিয়া প্রভাতে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বমুখী করিয়া দাঁড় করাইয়া উহা খাওয়াইয়া দিবে। পরে অশ্বথ বা ভূর্জ্জপত্রে নিষ্ঠীবন ফেলিলে যদি তাহাতে রক্ত দেখা যায়, অথবা যদি তাহার মুখ ফোলে কিংবা দেহাদি কাঁপে তবে প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িয়াছে বলিয়া জানিবে। এখনও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এইপ্রকার চালপড়ার ব্যবহার সময় সময় দেখা যায়।

সপ্তম পরীক্ষা ফুটন্ত তৈল হইতে এক খণ্ড স্বর্ণ তুলিয়া লওয়া, আলবেরুণী ও আবুল্‌ফজলের বর্ণনারই মত।

অষ্টম পরীক্ষা অতি সহজ। বাদী প্রতিবাদী উভয়ে দুইখানা রূপার বা সীসার পাতের উপর অথবা ভূর্জ্জপত্রে "ধর্ম্ম" ও "অধর্ম্ম" এই দুইটী লিখিয়া পূর্ব্বে জল রাখা হয় নাই এমন একটি পাত্রে রাখিবে। তাহার পর যাহার ভাগ্যে "ধর্ম্ম" কথাটী উঠিল সেই জয়ী হইবে। এই প্রকার স্থূর্ত্তিখেলা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় বিলাতেও প্রচলিত ছিল। George Eliot এর Silas Marner নামক উপন্যাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মিল্‌ তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, নয়প্রকার দৈবপরীক্ষা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তুলাদণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, জলে নিমজ্জন, বিষপ্রয়োগ, দেবমূর্ত্তির স্নানের জল, চালপড়া, ফুটন্তুতৈল,

তপ্তলৌহ এবং দুইখানি ক্ষুদ্র দেববিগ্রহ লইয়া পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইত (Mill's History of India p. 195)। অন্য সব গুলিই আবুলফজলের বর্ণিত পরীক্ষার অনুরূপ; কেবল তিনটীর বর্ণনা অন্য রকমের।

মিল্-বর্ণিত অগ্নিপরীক্ষা এই প্রকার। নয় হস্ত দীর্ঘে, দুই বিঘত প্রস্থে এবং এক বিঘত গভীর এক গর্ত্ত করিয়া উহা অগ্নিপূর্ণ করিবে। অতঃপর অভিযুক্ত ব্যক্তি নগ্নপদে ঐ অগ্নির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবে। ইহাতে তাহার কোন অপকার না হইলে সে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইবে।

বিষ-পরীক্ষা দুই প্রকার—এক,আসামীকে বিষ খাওয়ানো। অপর পরীক্ষায় একটী বিষধর সর্পকে হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া একটী অঙ্গুরী বা মুদ্রা উহাতে ফেলিয়া দিবে। আসামী যদি নির্ব্বিঘ্নে হাঁড়ীর মধ্য হইতে উহা তুলিয়া লইতে পারে, তবে তাহার কোন দোষ নাই মনে করিতে হইবে।

শেষ পরীক্ষা দেবমূর্ত্তি লইয়া। একটী রূপার ও আর একটী সীসার ছোট মূর্ত্তি কোন গভীর পাত্রে রাখিবে; অথবা একখণ্ড সাদা আর একখণ্ড কাল কাপড়ে দুইটী বিগ্রহ অঙ্কিত করিয়া গোবরে পুরিয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিবে। যদি আসামী রৌপ্যমূর্ত্তি বা শ্বেত বস্ত্রখণ্ড সহজেই তুলিয়া লইতে পারে, তবে সে নিরপরাধ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে দৈবপরীক্ষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে মাত্র এক প্রকার; মনুর সময়ে দুইপ্রকার, (তাহাও শূদ্রের জন্য), কিন্তু ক্রমে সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া আট নয় প্রকার হইয়াছিল। ইহা দ্বারা ন্যায় বিচারের নামে যে কেবল নৃশংসতারই অনুষ্ঠান হইত তাহা নহে, সময় সময় অতি বীভৎস ব্যাপারও উহার সহিত মিশ্রিত থাকিত। ডাঃ বুকানন নামক একজন ইংরাজ লর্ড ওয়েলেস্‌লীর সময় দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিতে করিতে ইহার এক দৃষ্টান্ত দেখিতে পান। তিনি বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে যদি এক বর্ণের পুরুষ অন্য বর্ণের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়া পাপ গোপন করিত, তবে তাহার পরীক্ষার জন্য স্ত্রীলোকের শরীরে গলিত সীসা এবং পুরুষের শরীরে উত্তপ্ত লৌহ অতি কুৎসিত উপায়ে প্রযুক্ত হইত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে, নির্দ্দোষ ব্যক্তির উহাতে কোন অনিষ্ট হইবে না। (Mill's History of India, p. 195, note.) মিল্ বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া এ-কথা লিখেন নাই, ইহা সম্ভব; তিনি বুকাননের পুস্তকের পত্রাঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন এবং সমালোচক উইলসনও তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

ইউরোপে দৈব-পরীক্ষা যত শীঘ্র উঠিয়া গিয়াছিল, এখানে তত শীঘ্র যায় নাই। মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমে কমিয়া আসে এবং বোধ হয় ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বেই অনেকটা লোপ পাইয়াছিল। তবে স্থানে স্থানে পরেও লোকের উহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আজিও চালপড়া, বাটি চালান, হাতচালান, নলচালান প্রভৃতি

ব্যাপার নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। মানুষের মনে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে সহজে তাহা উৎপাটিত হয় না। তাহার উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি যে, সুসভ্য ইংলণ্ডেও নরহত্যা হইলে কৃষকদের মধ্যে মৃতদেহ স্পর্শ করিবার প্রথা আজিও বিদ্যমান আছে। স্পর্শ করিলে মৃতব্যক্তির প্রতি কোন বিদ্বেষ নাই, ইহা প্রমাণিত হইবে। আততায়ীর স্পর্শ মৃতদেহের লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইবে, এই প্রাচীন বিশ্বাসের আভাস ঐ প্রথায় পাওয়া যায়।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠাকুরঝি

গল্প

নীরজা রান্নাঘরে ঝোল সাঁৎলাইতেছিল,—শিবপ্রিয়া পা টিপিয়া অলক্ষ্যে আসিয়া তাহার মুখে খানিকটা মোহনভোগ পূরিয়া দিল। নীরজা ঘাড় ফিরাইয়া অনুযোগের সুরে কহিল, "ও কি ভাই, ঠাকুরঝি!"

শিবপ্রিয়া হাসিয়া কহিল, "কিছু মুখে দাও দেখি। নিজে থেকে ত খাবার কখনও ছুঁতে দেখলুম না!"

নীরজা হাত ধুইয়া ধোয়া জল কড়ায় ঢালিয়া সরিয়া আসিল, কহিল, "এই যে ঝোলটা নাবিয়ে রেখেই খেয়ে নিচ্ছি।"

"বাসি রুটি ত! সে আর তোমায় খেতে দিচ্ছি না। কেন বল তো,—আমি খাব লুচি মোহনভোগ, আর তুমি বাড়ীর বৌ, একটি বৌ, তুমি কতকগুলো বাসি রুটি গিলবে! কেন? মার সঙ্গে এই নিয়ে আজ খুব একচোট হয়ে গেছে, আমার।"

নীরজা ম্লান নেত্রে শিবপ্রিয়ার পানে চাহিল। সে দৃষ্টিতে করুণ মিনতি যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। কেন, তুমি আমার হইয়া ঝগড়া কর, ভাই? সে তাল সামলাইতে আমার যে প্রাণ বাহির হইয়া যায়! শিবপ্রিয়া তাহা বুঝিত, তাই সে কহিল, "আমি এবার তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। দেখি, মা তোমায় কেমন কিছু বলে!"

নীরজা শিহরিয়া উঠিল, কহিল, "না ভাই, না ঠাকুরঝি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

শিবপ্রিয়া একদৃষ্টে নীরজার পানে চাহিয়া রহিল। নীরজার সুন্দর মুখে ঘামের বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে; কপালের উপর মুক্ত কেশগুলা সে ঘামে ভিজিয়া বসিয়া গিয়াছে; আগুনের তাপে মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে! শিবপ্রিয়া কহিল, "আজ থেকে আর একলা তোমায় রাঁধতে দিচ্ছি না। আমিও রান্নায় যোগ দেব।" বলিয়া শিবপ্রিয়া উনানের দিকে অগ্রসর হইল।

নীরজা বাধা দিয়া কহিল, "না ভাই, তোমার সহ্য হবে না; অসুখ করবে।"

শিবপ্রিয়া সজোরে কহিল, "ওগো, না গো না, আমি মোমের পুতুল নই যে আগুন-তাতে গলে যাব!"

নীরজা কহিল, "তুমি দুদিনের জন্যে এখানে জিরুতে এসেছ—"

শিবপ্রিয়া কোপের ভাণ করিয়া কহিল, "বটে, আমার বাপের বাড়ী আমি এসেছি, কুটুম! তাই আমি সিংহাসনে দিবা-রাত্তির বসে থাকব, কুটোটি অবধি নাড়তে পাব না! ইস্ লো! না, আমার হাতের রান্না খেলে তোমাদের জাত যাবে? ওগো, তোমার ঠাকুরজামাই অখাদ্যি খেলেও সে মোছলমান নয়—বুঝলে?"

নীরজা জানিত, শিবপ্রিয়াকে ঠেকাইয়া রাখা দায়! সে যাহা ধরিবে, তাহা সে করিবেই। বিশেষ নীরজার কষ্ট এতটুকুও লাঘব করিবার জন্য শিবপ্রিয়া মায়ের উগ্র রোষানল হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া লইতে পারে। বড়লোকের ঘরে সে পড়িয়াছে,—বাপের বাড়ী বড় একটা আসিবার তাহার সুবিধা ঘটে না। এক বৎসর পরে কয়দিনের কড়ারে এবার সে বাপের বাড়ী আসিবার অনুমতি পাইয়াছে। মা মেয়েকে পাইয়া কোথায় রাখিবেন, কি তাহাকে পাঁচটা ভাল জিনিস খাওয়াইবেন, তাহা ভাবিয়া অস্থির আকুল হইয়া উঠিয়াছেন! পূর্ব্বে যেখানে শুধু স্নেহ ছিল, এখন সেখানে মন জোগাইবার পালা পড়িয়াছে। হৌক পেটের মেয়ে, তবু সে আজ বড়লোকের বৌ! এই কথাটাই মায়ের মনে সকলের চেয়ে বেশী জাগিতেছিল। তাই মা মেয়ের জন্য অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মেয়ে কিন্তু দেখিতে পাইল, তাহার আদরের ঘটায় বেচারী নীরজার পরিশ্রমের সীমা নাই। আবার শুধু তাহাই নহে। মুখ টিপিয়া এতখানি যে খাটিয়া সারা হইয়া যাইতেছে, তাহার উপর জুলুমেরও কি অন্ত আছে! আবার শুধুই জুলুম? শিবপ্রিয়া নারী—সে জানে, সংসারের কাজে নারী যতই খাটিয়া সারা হোক না কেন, সে খাটুনি কিছুই তাহার গায়ে লাগে না, যদি এ সকল খাটুনির পিছনে স্বামীর ভালবাসায় জুড়াইবার একটা আশ্রয় থাকে! কিন্তু এ ক্ষেত্রে নীরজার ভাগ্যে তাহারও অভাব। প্রবল-প্রতাপ ভাই তাহার স্ত্রীর ভালবাসার ধার মোটেই ধারিত না। বৌ যখন গভীর রাত্রে পরিশ্রমান্তে জুড়াইবার জন্য ঘরের কোণে গিয়া আশ্রয় লয়, ভাই শ্রীপতি তখন নীচ ও জঘন্য আমোদ-প্রমোদের চেষ্টায় বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। মার সেদিকে শাসন ত মোটেই নাই, বরং তিনি ছেলেকে এ বিষয়ে একরূপ প্রশ্রয়ই দিয়া আসিতেছেন!

বহুদিন পরে ভাইয়ের সংসারে আসিয়া এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া শিবপ্রিয়ার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিল, দূর হোক, এখনই চলিয়া যাই! কিন্তু না, বেচারী নীরজা! নীরজার প্রতি সুগভীর মমতাই তাহাকে এখানে আটকাইয়া রাখিল। সে ভাবিল, নীরজার সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া তবে সে এখান হইতে নড়িবে! এমন লক্ষ্মী বৌ—তাহার এমন দুর্দ্দশা! ঘরের লক্ষ্মী যেখানে কাঁদিয়া দিন কাটায়, সে সংসারের উচ্ছেদ হইতে কতক্ষণ!

তাই বৌয়ের পক্ষ লইয়া মায়ের সহিত সে ঝগড়া সুরু করিল। স্বামি-সৌভাগ্যের দুর্জ্জয় বর্ম্ম তাহাকে বিপুল শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছিল। মাকে সে স্পষ্টই বলিল, "তোমার আস্কারাতেই ত দাদার এতখানি বাড় হয়েছে!"

মা বলিলেন, "তা যা বল, বাপু, শ্রীপতি আমার এ-কালের ছেলেদের মত বেহায়া নয়—যে, বৌকে মাথায় তুলে নাচবে!"

শিবপ্রিয়া রাগিয়া বলিল, "নাঃ, বৌকে দু'পায়ে থেঁৎলানোটাই ভারী পৌরুষের লক্ষণ!"

মা বলিলেন, "বৌ বৌই আছে, খাচ্ছে পরছে—ব্যস! আবার কি। কিসের তার আর অভাব রইল, শুনি! মেমেদের মত সোয়ামীর হাত ধরে গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে না কি! না, পাঁচটা মজলিশে ধেই ধেই করে নাচতে ছুটবে?"

বৌ-সম্বন্ধে মাতার এই আশ্চর্য্য ধারণার কথা শুনিয়া শিবপ্রিয়া অবাক হইয়া গেল, কিন্তু দমিল না। সে ভাবিল, কিছুতেই ছাড়া হইবে না—এ গাঙ্গে তরী যখন ভাসাইয়াছে, তখন শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া কূলে সে পৌছিবেই! ভাইকেও একদিন কাছে পাইয়া সে বেশ চড়া রকমের দশটা কথা শুনাইয়া দিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, শ্রীপতি পূর্ব্বে দুই বেলা দুই মুঠা ভোজন করিবার জন্যও অন্দরে আসিতেছিল, এখন ভগ্নীর কড়া কথা শুনার পর হইতে সে পুরে সে একান্তই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল।

এই ঘটনায় মায়ের যত রাগ পড়িল, নীরজার উপর! সে-ই ত এ ব্যাপারের মূল! তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ত শিবপ্রিয়া কঠিন বচনের চাকাখানা ঘুরাইয়া দিয়াছে! আর সেই চাকা তাঁহাকে ও শ্রীপতিকে মাড়াইয়া পিষিয়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে! কতদিন পরে মেয়ে আসিল—কোথায় দুই দণ্ড তাহাকে কাছে রাখিয়া সুখ-দুঃখের দুইটা কথা কহিবেন, তাহার অবকাশমাত্র না দিয়া মেয়েটা বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরিতেছে! পাঁচটা বাজে ছুতা খুঁজিয়া মার সঙ্গে কোঁদল বাধাইতেছে! মুখ টিপিয়া থাকিলে কি হয়, বৌয়ের হাড়ে ভেল্‌কি খেলে! তাই বৌয়ের উপর তাঁহার আক্রোশ সীমা ছাপাইয়া উঠিল। বৌকে অন্তরালে পাইলেই মনের জ্বালার বেশ দুই-চারিটা তীব্র ছিটা তিনি তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না।

নীরজা চোখের জল মুছিয়া ভাবিল, হায়, ঠাকুরঝি এ করিল কি! মধু পাইবার প্রত্যাশায় মধু-চক্রে খোঁচা দিয়া মধু ত পাওয়া গেলই না, এখন হুলের বিষে তাহার যে প্রাণ যাইবার জো হইয়াছে! মনে সুখ ত তাহার ছিলই না; স্বস্তি একটু ছিল! সে স্বস্তিটুকুও ঠাকুরঝি আজ দূর করিয়া দিতেছে! হায়, সে দুই দিনের লোক, দুই দিন পরেই দূরে চলিয়া যাইবে; কিন্তু সে বুঝিতেছে না, এ দুইদিনে সংসারটায় যে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া গেল, সে ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া নীরজার পক্ষে টিঁকিয়া থাকা কতখানি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে!

২

রান্নাঘরে মেয়ের গলার সাড়া পাইয়া

মা পা টিপিয়া তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৌয়ের পানে রক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "ননদের সঙ্গে গানে-গল্পে ঝোল্‌টা শেষ পুড়িয়ে ফেলো না যেন! কোথায় ও দু দিনের জন্য এল, বাপের বাড়ীতে জিরুতে, না, দিবা-রাত্তির ওকে ধরে ফুসলোনো হচ্ছে! শেষে রান্নাঘরে এই উনোনের পাশে আগুন-তাতে অবধি ওকে টেনে আনা হয়েছে!"

নীরজা মাটীর পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল, "ও কেন ডাকতে যাবে? আমি নিজে এসেছি। সকাল থেকে মানুষটা কিছু না খেয়ে রেঁধে সারা হচ্ছে,—কি খেলে না খেলে, সেদিকে কারও নজর নেই! তাই ওর মুখে জোর করে একটু মোহনভোগ পুরে দিলুম।"

মা বলিলেন, "বড়লোকের মেয়ের মুখে বুঝি রুটী আর রোচে না!"

শিবপ্রিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা—!" সে স্বরে মা চমকিয়া থামিয়া গেলেন। শিবপ্রিয়া বলিল, "তুমি ওকে যা খুসী বকতে পারো, কেন না ও তোমার বৌ। এখন ওকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছ। কিন্তু তাই বলে ওর বাপের নামে খোঁটা দিয়ো না। ও ভাল মানুষ, তাই চুপ করে সহ্য করছে! আমায় যদি কেউ এমনি করে আমার মরা বাপের নামে খোঁটা দিত, তাহলে আমি কি করতুম, জানো? নখে করে তাকে ছিঁড়ে ফেলতুম—তা সে আমার যত-বড় গুরুজনই হোক না কেন! সোয়ামী হলেও তাকে আমি রেহাই দিতুম না।"

মেয়ের কথায় মা ভড়কাইয়া গেলেন। শিবপ্রিয়ার চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছিল—রাগে সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মা বলিলেন, "এখন আয় বাপু—রান্নাঘর থেকে চলে আয়—তোর মাথা গরম হয়ে উঠেছে। এখনই আবার ফিট্-টিট হয়ে পড়বে! কত করে ত ফিট বন্ধ হয়েছে! আয়, চলে আয়।" মা মেয়ের হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিলেন।

শিবপ্রিয়া কহিল, "না, আমি যাব না। ছাড়ো আমায়। আমি আজ রাঁধব—বৌকে রাঁধতে দেব না। তুমি যাও। আমায় রাগিয়ো না, বলছি,—তাহলে অনর্থ বাধবে!"

মা ভয়ে সরিয়া গেলেন। যাইবার সময় বৌয়ের পানে যে দৃষ্টি হানিয়া গেলেন, তাহাতে যেন আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল।

নীরজা কাঠের পুতুলের মতই নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যেন চেতনা ছিল না। চোখের সামনে এই যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহা কি সত্য! যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখে, শিবপ্রিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া কানি দিয়া কড়ার আংটা ধরিয়া উনান হইতে ঝোলের কড়া নামাইতেছে। সে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া তখন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সহজভাবেই সে বলিল, "দে ত ভাই, ঐ কাঁশিখানা—ঝোলটা ঢেলে রাখি। কেমন, এই হয়েছে ত? আর থাকলে ঝোল মরে একেবারে কাই হয়ে যাবে, না?"

যন্ত্র-চালিতের মত নীরজা কাঁশি আগাইয়া দিল। শিবপ্রিয়া কাঁশিতে ঝোল ঢালিয়া রাখিয়া খুন্তি দিয়া কড়া চাঁচিয়া ফেলিল। পরে কড়ায় জল ঢালিয়া ভিজা ন্যাতা দিয়া কড়ার গা রগড়াইয়া জলটা বাহিরে নর্দ্দামার ধারে ঢালিয়া আসিয়া কহিল, "এই কড়াতেই অম্বলটা চড়িয়ে দি, তাহলে। তুই ভাই মশলাটা ঠিক করে দে। আমি ততক্ষণে চাল্‌তা কটা ছেঁচে নি।"

৩

কড়ারের তখনও কয়দিন বাকী ছিল, শিবপ্রিয়ার শাশুড়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, হঠাৎ তাঁহার গৃহে তাঁহার এক দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপস্থিত; বীরেন যাইয়া শিবপ্রিয়াকে লইয়া আসিবে। শিবপ্রিয়ার মনটা অস্থির হইয়া উঠিল। সে নীরজার পানে চাহিল। নীরজার মুখে-চোখে করুণ বেদনার একটা ছায়া পড়িয়াছিল। ঠাকুরঝি চলিয়া যাইবে! হায়, স্নেহের দেওয়াল তুলিয়া এই যে কঠিন বাক্য ও মিথ্যা তিরস্কারের হাত হইতে এতদিন তাহাকে সে আগুলিয়া রাখিয়াছিল—সে দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সে চলিয়া গেলে বাহিরের রুদ্র গর্জ্জন নিমেষে যে তাহাকে দ্বিগুণ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিবে। এখন সেগুলার আক্রোশ যে ভীষণতর হইবে, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র ছিল না! হায়, কেন সে আসিল,—কেন সে এমন ভাবে ঘাঁটাইয়া শাশুড়ীর চিত্তের আগুনটাকে আরও গাঢ় তীব্র করিয়া দিল! এখন তাহার উপায়!

শিবপ্রিয়াও ঠিক এই কথাটা ভাবিতেছিল। সে ভাবিল, রুদ্র ভাব ধরিয়া সে ভাল করে নাই; শান্তভাবে কথাগুলা পাড়িয়া শান্তি আনিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় কিছু ফল হইত। তাহার অনুপস্থিতিতে নীরজার অসহায় ভাব কল্পনা করিয়া সে ব্যথিত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল,—দাদাকে একবার পাইলে হয়, নরম কথায় তাহাকে সে একবার বুঝাইবে! কিন্তু শ্রীপতি আজ কয়দিন আর বাড়ীর চৌকাট মাড়াইবারও অবকাশ পায় নাই!

কাল সকালে বীরেন আসিয়া শিবপ্রিয়াকে লইয়া যাইবে। কন্যা চলিয়া যাইবে, মা তাই পূর্ব্বরাত্রে তাহার ভোজনের জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রে সংসারের লেঠা চুকাইয়া নীরজা যখন শুইতে আসিল, তখন তাহার মাথাটা খুবই ধরিয়া উঠিয়াছে। শিবপ্রিয়া আসিয়া কহিল, "আজ আমি তোর কাছে শোব, ভাই—" শিবপ্রিয়া বিছানায় পড়িয়া নীরজাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। সে চমকিয়া উঠিল। এ কি, গা যে তাহার পুড়িয়া যাইতেছে! শিবপ্রিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া কহিল, "তোর যে জ্বর হয়েছে, বৌ!" পরে তাহার কপালে হাত দিয়া কহিল, "নাঃ—বেশ জ্বর! গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে! আর এই জ্বরে আগুন-তাতে সারাক্ষণ বসে সব করলি কর্ম্মালি! তাই বুঝি আমাকে আজ ওধারে ঘেঁসতেও দিলিনে? বললি, না ভাই, কাল চলে যাবে, মার কাছে আজ থাকগে! আমিও যেমন নেকী, কিছু বুঝলুম না।"

শিবপ্রিয়া উঠিয়া মার ঘরে গেল, ডাকিল, "মা—"

মা তখন মনে মনে জ্বলিতেছিলেন।

আহারের এই এতখানি আয়োজন করা গেল, তা শ্রীপতি তাহার কিছুই মুখে দিল না! সাধে কি শিবপ্রিয়া এত কথা শুনাইয়া দেয়! কেন বাপু, তুই ঘরের ছেলে,—তোর এ রাগ করিয়া বাহিরে পড়িয়া থাকা কেন! যুক্তি-তর্কের পর রাগটা পড়িল, বধুর উপর! সেই সর্ব্বনাশীই ত যত নষ্টের মুল! এমন বৌকে বিদায় করিলেই না হাড়ে বাতাস লাগে!

মেয়ের ডাক শুনিয়া মা কহিলেন, "আয়, শুবি আয়।"

শিবপ্রিয়া কহিল,"শোবার কথা হচ্ছে না। বৌয়ের খুব জ্বর হয়েছে! কাওকে এখনই একজন ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।"

আবার সেই বৌয়ের হইয়া ওকালতি! মা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হাঁ, দেউড়ীতে আমার পাঁচটা পাইক-বরকন্দাজ বসে আছে —এই যে এতেলা পাঠাই।"

শিবপ্রিয়া মুহূর্ত্তে কঠিন হইয়া উঠিল। এই সে একটু পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কঠিন হইবে না। কিন্তু উপায় নাই! সে কহিল, "আর তোমার ছেলের কি মেয়ের যদি অসুখ করত—?"

সে কথার জবাব না দিয়া মা পাশ ফিরিয়া শুইলেন, কহিলেন, "যা তোর খুসী হয়, করগে না, বাছা। সারাদিন পরে ঘুমিয়ে যে একটু আরাম পাব, তারও জো নেই।"

শিবপ্রিয়া নিরাশ নিরুপায় চিত্তে নীরজার ঘরে ফিরিয়া আসিল; বাক্স হইতে অডি-কলোনের শিশি বাহির করিয়া তাহাতে রুমাল ভিজাইয়া নীরজার কপালে পটি আঁটিয়া দিল। সারা রাত্রি জাগিয়া বসিয়া সে নীরজার শুশ্রূষা করিল। নীরজা কতবার কহিল, "ও কি ভাই, ঠাকুরঝি, অত কেন? আমি ত বেশ আছি, তুমি ঘুমোও—"

ভোরের দিকে নীরজা জ্বরের ঘোরে কেমন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। শিবপ্রিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। এ বাড়ীতে কাহারও কাছে কোন সাহায্য পাইবে না, সে। বীরেন্দ্র আসিলে যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবে ভাবিয়া বীরেনের আশা-পথ চাহিয়াই সে নীরজার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সকালে মা আসিয়া ঘরের দ্বারে উঁকি পাড়িলেন। মা হাঁকিলেন, "এখনও নবাব-পুত্রীর ঘুম ভাঙ্‌ল না! আজ বীরেন আসছে, খাবার-দাবারের একটু উদ্‌যোগ-সুদ্‌যোগ করতে হবে না?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "তোমার ভয় নেই মা। এ বাড়ীতে সে জলগ্রহণও করবে না— সে ব্যবস্থা আমি করব'খন। তোমার কোন ভাবনা নেই, তুমি ঘুমোওগে যাও।"

মেয়ের মুখের কাছে মা দাঁড়াইতে পারিতেন না। অগত্যা তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

৪

যথাসময়ে বীরেন আসিয়া বহির্দ্বারে হাঁকিল, "দাদা—" শিবপ্রিয়া ঝীকে কহিল, "তোর জামাইবাবু এসেছে রে। এইখানে ডেকে নিয়ে আয় ত—"

বীরেন আসিলে শিবপ্রিয়া কহিল, "তোমার গাড়ী আছে, এখনই একজন ডাক্তার ডেকে আনো। বৌয়ের কাল রাত্তির থেকে খুব জ্বর!"

বীরেন আসিয়াই এ ভাব দেখিয়া কেমন

ভড়কাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "বড় সুবিধে মনে হচ্ছে না। টাইফয়েড হতে পারে বলেই আশঙ্কা হচ্ছে! আজ তিন-চারদিন থেকে বোধ হয় জ্বরটা হয়েছে?" ডাক্তার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বীরেনের পানে চাহিল।

শিবপ্রিয়ার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। ঘোমটার অন্তরাল হইতে মৃদু স্বরে সে কহিল, "কাল রাত্রে আমরা জ্বর জানতে পেরেছি।"

প্রেসক্রূপসন লিখিয়া ভিজিটের টাকা পকেটে পুরিয়া ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলে শিবপ্রিয়া কহিল, "আমায় নিতে এসেছ, বুঝি?"

বীরেন কহিল, "হাঁ। সরোর ছেলের ভাত হবে, কাল। মা লেখেন নি?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "লিখেছেন, কিন্তু কি করে যাই, বল! আমি গেলে বৌটো বিনা চিকিৎসাতেই মারা যাবে। যা ওর যত্ন-আত্তি! এ জানলে এ বাড়ীতে আমি এবার পা দিতুম না।"

বীরেন কহিল, "তোমার দাদা কোথায়?"

শিবপ্রিয়া কিছু বলিতে পারিল না। বলিতে লজ্জা হইল যে, দাদার গুণের সীমা নাই! স্বামি-সৌভাগ্য পূর্ণ মাত্রায় যে লাভ করিয়াছে, সে-ই জানে, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও কতখানি বাধে! অনুমানে বীরেন ব্যাপার কতক বুঝিল। সে কহিল, "বাড়ীতে সে ফিরবে কখন?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "সে-ই জানে। আজ ক'দিন ত চুলের টিকিও দেখতে পাচ্ছি না; তা যাক্, তুমি ত সব দেখলে। গিয়ে মাকে বলো, এ অবস্থায় আমি কেমন করে যাই! ঠাকুরঝিকেও দুঃখ করতে বারণ করো। দেখে ত যাচ্ছ! বলো, নেহাৎ নিরুপায়!"

বীরেন কহিল, "তা ত দেখছিই। এ অবস্থায় কেমন করেই বা তোমায় নিয়ে যাই! মোদ্দা ডাক্তার ডাকা, হাঙ্গাম পোহানো, তুমি এ সব পারবে কি? রোগটাও ত সহজ নয়, বিশেষ তোমার শরীরে না যদি সহ্য হয়—"

শিবপ্রিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল, "সে ভাবনা তোমার নেই। তোমায় আবার ফিরে স্বপ্ন দেখতে হবে না।"

বীরেন কহিল, "তা বুঝি। কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। তুমি মেয়েমানুষ, সামলাতে পারবে কেন? তার চেয়ে আমি গিয়ে বরং সনাতনকে পাঠিয়ে দি।"

শিবপ্রিয়া আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "তাহলে ত ভালই হয়। তবে এ রোগের বাড়ীতে তার খাওয়া-দাওয়া দেখবার সুবিধে হবে না কিন্তু!"

বীরেন কহিল, "সে সে করে নেবে'খন। সে ত আর এখানে কুটুম্বিতে করতে আসছে না। আমি তার ব্যবস্থাও করে দেব।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "তাহলে তুমি যাও। গিয়ে যা দেখলে, মাকে বলো।"

বীরেন কহিল, "মার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "দেখা করতে চাও, দেখা করগে। আমায় আর বকিয়ো না।"

বীরেন গিয়া শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শাশুড়ী আনন্দে সারা হইয়া উঠিলেন। বড়মানুষ জামাই মা

বলিয়া ডাকিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট! তাহার উপর আবার প্রণাম! শাশুড়ী কহিলেন, "রান্না চাপিয়ে দি। দুটি খেয়ে যাও, বাবা।"

বীরেন কহিল, "না মা, তার জন্ম ভাববেন না। বৌ সারুক, এসে ওরই হাতে একদিন তখন খেয়ে যাব। আমার এখন ঢের কাজ, দাঁড়াবার সময় নেই।"

বীরেন চলিয়া গেল। শাশুড়ী বুঝিলেন, এ শিবপ্রিয়ারই কাজ! সে ই জামাতাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, এখানে আহার করিয়ো না। কিন্তু কেন এ নিষেধ! ইহারও মূলে ঐ বৌ! তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। এমন সর্ব্বনাশীকেও তিনি ঘরে আনিয়াছিলেন যে, মুহূর্ত্ত শান্তি নাই! ইহারই জন্ম ছেলে তাঁহার ঘর ছাড়িয়া গেল, মেয়ের মুখ সদাই অপ্রসন্ন! শুধু অপ্রসন্ন! মার উপর মেয়ের মন একেবারে তাতিয়া রহিয়াছে। তিনি ফুঁসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, বৌয়ের যদি এখন ঘটনাক্রমে একটা ভাল-মন্দ কিছু হইয়া যায়, তবেই মঙ্গল! নিজের ছেলে ও মেয়েকে আবার তিনি ফিরাইয়া পাইবেন! আহা, তেমন দিন কি হইবে!

বিশ্বের ভগবান বুঝি এ প্রার্থনা শুনিয়া সে দিন শিহরিয়া উঠিয়া ছিলেন!

৫

চারদিন জ্বর-ভোগের পর সেদিন দুপুর বেলায় নীরজা চোখ মেলিল, ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

তাহার হাত দুইটা শিবপ্রিয়ার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। সনাতন আসিয়া ঘরের বাহিরে ডাকিল, "বৌমা—"

শিবপ্রিয়া কহিল, "কেন বাবা?"

"হোয়েটুকু এনেছি মা। খাওয়াতে পারবে?"

শিবপ্রিয়া উঠিয়া গিয়া ক্যাপ্ লইয়া আসিল, নীরজাকে ডাকিল, "বৌ—"

নীরজা ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল, "কেন, ভাই?"

"এইটুকু খেয়ে নাও—"

"আর কেন, ঠাকুরঝি?" নীরজার চোখের কোলে অশ্রুর বিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

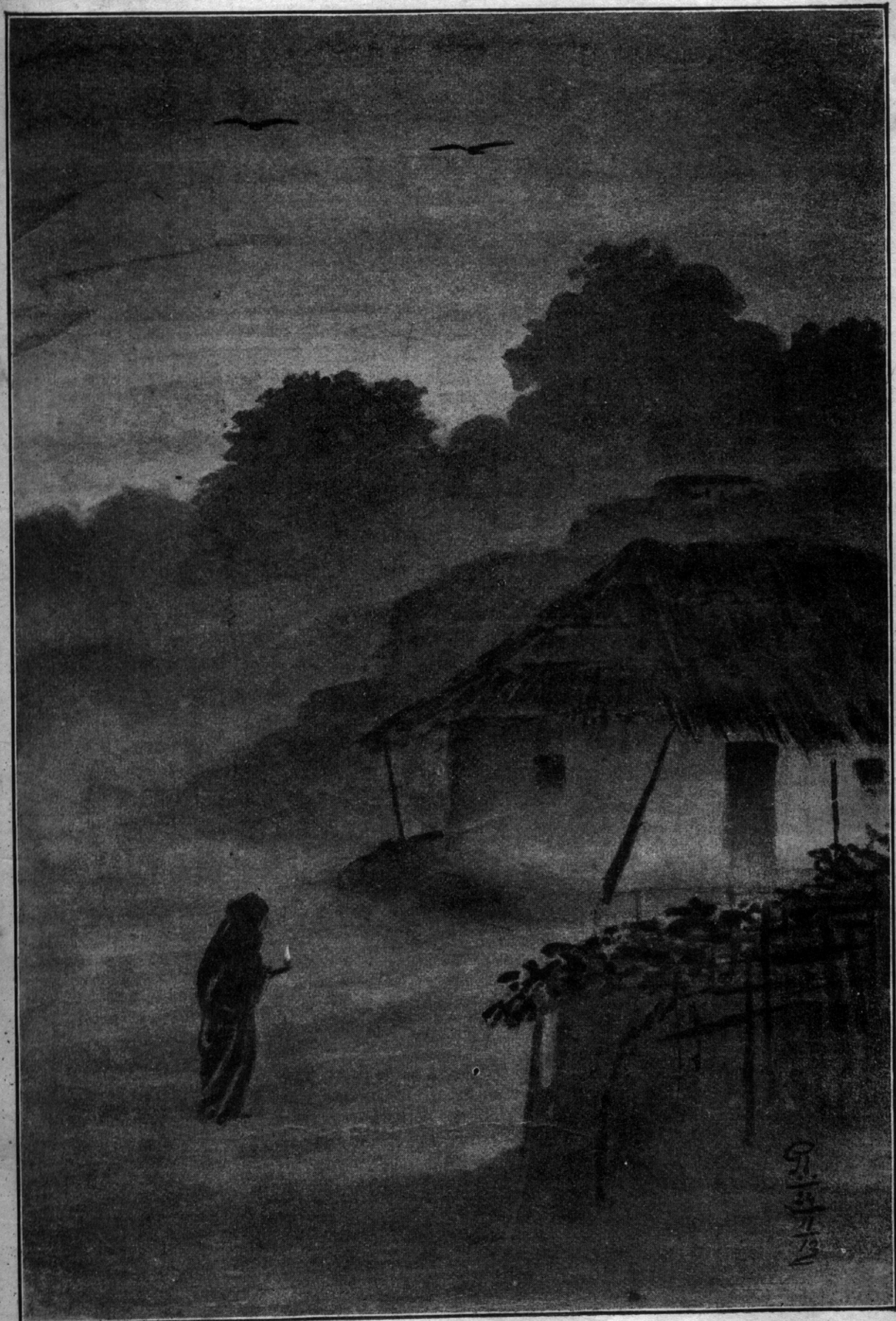
শিবপ্রিয়া আঁচল দিয়া সে অশ্রু মুছিয়া লইল। পরে হোয়ের ক্যাপ্ নীরজার মুখে ধরিয়া কহিল, "এটুকু খাও, ভাই।"

নীরজা আপত্তি না করিয়া পান করিল; কহিল, "ঠাকুরঝি, তোমার ভাই বড় কষ্ট হচ্ছে।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "এখন সে কষ্টটুকু সার্থক কর দেখি—"

নীরজা কিছু বলিল না, উদাস ম্লান নেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছিল। দৃষ্টি তাহার নীরজার মুখের পানে। যে মুখ এত দুঃখেও সর্ব্বক্ষণ সে হাস্যময় দেখিত, সে মুখ আজ বাসি ফুলের মতই শুষ্ক মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার কপালের উপর দুই-চারিগাছি কেশের গুচ্ছ উড়িয়া পড়িয়াছিল। রেশমের মতই কোমল কেশ! সেগুলা হাত দিয়া সরাইয়া নীরজার মুখের কাছে মুখ আনিয়া শিবপ্রিয়া কহিল, "কি ভাবছ, বৌ?"

নীরজার চোখ জলে ভরিয়া ছিল; বাহিরের এই করুণ সমবেদন-মাখা প্রশ্নের ঘা খাইয়া মুহূর্ত্তে তাহা ঝরিয়া পড়িল। নীরজা বালিশে চোখ মুছিয়া কহিল,



সন্ধ্যা

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

"ঠাকুরঝি—" তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

শিবপ্রিয়া কহিল, "কি ভাবছ, বল।"

একটা তীব্র নিশ্বাস ফেলিয়া নীরজা কহিল, "আজও বাড়ী আসেননি? আমার জন্যে শেষ বাড়ী আসা ছেড়ে দিলেন?"

শিবপ্রিয়ার বুকের ভিতরে একটা ভীষণ বেদনা ঠেলিয়া উঠিল। সে কহিল, "দাঁড়া, তোর বুঝি ভাগ্যি ফিরেছে। একটু আগে যেন দাদার গলার সাড়া পেলুম।"

নীরজাও সেই সাড়াই পাইয়া ছিল—তাই সে চোখ খুলিয়াছে!

শিবপ্রিয়া বাহিরে গেল। দালানে বসিয়া শ্রীপতি তেল মাখিতেছিল। মা নিকটে দাঁড়াইয়া। শিবপ্রিয়া গিয়া সহজ স্বরে ডাকিল, "দাদা—"

শ্রীপতি ভগ্নীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু গলার স্বরে আশ্বস্ত হইল। সে কহিল, "কি বলছিস, শিবু?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "তোমার চান হয়ে গেলে একবার এ ঘরে এসো। বৌয়ের বড় অসুখ—"

মা কহিলেন, "অসুখ, তা ও গিয়ে কি করবে? ও কি ডাক্তার?"

শিবপ্রিয়া সে কথা কানে না তুলিয়াই কহিল, "তোমায় একবার সে দেখতে চায়। মেয়েমানুষের মন, বোঝে না, কি করবে বল! তবে ভয় নেই, তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগবে শীগ্‌গির—তারই সে বন্দোবস্ত করেছে, এবার!"

মা বলিলেন, "তোর আস্কারাতেই ত ওর এত বাড় হয়েছে! নাহলে অসুখের ভাণ করে এতখানি ঘটা বাধায়!"

শিবপ্রিয়া কোন কথা বলিল না। তাহার মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছিল, ইচ্ছা থাকিলে সে আগুনে এখনই সে সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে ইচ্ছাও আর আজ তাহার ছিল না। তাই সে আবার শ্রীপতিকে কহিল, "চান করে এসো একবার—লক্ষ্মী দাদা। নাহলে একটা মানুষকে চিরদিনের মনস্তাপ নিয়ে চলে যেতে হয়। তুমিও মানুষ ত, এটুকু মনে রেখো!"

শিবপ্রিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কথার যে প্রচ্ছন্ন হুলটুকু সে শ্রীপতির মনে ফুটাইয়া দিয়া গেল, বহুক্ষণ ধরিয়াই তাহা শ্রীপতির মনে খচ্‌-খচ্‌ করিতে লাগিল। স্নান সারিয়া সে আহারে বসিল। মা সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। মা কহিলেন, "এবার শিবুকে পেয়ে এমন সোহাগ হয়েছে যে, দেখে আর বাঁচি না। মেয়েটাকে একেবারেই পর করে দিলে। ছেলের শোধ মেয়ের উপর দিয়ে নিলে! কি অশুভ ক্ষণেই যে শিবু মা আমার এবার শ্বশুরবাড়ী থেকে পা বাড়িয়ে ছিল!"

আহার করিতে করিতে শ্রীপতি ভাবিল, আহার সারিয়া একবার সে নীরজাকে দেখিয়া আসিবে। তবে দেখা করিয়া কি যে বলিবে, ইহাই মহা ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বিধাতা তাহাকে সে দায় হইতে খুব রক্ষা করিলেন! আহার সারিয়া সে মুখ ধুইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, যতীশ বাবু গাড়ী লইয়া আসিয়া হাজির—

তাঁহার বাগানে আজ মাছ ধরিবার ভারী ঘটা! কাজেই আর বসা বা নীরজার সহিত দেখা করা ঘটিয়া উঠিল না। ডিপা-ভরা পান পকেটে ফেলিয়া সাজিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

দাদার কাণ্ড দেখিয়া শিবপ্রিয়া ঘরের মধ্যে গর্জ্জাইতেছিল। এই ভাইয়ের বোন্ সে! ধিক তাহাকে!

মা আসিয়া ডাকিলেন,"শিবু, খাবি আয়।"

শিবপ্রিয়া বর্ত্তাইয়া গেল। মনের ঝাল কতকটা সে এবার মিটাইতে পাইবে! মার উপর তর্জ্জন করিয়া সে কহিল, "আমার ভাত একধারে ঠেলে রেখে তুমি ক্ষুধা নিবৃত্তি কর গে। আমার জন্য এ-বাড়ীর কাকেও ভাবতে হবে না।"

"পরের বৌকে ঘরে এনে এ কি দায়ে পড়লুম গা—" বলিতে বলিতে মা চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, বৌটাকে ধরিয়া দুই হাতে যদি তাহাকে একবার পিটিতে পারিতেন, তবেই বুঝি প্রাণের এ জ্বালা কতক জুড়াইত!

শাশুড়ী ও ননদের কথা নীরজা সকলই শুনিল। শাশুড়ী চলিয়া গেলে শিবপ্রিয়াকে সে কহিল, "তুমি যাও ঠাকুরঝি, খেয়ে নাওগে। আমি ত বেশ আছি, এখন। যাও ভাই।"

শিবপ্রিয়া কিছু বলিল না। রাগে সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। নীরজা আবার কহিল, "যাও না ভাই, খেয়ে এসোগে না—"

নীরজার মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপিয়া শিবপ্রিয়া কহিল, "এ বাড়ীতে জলগ্রহণ করতে বল, তুমি—?"

নীরজা এ কথায় বড় আরাম বোধ করিল না। সে কহিল, "যে কটা দিন আর আছি ভাই, একটু শান্তিতে কাটতে দাও! আমাকে নিয়ে এ খেচাখেচি—"

শিবপ্রিয়া বুঝিল, নীরজার প্রাণের কোন্‌খান্‌টায় কি ব্যথা বাজিতেছে। সে কহিল, "তুই সেরে ওঠ্ ভাই, প্রাতর্বাক্যে কামনা করছি, তুই সেরে ওঠ্! তার পর আমি তোকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। দেখি, কে তাতে বাধা দেয়! যদি আজ তোর মা বেঁচে থাকতেন ত যেমন করে পারতুম, তোকে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম—"

"তাই দাও ভাই—আমার মার হাতেই আমাকে তুলে দাও। আমারও আর সহ্য হয় না।"

শিবপ্রিয়া দেখিল, এ কথাগুলা তোলা ঠিক হয় নাই। রোগীর উত্তেজনা ইহাতে বাড়িতে পারে! তাই সে কহিল, "তুমি তা হলে চুপ করে শুয়ে থাকো। বরফের ব্যাগ মাথায় চাপানো থাক্—আমি চট্ করে মুখে কিছু দিয়ে আসিগে—"

"হাঁ, তুমি যাও। এর মধ্যে আমি মরে যাব না।" বলিয়া নীরজা হাসিল। শিবপ্রিয়া চোখ চাহিয়া সে হাসি দেখিল। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এ হাসি সেই দীপ নিবিবার পূর্ব্বে যেমন একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনই যে! মনে মনে মা-কালীকে ডাকিয়া নীরজার রোগ-পাণ্ডু মুখে সে একবার হাত বুলাইল। এ স্পর্শে সব জ্বালা সব গ্লানি তোর মুছিয়া যাক্! তারপর সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

সেদিন শেষরাত্রে নীরজা কেমন অস্থির হইয়া পড়িল। চোখের চাহনিও কেমন এলো মেলো। বিছানায় পড়িয়া সে ছটফট করিতেছিল। ভিতর হইতে কেমন একটা জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইতেছে! প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে!

শিবপ্রিয়া তাহারই বালিশে মাথা রাখিয়া সবে-মাত্র একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কাতর কণ্ঠে নীরজা ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। ঘরের কোণে বাতিটা জ্বলিয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে! সে ক্ষীণ আলোকে শিবপ্রিয়া চাহিয়া দেখে, নীরজার মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে! বুঝি এ মৃত্যুর করাল ছায়া! তাড়াতাড়ি আর একটা বাতি জ্বালিয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল, ডাকিল, "সনাতন—"

সনাতন বাহিরের দালানে পড়িয়া একটু গড়াইয়া লইতেছিল; কহিল, "কেন মা?"

"শীগ্‌গির একবার ডাক্তার বাবুর কাছে যাও, তাঁকে ডেকে আনো, বাবা—অবস্থা ভাল বুঝছি না।" সনাতন উঠিয়া ডাক্তারের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

শিবপ্রিয়া আসিয়া মালিশ, পথ্য প্রভৃতির নানা আয়োজন বাধাইয়া তুলিল। কিন্তু হায়, নিবানো দীপে তৈল-দানে কি ফল! ভিতর হইতে পুড়িয়া জীবনটা ত তাহার পূর্ব্ব হইতেই ছাই হইয়া গিয়াছে, বাহিরের কাঠামোটা কোনমতে খাড়া আছে বৈ ত না! আজ এ রোগের প্রবল ধাকায় বুঝি সে কাঠামো-খানাকেও আর বজায় রাখা যায় না! শিবপ্রিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অসহায় দুর্ব্বল নারী সে,—তাহার কি সাধ্য যে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এই অবহেলিতা উপেক্ষিতা প্রাণীটিকে তাহার গ্রাস হইতে সে ছিনাইয়া লয়!

সহসা রোগীর ঠোঁট নড়িল—ভিতর হইতে মিনতির সে যেন এক করুণ অস্ফুট-আবেদন! নীরজার শুষ্ক ওষ্ঠে শিবপ্রিয়া এক চামচ্‌ বেদানার রস ঢালিয়া দিল—নীরজা সাগ্রহে তাহা পান করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে অতি ধীরে সে চোখের পাতা মেলিল; দুই হাতে হাতড়াইয়া কিসের যেন সন্ধান করিল! হায় রে, পাথেয় যে তাহার বহুকাল হারাইয়া গিয়াছে! কি সম্বল লইয়া এখন এ দীর্ঘ পথে সে যাত্রা করে!

শিবপ্রিয়া ঔষধ ঢালিয়া নীরজাকে পান করাইল। নীরজা কহিল, "আঃ—" পরে শিবপ্রিয়ার পানে স্থির দৃষ্টিতে সে চাহিল। শিবপ্রিয়া আদর করিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিল, কহিল, "কি চাচ্ছ, বৌ?"

নীরজা কোন কথা বলিতে পারিল না—তাহার দুই চোখ বহিয়া শুধু ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সারা জীবনের উপেক্ষার বেদনা আজ এ কাতর অশ্রুর মধ্য দিয়া অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িয়াছে! শিবপ্রিয়া ভাবিল, হায় বোন, এতদিন যদি নীরবে সব সহিয়া আসিলি,—আপনার তেজে এ উপেক্ষা গ্রাহ্যও করিলি না, তবে এ নিদান-সময়ে কিসের জন্য এ দুর্ব্বলতা! সে দুর্ব্বলতা আর কেনই বা দেখাস্! তোর পানে কেহই যখন চাহিয়া দেখিল না, তখন তুইই বা

কাহার জন্য আজ এতখানি কাতর হইতেছিস্!

ডাক্তার আসিয়া ইঞ্জেক্সন দিলেন—কিছুক্ষণ পরে রোগী যেন একটু শক্তি পাইল। ডাক্তার বাহিরে বসিয়া রহিলেন—শিবপ্রিয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল, "আপনি আজ দয়া করে থাকুন—যত টাকা চান দেব—" তারপর সে সনাতনকে কহিল, "তোমার বাবুকে একবার শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে এসো, সনাতন। গাড়ী করে ছুটে যাও। বলগে, বড় বিপদ এখানে!" সনাতন বীরেনের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

নীরজা আর একবার কথা কহিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া বর্ত্তাইয়া গেল। তবে এ ধাক্কা কাটিল, বুঝি! সে কহিল, "বল্, তোর যা কিছু বলবার আছে, সব খুলে বল্। আমি এই তোকে আগ্‌লে বসে রইলুম। দেখি, আমার কাছ থেকে কে আজ তোকে ছিনিয়ে নেয়!"

সতীর মুখে তেজের একটা দৃপ্ত রেখা ফুটিয়া উঠিল। একবার সে কোন্ যুগে সতীর মুখে এমনই তেজ দেখিয়া যমের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল! আজও এ যেন রাজেন্দ্রাণী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে সে নীরজাকে রক্ষা করিবার জন্য বুক দিয়া দাঁড়াইল। দুর্জ্জয় তেজে প্রাণ তাহার বলীয়ান হইয়া উঠিল। নীরজা অতি-কষ্টে থামিয়া থামিয়া কহিল, "সতী-লক্ষ্মী তুমি, আশীর্ব্বাদ কর, ফিরে জন্মে যেন তোমার মত বরাত নিয়ে পৃথিবীতে আসি—এ বড় কষ্ট! সওয়া যায় না।"

হায়রে, তবু সে সকলই সহিয়া আসিয়াছে! আর কাহারও প্রাণ হইলে কবে বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইত—কিন্তু এ নারীর প্রাণ, বড় কঠিন! সকলই সয়, ভাঙ্গিতে জানে না!

কিন্তু তবুও সহের একটা সীমা আছে। নীরজার প্রাণ সে সীমার একেবারে কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকেও আর ধরিয়া রাখা গেল না। সেদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে যখন মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, ঠিক সেই সময় তাহার সকল অকল্যাণ হইতে নীরজা মুক্তি লাভ করিল। সংসার তাহাকে বিদায় দিয়া আঁধারে ভরিয়া গেল।

৭

শাশুড়ী জামাতার কাছে মিনতি জানাইয়া শিবপ্রিয়াকে আরও কয়দিন আপনার গৃহে ধরিয়া রাখিল, কিন্তু মা ও মেয়ের মধ্যে কথা ছিল না। শত সাধ্য সাধনা করিয়াও মেয়েকে মা একটু জল অবধি মুখে দেওয়াইতে পারিলেন না। তাঁহার তখন আশঙ্কা হইল, পরের মেয়ের প্রতি যে পাপ করিয়াছেন, বুঝি তাহারই ফলে নিজের মেয়েটিকে আজ হারাইতে হয়! তাই তিনি সনাতনকে কহিলেন, "তুমি ভাই বীরেনকে খবর দাও—সে এসে ওকে নিয়ে যাক্। না হলে দেখছ ত, ওকে বাঁচানো যাবে না।"

সনাতন অগত্যা বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

বহুদিন পরে শ্রীপতিও আজ ঘরে ফিরিয়াছিল। বাড়ীতে পা দিয়াই সে বুঝিল, সেখানে মস্ত একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। সারা বাড়ীটা যেন আজ

তাহাকে গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে! নীরজার প্রতি তাহার একটা আন্তরিক টান না থাকিলেও বাড়ীটা আজ তাহার কাছে নিতান্তই শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সব থাকিলেও যেন আজ কিছু নাই, এমনই ভাবখানা বাড়ীটার প্রত্যেক ইষ্টক-খণ্ডে, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটাতে অবধি লাগিয়া রহিয়াছে। বাড়ী যেন নিতান্তই অতিষ্ঠের স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

হৌক, বাড়ীর প্রতি কোন দিনই তাহার মায়া ছিল না—আজও নূতন করিয়া মায়া পড়িল না। তবে আজ মার কাছে প্রয়োজন ছিল; গোটাকয়েক টাকা চাই—বাগানের আমোদে এ-দফায় তাহারই উপর খরচের ভার পড়িয়াছে। না দিলে মান থাকে না। সেই টাকা কয়টা লইয়া কোনমতে এখন সরিয়া পড়িতে পারিলেই সে বাঁচিয়া যায়!

ভিতরে পা দিতেই মা ছেলেকে দেখিয়া শোকে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ছেলে আসিয়া মার কাছে বসিল—মা তখন সপ্তমে সুর চড়াইলেন! শিবপ্রিয়া ব্যাপার বুঝিবার জন্য সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে আজ কোন কথা নাই, দৃষ্টি স্থির, মূর্ত্তি রুক্ষ! কে যেন পাথরে খোদা প্রাণহীন একটা পুতুলকে আনিয়া সেখানে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে! উপেক্ষিতা নীরজার স্মৃতির মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তপশ্চারিণী সর্ব্বত্যাগিনীর মতই একটা ভাব তাহার মুখে-চোখে আঁটিয়া গিয়াছে!

কাঁদিতে কাঁদিতে ইনাইয়া বিনাইয়া মা কহিলেন, শূন্য গৃহ পাষাণের মতই তাঁহার বুকে বসিতেছে! পুত্রের এ লক্ষ্মীছাড়া দীন বেশও তিনি আর চক্ষে দেখিতে পারেন না। ও-পাড়ার পার্ব্বতী একটি মেয়ের কথা বলিতেছিল—পুত্রের কোন আপত্তিই তিনি কানে তুলিবেন না!

শিবপ্রিয়ার সারা অঙ্গ বহিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্র দাহ ছুটিল। আপাদ-মস্তক তাহার জ্বলিয়া উঠিল। তবুও জীর্ণ গৃহের অধিবাসী ঝড় আসন্ন দেখিয়াও আকাশের পানে যেমন হতবুদ্ধিভাবে চাহিয়া থাকে, তেমনই ভাবে মা ও ভাইয়ের পানে সে চাহিয়া রহিল—চোখ তাহার পলক-হীন, অচঞ্চল!

শ্রীপতি বুঝিল, টাকা আদায়ের চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে। নত মুখে গাঢ়স্বরে সে কহিল, "তোমার কথা কবে আমি ঠেলেছি মা—"

দুইখানা চঞ্চল মেঘে ঠোকাঠুকি হইলে অশনি যেমন গর্জ্জিয়া উঠে, শিবপ্রিয়া ঠিক তেমনই ভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল। সে ডাকিল, "সনাতন—"

কয়দিনের রুদ্ধ বাণী নিমেষে যেন এক প্রলয়-হুঙ্কারে মুক্ত হইয়া গেল। মাতা-পুত্র উভয়েই সে স্বরে শিহরিয়া শিবপ্রিয়ার পানে চাহিলেন।

সে স্বরে চমকিয়া প্রভু-গৃহ-গমনোদ্যত সনাতন আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল—চাহিয়া দেখিল, মার এ কি এ করালিনী মূর্ত্তি! চোখে যেন প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে!

শিবপ্রিয়া কহিল, "সনাতন, এখনই গাড়ী নিয়ে এসো। আমি চলে যাব,

এখনই। এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও থাকতে চাই না। এ বাড়ীতে যদি আর কখনও জলগ্রহণ করি ত আমি বাপের বেটী নই!”

কথাটা বলিয়া বিদ্যুতের মতই সেখান হইতে সে সরিয়া গেল। মা ও শ্রীপতি বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

ভূপরিচয়। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, এম-এ ও শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস। এলাহাবাদ। ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। ‘নিবেদনে’ লিখিত হইয়াছে, “যাহারা ভারতবর্ষের ভূগোল পাঠ সমাপ্ত করিয়া সমস্ত পৃথিবীর বিবরণ অধ্যয়ন করিবে এইরূপ পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের বালকগণের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সূচী অনুসারে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ দেশ, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতির নাম কণ্ঠস্থ করিয়া ছাত্রগণ সময়ের অযথা অপব্যবহার করিয়া থাকে। এই গ্রন্থে কিয়ৎপরিমাণে কার্য্য-কারণের নিয়ম অনুসরণ করিয়া মহাদেশগুলির অবস্থান ভূপ্রকৃতি সমুদ্রোপকূল প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাদেরই ফলে ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে জলবায়ু, উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর কি বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।” আমরা সানন্দে বলিতে পারি, গ্রন্থকারদ্বয়ের সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি এমন নিপুণ সহজ ভাষায়, আশ্চর্য্য নূতন ও সরল ভঙ্গীতে লিখিত হইয়াছে যে বিনা-আপত্তিতে, আপনা হইতেই ছাত্রগণের এ গ্রন্থ-পাঠে কৌতূহল জন্মিবে। গ্রন্থখানিতে সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিকভাবে ভূপ্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তোতাপাখীর মত কতকগুলা উৎকট নাম মুখস্থ করাইয়া ছাত্রগণকে কাতর ও পীড়িত করিবার পক্ষে ইহাতে কোনই আয়োজন নাই। ছাত্রগণের কল্পনা-শক্তি জাগ্রত করিবার জন্য নানাস্থানের সরস ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এবং কৌতুককর কাহিনীরও এ গ্রন্থে প্রচুর সমাবেশ আছে। ফলতঃ গ্রন্থখানি বাঙ্‌লা ভাষায় ভূবৃত্তান্ত-বিষয়ক গ্রন্থরাজির আদর্শস্বরূপ হইয়াছে, এ কথা অসঙ্কোচে আমরা বলিতে পারি। গ্রন্থের ছাপা কাগজ চমৎকার—এবং বর্ণনাদ্যোতক অসংখ্য চিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নানা দিক দিয়াই গ্রন্থখানি নীরস বিভীষিকাময় পাঠ্যমাত্র না হইয়া উপভোগের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্‌লার ছাত্র-সম্প্রদায় এ গ্রন্থ-পাঠে আনন্দের সহিত যে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিবে, যে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

কৈশোরক। রবি দত্ত বিরচিত। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, প্রকাশক, ৫৪।৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯১৫। মূল্য দুই আনা। এখানি ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থ। কবিতাগুলি প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে লেখকের ছাত্রাবস্থায় লিখিত হইয়াছিল। পুরাতনের প্রতি এ মমতা ত্যাগ করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। কবিতাগুলিতে কোন বিশেষত্ব নাই।

প্রভাবতী। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বি-এ প্রণীত। ১০।১ এ রামমোহন দত্তের লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভবানীপুর ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য সাত আনা। গ্রন্থখানিতে সাহিত্য-রসের নিতান্ত অভাব।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বুদ্ধ

শ্রীযুক্ত গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২২ [৩য় সংখ্যা

নালক

আজ সে বরফের হাওয়া ছুরির মত বুকে লাগছিল। শীতের কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, পৃথিবীর উপরে আর সূর্য্যের আলোও পড়ছেনা—তারার আলোও আসছেনা,—দিন রাত্রি সমান বোধ হচ্ছে। ঝাপসা আলোতে সব রং বোধ হচ্ছে যেন কালো আর সাদা, সব জিনিস বোধ হচ্ছে যেন কতদূর থেকে দেখছি—অস্পষ্ট ধোঁয়া দিয়ে ঢাকা, শিশির দিয়ে মোছা!

উত্তর মুখে খোলাদরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছিলেন, পৃথিবীর সব সবুজ, সব পাতা, সব ফুল বরফে আর কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে, বরফের চাপনে পথঘাট উঁচুনীচু ছোটবড় সব সমান হয়ে গেছে। আকাশ দিয়ে আর একটি পাখী উড়ে চলছেনা, গেয়ে যাচ্ছে না; বাতাস দিয়ে আজ একটিও ফুলের গন্ধ, একটুখানি সুখের পরশ কি আনন্দের সুর ভেসে আসছেনা;—সাদা বরফে, হিম কুয়াশায়, নিঝুম শীতে, সব চুপ হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে, পাষাণ হয়ে গেছে;—পৃথিবী যেন মূর্চ্ছা গেছে। সিদ্ধার্থ দিনের পর দিন উত্তরের হিম কুয়াশায় সাদা বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন—কুয়াশার জাল সরিয়ে দিয়ে আলো কি আর আসবে না? বরফ গলিয়ে ফুল ফুটিয়ে পৃথিবীকে রং'এ রং'এ ভরে দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে আনন্দ কি আর দেখা দেবেনা? চারিদিক নিরুত্তর ছিল। সিদ্ধার্থ কান পেতে মন দিয়ে শুনছিলেন, কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ আসছিল না। সেই না-রাত্রি-না-দিন, না-আলো-না-অন্ধকারের মাঝে কোনো সাড়া মিলছিল না। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যতদূর দেখা যায় ততদূর তিনি দেখছিলেন বরফের দেওয়াল আর কুয়াশার পর্দ্দা, তারি ভিতর দিয়ে জরা উঁকি মারছে—সাদা চুল

নিয়ে; জ্বর কাঁপছে—পাংশুবর্ণ মুখে শূন্যে চেয়ে; মরণ দেখা যাচ্ছে—বরফের মত হিম সাদা চাদরে ঢাকা! আয়নায় নিজের ছাওয়া দেখার মত, সাদা কাগজের উপরে নানা রকমের ছবি দেখার মত, সেই ঘন কুয়াশার উপরে সেই জমাট বরফের দেওয়ালে সিদ্ধার্থ নিজেকে আর জগৎসংসারে সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন—জন্মাতে, বুড়ো হতে, মরে যেতে; মহাভয় তাঁদের সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে রক্তমাখা ত্রিশূল হাতে! জ্বর জরা আর মরা তিনটে শিকারী কুকুরের মত ছুটে চলেছে মহাভয়ের সঙ্গে সঙ্গে, দাঁতে নখে যা কিছু সব চিরে ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে, টুকরো টুকরো করে। কিছু তাদের আগে দাঁড়াতে পারছেনা, কেউ তাদের কাছে নিস্তার পাচ্ছে না! নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভয়ে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে; পর্ব্বতে এসে তারা ধাক্কা দিচ্ছে, পাথর চূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তারা মায়ের কোল থেকে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে; ঘরের মাঝ থেকে ঘরের লোককে টেনে নিয়ে যাচ্ছে,—আগড় ভেঙে শিকল ছিঁড়ে। মহাভয়ের আগে রাজা-প্রজা ছোট-বড় সব উড়ে চলছে—ধূলোর উপর দিয়ে শুকনো পাতার মত। সবাই কাঁপছে ভয়ে, সব নুয়ে পড়ছে ভয়ে। সব মরে যাচ্ছে, সব নিভে যাচ্ছে—ঝড়ের আগে বাতাসের মুখে আলোর মত। একদণ্ড কিছু স্থির থাকতে পারছেনা! আকাশ দিয়ে হাহাকার করে ছুটে আসছে ভয়, বাতাস দিয়ে মার-মার করে ছুটে আসছে ভয়!—জলে স্থলে ঘরে বাহিরে হানা দিচ্ছে ভয়—জ্বরের ভয়, জরার ভয়, মরণের ভয়! কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি? কোথায় আরাম? সিদ্ধার্থ মনের ভিতর দেখছেন ভয়, চোখের উপর দেখছেন ভয়, মাথার উপর বজ্রাঘাতের মত ডেকে চলেছে ভয়, পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মত পৃথিবী ধরে নাড়া দিচ্ছে ভয়, প্রকাণ্ড জালের মত চারিদিক ঘিরে নিয়েছে ভয়। সারা সংসার তার ভিতরে আকুলি-ব্যাকুলি করছে, হাজার হাজার হাত ভয়ে আকাশ আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে, বাতাসে কেবলি শব্দ উঠছে—রক্ষে কর! নিস্তার কর! কিন্তু কে রক্ষে করবে? কে নিস্তার করবে? ভয়ের জাল যে সারা সংসারকে ঘিরে নিয়েছে! এমন কে আছে যার ভয় নেই, কে এমন যার দুঃখ নেই, শোক নেই, এত শক্তি কার যে মহাভয়ের হাত থেকে জগৎ-সংসারকে উদ্ধার করে—এই অটুট মায়াজাল ছিঁড়ে? সিদ্ধার্থের কথায় যেন উত্তর দিয়ে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে শব্দ উঠল—'বুদ্ধা মহিদ্ধিকা'—'মহাশক্তি বুদ্ধগণ'—'সদেবকস্স লোকস্স সব্বে এতে পরায়না।'

দীপা, নাথা, পতিট্ঠা, চ তাণা লেনা চ পাণীনং।
গতি, বন্ধু, মহাস্সাসা, সরণা চ হিতেসিনো॥
মহাপ্পভা, মহাতেজা, মহাপঞ্ঞা, মহাব্বলা।
মহা কারুণিকা ধীরা সব্বেসানং সুখাবহা॥

—বুদ্ধগণই ত্রিলোকের লোককে পরম পথে নিয়ে চলেন। মহাপ্রভ মহাতেজ মহাজ্ঞানী মহাবল ধীর করুণাময় বুদ্ধগণ সকলকেই সুখ দেন। জগতের হিতৈষী তাঁরা অকূলের কূল, অনাথের নাথ, সকলের নির্ভর, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, যার কেউ নাই তার বন্ধু, যে হতাশ তার আশা, অশরণ যে তার শরণ।

দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে থেকে—মনের উপর থেকে জগৎজোড়া মহা-ভয়ের ছবি আলোর আগে অন্ধকারের মত মিলিয়ে গেল। তিনি দেখলেন, আকাশের কুয়াশা আলো হয়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে। সেই আলোয় বরফ গলে চলেছে—পৃথিবীকে সবুজে সবুজে পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে ভরে দিয়ে। সেই আলোতে আনন্দ আবার জেগে উঠেছে। পাখীদের গানে গানে বনে উপবনে সেই আলো। ঘরের মাঝে হাসি হয়ে ফুটে উঠেছে সেই আলো। বাহিরে বাঁশী হয়ে বেজে উঠছে, অন্তরে সুখ হয়ে উথলে পড়েছে, শান্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—সেই আলো। ত্রিভুবনে—স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে সেই আলো আনন্দের পথ খুলে দিয়েছে, শান্তির সাতরঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। সেই আলোর পথ দিয়ে, সিদ্ধার্থ দেখলেন, চলেছেন এক ভিক্ষু,—যারা ভয় পেয়েছে তাদের অভয় দিয়ে, যে দুঃখ পাচ্ছে তাকেই সান্ত্বনা দিয়ে—মূর্ত্তিমন্ত আনন্দের মত। তাঁর আগে আগে চলেছেন—বুদ্ধ যাঁরা এসেছিলেন, তাঁর পিছে পিছে চলেছেন—বুদ্ধ যাঁরা পরে আস্‌বেন। সিদ্ধার্থ আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন, যে-ভিক্ষু মাঝে চলেছেন সে তিনি নিজেই! তাঁর খালি পা, খোলা মাথা। তাঁর ভয় নেই, দুঃখু নেই, শোক নেই। সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্ভয়ে চলেছেন—সবাইকে অভয় দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের কাছে কাঁপছে একটুখানি ছায়ার মত! মায়াজাল ছিঁড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়—যেন খণ্ড খণ্ড মেঘ!

যেমন আর দিন, সেদিনও তেমনি—রথ ফিরিয়ে সিদ্ধার্থ ঘরে এলেন বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে মন তাঁর সে রাজমন্দিরে সেই মায়া-জালে-ঘেরা সোনার-স্বপনে-মোড়া ঘরখানিতে আর বাঁধা রইল না। সে উদাসী হয়ে চলে গেল,—ঘর ছেড়ে চলে গেল—কত অনামা নদীর ধারে ধারে, কত অজানা দেশের পথে পথে,—একা নির্ভয়।

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত ফুলের মত নতুন ছেলের কচি মুখ, নতুন মা হয়েছেন সিদ্ধার্থের রাণী যশোধরা—তাঁর সুন্দর মুখের মধুর হাসি, সহচরীদের আনন্দ গান, কপিলবাস্তুর ঘরে ঘরে সাত রঙের আলোর মালা—কিছুতে আর সিদ্ধার্থের মনকে সংসারের দিকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারলে না;—সে রইল না—সে রইল না।

ছেলে হয়েছে; এবার সিদ্ধার্থ সংসার পেতে ঘরে রইলেন—এই ভেবে শুদ্ধোদন নতুন ছেলের নাম রাখলেন "রাহুল।" কিন্তু সিদ্ধার্থের মন সংসারে রইল কই? রাহুল রইল, রইল রাহুলের মা যশোধরা, পড়ে রইল ঘরবাড়ি বন্ধুবান্ধব, আর সব আঁকড়ে পড়ে রইলেন রাজা শুদ্ধোদন, কেবল চলে গেলেন সিদ্ধার্থ,—তাঁর মন যে-দিকে গেছে।

সে দিন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। রাত তখন গভীর। রাজপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে গান থামিয়ে সিদ্ধার্থ ডাকলেন,—ছন্দক্, আমার ঘোড়া নিয়ে এসো। সিদ্ধার্থের চরণের দাস ছন্দক, কণ্ঠক ঘোড়াকে সোনার সাজ পরিয়ে অর্দ্ধেক রাতে রাজপুরে নিয়ে এল। সিদ্ধার্থ সেই ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন অনামা নদীর পারে। পিছনে অন্ধকারে ক্রমে

মিলিয়ে গেল—কপিলবাস্তুর রাজপুরী ; সামনে দেখা গেল—পূর্ণিমার আলোয় আলোময় পথ!

(৮)

ছন্দক চলেছে কপিলবাস্তুর দিকে, —সিদ্ধার্থের মাথার মুকুট, হাতের বালা, গলার মালা, কানের কুণ্ডল আর সেই কণ্ঠক ঘোড়া নিয়ে। আর সিদ্ধার্থ চলেছেন পায়ে হেঁটে, নদী পার হয়ে, বনের দিকে তপস্যা করতে,—দুঃখের কোথা শেষ তাই জানতে।

ছোট নদী দেখতে এতটুকু, নামটিও তার 'নমা,—'কেউ বলে অনামা, কেউ বলে অনোমা, কেউ বা ডাকে অনামা। সিদ্ধার্থ নদীর যে পার থেকে নাম্‌লেন সে পারে ভাঙন জমী,—সেখানে ঘাট নেই, কেবল পাথর আর কাঁটা। আর যে পারে সিদ্ধার্থ উঠলেন সে পারে ঘাটের পথ ঢালু হয়ে একবারে জলের ধারে নেমে এসেছে ; গাছে গাছে ছাওয়াকরা পথ। সবুজ ঘাস, বনের ফুল দিয়ে সাজানো বনপথ। এই দুই পারের মাঝে নমা নদীর জল, বালি ধুয়ে ঝির-ঝির করে বহে চলেছে। একটা জেলে ছোট একখানি জাল নিয়ে মাছ ধরছে। সিদ্ধার্থ নিজের গায়ের সোনার চাদর সেই জেলেকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথাখানি নিজে পোরে চলেছেন। নদী—সে ঘুরে ঘুরে চলেছে আম কাঁটালের বনের ধার দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়ের গা ঘেঁসে—কখনো পূব মুখে কখনো দক্ষিণ মুখে। সিদ্ধার্থ চলেছেন সেই নদীর ধারে ধারে ছাওয়ায় ছাওয়ায়, মনের আনন্দে। এমন সে সবুজ ছাওয়া, এমন সে জলের বাতাস যে মনে হয় এইখানেই থাকি। ফলে ভরা পাতায় ঢাকা জাম গাছ একেবারে নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে, তারি তলায় ঋষিদের আশ্রম। সেখানে সাত দিন সাত রাত্রি কাটিয়ে সিদ্ধার্থ বৈশালি নগরে এলেন। সেখানে জটাধারী মহাপণ্ডিত আরাড় কালাম, নগরের বাইরে তিনশ চেলা নিয়ে আস্তানা পেতে বসেছেন। সিদ্ধার্থ তার কাছে শাস্ত্র পড়লেন, ধ্যান, আসন, যোগ-যাগ, মন্তর-তন্তর কতই শিখলেন কিন্তু দুঃখুকে কিসে জয় করা যায় তার সন্ধান পেলেন না। তিনি আবার চল্লেন। চারিদিকে বিন্ধ্যাচল পাহাড় ; তার মাঝে 'রাজগেহ' নগর। মগধের রাজা বিম্বিসার সেখানে রাজত্ব করেন। সিদ্ধার্থ সেই নগরের ধারে রত্নগিরি পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে, সিদ্ধার্থ পাহাড় থেকে নেমে নগরের পথে—ভিক্ষে দাও বলে এসে দাঁড়ালেন। ঘুমন্ত নগর তখন সবে জেগেছে—চোখ মেলেই দেখছে নবীন সন্ন্যাসী! এত রূপ এমন করুণামাখা হাসি-মুখ, এমন আনন্দ দিয়ে গড়া সোনার শরীর, এমন শান্ত দুটি চোখ নিয়ে এমন করে এক হস্তে অভয় দিয়ে অন্য হাতে ভিক্ষে চেয়ে চরণের ধুলোয় রাজপথ পবিত্র করে দিয়ে কেউতো কোনো দিন সে নগরে আসেনি। যারা চলেছিল, তাঁকে দেখে তারা ফিরে আসছে ; যারা ঘরে ছিল তারা তাঁকে দেখতে বাইরে আস্‌ছে ; ছেলে খেলা ফেলে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে ; মেয়েরা ঘোমটা খুলে তাঁর দিকে চেয়ে আছে! তাঁকে দেখে কারু ভয় হচ্ছেনা, লজ্জা করছেনা। রাজা বিম্বিসার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে দেখতে! কত সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে

আসে কিন্তু এমনটিতো কেউ আসে না। রাজপথের এপার-থেকে-ওপার লোক দাঁড়িয়েছে—তাঁকে দেখতে, তাঁর হাতে ভিক্ষে দিতে। ধনী চাচ্ছে ভাণ্ডার শূন্য করে তাঁকে ভিক্ষে দিতে, দোকানী চাচ্ছে দোকানে লুটিয়ে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে, পসারি চাচ্ছে পসরা খালি করে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে! যে নিজে ভিখারী সেও তার ভিক্ষার ঝুলি শূন্য করে তাঁকে বলছে,—ভিক্ষে নাও গো ভিক্ষে নাও! ভিক্ষেয় সিদ্ধার্থের দুই হাত ভরে গেছে কিন্তু ভিক্ষে দিয়ে তখনও লোকের মন ভরে নি! তারা মণিমুক্তো সোনারূপো ফুলফল চাণ্ডাল স্তুপাকারে এনে সিদ্ধার্থের পায়ের কাছে রাখ্ছে, তারা নিষেধ মান্‌বে না, মানা শুন্‌বে না।

রাজা প্রজা ছোট বড় সকলের মনের সাধ পূরিয়ে সিদ্ধার্থ সেদিন রাজগেহের দ্বারে দ্বারে পথে পথে এমন করে ভিক্ষে নিলেন যে তেমন ভিক্ষে কেউ কোনো দিন দেবেও না, পাবেও না। এত মণি মুক্তো সোনা রূপো বসন ভূষণ সিদ্ধার্থের দুই হাত ছাপিয়ে রাজগেহের রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল যে তত ঐশ্বর্য্য কোনো রাজা কোন দিন চোখেও দেখেনি। সিদ্ধার্থ নিজের জন্যে কেবল এক মুঠো শুকনো ভাত রেখে সেই অতুল ঐশ্বর্য্য মগধের যত দীনদুঃখীকে বিতরণ করে চলে গেলেন।

'উদরক' পণ্ডিত সাতশো চেলা নিয়ে পসারী-পাড়ায় চৌপাটি খুলে বসেছেন। সিদ্ধার্থ সেখানে এসে পণ্ডিতের কাছে শাস্তর শিখতে লাগলেন। উদরকের মত পণ্ডিত তখন ভূভারতে কেউ ছিল না। লোকে বোল্‌তো ব্যাসদেবের মাথা আর গণেশের পেট—এই দুইটি এক হয়ে অবতার হয়েছেন উদরক শাস্ত্রী। সিদ্ধার্থ কিছুদিনেই সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন, কোনো ধর্ম্ম কোনো শাস্ত্র জানতে আর বাকি রইল না। শেষে একদিন তিনি গুরুকে প্রশ্ন কল্লেন—দুঃখ যায় কিসে? উদরক সিদ্ধার্থকে বল্লেন—এস, তুমি আমি দুজনে একটা বড়গোছের চৌপাটি খুলে চারিদিকে সংবাদ পাঠাই, দেশ বিদেশ থেকে ছাত্র এসে জুটুক, বেশ সুখেসচ্ছন্দে দিন কাট্‌বে। এই পেটই হচ্ছে দুঃখের মূল, একে শান্ত রাখ, দেখবে দুঃখু তোমার ত্রিসীমানায় আসবে না। উদরক শাস্ত্রীকে দূর থেকে নমস্কার করে সিদ্ধার্থ চৌপাটি থেকে বিদায় হলেন। দেখলেন, গ্রামের পথ দিয়ে উদরকের সাতশো চেলা ভারে ভারে মোণ্ডা নিয়ে আসছে—গুরুর পেট্‌টি শান্ত রাখতে। সিদ্ধার্থ গ্রামের পথ ছেড়ে বনের ভিতর দিয়ে চল্লেন। এই বনের ভিতর কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা। ইনিই একদিন শুদ্ধোদন রাজার সভায় শুনে বলেছিলেন, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হবেন। কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে আর চারজন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল। তাঁরা সবাই সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে তাঁর সেবা করবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে কপিলবাস্তু থেকে চলে এসেছেন।

অঞ্জনা নদীর তীরে উরাইল বন। সেইখানেই সিদ্ধার্থ তপস্যায় বসলেন—

দুঃখের শেষ কোথা তাই জানতে। শাস্ত্রে যেমন লিখেছে, গুরুরা যেমন বলেছেন, তেমনি করে বছরের পর বছর ধরে সিদ্ধার্থ তপস্যা কচ্চেন। কঠোর তপস্যা—ঘোরতর তপস্যা,—শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বাদলে অনশনে একাসনে এমন তপস্যা কেউ কখনো করেনি! কঠোর তপস্যায় তাঁর শরীর শুকিয়ে কাঠের মত হয়ে গেল, গায়ে আর একবিন্দু রক্ত রইল না—দেখে বোঝা যায় না আর তিনি বেঁচে আছেন কি না!

সিদ্ধার্থের কত শক্তি ছিল, কত রূপ ছিল, কত আনন্দ কত তেজ ছিল, ঘোরতর তপস্যায় সব একে একে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁকে দেখলে মানুষ বলে আর চেনা যায় না;—যেন একটা শুক্‌নো গাছের মত তিনি দাঁড়িয়ে আছেন! এমনি করে ছয় বছর কেটে গেছে। সে দিন নতুন বছর, বৈশাখ মাস, গাছে গাছে নতুন পাতা নতুন ফল নতুন ফুল। উরাইল বনে যত পাখী যত প্রজাপতি যত হরিণ যত ময়ূর সব যেন আজ কিসের আনন্দে জেগে উঠেছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, উড়ে উড়ে গেয়ে গেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। সিদ্ধার্থের পাঁচ শিষ্য শুনতে পাচ্চেন খুব গভীর বনের ভিতরে যেন কে এক-জন একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। সারাবেলা ধরে আজ অনেকদিন পরে শিষ্যরা দেখছেন সিদ্ধার্থের স্থির দুটি চোখের পাতা একটু একটু কাঁপছে,—বাতাসে যেন শুক্‌নো ফুলের পাপড়ি। বেলা পড়ে এসেছে, গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ-বেলার সিঁদুর-আলো নদীর ঘাট থেকে বনের পথ পর্য্যন্ত বিছিয়ে গেছে—গেরুয়া-বসনের মত।

একদল হরিণ বালির চড়ায় জল খেতে নেমেছে, গাছের তলায় একটা ময়ূর ঠাণ্ডা বাতাসে আপনার সব পালক ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আগে প্রাণ ভরে একবার নেচে নিচ্ছে, সেই সময় সিদ্ধার্থ চোখ মেলে চাইলেন,—ছবছর পরে আজ প্রথম তিনি যোগাসন ছেড়ে নদীর দিকে চল্লেন। শিষ্যরা দেখলেন, তাঁর শরীর এমন দুর্ব্বল যে তিনি চলতে পাচ্ছেন না। নদীর পারে একটা আমলকী গাছ জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল, সিদ্ধার্থ তারি একটা ডাল ধরে আস্তে আস্তে জলে নাম্‌লেন। তার পর অতি কষ্টে জল থেকে উঠে গোটাকয়েক আমলকী ভেঙে নিয়ে বনের দিকে চলবেন আর অচেতন হয়ে নদীর ধারে পড়ে গেলেন। শিষ্যেরা ছুটে এসে তাঁকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে এল। অনেক যত্নে সিদ্ধার্থ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কুণ্ডিণ্য প্রশ্ন কল্লেন—প্রভু, দুঃখের শেষ হয় কিসে জানতে পাল্লেন কি? সিদ্ধার্থ ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"না"—"এখনো না"। অন্য চার শিষ্য তাঁরা বল্লেন—"প্রভু, তবে আর একবার যোগাসনে বসুন, জান্‌তে চেষ্টা করুন, দুঃখের শেষ আছে কি না।"

সিদ্ধার্থ চুপ করে রইলেন। কিন্তু শিষ্যদের কথার উত্তর দিয়েই যেন একটা পাগলা বনের ভিতর থেকে একতারা বাজিয়ে গেয়ে উঠল—নারে! নারে! নাইরে নাই! কুণ্ডিণ্য বল্লেন,—জানবার কি কোনো পথ নেই প্রভু? সিদ্ধার্থ বল্লেন—পথের সন্ধান এখনও পাইনি কিন্তু দেখ তার আগেই এই শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়ল, বৃথা যোগেযাগে নষ্ট হবার মত হল।

এখন এই শরীরে আবার বল ফিরিয়ে আনতে হবে, তবে যদি পথের সন্ধান করে ওঠা যায়। নিস্তেজ মন দুর্ব্বল শরীর নিয়ে কোনো কাজ অসম্ভব। শরীরকে সবল রাখ, মনকে সতেজ রাখ। বিলাসীও হবে না উদাসীও হবে না, শরীর মনকে বেশি আরামও দেবে না বেশি কষ্টও সহাবে না তবেই সে সবল থাকবে কাজে লাগবে পথের সন্ধানে চলতে পারবে। একতারার তার যেমন জোরে টেনে বাঁধলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি বেশি কষ্ট দিলে শরীর মন ভেঙে পড়ে। যেমন তারকে একবার ঢিলে করে দিলে তাতে কোনো সুরই বাজেনা তেমনি শরীর মনকে আরামে আলস্যে ঢিলে করে রাখলে সে নিষ্কর্ম্মা হয়ে থাকে। বৃথা যোগেযাগে শরীর মনকে নিস্তেজ করেও লাভ নেই, বৃথা আলস্যে বিলাসে তাকে নিষ্কর্ম্মা বসিয়ে রেখেও লাভ নেই, —মাঝের পথ ধরে চলাই ঠিক।

সেদিন থেকে শিষ্যেরা দেখলেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীদের মত ছাইমাখা আসন বেঁধে বসা, ন্যাস কুম্ভক তপ জপ ধুনি ধুনুচি সব ছেড়ে দিয়ে আগেকার মত আবার গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে দিন কাটাতে লাগলেন। কেউ নতুন কাপড় দিলে তিনি তাই পরেন, কেউ ভালো খাবার দিলে তিনি তাও খান্। শিষ্যদের সেটা মনোমত হল না। তাদের বিশ্বাস যোগী হতে হলেই গরমের দিনে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে শীতের দিনে সারারাত জলে পড়ে কখনো উর্দ্ধবাহু হয়ে দুই হাত আকাশে তুলে কখনো হেঁটমুণ্ডু হয়ে দুই পা গাছের ডালে বেঁধে থাকতে হয়। প্রথমে, দিনের মধ্যে একটি কুল, তার পর সারা দিনে একটি বেলপাতা, ক্রমে এক ফোঁটা জল তার পর তাও নয়, এমনি করে যোগসাধন না করলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। কাজেই সিদ্ধার্থকে একলা রেখে একদিন রাত্রে তারা কাশীর ঋষিপত্তনের দিকে চলে গেল—সিদ্ধার্থের চেয়ে বড় ঋষির সন্ধানে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আধুনিক ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সিপাহী-বিদ্রোহ।

সংবাদপত্রাদিতে সমালোচিত ক্রিমিয়ার ঘটনাবলী, রুশ কর্ত্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা—লোকের মনকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। ইংলণ্ড এতদিন বাহুবলের সাহায্যে রাজত্ব করিতেছিলেন; ভারতবাসীরা মনে করিল এইবার ইংলণ্ডের সিংহাসন টলিয়াছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে, ইংরাজ

সেনা-নায়কেরা বেশ অনুভব করিতে লাগিল, সিপাহীরা তাহাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে; প্রায় প্রত্যেক ছাউনীর মধ্যেই পুনঃপুনঃ অগ্নিদাহ হইতে লাগিল, গুরুতর অবাধ্যতা লক্ষিত হইতে লাগিল। কতকগুলি রেজিমেণ্টকে বিদায় দেওয়া হইল। ১০ই মে তারিখে মিরাট-ছাউনীর মধ্যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। কঠোর দণ্ডপ্রয়োগে সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিল। তিন ইংরেজ রেজিমেণ্টের সাহায্যে সেনাপতি, বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে পারিতেন; কিন্তু সেনাপতির সেরূপ উদ্যমবীর্য্য ছিল না। সিপাহীরা দিল্লীতে উপনীত হইল এবং সেখানকার সিপাহীদিগকে আপন দলে টানিয়া লইল। মুসলমানগণকর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাবে আহূত হইয়া, মৌনসম্মতিক্রমে হিন্দুগণকর্ত্তৃক পরিপোষিত হইয়া, বিদ্রোহীরা ইংরাজদিগকে পলাইতে বাধ্য করিল; পরে, প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্বতন সমস্ত রাজ-অধিকার প্রত্যর্পণপূর্ব্বক মোগল-সম্রাটকে দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। অবশ্য এই অধিকারগুলা স্থায়ী অধিকার নহে; কেননা, কিয়ৎকাল পরেই দেখিতে পাই, এই বৃদ্ধ সম্রাট্ ভাগ্যের দারুণ কশাঘাতে অতিষ্ঠ হইয়া মেক্কা যাত্রা করিবার জন্য বৃথা অনুমতি চাহিতেছেন। তাই বিদ্রোহের প্রথম-কেন্দ্রস্থলটিতে আমরা একটি মুসলমানী আন্দোলন এবং একটি রাষ্ট্রীয় আন্দোলন দেখিতে পাই। বিদ্রোহীরা মোগল-সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল।

বিদ্রোহের দ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল কানপুরেও একটা রাষ্ট্রীয় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল—কিন্তু ইহা হিন্দু-প্রধান। দিল্লীর ঘটনাবলী, সেখানকার সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ উত্তেজিত করিল। তাহারা নানাসাহেবকে প্রধান বলিয়া বরণ করিল। পেশোয়ার উত্তরাধিকারীর পতাকাতলে নগরের সমস্ত অধিবাসী সমবেত হইল। একটা প্রচ্ছন্ন "ওৎপাতা" স্থানে আকৃষ্ট হইয়া ইংরাজ অধিবাসীরা কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

বিদ্রোহের তৃতীয় কেন্দ্রস্থল অযোধ্যা। কোম্পানী কর্ত্তৃক স্বকীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হওয়ায় সেখানকার তালুকদারেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং স্বকীয় অধীন পুরাতন প্রজাবৃন্দকে আপন দলে টানিয়া আনিল। সমস্ত প্রদেশটা ইংলণ্ডের হস্ত-বিচ্যুত হইল। লক্ষ্ণৌয়ের ইংরেজ দুর্গ-সৈন্য অবরুদ্ধ অবস্থায় ছয়মাস ধরিয়া বীরত্ব- সহকারে আত্মরক্ষা করিল।

মধ্য-প্রদেশগুলা বিদ্রোহের চতুর্থ কেন্দ্রস্থল। দত্তক-পুত্র-গ্রহণসম্বন্ধে লর্ড ড্যালহৌসির আইনের বিরুদ্ধে বহুল প্রতিবাদ সমুত্থিত হয়। স্বরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া তরুণবয়স্কা ঝাঁশীর রাণী সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং স্বকীয় সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতের এইরূপ অবস্থা ছিল। তখন মনে হইয়াছিল, যেন ইংরেজ-শাসনের অন্তিম দশা উপস্থিত। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বিদ্রোহীরা অন্য বিদ্রোহী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্‌ভাবে ছিল। অবশ্য,

দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ও কানপুরের অন্তর্বর্তী সমস্ত দেশটাই বিদ্রোহীদের দখলে আসিয়াছিল। রাজাদিগের অপক্ষপাতিতা সত্ত্বেও, হোলকার ও সিন্ধিয়ার সৈন্যমণ্ডলী বিদ্রোহীর দলে মিশিয়াছিল। বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিভাগে, বিদ্রোহের আশঙ্কা—বিশেষতঃ সিপাহী-বিদ্রোহের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল প্রদেশে সৈন্যমণ্ডলী ও সাধারণ প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হয় নাই। ভারতের স্বাধীন রাজারা ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। মোগল সম্রাট, ও নানাসাহেবও অযোধ্যার মুসলমানদিগের সহিত মিলিবার জন্য একটা বোঝাপড়া করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। ভারতের সর্ব্বত্রই অসন্তোষের একই হেতু সমূহ হইতে বিদ্রোহ কিংবা বিদ্রোহের আশঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছিল। কোথাও ভারতবাসীর আন্তরিক রাজভক্তি প্রকাশ পায় নাই।

*
* *

ইংরাজেরা এই রাজভক্তি ভারতবাসীর মনে উদ্রেক করিতে পারেন নাই। বিদ্রোহীদিগের অপকর্ম্মে ক্রোধান্ধ হইয়া ইংরাজেরা অলস্ত প্রতিশোধের আকাঙ্খা করিল; দিল্লী ভূমিসাৎ করিবে এইরূপ বলিতে লাগিল; খৃষ্টান ছাড়া আর সকলকেই সন্দিগ্ধ শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য দাবী করিতে লাগিল। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা, বিশেষতঃ লর্ড-ক্যানিং মনের স্থৈর্য্য কতকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। যাহারা সমস্ত দেশে প্রাণদণ্ডরূপ কঠোর দণ্ডনীতি প্রতিষ্ঠার দাবী করিতেছিল, যাহারা লর্ড ক্যানিংকে দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া দোষারোপ করিতেছিল, যাহারা তাঁহাকে নানা প্রকারে অবমাননা করিতেছিল,—লর্ড গ্র্যান্‌ভিলের নামে লিখিত পত্রে তিনি তাহাদিগকে ধীর গম্ভীরভাবে এই উত্তর দিয়াছিলেন :—

"মনে করুন যদি, যুদ্ধটা আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, অযোধ্যা কিম্বা অন্যান্য বিদ্রোহী প্রদেশের ত্রিসীমাতেও যদি আমরা পদার্পণ করিতে আর না পারি, আমাদের বাহুবল সম্বন্ধে তখনও যদি লোকের অবিশ্বাস থাকে—তথাপি বড় বড় তিনটি প্রদেশের রাজভক্তি বজায় রাখা, দূরদর্শী বিচক্ষণ গভর্ণমেন্টের উচিত নহে কি? সমস্ত শ্রেণীর লোককে দণ্ডার্হ বলিয়া, অসাধু বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা—ইহা কি কখন সম্ভবপর? ঈশ্বরের দোহাই, উচ্চকণ্ঠে এই কথা আপনি ঘোষণা করুন, এই সমস্ত ব্যাপার আপনি থামাইয়া দিন। আর আমার কথা যদি বলেন,—যত দিন আমার দেহে প্রাণ থাকিবে,—যে নীতি আমরা অবলম্বন করিয়াছি তাহা ছাড়া অন্য নীতি আমি কখনই অনুসরণ করিব না। শুধু সময়োপযোগী ও আশুফলপ্রদ বলিয়া নহে,—ধ্রুব সনাতন ন্যায়ধর্ম্মের অনুগত বলিয়াই আমি এই নীতি অবলম্বন করিয়াছি। আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রজাশাসন করিতে চাহি না। আমি সুবিচার করিব, আমি অকাট্য কঠোর ন্যায়ধর্ম্মানুসারে সুবিচার করিব—আইন ও রাজশক্তি বজায় রাখিয়া সুবিচার করিব। কিন্তু আমার উপর যতদিন ভারত-শাসনের দায়িত্ব থাকিবে, ততদিন আমি কাহাকেও এমন একটি কাজও করিতে দিব না, একটি কথাও উচ্চারণ করিতে দিব না যাহাতে ক্রোধের ভাব প্রকাশ পায়, কিংবা অবিবেচনা ও হঠকারিতা প্রকাশ পায়।"

লর্ড ক্যানিং যাহা বলিয়াছিলেন—বস্তুতই এই রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানীজনোচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্রনীতি। এই যুদ্ধ জাতিসংঘর্ষজনিত যুদ্ধ নহে, এই বিদ্রোহ জনসাধারণের বিদ্রোহ নহে,—কেবল আংশিক সিপাহী-বিদ্রোহ

মাত্র। তাই পৃথকভাবে এই সকল বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল। ১৫ই জুলাই তারিখে কানপুর, ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী, এবং ১৬ই নভেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌ পুনর্ব্বার দখল করা হয়। অযোধ্যা ও মধ্য-ভারতের প্রদেশ সমূহে সম্পূর্ণরূপে শান্তিস্থাপন করিতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। যদিও সংগ্রামের আগ্রহ ও উত্তেজনা, কতকগুলি রাজপুরুষকে গর্হিত কর্ম্মের আবর্ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু মোটের উপর ইংরেজ সরকার, যেমন মিতাচারিতা—তেমনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ হইতে অনেকগুলি শিক্ষালাভ হয়। (১)

---

(১) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ।—লর্ড ড্যালহৌসির পদত্যাগ (মার্চ ১৮৫৬)। লর্ড ক্যানিং ভারতের গভর্ণর জেনারেল (১ আগষ্ট ১৮৫৫)। বম্বে আগমন (২৬ জানুয়ারী ১৮৫৬); কলিকাতায় আগমন (২৮ ফেব্রুয়ারী)। আফগানিস্থানের সহিত সন্ধিস্থাপন (১৮৫৭-র প্রারম্ভে)। পারস্যের সহিত যুদ্ধ (১৮৫৭)। বন্দুকের টোটার ব্যাপার। বারাকপুর ও মুর্শিদাবাদে আন্দোলন। (১৮৫৭-র প্রারম্ভে)। বারাকপুরে নূতন বিদ্রোহ (মার্চ)। মিরট-ছাউনীর সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় (১০ মে, ১৮৫৭); উহারা দিল্লী দখল করে, তত্রস্থ সিপাহীদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করে, মোগল-বাদশাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করে (১১ মে)। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সর্-জন্-লরেন্স্, পঞ্জাবের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করেন এবং শিখদিগের রাজভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখেন।

দিল্লী।—দিল্লীর সিপাহীবিদ্রোহ (১১ মে)। ইংরেজরা দিল্লী অবরোধ করে (৮ জুন)। পঞ্জাব হইতে সৈন্য লইয়া নিখলসনের আগমন (আগষ্ট)। দিল্লী আক্রমণ (১৪ সেপ্টেম্বর)। দিল্লীর রাজপথে যুদ্ধ (১৪-২০ সেপ্টেম্বর)। হড্‌সন্ কর্ত্তৃক দিল্লীর সাজাদাদিগের হত্যা। বাদ্‌শাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া রেঙ্গুনে চালান করা হইল—সেইখানেই বাদ্‌সার মৃত্যু হয় (১৮৬২)

কানপুর।—সিপাহীদিগের সমুত্থান (৬ জুন)। নানাসাহেব (ধুন্ধু-পন্থ) তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ইংরাজেরা (স্ত্রী, পুরুষ, শিশু) যে পরিখার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই পরিখা অবরোধ। ২৭ জুনে ইংরাজেরা নানা-সাহেবের সহিত সন্ধি করিল, এবং এলাহাবাদে যাত্রা করিবার জন্য গঙ্গায় নৌকায় আরোহণ করিল। সংখ্যায় তাহারা ৪৫০ জন। নানাসাহেব নদীতটে অবস্থিত সৈন্যের দ্বারা তাহাদের উপর গুলি গোলা বর্ষণ করিল; কেবল ৪ জন মাত্র বাঁচিয়া যায়। ১২৫ জন রমণী ও শিশুকে কারাবদ্ধ করা হয় এবং ভীষণ যন্ত্রণা প্রয়োগ সহকারে ১৫ জুলাই তারিখে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। সেই দিনই হ্যাভ্‌লকের নেতৃত্বাধীনে ইংরাজেরা কানপুর দখল করে। অযোধ্যার বিদ্রোহীদের সহযোগে যুদ্ধ করিয়া নানাসাহেব ১৮৫৮ অক্টোবরে নেপালে পলায়ন করে।

লক্ষ্ণৌ।—অযোধ্যার Chief Commissioner. Sir Henry Lawrence সমস্ত য়ুরোপীয় অধিবাসী-দিগকে লইয়া দুর্গ-পরিণত রেসিডেন্সি-নিবাসে অগ্রেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। ৪ জুলাই তারিখে, এক গুলির আঘাতে নিহত হন। Havelock ও Outram কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সির প্রথম উদ্ধার। ইঁহারাও আবার বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেনাপতি Sir Colin Campbell (পরে Lord Clyde) কর্ত্তৃক দ্বিতীয়-উদ্ধার (১৬ নভেম্বর ১৮৫৭)। নানা সাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া-টোপির উপর বিজয় লাভ। নিশ্চিতভাবে লক্ষ্ণৌ অধিকার (মার্চ ১৮৫৮)। অযোধ্যায় সম্পূর্ণরূপে শান্তি-স্থাপন (জানুয়ারী ১৮৫৯)।

দুই সভ্যতার সংঘর্ষ হইতে যে সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী, লর্ড ড্যালহৌসী-কর্তৃক প্রবর্ত্তিত দিগ্বিজয়-নীতি ও ভারতের আর্থিক ও বৈষয়িক উন্নতি-চেষ্টা, ঐ সংগ্রামকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল—এই মাত্র। শুধু অগ্রসর করিয়া দেওয়া নহে, হয় ত বাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু উহাতে ভারত ও ইংলণ্ড উভয়েরই লাভ হইয়াছিল। এই শোণিত-প্লাবী সংগ্রাম না ঘটিলে, উভয়েই বধিরভাবে পরস্পরের বৈরসাধনে রত থাকিত, পরস্পরের দুঃখ-অভিযোগ বুঝিতে পারিত না। এই সিপাহী-বিদ্রোহ, ইংলণ্ডের নিকট ইংলণ্ডের দোষগুলি উদ্‌ঘাটিত করিল, ভারতের নিকট প্রতিরোধচেষ্টার ব্যর্থতা প্রকাশ করিয়া দিল। যে-ভারত-বিজয় য়ুরোপীয় সভ্যতা-কর্তৃক বিলম্বে ও যেন কতকটা অজ্ঞাতসারে সাধিত হইয়াছিল, সেই বিজয়-ব্যাপারের অন্তর্ভূত এই সিপাহী-বিদ্রোহরূপ একটিমাত্র ঘটনা, প্রকটভাবে দেখাইয়া দিল,—কতটা পথ অতিক্রম করা হইয়াছে, আরও কতটা পথ অতিক্রম করিতে হইবে।

কতকগুলি সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইলেও ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ আংশিক বিদ্রোহে পরিণত হয়। উহার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সামাজিক বা রাষ্ট্রিক মতামতের অস্তিত্ব ছিল না। মোগল বাদশাকে ভারত-রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার জন্য দিল্লীর মুসলমানেরা কিছুই করে নাই। অথবা কানপুরের হিন্দুরা, পেশোয়াকে উহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য কোন চেষ্টা করে নাই। কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করে নাই এবং ব্রাহ্মণেরাও সতীপ্রথা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, বা য়ুরোপীয় দ্রব্য জাত দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্যও কোন দাবী করে নাই।

পূর্ব্ব হইতে-বিজিত লোকদিগের মনোভাব যেরূপ হইয়া থাকে সেই মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণ হিন্দুরা স্বভাবতই এই বিদ্রোহের প্রতি বিমুখ হইয়াছিল এবং কার্য্য-সিদ্ধি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকায়, তাহারা ভবিষ্যতের জন্য কোনপ্রকার মতলবও আঁটে নাই। পোলণ্ডে ও আয়র্লণ্ডে এখনও যাহা টিঁকিয়া আছে—সেই রাষ্ট্র-সাধারণ প্রতিবাদ বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিদ্রোহভাব সিপাহী-বিদ্রোহ নির্ম্মূলিত হইবার পর, ভারত হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইল। ভারতে, সকল লোকেরই এইরূপ ধারণা হইল যে, হিন্দু-সভ্যতার অন্তিম দশা উপস্থিত—এখন নব-যুগের হস্তে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন গতি নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধ্যভারত-প্রদেশসমূহ।—ঝাঁসির রাণী (২০ বৎসর বয়স্কা) ও তাঁতিয়া টোপীর সহিত Sir Hugh Rose এর (পরে Lord Strathnairn) যুদ্ধ বিগ্রহ। ঝাঁসি ও কাল্পী ইংরাজের দখলে আসিবার পর, মনে হইল বুঝি মধ্যভারতে যুদ্ধের অবসান হইল, কিন্তু সেই সময়েই সিন্ধিয়ার সৈন্যমণ্ডলী বিদ্রোহীর হস্তে গোয়ালিয়র সমর্পণ করিল। পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিজ সৈন্যের নেত্রী ঝাঁসির রাণী নিহত হইলেন (জুন ১৮৫৮)। গোয়ালিয়র অধিকার (২০ জুন)। আরও দীর্ঘকাল তাঁতিয়া টোপীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁতিয়া-টোপী ধৃত হয়, ১৮ এপ্রিলে তাহার ফাঁসী হয়।

ভারতবর্ষে অর্থনীতি-অধ্যয়ন

(অধ্যাপক রাসেল ও সমাদ্দার লিখিত)

মনোবিজ্ঞান ও দর্শন ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রেই প্রাচীন ভারতবাসিগণ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই ; অথবা অর্থোৎপাদন বা মনুষ্যের আর্থিক উন্নতি-কামনায় সময়াতিপাত করেন নাই, এরূপ জনশ্রুতি ও প্রবাদ আবহমানকাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ যে কেবল এক পক্ষেরই কথা, সংস্কৃত-সাহিত্য পাঠ করিলে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও নানা-বিদ্যা-অনুশীলনের উৎকর্ষতার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, সেই সকল পুস্তক পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন ভারতীয়গণ অর্থবৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়-পর্য্যালোচনাতেও বিরত ছিলেন না এবং ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন পাটলিপুত্রে বা বর্ত্তমান পাটনায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তক-পাঠ শিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল। চাণক্যের অর্থ-শাস্ত্র নামক শিক্ষাপ্রদ পুস্তক-পাঠে জানিতে পারা যায় যে, বার্ত্তা চতুর্ব্বিদ্যার অংশভূত ছিল এবং উপবীতধারী ছাত্রগণ, অর্থশাস্ত্রবিৎ রাজকীয় কর্ম্মচারীগণের নিকট এই অতীব প্রয়োজনীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আদিষ্ট হইতেন।

প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে এই বিষয়টীর আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে ; অথবা, রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের কাল হইতে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর রাজ-রাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অর্থনীতির কিরূপ চর্চ্চা হইয়াছে, তাহারও হিসাব দিতে আসি নাই। এস্থলে আমরা অতীতের স্মৃতি জাগাইতে চাহি না—আমরা শুধু বর্ত্তমান ও নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা বলিবার প্রয়াস পাইব। অবশ্য ইহা বলিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যে অর্থনীতির চর্চ্চা বর্ত্তমান ভারতে অত্যাবশ্যক বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও আজিকালি যাহার চর্চ্চাও হইতেছে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ নূতন নহে,—এবং আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে এরূপ চর্চ্চায় নূতনত্ব কিছুই নাই। ইহা ভারতবাসীর নিজস্বই।

তবে, ইহাও সহজে প্রণিধান হইবে যে, চাণক্যের সময় যেরূপে ও যে-ভাবে অর্থনীতির আলোচনা হইত, এক্ষণে সেরূপ ভাবে উহার আলোচনা করিলে সুফল ফলিবে না। কারণ এ কথা বলাই বাহুল্য যে, চাণক্য ও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা যেরূপ ছিল, বর্ত্তমানে তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাঁহারা যেরূপ ভাবে অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেরূপভাবে আলোচনা বর্ত্তমানকালে সম্ভবপরও নহে। দ্বিসহস্র বৎসরের কথা দূরে থাকুক, এক শত বৎসরের

কথা ধরিলেও দেখা যায় যে আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার প্রথা—উভয়েরই যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে এই পরিবর্ত্তন আরও দ্রুতবেগে হইতেছে। পরলোকগত জষ্টিস রাণাডে ও সার থিওডর মরিসন এই বিষয়টী আমাদের সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং যদিও এই উভয় লেখকের সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ মিল হইবে না, তথাপি মোটের পর তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ভারতবর্ষে অর্থনীতির বিষয় ও আলোচনার প্রচারে এত পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়াই এখানে অর্থনীতির অধ্যয়নে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ও সেইজন্যই ভারতীয় অর্থনীতিতে এমন একটু বিশেষত্ব আছে, যাহা অপর দেশের অর্থনীতিতে দেখা যায় না।

প্রতিবন্ধক

অর্থনীতির আলোচনায় প্রতিবন্ধক যে যথেষ্ট আছে, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। বিশেষতঃ ঔপপত্তিক ও কার্য্যকরী বিভাগের সামঞ্জস্য করা অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাহার উপর, অন্যান্য দেশে অর্থনীতির অনেকগুলি সূত্র যেভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, ভারতবর্ষে তাহা আদৌ পারে না। ইহাও কম অসুবিধার কথা নহে। এই সকল অসুবিধা থাকার জন্যই ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা করিতে হইলে অত্যন্ত সাবধানে করিতে হইবে। খুব কম বিজ্ঞানই অর্থনীতির ন্যায় আমাদের কার্য্যকরী শিক্ষা দেয়, কিন্তু, অসতর্ক ব্যক্তিগণের পক্ষে অর্থনীতির আলোচনা করিতে যাওয়ায় পদস্খলনের সম্ভাবনাও তদ্রূপ অধিক। অর্থনীতির নাম করিয়া অনেক সময় অনেক বাচালতা প্রকাশ করা হয়! হিতোপদেশে কথিত হইয়াছে যে 'পল্লবগ্রাহিতা'র ন্যায় ভীষণ রোগ আর নাই! অর্থনীতি সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে এক্ষেত্রে পল্লবগ্রাহিতা অত্যন্ত সহজসাধ্য এবং তজ্জন্য পথও অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল। কিন্তু, ইহা হইতে যেন কেহ মনে না করেন যে, এজন্য এ শাস্ত্রের আলোচনা না করাই যুক্তিসঙ্গত। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। যদিও অর্থনীতিতে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী বটে, কিন্তু তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত কখনই সমীচীন হইবে না যে ইহা হইতে দূরে থাকাই সঙ্গত। তৎপরিবর্ত্তে, অর্থনীতি সাতিশয় যত্নপূর্ব্বক পাঠ করা এবং আমাদের ক্ষমতানুযায়ী ইহার সম্যক আলোচনা করা কর্ত্তব্য, এইরূপ সিদ্ধান্তই বাঞ্ছনীয়। অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য যে ব্যাঘাত হয়, তাহা দূরীভূত করাই শ্রেয়ঃ।

এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যে সকল প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে সংক্ষেপে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; প্রথম—শাস্ত্র-সংক্রান্ত ঘটনাবলী অত্যন্ত জটিল এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল ঘটনা-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ববশতঃ উচিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এখন প্রথমটীর বিষয় অগ্রে আলোচনা করা যাউক।

অর্থনীতি-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর জটিলতা

প্রত্যেক সমাজেই অর্থোৎপাদনে ও বণ্টনে অনেকগুলি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়

এবং এই সকল প্রক্রিয়াগুলির সহিতই উৎপাদন ও বণ্টনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন এক সমাজের যে কোন ব্যক্তির কথা আলোচনা করা যাউক। রাজা বা প্রজা, কোটীপতি বা দরিদ্র যে-কাহারও হৌক, এক জনের জীবনের এক মাসের ঘটনা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এই ব্যক্তি এক মাসে যাহা উপার্জ্জন করে বা ব্যয় করে, তাহার প্রত্যেক কারণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এ পরীক্ষার আদি বা অন্ত নাই। অর্থনীতির হিসাবে সেই মাসে সেই ব্যক্তি অর্থোৎপাদনে ও বণ্টনের জন্য যে সকল প্রক্রিয়ার আশ্রয় লয় এবং যে যে কারণে সে সেই সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, তাহার বর্ণনা করিতে হইলে তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, তাহার বংশাবলীর বিষয় ত আলোচনা করিতেই হইবে, তদ্ব্যতীত সে ব্যক্তি যে সমাজের অন্তঃভূর্ত, সে সমাজের রীতি-নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিতে হয়। তৎপরে, আরও কতকগুলি বাহ্যিক কারণ আছে। এ কারণগুলি প্রথম দৃষ্টিতে গুরুতর বলিয়া বোধ না হইলেও অর্থনীতির হিসাবে উহাদের যথেষ্ট মূল্য আছে। মনে করুন, সেই ব্যক্তি বেহার প্রদেশের কোন স্থানে শস্যাদি ক্রয় বা বিক্রয় করে। দ্রব্যাদির জন্য সে যে মূল্য প্রদান করে বা বিনিময়ে সে যে দ্রব্য লাভ করে, সেই দ্রব্যের পরিমাণ জলবায়ুর দোষে (Climatic condition) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন হইতে পারে। রুসিয়া বা আমেরিকার ত কথাই নাই। তদ্রূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা, পরিধেয় বস্ত্র বা কেরোসিন তৈলের জন্য সেই ব্যক্তিকে যে মূল্য প্রদান করিতে হয়, অনেকগুলি কারণে সেই মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। ইংলণ্ডের মন্ত্রীপরিবর্ত্তন বা আমেরিকার কর্পোরেশনদের বাই-ল (Bye-law) পরিবর্ত্তনের জন্য ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হইতে পারে। অর্থাৎ, আমরা যে বিষয়টীই আলোচনা করি না কেন, তাহাতেই দেখিতে পাই যে বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য্য করিতেছে এবং এই সকল কার্য্যের প্রত্যেকটীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা কিছু সহজ ব্যাপার নহে।

এই প্রকার কতকগুলি কারণেই অনেক সময়ে কেহ কেহ অর্থনীতির পুরাতন পদ্ধতিগুলি একেবারে পরিত্যাগ করিতে চাহেন। আমাদের মতে এরূপ করা কদাপি যুক্তিসঙ্গত নহে। এই বিষয়টির আলোচনা আমরা পুনরায় যথাস্থানে করিব। বর্ত্তমানে আমরা এইমাত্র বলিতে চাহি যে, কোন একটি স্থূল বিষয়ের আলোচনা-কল্পে প্রাসঙ্গিক অবস্থাগুলির কথা না ধরিয়া, সাধারণে যে মিথ্যা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন এবং সকল অবস্থাতেই একবিধ সমতার (Uniformity) কথা মনে করিয়া কার্য্য করেন, তাহা ঠিক নহে। পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে যে সকল অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থূল বিষয়াদির আলোচনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন, তাঁহাদের সমালোচকগণও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ সঙ্কীর্ণভাবে কোন বিষয় আলোচনা করায় যেমন দোষ, অনিশ্চিত ও

শিথিলভাবে তাহার আলোচনাতেও ঠিক সেই দোষ ঘটিয়া থাকে। সোজা পথে (Short cut) একদিকে সত্যানুসন্ধান করিলে হয়ত কোন সত্যের আবিষ্কার করা যায় না, কিন্তু তাহা হইতে এরূপ অনুমানও সঙ্গত হইবে না যে অপরদিকে এইরূপ ভাবে সংক্ষেপে কার্য্য করিলেও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে না। অথচ অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে ঠিক এই প্রকার তর্কেরই আশ্রয় গ্রহণ করা হয়! দৃষ্টান্তস্বরূপ, রক্ষণীয় নীতির স্বপক্ষে যে সকল কথা বলা হইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটা কথা শুনা যায় যে (Laissez Faire) ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান সময়ে আর প্রযুজ্য হইতে পারে না; যে সকল সূক্ষ্ম যুক্তিদ্বারা এই কথা প্রমাণ করা হইত, সেগুলি এখনকার দিনে আর খাটে না সত্য, কিন্তু এইরূপ (Negative premises) বিয়োগান্ত প্রতিজ্ঞা হইতে (Negative conclusions) বিয়োগান্ত সিদ্ধান্ত মাত্রই পাওয়া যায়। অবাধ বাণিজ্যের গতি প্রতিহত করিবার স্বপক্ষে কোন মন্তব্য সম্বন্ধে ইহা সহজেই বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত মত আজিকার দিনে খাটে না বলিয়া ঐ মন্তব্যও প্রযুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু ইহা বলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইবে না। স্থান ও সময় ও প্রাসঙ্গিক কারণাদির আলোচনা করিয়া তবে ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা সমীচীন হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়াই যে কোন-একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই আজি-কালিকার প্রথা দাঁড়াইয়াছে।

পক্ষপাতিত্ব দোষ

ঐতিহাসিকগণও ঘটনার জটিলতার বিষয় আমলে না আনিয়া কোনরূপ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বে যে ভ্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রকার ভ্রমকে তাহারই অন্তর্গত দ্বিতীয় প্রকারের ভ্রম বলিয়া পক্ষপাতিত্ব-দোষ বলিব। অর্থনীতির আলোচনায় সম্পাদ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, কেবল সত্যের চক্ষেই সকল বিষয় দেখিতে হইবে এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হিসাবেই সকল বিষয়ের বিচার করিতে হইবে। এই বিষয়টি সহজেই দৃষ্ট হয়, এবং এই বিষয়ে কিছু বলাও সহজ; কিন্তু এই বিষয়ে কার্য্য করাই প্রকৃত পক্ষে কঠিন।

প্রধানত অর্থনীতি-অধ্যয়নের যে প্রথম আকর্ষণ তাহা কেবল বিজ্ঞান-শিক্ষার খাতিরেই নহে। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সুখ-দুঃখের কারণ, যাহাতে মনুষ্যের উন্নতি বা অবনতি হয়, সেই সকল বিষয় অনুষ্ঠানের জন্যই আমরা এই বিজ্ঞান শিখিতে আকৃষ্ট হই। এই সকল কারণ, অবস্থা ও শক্তি হইতে আমরা নিজেরা বিচ্ছিন্ন বা উদাসীন থাকিতে পারি না। উন্নতি ও অবনতি, সুখ ও দুঃখ এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বা ক্রিয়া আমরা দেখিতেছি এবং উন্নতি ও সুখের প্রতি আমাদের যেরূপ আকর্ষণ, অবনতি ও দুঃখের প্রতিও আমাদের ঠিক ততখানি বিতৃষ্ণা। প্রথমোক্তকে আমরা স্থায়ী এবং দ্বিতীয়কে দূরীভূত করিতে প্রয়াস পাই এবং

তজ্জন্য প্রকৃত ন্যায় ও অভিজ্ঞতায় যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহা ত্যাগ করিয়া উন্নতি ও সুখের আনুকূল্যে মত পোষণ করি।

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বাস্তব জগতে অর্থনীতি সংক্রান্ত সম্পাদ্য বিষয়গুলি পৃথক করিয়া অন্য সকল প্রকার বিষয় হইতে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নহে। যখনই আমরা অর্থনীতি সংক্রান্ত কোন বিষয় আলোচনা করিতে অগ্রসর হই, বা কার্য্যক্ষেত্রে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত শিক্ষানুযায়ী কোন পন্থা অবলম্বন করি, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেকগুলি বিষয় আছে, যাহা আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি বিষয়ক প্রশ্নগুলি, রাজনৈতিক, সামাজিক, ও ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্নের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং তজ্জন্য এই সকল বিষয়ই পরস্পর-হিসাবে অল্প-বিস্তর জড়িত এবং এই জন্যই তত্ত্বসংক্রান্ত বা ব্যবহারিক কোন প্রশ্ন উঠিলে ইহার জটিলতাও বৃদ্ধি পায়। কখনও কখনও ইহা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানকারীর নিকটে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে গেলে, অনেক সময়ে আমাদের ব্যবস্থা কিছু অস্পষ্ট হইয়া পড়িতে পারে।

যতই আমরা এই প্রকার সূক্ষ্ম বিচার হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা পাইয়া স্থূলভাবে আলোচনা করি, ততই এই সকল পক্ষপাতিত্ব-দোষ বৃদ্ধি পায়। যদি আমরা সূক্ষ্ম মূলতত্ত্বগুলি একেবারে পরিত্যাগ করি এবং প্রত্যেক প্রাসঙ্গিক বিষয় বিচারের জন্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের এক বিপদ হইতে অন্য বিপদে পড়িতে হইবে—সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিলে ন্যায়-সঙ্গতি এবং নিশ্চয়তাও বর্জ্জিত হইবে। তাহা হইলে তখন ইহারা গন্তব্য পথ হইতেও বিচ্যুত হইবে। দেখিতে নয়নরঞ্জন হইতে পারে; কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তের এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটিবে।

অর্থনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যে অনেক পক্ষপাতিত্ব-দোষ আসিয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এগুলি পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষার পদ্ধতি

বিষয়ের জটিলতা উপলব্ধি করিয়া এবং আমাদের পক্ষপাতিত্বের কথা মনে করিলে অর্থনীতির আলোচনায় দুইটী প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইবে। এই সকল প্রতিবন্ধকের গুরুত্ব হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু ইহাদিগকে একেবারে দূরীভূত করা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই আমাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রাখিয়া—ইহাদের অস্তিত্ব মনে করিয়া, অগ্রসর হওয়া। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইতেছে, এইগুলি স্মরণ-পথে রাখিয়া এমন শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে এইগুলি অনায়াসে আমরা অতিক্রম করিতে পারি।

অর্থনীতি শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে কিরূপ শিক্ষা আবশ্যক—সেই প্রাথমিক শিক্ষার সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিতে চাহি না। ইতিহাস, ভূগোল এবং

বর্ত্তমান ঘটনা সম্বন্ধে কিছু-কিছু জ্ঞান থাকা ব্যতীত অন্য বিশেষ কিছু শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। এতদ্ব্যতীত অন্য একটি বিষয় আবশ্যক—যাহা মন-মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা অত্যুত্তমরূপে সমীকরণ করা। কতকগুলি বিষয় যা তা করিয়া শিখিয়া এবং তাহাদের অর্থের প্রতি সম্যক দৃষ্টি না রাখিয়া কলের মত সেগুলি আওড়াইলে শিক্ষার পক্ষে তাহা অতীব হানিকর হইবে।

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত আপত্তি

দ্বিতীয় দফার আপত্তিগুলি এই স্থলেই উঠিবে এবং এই স্থলেই সেগুলির বিচার করিতে হইবে। ইহা বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য দেশের পক্ষে যাহা প্রযুক্ত হইতে পারে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওয়াল্টার বাজহট যাহা বলিয়াছেন, তাহারই প্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাজহট বলিয়াছেন যে, অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় যে সকল কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সকল দেশের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না—কেবল যে সকল দেশের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি লাভ ঘটিয়াছে সেই সকল দেশের প্রতিই ব্যবহৃত হইতে পারে। ইংলণ্ডের ন্যায় যে দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রচলিত সেই দেশে এরূপ সম্ভবপর। সেই হিসাবে, ভারতবর্ষের প্রতি ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে না—কারণ ভারতবর্ষে অনেক স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব। ভারতবর্ষের শিল্পবিষয়ক গঠন সম্পূর্ণ হইতে এখনও যথেষ্ট বিলম্ব রহিয়াছে এবং অনেকে এরূপও বলেন যে, এতদ্দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্বও নাই এবং দেশাচারই সকল বিষয়ে প্রভুত্ব প্রকাশ করে। ভারতীয় অর্থনীতির মূলাধার পরলোকগত জষ্টিস রানাডে বলিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষে জাতি ও পরিবার সকল বিষয়েই আধিপত্য বিস্তার করে। স্বাধীন ও অসীমাবদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতি ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি, সামান্য কয়েকটি নির্দ্ধারিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। দেশাচার ও আইনেরই প্রভাব অধিক এবং যুক্তি অপেক্ষা পদগৌরবই অধিক নিষ্পত্তিকরণক্ষম হইয়া থাকে। মূলধন বা পরিশ্রম চলনশীল নহে এবং একস্থান হইতে অন্য স্থানেও পরিচালনীয় নয়। বেতন ও লাভ নির্দ্ধারিত অবস্থায় থাকে এবং ঘটনানুসারে তাহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। যে সমাজ এইরূপে গঠিত, সে সমাজের অভিপ্রায়গুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া কার্য্যকরী হইতে পারে না; অধিকন্তু, তাহারা তাহাদের প্রকৃত পথ হইতে অপসৃত হয়।"

উপর্য্যুক্ত মতামতগুলি যে বিচারশক্তি এবং বহুদর্শিতার উপরে ন্যস্ত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি ইহা বলিতে হইবে যে অর্থনীতি বিষয়ক সাবেক মতগুলি ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারেই প্রযুক্ত হইতে পারে না এবং ভারতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত সম্পাদ্য বিষয়গুলির আলোচনার জন্য সেই প্রাচীন মতগুলি অধ্যয়ন করা ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র? আমরা এই প্রকার

সিদ্ধান্তের অনুকূলে আদৌ মত দিতে পারি না—বরং এ প্রকার সিদ্ধান্তের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী এবং আমাদের বিশ্বাস যে মহামতি রাণাডে যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও স্বীকার করিতেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী মতামতের পরিবর্ত্তনের সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। সাবেক মতের বর্ত্তমান স্বপক্ষীয়গণ তাহাকে অনেক পরিমাণে নমনীয় করিয়াছে এবং "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের" পার্থক্যও অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের উপযোগী পন্থা

ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী, তিনটী পন্থা বিবেচিত হইতে পারে।

(১) আমরা এরূপ ধরিয়া লইতে পারি যে, ভারতবর্ষের অবস্থা এমন নিয়ম-বিরহিত যে সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ যুক্তিগুলির কোনই মূল্য নাই এবং তজ্জন্য অমানুষিক পদ্ধতিগুলিতেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকি। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা ঘটনা-সংগ্রহ এবং তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করিব ও এই সকল ঘটনা যে সকল মত নির্দ্দেশ অথবা সপ্রমাণ করে তাহাই মাত্র নির্দ্ধারণ করিব। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থনীতির এইরূপ মালমসলা সংগ্রহ ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই করিতে পারি না। আমাদের শিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে এই মত গ্রহণীয় হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ এই পথে অগ্রসর হইয়া কার্য্য করিলে সুফলও ফলিতে পারে। তবে আমরা এরূপ বলি না যে অন্য পথে অগ্রসর হইলে ফল পাইব না।

(২) ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, যদি আমরা সুচারু ও সঙ্গত জ্ঞানলাভ করিতে চাই, তবে আমরা—ভারতবর্ষ ও ইউরোপ উভয় স্থানেই—আমাদের সম্পাদ্য বিষয়গুলি সিদ্ধ করিবার জন্য পন্থা অবলম্বন করিতে পারি। তবে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, অবলম্বিত পন্থাগুলি স্বদেশীয় হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ ভিন্ন-দেশীয় না হয়। ভারতবর্ষের জন্য অবলম্বিত পন্থাগুলি ভারতীয় অবস্থা হইতেই উদ্ভূত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ইউরোপের জন্য যে পন্থা হওয়া উচিত, ভারতবর্ষের জন্য তাহা হইতে ভিন্ন পন্থাবলম্বন শ্রেয়। এরূপ কথা সরাসরি ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। প্রস্তাবিত প্রণালী প্রত্যয়যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইহার একটী নক্সা উপস্থিত করা উচিত এবং সেই নক্সায় নূতন মত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলির কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া অত্যাবশ্যক। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এ পর্য্যন্ত কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে, এরূপ অর্থনীতি প্রস্তাবিত হয় নাই।

(৩) তৃতীয় পন্থা এই যে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক মতের যতগুলি ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে, সেইগুলিই গ্রহণ করা। বর্ত্তমানে কেহই এরূপ স্বীকার করিবেন না যে, অর্থনীতি-সংক্রান্ত সকল মতগুলি সকল দেশে এবং সকল সময়ে একই ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। তবে, স্থলবিশেষে যে কতকগুলি মত প্রযুক্ত হইতে পারে ইহা স্বীকার করা যায় এবং এক দেশীয় এক সময়ের মত অন্য সময়ে কিয়দংশে নিশ্চয়ই প্রযুক্ত হইতে পারে।

যে সমস্ত প্রশ্ন আমরা উপরে উত্থাপন করিয়াছি তাহা সংখ্যায় অনেক এবং সেই সকলগুলিই সরাসরি ভাবে বিচার করা যাইতে পারে না। অর্থনীতি বিষয়ক মত গুলির বহু শাখা-প্রশাখা আছে। বিশেষতঃ, ভারতীয় ব্যবসায় ও শিল্প বহু বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। ইউরোপীয় মত ভারতীয় আচারের প্রতি প্রয়োগ করিলে সহস্র সহস্র সমস্যার উৎপত্তি হয়। এবং শেষোক্তের মধ্যে হয়ত এত অল্প সংস্রব আছে যে প্রত্যেকটী নিজ নিজ পৃথক অবস্থানুসারে বিচার করিতে হইবে। হয়ত, কথা উঠিবে যে ভারতবর্ষে ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিবেচ্য অনেকগুলি বিষয়ই বৈদেশিক এবং তাহারা প্রকৃত ভারতীয় অর্থনীতির অঙ্গীভূত নহে। অবশ্য এ উক্তিতে কিছু সত্য নিহিত আছে; তবে এরূপ উক্তি অধিকস্থলেই অতিরঞ্জিত। ভারতবর্ষে প্রচলিত বর্ত্তমান ব্যবসায়িক পদ্ধতি বৈদেশিক হইলেও অদূর ভবিষ্যতে ইহাদের বৃদ্ধি অথবা ইতিমধ্যেই ইহা সকল দেশের উপর যে ফল উৎপাদন করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট অফিস এবং সর্ব্বোপরি শিক্ষা পুরাতন রক্ষণশীলতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং চির-প্রবাদভূত ভারতীয় গ্রাম-সমূহের বিচ্ছিন্নতাও ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতেছে।

উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বিশেষ আবশ্যক হইতেছে ছাত্র ও কাযের লোকের প্রণালী-বদ্ধ সহযোগিতা—উভয়ের একত্র সমাবেশ ও কার্য্য না হইলে ফল পাওয়া দুষ্কর। ভারতীয় অবস্থার বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে হইলে তিনটী কার্য্য অত্যাবশ্যক এবং এই তিনটীর মধ্যে বহুদর্শিতা ও কার্য্যোপযোগী জ্ঞান ঔপপত্তিক শিক্ষাপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

উপর্য্যুক্ত তিনটী বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা এই :—

(১) প্রথমে কার্য্য-ঘটনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। বর্ত্তমানে ইহাই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া আমাদের মনে হয় এবং ইহার ক্ষেত্রও সুবৃহৎ। সত্য বটে, অনেক প্রকার ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিবরণ কতক পরিমাণে প্রণালীবদ্ধভাবে আমাদের হস্তে পতিত হইয়াছে। সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট, গেজেটীয়র, কমিশনের রিপোর্ট এবং গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত অন্যান্য কাগজে অনেক মূল্যবান বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এরূপ সংবাদ বহুজ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ হইলেও কোন কার্য্য-বিশেষের জন্য সংগৃহীত হয় এবং কোন মত বিশেষের সাপক্ষের জন্যই প্রধানতঃ উপস্থিত করা হয়। এই সকল সংবাদ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এবং গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনের জন্যই সাধারণতঃ সংগৃহীত হয়। কিন্তু ইহাতে ইহার মূল্যের হ্রাস হয় না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয় বলিয়া এই সকল সংবাদের মূল্য অধিক। ব্যক্তিগতভাবে লোকে যে সকল সংবাদ গ্রহণ করিতে পারে, গবর্ণমেণ্টের তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও অধিকতর মূল্যবান সংবাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা

রহিয়াছে এবং যখন এই সকল সংবাদ শাসন-সৌকর্য্যার্থে সংগৃহীত হয়, তখন সে গুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকে না। পক্ষান্তরে, এগুলি যে একেবারে ভ্রমপূর্ণ নহে তাহাও বলা যায় না এবং ইহাতে যে সকল ভ্রম থাকে তাহা ধারাবাহিক; ব্যক্তিগত অনুসন্ধানেই তাহার সংশোধন হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের "ব্লু" পুস্তকসমূহে যে উপাদান থাকে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান এবং এই মূল্যবান উপাদানসমূহ সাধারণ ব্যক্তিগণের অধ্যয়নের বিষয়ীভূত হওয়া একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইহার সহিত আরও সূক্ষ্ম উপাদা একত্র করা প্রয়োজন। সকল সংবাদই ঘটনার উপর ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজনীয় এবং ভারতীয় অর্থনীতি-সংক্রান্ত ঘটনাগুলি যে গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবন ও তৎসংক্রান্ত ঘটনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তাহা বেশ মনে রাখা উচিত। অবশ্য, একমাত্র গবর্ণমেণ্টই এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পারেন; কিন্তু যে উপায়ে এ তথ্য সংগৃহীত হয়, তাহাতে জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন ও তাহার উত্তর কতকাংশে সীমাবদ্ধ হয়। আমাদের মনে হয় যে, এই সকল সংবাদের মূল হইতেছে গ্রাম্য চৌকিদার। এ প্রকারে সংগৃহীত সংবাদ সংশোধিত হইলেও যে কতকাংশে অসম্পূর্ণ থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ধীর ভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ঘটনা এত বিভিন্ন প্রকারের যে, এই ভাবে অনুসন্ধান ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাধারণ ভাবে মত প্রকাশ অর্থাৎ এক গ্রামে যাহা ঘটিতেছে, ভারতবর্ষের সকল গ্রামেই তাহা ঘটিতেছে এরূপ ধারণা অত্যন্ত দূষণীয়। গ্রামের কথা দূরে থাকুক, এক প্রদেশের সহিতই অন্য প্রদেশের সামঞ্জস্য নাই।

আমাদের এই পাটনা কলেজে "চাণক্য সমিতি" নামক ছাত্রদিগের একটী সমিতি আছে। এই সমিতি-সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। আমরা উপরে যে প্রকার ঘটনা-অনুসন্ধানের কথা বলিয়াছি, এই সমিতি কতক পরিমাণে সেইরূপ ঘটনা-নিচয়ের অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। সমিতির সদস্যগণ প্রায় সকলেই বেহার-প্রদেশীয়; কিন্তু এক গ্রামের এক সদস্য যে বিবরণ দাখিল করেন, অন্য গ্রামের অন্য সদস্যের সহিত সব স্থানে তাহার মিল হয় না। ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে একস্থানের ঘটনার সহিত অন্য স্থানের ঘটনার সামঞ্জস্য নাই—বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে প্রত্যেক স্বতন্ত্র গ্রামের বিষয় সকল অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

(২) দ্বিতীয় কার্য্য হইতেছে যে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইতেছে, তাহাদের পর্য্যালোচনা ও বিশিষ্ট বিশ্লেষণ। এরূপ কার্য্যে পারদর্শী হইতে হইলে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কতক ঔপপত্তিক শিক্ষা এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমাদের মতে প্রথম দফা দ্বিতীয় দফা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

উপাদান-সংগ্রহের কার্য্য আরও অধিকদূর অগ্রসর হইলে এই কার্য্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। তবে ইহা একেবারে স্থগিত রাখিলে চলিবে না। উপাদান-সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ একত্রেই করিতে হইবে। এবং একটী হইতে অন্যটী পৃথকভাবে করিলে কার্য্যের ক্ষতি হইবে। বিশ্লেষণ ও তুলনা দ্বারা আমরা যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে যে কেবল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব এমন নহে, ইহাও জানিতে পারিব যে কোন্ বিষয়ে আরও উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক এবং কি ভাবে প্রশ্ন করিলে উত্তম উপাদান সংগৃহীত হইতে পারিবে। পুনশ্চ, যদিও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতীয় অর্থনীতি এখনও ধারাবাহিক শিক্ষার উপযোগী হয় নাই, তাহা হইলেও ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে ইউরোপীয় মতামত ও বহুদর্শিতা ভারতীয় অনেক প্রশ্নের সমাধানের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ-আনয়নের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক জানিতে চান, তাঁহারা রানাডের রচনাগুলি, অথবা স্যার থিওডোর মরিসনের পুস্তক পাঠ করিতে পারেন কিংবা ডাক্তার মার্শাল ইণ্ডিয়ান কারেন্সী কমিটীতে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা করিবেন।

(৩) তৃতীয় কার্য্য হইতেছে কার্য্যোপযোগী ফল পর্য্যালোচনা করা। আমাদের মনে হয় যে প্রথমোক্ত দুই দফা এই শেষোক্ত দফারই অধীন। কেবল জ্ঞান লাভ করিতে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা না বিশ্বাস করিতে পারি যে, এই জ্ঞানলাভ কার্য্যকরী, ভ্রম-সংশোধনে সক্ষম এবং উন্নতির সহায় হইবে। কেহ কেহ এমন আছেন যাঁহারা মনে করেন যে এই বিশ্বাস কেবল ভ্রান্তি মাত্র। তাঁহারা মনে করেন কার্য্যের জন্য ঔপপত্তিক শিক্ষার কোনই আবশ্যকতা নাই—কেবল বহুদর্শিতারই প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা যে সকল কর্ম্ম সিদ্ধ হয় নাই বা যে সকল সংস্করণ বৃথা হইয়াছে তাহাই উল্লেখ করিবেন। কিন্তু, সুখের বিষয় এই, অন্যদিকেও দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। যৌথ মহাজনীর কথা ধরুন। ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে ইহার সফলতার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ইহার ফল স্বপ্নেরও অগোচর ছিল—অলীক স্বপ্ন আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ইহার সফলতা যে কল্পনা ও বহুদর্শিতা উভয়ের সংমিশ্রণে হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। কল্পনার যে কোনই আবশ্যকতা নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এমন কি যিনি মুখে "কল্পনার আশ্রয় লইব না, কেবল কার্য্য করিব" বলেন, তিনিও কিছু না কিছু কল্পনার আশ্রয় না লইয়া পারেন না। কল্পনার উপরে কার্য্যকে ন্যস্ত করিতে হইবে এবং প্রকৃত কাজের লোক হইতে হইলে কল্পনাকে হস্তগত করিতে হইবে। যে শিক্ষায় কল্পনা ও বহুদর্শিতা সম্মিলিত হয়, সেই শিক্ষার ফলই প্রকৃত কার্য্যকরী হয়। এরূপ শিক্ষা হইলে দুই প্রকার ভ্রম হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। এক প্রকার হইতেছে এক

দলের ভ্রম, যাঁহারা কেবল কার্য্য করিতেই উপদেশ দেন। অন্যপ্রকার হইতেছে অপর দলের, যাঁহারা কেবল কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন, মনে করেন যে সকল জিনিষেরই একটী "রাজকীয় পন্থা" আছে—যেমন স্বদেশী প্রতিজ্ঞা বা প্রকাশ্য সভায় "রেজলিউসন পাস" করিলেই অর্থনীতির উন্নতি হইতে দেরী লাগে না। একদল মনে করেন যে উৎসাহেই সব কাজ হয়, অপর দল মনে করেন যে গবর্ণমেণ্টই সব করিবেন। অর্থনীতিতে শিক্ষালাভ হইলে এই উভয় প্রকার ভ্রমই দূর হয়।

ভারতবর্ষে এক্ষণে কি কি সমস্যা উপস্থিত, তাহার এক ফর্দ্দ দেওয়া অনেক সময় আবশ্যক। ইহার মধ্যে কয়েকটী খুব বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গে দুর্ভিক্ষ-সমস্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কৃষির উন্নতি, জমিদার ও প্রজার সম্পর্কের উন্নতি, কার্য্যে অধিক মূলধন প্রয়োগ এই সকল গুলিও সমধিক উল্লেখযোগ্য।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহা ছাত্ররূপে বলিয়াছি এবং আমাদের এত কথা বলিবার সার্থকতা এই যে অর্থনীতি শিক্ষার দুইটী দিকই—ঔপপত্তিক ও কার্য্যকরী—আছে এবং এই শিক্ষাকে প্রকৃত কার্য্যে প্রযুক্ত করা যাইতে পারে। তিনদিক হইতে এই সকল সমস্যাগুলি বিবেচিত হইতে পারে এবং তিনপ্রকারের লোক ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট;—অর্থনীতি শিক্ষায় ব্রতী ছাত্র, কাষের লোক এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ। কেহই ইহা অস্বীকার করিবেন না যে এ-যাবৎ শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণই অধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের ন্যায় অধ্যয়নে ব্রতী ছাত্রগণ ও কার্য্যকরী ব্যক্তিগণের স্ব স্ব দিকটায় দৃষ্টিপাত করা উচিত। বলা বাহুল্য যে তিনদলের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক এবং একত্রে মিলিয়া কার্য্য করিলে যে প্রভূত ফললাভ হইবে তাহা সুনিশ্চিত। যে সকল সমস্যা সমাধান করিতে হইবে তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুরূহ এবং সেই জন্য যত দিক হইতে পারা যায় ততদিক হইতেই ইহার আলোচনা আবশ্যক। যাহাতে জ্ঞান ও পারদর্শিতা যতখানি পাওয়া যায়—উভয়ই ইহার আলোচনায় সাহায্য করিতে পারে তাহা করার প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে কার্য্য করিয়া ইহার সমাধান করা অসাধ্য। সম্ভবতঃ এ সকল সমস্যার দুই-একটীর কোন দিনই সমাধান হইবে না এবং সমবেত শক্তিতে অংশবিশেষমাত্র সমাধান হইতে পারে। তথাপি এরূপ ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিশ্রম যে অত্যাবশ্যক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

আমাদের মনে হয় না যে, আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন রাজরাজেশ্বর যে সঙ্কেত-বাক্য (watch word) ভারতবর্ষে আসিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আর কোন দিকে এরূপ পরিষ্কারভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে! ভারতবর্ষ যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইতে

পারেন না। তবে বর্ত্তমান যে অতি উজ্জ্বল, অতি আশাপ্রদ, তাহা সকলেই বলিবেন। অপিচ, সকল দিকেই সকল প্রকারে এক সার্ব্বজনীন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে এবং তাহা হইতেই ভবিষ্যৎ অনুমিত হইতে পারে।

তেহাই

(সাহিত্য-রসাশ্রিত দার্শনিক-দানাদার নাট্যরঙ্গ)

নাটকীয় পাত্র-পাত্রী

আমি
মগজ
কাগজ
গজকাঠি
বর্গীয় জ (ওরফে জগন্নাথ, ওরফে জগৎ-পিতামহ)
উড়ে পাণ্ডা
কামার
কুমার
দালাল
তাঁতি
ঢাকী
টিক্‌টিকি

[দৃশ্য—চুরোটের ধোঁয়া, চিম্‌নীর ধোঁয়া ও চুলার ধোঁয়ার ত্রিবেণী-সঙ্গম]

আমি

দিনে আলো আছে, নিশীথে কালো আছে, আস্‌মানে ব্লু আছে, জমিনে সবুজ আছে, আসামে কম্‌লা আছে, হলুদে হলুদে আছে, কীর্ত্তিবাসের রামায়ণে নীল আছে, ইউরোপে ভার্সেই উদ্যানে ভায়োলেট্‌ আছে, লঙ্কায় ঝাল আছে আবার লাল আছে, কিন্তু বেগুনি কই? সে যে স্বর্গে ছিল, স্বর্গের রাজার রামধনুটিকে সে যে সুনিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, সে গেল কোথায়? সে যে স্বর্গের জিনিস, মর্ত্ত্যের পথে কোথায় পথহারা হইল? সে কোথায় গেল? আমার বেগুনি কোথায় গেল?

মগজ

হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর দেখি, সে বোধ হয় হদিস্‌ দিতে পারিবে। অনেক সময়ে আমি যে-কথার জবাব দিতে পারি না হৃদয় অতি সহজেই তাহার একটা হেস্ত-নেস্ত করিয়া ফেলে। বলিতে কি স্বয়ং হৃদয়েশ্বর যাহা না জানেন হৃদয় তাহাও জানে।

আমি

বটে বটে, আমি হৃদয়কে ডাকিতেছি। হৃদয়! ও হৃদয়! ও আমার হৃদয়বন্ধু হৃদয়! জবাব দাও, বল আমার বেগুনি কোথায়?

মগজ

রোস রোস আমি ভুল করিয়াছি। তোমার হিদে জোলার নাতি হৃদয়ের আর

তুমি সাড়া পাইবে না। বর্ত্তমান জ্ঞান-গরীয়ান যুগে হৃদয় বেচারা বয়ঃপ্রাপ্ত বেঙাচির লেজের মত খসিব খসিব হইয়া আছে। বেচারা বড় কাবু হইয়া মনস্তত্ত্ববিদের হাসপাতালে পড়িয়া অসার অচৈতন্য অবস্থায় আছে। উহাকে ডাকিলেও সাড়া পাইবে না। এখন হৃদয়ের শূন্য জায়গাটাতে খানিকটা কাগজ পুরিয়া রাখা হইয়াছে। কাগজ এখন হৃদয়ের একটিনি করিতেছে। সুতরাং মগজ ও কাগজে মিলিয়া যে জুড়ি হইয়াছে বর্ত্তমান সভ্যতা সেই জুড়ি হাঁকাইয়া মানুষকে তাহার ঈপ্সিত অর্থাৎ তুমি যাহাকে বেগুনি বলিলে, বোধ হয় তাহারই অভিমুখে লইয়া যাইতেছে।

আমি

এখন উপায়? বেগুনির সন্ধান আমায় কে বলিয়া দিবে।

মগজ

কাগজের কাছে জিজ্ঞাসা কর দেখি।

কাগজ

বেগুনি? বেগুনির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? এ ভারি কঠিন প্রশ্ন। বিশেষতঃ এই ত্রি-ধোঁয়ার রাজ্যে। দেখ, আমি একজন উড়িয়াকে বেগুনি খাইতে দেখিয়াছি। উহার পেটের মধ্যে বেগুনি পাওয়া যাইতে পারে। আচ্ছা তুমি এক কাজ কর। চট্ করিয়া ঐ উড়ে পাণ্ডাটিকে ধরিয়া আন ত। উহার কাছে সমস্ত সমাচার পাওয়া যাইবে। আমি যদিও কাগজ অর্থাৎ সমাচার-পত্রিকা অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের হৃদয়ের নাড়ী, তথাপি রিপোর্টার ভিন্ন আমার গতি নাই। ঐ উড়ে পাণ্ডার বাক্য আজকে আমার রিপোর্টারের পত্র হইবে। ডাক, ডাক, উহাকে ডাকিয়া আন।

আমি

পাণ্ডা ঠাকুর! ও পাণ্ডা ঠাকুর! ও উড়ে!

উড়ে পাণ্ডা

আরে কাঁই কি এম্‌তি হউছ?

আমি

বলি, আমার বেগুনি কোথায়?

উড়ে পাণ্ডা

কঁড়? বেগ্‌গুনি? বেগ্‌গুনিরে কথা কউছ? সিয়ে আম্ভ ওড়িয়া সব্ব্ সোরিষ্-ত্যালেরে ভাজি কীরি বেসম্ম দেই কীরি মজ্জা করি কীরি কাড়ি রাত্তিকু খাইথিলে। বেগ্‌গুনি আর কুথা?

আমি

হায় মগজ! হায় কাগজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই উড়িয়া আমার বেগুনির প্রাণ সংহার করিয়াছে। নববর্ষায় রাম-ধনুকের একটা শুঁড় যখন একাগ্রভাবে ধরণীতে মুখ জোবড়াইয়া শিলীন্ধ্র অর্থাৎ বেঙের ছাতা ভোজন করিতেছিল আমার বেগুনিও সেই সঙ্গে মর্ত্ত্যে নামিয়াছিল, এবং নামিবামাত্র কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে বেগুন বৃক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই উড়ে বোধ হয় তাহাকে নামিতে দেখিয়াছিল এবং বেগুনের অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া একীভূত হইতে—অভেদাত্মা হরিহর হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।—সবুজ ফলে যে মুহূর্ত্তে বেগুনি আভার সঞ্চার সেই



প্রতীক্ষা

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

৪

মুহূর্ত্তে এই হতভাগা উড়ে তাহাকে ভাজিয়া খাইয়াছে। হায় বেগুনি আমার বেগুনি!

মগজ

তুমি কাগজের শরণাপন্ন হও। এ বিষয়ে আন্দোলন হওয়া উচিত।

টিক্‌টিকি

টিক্‌টিক! সাহিত্য-গঞ্জে Smoke-Nuisance সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছিল—তাহার ফল কি হইল? টিক্ টিক্।

কাগজ

দেখ দেখ আন্দোলনের ফল কিরূপ হইবে বলিতে পারি না, কারণ টিক্‌টিকি ডাকিয়াছে।

আমি

আমি টিক্‌টিকি বিশ্বাস করি না। আমি টিক্‌টিকি-নাস্তিক।

মগজ

বেদান্ত-বাদীরা জগন্নাস্তিক; কিন্তু তাতে কি?—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। দেখ আমার খাস মহলে একজন বুড়া রাইয়ৎ আছে। তাহার নাম সংস্কার। সে বলে হাঁচি টিক্‌টিকি বাধা যে না মানে সে গাধা। অনেকে বলেন, অমন কুসংস্কারাপন্ন প্রজার চাল কাটিয়া উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু ও তাড়াইলেও যায় না। দিনের বেলা তাড়াইয়া দিলাম। রাত্রে দেখি আবার সেই সব ঝুলি কাঁথা পাতিয়া দিব্য আসর জমাইয়া বসিয়াছে। সদর দরজা দিয়া বাহির করিয়া দিই, খিড়কীর দরজা দিয়া একেবারে অন্দরে ঢুকিয়া বসে। আর তা ছাড়া আজকাল বড় একটা তাড়া হুড়াও করি না। কারণ, পণ্ডিতেরা, এমন কি বড় বড় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদেরা, বলিতেছেন, যাহা আছে তাহাকে থাকিতে দাও। প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্বের একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে কেহ কখনও কোন দিন বিশেষ কোন আচার বা সংস্কার বা আর কিছু মানিয়া লইতে পারে না। বিশেষ ধূমধামের সহিত আজকাল এইপ্রকার ধূম উদ্গিরিত হইতেছে। আমার তো Asphyxia হইবার জোগাড়।

আমি

তা হউক। তোমাকে পরে আপীলে বাঁচাইব। আমি নিজে এ কথায় বিশ্বাস করি। প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াই আমাদের শরীর ইনফ্লুয়েঞ্জা ডেঙ্গু ডিসেণ্টী প্রভৃতিকে গ্রহণ করে। উহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে যাওয়ার মানে ইতিহাসের বিরুদ্ধাচরণ করা, কেবল ডাক্তারের পেট ভরানো। এখন টিক্‌টিকির টিক্‌টিকের ভয়ে কাগজে আন্দোলন ত বন্ধ করিলাম, কিন্তু বেগুনির উদ্ধারের কি হইবে?

মগজ

দেখ, কাগজে যখন আন্দোলনে বাধা পড়িল তখন এক কাজ কর। দেখিতেছি এই ব্যক্তি উড়ে। উড়েরা জগন্নাথের প্রজা, জগন্নাথকে খুবই মানে। সুতরাং তুমি জগন্নাথের দরবারে নালিশ রুজু কর।

আমি

কিন্তু আমি ত জগন্নাথকে মানি না। আমি যে নেতি নেতি করিয়া বেদান্তের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; জগন্নাথ আমি মানি না।

মগজ

জগন্নাথ মান না? অর্থাৎ বলরামের কনিষ্ঠ সুভদ্রার জ্যেষ্ঠ যে জগন্নাথ তাঁহাকে মান না। কিন্তু—

আমি

না না, আমি ঠিক ওরূপ বলিতে চাহি নাই, বরং ঐরূপ মানবীয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই তো আমি জগন্নাথকে মানি। আমি যে বৈষ্ণব Philosophy পড়িয়াছি। অক্ষর-মূর্ত্তি বর্গীয় জ, আমাদের বাক্য মনের অতীত। তাঁহাকে দাদা, চাচা, না বলিলে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইব কিরূপে। স্বর্গ-রাজ্য পাইব কিরূপে। আমি জগন্নাথকে মানি। তবে একবার তাঁহার কাছেই অভিযোগ উপস্থিত করি। (করজোড়ে) প্রভু, জগন্নাথ! স্বামী!

উড়ে পাণ্ডা

নইয়ন—পথ-গা—আমী ভবতু মেএঁ এঁ—

জগন্নাথ

নাথ্‌নী! আমায় ডাকিতেছ?

আমি

আপনি আমায় নাত্‌নী বলিলেন?

জগন্নাথ

না না তুমি ভুল শুনিয়াছ। আমি তোমায় নাথ্‌নী বলিয়াছি। তুমি যখন আমায় জগতের জবানী নাথ বলিয়াছ তখন আমি তোমাকে নাথ্‌নী তো বলিবই। ইহাতে সম্পর্কবিরুদ্ধ কিছুই বলা হয় নাই। আর যদি নাত্‌নী বলিতাম তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি জগৎ-পিতামহ, সুতরাং জীব মাত্রই আমার নাত্‌নী। কেন জান? আমি পুরুষোত্তম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমিই এক-মাত্র পুরুষ! সুতরাং জীবমাত্রই আমার নাত্‌নী। স্ত্রীলোকও নাত্‌নী, পুরুষও নাতনী। আর নাতনীরা যখন পিতামহদের প্রভু অর্থাৎ হুকুম করিবার মালিক, তখন নাতনী ও নাথ্‌নী ত একই। তুমি বৈষ্ণব Philosophy পাঠ কর নাই?

আমি

পাঠ করি নাই? আমি পাঠ করি নাই? এমন কি গ্রন্থ পৃথিবীতে আছে যাহা আমি পাঠ করি নাই। কাগজে যাহা ছিল তা সমস্তই মগজে পূরিয়াছি। তবুও আমার মগজ Tabula Rasa অর্থাৎ সাদা কাগজ। আর হৃদ্‌পিণ্ডের জায়গায় ছাপার কাগজ গুঁজিয়াছি। অত্যধিক পড়া-শুনায় উর্দ্ধবাহুর বাহুর মত চর্চ্চার অভাবে হৃদয়টা শুকাইয়া গিয়াছিল। সেটাকে বাতিল করিয়াছি। শূন্য স্থান কাগজে পূর্ণ করিয়াছি। কাগজে কাগজে কাগজী-রাজ হইয়াছি। আমি পড়ি নাই? কি বলিব আপনি জগৎ-পিতামহ, বৃদ্ধ হইয়াছেন, নহিলে একবার দেখিতাম। এই যে নিম-কাঠের কুঁদো বসিয়া আছেন, আপনি যে আপনি নন্‌ তাহা জানেন? আপনার কতটুকু অসিরিস্‌, কতটুকু ইন্দ্র, কতটুকু জিহোভা, কতটুকু ওডিন, কতটুকু ব্রহ্মা, কতটুকু জুপিটার, কতটুকু শক্তি, কতটুকু ভক্তি, কতটুকু কাষ্ঠ, কতটুকু তৈল, কতটুকু রঙ, কতটুকু রাইট তাহা আমি সমস্তই একটি দেড়গজি Thesis এ Cosine Thetaর সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিয়া আপনার জগমন্দিরের পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণে সভা আহ্বান করিয়া পাঠ করিয়া শুনাইতাম।

মুসলমান পণ্ডিতেরা কবি আমির-খস্রুকে তুতী-ই-হিন্দ্ অর্থাৎ হিন্দুস্থানের তোতাপাখী বলিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুস্থানের একমাত্র তোতাপাখী যে আমি তাহা আমি আপনাকে প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই দণ্ডেই বুঝাইয়া দিতে পারি।

জগন্নাথ

আচ্ছা বুঝাইয়া দাও। আমার পা নাই পলাইতে পারিব না, কাজেই শুনিতে হইবে।

আমি

আমার বিদ্যার অধিক পরিচয় আমি দিতে চাই না। আমি আপনার সম্বন্ধে যেটুকু তত্ত্ব, গ্রন্থ কেতাবাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া মগজের মধ্যে জগা-খিচুড়ি অর্থাৎ ভবদীয় খিচুড়ি পাকাইয়াছি, শুধু তাহাই উদ্গিরণ করি, অবধারণ করুন। হে জগন্নাথ! আদিতে আপনার বর্গীয় জ সুতরাং আপনি জবরদস্ত জবরজং; তৎপরে গ, অর্থাৎ আপনি গদাধর; আপনাকে নাথ বলা হইয়া থাকে, অথচ আপনি পিতামহ। এ দুইএর সমন্বয় কিরূপে হইতে পারে? শ্রবণ করুন। হিন্দুর দেশে পিতামহেরা ঠাট্টা করিয়া নাত্নীদিগকে পত্নী-সম্বোধন করিয়া থাকেন। সেইজন্য আপনি পিতামহ হইয়াও নাথ। এইখানে আপনাতে ও আমাতে রসের সম্বন্ধ। আপনি শূন্যবাদীর শূন্য। অজ্ঞেয়বাদীর X। শূন্যবাদীর শূন্যের সহিত অজ্ঞেয়বাদীর X জুড়িয়া মহাসমন্বয় করিয়া আমরা আপনার মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছি। Xএর স্কন্ধে শূন্য চাপাইলে ঠিক আপনার মূর্ত্তিটি হয়। ঐ শূন্যের গর্ভে সত্ত্ব তমঃ ও রজঃ গুণের প্রতিভূস্বরূপ তিনটি বিন্দু বসাইয়া দিলেই আপনার দুই নেত্র ও শ্রী হাঁ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শূন্যের ভিতর অর্থাৎ নির্গুণের ভিতর ত্রিগুণের বিন্দুপাত হইয়াছে। কথায় বলে নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ বাড়া। এই সামান্য প্রবাদবাক্যের মধ্যে আর্য্যজাতি গূঢ় ভাবে ভবদীয় তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। উহাতে আমাদের জাতির আধ্যাত্মিক দৌড়ধাপের পরিচয় বিদ্যমান। এক্ষণে আপনার বিষয়ে আমার বক্তব্য ইঙ্গিতে কিঞ্চিৎ বলিলাম। সুতরাং আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার অভিযোগ শ্রবণ করুন। আপনার খাস-মহলের প্রজা বর্ত্তমান উড়ে পাণ্ডা স্বর্গীয় বেগুনিকে মর্ত্ত্যে পাইয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার শাস্তিবিধান করুন এবং অগস্ত্য যেমন ইল্বল বাতাপির পেট চিরিয়া বাহির হইয়াছিলেন, বিশ্বসংসারের চিরপ্রিয় বেগুনি রামধনু-রঞ্জিকা বেগুনিও সেইরূপ উড়িয়ার উদর চিরিয়া বাহির হইয়া পড়ুন।

জগন্নাথ

কি ভয়ানক! ইহার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আমার তো হাত নাই।

আমি

হাঁ, তাই তো, আপনার যে হাত নাই।

উড়ে পাণ্ডা

হাত্ত অছে, আঙ্গুড়—অ নাই!

আমি

চুপ্ রাও বেয়াদব। আমার মগজে জগবন্ধুর এই হাত না থাকার বেশ একটি Philosophy গজাইয়া উঠিতেছিল। তোর

চীৎকারে ভাবের ডিম্ব একেবারে গাঁজিয়া গেল। হতভাগা বদ্‌মায়েস্‌! বাজে বকিয়া আমার idea ওলট্‌ পালট্‌ করিয়া দিতে এলি। জানিস্‌ তুই বেগুনি খাইয়াছিস্‌!

কাগজ

এ বিষয়ে কাগজে একটু লেখালেখি হোক্‌।

মগজ

কাগজ হতে মগজে যায়
মগজ হতে কাগজে,
গজ্‌কাঠিটা গেল কোথায়
রফা হত সহজে।

গজকাঠি

চেঁচিও না, চেঁচিও না। গজকাঠি কখনও গরহাজির হয় না। সম্প্রতি কিন্তু একটু ব্যস্ত আছি। রোস, রোস। তিন যবোদরে এক ইঞ্চি, উনচল্লিশ ইঞ্চিতে এক মিটার; কিন্তু ক মিটারে এক যোজন? (চিন্তা) যবোদর হিন্দু, ইঞ্চি ইংরেজি, মিটার ফরাসী, আবার যোজন হিন্দু। গোড়ায় যবোদর শেষে যোজন। গোড়ায় হিন্দু চংমেও হিন্দু। পাশ্চাত্যেরা কেবল মাঝের কটা ধাপ। হুঁঃ, পাশ্চাত্যেরা পিছনে পড়িয়া আছে। থাকিবারই ত কথা। পশ্চাতে অস্তি ইতি পাশ্চাত্য। নামেই পরিচয়। হুঁঃ তুমিও যেমন।

আমি

গজকাঠি তুমি ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু হায়, কিন্তু হায়, জগন্নাথ, জগবন্ধু, জগৎ-পিতামহ, আপনার হাত নাই। হায় তবে বিশ্বসৃষ্টি হইল কি করিয়া?

মগজ

হুঁঃ এই না তোমার মগজের মধ্যে এখনি হাত না থাকার Philosophy তৈয়ারি হইতেছিল।

আমি

হাঁ, হইতেছিল তো। কিন্তু এখন মনে হইতেছে ধোঁয়া, ধোঁয়া, সব ধোঁয়া। সৃজন-কার্য্য চলিতেছে। তবু সমস্তই যেন ধোঁয়ার অবস্থায় রহিয়াছে। সব যেন নীহারিকা।

মগজ

নীহারিকা থেকেই ত বিশ্বের সৃষ্টি। এই দেখ। ধোঁয়াটে ভাবের ক্রমশঃ জমাট চেহারা ফুটিয়া উঠিতেছে। আচ্ছা ধর, জগন্নাথের হাত নাই। অর্থাৎ জগৎ-পিতামহের হাত নাই; সেইজন্য তাঁহার কন্যা জগৎ অর্থাৎ পৃথিবীরও হাত নাই। পৃথিবী ভাঁটার মতন গোলাকার, সেইজন্য সূর্য্য গোলাকার, চন্দ্র গোলাকার, গ্রহনক্ষত্রও সব গোলাকার। যেন রাশি রাশি ধোঁয়া তাল গোল পাকাইয়া রহিয়াছে।

আমি

জগৎ-পিতামহের যে হাত নাই তাহা তো জগন্নাথকে দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। আর তাঁহার পুত্র কন্যা চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীও যে গোলাকার, ভূ-গোলে তাহার প্রমাণ আছে দেখিয়াছি। কিন্তু আমার জগৎ-পিতামহী কই? তিনি দেখিতে কেমন? তাঁহার নাম কি?

কাগজ

আমার পুরানো File উল্টাইয়া Domestic Occurences এর স্তম্ভ খুঁজিয়া

দেখ। যদি বিবাহ হইয়া থাকে নিশ্চয়ই নাম পাইবে।

মগজ

তুমি খাম বলিতেছি। আদিতে জগৎ-পিতামহ হাই তুলিয়াছিলেন।

আমি

বটে! কিন্তু কেন হাই তুলিয়াছিলেন? হাই তুলিবার নিশ্চয়ই কারণ ছিল! সে কারণ কি?

মগজ

কেন হাই তুলিলেন? হাই উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? নেহাৎ শুনিবে? তিনি দিব্য চক্ষে ভবিষ্যৎ-তোমার ভাবী প্রবন্ধ পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমি

কি আনন্দ! কি আনন্দ! আমি ধন্য! আমি ধন্য হইলাম! আমার জন্ম ধন্য! আমার প্রবন্ধ নিবন্ধ ধন্য! তাহার পর? তাহার পর?

মগজ

তাহার পর সেই হাই-হাওয়া জমিয়া ধোঁয়া হইল। সেই ধোঁয়া ত্রিধারা হইল। একটি ধারায় নীহারিকার উৎপত্তি, একটি ধারায় চিত্তকুজ্ঝটিকার জন্ম এবং তৃতীয় ধারায় জগৎবিখ্যাত সাধনাসহায় শ্রীশ্রী গঞ্জিকার আবির্ভাব। এই হইল হাই-এ-আওয়ল্ অর্থাৎ আদিম হাই।

আমি

কি আনন্দ! কি আনন্দ! তাহার পর?

মগজ

তাহার পর চব্বিশ ঘণ্টা আকাশময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া সূর্য্য একদিন পবনের গায়ে হাই তুলিয়া দিলেন। সূর্য্যের আর একটি নাম আদিত্য। ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রে আদিত্যকে আদম বলা হইয়াছে। এবং হাই হইলেন শ্রীমতী হবা। ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রের কাহিনীটা একটু খাপ্ছাড়া। আমি পূর্ব্বাপর বলিতেছি শ্রবণ কর। হাই Highly ছোঁয়াচে। তাহাতে পবনেরও হাই উঠিতে লাগিল। সে ঢুলিতে ঢুলিতে পৃথিবীর গায়ের উপর হাই ছাড়িয়া দিল। তাহাতে পৃথিবী বলিলেন "তুমি একি করিলে? আমার গা মাটি-মাটি করিতেছে।" এইরূপে পৃথিবীতে মাটির সৃষ্টি হইল এবং ঐ মাটি হইতে মটর, মর্কট, মনুষ্য পক্ষী, এবং মনুষ্য জন্মিল।

আমি

কি আনন্দ! কি আনন্দ! আচ্ছা, সব ত বুঝিলাম, কিন্তু হাই-হাওয়া হইতে সন্তান হইল কিরূপে তাহা তো বুঝিলাম না।

মগজ

পারিলে না? মুক্তোপাতির গাছ দেখিয়াছ? উহার পাতায় পাতায় যখন মুক্তোর মত কুঁড়ি ধরে তখন প্রত্যেক পাতাটি মুক্তো-ঘেরা ইয়ারীংএর মতন দেখায়। ঐসব কুঁড়িতে ফুল হয়। ঐ ফুলে আবার সরিষার মত ছোট ছোট ফল হয়; ঐ ফলের ভিতর বীজ থাকে; ঐ বীজেও গাছ হয়।

আমি

উদ্ভিদবিদ্যার কেতাবে পড়িয়াছি বটে, দেখি নাই।

মগজ

পাতার গায়ে ফুল ফল হইতে পারে, আর হাইয়ের হাওয়ায় সন্তান হইতে পারে না।

আমি

ঠিক বলিয়াছ। এখন বুঝিলাম। পরিষ্কার বুঝিলাম। কি আনন্দ! তাহার পর?

মগজ

তাহার পর? হাঁ হাঁ ভাল কথা মনে পড়িল। বলিতে ভুলিয়াছি যে জগৎ-পিতামহের হাত না থাকায় তদীয় হাই হইতে যে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সৃষ্ট হইল তাহাদেরও হাত হইল না।

আমি

বেশ বুঝিলাম। কিন্তু পৃথিবীর পুত্র মানবের হাত হইল কেন?

কাগজ

হাতাহাতি করিবার জন্য।

মগজ

ফের তুমি বক্‌বক্‌ করিতেছ? চুপ কর। আমরা যাহাকে হাত মনে করি উহা ঠিক হাত নয়। অজা-গল-স্তন যেমন স্তন নয় সেইরূপ।

আমি

যদি মানুষের হাত অজা-গল-স্তনের মতন হইবে তবে তিন হইতে দুই বাদ দিলে হাতে এক থাকে কি করিয়া? আর ডাক্তারেরাই বা হাতে রাখিয়া চিকিৎসা করেন কি করিয়া?

মগজ

তুমি ঠিক ধরিয়াছ। হাত না থাকিলে হাতে রাখা অসম্ভব বটে। কিন্তু উহারও প্রতীকার হইবে। ভবিষ্যতে হাত-বিষয়ক আইন হইবে। যাহাকে তোমরা এখন হাতিয়ার-বিষয়ক আইন বলিয়া জান একজন প্রেরিত-পুরুষ জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া উহার নূতন ব্যাখ্যা করিবেন। তখন মনুষ্য মাত্রেই বৈষ্ণব ভাবেই মশগুল হইয়া নিজ নিজ হাতকে বেহাত করিবেন। এবং জম্বুদ্বীপের এই আদর্শ সমস্ত জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে সেই প্রেরিত-পুরুষের গুম্ফমাত্র মধ্যে মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাকে লোকে ধূমকেতু বলিয়া ভুল করে।

আমি

তবে বেগুনি কি চিরতরে বেহাত হইল?

মগজ

না না। তুমি এই উড়িয়ার সাহায্যে স্বদেশে একটি উড়ের দোকান প্রতিষ্ঠা কর। এইরূপ করিলে হাজার হাজার বেগুনি অচিরে তোমার হস্তামলকবৎ হইবে। যাহা স্বর্গে ছিল তাহা যুগপৎ স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে অধিষ্ঠান করিবে। তখন রামধনুকের সেই বেগুনি আকাশের মেঘ বেগুনের ক্ষেত এবং উড়িয়ার দোকান এই তিন স্থানে ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইবে। ইহাকেই বলে True to the kindred points of sky and shop। তখন চন্দ্রের দ্রেক্কাণ এবং উড়িয়ার দোকান একাকার ধারণ করিবে।

আমি

চমৎকার! চমৎকার! শূন্যবাদীর শূন্য—

সকলে

গোল!

আমি

জগৎ-পিতামহের হাত নাই, সুতরাং একরকম—

সকলে

গোল!

আমি

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, হাঁড়ি, কুঁড়ি, মালসা—

সকলে

গোল!

আমি

জগৎ-পিতামহের কন্যা জগৎ অর্থাৎ পৃথিবী—

সকলে

গোল!

আমি

আমরা মনুষ্যেরা ভবিষ্যতে অর্থাৎ হাত-বিষয়ক আইনের আমলে—

সকলে

গোল!

আমি

তখন পাব্‌লিক্ কাগজে মিটিয়া যাইবে—

সকলে

গোল!

আমি

তখন Private মগজের ঘুচিয়া যাইবে—

সকলে

গোল!

আমি

তখন ভূলোকে গড়ের মাঠে মোহন-বাগানের—

সকলে

গোল!

আমি

ভোজন-লোকে দীনু ময়রার রসগোল্লার মধ্যে—

সকলে

গোল!

আমি

স্বর্লোকস্থ গোলকের Two thirds—

সকলে

গোল!

আমি

তোমরা আনন্দে রক্তপাগল মোগলদের মতন তাল গোল পাকাইয়া হট্টগোল গণ্ডগোল এবং সোরগোল করিতে থাক। আমি ততক্ষণ একখানা খোল লইয়া আসি।

টিক্‌টিকি

ঠিক্ ঠিক্। (স্বগত) বুদ্ধিবৃত্তির গঙ্গাযাত্রার সময় হইয়াছে।

গঙ্গাফড়িং

টিক্‌টিকি তোমার বাক্য সত্য হউক। ইহা কাকতালীয় কি না জানি না, কিন্তু তুমি ঠিক্ সময়েই ঠিকঠিক বলিয়াছ। আমি সাংখ্যের মত ইঞ্চি ফুটের ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছি। পাতঞ্জল জল করিয়া তাহার মধ্যে ডুবুরী-ওলোন হইয়া ডুব দিয়াছি। মীমাংসা-দর্শনের মাংস ওজন করিয়াছি, কিঞ্চিৎ ভোজনও করিয়াছি। বেদান্তের দন্ত গুণিয়াছি, ন্যায়দর্শনের ল্যাজ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এ প্রকার দেখি নাই। এ যে হাই Philosophy অর্থাৎ জৃম্ভ-দর্শন। ইহাতে জগৎ-পিতামহ হইতে টিক্‌টিকি পর্য্যন্ত কাহারও হাই উঠিতে বাকী নাই। বিগত অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহার তুলনা নাই। ইহা রসে এবং কষে, মগজে এবং কাগজে সমান শোভা পাইতেছে। ইহা অতুলনীয় অবর্ণনীয় অভাবনীয়। হিন্দু

তোমার মরা হাড়ে এখনও কেমন ভেল্কি খেলে তাহা দেখিলে? নিত্য প্রত্যহ দধি ইচ্ছা করিয়া দধীচির হাড়ে একবার ভেল্কি খেলিয়াছিল। হিন্দু আবার দধি পান সুরু করিয়াছে, অর্থাৎ পাকস্থলীর মাথায় ঘোল ঢালিতে শিখিয়াছে। সুতরাং হাড়ে যে ভেল্কি খেলিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু তুমি হাতী। লোকে তোমায় মরা বলে। সে কথা স্বীকার করিলেও তোমার মূল্য লাখ টাকা। জগৎ-পিতামহ একবার হাই তুলিয়াছিলেন। সে একহারা হাই। তাহাতে জগৎ জুড়িয়া কি কাণ্ডই না হইয়াছিল। তাহার পর সূর্য্য এবং পবন যুগপৎ হাই তুলিলেন। সে হইল জোড়-হাই, অর্থাৎ দো-হাই। আর অধুনা আর্য্য ইসলামীয় ও ইউরোপীয় উনুন বিড়ি ও চিম্‌নীর ধোঁয়ায় ধূম্রলোচন হইয়া জম্বুদ্বীপের যে প্রকাণ্ড হাই উঠিয়াছে তাহাই হইল—

সকলে

তে-হাই।

টিক্‌টিকি

ফিক্ ফিক্।

কল্লে ভারি কারখানা,
তিন ঝুড়ি তার ব্যাখ্যানা।

আমি।

কই? তোমরা ভাল করিয়া সোরগোল করিতেছ কই? মগজে এখনো গোলমাল বাধে নাই? আমি যে খোল আনিলাম, বাজাইব।

ঢাকী

আমি ঢাক আনিয়াছি, বাজাইব।

কামার

আমি হাতুড়ী আনিয়াছি, বাজাইব।

কুমার

হুঁ, হুঁ, আমি হাঁড়ি বাজাইব।

দালাল।

আমি ওসব বুঝিনা। আমি কাজ বাজাইব।

তাঁতি

আমি বগল বাজাইব।

টিক্‌টিকি

ধিক্ ধিক্। তুমি কি হনুমান? তুমি কি সূর্য্যি ঠাকুরকে বগলে পুরিয়াছ? যে বগল বাজাইবে? ধিক্ ধিক্।

সকলে (গীত)

লাক্ চড়া চড়্ লাক্ চড়া চড়্
গিজদা গিজম।
নেই ধরাপর মোর বরাবর,
বিদ্যা কি কম?
বাক্য বকম মগজ জখম
ভাবনা কিবা,
সরগরমে সরদ গরম
হয় বুঝি বা।
আসমানে কি হাই উঠেছে
ভাইরে ও ভাই
সেই হাইএ ব্রহ্মাণ্ড হল
কি হাই দোহাই।
হাই তুলেছে সূর্য্যি ঠাকুর
বল্‌ছি খাঁটি,
সেই হাইয়ে হায় পিরথিমির গা
মাটি মাটি।
তাতেই মাটির সৃষ্টি হল,—
নাইরে রেহাই,—

মানুষ হনূ মর্কটাদি
বরণ সেহাই।
সেই মানুষের মগজে আজ
উঠলো কি হাই
তিন তালে এক ফাঁক পেয়েছে
পড়ল তেহাই।
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বজবজিয়ে
উঠল মগজ—
বুদ্ধি গেল নজ্‌ গজিয়ে,—
বেজায় হরজ!

হাই তুলে তাই হালকা হলাম;
হাই কি সোজা?
হাইয়ের হাওয়ায় যায় উড়ে
ব্রহ্মাণ্ড-বোঝা।
তিনটি হাইয়ে তিন ভুবনের
ব্যক্ত নিয়ম,
তোমার নেহাই আমার তেহাই
গিজদা গিজম।

(এই সময়ে পুঞ্জ পুঞ্জ সাঁজালের ধোঁয়া ঢুকিয়া যবনিকার কার্য্য হাসিল করিল।)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে

কবিবর,

আজি তব শুভ জন্মদিনে
মনে হয় কতদিনে কি জীবন সঞ্চারিলে
জগৎ বাঁধিলে কোন্ ঋণে।
অজানা সে অচেনা সুদূর—
বুঝিলে কি তার ভাষা জানিলে কি তার আশা
সেথাও পশিছে তব সুর।
প্রাণভরা ক্ষুধা তৃষা নিয়ে
দাঁড়াল দুয়ারে এসে দীন অতিথির বেশে
ধন্য হ'ল সুধাধারা পিয়ে।
অনাগত মহা ভবিষ্যৎ;
তারো অন্ধ অন্ধকার শিহরিছে অনিবার
পশিছে তোমার জয়রথ।
মন্দারের মালার মতন
কালে কালে দেশে দেশে তব গান ভালবেসে
প্রাণে প্রাণে রচিছে মিলন।

বিশ্বের সে মহাঋণভার
ব্যথিছে পরাণ মোর নয়নে ঝরিছে লোর,
কিসে শুধি এ আনন্দ-ধার?
ওরে মুগ্ধ মুছ্‌ আঁখিজল,
দেখ্‌ শুধু ভাল ক'রে পরম মরম ভ'রে
আনন্দ রাজে কি ঢল ঢল?
কি দিবি সে শোক আজি মিছে!
কবির অজস্র দান অফুরন্ত মহাপ্রাণ
রন্ধ্রে রন্ধ্রে চিত্ত কি ভরিছে?
দেওয়া! ভুলে' যারে তার কথা,
নেওয়া কি হ'য়েছে শেষ? নাহি কিরে দৈন্যলেশ
কোনও খানে কোনও বা রিক্ততা?
যতটুকু পেরেছিস্‌ নিতে
মিটেছে হিসাব তার কেটে গেছে ঋণভার
অমর সে হ'বে চিতে চিতে।
আনন্দের এ মহা উৎসব;
কেবা দাতা দীন আর দেওয়া নেওয়া একাকার
আনন্দে অসীম আজি সব।

২৫ বৈশাখ, ১৩২২। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

রুষ-সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রও নাই, সঞ্জয়ও নাই,—কৌতূহলও নাই সংবাদ-দাতাও নাই; নহিলে এই ইউরোপীয় মহাসমর-প্রসঙ্গে অনেক শিখিতাম। জর্ম্মাণির অতিবৃদ্ধি এবং অতিদর্প বিনাশের জন্য যাহারা ত্যক্ত-জীবিত, তাহাদের মধ্যে রুষের সহিত আমাদের পরিচয় অল্প। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয়েরাই যখন রুষরাজ্যকে দুর্জ্জেয় বলিয়া মনে করিতেন, তখন আমাদের অজ্ঞতা তেমন দোষের বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে।

গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার দিনে, গ্রীক্ ইতিহাসে অনেক জাতির যথার্থ বিবরণ লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু রুষিয়ার সম্বন্ধে কোন কথাই লিখিত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন গ্রীক কবিরা রুষিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদিগের বর্ণনায় কবিত্বের রং ফলাইয়া লিখিয়াছিলেন যে, উহারা নির্ব্বিরোধী, সুন্দর, চিরজীবী জাতি, কেবল সরলভাবে প্রেম বিনিময় করিয়াই প্রকৃতির রাজ্যে বিচরণ করে। পরে যখন রোমকেরা কথঞ্চিৎ সন্ধান লইয়াছিলেন; তখন গ্রীক্ কবির কাল্পনিক চিত্র উপহাসের সহিত উপেক্ষিত হইয়াছিল। লাটিন্ এবং ইতালীয় সাহিত্যের বর্ণনা এই, যে রুষিয়াবাসীরা বর্ব্বরের অধম, উহারা হিংস্র পশুর মত নিষ্ঠুরভাবে নরহত্যা করে, পরিচ্ছন্নতা কাহাকে বলে একেবারেই জানে না, মড়ার মাথার খুলিতে জল পান করে, এবং যাহা কিছু ভীষণ, যাহা কিছু ঘৃণ্য, তাহাই তাহাদিগের অঙ্গের ভূষণ। প্রাচীন সময়ের কথা আমরা জানি আর নাই জানি, এই সকল বর্ণনা যে কল্পিত, এবং অতিরঞ্জিত, তাহা নৃতত্ত্ব বিদ্যার প্রভাবে কিয়ৎপরিমাণে ধরিতে পারা গিয়াছে।

রুষিয়ার জাতিতত্ত্বের অতি প্রাচীন কথা পাঠকদের তৃপ্তিকর হইবে না। এখন রুষিয়ায় যাহাদের প্রাদুর্ভাব, কেবল তাহাদের প্রসঙ্গে বলিতে পারি, যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, জর্ম্মাণ সীমান্ত হইতে বেরিয়াগ্ বা বেরাঙ্গিয়ান্ (Variags or Varangians) নামক জাতি রুষিয়ায় প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্ব অধিবাসীদিগকে শাসনাধীনে রাখিয়া, আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বেরিয়াগেরা স্লাব্ (Slavs) জাতির একটি শাখা, এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রুষ্ (Rus) নামক বংশ বা গোত্রের লোক। ইহারা সর্ব্বপ্রথম যখন ৮৬২ খৃষ্টাব্দে রুরিক্ (Rurik) নামক দলপতির অধীনে রুষিয়ায় প্রবেশ করে; তখন নবগরড্ (Novgarod) কিয়েব্ (Kiev) প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরে পূর্ব্ব অধিবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। রুরিকের রাজত্বের পর দশম শতাব্দীতে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক আইগরের মাতা বীর রমণী ওল্গা (olga) একটি ক্ষুদ্র জৈত্র যাত্রার পর, কৃষ্ণসাগর পথে দেশ লুট করিতে গিয়া, কনস্তান্তিনোপলে খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মে দীক্ষিতা হয়েন;

এবং ধর্ম্মদীক্ষার পরিচয়ে হেলেন্ নাম গ্রহণ করেন। রুষিয়ায় খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মের এই প্রথম সূত্রপাত। প্রথমতঃ দেশের লোকে যাহারা খৃষ্টিয়ান্ হইতে চাহে নাই, বল্‌গা (Volga) নদী তাহাদের শবরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই ভীষণ শিক্ষার পরে, দেশের লোক দলে দলে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ চিঙ্গিজ্ খাঁ রুষিয়া রাজ্যটিকে বিধ্বস্ত করিয়া, দেশটিকে আপনার পদতলে আনিয়াছিল। চিঙ্গিজের পৌত্র বাটু খাঁ লুট-তরাজ এবং নরহত্যার একশেষ করিয়া, যে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল; আড়াই শত বৎসর তাহা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাতারের অধীনতা এড়াইয়া, গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। মোঙ্গল জাতির বিরুদ্ধে, গ্রীক্ এবং রোমকদিগের সাহায্যের প্রত্যাশায়, অলেক্‌জন্দর নেব্‌স্কি কনস্তান্তিনোপলে ধর্ম্ম দীক্ষা এবং অভিষেক লইয়া, সীজার শব্দের অনুরূপ জার শব্দে ভূষিত হইয়া আসিয়াছিলেন; (১২৪০) কিন্তু বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য তখন টলমল করিতেছিল, আপনাকে না বাঁচাইয়া, পরকে সাহায্য দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তাই মুর বা তামারলেনের সময়ের পর, যখন আত্মবিদ্রোহে তাতার রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই রুষিয়া মাথা তুলিবার অবকাশ পাইয়াছিল।

তৃতীয় আইবান্ বা আইবান্ দি গ্রেট্‌কে, নূতন যুগের বা স্বাধীন রুষিয়ার প্রথম নরপতি বলা যাইতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত; এই রাজার অকাতর পরিশ্রমে, বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষীণবল মোঙ্গল সঙ্ঘ রুষিয়া হইতে তাড়িত হইয়াছিল। রাজা আইবান্ কনস্তান্তিনোপলের এক গ্রীক্ রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং এই নব সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিবার জন্য রাজ ধ্বজায় দ্বি-শির একটি ঈগল্ পক্ষীর প্রতিরূপ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে রাজধ্বজা, সেণ্ট্ জর্জ্জ এবং ড্রেগন-মূর্ত্তি-লাঞ্ছিত ছিল। আইবান্ দি গ্রেট্ ক্ষমতাশালী বড় রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তখনও রুষিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নৃপতিগণের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নাই, এবং সমগ্র রুষ রাজ্য সমষ্টির জাররূপে তিনি বিখ্যাত হয়েন নাই। তিনি যখন গ্রীক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কনস্তান্তিনোপলে খৃষ্টিয়ান রাজ্য শেষ হইয়া গিয়াছিল; এবং কনস্তান্তিনোপলে ওৎমানের বিজয়ী পুত্র নব তুরস্ক রাজ্যের রাজলক্ষ্মীকে স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রীক্ ও রোমানদিগের সহিত যোগ দিয়া, তুরস্ককে খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়েই আইবান্ দি গ্রেট্ পতিত রাজবংশে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুসলমান জাতির প্রতি যে রুষিয়ার ক্রোধ এবং বিদ্বেষ সহজাত, তাহা বুঝিতে পারি। ইহা ছাড়া অন্য কারণেও, যে কনস্তান্তিনোপল্ লাভের জন্য রুষিয়া চিরকালই উৎসুক ছিল, তাহা এই মহাসমরের সময়ে একটু বলিবার প্রয়োজন। ঠিক যে দিন যে মুহূর্ত্তে, রুষ রাজ্যের জন্মদাতা

রুষিক্‌, পোলাণ্ড্‌ এবং কার্‌পেথিয়ান্‌ পর্ব্বত-প্রস্থ হইতে গিয়া রুষিয়ায় রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন; সেই দিনও রুরিক্‌ কনস্তান্তিনোপলের কথা ভুলেন নাই। নূতন রাজ্য স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই তিনি দস্যুবৃত্তি করিবার সময়ে, কনস্তান্তিনোপলের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রুরিক্‌ ৮৬২ খৃষ্টাব্দে নূতন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, আর ৮৬৪ খৃষ্টাব্দেই জলপথে কনস্তান্তিনোপল লুট করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সমৃদ্ধি এবং সৌন্দর্য্যই কনস্তান্তিনোপলের কাল হইয়াছে।

রুরিক্‌ বিফল-মনোরথ হইবার পরে, ৯০৬ খৃষ্টাব্দে বালক রাজা আইগরের মাতা বীর নারী ওল্‌গা কৃষ্ণসাগর-কূলে অনেক নরহত্যা, এবং লুণ্ঠনের পর কনস্তান্তিনোপলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কনস্তান্তিনোপল্‌ লুট করা অসম্ভব দেখিয়া, তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন; এবং হেলেন্‌ নাম লইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু ফিরিবার সময় লোলুপ দৃষ্টিতে নগরীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন যে, একদিন কি ঐ নগরীর অতুল সম্পদ তাঁহার ভোগে আসিবে না? কনস্তান্তিনোপল্‌ হইল রুষিয়ার গুরু পাট; কিন্তু ক্ষুধিত ভল্লুক গুরুর ভাণ্ডার আত্মসাৎ করা পাপ মনে করে নাই। রাণী ওল্‌গো বা হেলেনের পুত্র আইগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্রেই বিপুল আয়োজনে কনস্তান্তিনোপল্‌ অবরোধ করিয়াছিলেন। আইগর পরাভূত হইবার পর আবার ৯৭২ খৃষ্টাব্দে বেটস্লাব্‌ (Svataslav) গুরুপাট দখল করিতে ছুটিয়াছিলেন। বেটস্লাবের মৃত্যুর পর প্রায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত রুষিয়া আর কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পরেই ক্রমাগত ২৫০ – ৩০০ বৎসর রুষিয়া মোঙ্গল বিজেতার পদতলে দিন কাটাইতেছিল। রুষিয়া যখন ইহার পর স্বাধীনতা লাভ করিল (১৪৯২—১৫০৫); তখন কনস্তান্তিনোপলে তুরস্কের রাজত্ব চলিতেছিল। কনস্তান্তিনোপলের লোভে যাহারা গুরুর বক্ষে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহারা যে ঐ নগরীর মুসলমান অধিকার সহিতে পারিবে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

১৫৫২ খৃষ্টাব্দে রুষিয়ার রাজা-সমষ্টির প্রথম জাররূপে চতুর্থ আইবান্‌ যখন উন্নীত হইলেন, তখনও রুষিয়া বড় দুর্ব্বল। ডন্‌ এবং বলগার পথে খাল কাটিয়া, তুরস্কের সুলতান যখন বাণিজ্যের পথ খুলিলেন; তখনও তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত, রুষিয়ার সীমান্তে কৃষ্ণ সাগরকূল পর্য্যন্ত; তাতার জাতীয়েরা প্রবল ছিল।

রুষিয়ার জার পিটার ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে আজব (Azov) অধিকার করিবার পর স্বদেশের সুব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, তুরস্কের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। ইহার পর ১৭০০ খৃষ্টাব্দে, রুষিয়া এবং তুরস্কের মধ্যে ত্রিশ বৎসরের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। সে কালে রুষিয়ার সন্ধি ছলনামাত্র ছিল। সন্ধি-সত্ত্বেও ১৭১০ খৃষ্টাব্দে পিটার মহোদয় তুরস্কের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া, প্রুথ (Pruth) নদীর তীরে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার রাণী বা কেথেরিণের কৌশলে ও অর্থব্যয়ে কোন রূপে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর, বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ, এবং সন্ধির পর সন্ধি ক্রমাগতই চলিতেছিল। তুরস্ককে পূর্ব্বে ইউরোপের সকল জাতিই ভয় করিত; কিন্তু ১৭২০ খৃষ্টাব্দের পর চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া ছিল যে, তুরস্ক হীন বল হইয়া পড়িয়াছে, এবং যখন তখন তাহাকে বিপদগ্রস্ত করা যাইতে পারে। এই জন্যই রুষিয়া ক্রমাগত সকল সন্ধি উপেক্ষা করিয়া, বিনা কারণে তুরস্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে রুষিয়া যখন রণতরী সাজাইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল, তখন রুষিয়ার রণপোতে অনেক ইংরেজ, চালক এবং কর্ম্মচারীরূপে ছিলেন।

নবম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্য্যন্ত; রুষ রাজ্যের যে সংক্ষিপ্ত কথা বলিলাম, তাহার মধ্যে যথার্থ গৌরবের কাহিনী বড় অধিক নাই। প্রথম চারিশত বৎসর ধরিয়া বর্ব্বর রাজ্য সন্নিবেশের পর, তিনশত বৎসরের পরাধীনতার ইতিহাস পাই; এবং প্রথম হইতে এই ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতেছি যে, কেবল সমৃদ্ধি-পরিপূর্ণ বলিয়া, রুষিয়া ক্রমাগত কনস্তান্তিনোপল-লাভের জন্য ছটফট করিয়া আসিতেছে। রুষিয়ার জাতীয় জীবনের যেন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য, কনস্তান্তিনোপল লাভ। প্রুথ নদী তীরের কলঙ্ক ক্ষালনের জন্যই ১৭৬৬ এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ-যাত্রা, অথচ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রুষিয়াকে বাধ্য হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে হইয়াছিল। কাঁঠাল যতই উচ্চ গাছে থাকুক; রুষিয়ার জার স্বীয় গুম্ফ তৈলসিক্ত করিতে ছাড়েন নাই। রাজ-বংশের একটি সন্তানকে কনস্তান্তাইন্ (Constantine) নাম দেওয়া হইয়াছিল; এবং মস্কাউ নগরের নূতন নির্ম্মিত রাজ প্রাসাদের একটি প্রবেশ-দ্বারের নাম রাখা হইয়াছিল—কনস্তান্তিনোপল্ প্রবেশের পথ।

ইহার পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস, রুষিয়ার আধুনিক ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসের সহিত সকলেই সুপরিচিত। জগৎ-বিখ্যাত সুচতুর নেপোলিয়ান সন্ধির ছল করিয়া; রুষিয়ার জারকে ভুলাইয়া, রুষিয়ার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু উহা ঘটিয়া উঠে নাই। রুষিয়ার দুর্ব্বলতা কোথায়, নেপোলিয়ান তাহা জানিতেন; এবং সেই জন্যই তাহাকে তুরস্ক জয়ের লোভ দেখাইয়া, হীনবল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জর্ম্মাণিও অনেকবার ছলনাপূর্ব্বক, তুরস্কের লোভ দেখাইয়া, রুষিয়াকে বাঁদর নাচাইয়াছে। কিন্তু উপস্থিত ইউরোপীয় সমরে, রুষিয়া ন্যায় এবং সাধুতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেছে; এবং সেই যুদ্ধে রুষিয়ার বীরদর্প এবং ধীরতা দেখিয়া, এই সর্ব্ব প্রথম আমরা রুষিয়াকে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইতেছি। জর্ম্মান দস্যুকে পরাভূত করিয়া, প্রকৃতস্থ করাই সমবেত যুক্তদলের উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, রুষিয়া

তাহার চিরকালের আকাঙ্খিত ফল লাভ করিবে, কিংবা সন্ধির নিয়মে অন্য কোন ব্যবস্থা হইবে; তাহা এখনও অজ্ঞাত।

উপস্থিত যুদ্ধের সময়ে যাহা নিতান্ত জ্ঞাতব্য, রুষিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাই অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি। রুষিয়া এখন যুদ্ধ করিতেছে খাসা; কাজেই পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—এ দিকে তো বেশ, তবে লেখাপড়ায় কেমন? বিদ্বেষ বুদ্ধিশূন্য সুবুদ্ধি ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, যে রুষিয়ার খুব উচ্চ শ্রেণীর অল্প জনকতক ভদ্রলোক ছাড়া, বাদ বাকী লোকেরা ডাহা মূর্খ বলিলেও ক্ষতি হয় না। বেশী পয়সা-কড়িওয়ালা ভদ্রলোক ছাড়া কেহ লেখা-পড়াই জানে না। রুষিয়ার সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা যেমন বর্ব্বর, আকাঠ মূর্খ—এমন আর পৃথিবীর কুত্রাপি দেখা যায় না। রুষিয়ার সৃষ্টি হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, লেখা-পড়ার এক রকম চর্চ্চাই ছিল না। দেশের কলঙ্ক মোচনের জন্য, পিটার দি গ্রেট ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিত মালী আনাইয়া ফরাসী ও জর্ম্মান সভ্যতার বড় বড় ফলন্ত গাছ, একেবারে রুষিয়ার মাটিতে পুঁতিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহার ফল কি হইয়াছিল বলিতে হইবে না। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে মস্কাউ নগরে বিশ্ববিদ্যালয় বসিয়াছিল, কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয় অল্পসংখ্যক ভদ্র লোকের শিক্ষার জন্যই আবদ্ধ আছে। আমরা যাহাকে নিম্ন শ্রেণী বা চাষাভুষা বলি, রুষিয়ায় তাহাদের নাম মোয়াজিক্ (Moujiks); বর্ব্বর মোয়াজিকের সহিত শিক্ষিতের প্রভেদ আকাশ-পাতাল।

একেই তো চিরকাল দুয়ার বন্ধ করিয়া এবং চোখ বুঁজিয়া, রুষিয়াবাসীরা ইউরোপের সভ্যতা এবং আলোক দেশে প্রবেশ করিতে দেয় নাই; তাহার উপর আবার কেহ লেখা পড়া শিখিয়া, নূতন ধরণের মত প্রচার করিলেই, তাহাকে তাড়িত হইতে হয়। একজন রুষ প্রেমিক ইতিহাস-লেখক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া লিখিয়াছেন—

The history of Russian thinkers is a long list of martyrs and a register of convicts. সাহিত্য-চর্চ্চার যে ভাল লেখকটি নূতন ধরণের কথা লেখেন, তাঁহাকেই নির্ব্বাসিত হইতে হয় অথবা অন্য দণ্ড ভোগ করিতে হয়। টল্‌ষ্টয় প্রভৃতি জনকয়েক লোকের নাম বাদে, রুষিয়ার সুশিক্ষিত লোকেরা হয় জিহুদা, না হয় আরমানিয়ান; না হয় আর কোন রুষিয়াবাসী বিদেশী। বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা এতই কম হইয়াছে, যে রুষিয়াকে সুসভ্য ইউরোপের একটা দেশ বলিয়া পণ্ডিতেরা গণনা করেন না। সে যাহাই হউক কারপেথিয়ান্ প্রস্থে ইহারা লড়িতেছে ভাল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(২৯)

রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া বিপিন খুড়িমাকে বলিল—খুড়িমা আমাদের সঙ্গে তুমিও কলকাতা চল। আমাদের ঘরকন্না গুছিয়ে আমাদের স্থিতি করে দিয়ে তারপর কাশী যেও।

খুড়িমা রূঢ় স্বরে বলিলেন—সংসারে আর আমি থাকছিনে। কাশী না গিয়ে আমি জলগ্রহণ করব না।

নবকিশোর বলিল—তবে খুড়িমা ওপারের প্লাটফর্ম্মে চল; কাশীর গাড়ী আসবার সময় হয়েছে।

খুড়িমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিপিন ও মালতী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইল।

এই বিদায়ের ক্ষণে খুড়িমার সকল কঠোরতা চোখের জলে ভাসিয়া গেল। তিনি বিপিন ও মালতীর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন; তারপর বিপিনের হাতে মালতীর হাত রাখিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন—আমার মান ইজ্জত, আমার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে দিয়ে গেলাম বাবা; তুমি তার মর্য্যাদা রেখো।

বিপিন ও মালতীর চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। বিপিন বলিল—খুড়িমা, মা ত আমাদের আশীর্ব্বাদ করলেন না; তুমিও আমাদের ছেড়ে যাবার সময় আশীর্ব্বাদ করে যাবে না।

খুড়িমা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—আশীর্ব্বাদ করছি আমি যেমন দুঃখ পেয়েছি তোমরা তেমনি সুখী হয়ো।

খুড়িমা আর কিছু বলিতে পারিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে নবকিশোরের সহিত প্রস্থান করিলেন। বিপিন ও মালতী স্তম্ভিত হইয়া খুড়িমার এই অভিসম্পাতের মতন ভীষণ আশীর্ব্বাদের কথা ভাবিতে লাগিল।

(৩০)

বিপিন ও মালতী কলিকাতায় আসিয়া তারকের বাড়ীতে উঠিয়াছে। নবকিশোরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এখানে মালতী পরের অন্তঃপুরে আছে, সেখানে গিয়া বিপিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছে না, নবকিশোরও কাছে নাই। তাহার মনে একটি শান্তিময় ঘরের অতীত স্মৃতি ও একটি সম্ভবপর ঘরের সুখময় কল্পনা থাকিয়া থাকিয়া কেবলি আঘাত দিতেছে, তাহাকে ব্যাকুল ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, এ অবস্থায় মালতী ও নবকিশোর উভয়েরই সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপিনের কিছুই ভালো লাগিতেছে না। তাহার উপর সমস্তদিন তারকের সহিত তর্ক করিয়া করিয়া তাহার মন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। তারক তাহার প্রাণপণ চেষ্টায় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে বিধবা-বিবাহ আমাদের দেশের জিনিষ নয়,—ইহা বিলাতী আমদানি। যে দেশে বিধবার চরম আদর্শ পুড়িয়া মরা, যে দেশে বিধবা

মানে পুণ্যশীলা ব্রহ্মচারিণী, সে দেশে এরূপ অনাচার ব্যভিচারেরই নামান্তর।

বিপিন বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া একদিন তাহাকে বলিল—মাপ কোরো ভাই, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করছিনে, তর্কটা তোমার কিশোরের জন্যেই তোলা থাক, তার সঙ্গেই তোমার বনবে ভালো। আমি শুধু বলতে চাই কি, তোমরা শুধু স্ত্রীলোকের বেলাই এতটা কঠিন নজর রাখ কেন? আর পুরুষের বেলাই বা রাখ না কেন? পুরুষের চোদ্দটা বিয়ে করলেও দোষ নেই, আর যত দোষ বিধবার বেলা?

তর্কের সুযোগ পাইয়া তারক পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—পুরুষ আর স্ত্রী সমান হল! প্রকৃতিই যে তাদের ভিন্ন ছাঁচে গড়েছে। যে নারী সন্তানের জননী হবে, তার কি একনিষ্ঠতা আবশ্যক নয়।

—মানি। কিন্তু বিধবা যে, তার বিবাহ হলে একনিষ্ঠতা নষ্ট হয় না। বিশেষত যে বিধবা কুমারীরই সমান আপনার সমস্ত প্রাণের অনিবেদিত ভালোবাসার অর্ঘ্য সাজিয়ে সার্থকতার জন্যে একজন কারুর অপেক্ষা করে আছে, তার বেলাও কি ঐ ব্যবস্থা?

—হাঁ নিশ্চয়। প্রকৃতির নিয়ম কখনো কি স্বতন্ত্র লোকের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। নিয়ম নিয়মই। ওরকম লোককে সেই নিয়মের অনুকূল করে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। সে দুর্ব্বল বলে ত আদর্শ খাটো হতে পারে না। আদর্শ চিরকালই উচ্চ; মানুষের মন চিরকালই খাটো;—তাকে সংগ্রাম করে সেই উচ্চ স্থানে পৌছতে হবে; এইতেই ত তার গৌরব।

—এ ত প্রকৃতির নিয়ম নয়; এ যে সমাজের শাসন। সকলকেই জোর করে আদর্শে পৌছে দিতে গেলে কি ফল হয় তা ত সমাজের মধ্যে আমরা নিত্যই দেখছি। তার ওপর, মনে কর, যারা অসহায় নিরাশ্রয়, যাদের ভালো থাকবার ইচ্ছা আছে কিন্তু সুবিধা নেই, তাদের উপায়?

তারক জোর দিয়া বলিল—নিরাশ্রয় হলেই নিরুপায় হবে তার কি মানে আছে। আমাদের দেশের সন্ন্যাসিনীরা কি? একেবারে নিরাশ্রয় কিন্তু কত বড় সব সাধ্বী! তোমায় আমি দেখাব দেখাব, প্রত্যক্ষ দেখাব, বিধবা সাধ্বী সন্ন্যাসিনী কাকে বলে।... শুনেছ ত শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ স্বামীর নাম! সাক্ষাৎ দেবতা! শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার! নিয়ে যাব তোমাকে আজই দর্শন করাতে। দেখবে দেখবে তিনি নরনারীর কি চমৎকার আদর্শ প্রচার করছেন। তিনি আমার গুরুজী।

এই বলিয়া তারক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার মাংসশূন্য কঙ্কালসার হাত দুটি জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। গুরুজীর স্মরণে বিভোর হইয়া তাহার তর্ক থামিয়া গেল।

তারক বলিল—গুরুজীকে দর্শন করতে যাবে?

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় তিনি থাকেন?

—তাঁর আশ্রম এখন খড়দহে। গঙ্গার

ধারেই আশ্রম, নামেও আনন্দাশ্রম কাজেও আনন্দাশ্রম, কি মনোরম পবিত্র সে স্থান। গেলেই ইচ্ছে করে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে গুরুজীর চরণতলে পড়ে থাকি।

বিপিন হাসিয়া বলিল—এ রকম মনের অবস্থা যখন হয় তখন ত সে রকম জায়গায় যাওয়া ঠিক উচিত হবে না।

তারক গম্ভীরভাবে বলিল—সংসারে মায়া কি অত শিগগির কাটে হে ভায়া? মুক্তির পথ অত সহজ নয়। শ্রীগুরুর বিশেষ কৃপা না হলে তাঁর চরণে আশ্রয় মেলে না।

বিপিন হাসিয়া বলিল—যদি তাঁর এই অধমের প্রতি বিশেষ কৃপাই হয়ে পড়ে, তখন?

—সে সৌভাগ্য তোমার হবে না, ভয় নেই।

—ঠিক বলছ ত হবে না! হলে কিন্তু তুমি তার জন্যে দায়ী!

—হাঁ হাঁ, এখন চল।—বলিয়া তারক বিপিনের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

বিপিন হাসিতে হাসিতে প্রস্তুত হইয়া তারকের গুরুজীকে দেখিতে যাত্রা করিল। তারকের তর্ক খোঁচা দিয়া দিয়া বিপিনের আবাল্যের সমস্ত সংস্কারকে উস্কাইয়া তুলিয়া তাহাকে বড় দ্বিধার মধ্যে ফেলিতেছিল। সে নিজের বিক্ষিপ্ত মনটাকে নূতন দৃশ্য দেখিয়া গুছাইয়া লইবার জন্য সানন্দেই তারকের আহ্বান স্বীকার করিল।

আহিরীটোলা ঘাট হইতে একখানি পাল্কি ভাড়া করিয়া তারক ও বিপিন খড়দহে আনন্দাশ্রমের ঘাটে আসিয়া নামিল। প্রশস্ত ঘাটটি আগাগোড়া মার্ব্বেল পাথর দিয়া বাঁধানো। জলের তল পর্য্যন্ত সোপান-শ্রেণী নামিয়া গিয়াছে। বরফের মতো শুভ্র সুন্দর ঘাটের শিলায় গঙ্গার জল ছলছল তরতর করিয়া খেলা করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়াই বিপিন দেখিল একটি চমৎকার সুরম্য সুসজ্জিত পরিষ্কার পরিপাটী প্রকাণ্ড উদ্যান। কোথাও কদম্বকুঞ্জ, কোথাও বকুলবীথি, কোথাও কুরবকের কেয়ারি; মাঝে মাঝে গোলাপ বেল মল্লিকা মালতী সুরভিপুষ্পের ক্ষেত; কেয়াফুলের বেড়া; একপ্রান্তে একটি লতাবিতান, তাহার প্রবেশপথে একটি মার্ব্বেলের খিলান, তাহার মাথায় সোনালি পাথর বসাইয়া লেখা আছে—কেলিকুঞ্জ। মাঝে মাঝে শষ্পক্ষেত্র চোখের উপর মাধুর্য্যের শ্যাম-অঞ্জন বুলাইয়া দিতেছে। পায়ে ঝাঁঝ আর গলায় ঘুঙুর পরিয়া দুটি হরিণ চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে; তালতমাল কুঞ্জের তলায় তলায় গুটিকয়েক ময়ূর চরিয়া বেড়াইতেছে; শান্ত নীরব আশ্রম-বাটিকাটি কত শত পক্ষীর আনন্দ-সঙ্গীতে থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কৃত মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। স্থানে স্থানে শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে ফোয়ারার উচ্ছ্বসিত ধারা হীরার শতনরী হারের মতো উৎসারিত হইতেছে। এত বড় বাগানের কোথাও অনাবশ্যক ঘাস জন্মে নাই, কোথাও একটি শুষ্কপত্র পড়িয়া নাই, যেন একখানি নিরুপম চিত্রপট। এই বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যস্থলে একখানি ছবির মতো বাড়ী, আগাগোড়া আইভি-

লতায় ঢাকা; এই বাড়ীটিও প্রকাণ্ড। বাড়ীর তোরণে লেখা আছে গোলোকধাম। বাড়ীর প্রবেশপথেই একটি ঘর আছে, সেইখানে জুতা রাখিয়া যাইতে হয়। জুতা রাখার ঘরের পাশেই একটি জলের চৌবাচ্চা, একটি পাথরের মাছের মুখবিবর দিয়া জল নির্গত হইয়া পড়ে; তাহার উপরে সোনার পাথরে লেখা—বৈতরণী। বাড়ীতে আরো অনেক চৌবাচ্চা আছে; তাহা হইতে জল বাহির হইবার নালি কোনোটি বা গোমুখী, কোনোটি বা মকরমুখী, কোনোটি বা শতধারা; কোনোটির নাম ভোগবতী, কোনোটির নাম মন্দাকিনী, কোনোটির নাম অলকনন্দা।

বিপিন ও তারক জুতা খুলিয়া, বৈতরণীতে পা ধুইয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। অট্টালিকার মেঝে পর্য্যায়ক্রমে শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মরে মণ্ডিত, তাহাতে মধ্যে মধ্যে শতদল পদ্মের আকার হইয়াছে; স্তম্ভগুলি বিচিত্র বর্ণের মার্বেলের; কড়িকাঠ হইতে বিচিত্র সুন্দর আলোর ঝাড়, লণ্ঠন, বেল, ঝুলিতেছে। কক্ষে কক্ষে গৈরিকধারী শিষ্যমণ্ডলী ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে রত। কেহ পীড়িতের সেবা করিতেছে। কেহ কেহ বা ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতেছে, কিন্তু তাহা উদ্ধতভাবে তর্ক করিয়া নয়, শান্তভাবে ধীরস্বরে।

বিপিন ও তারক মর্ম্মর সোপান বাহিয়া দ্বিতলে উঠিল। দ্বিতলের একাংশে ঠাকুরঘর, ঠাকুরঘরটি গঙ্গার দিকে। বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া গঙ্গার উন্মুক্ত বক্ষ চমৎকার দেখা যায়। ঠাকুরঘরের সম্মুখে লেখা আছে—বৈকুণ্ঠ। ভিতরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ, নাম রাধাকান্ত। কয়েকজন শিষ্য ঠাকুরের পূজা আরতি ভোগের আয়োজন করিতেছে, তাহারাও নীরব, অথচ প্রসন্ন। তারক বিগ্রহকে প্রণাম করিল; বিপিনও দেখাদেখি করিল, সে এই শান্ত নীরব সুন্দর আশ্রমে আপনার বিরোধকে বড় করিয়া রাখিতে পারিল না।

সেখান হইতে তারক বিপিনকে গুরুসন্দর্শনে লইয়া চলিল। একে গুরু তায় সন্ন্যাসী, তাঁহার গৃহে সকলেরই অবাধ গতি; এ জন্য এ গৃহের কোনো দ্বারে অর্গল পর্য্যন্ত নাই। বিপিন গিয়া দেখিল একটি প্রশস্ত কক্ষ; বহুমূল্য পুরু নরম গালিচায় একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঢাকা। ছাদ হইতে বিবিধবর্ণের সুন্দর সুন্দর বেলোয়ারি ঝাড় প্রলম্বিত; দেয়ালে বিচিত্র পুষ্পপত্র অঙ্কিত, তাহার মাঝে মাঝে দেশী বিদেশী পুরাণের চিত্র, গোপালজননী যশোদার পাশে যিশুজননী মেরীর ছবি, মহাভারত রামায়ণ পুরাণের দৃশ্যের পাশে পাশে য়ুরোপীয় শিল্পগুরুগণের অঙ্কিত চিত্র সজ্জিত রহিয়াছে। ছবির উপরে দেয়ালের গায়ে বিচিত্র ছাঁদের লেখায় ইংরেজি, সংস্কৃত, ফার্সী বচন চিত্রিত। ঘরের মধ্যস্থলে আর-একখানি ছোট কার্পেটের উপর বসিয়া আছেন গুরুজী; আর তাঁহার সম্মুখে কতিপয় আগন্তুক।

ঘরের একপ্রান্তে একখানি প্রকাণ্ড মেহগিনি কাঠের সুন্দর খাট; তাহার শয্যা, মশারি সমস্তই রেশমী; দরজায় দরজায় চওড়া হাশিয়াদার শালের পর্দ্দা; পাশের ঘরে একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরী বিভিন্ন ভাষার

পুস্তক ও হস্তলিখিত পুঁথির সুশৃঙ্খল সন্নিবেশে সম্পদশালী।

আগন্তুকদের মধ্যে কেহ শোকাতুর, কেহ জগতের কৃতঘ্ন আচরণে আহত, কেহ দরিদ্র,—তাহারা সান্ত্বনার সন্ধানে এখানে আসিয়াছে। কেহ বা আত্মা, ইহকাল পরকাল, পুনর্জন্ম প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের মীমাংসা করিতে আসিয়াছে। গুরুজী হাসিয়া হাসিয়া সকলের সহিতই শান্ত ধীর ভাবে আলোচনা করিতেছেন। কত লোক কত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতেছে তবু তাঁহার বিরক্তি নাই। তাঁহার বদনমণ্ডল সর্ব্বদাই প্রসন্ন, হাস্যদীপ্ত।

গুরুজীর বয়স চল্লিশের নীচেই। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুকোমল সুশ্রী শান্ত মূর্ত্তি। চুল দাড়ি গোঁফ কামানো, মুখভাবে মেয়েলি ভাবের উজ্জ্বল লাবণ্য। গায়ে একটি রেশমী গেরুয়া রঙের আলখেল্লা, মাথায় একটি রেশমী গেরুয়া পাগড়ী। গুরুজীর চোখ দুটি চমৎকার সুন্দর, বুদ্ধিতে ঝলমল করিতেছে, তাঁহার অন্তরের দর্পণের মতো প্রশান্ত নির্ম্মল; মুখখানি সংযম-নিষ্ঠার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, দৃঢ়তা-মাখানো অথচ সদাই হাস্যমধুর। এই অপরূপ পুরুষকে দেখিয়া বিপিন মনে মনে বলিল—হাঁ মানুষ বটে! গুরু হবার উপযুক্ত! শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বিপিন প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে বসিল।

এত সব বিলাসসজ্জা বিপিনের মনে কিছুমাত্র দ্বিধা উদ্বোধিত করিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল এই অদ্ভুত পুরুষের চারিদিকে এইরূপ সৌন্দর্য্য সম্পদের সমাবেশ না হইলে যেন ঠিক মানাইত না।

গুরুজী স্মিত হাস্যে মাথা নত করিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং হাসিমুখে তারককে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিহে সংসারানন্দ! ইনি?

তারক কৃতাঞ্জলিপুটে পরম বিনয়ের সঙ্গে বলিল—উনি আমার একটি বন্ধু। নাম বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী। উনি এম-এ পাশ। আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।

গুরুজী হাসিয়া বলিলেন—আমি এম-এ-ওয়ালাদের বড় ডরাই, তাঁরা শুধু তর্ক করতেই আসেন।... বিপিন বাবু, আপনাকে আগেই বলে রাখি, এঁরা সবাই আপনাকে বলবেন যে আমি একটা মস্ত রকমের অবতার, বরাহ কূর্ম্ম দলের ঢের ঊর্দ্ধে, চাইকি আমি স্বয়ং ভগবানই। তবে আমি যে সে কথা অস্বীকার করি সে হচ্ছে আমার লীলা!... এসব কথা আপনি কিছু বিশ্বাস করবেন না; আমি আপনাদের মতনই একজন অতি সাধারণ মানুষ, পাপে পুণ্যে লালসা বৈরাগ্যে জড়ানো অতি সাধারণ।... তবে প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তা-প্রণালীর একটা স্বাতন্ত্র্য আছে; আমার যেটা সত্য ও মঙ্গল বলে দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, তাই আমি লোককে বলি, কেউ বা সে মত গ্রহণ করে, কেউ বা করে না! মহাপ্রভু ঈশা বলেছেন—You shall know the truth and the truth shall make you free. এ সত্য কি রকম সত্য? সে কথাও মহাপ্রভু ঈশা

স্পষ্ট করেই বলে গেছেন—Then shall ye know, that I do nothing of myself; but as my father hath taught me, I speak these things. And He that sent me is with me; the Father hath not left me alone. এই বোধের যে ভরপূর আনন্দ, যে আনন্দে আমার অন্তর ফুলে ফুলে ওঠে তা আমি নিজে সম্ভোগ করতে না পেরে আমার ভাই ভগিনীদের বণ্টন করে দি। এই অপার আনন্দ প্রচার করা ভিন্ন আমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি সংসারত্যাগী নই, আমি ঘোর কৃপণ সংসারী! এই বুঝে তর্ক করবেন।

গুরুজীর চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়া হাসিতে লাগিল। বিপিন জন্মে তেমন মোহন চরিত্রদ্যোতক মুখভাব দেখে নাই; মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন তাঁহার চিত্তের গভীর জ্ঞান, মনের সরলতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা চরিত্রের দৃঢ়তা ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল। বিপিন একেবারে মুগ্ধ হইয়া বলিল—প্রভু, আমি মূর্খ! কতকগুলো কেতাব পড়ার ছাপ বিশ্ববিদ্যালয় আমার নামের গায়ে মেরে দিয়েছে মাত্র। জ্ঞান আমার কিছুমাত্র হয়নি। আমি তর্ক করতে আসিনি, শিষ্যের মতো জিজ্ঞাসু হয়ে এসেছি। আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দিন, মানুষের কর্ত্তব্য কি, ধর্ম্ম কি, কি ব্রত পালন করলে আমি প্রকৃত মানুষ হতে পারব।... আর দয়া করে আপনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন না।

গুরুজী হাসিয়া হাসিয়া মানুষের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ভাষার সে কি প্রচণ্ড শক্তি, কি ওজস্বী প্রকাশ; বলিবার সে কি অপূর্ব্ব মনোহর ভঙ্গি; স্বরের কি গম্ভীর মাধুর্য্য; জটিল কথাকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া সরল করিবার সে কি চমৎকার নিপুণতা! কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা সঙ্গীতের মতো সুমধুর একটি তাললয়ছন্দে গাঁথা সুরে অনুপ্রাণিত, হাসির মতো স্বচ্ছ ও মনোহর। বিপিন মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, আবিষ্টের মতো শুনিতেছিল। গুরু কি বলিতেছেন সে ভালো করিয়া শুনিতে পারিতেছিল না, বুঝিতে পারিতেছিল না, শুনিতেছিল শুধু তাঁহার বাক্যের প্রবল প্রবাহের ঝঙ্কৃত সঙ্গীত, দেখিতেছিল শুধু তাঁহার অপরূপ সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল মূর্ত্তি!

আরতি আরম্ভের শঙ্খধ্বনি হইল। গুরু নীরব হইলেন। সকলকে লইয়া তিনি রাধাকান্তের আরতি দেখিতে গেলেন। বিপিনের চোখের সামনে আরতির পঞ্চ-প্রদীপের আলো যেন গুরুর চোখের আলোর কাছে ম্লান বোধ হইতে লাগিল। আলোকে গন্ধে আনন্দে আরতি হইয়া গেল। স্বামীজী তখন যুক্ত করে ঊর্দ্ধনেত্রে পরম পুলকিত ভাবে গান ধরিলেন—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

বিপিন তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল সে স্বর কি তীক্ষ্ণ, কি মধুর! ছন্দে ছন্দে

পর্দ্দায় পর্দ্দায় ভাবের হিল্লোলে সুর তরঙ্গিত হইতেছিল—সে সুর কোথাও আপনার সৌভাগ্যগর্ব্বে পুলকিত, কোথাও বেদনায় আপ্লুত, কোথাও মিনতিতে একেবারে বিগলিত! সঙ্গীতরসধারা মন্দির ছাপাইয়া অট্টালিকা ভেদ করিয়া আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, গঙ্গা সেই সন্ধ্যারতির বন্দনা-গানে তাল দিয়া তেমনি হিল্লোলে গলিয়া পড়িয়া যুগল-সম্মিলনে ছুটিতেছিল।

স্বামীজী গান সমাপ্ত করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বিপিনের মনে হইতেছিল এ প্রণাম যেন যথেষ্ট প্রণাম হইল না, সমস্ত হৃদয় লুটাইয়া দিলে যেন ঠিক হয়। তার পর গুরুজী নিজের হাতে সকলকে প্রসাদ পরিবেষণ করিলেন, বিপিন ভক্তিতে একেবারে গলিয়া অশ্রুজলে পরিণত হইবার মতন হইতে লাগিল।

স্বপ্নাবিষ্টের মতন তাহাকে তারক একরকম টানিয়া আনিয়া বাড়ীতে ফেলিল। সে বাড়ীতে আসিয়া মনে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল গুরুজী কি বলিয়াছেন। স্বপ্নভঙ্গের পর কিছুই যেমন স্পষ্ট মনে হয় না, সমস্ত ব্যাপারটা আবছায়া রকমে অনুভবেই থাকে, স্মৃতিতে ফুটিয়া ওঠে না, চেষ্টা করিয়া তাহা স্মরণ করিলেও সঞ্চরমান চিত্রের মতো পশ্চাতের দৃশ্য যখন উপস্থিত হয় পূর্ব্বের দৃশ্য তখন অন্তর্হিত, বিপিনেরও তেমনি কিছুই বেশ একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলায় স্মরণ হইতেছিল না; টুকরা টুকরা তালি জুড়িয়া সে এইটুকু বুঝিল যে স্বামীজী বলিয়াছেন—বৈরাগ্যমূলক প্রেমই ধর্ম্ম। মানুষ নিজেকে কোনো বিশেষ দেশকালের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিবে না, সে আপনাকে বিশ্ববাসী মনে করিবে, অতীত অনাগত সকল কালের সকল লোকের সহিত প্রেমযোগ স্থাপন করিলে ই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মমতা নষ্ট হইয়া শান্ত বৈরাগ্য হৃদয় পরিপূর্ণ করিবে। মানুষে মানুষে ভেদ নাই,—সকল জাতি সকল বর্ণ সেই এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষেরই বিচিত্র প্রকাশ। অহঙ্কার এই মোহ উৎপাদন করে, প্রবৃত্তিই এই ভেদ সংঘটিত করায়; নারী স্বর্গীয় জিনিষ, ইঁহাদিগকে পূজা করিতে হয়, ভোগে কলুষিত করিতে নাই। ইঁহারা দেবতা; যিনি সৌন্দর্য্যের আদি প্রস্রবণ পরমসুন্দর, নারী সেই সৌন্দর্য্যসূর্য্যের সমুজ্জ্বল রশ্মি; আমরা আমাদের হৃদয় পরকলার ভিতর দিয়া দেখি বলিয়া নারীকে লালসায় রঙিন করিয়া দেখি, কিন্তু বস্তুত নারী শুভ্র উজ্জ্বল পবিত্র। প্রেমের পাত্র স্ত্রীপুরুষ সকলেই সমান; স্ত্রীপুরুষ ভেদে যদি ভাবের তারতম্য ঘটে তবে সেখানে নিজের চিত্ত নির্ম্মল নাই বুঝিতে হইবে। আসল প্রেম জীবাত্মার পরমাত্মায়! জীবাত্মা রাধা, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধাকান্ত। হৃদ্‌কমল-মঞ্চে ইঁহাদের নিত্য নিরন্তর মিলনোৎসব চলিতেছে বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ভঙ্গিতে; প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ সুন্দর দিনে সেই আনন্দের আভাস পাওয়া যায়। যাঁহারা আত্মক্রীড় আত্মরতি তাঁহারা বুঝিতে পারেন ঝুলন রাস দোল বাহিরের কোনো সাময়িক উৎসব নয়, অন্তরে অহরহ নিত্য

নিরন্তর জীবাত্মা পরমাত্মার মহামহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে। জীবাত্মা পরমাত্মার এই যে প্রেমযোগ তাহা মানুষ বিশ্ববোধ ও আত্মবোধের ভিতর দিয়াই লাভ করে।

বিপিন ভাবিতে লাগিল, তবে কি এই-সব সংসার-মায়া মিথ্যা! মালতী আমার কেহ নহে, আমরা বিশ্বের সম্পত্তি, বিশ্ব আমাদের বিরহে ক্রন্দন করিতেছে! নবকিশোর ফিরিবার আগে স্বামীজীকে একবার সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিতে হইবে, দেখি তিনি কি বলেন। নবকিশোরটা গায়ের জোরে সমস্ত মানাইতে চায়, স্বামীজী কি শান্ত যুক্তিতে সব বুঝাইয়া দেন! নবকিশোরকে কিন্তু এখন শীঘ্র স্বামীজীর কথা বলা হইবে না, তাহা হইলে সে তর্কের ধূলা উড়াইয়া কোনো পথই ভালো করিয়া দেখিতে দিবে না।

চারিদিকের আঘাত সংঘাতে জমিদারের ছেলে বিপিন যখন নিতান্ত মুহ্যমান বোধ করিতেছিল; কাঙারু শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই যাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, চিরকাল পরের উপর নির্ভর করাই যাহার অভ্যাস, পরের সাহায্য ব্যতীত যাহার আহার বিহার আরাম বিরাম কিছুই সম্পন্ন হইবার জো ছিল না, তাহাকে যখন নিজের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে দিশাহারা হইতে হইতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার শেষ দুটি অবলম্বন নবকিশোর ও মালতীর সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপিন নিজেকে নিতান্তই অসহায় ও একাকী বোধ করিতেছিল। এমন অবস্থায় প্রেমানন্দ স্বামীর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাহার মনের উপর পড়াতে বিপিন যেন একটা আশ্রয় পাইয়া বাঁচিল। সেই দিন হইতে সে প্রায়ই স্বামীজীর আশ্রমে যাইতে লাগিল; স্বামীজী আজ বিডন গার্ডেনে, কাল টাউন হলে, পরশু কোনো থিয়েটার-ঘরে বক্তৃতা দিয়া ফিরেন, আর শত সহস্র মুগ্ধ দৃষ্টির ঈর্ষার পাত্র হইয়া বিপিন ছায়ার মতো স্বামীজীর পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরে।

একদিন স্বামীজীকে নির্জ্জনে পাইয়া বিপিন নিজের সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে নিবেদন করিল। স্বামীজী চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সমস্ত শুনিলেন। কিছুক্ষণ পরে 'রাধাকান্ত!' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিলেন। বিপিনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বৎস, তোমায় ত আমি বলেছি প্রেমই ধর্ম্ম! তুমি মহা ভাগ্যবান তাই রাধাকান্ত তোমার হৃদয়ে এমন প্রবল প্রেম দিয়েছেন। তুমি সেই প্রেমকে একধারায় ভোগের মরুভূমিতে কেন বইয়ে দেবে, তাতে তোমারই বা লাভ কি, জগতেরই বা লাভ কি? সেই প্রেমকে তোমার হৃদয়হিমাচল থেকে জাহ্নবী-ধারার মতো সহস্রধারায় বইয়ে দাও, যাক সে বিশ্বমানবের মহাসাগরে মিশে, সে সার্থক হোক, সে ধন্য করুক! আমি যতদূর দেখছি মালতী সাক্ষাৎ রাধারাণীর বিকাশ, সে সকল কলঙ্ক মাথায় করে তোমায় যে বরণ করেছে, তার সেই অপূর্ব্ব অমল প্রেম সে কি শুধু তোমার নিজের ভোগে কলুষিত করবার জন্যে! না না, তা

কখনো নয়। তোমরা আধ্যাত্মিক যোগে ঘনিষ্ঠ হবে, বিশ্ব তোমাদের প্রেমের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে। এই তোমাদের পথ। আত্মা শুধু যে কেবলমাত্র আছে তা ত নয়—আত্মা জ্ঞান প্রেম ও আনন্দের খনি। পৃথিবী কত যুগযুগান্তর তপস্যা করে আত্মাকে পেয়েছে। আত্মা পৃথিবীর অন্ধকারের আলো, মরুভূমির ওয়েসিস! আত্মাকে পেয়ে পৃথিবীর শ্রী ফিরে গেছে। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন ভোগ একদিকে, আর আত্মা একদিকে,—আত্মার তুলনায় ভোগ অকিঞ্চিৎকর ছাই ভস্ম! বেদান্তশাস্ত্র বলেন যে, আত্মা, অস্তি ভাতি এবং প্রিয়—এই তিন সাধনের ধন একাধারে। অস্তি কিনা আত্মার স্থিরপ্রতিষ্ঠা, ভাতি কিনা আত্মার জ্ঞানালোক, প্রিয় কিনা আত্মার প্রেমামৃত। তাই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধনতত্ত্ব আত্মানং বিদ্ধি, আত্মাকে জানো; তারপর আত্মাকে প্রেম কর, দেহকে নয়, নিজের ভোগের লালসাকে নয়। পুষ্করিণীতে পাঁকগুলো জমে' যেমন তার জল অব্যবহার্য্য হয়, তেমনি প্রবৃত্তির প্রলেপ লেগে আত্মার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়; নষ্ট পুষ্করিণীকে ঝালিয়ে যেমন আবার কাকচক্ষু জল পাওয়া যায়, তেমনি বিবেক বৈরাগ্য এবং সংযমের দ্বারা আত্মার পঙ্কোদ্ধার করা আবশ্যক, তা নইলে আত্মা সাধকের ভোগে আসতে পারে না।—আত্মরতিই রতির চরম বলেই জেনো। ভাষার মধ্যে যেমন ব্যাকরণ অলঙ্কার কাব্য সাহিত্য সবই অন্তর্ভুক্ত, তেমনি সমগ্র আত্মাতে জ্ঞান বীর্য্য প্রেম আনন্দ সবই অন্তর্ভুক্ত আছে; ভাষা আয়ত্ত করতে হলে যেমন প্রথমে ব্যাকরণজ্ঞানকে আয়ত্ত করা চাই, ব্যাকরণ শুষ্ক নীরস বলে ছেড়ে দিয়ে একেবারেই কাব্য ধরলে সকল দিকই পণ্ড হয়ে যায়, কাব্যের রস কিছুতেই আয়ত্ত হয় না, তেমনি সাধনের ভিতর দিয়ে প্রকৃত আত্মার প্রেম আয়ত্ত না করলে প্রেম ব্যর্থ হয়ে পড়ে।...তুমি যদি মালতীকে প্রকৃত ভালোবাসতে চাও তার আত্মার সঙ্গে তোমার আত্মার যোগ স্থাপন কর; আপনাদের ভোগলালসাকে খর্ব্ব কর।... তুমি ভাগ্যবান, তুমি ভাগ্যবান। এমন সর্ব্বস্ব-খোয়ানো প্রেম রাধাকান্তকে নিবেদন করে দিয়ে তোমরা ধন্য হও!

গুরুজী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। বিপিন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজীর তত্ত্বকথা তাহার চোখের সামনে আকাশ পাতাল উলটপালট করিয়া দিয়া বনবন করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

গুরুজী চোখ মেলিয়া বলিলেন—বৎস, তুমি অবসর-মতো কথাগুলি ভেবে দেখো।

বিপিন স্বামীজীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া নীরবে প্রস্থান করিল। বিপিনের মনের উপর স্বামীজীর কথাগুলি কাটিয়া কাটিয়া বসিতে লাগিল—স্বামীজী যে মালতীকে ত্যাগ করিতে বলিলেন না, আরো গভীর ভাবে প্রকৃত ভাবে ভালো বাসিবার পথনির্দ্দেশ করিলেন, এই কথা-টাতেই তাহাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইতে লাগিল বাস্তবিকই ত দেশবিদেশের ইতিহাসে কাব্যে এই কথাই দেখা যায়—সৌন্দর্য্য ও প্রেম

যেখানেই সমগ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া বাসনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঘুরিয়া মরিয়াছে, যেখানে মঙ্গল কর্ম্মে বৃহৎকর্ম্মে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে নাই, সেখানেই ত অবশেষে নিদারুণ দুঃখের প্রলয়াঘাতে সেই ভীষণ প্রেমের নাগপাশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। নিজের ভোগের সুর বিশ্বসঙ্গীতের সুরকে অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন করিয়া নিজেকেই যদি একান্ত প্রবল করিয়া তোলে তবে সেই ভোগ ত মৃত্যুরই নামান্তর! বিপিনের মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই যদি সে মালতীকে ভালোবাসিয়া থাকে তবে তাহাকে পবিত্র রাখিয়া সুন্দর রাখিয়াই ভালোবাসিতে হইবে, নিজেদের বাসনার পঙ্কে আত্মাকে আচ্ছন্ন বিমলিন করিয়া নহে।...কিন্তু মালতী বড় সুন্দর! এই 'অষ্টাদশ বসন্তের একগাছি মালা' কি একদিনের জন্যও বুকে তুলিয়া লওয়া অন্যায় হইবে? 'যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন!' তাহার কি ক্ষুধা মিটিবে না? জীবনসূত্রে যে জট বাঁধিয়া যাইতেছে, তাহা কি খুলিবে না?...না না, ও বিষয়ে আর ভাবনা বৃথা—

'একি দুরাশার স্বপ্ন হায়গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোনখানে!'

বিপিন পথ চলিতে চলিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিতে লাগিল—গুরুদেব, গুরুদেব, অজ্ঞানতিমিরান্ধকে পথ দেখাও, পথ দেখাও।

তারপর হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিল—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

ক্রমশঃ

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

নবাব

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মেঘ সঞ্চার

মশার্দের সহিত পথে সেদিন সে কাণ্ডটা ঘটিয়া যাইবার প্রায় সাত দিন পরে নবাব ডিউকের প্রাসাদে চলিলেন। সেদিন বৃহস্পতিবার। এ কয়দিন ইচ্ছা থাকিলেও নবাব ডিউকের দ্বারে হাজিরা দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন। সে ঘটনা পল্লবিত হইয়া ডিউকের কানে নিশ্চয়ই পৌঁছিয়াছে। ডিউক অত করিয়া নিষেধ করিয়া দিবার পরও নবাবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা ঠিক হয় নাই। ডিউক ইহাতে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষের মাত্রাটা টাট্‌কা থাকিতেই ডিউকের সঙ্গে দেখা করিতে নবাবের সাহস হইল না। অথচ না দেখা করিলেও নয়! লি-মার্কার তাহার রিপোর্ট লিখিয়া শেষ করিয়াছে, লোকের মুখে এ সংবাদটাও রাষ্ট্র হইয়াছে। সে রিপোর্টে যুক্তি যত না থাকুক, নবাবের বিরুদ্ধে তীব্র অপবাদের ভাষা যে প্রচুর সঞ্চিত আছে, সে খপরটুকুও নবাবের কানে তাঁহার দুই চারিজন

তথাকথিত হিতৈষী বন্ধু অনুগ্রহপূর্ব্বক তুলিয়া যাইতে ভুলেন নাই! এখন নবাবের পক্ষে ডেপুটি নির্ব্বাচিত হওয়ার আশা খুবই কম—তবে ডিউক মোরা তাঁহার সহায়! কাজেই নবাব হাল ছাড়িতে পারেন নাই। আজ তাই সব দ্বিধা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া নবাব ডিউকের প্রাসাদে চলিয়া ছিলেন।

প্রাসাদের অদূরে পথে অসংখ্য গাড়ী! গাড়ীর সারি প্রাসাদ পর্য্যন্ত লাইন-বন্দী দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সে গাড়ীর ভিড়ে নবাবের গাড়ীর গতি মন্থর হইয়া পড়িল; নবাব বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। তাই ত! এ যে অসংখ্য গাড়ী! ব্যাপার কি! কোন মজলিসের আয়োজন হইয়াছে না কি! কৈ, নবাব ত কোন সংবাদ পান নাই! তবে কি তাঁহাকে—? না, তাহা হইলে আজ আর যাওয়াটা ঠিক হয় না। গাড়ী ফিরানো যাক্! একটা উদ্বেগে নবাবের বুক কাঁপিয়া উঠিল। নিজের উপর রাগও ধরিল। সেদিন মশার্দকে উপেক্ষা করিলে কি ক্ষতি ছিল! তাহাকে চাব্‌কাইয়াও ত বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। ক্ষতি যেটুকু করিবার তাহা ত সে করিয়াছেই। লি-মার্কারের কলমের একটি খোঁচায় নবাবের সমস্ত জীবনটাই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে! শুধু ডিউক তাঁহার সহায় ছিলেন! মশার্দকে সেদিন চাবকাইবার ফলে সেই ডিউক আজ তাঁহার উপর বিরূপ হইলেন—এতখানি বিরূপ যে, মজলিসে তাঁহাকে একটা ডাক দিতেও ভুলিয়া গেলেন! অনুশোচনায় নবাবের সমস্ত প্রাণটা হায়-হায় করিতে লাগিল।

তিনি কোচম্যানকে গাড়ী ফিরাইতে বলিবেন, এমন সময় দুইজন পথিকের কথা তাঁহার কানে গেল। দুইজনেরই মুখের ভাব বিশেষ উদ্বিগ্ন। একজন কহিল, "এ যাত্রা তাহলে রক্ষা পাওয়া দায়!" অপর জন কহিল, "তা আর বলতে! কিন্তু হঠাৎ এমনটা হবে, কে ভেবেছিল!"

প্রথম পথিক কহিল, "দোষে-গুণে ডিউক একটা মানুষের মত মানুষ ছিল, কিন্তু।"

এ কি কথা! কাহার অসুখ—এমন অবস্থা! ডিউকের না কি! পথিক দুইজন ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, নবাবের গাড়ীও ডিউকের ফটকের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। নবাব মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, ফটক হইতে বাহির হইয়া ডিউকেরই এক ভৃত্য শশব্যস্তে ছুটিয়াছে। নবাব তাহাকে ডাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, "ডিউকের অসুখ না কি!"

ভৃত্যটা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "বাঁচেন কি না সন্দেহ! ডাক্তারে বাড়ী অমনি গিস্-গিস্ করছে। কত ডাক্তারই আসছে-যাচ্ছে! দু-একজন স্পষ্ট জবাবও দিয়ে গেছে।"

সমস্ত প্রাসাদটা যদি সেই মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া নবাবের মাথায় পড়িত, তাহার আঘাতও বুঝি তাঁহার এত তীব্র ঠেকিত না। নবাবের চোখের সম্মুখে কে যেন প্রকাণ্ড একখানা ঘসা কাচের পরদা তুলিয়া ধরিল—সমস্ত বাহ্যদৃশ্য চকিতে মিলাইয়া গেল।

বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। নবাব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। পা তাঁহার টলিতেছিল —মাথার মধ্যে যেন একখানা চাকা ঘুরিতেছিল। কোনমতে পা-দুইখানাকে টানিয়া প্রাসাদের হলে আসিয়া হতাশভাবে নবাব একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। মুখ ঘামিয়া উঠিয়াছে! রুমালে ঘাম মুছিয়া নবাব ভাবিলেন, "তাহ'লে আমারও সব আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল! সব শেষ!"

মৃত্যু আজ ডিউকের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত অতর্কিতভাবেই সে আসিয়া দেখা দিয়াছে। রবিবার ডিউক যখন বেড়াইয়া ফিরিলেন, তখন তাঁহার মাথাটা অল্প ভার বোধ হইতেছিল। ক্রমে নাড়ী-গুলাও অসহ্য বেদনায় টন্‌টন্ করিতে লাগিল। সমস্ত শরীরের মধ্যে কে যেন তপ্ত লৌহ ফুটাইয়া দিতেছে, এমনই বেদনা! রাত্রে নিদ্রা নাই—বিছানায় পড়িয়া সারা রাত্রি ডিউক ছটফট করিলেন। ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে তখনই খপর পাঠানো হইল। ডাক্তার আসিয়া ঘুমের ঔষধ দিলেন; তাহার ফলে শেষ-রাত্রিটা ডিউকের কেমন ঘোর আসিল। পরদিন সকালে আবার রুদ্ধ যন্ত্রণা দ্বিগুণ আক্রোশে ফুঁসিয়া উঠিল। বরফ আনো—বরফ! সারাদিন মাথায় গায়ে বরফ চাপাইয়া সে জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টায় ভৃত্যের দল হিম্‌সিম্ খাইয়া গেল। তবুও সে জ্বালা জুড়াইতে জানে না। ডিউকের প্রাণখানা যেন তাতিয়া গলিয়া বাহির হইবে। জেঙ্কিন্স ঘর-ঘড়ি ঔষধ বদলাইতে লাগিল, কিন্তু কোনই ফল হইল না।

বাহিরে সংবাদটা তত রাষ্ট্র হয় নাই। জেঙ্কিন্স ইচ্ছা করিয়াই ব্যাপারটাকে লঘু বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। ডিউকের বন্ধুর দল জেঙ্কিন্সের সে আশ্বাসে একরূপ স্থির হইয়াই বসিয়া ছিল। পরে তৃতীয় দিন সকালে যখন ডিউকের ঘুম ভাঙ্গিল, চোখ চাহিয়া ডিউক দেখিলেন, মাথার বালিশে রক্তের একটা রেখা সুতার মতই জমিয়া রহিয়াছে! দাড়িতে ও ঠোঁটে শুকানো রক্ত! তিনি চমকিয়া উঠিলেন। মানব-জীবনের এই চরমতম দুর্ভাগ্য, রোগের এই বীভৎসতা লক্ষ্য করিয়া ডিউকের হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মপাভঁ জেঙ্কিন্সের পিছনে দাঁড়াইয়া এই রক্ত লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিল; ডিউকের মুখের দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহার অলক্ষ্যে জেঙ্কিন্সকে বাহিরে আসিবার জন্য সে ইঙ্গিত করিল।

জেঙ্কিন্স বাহিরে আসিলে মপাভঁ কহিল, "ডিউকের অসুখটা ত এবার বড় গুরুতর দেখছি, ডাক্তার!"

জেঙ্কিন্স মৃদুস্বরেই কহিল, "আমারও আজ ভয় হচ্ছে।"

"এ রোগটা হঠাৎ দাঁড়াল কি করে?"

ডাক্তার ঈষৎ কুপিত স্বরে কহিল, "এরই জন্য আজীবন সাধনা করে আসছেন যে! তাহলেও বয়স যখন অল্প ছিল, তখন এ সব অত্যাচার সইত, এখন সইবে কেন? এই বদখেয়ালির জন্যই প্রাণটা দিতে বসেছেন।"

দারুণ হিংসায় ডাক্তারের প্রাণ জ্বলিতেছিল। কথাটার মধ্যে জেঙ্কিন্স

প্রাণের সেই সমস্ত জ্বালা মিশাইয়া দিয়াছিল! জেঙ্কিন্সের প্রাণে যেমন ঘা দিয়াছ, তেমনই তাহার ফল ফলিয়াছে ত!

পরক্ষণেই কিন্তু সুর বদলাইয়া ক্ষুব্ধভাবে জেঙ্কিন্স কহিল, "বেচারা—বেচারা ডিউক! ওঃ, আমি ত কোনই আশা দেখছি না—ম্যসিয়ো—"

এই কথাটায় মপার্ভ'র প্রকৃতই বেদনা লাগিয়াছিল। সে কহিল, "শোন, এত বড় দায়িত্বের ব্যাপার নিজের হাতে রেখে তুমি ভাল করছ না, ডাক্তার জেঙ্কিন্স। এত বাড়াবাড়ি অসুখ—অথচ দ্বিতীয় একজন ডাক্তার ডাকা হয়নি—একটা পরামর্শ করবারও কারও সঙ্গে দরকার বোধ করছ না!"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার কহিল, "বিশেষ ফল যে তাতে পাওয়া যাবে—"

সে কথায় বাধা দিয়া মপার্ভ কহিল, "তবু আমাদের মনের একটা সান্ত্বনা চাই ত! ব্রিসে, জুস্‌লিন, বুর্শার এদের একবার এখনই ডাকা হোক!

জেঙ্কিন্স কহিল, "কিন্তু ডিউক তাতে ভয় পাবেন, না?"

মপার্ভ বিরক্ত হইল, চড়া গলায় কহিল, "ভয়! ডাক্তার, তুমি জান না, ডিউক মোরা আর আমি, দুজনে ভয় কাকে বলে কখনও জানিনি। যাক্—মোরা ভয় পাবে ভেবে একটা চেষ্টা-চরিত্র অবধি আমরা করব না! আশ্চর্য্য! না, না, ব্রিসে, জুস্‌লিন—এঁদের এখনই ডাকাও। আমি নিজে ডিউককে বলছি, যে আমরা আরও পাঁচজন ডাক্তার ডাকাচ্ছি। রোগটা কি, সকলে মিলে দেখে ধরে দিন—তারপর সকলের পরামর্শ-মত চিকিৎসা চলুক।"

সন্ধ্যার সময় প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে ডাক্তারদের কমিটি বসিল। পরামর্শ গোপনেই চলিল। সেখানে একটী প্রাণীরও প্রবেশাধিকার ছিল না। ডিউক নিজে ডাক্তার আনাইতে মত দিয়াছিলেন। রোগের যন্ত্রণা তাঁহার সহ্য হয়, তবে এই রোগ যে সাধারণ মানুষের সহিত এক পংক্তিতে তাঁহাকে বসাইতে চাহে, এই দুঃখই সব চেয়ে অসহ্য!

তাই ডাক্তারী বৈঠকে পরামর্শের আজ এত ধুম! ডাক্তারদিগের মুখ গম্ভীর—মুখে কথাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত! কিন্তু হায়; এতখানি গাম্ভীর্য্যও ডিউকের যন্ত্রণা লাঘব করিতে সক্ষম নহে, আরোগ্য দান ত দূরের কথা!

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তারের দল গম্ভীরতর মুখে ডিউকের কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। বিচার-প্রার্থী অপরাধীর মতই ডিউক করুণভাবে তাঁহাদের পানে চাহিলেন। না জানি, ইঁহারা কি কথা বলিবেন! অবাধ মুক্ত আরোগ্যের আভাষ, না, কঠোর কঠিন মৃত্যুদণ্ড! ডাক্তারদের নীরব গম্ভীর দেখিয়া ডিউক কহিলেন, "আপনাদের শাস্ত্র কি বলে, বলুন।"

ডাক্তারের দল অস্পষ্ট জড়িতভাবে উৎসাহ-আশ্বাসের দুইটা মৃদু বাণী বলিলেন—টাকা খাইয়াছেন বিস্তর, তাহার বিনিময়ে এটুকু না দিলে অধর্ম্ম হইবে! তাহার পর তাঁহারা ডিউকের করকম্পন করিয়া সিগার ধরাইয়া বিদায় লইলেন। মপার্ভ ছুটিয়া বাহির

হইয়া গেল। জেঙ্কিন্স ও পুরাতন ভৃত্য লুই ডিউকের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। ডিউক জেঙ্কিন্সকে ডাকিয়া একটা কথাও কহিলেন না। তিনি জানিতেন, প্রশ্ন করিলেও সত্য কথাটা এই ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে কিছুতেই আদায় হইবে না। তাই আর বৃথা কথা বাড়াইতে তাঁহার এতটুকু আগ্রহ বা ইচ্ছা ছিল না। মপার্ভঁ ফিরিয়া আসিলে ডিউক তাহাকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে লুকোচুরি করবে না, জানি তাই। যত কঠোর হোক্, সত্য কথাটা বল দেখি। ডাক্তারেরা কি বলে গেল! আমার আর কোন আশা নেই,—না?"

মপার্ভঁ মুহূর্ত্তের জন্য স্থিরভাবে ডিউকের পানে চাহিয়া রহিল; তারপর উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "কোন আশা দেয় না, ওরা, মোরা।"

ডিউক অবিচলিতভাবেই এ কথা শুনিলেন, শুধু কহিলেন"—হুঁ—"তারপর চেষ্টাসত্ত্বেও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার বুকের মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। আশা নাই! তাহা হইলে প্রস্তুত হইয়া লও!

তারপর চকিতে ডিউক দেখিলেন, জীবনে যাহা কিছু তাঁহার প্রিয় ছিল,—ক্ষমতা, সম্মান, ঐশ্বর্য্য—এই বিপুল সমারোহ, সব কোথায় সরিয়া গিয়াছে! সেগুলা আর তাঁহার আয়ত্তে নাই—অতীতের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে! এত বড় আঘাতের বেদনা এড়াইতে অনেকখানি শক্তির প্রয়োজন। সে শক্তি যেন সকলই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এত ঐশ্বর্য্য, এত ক্ষমতা কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না! হায়রে মানুষের অক্ষম দুর্ব্বলতা! ভিতরটা তাঁহার অশ্রুর সাগরে ডুবিয়া গেল। কিন্তু না, এ শেষ মুহূর্ত্তে কেন এ কাতর অশ্রু! যে দর্প লইয়া আজীবন তিনি কাটাইয়া দিয়াছেন, আজ কেন সে দর্পকে দূর করিয়া দিবেন! লোকে দেখিবে, ডিউক কাতর হইয়াছেন! না, তাহারা হাসিবে। ডিউকও তবে সাধারণ মানুষের মত মৃত্যুর নামে ভয় পায়! না, কখনই নহে! জীবনে দম্ভের যে ডঙ্কা সমানে বাজাইয়া আসিয়াছেন, এখনও সেই ডঙ্কা বাজাইয়া মৃত্যুর হাতে তিনি আত্ম-সমর্পন করিবেন। মৃত্যু ত আসিবেই—ঐ বাগানের অসংখ্য গাছের একটি পাতা, একটি পল্লবও না ভাঙ্গিয়া, মর্ম্মর-সোপানে সুরক্ষিত ফুলগাছগুলার ফুলের একটি দলও ছিন্ন না করিয়া মৃত্যু তাহার কঠোর কর বাড়াইয়া আসিবেই! নীরবে চরণ ফেলিয়া, কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা না ঘটাইয়া সে আসিয়া ডিউকের শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিবে, 'এস।" তখন যাইতেই হইবে! কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না! সর্ব্বস্ব দিয়াও নহে। ডিউক তখন চোখের জল ফেলিবেন? না। ডিউক বালিসে চোখ মুছিলেন, একবার শিয়রের পানে চাহিলেন, মনে মনে বলিলেন, আমি প্রস্তুত—ওগো মৃত্যু, প্রস্তুত—চল, কোথায় লইয়া যাইবে। তাঁহার মত মানুষের পক্ষে ইহাই ত যোগ্য তিরোধান—ক্ষিপ্র, অবিচল, অতর্কিত!

ডিউক মপার্ভঁকে ডাকিয়া কতকগুলা নামের তালিকা দিলেন, ইহাদিগের সহিত

তিনি একবার শেষ দেখা করিতে চাহেন। তখনই তাঁহাদের কাছে লোক ছুটিল। তারপর জেঙ্কিন্সকে তিনি কহিলেন, "কালকের দিনটা বেঁচে থাকব কি না, বলতে পার, ডাক্তার? একটু যেন বল পাচ্ছি। কিন্তু এ বলটুকু কতক্ষণের জন্য?"

লুই একবার অগ্রসর হইয়া কহিল, "ডচেস্ একবার আসতে চান—তিনি বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন।"

ডিউক কহিলেন, "দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা করতে বল। এ-দিককার কাজ-গুলো একবার গুছিয়ে নি, আগে—" তারপর ডিউক বলিলেন, "মপার্ভ, ঐ ডয়ারটা খোল। ওতে যত চিঠি-পত্র আছে, সব বার করে আমার সামনে পুড়িয়ে ফেলো। না, ওখানে হবে না—অনেক চিঠি। বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলো; তুমি হাজির থেকো, দেখো, সমস্তগুলো যেন ঠিক পোড়ানো হয়—"

জেঙ্কিন্স দুই পা আগাইয়া আসিয়া কহিল, "চলুন, আমিও নয় সাহায্য করছি। চট্‌পট্ হয়ে যাবে'খন।"

ডয়ার খুলিয়া চিঠির একটা প্রকাণ্ড তাড়া লইয়া মপার্ভ ও জেঙ্কিন্স বাহিরে আসিল। রঙ বেরঙের খামে মোড়া অসংখ্য চিঠি! এখনও মধুর পুষ্প-সুরভি তাহাদের অঙ্গে মাখানো রহিয়াছে—সবগুলাই প্রেম-পত্র! কোনটাতে কোন সাহসিকা আপনার প্রাণের ব্যাকুল নিবেদন ঢালিয়া দিয়াছে, কোনটা-বা উপেক্ষিতা অভিমানিনীর মৃদু ভর্ৎসনার সুরে ভরা! জেঙ্কিন্স চিঠি বাছিতেছিল—এবং মপার্ভ আগুনে ধরিয়া তাহার সৎকার করিতেছিল। সেই অবসরে ঈষৎ সতর্কভাবে দুই-চারিখানা চিঠির উপর চোখ বুলাইয়া লইতে জেঙ্কিন্স ভুলিয়া যায় নাই। যেন পুষ্প-সুরভির মধ্যে ভাষার কি স্নিগ্ধ সুর ভাসিয়া উঠিয়াছে! যেন এ গোলাপ-কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া বিচিত্র পাখীর দল করুণ কাকলী তুলিয়াছে! হঠাৎ দুই খানা চিঠি হাতে করিয়া জেঙ্কিন্স চমকিয়া উঠিল। বড় পরিচিত হস্তাক্ষর! মপার্ভের পানে মৃদু কটাক্ষপাত করিয়া তাহার অলক্ষ্যে চিঠি দুইখানা সে পড়িতে আরম্ভ করিল। মপার্ভের সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। মপার্ভ কহিল, "ওহে ডাক্তার, তুমি যদি এমন করে সব চিঠি পড়তে বসো, তাহলে এক মাসেও চিঠি পোড়ানো শেষ হবে না।"

জেঙ্কিন্সের গাল দুইটা লাল হইয়া উঠিল। চিঠি দুইখানা আগাগোড়া পড়িয়া লইবার উৎকট বাসনা তাহার মনের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। তবু মপার্ভের এ কথার পর আর তাহা পড়া ভাল দেখায় না! মপার্ভের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে! না জানি, জেঙ্কিন্স কোন্ হারামণির সন্ধান করিতেছে! সে তখন সে চিঠি দুইখানা একধারে ঠেলিয়া রাখিয়া আবার অন্য চিঠি বাছিয়া মপার্ভের হাতে আগাইয়া দিতে লাগিল। মপার্ভ সেগুলা আগুনে ধরিতে লাগিল—দাউ দাউ করিয়া চিঠির গোছা পুড়িতে-ছিল। তাহার সহিত কত প্রাণের কত গোপন কথা, কত মর্ম্ম-ব্যাকুলতা, প্রেমের কত মান, কত অভিমান, বিরহের কত বেদনা,—কত পাপ, কত অভিসার, সব আজ আগুনে পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল।

জেঙ্কিন্স হঠাৎ একটা চিঠি হাতে লইয়া কহিল, "এটা ত ভালবাসার ব্যাপার নয়। এই যে কি লেখা—প্রিয় ডিউক, আমি ত ডুবিতে বসিয়াছি। দেনার দায়ে বুঝি সব যায়। মান-সম্ভ্রম ধুলায় লুটায়। তুমি যদি—"

মপার্ভ কান খাড়া করিয়া শুনিল, সহসা সবলে চিঠিখান ডাক্তারের হাত হইতে টানিয়া লইয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল। এ যে তাহারই লেখা! ডিউকের অসতর্কতায় সেখানাও এগুলার সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে! চিঠিখানা আগাগোড়া পড়িবার ইচ্ছায় সেখানা হাতে লইয়া সে জানালার ধারে আসিল, আসিবার সময় ডাক্তারের পানে একটা তীব্র দৃষ্টি সে হানিয়া আসিল।

জেঙ্কিন্সও এমনই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই অবসরে সে চিঠি দুইখানা ক্ষিপ্র সে আপনার পকেটের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। এমন সময় হঠাৎ লুইয়ের স্বর শুনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডিউকের তীব্র ভর্ৎসনার সুর—"নে, নে, বাপু, যা পারিস্ নে—মোদ্দা, শব্দ করিস্‌নে! আমায় একটু ঘুমোতে দে।"

মপার্ভ ও জেঙ্কিন্স তাড়াতাড়ি ছুটিয়া ডিউকের ঘরে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখে, ডিউকের ডয়ার খোলা—কতকগুলা মুদ্রা ছড়ানো রহিয়াছে—এবং সম্মুখে দাঁড়াইয়া লুই, তাহার মুঠি মুদ্রায় ভরা! ডিউককে নিদ্রালু দেখিয়া সে টাকা সরাইতে সুরু করিয়াছিল, ডিউক তাহা দেখিয়া ফেলিয়াছেন!

সে রাত্রিটা ডিউকের আচ্ছন্নভাবেই কাটিল। একটু তন্দ্রা আসে, আবার তখনই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। ডাক্তারের ঔষধে রোগ সারিবার এতটুকু সম্ভাবনা নাই। তবুও ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়ানো চলিতে লাগিল—মরণ-পথে ডিউক যাত্রা ত করিয়াছেনই—যতটা তবু তাঁহার যাতনার লাঘব করা যায়!

তারপর বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ঘুম ভাঙ্গিলে মপার্ভ, কার্দ্দিলাক ও আরও দুই-চারিটা নিতান্ত পরিচিত মুখ দেখিয়া ডিউক মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহরে লোকে সব কি বলে?"

সহরে অনেক কথারই আলোচনা চলিতেছিল। তবে তাঁহার কথাটাই লোকের মুখে বেশী করিয়া ফিরিতেছিল। ডিউকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—বুঝি আর বাঁচেন না, এইটাই ছিল, সব-চেয়ে উত্তেজক সংবাদ! আর নবাব! ডিউকের মৃত্যু,—তাহার অর্থ, তাঁহার সর্ব্বনাশ, ধ্বংশ, তাঁহারও মৃত্যু! নবাব এ সংবাদ শুনিয়া বাহিরে কোন কাতরতা দেখাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইল, বুক যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁহার শূন্য মনে হইতেছিল। যেন দারিদ্র্য, ধ্বংশ তাহাদের বিকট মূর্ত্তি লইয়া নবাবের চোখের সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্য লাগাইয়া দিয়াছে!

ডিউক আজ আপনাকে একটু সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। নানা লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছিল—ডিউক তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে একবার শেষ দেখা!

একে একে সকলে দেখা করিয়া চলিয়া গেলে ক্রমে জাঁম্বুলের পালা আসিল। ডিউক তখন কেমন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন —চোখ তাঁহার মুদিয়া আসিল। জাঁম্বুলে ঘরে ঢুকিতে জেঙ্কিন্স কহিল, "আঃ, কি লোক! কারুকে এ শেষ মুহূর্ত্তে ভোলেন নি! এইমাত্র আপনারই কথা কচ্ছিলেন। এখন একটু ঝিমিয়ে পড়লেন।"

"আমার কথা বলছিলেন?" নবাবের স্বরে কি সে কৃতজ্ঞতার সুর মিশানো ছিল! জেঙ্কিন্স কহিল, "হাঁ, আপনার নির্ব্বাচনের কি হল, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন।"

জাঁম্বুলে কৃতজ্ঞতায় শির নত করিলেন। এমন সময়ে, মৃত্যু-লোকের দ্বারে দাঁড়াইয়াও ডিউক তাঁহার কথা ভুলেন নাই। হায়, তাঁহারই ভাগ্যদোষে আজ এত বড় বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিতে বসিয়াছে।

ডিউকের সহিত দেখা করিতে আসিয়া জাঁম্বুলের একটা কথা কহিবারও সুযোগ মিলিল না—ইহাও কি অল্প দুর্ভাগ্য!

নবাব সে ঘরে আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। মহত্ত্বের এমন ধ্বংশ চোখে দেখা যায় না! হৃদয়-হীন পারির মধ্যে একমাত্র যিনি হৃদয়-বান, তাঁহার এ যাতনা দেখিলে পাষাণও বুঝি ফাটিয়া যায়, নবাব ত মানুষ! নবাব ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন। সিঁড়ির কাছে ভৃত্যের দল নানা কথা কহিতেছিল। কেহ বলিল, "ঢের টাকা পেয়ে গেছি। আর আমি চাকরি করছি না।" আর একজন কহিল, "আমি ডচেসের কাছে থাকব।"

নবাব সে কথা কানে না তুলিয়াই হল-ঘরে দর্শক ও বন্ধুবর্গের জন্য যে খাতা ছিল, তাহাতে নিজের নাম লিখিলেন। লিখিয়াই তাঁহার নজর পড়িল, ঠিক পূর্ব্বেকার নামটির উপর—এ কি—এ যে হেমারলিঙ্! তাহার চির-শত্রু হেমারলিঙ! নবাব শিহরিয়া উঠিলেন—অদৃষ্টের কি ক্রূর পরিহাস, এ! তাঁহার নামের উপরই হেমারলিঙের নাম? সে যেন বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে!

নবাব আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এখন তিনি কোথায় যাইবেন! ক্লাবে? বাড়ীতে? না। নবাব হোটেলের অভিমুখে চলিলেন। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল।

হোটেলে লোকের মুখে আর অন্য কথা নাই; কেবলই ডিউকের কথা! ভোজনে বসিয়া একটা কথা ডিউকের কানে গেল—কে বলিতেছিল, "আশা আছে বৈ কি! এর চেয়ে বড় বড় রোগ লোকের সারছে—এ'ত কি! চিকিৎসার অত ধুম!"

নবাবের প্রাণখানা আশার উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। আহার অসমাপ্ত রাখিয়াই বিলের টাকা সম্পূর্ণ চুকাইয়া দিয়া আবার তিনি ডিউকের প্রাসাদের অভিমুখে গাড়ী হাঁকাইবার আদেশ দিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ডিউকের প্রাসাদ উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করিতেছে! সে যেন আশারই হর্ষোজ্জ্বল হাসির দীপ্তি! ভৃত্য-পরিজন এধারে ওধারে নিত্যকার মতই চলা-ফেরা করিতেছে। দেখিলে মনে হয় না, এ গৃহে কোন ভীষণ মর্ম্ম-ঘাতী নাটকের অভিনয় চলিতে পারে!

নবাবের বিষণ্ণ চিত্তে আশার আনন্দ-কিরণ ফুটিয়া উঠিল। গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই চেয়ারে বসিয়া মপাভ এবং আরও কয়-জন লোক—আচার্য্যও বসিয়া রহিয়াছেন যে! তবে কি—তবে—!

নবাব বিস্ফারিত নেত্রে সকলের পানে চাহিয়া দেখিলেন। মপাভঁ কহিল, "ঠিক থাপ খাবে কি না, এই হচ্ছে কথা! ভাবুন, মোরার যে-সবে বিশ্বাস ছিল—অর্থাৎ বুঝলেন কি না—তাঁর মত লোকের যোগ্য আয়োজন—"

জাঁসুলের বুকটা ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল। তাহা হইলে সব শেষ! মপাভঁ কহিল, "এই যে নবাব বাহাদুর। আমাদের এখনই সকলকে খপর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। দেরী করা ঠিক হবে না। কাল সকালেই কবরের ব্যবস্থা হয়েছে। ডিউকের ইচ্ছাও তাই ছিল। ডিউকের যোগ্য আড়ম্বর-সমারোহ চাই—সেই কথাই হচ্ছে! কত গাড়ী, কত লোকজন সঙ্গে যাবে—"

নবাবের কানে আর কোন কথাই প্রবেশ করিল না। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার চোখের সম্মুখে একটা নীল গোলকখণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া গেল। নবাব মাথায় হাত দিয়া নিকটস্থ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ভিতর হইতে একটা তীব্র দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলিয়া বাহির হইল—সে নিশ্বাসের শব্দে মপাভঁর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল—তাহার মনে হইল, নবাবের প্রাণবায়ুটুকুও যেন সে নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে! নবাব মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

চয়ন

নাট্যকার ব্রাঁয়ো

অধুনিক ফরাসী মনীষিদিগের মধ্যে নাট্যকার ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌ ইউজিন ব্রাঁয়োর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি Ibsen, Heyenmans, Echegaray, Shaw এবং Galesworthyর ন্যায় বাস্তবদর্শী। ইনি একাধারে ডাক্তার, জননায়ক এবং উপদেষ্টা। ইনি সমাজদেহের ব্যাধি আবিষ্কার ও তাহার প্রতিকার-সাধনে সর্ব্বদাই যত্নশীল বটে—কিন্তু উহা লইয়া তিনি কখনও নীচ বিদ্রূপ বা যা-খুসি-তাই করেন নাই।

ব্রাঁয়োর রচনায় ইবসেনের রচনা অপেক্ষা অধিক হাস্য-রসিকতা এবং বার্ণার্ড শ'র অপেক্ষা অধিক কোমলতা আছে। Hauptmannএর তুলনায় কবিত্বে তিনি নিকৃষ্ট বটে,—কিন্তু দৈনন্দিন জীবন-চিত্রনে তাঁহার শক্তি অধিক।

Adolphe Brisson সম্প্রতি ইহাঁর

সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"জগতের ব্যাধি ও দুষ্কার্য্য প্রভৃতির ভিতরে ইনি মিশিয়াছেন বটে—কিন্তু নিজে তাহাতে মিশ্রিত হইয়া পড়েন নাই। শরীর ও মনের স্বাস্থ্য ইহাঁর রচনায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।"

ব্রাঁয়ো প্রায় ২০ খানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম নাটক Blanchette প্রায় বাইশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। শক্তিমান্ নাটককার বলিয়া এখন তাঁহার খ্যাতি ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লরেন্স আরভিং ইহার "Three Daughters of M. Dupont" নাটক অভিনয় করাইয়াছেন। ইহাঁর রচিত করুণরসাত্মক উৎকৃষ্ট নাটক 'Les Avaries' বার্নার্ড শ' কর্তৃক অনূদিত হইয়া 'Damaged Good' নামে অভিনীত হইয়াছে।

এই ধরণের নাটকে ব্রাঁয়ো সমাজ-ব্যাধি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন;—উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়াই তিনি ইহা করিয়াছেন—যাহাতে রোগের প্রতিকার হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা।

নারীজাতির উপর ব্রাঁয়োর সমধিক সদাশয়তা দেখা যায়। পুরুষের দুর্ব্যবহার ও স্বার্থপরতার জন্য নারীর কষ্ট দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া, যাহাতে এই অত্যাচারের উপশম হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই যত্নশীল। তাঁহার আধুনিক নাটক 'La Femme Seule' পারির 'Theatre Du Gymnase'এ অভিনীত হইয়াছে। ইহাতে আধুনিক নারীদের মধ্যে যাহারা স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাহাদের দৈনন্দিন কষ্ট ও যাতনা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনা এইরূপ:—

নাটকের নায়িকা আর্সির বয়স তেইশ বৎসর। সে সুন্দরী, সুচতুরা ও উচ্চশিক্ষিতা; তাহার অবস্থাও স্বচ্ছল। রেনী নামক যুবকের সে বাক্‌দত্তা! যুবক আর্সিকে খুব ভালবাসিত—আর্সিও যুবককে ভালবাসিত। আর্সির বাপ-মা ছিল না বলিয়া সে তাহার ধর্ম্মপিতার সহিত বাস করিত।

হঠাৎ এই সৌভাগ্য হইতে আর্সি দারিদ্র্যে পতিত হইল—ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতেই তাহার এই দুর্দ্দশা। কন্যা দরিদ্র বলিয়া রেনীর পিতামাতা সন্তানের এ বিবাহে আপত্তি করিলেন। যৌতুকহীনা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া কি লাভ? রেনী নিজেও উপার্জ্জনক্ষম নহে—বিবাহ করিয়া কোথা হইতে সে খরচ চালাইবে?—শুধু ভালবাসিয়া তো আর পেটের ক্ষুধা মিটিবে না!

আর্সির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—সে উপার্জ্জনে সক্ষম, নিজের জীবিকা স্বচ্ছন্দেই সে সংগ্রহ করিতে পারিবে। তাহার আশ্রয়দাতারা নিজেদের পল্লী-ভবনে উঠিয়া গেলেন। আর্সি তাহাদের ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে অস্বীকার করিল। সে স্থির করিল, পারিতে থাকিয়াই তাহার জীবিকা সংগ্রহ করিবে। যে দৃশ্যে সে আশ্রয়দাতার নিকট এই সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া বলিতেছে—নাটকের সে দৃশ্যটি অতি সুন্দর।

আত্মবিশ্বাস ও উচ্চ সঙ্কল্পে হৃদয় তাহার পূর্ণ—সাহিত্য ও ইতিহাসের জ্ঞান তাহার প্রচুর। তাহার ইচ্ছা, সে তাহার বন্ধুর পরিচালিত "La Femme Libre" পত্রিকার

একজন নিয়মিত লেখক হয়। কারণ, পত্রিকার সম্পাদক তাহার পূর্ব্ব প্রবন্ধগুলির যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

কিন্তু আর্সি ক্রমে দেখিল, সম্পাদকেরা সখের লেখকদের প্রতি এবং অর্থপ্রয়াসী লেখকদের প্রতি একরূপ ব্যবহার করেন না। আরও দেখিল, সম্পাদকের চক্ষু কি নির্ম্মমভাবেই অন্যের হৃদয়ের আঁচড়গুলিকে পরখ্ করিয়া থাকে! যা হোক, কোনরূপে দিন চলে এমনি সামান্য একটি কাজ সে জোগাড় করিয়া লইল।

ব্রাঁয়োর সজীব রসিকতা, আর্সি'র সহকর্ম্মীদের চরিত্র-চিত্রনে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। Mlle Mewicrtর চরিত্রে মহত্ত্বের ধারা নিপুণভাবে দেখানো হইয়াছে।

ক্যারোলাইন লিগ্রাণ্ড একজন সাফ্রাজিট্ রমণী;—পুরুষকে তিনি ভয়ানক ঘৃণা করেন। কিন্তু তিনি তাহাদের পরিচ্ছদ, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অত্যন্ত প্রিয় চক্ষে দেখেন। এটা লইয়া হাসির ফোয়ারা ছোটানো এবং তিলকে তাল বানানো নাট্যকারের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু ইহাদের অতিবাদ ও দুর্দ্ধর্ষতার মধ্যে চরিত্রকে সহানুভূতি-সিক্ত করিয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন। দু'এক লাইনে ক্যারোলাইনের পুরুষ-বিদ্বেষ কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

"আর্সি—ক্যারোলাইন লিগ্রাণ্ড!—খুব একটা ভাল খবর আছে—শুনলে তুমি ভারী খুসী হবে।

ক্যারোলাইন।—কি, সব পুরুষগুলো একেবারে নির্ঝাড় হয়ে মরে গেছে নাকি ?"

আর্সি যে সংবাদপত্রের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে ভাল ভাল লেখা থাকা সত্ত্বেও কাগজখানি সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছিল না। পরিচালকগণ ব্যয়-সংক্ষেপের জন্য কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

আর্সি কর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প করিল; কারণ এ বেতনে যেমন-তেমন ভাবেও তার পেট চলিবে না। তাহার সংকল্পের কথা শুনিয়া সম্পাদক আর্সি'র প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া তাহাকে পূর্ব্ববেতনে রাখাই মঞ্জুর করিলেন।

তাহার প্রতি এই অনুগ্রহে আর্সি মোটেই সন্তুষ্ট হইল না। সকলকে বঞ্চিত করিয়া তাহার প্রতি এ অনুগ্রহ কেন? এইখানে নাটকীয় ঘটনা সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, আর্সি বেশ ভাল কাজ পাইয়াছে। রেনীও এখন কাজের জোগাড় করিয়াছে। কিন্তু আর্সি'র দুর্ভাগ্য তখনও শেষ হয় নাই। শ্রমজীবী সম্প্রদায় সহসা নারীজাতির উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করিল,—নারীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হইবে।

শেষ অঙ্কে নাটকীয় ঘটনার বিকাশ অল্পই হইয়াছে। কিন্তু কথোপকথনে ব্রাঁয়ো তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন। পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নারী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে—পুরুষের তাহা সহ্য হইবে কেন? নাট্যকার এই সমস্যা-সমাধানের সুন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন।

আর্সি কার্য্য ত্যাগ করিয়া পারিতে রেনীর সঙ্গে যোগ দিতে গেল। তাহার

শেষ কথায় নাট্যকারের নিজেরই মত বিবৃত হইয়াছে:—নরনারীর এই যুদ্ধে পুরুষেরই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; কারণ পুরুষের চেয়ে নারী অল্পেই তুষ্ট, পুরুষের মত বাজে খরচ তাহাদের নাই—অতিরিক্ত বেতন পাইয়া মদের দোকানে শুঁড়ির পেট মোটা করিবার আগ্রহও তাহাদের নাই। নগরের যুবক-সম্প্রদায় যাহারা বিনা পণে বিবাহে নারাজ, তাহারা পরে এজন্য অনুতপ্ত হইবে; কারণ তাহারাই নারী-জাতিকে সংসারের কষ্টে চালিত করিয়াছে।

যে সকল পুরুষ মদের খোরাক যোগাইতে যোগাইতে এবং নিজেদের বাজে বাজে বিবাহের সামর্থ্য হারাইতেছে, তাহাদের হইয়া নারীদেরও জীবিকার সংগ্রহ করিতে হইবে; কল-কারখানা, দোকান, অফিস সর্ব্বস্থলেই তাহাদের কর্ম্ম-চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পুরুষ তাহাদিগকে গৃহিণী করিবে না। অতএব, নারীরাও শ্রমজীবী হইবে। এ স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যম্ভাবী।

এই নাটকে আর্সি ও রেনীর ভূমিকাই প্রধান বিষয় নহে—নারী ও শ্রমজীবী-সমস্যা এই নাটকের মূল ভিত্তি। এই নাটকের ঘটনা-প্রবাহ—বাস্তব জীবনে দুষ্প্রাপ্য নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

হুগোর প্রণয়-কাহিনী

অমর কবি ভিক্টর হুগোর সহিত জুলিয়েত দ্রউতের প্রেমের কাহিনী সাহিত্য-রসিকের কাছে পরিচিত। সংপ্রতি জুলিয়েত দ্রউতের লেখা কয়খানি প্রেম-পত্র বাহির হইয়া সেই প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে আরও গুটিকয়েক নূতন পরিচ্ছেদ জুড়িয়া দিয়াছে।

১৮২৯ ও ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আঁকা, ভিক্টর হুগোর দুখানি তৈল-চিত্র আছে। ঐ ছবি দুখানি দেখিলে, হুগোর চেহারা তিনটি-মাত্র বছরের ভিতরে বদলাইয়া কি-রকম খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কারণ,—তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাসঘাতকতা। চিত্ত-বেদনায় অস্থির এবং প্রেম ও বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া ভিক্টর হুগো এই সময়ের একখানি চিঠিতে লিখিয়া ছিলেন:—"আমি আমার মনের আবেগেই বেঁচে আছি। সুখে-দুঃখে, প্রকাশ্যে-নিভৃতে আমার জীবনের আসল কামনা হচ্ছে, ভালবাসা।.........যাকে আমি আমার সমস্ত প্রেম সমর্পণ করেছি, সে যে আমার দিকে ফিরে না-তাকালেও না-তাকাতে পারে, এটা আমি এতদিনে খুব-সম্ভব বলে বুঝতে পেরেচি।"

হুগোর স্ত্রী দেখিতে পরমা সুন্দরী হইলেও তাঁহার কোনরূপ রুচি বা সজ্জা-নৈপুণ্য ছিল না। তিনি তাঁহার প্রতিভাবান স্বামীর মরমের মরমী বা দরদের দরদী ছিলেন

না। "যুগল আত্মায় অনুরাগের যে বিমল মিলন মর্ত্ত্যে আরম্ভ হয়, স্বর্গেও তাহার অবসান নাই।"—এই যে প্রেমের একটা মহৎ আদর্শ হুগো তাঁহার প্রাণের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে আদর্শ হইতে তাঁহার স্ত্রী দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন শুধু টাকা—চাহিতেন শুধু টাকা! হুগোর স্ত্রী, কবির এক বন্ধুর সঙ্গে এক-যোট হইয়া তাঁহার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকের ব্যবহার করিয়াছিলেন, কবি তাহা ঘৃণা-ভরে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। এইসকল নানা কারণে হুগো শেষে বাধ্য হইয়া অপর রমণীর আলিঙ্গনের মধ্যে তাঁহার চিরকাম্য প্রেমকে খুঁজিতে লাগিলেন। প্রাণে চিতার আগুন জ্বালিয়া কোন্ কবি নিয়তির অন্ধকার কারাগারে কয়েদী হইয়া থাকিতে পারেন?



ভিক্টর হুগো
(১৮২৯)

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে, এক নৃত্য-অভিনয়ে হুগোর সঙ্গে জুলিয়েত দ্রউতের প্রথম দেখা। জুলি-য়েতের রূপের শিখা ছিল এমনি উজ্জ্বল ও প্রখর, যে হুগো তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ভরসা পাইলেন না। ছয়মাস পরে হুগো আবার অভিনেত্রী-রূপে জুলি-য়েতের দর্শন লাভ করি-লেন। হুগোর একজন চেনা লোক তাঁহাকে পরা-মর্শ দিলেন যে, তাঁহার নাটক Lucrice Borgia হইতে জুলিয়েতকে একটি ভূমিকা দেওয়া হউক। হুগোর পক্ষে এই

পরামর্শ 'পেটুককে ভাত খাইতে বলা'র মত দাঁড়াইল। তিনি তখনি স্বীকার পাইয়া জুলিয়েতকে একটি ছোট ভূমিকা দিলেন।

এই পরিচয়ের সুত্রপাত হইতে তাঁহারা দুইজনে যে সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধা পড়িলেন, পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও সে বাঁধন ঢিলা হয় নাই। জুলিয়েতের মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত হুগো সমস্ত ভুলিয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসিয়া ছিলেন, জুলিয়েত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ভাবনা তিনি ভাবিতেন না। জগতের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে এমন অমর-অক্ষয় প্রেমের স্বপ্ন, আর কাহারো জীবনে বোধ করি, সফল হইবার অবকাশ পায় নাই—ইহা মধুর, অপূর্ব্ব, অতুলনীয়

পরিচয়ের প্রথমেই জুলিয়েত কবির কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, "আমি জানি, শুধু তোমাকেই ভালবাস্‌তে; তা-ছাড়া আর সবদিকে আমি একেবারে অপদার্থ!"

রুই সেণ্ট ডেনিসে ছিল জুলিয়েতের বাস। তাঁহার বাড়ী হইতে ফিরিবার মুখে, গলির মোড়ে আসিয়া হুগো থমকিয়া পিছনপানে চাহিতেন; জুলিয়েতও তখন জানালার কাছে আসিয়া কবির দিকে পলকহীন নেত্রে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। চারি চোখ এক হইবামাত্র, দুজনে দুজনকে ইঙ্গিতে চুম্বনের পর চুম্বন বিনিময় করিতেন। পরে, কবিকে যখন আর দেখা যাইত না, জুলিয়েত তখন বিশ্বমাঝে আপনাকে একাকী—বড়ই একাকী—মনে করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেন এবং নিদ্রাচর যেমন স্বপ্নে ঘুরিয়া বেড়ায়, স্বপ্নে কথা কয়, তাঁহারও বোধ হইত, তিনিও যেন ঠিক তেমনি স্বপ্নচালিতের মত স্বপ্ন-জগতে বাস করিতেছেন! তাঁহার চারিদিকে তখন যেন এক সীমাহীন শূন্যতা হা-হা করিতে থাকিত এবং তাঁহার হৃদয়ে একটিমাত্র কামনা বারবার জাগিয়া উঠিত; সে কামনা—কবিকে আবার দেখিবার কামনা—অবিচ্ছেদ মিলনের একান্ত বাসনা! এই দুঃসহ শূন্যতা হইতে নিস্তার পাইয়া চিত্তবিনোদ করিবার জন্য, জুলিয়েত



জুলিয়েত দ্রউতে

অবশেষে কবির সহিত নিয়মিত পত্র-ব্যবহারে ব্রতী হইলেন।

তাঁহার নিজের বাড়ী হইতে, তাঁহার কোন বন্ধুর বাড়ী হইতে, রঙ্গালয় হইতে, হোটেল হইতে—জুলিয়েত যখন যেখানে থাকিতেন, তখন সেইখান হইতেই তাঁহার প্রিয়তমকে তিনি পত্র লিখিতেন। তাঁহার পত্রের উপাদানও ছিল বিচিত্র! যে-রকমেরই হৌক না কেন, একটুক্‌রা কাগজ হইলেই তাঁহার চিঠি লেখার কাজ চলিয়া যাইত; অনেক সময়ে আর কিছু না পাইয়া একখানা খামের উপরে বা খবরের কাগজের সাদা অংশে দু-চারটি কথা লিখিয়া পাঠাইতেন। কলম বা পেন্সিল না পাইলেও তাঁহার পত্র-রচনার ঝোঁক্ একটুও দমিয়া যাইত না,—একটি কৃষ্ণবর্ণরঞ্জিত 'পিনে'র সাহায্যেই তিনি মনের কথা কাগজে ফুটাইয়া তুলিতেন। প্রেম ও প্রতিভা,—দুই উদ্দাম। তাহারা কোনই মানা মানে না।

পত্রের ভাষার প্রতি জুলিয়েত বড় একটা নজর দিতেন না। ভাব জাহির করিবার জন্য ভালবাসা কি কখনও অভিধান খুঁজিয়া মরে? প্রাণে যখন আবেগ-সায়র দোদুল দুলিয়া উঠে, কোন্ রমণী তখন ব্যাকরণ লইয়া মাথা ঘামাইতে বসে? জুলিয়েত নিজেই বলিয়াছেন, তিনি এ-সব ঝঞ্ঝাটের ধার ধারিতেন না বলিয়াই তাঁহার প্রথম জীবনের প্রেমপত্রগুলি এতটা মনোরম হইবার অবকাশ পাইয়াছে। তাহারা সহজ সরল প্রেমের সুরভি-সঙ্কোচে ভরা।

আমরা এখানে জুলিয়েতের নব-প্রকাশিত অসংখ্য প্রেমপত্রের ভিতর হইতে দু-চারখানি বাছিয়া দিলাম।

১

রবিবার। রাত সাড়ে আটটা। (১৮৩৩)

ওগো আমার ক্ষুদে পাগল,

তোমার লেখা নকল বা তার কথা শুণবার আগে (জুলিয়েট মাঝে মাঝে কবির সেক্রেটারির কাজ করিতেন) আমি এক লাইন প্রেমের কথা লিখ্‌ব। আমি তোমাকে ভালবাসি—বুঝ্‌চ প্রিয়তম!—আমি তোমাকে ভালবাসি! ভালবাসা হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যবসা, আমার সকল নির্ম্মলতা ও কর্ত্তব্য নিয়েই তার কারবার! আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমার বিশ্বস্ত সখি, আমি শুধু তোমাকে দেখি, শুধু তোমার কথা ভাবি, শুধু তোমাকেই কথা বলি, শুধু তোমাকেই স্পর্শ করি, শুধু তোমাকেই স্বপনে দেখি, আমার নিশ্বাসে তুমি, আমার কামনায় তুমি,—এক কথায়, আমি তোমাকে ভালবাসি! এই এক কথায় সব কথা আছে।

অতএব, আর বেদনার টানে টলে পড়ো না। তুমি আপনাকে ভালবাসতে দাও, সুখী হতে দাও। আমাকে ভয় করো না, আমাকে কখনো সন্দেহ করো না,—দেখবে, আমরা এমন নন্দনানন্দে নন্দিত হব, 'বাক্যে যা কখন না যায়'।

তুমি শীঘ্র আস্‌বে বলে আমি তোমার আশা-পথ চেয়ে বসে আছি। বোধ হয়, আমার যত্নের উত্তাপে ও কোমলতায় তুমি উল্লসিত হয়ে উঠ্‌তে পারবে।

তোমার 'জুজু' (১৮৩৩)

২

"তুমি চলে যাবার পর থেকে আমি বুকের মধ্যে যেন মৃত্যুকে পুষে রেখেচি। আজ রাতে তুমি যদি বল-নাচে যোগ দাও, তাহলে আমাদের মাঝে নিশ্চিত বিচ্ছেদ হবে বলে জেনো। তুমি যদি একদল মনভুলানো সুন্দরী রমণীর সঙ্গে ঘুরে-ফিরে বেড়াও, তা হলে আমার উপরে অন্যায় করা হয়; এটা ভাবলেই আমি কষ্ট পাই। আমার ঠিকানা "কেয়ার-অফ মাদামকে ০০"। চিঠি লিখো। মাঝরাতের আগে তোমার চিঠি না পেলে বুঝব, তুমি আমাকে 'থোড়াই কেয়ার' কর··· আরো বুঝবো, তোমার আমার মধ্যে সকল সম্বন্ধ ঘুচে গেল··· ····· হাঁ, চিরকালের মত।—জে।"

৩

বেলা দুইটা (১৮৩৩)

আমার ভিক্টর,

আমি তোমাকে সত্যই ভালবাসি এবং আমার কাছে তোমার চেয়ে ভক্তির পাত্র অন্য কোন ব্যক্তির কথা কল্পনাতেও আসে না।

আমি তোমাকে একজন বিশ্বাসী, নির্ভরযোগ্য বন্ধুর মত দেখি। এত নম্র ও এমন মাননীয়, আমি আর কোন লোককে জানি না।

আমার অতীত জীবন যে তোমার বিশ্বাসকে আহত করেছে, এ অনুভব করে আমি আঘাত পেয়েছি। তোমাকে জানবার আগে আমি যা করেছি, সেজন্যে আমি একটুও লজ্জিত নই; সে কথাকে আমি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বল্‌তে বা লুকোতেও চাই না। কিন্তু, যেদিন থেকে আমি তোমাকে জেনেছি, সেদিন থেকেই আমার মনের গতি সব দিকেই বদ্‌লে গেছে। আমার প্রেম যে অতীতের দাগকে মুছতে অক্ষম, এ কথা ভেবে আমি লজ্জা-ভয়ে গুম্‌রে মরি। কিন্তু আমার ভয় তখনি বেশী হ'য়ে ওঠে, যখন তুমি আমাকে অন্যায় সন্দেহ কর।

আমার ভিক্টর, তোমার প্রেম আমাকে পবিত্র করবে, আমার মাঝে একদিন যাহা সৎ ও শুদ্ধ ছিল, তোমার ভালবাসা আবার তাকে নূতন তেজ দেবে।

আমি এমন একান্তভাবে তোমাকে প্রাণ সঁপেছি যে, যা বল্‌লুম তা সব সম্ভব হতে পারে। যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর, তবে আমি তোমার যোগ্য হব।

বিদায়। তুমি আমার আত্মা, আমার প্রাণ, আমার ধর্ম্ম। আমি তোমাকে ভালবাসি।

জুলিয়েত।"

—Vanity Fair and Hearth & Home হইতে

রুশ-প্রতিভার নব-পরিচয়

বিশ্বসাহিত্যে রুশ-প্রতিভার প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। জগতে মানুষের জীবন-যাত্রার ভিতরে রুশ-সাহিত্য নূতন চিন্তা, নূতন কাম্য, নূতন প্রশ্ন জাগাইয়া

তুলিয়াছে। রুশিয়ার শক্তিধর ঔপন্যাসিকগণ আপনাদের সমাজের ভিতরের রূপটি এমন সুকৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, তাহা আর সংকীর্ণতার অন্ধকার কারাগারে বদ্ধ হইয়া নাই; পরন্তু, বিশ্বের সঙ্গে ছন্দ তাল ও লয় বজায় রাখিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহা ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুদূর বাঙ্গলার নিরীহ সন্তানেরাও রুশিয়ার রণপ্রিয় কসাক-যুবকের সরল সুখ-দুঃখের কথা পড়িয়া এবং অপরিচিত বিদেশী কৃষক পরিবারের নিরাশা ও নির্য্যাতন দেখিয়া চোখের জলে বুক না ভাসাইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু রুশ-সাহিত্যের পরিচয় কতটুকু আমরা রাখি? গোগোল, টুর্গেনিভ, ডোষ্টয়েভস্কি, টলষ্টয় ও ম্যাক্সিম গোর্কির পুস্তক লইয়া আমরা আলোচনা ও আন্দোলন করি বটে, কিন্তু প্রধানতঃ ইঁহাদের সাধনার মধ্যেই সমগ্র রুশ-সাহিত্য সীমাবদ্ধ নহে। আগে আমরা জানিতাম, টলষ্টয়ই রুশ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। পরে জানিলাম, টুর্গেনিভের ঔপন্যাসিক-প্রতিভা টলষ্টয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তারপর ম্যাক্সিম গোর্কি শ্রেষ্ঠত্বের মান্য লাভ করিয়াছেন। সংপ্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, রুশদেশে গোর্কির অপেক্ষা বড় লেখকেরও অভাব নাই। যেমন, লিওনিডাস আণ্ড্রিভ। বৈশাখের "ভারতীতে" তাঁহার জীবন ও রচনার যৎসামান্য পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

আজ আমরা আর একজন প্রতিভাবান রুশ-লেখকের পরিচয় দিব। তাঁহার নাম, ভাসিলি নেমিরোভিচ ডান্‌চেঙ্কো। সকল দিকেই তিনি এখনকার জীবিত রুশ লেখকদের মধ্যে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি। একাধারে তিনি ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, কবি, ঐতিহাসিক, ভ্রমণকারী, জীবনচরিতকার এবং যুদ্ধসংবাদদাতা। অথচ, এতদিন তাঁহার নাম আমরা একেবারেই জানিতাম না।

ডান্‌চেঙ্কোর জন্ম হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। ডাঘেষ্টান ও জর্জ্জিয়া নামক দুর্গরক্ষিত নগরদ্বয়ে তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তারপর, মস্কো নগরের "আলেকজান্দ্রভ্‌স্কি সামরিক বিদ্যালয়ে" তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কিন্তু সৈনিকজীবন অপেক্ষা সাহিত্য-জীবনের দিকেই তাঁহার প্রাণ অধিক আকৃষ্ট হইল। ফলে, কুড়ি বৎসর বয়সের ভিতরেই তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে 'জাত-লিখিয়ে', ঐ লেখাগুলি প্রকাশিত হইয়া তাহাই প্রমাণিত করিল।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রুশ-তুরুস্কে যুদ্ধ বাধিল। সেই ভীষণ সংগ্রামের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার বন্ধু স্কোবেলেফের সঙ্গে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ব্যক্তিগত সাহসের জন্য তিনি "Cross of St. George" নামক পদক পুরস্কার পান। রণক্ষেত্র হইতে তিনি স্বদেশে যে সকল পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে একেবারে বিখ্যাত করিয়া দিয়াছিল। "White General" নামক সে পুস্তকে তাঁহার যুদ্ধের পত্রগুলি বাহির হইয়াছিল, সে বইখানি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতে পারিয়াছিল। আজ তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মন এখনও যুবার মত কার্য্যক্ষম ও সবল। বার্দ্ধক্যের ভারে তিনি জড়ের মত বসিয়া নাই। বর্ত্তমান

পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্রে তিনি একখানি রুশ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছেন।

ডান্‌চেস্কো যদিও চল্লিশখানিরও বেশী সর্ব্বজনপ্রিয় উপন্যাস লিখিয়াছেন, তথাপি ছোটগল্পেই বোধ হয় তাঁহার হাত খেলিয়াছে ভাল। সামরিক ব্যাপারের সঙ্গে তাঁহার যতটা জানাশুনা ততটা খুব কম লোকেরই আছে। এই পরিপূর্ণ জ্ঞানের সহিত সাহিত্য-শক্তির সমাহার ঘটাতে তাঁহার যুদ্ধের গল্পগুলি বস্তুতন্ত্রতায়, একেবারে জীবন্তের মত নির্দ্দোষ হইয়া উঠিয়াছে।

—Strand Magazine হইতে

প্রতীচ্যের কুরুক্ষেত্রে এবং 'জার্ম্মাণ আর্ট'

এখনকার একটি প্রধান প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ললিত কলার লোক্‌সান, না লাভ হইবে? মিঃ উইলিয়ম ডি, হওয়েল্‌সের মত সুপণ্ডিত ও সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির মতে, বর্ত্তমান যুদ্ধ সাহিত্য-কলার গাঁথুনি একেবারে ভঙ্গুর করিয়া দিবে। কিন্তু, জার্ম্মান সমালোচক রবার্ট ওয়েষ্ট বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জার্ম্মানীতে ললিত কলার এখন যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে কালোয়াতের ওস্তাদী কস্‌রৎ থাকে নানা-রকম। বাস্তবকে এখানে খুব বাহাদুরির সহিত ঠিক্‌ঠাক ফলাইয়া তোলা হইয়াছে। একালের কলাবৎ শিক্ষাপটুতা দেখাইতে মজবুৎ হইলেও চিন্তা এবং কল্পনায় তিনি একান্ত দরিদ্র।

হয়ত' এই কারণেই এখন নিসর্গ-চিত্র ও জড়-চিত্রের ছড়াছড়ি যেমন বেশী, ঐতিহাসিক চিত্র প্রভৃতির পরিকল্পনা তেমনি কমিয়া যাইতেছে। আজকালকার শিল্পী লাগ-সৈ উপাদান আবিষ্কার ও তাহা পরিপুষ্ট করিবার শক্তি হইতে ক্রমেই বঞ্চিত হইতেছে। পরন্তু একালের সমালোচক, কলাবিদ এবং জনসাধারণ, ললিত কলার আলোচ্য বিষয়ে আর মনোযোগ দেয় না। চিত্রার্পিত বিষয়ে ভিতরের প্রাণটি ফুটাইতে না পারিলে সকলি যে বিফল, এ-সত্যও কেহ স্মরণ করে না। কেবল রেখাপাত, বর্ণরঞ্জন, তুলির লিখন, impressionism ও pointillism লইয়াই যে কলার কারবার নয়, এ কথাটাও কেহ খুলিয়া বলে না। ললিত কলার এই অবনতির সহিত বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আধুনিক কলায় ব্যক্তিগত কোন-কিছুর মূল্য বড় অল্প; একালের সমগ্র জীবন-ধারার ভিতরেও ব্যক্তিত্বকে খুব কম আমোল দেওয়া হইয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অমনোযোগ আর কখনও দেখা যায় নাই। মানব-জীবনের বাহিরের দিক লইয়া এত নাড়াচাড়া এবং সেই তুলনায় তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতি এত অবহেলা আর

কখনও হয় নাই। ইহার স্বাভাবিক ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, সাধারণ নর-ভাগ্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি আমরা সহমর্ম্মিতা হারাইয়াছি। এমন-কি, এ-কালের শিল্পী যখন কাহারও প্রতিমূর্ত্তি আঁকিতে বসেন, তখন তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি অতি সামান্য দৃষ্টি দেন।

প্রতীচ্য কুরুক্ষেত্রের আজিকার এই জীবন-যুদ্ধ, জার্ম্মান আত্মাকে ধার-করা কৃত্রিমতা হইতে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে। মিথ্যা সভ্যতার বিষাক্ত বীজ যুদ্ধের ঝড়ে উড়িয়া যাইবে। জার্ম্মান জাতির ভিতরে আজিও যে এই দৈব-প্রেরণার সামর্থ্য, এই আত্মত্যাগের সাহস, এই কর্ত্তব্যের জ্ঞান, এই নির্ভীকতা, এই বিশ্বস্ততা এবং পিতৃভূমির প্রতি এই ভালবাসা সুপ্ত ছিল, এ-কথা এতদিন স্বপ্নেও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই।

ফরাসীরা আমাদের ওস্তাদ। আমাদের শিল্পীরা ফ্রান্স হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিত। সে ভাল কথা। জার্ম্মান শিল্পের পক্ষে এই শিক্ষাকাল বাস্তবিক দরকারী ও উপকারী ছিল। কিন্তু সে কাল গিয়াছে। জার্ম্মান শিল্পের জন্য আর ফরাসী আদর্শের প্রয়োজন নাই।

ফরাসী শিক্ষার শাস্ত অনুসরণের ভিতরে আমাদের শিল্পধারা প্রায় বদ্ধ হইয়া যাইবার জো হইয়াছিল। কারণ, শিল্পে আমাদের হাত যখন পাকিয়াছিল, আমরা তখন নকল ছাড়িয়া নিজেদের আসল পথটি চিনিয়া লই নাই। সুমুখে পথের কোন চিহ্ন না পাওয়ার দরুণই কি আমাদের এই দশা ঘটিয়াছিল? জাগাইয়া দিবার সোনার কাঠি ছিল না বলিয়াই কি আমাদের প্রাণ সাড়া দিতে পারে নাই! ....আমাদের শিল্প ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ, দরিদ্র ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল।

এই সঙ্কীর্ণতা, দরিদ্রতা ও বিবর্ণতার মধ্যে সহসা সহস্র হৃদয়ে মহৎ ভাবের প্রবাহ গর্জ্জিয়া উঠিল। আমাদের ভিতরে জীবন ও মৃত্যুর গমনাগমন চলিতে লাগিল।...... —জার্ম্মান কবি এবং পটুয়ার জন্য অসংখ্য উপাদান সৃজিত হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমানের ইতিহাস, আমাদের ভবিষ্য শিল্পের সূচীপত্র হইবে। এখন আমাদের ঘরে কোন দামী যুদ্ধপট নাই। হয়ত' এইবারে আমরা একখানি ভাল ছবি আঁকিতে পারিব। ......হয়ত' যুদ্ধের, ফৌজের, ও সৈনিকের ছবি এইবারে আঁকা হইবে। নয়নমোহন সমরবেশ এবং সেনাদলের ছন্দ তাল ও লয়ের ভিতরে ললিত কলা এতদিন কোন কারণ খুঁজিয়া পায় নাই; হয়ত' এবারে তাহার সন্ধান পাইবে ...... সে সকল পটের ক্ষেত্রপৃষ্ঠ হইবে জ্বলন্ত গ্রামের পর গ্রাম, ধ্বংশ-ভগ্ন দুর্গের পর দুর্গ, পদদলিত শস্যক্ষেত্রের পর শস্যক্ষেত্র এবং হাসপাতালের করুণ দৃশ্য! দুঃখ ও তিক্ত অভাব এবং বিজয়োল্লাস অপেক্ষা গভীরতর আনন্দ, এক মহৎ ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত হইয়া যাইবে।

পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার অধিবাসীরা এখন অপূর্ব্ব বর্ব্বরতার মুখে পলায়ন করিতেছে এবং আমাদের পশ্চিম সীমান্তভাগে এখন রক্তের তুফান বহিয়া ফরাসী আক্রমণকে ব্যাহত

করিতেছে; আজ আমাদের পিতৃভূমিকে যেমন শ্রীমৎ দেখিতে হইয়াছে, এমন আর কখনও হয় নাই। ইহার ফলে জার্ম্মান জাতির ব্যক্তিত্ব আবার আমাদের সুমুখে শ্রী-ছাঁদে কমনীয় হইয়া উঠিবে।

The American Review of Reviews হইতে

যুদ্ধের পরে জীবন ও সাহিত্য

*

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস গার্ভিস বলিতেছেন, "সাহিত্য পেলব বলিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধ তাহার উপর সহজে রেখাপাত করিতে পারিবে। যুদ্ধ যখন প্রথম সুরু হয়, লেখকদের দশা তখন বেজায় কাহিল। যুদ্ধসংক্রান্ত পুস্তক ভিন্ন আর সমস্ত পুস্তকের বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পড়ুয়াদের মতি-গতি প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের দিক হইতে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারপর, প্রথমকার উত্তেজনা ধীরে ধীরে থিতাইয়া আসাতে জনসাধারণ আবার ক্রমে ক্রমে পড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। শুনিতেছি, বইয়ের ব্যবসায় আবার চাগিয়া উঠিতেছে এবং কতকগুলি বই আবার পূর্ব্বকার মতই বিকাইতেছে।

খাঁটি সাহিত্যের দিক হইতে দেখিলে বলিতে হয় যে, এখন ও পরের দুতিন বছর ধরিয়া যে-সব বই লেখা হইবে, যুদ্ধের ফলে তাহাদের সুর ও গুণ বদলাইয়া যাইবে। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এবং অতীতের কিছুকাল হইতে যে-সকল উপন্যাস লেখা হইতেছিল, তাহাদের প্রতি খুঁটিনাটিটি অবধি লেখকের চোখ এড়াইয়া যায় নাই; জীবনের তুচ্ছ ও ক্ষণিক ব্যাপারটি লইয়াও সে-সকল উপন্যাসে তন্নতন্ন করিয়া দেখা হইয়াছে।

এমন সময় সহসা অসিতে অসিতে ঝঞ্ঝনা বাজিল, আহতের আর্ত্তনাদ উঠিল এবং মরণ আসিয়া কালো ছায়ার আঁধার ঢালিয়া দিল। পৃথিবী এখন তাহার ঔদাস্য পরিহার করিয়াছে। এ-সময় ছোট-কিছুতে কাহারো মন মজিতে পারে না।

লড়াইয়ের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লোকে আবার কথা-সাহিত্যের দিকে ঝুঁকিয়াছে বটে,—কিন্তু আমার বিবেচনায় ভবিষ্য কথা-সাহিত্যের ধরণ-ধারণ হইবে আলাহিদা রকমের। বাজে যা তা গল্প, সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া তিলকে তাল করিয়া বিরক্তিকর আলোচনা, ভবিষ্যতে কেহ চাহিবে না। আমাদের উপন্যাসে আমরা তখন একটা মেরুদণ্ড চাহিব। নিছক প্রেম আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারিবে না। আকাশে-বাতাসে অশান্তি;—মানুষের পর-সেবা ও আত্মত্যাগের জন্য চেষ্টার কাহিনী এবং উচ্চতর জীবনের জন্য তাহার অন্ধ অথচ উদ্দেশ্যমূলক হৃদয়-সংগ্রামের কথা শুনিবার জন্য তখন আমরা আগ্রহ প্রকাশ করিব। অবশ্য, আমি আমার মন-গড়া কথাই বলিতেছি; কিন্তু, একটি মতে অনেকটা বিশ্বাস করা যায়:—উপন্যাসে

কেহ যুদ্ধ জিনিষটাকে দেখিবার দাবি করিবে না। এই মতের গোড়াপত্তন, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার উপরে; বুয়র যুদ্ধের পরে সকল ঔপন্যাসিকই বুঝিয়াছিলেন যে,—অন্য যাহা-কিছু লেখা হোক না কেন,—বুয়র যুদ্ধ লইয়া কোনকিছু লেখা ঠিক নহে।

আজিকার এই মৃত্যুলীলার ভয়ানক আঘাত হইতে যখন আমরা মুক্তি পাইব, আমাদের অন্যায় কাজগুলি যখন আমরা ন্যায়ের দ্বারা যথাসাধ্য সংশোধন করিব, পাপী ও অত্যাচারীকে যখন আমরা দণ্ড দিতে পারিব, তখন যে মহাভীতির ভিতর দিয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি এবং যে যন্ত্রণা আমরা সহ্য করিয়াছি, তাহার কথা আমরা যত-কম-পারি শুনিতে চাহিব,—যত-কম-পারি পড়িতে চাহিব!"

ডব্লু, এল, জর্জ্জ বলিতেছেন :—

"যুদ্ধের পূর্ব্বে যে-সকল উপন্যাস লেখা হইয়াছে, তাহাদের একেবারে আমোল না দেওয়া সমালোচকদের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, অনেকে বোধ করি ভাবিতেছেন যে, যুদ্ধের পর আমাদের ধাত্ একেবারে বদলাইয়া যাইবে, আমরা একেবারে নূতন মানুষ বনিয়া যাইব। মানুষ নম্র, কঠোর ও সাহসী হইবে, ভোট-ভিখারিণীর দল একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহারা আর ভোট চাহিবে না, কম মাহিনার জন্য আর ধর্ম্মঘট হইবে না, নিরামিষাশীর দল অদৃশ্য হইবে, রুশ নর্ত্তক-নর্ত্তকীর কথা আর আমরা শুনিতে পাইব না, এবং কাল্পনিক চিত্র আর আঁকা হইবে না।

এসব নিরেট বোকার কথা। এ কথা শুনিলে বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে য়ুরোপে যেন আর লড়াই হয় নাই। পূর্ব্বে আমরা যে-সব আন্দোলন করিতাম, যুদ্ধের পরে আমাদের সাহিত্যে যে আবার তাহার সূত্রপাত হইবে, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে। আমরা এখন পাগল নায়ক ও নায়িকার পথ চাহিয়া বসিয়া নাই। সমরোন্মাদ ঘুচিয়া গেলে পর, সাহিত্যের সুর আমরা আরও উঁচু-পর্দ্দায় বাঁধিয়া লইব। আমাদের জাতি কখনও পবিত্র, সরল, গম্ভীর ও নির্ব্বোধ হইবে না। (ইতিমধ্যেই ভোট-ভিখারিণীরা জ্বালাতন সুরু করিয়াছে এবং খনিমজুর ও গাড়োয়ানেরা ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।) সাহিত্যরসিকের দলও যেমন ছিল, ঠিক তেমনই থাকিবে।"

ষ্টিফেন ফিলিপ্স্ বলিতেছেন :—

"আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা, তাহাতে আমি বিশ্বাস করি যে, যুদ্ধের পরে আমরা কল্পনাবাদী হইব। জার্ম্মানী যে হারিবে, তাহা নিশ্চয়; কিন্তু, Might is Right এই উক্তির জন্য, জোর যার মুল্লুক তার এই বিশ্বাসের জন্য যে একটা প্রতাপশালী জাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, ইতিহাসে এমন দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। সত্য বটে, নেপোলিয়ন এমনি কল্পনারই অবতার; কিন্তু নেপোলিয়ন একজন দুর্দ্দম প্রভুত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ মাত্র। এখানে আমরা কেবল একজন রাজা বা জনকয়েক রাজপুরুষকেই দেখিতেছি না; পরন্তু, একটি কল্পনার জন্য একটা সমগ্র জাতি তাহার জাতীয়-



অবজ্ঞা



বাঁদী

জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মঙ্গলকে ছাড়িয়া অমঙ্গলকেই বরণ ইহাতে এই বুঝায় যে, প্রবল শক্তি করে।"

—"The Bookman"

আলোক-চিত্রে ভাস্কর্য্যের নকল

আলোক-চিত্র বাস্তবকে হুবহু ফুটাইয়া তোলে বটে, কিন্তু সে যেমন মানুষের চোখকে ঠকাইতে পারে, এমন আর কেউ নয়। একালের 'ছায়াবাজী'তে তালগাছের সমান উঁচু, আসল জীবন্ত মানুষের ছবি, উড়ন্ত মানুষের কাণ্ডকারখানা আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। দেখিয়া আমরা অবাক হই, কিন্তু ভিতরের লুকাচুরিটি কোনমতেই ধরিতে পারি না। এগুলি হইতেছে আলোক-চিত্রের জুয়াচুরি।

'ফটো'তে এখন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যকলার চমৎকার নকল হইতেছে। এসকল নকল-করা ছবিতে 'আলোক-চিত্রের কবিত্ব-শূন্য প্রয়াস বা বাস্তবতার কঠোরতা থাকে না; কল্পনার বিচিত্র রং তাহাদের সঙ্গে এমন মিলিয়া যায় যে, ধরিবার-ছুঁইবার আদোপেই যো থাকে না—এমন কি কলা-রসজ্ঞের তীক্ষ্ণ চোখও এখানে একেবারে হার মানিয়া যায়।

আমরা এখানে ভাস্কর্য্যের দুখানি নকল-পট দিলাম। প্রথম খানি,—মর্ম্মর-মূর্ত্তি এবং দ্বিতীয়খানি—পিতল-মূর্ত্তির অনুকরণ।

মর্ম্মর-মূর্ত্তি নকলের সময়ে, যাহার ছবি লওয়া হইবে, সেই লোকটীর মুখে, গলায় ও হাতে আগে পাউডার ও শাদা চর্ব্বি মাখাইয়া লইতে হয়। মাথায় শাদা পরচুল পরাইতে বা চুলেও পাউডার মাখাইতে হয়। পোষাক একেবারে শাদা হওয়া ঠিক নয়, তাহা ফিকে নীল বা পাটল রঙের হইলে জলজ্বলে শাদা রঙের চেয়ে তাহাতে ছায়ার লীলা ও অন্য সব খুঁটিনাটি বেশ মানানসই দেখাইবে। 'নেগেটিভ' শেষ হইলে, মূর্ত্তির চারিপাশ হইতে 'ক্ষেত্রপৃষ্ঠ' (back-ground) কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহা কোন কালো জমির উপরে বসাইয়া দিতে হইবে।

পিতলের মূর্ত্তি নকলের সময়ে 'মডেলে'র কাপড়চোপড় বেশ সাধারণ ও সাদাসিধা ভাবে রাখা দরকার। দেহে ঘন পিঙ্গল রঙের চর্ব্বি মাখাইতে হইবে। বস্ত্রাদি সাটিনে তৈয়ারি হইলেই ভাল হয়।

এরূপ অনুকৃতি-কৌতুক কাজে খাটাইতে হইলে আরও কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। কিন্তু এখানে সে-সব কথা সবিস্তারে বলিয়া লাভ নাই।

—Pearson's Magazine হইতে

রিম্‌স্ গির্জ্জার ঐশ্বর্য্য

রিম্‌সের গির্জ্জা-তৈয়ারী সুরু হয় ১২১২ খৃষ্টাব্দে। গত সাত শত দুই বৎসরকাল ইহা ফরাসীজাতির ধর্ম্ম-প্রতিভার এবং ললিতকলার অপূর্ব্ব নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান ছিল; সংপ্রতি আধুনিক হূণজাতি ইহাকে ইতিহাসের স্মৃতিতে পরিণত করিয়াছে। বৈশাখের 'ভারতী'তে আমরা রিমসের গির্জ্জার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি; আজ তাহার সহিত আর গোটাকয়েক কথা যোগ করিয়া দিব।

ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও উত্তর জার্ম্মানীতে যখন গথিক ভঙ্গীর অভিব্যক্তি হয় নাই, তখন রোমীয় রচনা-পদ্ধতি অনুসারে সেখানকার গির্জ্জাগুলি তৈয়ার হইত। তাহার পর, সাধারণের সরল কিন্তু গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস যখন প্রকৃতির দিকে ফিরিয়া আসিতে চাহিল, তখন সেই বিশ্বাসকে বাহিরে ফুটাইবার জন্য গথিক রচনা-ভঙ্গী আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার উচ্চ ও বঙ্কিম রেখাবিন্যাস, ইহার কঠিন সংলগ্নতা ইহাকে এমন একটি রূপ ও সম্পূর্ণতা দান করিয়াছিল, কোন কৃত্রিম রচনা-ভঙ্গী যাহা দিতে পারে না। প্রকৃতির দৃশ্যমান ব্যোমচুম্বী অরণ্যপাদপশ্রেণীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, তাহার ধনুকাকৃতি শাখা-প্রশাখা গথিক গির্জ্জাগুলির শ্রেণীবদ্ধ খিলানে সুকৌশলে অনুকৃত হইয়াছে; বনপাদপগুলির মাঝে মাঝে যে অবকাশ থাকে, গির্জ্জার গবাক্ষ-শ্রেণীতে তাহারই অনুকরণ দেখা যায়। উক্ত রচনা-ভঙ্গীর ভিতর কেবল আড়ম্বর দেখাইবার জন্য কোন-কিছুর সমাবেশ নাই। তাহার ভিতরে অপ্রয়োজনীয় কিছুও নজরে পড়ে না। তাহার প্রতি জিনিষটিতেই অর্থ আছে, উদ্দেশ্য আছে। রচনা-ভঙ্গীর পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তন্মধ্যে ক্রমে ক্রমে ভাস্কর্য্য ও অলঙ্কৃত শিল্পের সমাবেশ ঘটিতে লাগিল। রিম্‌সের গির্জ্জায় এই বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়। ভগবানের মহিমা ও মানবের আনন্দ এখানে এক হইয়াছিল; তাই, সর্ব্বযুগের, সর্ব্বকালের ললিতকলার ভিতরেই ইহা উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে।

ফ্রান্সে ও ফরাসী জাতির নিকটে রিমসের গির্জ্জা কতটা মহিমময়, তাহা বুঝিতে গেলে, ইহার নির্ম্মাণকালের সাতশত বৎসর আগেকার ঘটনা স্মরণ করিতে হইবে। সেই সময়ে রিম্‌সের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন সাধু রেমি। ক্রিশ্চান রাজরূপে রাজা ক্লেভিস, তাঁহার মুকুট-ধারণের স্মরণীয় উৎসব-দিনে সাধু রেমির নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, "তিনি যাহা পূজা করিয়াছেন, তাহা পুড়াইয়া ফেলিবেন এবং তিনি যাহা পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন তাহা পূজা করিবেন।" রিম্‌সের গৌরব সেইদিন হইতে।

কথিত আছে, যে পবিত্র তৈলে ক্লভিস অভিষিক্ত হন, একটি ঘুঘু তাহা স্বর্গ হইতে সাধু রেমিকে আনিয়া দেয়। ইহার পর ফ্রান্সের অধিকাংশ রাজাই রিম্‌সের গির্জ্জায় এই পবিত্র তৈলদ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছেন। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে যখন Charles VII, রিম্‌সের গির্জ্জায় অভিষিক্ত হন,

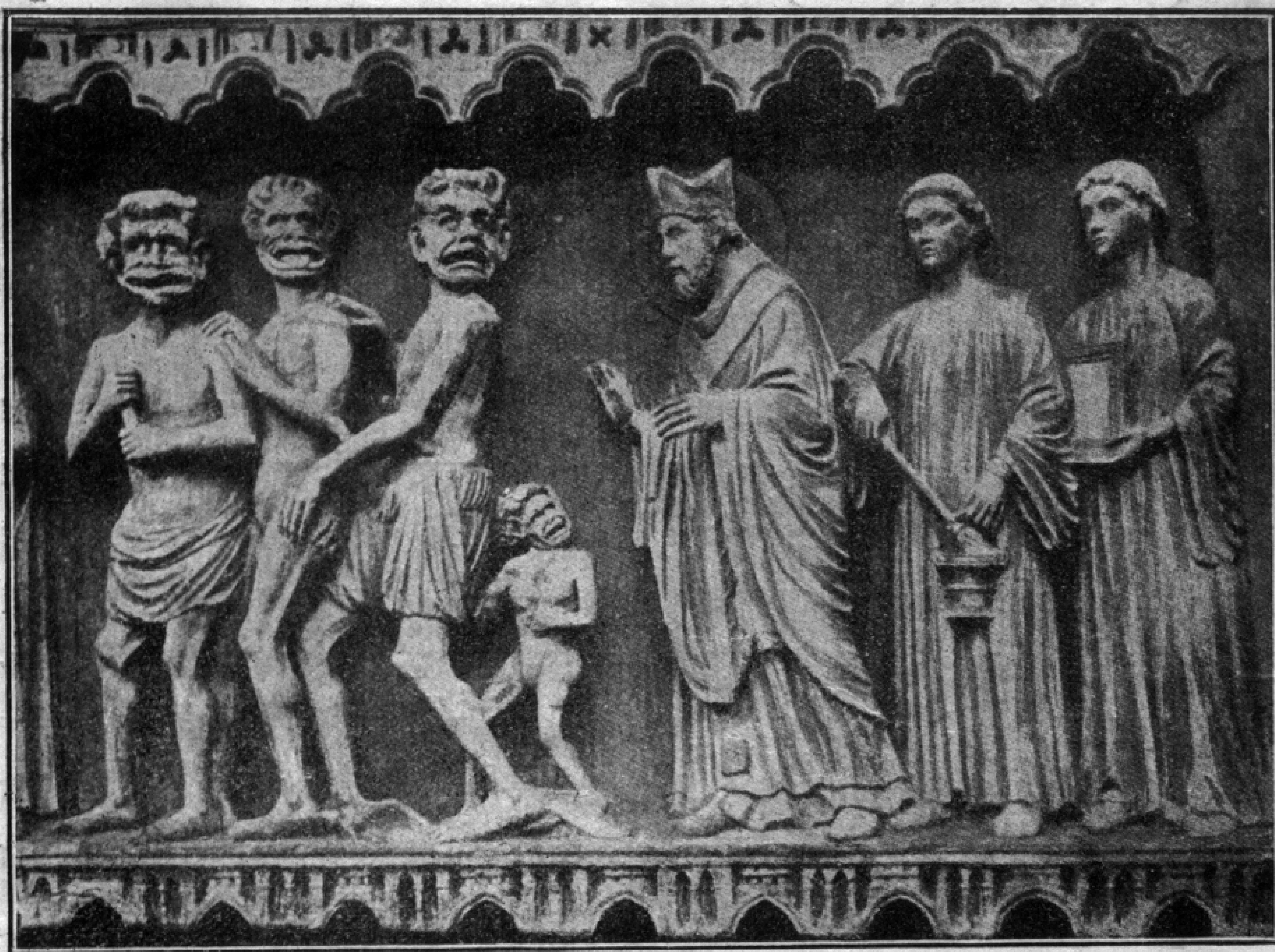
তখন বীরবালা জোয়ান অফ আর্ক তাঁহার অপূর্ব্ব স্বপ্নের সফলতা দর্শন করেন। রিম্‌সের গির্জ্জায় এই রাজ্যাভিষেক উৎসবটি সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। স্বর্গীয় তৈলাধারটি বিদ্রোহ-কালে এক উন্মাদ ভাঙ্গিয়া দেয়; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার তৈলসিক্ত একখণ্ড ভগ্নাংশ রক্ষা পাইয়াছিল! একটি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় রত্নখচিত পবিত্র আধারের ভিতর পরে সেই ভগ্নাংশ রক্ষিত হয়। Charles Xএর অভিষেক-ক্রিয়া আবার সেই স্বর্গীয় তৈলদ্বারা সম্পন্ন হইল। ফ্রান্সে একটা প্রচলিত কথা আছে যে, কোনরূপ দুর্ঘটনাতেই এই স্বর্গীয় তৈল একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার নহে!

মধ্যযুগের গির্জ্জা কিরূপে যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত বিষয়। পুরোহিতেরা ইহা একটি ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া প্রচার করিলেন, রাজগণ ইহার জন্য সকলকে উৎসাহ দান করিলেন, এবং সাধারণে একাগ্র চিত্তে আপনাদের অর্থদান করিল। রিম্‌সের নাগরিকেরা তাহাদের অপূর্ব্ব গির্জ্জার কথা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, তাহার কারুকার্য্য লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল এবং তাহার ক্রমবর্দ্ধমান সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনাদের মনে গর্ব্বানুভব করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা যত বাক্যব্যয় করিয়াছিল, তার চেয়ে কাজ করিয়াছিল ঢের বেশী। তাহারা সাধারণ মাহিনা-করা কারিকরের মত এই ধর্ম্ম-মন্দিরের গঠনে হস্তার্পণ করে নাই। তাহারা হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি, প্রাণের সমস্ত কামনা, হস্তের সমস্ত নিপুণতা দিয়া এই ধর্ম্ম-ভবনকে ক্রমেই পৃথিবী হইতে স্বর্গের দিকে টানিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা যাহা করিয়াছিল, একালের কোন কারিকরই ঘড়ী ও মাহিনার দিকে চোখ রাখিয়া তাহা করিতে পারিবে না।

রিম্‌সের গির্জ্জার সম্মুখাংশ যেন পাথরের একখানি বাইবেল! সেকালে পুঁথির লেখা পাতা পড়িতে পারে, এমন লোক সংখ্যায় বড় বেশী ছিল না। অতএব, পাথর বা কাঠের ফলকের উপর বাইবেলের গল্প-গুলিকে ছবিতে খুদিয়া খুদিয়া এমন পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইত যে, চোখে পড়িলেই লোকের তাহার মানে বুঝিতে দেরি হইত না।

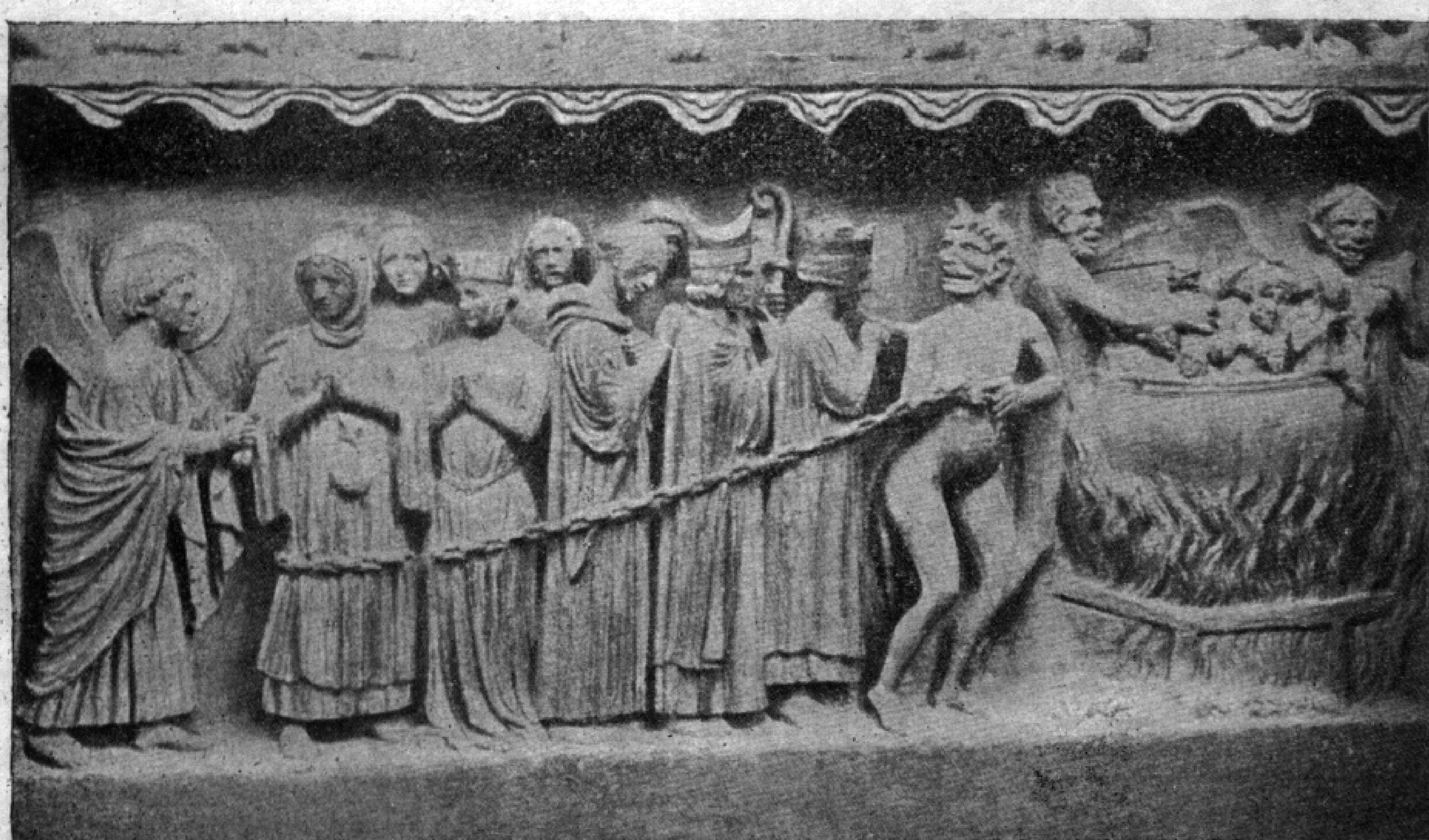
তবে, এই খোদাই-করা গল্প-চিত্রগুলি যে একেবারেই ধর্ম্মমূলক ছিল, তাহা নহে। সেকালে খবরের কাগজ ও মাসিক কাগজ ছিল না ত! সুতরাং যে-সব শিল্পী ছিলেন হাস্য-রসিক, তাঁহারা মনের কথা জাহির করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইয়া এই ধর্ম্মালয়ের দেয়ালে দেয়ালেই হাসির ছবি খুদিতেন ও লোক হাসাইতেন! তাঁহাদের তীক্ষ্ণ চোখ হইতে রাজা বা ধর্ম্মাধ্যক্ষ বা সন্ন্যাসী বা নাগরিক—কাহারও ছাড়ান্ ছিল না,—তাঁহাদের আঁকা ব্যঙ্গ-পট সকলেরই প্রতি সমান নিষ্ঠুর!

রিম্‌সের একটি প্রবাদ আছে যে, সাধু রেমি সহর হইতে মানুষের অনিষ্টকারী ভূতের দলের আড্ডা ভাঙ্গিয়া সকলকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। খোদাইকার এক যায়গায় সেই গল্পের



সাধু রেমি ভূত তাড়াইতেছেন

ছবিটি খুদিয়াছেন। যে ভূতটি পালের একটা বাচ্ছা ভূত লইয়া দাঁতমুখ খিঁচাইয়া গোদা, সেটা ভারি বদমায়েস ; সে তার সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে, কিছুতেই এক পা নড়িতে



নরকে পাপীর সাজা

রাজি নয়! সাধু অনেক ঝাড়্ফুক্ করিয়া ও মন্ত্র-তন্ত্র আওড়াইয়া তবে তাহাকে তাড়াইতেছেন। আরও দুইটা ভূতের একটা, সাধুকে জিভ্ বাহির করিয়া বেজায় ভ্যাংচাইতেছে ও আর একটা, এ-সব খুব মস্ত-রকমের ঠাট্টা ঠাওরাইয়া হা হা করিয়া হাসিতেছে! ইহাই হইল ছবির বিষয়।

আর এক জায়গায় নরকের কাণ্ড-কারখানা। ধূ-ধূ আগুনের উপরে একখানা কড়া এবং তাহার ভিতরে পাপী'দের ফেলিয়া যমদূতেরা আচ্ছা করিয়া ভাজিতেছে! আর একদিকে আর এক দল পাপীকে লোহার শিকলে বাঁধিয়া আনা হইতেছে। দলের প্রথমেই আসিতেছেন, একজন রাজা, তারপর এক ধর্ম্মাধ্যক্ষ, তারপর এক সন্ন্যাসী! এ ছবি যে খুদিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার বুকের পাটা খুব শক্ত ছিল!

—Munsey's Magazine হইতে

শ্রীপ্রসাদদাস রায়

দেববর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা

ব্রাহ্মণের 'দেবশর্ম্মা' ও ক্ষত্রিয়ের 'দেববর্ম্মা' যে সাধারণ উপাধি তাহা সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত মূল ও তাৎপর্য্য আমাদের নিকট তেমন সুস্পষ্ট নহে। আলোচনাদ্বারা এতৎসম্বন্ধে কিরূপ তথ্য লাভ করা যাইতে পারে—তাহা দেখিবার জন্যই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

'দেব' শব্দের অর্থ আমাদের সকলেরই নিকট সুগম। সুতরাং প্রথমে আমরা 'শর্ম্ম' ও 'বর্ম্ম' শব্দের অর্থেরই আলোচনা করিব। 'শর্ম্ম' শব্দ আমরা অভিধানে সুখার্থক দেখিতে পাই। যথা—'শর্ম্মশাত সুখানি চ।' রঘুবংশে কালিদাস শর্ম্ম শব্দের ব্যবহার এই অর্থেই করিয়াছেন। যথা—"সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যাহি পরত্রেহচ শর্ম্মণে॥" 'বর্ম্ম' শব্দটী বৃধাতু হইতে উৎপন্ন। বৃধাতুর অর্থ আবরণ। ইহা হইতে 'বর্ম্ম' শব্দটীর অর্থ আবরণ ও রক্ষা হয়। বীর পুরুষেরা শরীরে যে 'বর্ম্ম' ধারণ করে তাহাতে আবরণ ও রক্ষা উভয়ার্থই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে 'দেব' শব্দ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নামের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইয়াছে তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব। অভিধানে সন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ 'ভূদেব' নামে আখ্যাত ও রাজা 'নরদেব' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। রাজাকে আমরা শুধু 'দেব' নামেও আখ্যাত দেখিতে পাই। যথা—"রাজা ভট্টারকো দেবঃ॥" ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা দেবকার্য্যে নিরত থাকিতেন বলিয়া অধিক আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বিশিষ্ট হওয়াতেই যে 'দেবতুল্য' অর্থেই 'দেব' বলিয়া আখ্যাত হইবেন এবং ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হওয়াতেই দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই যে

'দেব' নামে কথিত হইবেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মহর্ষি মনু রাজার শক্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও আমরা ইহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হই। যথা—

"অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভি র্নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষঃ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥"
"বালোঽপি নাবমন্তব্যঃ পার্থিবইতি ভূমিপঃ।
মহতীদেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥"

এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও রাজার পূর্ব্বোক্ত 'দেব' আখ্যার সহিত যথাক্রমে 'শর্ম্ম' ও 'বর্ম্ম' শব্দের যোগ হইয়া কি অর্থ হয় তাহাই আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিব। এই যোগে 'দেবশর্ম্মা' শব্দের অর্থ ইহাই হয় যে যিনি দেবরূপে শর্ম্ম অর্থাৎ সুখ বিধান করেন এবং 'দেবশর্ম্মা' শব্দের অর্থ ইহাই হয় যে যিনি দেবরূপে বর্ম্ম অর্থাৎ রক্ষা বিধান করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রথম এই 'দেবশর্ম্মা' নাম হইতে কালে ব্রাহ্মণ জাতি মাত্রেই 'দেবশর্ম্মা' নামের অধিকারী হইয়াছেন এবং দৈবশক্তিসম্পন্ন রাজার প্রথম এই 'দেববর্ম্মা' নাম হইতে রাজার জাতি বা ক্ষত্রিয় মাত্রেই 'দেববর্ম্মা' নামের অধিকারী হইয়াছেন।

শর্ম্ম বা সুখবিধানের মুর্থ্যার্থতা হইতে আমরা দেবশর্ম্মার পরিবর্ত্তে সংক্ষেপে কেবল 'শর্ম্মাও' ব্রাহ্মণের নামের অন্তে সংযুক্ত দেখিতে পাই এবং বর্ম্ম বা রক্ষার মুর্থ্যার্থতা হইতে আমরা দেববর্ম্মার পরিবর্ত্তে সংক্ষেপে কেবল 'বর্ম্মাও' ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে সংযুক্ত দেখিতে পাই। এখানে আমরা কয়েকটী শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিতেছি—তাহা হইতে আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য বিশেষরূপেই উপলব্ধি হইবে :—

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমে হ হনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতম্॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত বিষ্ণুপুরাণ।
"শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্ম ত্রাতাচ ভূভুজঃ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত যমবচন।
"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্যচ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত শাতাতপ বচন।

জগতের হিতসাধন ব্রাহ্মণের ব্রত ও রক্ষাসাধন ক্ষত্রিয়ের ব্রত। তাহাতেই পুরাণাদিতে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ জগতের শ্রেয়ঃ সাধন জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন আর ক্ষত্রিয় সমস্ত উৎপাত উপদ্রব নিবারণ করিয়া ব্রাহ্মণের সাহায্য করিতেছেন। বিশ্বামিত্র ঋষি এই সাহায্যের জন্যই দশরথের নিকট হইতে রাম ও লক্ষ্মণকে চাহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অতি পুরাকালেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এইরূপে এক স্বাভাবিক সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিলেন। তাহাতেই আমরা শাস্ত্রের মধ্যেও ইহার অনুমোদন দেখিতে পাই। যথা—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রেতু সম্পৃক্তে ইহচামুত্র বর্দ্ধতঃ॥"

ভট্টিকাব্যে ইহারই অনুবাদে লিখিত হইয়াছে :—

"ময্যাত্মমাস্তথাঃ শরণং ভয়েষু
বয়ং ত্বয়াপ্যাপ্স্যাহি ধর্ম্মবৃদ্ধে।
ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থম্
শঙ্কাং কৃথা মা প্রহিনু স্বসূনুম্॥" ২১
১ম অধ্যায়।

ইহা হইতে পৃথিবীর শর্ম্ম ও বর্ম্মরূপ দেবোচিত কার্য্যে পরস্পর সহকারিতা হইতেই যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সাধারণ একই 'দেব' নামে অভিহিত হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

দৈবকার্য্যে পরস্পর সহযোগিতা করিয়া যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পৃথিবীতে ও সমাজে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন—তদ্রূপ জগতের অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যেও তাঁহারা দেবভাব প্রকাশ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লিখিত দেবযোগ্য শর্ম্ম ও বর্ম্মভাব সম্বন্ধে অতি সুন্দর চিত্রই প্রাপ্ত হই। এখানে আমরা তাহার একটু আভাস প্রদান করিব। ব্রাহ্মণের প্রকৃতি কিরূপে সম্পূর্ণভাবে জগতের হিতাভিমুখী করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে মনু লিখিয়াছেন—

"জপ্যেনৈবতু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্নবাকুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" ৮৭
২য় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কেবল জপদ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিবেন তাহাতে আর সংশয় নাই। বৈদিক যাগাদি অন্য কর্ম্ম করুন্ না করুন্ মৈত্র অর্থাৎ পশু জীবাদির প্রতিহিংসা শূন্য হইয়া জপপরায়ণ হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়।

"অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্প দ্রোহেণবা পুনঃ।
যাবৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রোজীবেদনাপদি॥" ২
১ম অধ্যায়।

"বিপৎ উপস্থিত না হইলে বিপ্র ভূতহিংসা না করিয়া বা সামান্য হিংসা করিয়া যাহাতে জীবন যাপন করিতে পারে তাহাই করিবেন।

জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের রক্ষারূপ লক্ষ্য লইয়াই যে রাজা জন্মগ্রহণ করেন তৎসম্বন্ধে মনু লিখিয়াছেন :—

"স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা॥" ৩৫
৭ম অধ্যায়।

"স্বধর্ম্মনিরত আনুপূর্ব্বিক সকলবর্ণ ও আশ্রমের সম্যক্ অভিরক্ষকরূপে রাজা সৃষ্ট হইয়াছেন।"

উল্লিখিত মঙ্গল ও রক্ষাভাবকে জীবনে চির উদ্বোধিত রাখিবার জন্য নামকরণের মধ্যেই যেমন তত্তৎভাব সন্নিবেশ করার বিধান মহর্ষি মনু করিয়াছেন—তেমনই নামের অন্তে তত্তৎভাবের স্পষ্টবোধক শর্ম্ম ও বর্ম্ম শব্দ সংযোগের বিধানও তিনি করিয়াছেন। যথা—

"নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ॥ ৩০
মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্॥ ৩১
শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্॥ ৩২
২য় অধ্যায়।

"দশম বা দ্বাদশ দিবসে জাত বালকের নামকরণ করিবে॥" ৩০

"ব্রাহ্মণের মঙ্গল বাচক ও ক্ষত্রিয়ের বল বাচক নাম রাখিবে॥" ৩১

ব্রাহ্মণের শর্ম্মযুক্ত ও ক্ষত্রিয়ের রক্ষাসূচক বর্ম্ম, উপপদযুক্ত করিবে॥" ৩২

প্রাগুপ্ত শর্ম্ম ও বর্ম্মভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সাহচর্য্যের স্পষ্ট বিধিও মনু এইরূপে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

"ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ শাসনে॥" ৩৭
৬ষ্ঠ অধ্যায়।

"রাজা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ঋক্‌যজুঃসাম এই বেদত্রয়ের মর্ম্মার্থাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিবেন, এবং তাঁহারা যে সকল আদেশ করেন, তৎসমস্ত প্রতিপালন করিবেন।"

"ব্যবহারান্‌ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্ম্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্‌ ॥" ১
৮ম অধ্যায়।

"বিচার দর্শনেচ্ছু রাজা ব্রাহ্মণও মন্ত্রনাভিজ্ঞমন্ত্রিগণ সহ বিনীতভাবে সভায় প্রবেশ করিবেন॥"

রাজা স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণকেই নিজ প্রতিনিধি পদে বরিত করিবার বিধিও মনু করিয়াছেন। যথা—

"যদাস্বয়ং ন কুর্য্যাত্ত নৃপতিঃ কার্য্যদর্শনম্‌।
তদানিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে॥ ৯
সোঽস্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।
সভামেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃ স্থিত এব বা॥" ১০

"যখন রাজা স্বয়ং কার্য্যদর্শন করিতে না পারিবেন তখন বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণকে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য নিযুক্ত করিবেন।" ৯

"তিনি তিনজন সভ্যসমবেত হইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিয়া তথায় উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।" ১০

এই প্রকারে ব্রাহ্মণের শর্ম্মভাব ও ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মভাবের সংমিশ্রণে এক সময়ে ভারতবর্ষে সুখশান্তির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার আয়োজন হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত স্বর্গরাজ্যের উপর অধিষ্ঠান করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে আপনাদের নিমিত্ত যে দেব-আদর্শ গঠন করিতে হয় তাহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের শর্ম্ম ও বর্ম্ম এই উপান্ত নামের পূর্ব্বে 'দেব'শব্দ সংযুক্ত হইয়া তাঁহারা যথাক্রমে দেবশর্ম্মা ও দেববর্ম্মা এই সাধারণ নামে পরিচিত হইয়াছেন।

উপরে আমরা দেবশর্ম্মা ও দেববর্ম্মা নামের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে আমরা ইহাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উপরে আমরা পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতি সংহিতাদির যে সমস্ত বচনে 'শর্ম্ম' ও 'বর্ম্ম' এবং 'দেব' পূর্ব্বক উভয় শব্দের উল্লেখ পাইয়াছি, তাহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রসকলের পূর্ব্বেই যে এই সমস্ত উপাধির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যে আবহমানকাল হইতে শর্ম্মাদি শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় তাহাতেও ইহাদের প্রাচীনত্ব প্রখ্যাপিত হয়।

'শর্ম্ম' ও 'বর্ম্ম'শব্দের এবং 'দেব' শব্দের সহিত ইহাদের সংযোগের এইরূপ প্রাচীনত্ব ও ইহাদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ শাস্ত্রোক্তি হইতে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, স্মরণাতীতকালেই হিন্দুসমাজ ও জীবনের আদর্শ কিরূপ স্বর্গীয় মহানুভবতার দ্বারা পরিকল্পিত হইয়াছিল।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বামী

(গল্প)

আরাকান হইতে নবাবের ফৌজ তখন দিল্লী ফিরিতেছিল। পথে বাংলা দেশে এক গ্রামের বুকে তাহাদের তাঁবু পড়িল। কয়দিন বিশ্রাম করিয়া সকলে একটু জুড়াইয়া লইবে।

পরদিন ফৌজ দেখিতে দলে দলে বালক বৃদ্ধ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। প্রথমে ভয়ে তাহারা দূরে দূরে রহিল; কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখিল, যে উহারা তাহাদেরই মত হাসে, গল্প করে, তখন তাহাদের ভয় ভাঙ্গিল এবং সকলে কাছে গিয়া নানা প্রশ্ন তুলিয়া অলীক বীরত্বের অসংখ্য কাহিনী শুনিতে লাগিল।

এই ক্ষুদ্র দলের সর্দার ছিল, এক মুসলমান যুবা। নবাবের সহিত তাহার না-কি কি সম্পর্ক ছিল; তাই সে অল্প বয়স হইতেই ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে শিখিয়াছিল। ক্ষমতাকে নিজের বিলাসের জন্য খরচ করিতে সে ভাল করিয়াই জানিত। যুবা বিবাহ করে নাই, কোনরূপ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে মোটেই তাহার ইচ্ছা ছিল না।

বৈকালে যুবা গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। সে গ্রামে শুধু হিন্দুর বাস, ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। সকলেরই অবস্থা স্বচ্ছল; কিন্তু ধনী তেমন কেহই নহে।

তিনজন অনুচরকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে যুবা গ্রামের পথে বাহির হইল। দৃষ্টি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছিল। চলিতে চলিতে পথের ধারেই তাহারা সুন্দর পরিচ্ছন্ন একখানি বাড়ী দেখিতে পাইল। যুবা ক্ষণকাল পথে দাঁড়াইল।

বাড়ীর মালিক বামাচরণ ভট্টাচার্য্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল; জায়গা-জমি যথেষ্ট আছে। নিজে তিনি পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বাড়ীটি এমন মাজা-ঘসা, অন্দর-বাহির এমন সুন্দরভাবে নিকানো, ঝাঁট দেওয়া, যে দেখিলেই বেশ একটা স্নিগ্ধ আরাম ও পবিত্রতার ভাব মনে জাগিয়া উঠে। যুবা কিন্তু এ সব কিছু দেখিতেছিল না। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ ছিল। সে দেখিতেছিল, এক কিশোরী সদ্য স্নান সারিয়া ভিজা কাপড়ে গৃহপার্শ্বস্থ পুষ্করিণী হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে, কাঁখে তাহার জল-ভরা কলসী! তাহার সিক্ত-বাস-লিপ্ত নিটোল পরিপূর্ণ দেহ হইতে সৌন্দর্য্য যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। ক্ষুদ্র ঘোমটাখানি তাহার স্নিগ্ধ রমণীয় মুখের অতি অল্পটুকুই ঢাকিতে পারিয়াছিল; বাকিটুকু অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি মাখিয়া এমন অপূর্ব্ব শ্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছিল যে যুবা তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কিশোরী ছায়া-শ্যামল

পথ ধরিয়া অন্দরে চলিয়া গেল। দৃষ্টি তাহার নত, গতি ত্রস্ত।

কিশোরী দৃষ্টির অন্তরালে গেলে যুবা সঙ্গীদিগকে বলিল, "বুঝলে ত,—আজই। বিশ-বিশ আসরফি বখ্‌সিস মিলবে!"

সঙ্গীরা বলিল, "আলবৎ, কুছ পরোয়া নেই।" তারপর বাড়ীটার অবস্থান ভাল করিয়া সকলে দেখিয়া লইল। যুবা খুসী হইয়া আতর-মাখা গোঁফে চাড়া দিয়া ধীরে ধীরে ঘোড়া হাঁকাইয়া অগ্রসর হইল।

২

গভীর রাত্রে গ্রামবাসীরা শুনিল, রামাচরণ ভট্টাচার্য্যের গৃহে মহা-সোরগোল। সকলেই ঠিক করিল, ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। তখন যাহার যাহা-কিছু লুকাইবার ছিল, সব লুকাইয়া ফেলিল। স্ত্রী-লোকেরা ছেলে-পিলে লইয়া খাটের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কোন কোন ব্রাহ্মণও যে ব্রাহ্মণীর সহিত মশক-সঙ্কুল খাটের নীচে প্রবেশ না করিলেন, এমন নহে। সকলেই কম্পমান বক্ষে নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিল—ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ছাড়িয়া ডাকাতেরা কখন্ কাহার বাড়ী চড়াও হয়, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই!

কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর গণ্ডগোল থামিয়া গেল। তখন সকলেরই বুকের স্পন্দন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। এইবার না জানি আবার কাহার সর্ব্বনাশ হয়! কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্তও যখন আর কোন নূতন আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইল না, তখন সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—ঠাকুর এবার খুব রক্ষা করিয়াছেন।

নিজ নিজ বিপদের আশঙ্কা যখন কাটিয়া গেল, তখন তাহাদের হৃদয় বেচারা বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের জন্য সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। অনেকেই গৃহিণীর ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও অসীম সাহসে ভর করিয়া পাট-মোড়ার আঁটি বাঁধিয়া বড় বড় মশাল জ্বালিল, তারপর দল বাঁধিয়া সকলে ভট্টাচার্য্যের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভট্টাচার্য্য শিরে করাঘাত করিয়া যখন তাহাদিগকে জানাইয়া দিল যে দুর্বৃত্তেরা তাঁহার লক্ষ্মী-স্বরূপিণী পুত্রবধূ নয়নতারাকে লইয়া গিয়াছে, তখন সকলেই বিস্ময়ে বিপদে অভিভূত হইয়া পড়িল। কাহারও মুখে একটিও কথা সরিল না।

কিন্তু বেচারা বৃদ্ধকেও ত সান্ত্বনা দেওয়া চাই। তাই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একে একে প্রত্যেকেই বৃদ্ধকে বুঝাইতে লাগিল, ভগবানের যাহা ইচ্ছা, কে তাহা খণ্ডাইতে পারে? বৃথা শোক করিয়া কোন লাভ নাই, ভগবানের কার্য্য মাথা পাতিয়া লওয়াই বিধেয়! যদিও সকলে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার মত প্রবীণ বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ-সব কথা বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র, তবুও উপদেশ দিতে কেহই ছাড়িলেন না। এমন কি, এখন কর্ত্তব্য কি তাহাও স্থির হইয়া গেল! যাদব তর্কালঙ্কার লোকটা যদিও গরীব, কিন্তু তাহার মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী,—তাহার সহিত পুত্রের বিবাহটা শীঘ্র দিয়া ফেলিলে উপযুক্ত পুত্রবধূর অভাব অচিরেই মোচন হইবে।

বৃদ্ধ কোন কথা বলিলেন না। পুত্র

রমানাথ ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া ক্রোধ, বিষাদ, করুণা প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তিগুলা একটা প্রবল ঝড় বহাইয়া তুলিয়াছিল। ঝটিকার প্রথম বেগ একটু শান্ত হইয়া আসিলে রমানাথ বুঝিতে পারিল, রমণীকে উদ্ধার করিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই—বিধাতার এ নিষ্ঠুর বজ্র বুক পাতিয়াই তাহাকে লইতে হইবে! তখন তাহার হৃদয় এই অসহায়া রমণীর জন্য করুণায় ভরিয়া উঠিল। একে একে অতীত জীবনের ছবিগুলি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সেই ছয় বৎসর পূর্ব্বে বারো বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকার সুখ-দুঃখের সমস্ত ভার যখন সে গ্রহণ করে, তখন হইতে কত ভাবেই না বালিকাকে সে আপন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে! তারপর ধীরে ধীরে তরুণী যখন তাহার সদ্য-মুঞ্জরিত যৌবন লইয়া নিতান্তই আশ্রয়ের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, তখন তাহার জীবনে কি মধুর বসন্তের হাওয়া বহিয়া গেল—তাহার সকল হৃদ্-কমল সঞ্জীবিত করিয়া এক নূতন পুলক জাগিয়া উঠিল। ইহার পর এ কয় বৎসর সে কি অনাবিল আনন্দেই যে কিশোরীর সাহচর্য্য ও পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে! আর আজ! কোন্ দস্যু তাহার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া এমনভাবে তাহার জীবনটাকে বিপদের ঘন অন্ধকারে পূর্ণ করিয়া দিল!

রমানাথ কিছুতেই তাহার হৃদয়কে শান্ত করিতে পারিল না—বিধাতার এই কঠোর বিধান মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবার মত হৃদয়ের বল কিছুতেই সে আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিল না। তাই উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে পাগলের মত সে কেবল উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ দিকে পাড়ার সমবেদনাকারীর দল যখন ছিলিমের পর ছিলিম পুড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন একে একে সকলেই শেষ উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় লইল।

৩

রাত্রি প্রভাত হইল। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সকলের শোক আরও বাড়িয়া উঠিল—পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতেই দুঃখ যেন ভীষণ নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল।

ক্রমে বেলা বাড়িল। হা-হুতাশ কমিয়া আসিতে লাগিল। বিরস বদনে ধীরে ধীরে যে যাহার কাজে মন দিতে সুরু করিল। সংসারের খুঁটিনাটি সব কাজই আবার পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল। কিন্তু একটি প্রাণ শুধু কিছুতেই আর নিজেকে গুছাইয়া লইতে পারিল না। সারাটা দিন নিশ্চল, নিস্তব্ধভাবে রমানাথ তাহার ঘরে বসিয়া কাটাইয়া দিল। কাহারো কথা শুনিবার বা মুখের দিকে চাহিবার শক্তিও তাহার ছিল না।

আবার সন্ধ্যা নামিল। আজ সন্ধ্যার আকাশে বাতাসে যেন ছিন্ন হৃদয়ের রক্তের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে রক্তের বন্যা গ্রামস্থ দেবালয়ের সন্ধ্যারতির কাঁশর ঘণ্টার রবের সহিত মিশিয়া রমানাথের রুদ্ধ ঘরে ঢুকিয়া তাহার চারি পাশে একটা করুণ মায়াময় আবেশের সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

আপনা হইতেই রমানাথের চোখ বুজিয়া আসিল। অল্পক্ষণ পরেই সারাদিনের অবসন্নতায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। পাড়ার লোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; চতুর্দ্দিক নীরব নিস্তব্ধ। খানিকটা চাঁদের আলো জানালা দিয়া তাহার বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথমটা কিছুই তাহার মনে পড়িল না—কিন্তু বোধ হইতে লাগিল, যেন কি একটা ভীষণ কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। ক্রমে সব তাহার মনে পড়িল। তখন আবার নূতন করিয়া শোকাবেগ তাহার হৃদয়টাকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। রজনীর নিস্তব্ধতায় চাঁদের জ্যোৎস্নায় দুঃখ তাহার আরো ঘনাইয়া উঠিল। একটি দিনের ভিতর তাহার জীবনের উপর দিয়া পরিবর্ত্তনের কি এ দারুণ বন্যা বহিয়া গিয়াছে!

আশে-পাশে তাহার স্ত্রীর কত স্মৃতি পড়িয়া রহিয়াছে! সে একে একে সব দেখিতে লাগিল; ঘরের প্রত্যেক স্থানেই তাহার স্ত্রীর কর্ম্মকুশলতার পরিচয় বর্ত্তমান! এমন কি, তাহার মাথার কাছে স্ত্রীর সেই বালিশটিতে এখনো তাহার চুলের স্নিগ্ধ গন্ধ জাগিয়া রহিয়াছে—সমস্তই আছে! নাই শুধু সেই সহাস সুন্দর মুখখানি!

রমানাথ শুইয়া পড়িয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। যতই ভাবে, ততই স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ তাহার বাড়িয়া উঠে। ততই আরও বেশি করিয়া মন তাহার ক্লিষ্ট হয়। এমন সময় হঠাৎ রমানাথ চমকিয়া উঠিল—সে দেখিতে পাইল, তাহার সম্মুখে খোলা দরজার মাঝখানে নয়নতারা দাঁড়াইয়া আছে,—তাহার সারাদেহে চাঁদের আলো লুটাইয়া পড়িয়াছে। ছুটিয়া গিয়া রমানাথ তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর ঘরের ভিতর তাহাকে লইয়া আসিল।

৪

রমানাথ নয়নতারার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "তুমি কেন মিছে ভেবে কষ্ট পাও! আমি তোমাকে কতবার বলব নয়ন, তোমাকে গ্রহণ করতে আমার মনে এতটুকু দ্বিধা নেই!"

নয়নতারা বলিল, "কিন্তু আমার যেন মনে হয়, আমার কপাল ভেঙ্গেছে, নইলে এমন ঘটত না। আমার সমস্ত দেহ যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে—যেখানটা তুমি স্পর্শ করছ, সেখানে কি যে একটা আরাম পাচ্ছি, তোমাকে তা বোঝাতে পারব না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি তোমার স্পর্শের অযোগ্য হয়ে পড়েছি। তোমাকে আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে দিয়ে যেন আমার পাপের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তুলছি!"

রমানাথ দেখিল, নয়নতারার মুখ হতাশের কালিমায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে! সে মুখে কোনদিন যে হাসির উজ্জ্বলতা বিরাজ করিত, কল্পনাতেও আজ তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সে বলিল, "মিছে কেন কষ্ট পাও? তুমি কি বুঝতে পার না, দেহটা আমাদের কিছু নয়। মনটাই আসল। আমি ভালবাসি তোমাকে, তোমার দেহটাকে নয়। তুমি

কি মনে কর, তোমার দেহের একটা-কিছু হলে—রোগ হয়ে তোমার একটা হাত খসে গেলে তোমাকে আমি ভালবাসব না? তোমার কি কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে? তুমি যা ছিলে, তাই আছ। রোগ তোমার দেহের উপর অত্যাচার করে না? রোগ সেরে গেলে কেউ কি তা মনে করে কষ্ট পায়? মনে রেখো, আমাদের সম্পর্ক দেহ নিয়ে নয়। যতদিন মন আমাদের একনিষ্ঠ হয়ে পরস্পরে অনুরক্ত থাকবে, ততদিন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বাইরের কোন আঘাতই ভাঙ্‌তে পারবে না। মিছি-মিছি যা-তা ভেবে মনকে আর কষ্ট দিয়ো না।"

স্বামীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া নয়নতারা আনন্দে গর্ব্বে কাঁদিয়া ফেলিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "যখন নরাধমদের তাঁবু থেকে পালিয়ে আসি, তখন মনে ঠিক করেছিলুম, আমি আত্মহত্যা করব, এ পাপ মুখ লোক-সমাজে আর দেখাব না। কেন জানি না, ইচ্ছা হল, তোমাকে একবার শেষ দেখা দেখে যাই। তাই বাড়ীতে এলুম। কিন্তু এখন আর আমার কোন ক্ষোভ নেই, কোন লজ্জা নাই। তোমার চরণে যখন স্থান পেয়েছি, তখন আর আমার কিসের ভয়!"

৫

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া গেল, ভট্টাচার্য্যের বউ ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা দুই দিন নয়নতারার জন্য এতখানি শোক করিতেছিল, তাহারা কেহই এ সংবাদে এতটুকু আনন্দিত হইল না। বেচারী এখন কোথায় দাঁড়াইবে, সেই ভাবনাটাই সকলের কাছে এখন বড় হইয়া উঠিল। কারণ এটা ধ্রুব সত্য যে, তাহাকে সমাজে আর স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাছে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য স্নেহবশতঃ এমন-একটা কিছু করিয়া বসেন, যাহার জন্য হয় ত তাঁহাকে সমাজের কাছে জবাবদিহী করিতে হয়, তাই গ্রাম্য সমাজ পতিরা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া গেলেন যে ভগবান যাহার কপাল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, মানুষ তাহার আর কি করিতে পারে? পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে—সমাজের চেয়ে ত আর বউ বড় নয়!

কাজেই বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যকে অনেক কাসিয়া গলা ঝাড়িয়া অপর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পুত্রকে বলিতে হইল, "বাবা, দেখ, কি করব,—ধর্ম্ম মেনে, সমাজ মেনে ত চলতে হবে। তোমাদের অল্প বয়স, ও সবের ধার বড় ধার না। কিন্তু তাই বলে ত আর তোমাদের আমি সমাজচ্যুত করে রেখে যেতে পারি না। তোমার কপালে যখন ভগবান দুঃখ লিখেছেন, তখন তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না; নইলে অমন সোনার বউকে কেন ত্যাগ করতে হবে! বউমাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে বিদায় করে দাও,—বলে দাও, যেন বাকি কটা দিন ধর্ম্মে মন রেখে নবদ্বীপে বা কাশীতে কোথাও তিনি কাটিয়ে দেন।...আর দেখ, যাতে আজই তিনি চলে যান্, তারও বিহিত করে দাও। নইলে কে আবার কি বলবে, তার ঠিক নেই।"

এ কথা যে রমানাথকে শুনিতে হইবে,

তাহা সে জানিত এবং সে জন্য সে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াও রাখিয়াছিল। পূর্ব্ব রাত্রেই নিজের কর্ত্তব্য সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি অপরাধে তাকে ত্যাগ করতে আদেশ করছেন?"

পুত্রের প্রশ্নে পিতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি অপরাধ! কেন, সে যে এখন পতিতা!"

রমানাথের আজ বিদায়ের দিন; তাই সে আজ নিজের কথাগুলি বলিবার জন্য শুধু সুযোগ খুঁজিতেছিল। সে বলিল, "দুর্ব্বৃত্তেরা তার উপর বল প্রকাশ করেছে বলে পতিতা হল, সে! সে কি কোন অপরাধ করেছে যে, সমাজ তাকে শাসন করবে? দুঃখে অপমানে নিজেই সে মরে আছে, কোথায় সকলে তাকে সান্ত্বনা দেবে, তা না আরো মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছে!" বৃদ্ধ কহিলেন, "কি করবে! সমাজে থাকতে হলে—" রমানাথ বাধা দিয়া কহিল, "যে সমাজ শুধু বর্জ্জন করতেই জানে, মার্জ্জনা জানে না, সে সমাজ ভগবান আমার জন্য সৃষ্টি করেন নি।"

পুত্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ অবাক হইয়া রহিলেন। রমানাথ বিলম্ব না করিয়া পিতার সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিল।

* * * *

গভীর রাত্রে রমানাথ ও নয়নতারা গৃহ পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইল। নয়নতারা বলিল, "দেখ, তোমাকে আবার বলছি, আমার জন্য কেন তুমি সব ত্যাগ করবে? তুমি থাক, আমি একা যাই। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।"

রমানাথ বলিল, "তোমার অদৃষ্ট আর আমার অদৃষ্ট যে ভগবান একসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন, এ কথা তোমাকে কতবার বোঝাব? তুমি কি মনে কর, তুমি বিদেশে বিপাকে পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি এখানে বড় আরামে বাড়ীতে শুয়ে ঘুমোব?"

নয়নতারার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। স্বামীর পায়ে হাত রাখিয়া সে বলিল, "এত দিন তোমাকে চিনতে পারি নি। সত্যি বল্‌ছি, তুমি দেবতা!"

রমানাথ তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দেবতা নই নয়ন, শুধু তোমার স্বামী।"

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

কোষ্ঠী-বিচার

[পণ্ডিত-সম্রাট, শাস্ত্র-বিদাম্বর, শ্রীমৎ নবকুমার কবিরত্ন, জ্যোতির্ব্বিদী, ভৃগুভূষণ, মিহির-মহার্ণব, খনা-বচন-খনিত্র, বরাহ-বিদ্যা-বারিধি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি কৃতম্- সারম্বাং Sirস্য চিত্ত-চিকিৎসকস্য ডাক্তারস্য ঠাকুরোপাধিকস্য শ্রীরবীন্দ্রনাথস্য শুভ-কোষ্ঠী-বিচারম্।]

"নমো ভৃগুসংহিতায়ৈ নমঃ শ্রীভৃগবে নমঃ।
মুদ্রায়ৈ তু সমুদ্রায় সামুদ্রিকায় এবচ॥"

ভৃগুসংহিতাকে নমস্কার করি; শ্রীমদ্ ভৃগুকে নমস্কার করি; সামুদ্রিক বিদ্যাকে নমস্কার করি। সমুদ্রকে অর্থাৎ যিনি মুদ্রার সহিত বর্ত্তমান তাঁহাকে নমস্কার করি;

আর যাঁহারা ভুবনকে মোদিত করেন সেই শত্রুমর্দ্দন আনন্দবর্দ্ধন মুদ্রা-সকলকে আমি শত শত নমস্কার করি।

"গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী গোকুলানন্দ গো-গোপ-গোপিকা-কান্ত গোবিন্দ আমাকে গো-ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত জানিয়া কোনো মতেই আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না"—ইহা যোগবলে জানিয়াই যিনি শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন সেই লোকচরিত্রজ্ঞ বিজ্ঞবর ভৃগু-মুনিকে আমি নমস্কার করি। যিনি গণক-দিগের অগ্রণী ও ভৃগুসংহিতার জনক সেই শাস্ত্রদর্শী আদর্শপুরুষ ভৃগুমুনিকে আমি নমস্কার করি। দক্ষযজ্ঞে ভূতে যাঁহার দাড়ি উপড়াইয়াছিল সেই মুনিপুঙ্গব ভৃগুমুনির কৃপায় ভূত ভবিষ্যং সমস্তই আমি স্ফুট করিয়া, স্ফুটতর করিয়া নখ-দর্পণের ন্যায় দেখাইব। আপনারা একটু অবহিত হউন্।

১। জাতকের জন্ম বিশাখা নক্ষত্রান্বিত বৈশাখ মাস; বৈশাখ মাসে রবি মেষ-রাশিতে অবস্থিতি করেন। আবার জাতকের নামও হইবে রবি; সুতরাং তাৎকালীন গগনচারী রবির যে দশা ভূতলচারী রবিরও সেই প্রকার অবস্থা হইবে। রবি মেষ-রাশিতে ছিলেন, সুতরাং রাশীকৃত মেষের মধ্যে ইঁহাকে দিন যাপন করিতে হইবে। ইঁহার প্রতিভার স্ফুলিঙ্গে মধ্যে মধ্যে এই রাশীকৃত মেষে অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যাপী ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগিয়া যাইবে। তজ্জন্য ভেড়ারা অর্থাৎ গড্ডলিকারা ইঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। কিন্তু এই ভেড়াদের শৃঙ্গে পতিত হইলেও ইঁহার ধার কমিবে না, কারণ ভেড়ার শৃঙ্গে পড়িলে হীরাৎই ধার ভাঙে, রবির ভাঙে না। ভেড়ারা ভেড়া বলিয়াই রবিকে একখণ্ড প্রকাণ্ড হীরা বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু ইহা ভেড়াদের ভুল। সুতরাং গড্ডলিকার শৃঙ্গে পড়িলে রবির কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না, ভেড়ারই শিং পুড়িয়া যাইবে।

২। জাতকের জন্ম-সন বার-শত আট-ষট্টি। অর্থাৎ আট, ষাট, বার। বার—অর্থাৎ বারে বারে ইঁহাকে অস্ত্র ধরিতে হইবে, কলিতে কলম ধরিলেও চলিবে; কারণ কলিতে কলম-ধারীরাই অস্ত্রধারীদের স্থান অধিকার করিবে। ষাট—অর্থাৎ অন্ততঃ ষাট বৎসর কাল এই প্রকার যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতে লোকে ইঁহাকে কলমধারী জঙ্গীলাট বা ঐ প্রকার কিছু বলিবে; ঐ প্রকার একটা উপাধিও দিবে। আট—অর্থাৎ আট্‌কাইতে পারা অসম্ভব। বারে বারে কলম ধারণই ইঁহার ভবিতব্য।

৩। ইঁহার জন্ম-তারিখ পঁচিশে, আর্য্য-ভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্ত বলেন পাঁচকে পাঁচগুণে গুণিত করিলে পঁচিশ হয়। ইনি পাঁচজন লোককে গুণ করিবেন, অর্থাৎ পাঁচ রকম গুণের দ্বারা পাঁচ জনকে বশ করিবেন।

ইঁহার জন্ম-তারিখ পঁচিশে হওয়াতে ইঁহার মনের বয়স চিরকালই পঁচিশ থাকিবে, —পনের বছরেও পঁচিশ, পঁয়ষট্টি বছরেও পঁচিশ।

৪। জাতকের জন্মতিথি কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী! ইনি যে-কাজে হাত দিবেন তাহাতেই সিদ্ধিলাভ

হইবে। অন্যথা হইবে না। তবে ত্রয়োদশী কৃষ্ণ পক্ষীয় বলিয়া শাদার উপর কালি দেওয়াই ইহাঁর পক্ষে প্রশস্ত। শাদা কাগজে কালির আঁচড় টানিয়া ইনি যে পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করিবেন, ব্ল্যাক্-বোর্ডের উপর খড়ি পাড়িয়া আঁক কষিয়া অর্থাৎ মাষ্টারি করিয়া ইনি ঠিক সেই পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না।

পুনশ্চ— কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে জন্ম হওয়ায় জাতকের কখনো এককালীন এয়োদশটির বেশী অন্তরঙ্গ বন্ধুলাভ ঘটিবে না। শুক্লা ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে, তের দুগুণে ছাব্বিশ, এমন কি এককালীন তিন-তেরং উন-চল্লিশটি পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাইতে পারিতেন। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কেন এমন হয়? শাস্ত্র বলিতেছেন শুক্লে ও কৃষ্ণে অর্থাৎ গোরায় ও কালায় অনেক তফাৎ, সুতরাং ফলেরও তফাৎ হয়।

৫। জাতকের জন্ম-মাস বৈশাখ, বই হইয়াছে শাখা যাঁর তিনিই বৈশাখ। সুতরাং যাবচ্চন্দ্রদিবাকর এই বনস্পতির বই-রূপ শাখা বাহির হইবে। ভৃগুসংহিতায় ইহা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে।

৬। জাতকের জন্মকালীন চন্দ্র মীন-রাশিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন; মীন জলচর জীব; সুতরাং জাতকের যশোরূপ চন্দ্রমা জলচর জাতির মধ্যে যেরূপ প্রভা-জাল বিস্তার করিবে, স্থলচর মেষদিগের মধ্যে তদ্রূপ পারিবে না। এখানে জলচর শব্দ জলবেষ্টিত দ্বীপবাসীদিগের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারিবে। কারণ জলের নিকটে থাকিলেও জলবাসী অর্থাৎ জলচর বলা যায়। সর্ব্বশাস্ত্রের দ্বারস্বরূপ যে ব্যাকরণ-শাস্ত্র তিনিও এ কথায় সায় দিয়া থাকেন। "গঙ্গায়াং ঘোষ" কি না, ঘোষ মহাশয় গঙ্গায় বাসা বাঁধিয়াছেন, কি না গঙ্গাবাসী হইয়াছেন অর্থাৎ গঙ্গাতীরবাসী হইয়াছেন। এ-সমস্তই ব্যাকরণ-শাস্ত্রের কথা। সুতরাং অকাট্য। আমরা শাস্ত্র-পরায়ণ জাতি, শাস্ত্র লঙ্ঘন আমরা প্রাণান্তেও করি না, করিতে পারিও না। ছাগ মেষাদি যেমন ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইতে পারে না, আমরাও তেমনি শাস্ত্র ডিঙাইয়া কোনো কিছুতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। ইহা অস্মদ্দেশীয়ের ভবিতব্য। ইহাও ভৃগুসংহিতায় লেখা আছে— স্পষ্টাক্ষরেই লেখা আছে।

৭। মীনের ঠিক পাশের ঘরেই কুম্ভ। সুতরাং মৎস্য-লোকে কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইবামাত্র কুম্ভ-রাশির প্রভাবে কুম্ভ কুম্ভ অর্থাৎ ঘড়া ঘড়া টাকা গিনি বা মোহর প্রাপ্তির খুবই সম্ভাবনা। অন্ততঃ শাস্ত্রে এই প্রকারই লিখিত আছে। শাস্ত্রে যেরূপ দৃষ্টি করিতেছি সেইরূপই বলিতেছি। অপিচ শাস্ত্রই আমাদের চক্ষু। আর লোকে যাহাকে চক্ষু বলিয়া জানে তাহা রক্ত-মাংস-ময় পর-কোলা মাত্র। উহা তো কোলা-ব্যাঙেরও আছে, কুলী মজুরেরও আছে। আমরা শাস্ত্রব্যবসায়ী, বিশুদ্ধ শাস্ত্র জ্ঞানের সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া থাকি। স্থূল রক্ত-মাংসের ধার ধারি না।

৮। মেষ-রাশিস্থিত রবির মিত্রস্থান কর্কট। অর্থাৎ কর্কট রবির মিত্র। মেষ-গণ যখন রবিকে একখণ্ড বৃহৎ হীরা মনে

করিয়া ঐ হীরাতে নিজ নিজ শিং ঘষিতে আসিবে তখন কর্কট করজোড়ে অর্থাৎ দাড়াজোড়ে মিনতি করিবে; মিনতিতে ফল না হইলে কট্‌কট্ করিয়া শুনাইয়া দিবে। কট্‌কট্ করিয়া শুনাইয়া দেয় বলিয়াই উহার নাম কর্কট। ইহাতেও যদি গড্ডলিকা বিরত না হয় তবে দাড়া দিয়া ভেড়াদের গলা আঁকড়াইয়া ধরিবে। ইহা হইল চরমের ব্যবস্থা। কারণ কর্কট জলচর জীব, সহজে উহাদের রক্ত গরম হইবে না।

৯। মেষস্থ রবির বাণিজ্যস্থানে তুলা। জাতককে তুলাদণ্ড অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা ধরিতে হইবে। দাঁড়িপাল্লা ধরিয়া ইঁহাকে তুলা অথবা তত্তুল্য কোনো দ্রব্য অর্থাৎ কোমল-ভাবাপন্ন বস্তুর কারবার করিতে হইবে। তুলা মানে যদি নিথ্‌তি ধরা যায়, তবে ইনি ডাক্তার হইবেন। কারণ নিথ্‌তি হইল ডাক্তারীর প্রধান অঙ্গ। উহাতে করিয়াই ডাক্তারী ঔষধ ওজন করিতে হয়।

১০। ইহাঁর অর্থাৎ মেষস্থ রবির বিদ্যাস্থানে সিংহ। ইহাঁর বিদ্যায়, বোধ হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া শক্তির বাহন সিংহ ইহাঁকে খাতির করিবে, পিঠ পাতিয়া দিবে। ইনি যদি কখনো পশুশালা দেখিতে যান্ তবে ঐদিন উদ্যানস্থ সিংহসকল আনন্দে গর্জ্জন করিবে, আমার গণনা ভুল হইবার নয়।

১১। দশমে মকর, অর্থাৎ কর্ম্মস্থানে মকর। মকর হইল গঙ্গাদেবীর অন্তর্জলী (Submarine) বজরা; সুতরাং বজ্‌রায় থাকিয়া গঙ্গা বা তদ্বৎ কোনো বৃহতী নদীতে ইনি কর্ম্ম করিবেন। নির্জ্জলা মাঠে বসিয়া ইহাঁর কাজকর্ম্ম তেমন সুবিধার হইবে না। তবে যদি ঐ মাঠে মকরাকৃতি বজ্‌রা বা বজ্‌রাকৃতি ভবনে বাস করতঃ কার্য্যাদি করেন, তবে মন্দের ভাল হইবে।

১২। মেষস্থিত রবির আয়-স্থানে কুম্ভ, সুতরাং ইনি যক্ষের ধন পাইবেন। অর্থাৎ যে ধন যুগযুগান্ত ধরিয়া মালিকের অপেক্ষায় মাটির তলে আছে তাহা ইহাঁর করগত হইবে। জাতক যদি যশোধন হন, তবে ইনি কুম্ভসম্ভব অগস্ত্যের ন্যায় অনেকের যশোরূপ সমুদ্র নিঃশেষে পান করিয়াই যশোধন হইবেন।

১৩। জাতকের জন্ম দেখিতেছি সোমবারে, ইহা নিশ্চয়ই ঠিকুজীকারের ভুল। রবির জন্ম রবিবারেই নিশ্চিত। নিজের বার থাকিতে কেহ অন্যের বারে জন্মগ্রহণ করিতে যায় না। স্বকীয় গৃহ বর্ত্তমান থাকিতে বাবুই বিহঙ্গের বর্ষাভিষিক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়।

১৪। জাতকের জন্মনক্ষত্র—এক্ষণে দিনমান বলিয়া—ঠিক্ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। দিবাভাগে নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া অতি দুর্ঘট ব্যাপার। যাঁহারা যম-নিয়মাদি অভ্যাস-পূর্ব্বক যোগী হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা নিয়মিত কুক্কুটাণ্ড ও পলাণ্ডু ভক্ষণ করেন, কেবল তাঁহারাই দিনে তারা দেখিতে পান। যদি কুক্কুটাণ্ড ও পলাণ্ডু খাইতাম তবে আমিও দেখিতে পাইতাম। সম্প্রতি আবার যৌব-নান্তিক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধিসভায় নাম লিখাইয়াছি, সুতরাং ও-সব জিনিসের নাম আর মুখে আনা নয়। সুতরাং চোখের

তেজ কমিয়াছে। তদ্ভিন্ন ভৃগু দর্শিত পথে যাঁহারা বিচরণ করেন তাঁহাদের নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণ সমীচীন কিনা তাহাও বিচার্য্য। আপনারা বিস্মিত হইতেছেন? স্থির হউন্। যাহা বলি শ্রবণ করুন্। ভৃগুবংশীয় পরশুরাম জ্যোতিষ্কদিগকে গর্ব্বস্ফীত ও রোষদীপ্ত ক্ষত্রবন্ধু মনে করিয়া উহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করেন, তাহাতে উহারা "ন ক্ষত্র" অর্থাৎ "আমরা ক্ষত্রিয় নই অতএব আমাদের মারিবেন না" এইরূপ কাপুরুষোচিত উক্তির দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়াছিল। আমি এই কাপুরুষদের কোনো কথায় থাকিতে চাই না, উহাদের মুখদর্শন করিতে চাই না। সকালে উহাদের মুখ দেখিলে দিন ভাল যাইবে না। আর নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু কপালে তুলিবারই বা প্রয়োজন কি? নক্ষত্রবিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য তাহা তো ভৃগুমুনির পুঁথির মধ্যেই পাইব। আমি ঋষিদিগের আপ্তজ্ঞান হইতে অধিক জানিবার দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি না; আমি ম্লেচ্ছ নই।

সে যাহা হউক, আপনারা আমার কোষ্ঠী-বিচারের ক্ষমতা স্বচক্ষে দেখিলেন, স্বকর্ণে শুনিলেন। এক্ষণে নষ্ট-কোষ্ঠী সম্বন্ধে যাঁহাদের কৌতূহল আছে তাঁহারা গোপনে পান সুপারি ও পয়সা লইয়া একদিন একান্তে আমার সঙ্গে বাসায় দেখা করিবেন। আমি চটক-পক্ষীর নখ দেখিয়া আপনাদের সকলের জন্মনক্ষত্র বলিয়া দিব। পূর্ব্বাহ্ণে পঞ্জিকা দেখাইয়া দিন ক্ষণ দেখিয়া আসিবার আবশ্যকতা নাই। সামুদ্রিক গণনায় স-মুদ্র হইয়া আসিবেন, আমি আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। তবে, দেখুন, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে আসিবেন না, হিন্দুর ছেলের পক্ষে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে কোনো কাজ করা ভাল নয়। কারণ ঐ মুহূর্ত্তটার সঙ্গে ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মদের নাম সংযুক্ত আছে। ও সময়ে আসিলে আমার গণনা ফলিবে না।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

বেঙ্গলি

বিগত ৮ই মে বেঙ্গলি জাহাজের নামকরণ অনুষ্ঠানে আমরা নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভার কার্য্যবিবরণ অভিভাষণাদি তৎপর দিনই সংবাদপত্রপ্রমুখাৎ সকলে অবগত হইয়াছেন, কিন্তু তথায় সমবেত প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেদিন যে উৎসাহ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা যিনি সাক্ষাৎভাবে অনুভব না করিয়াছেন তাঁহাকে কথায় সে ভাব বুঝান অসম্ভব।

সভাদৃশ্য সে সুগম্ভীর সুমোহন! বৃহদাকার সুগোল সুদৃশ্য স্তম্ভাবলী শোভিত, চন্দ্রাতপশীর্ষ, সুসজ্জিত প্রিন্‌সেপ ঘাট-মণ্ডপে সপারিষদ গভর্ণর সাহেবের স্থান, তৎপার্শ্বে সামিয়ানার নিম্নে দর্শকমণ্ডলী সমাসীন, স্ত্রীপুরুষের

স্থান পৃথক। তাঁহাদের পার্শ্বে উন্মুক্ত ময়দানে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান খাকি-পোষাকধারী স্বেচ্ছাসেবক বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ। ইহারাই আহত সৈনিকদিগের সেবার জন্য বেঙ্গলি জাহাজে আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে।

বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চেহারারও কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! বাঙ্গালী বলিয়া আর চেনাই যায় না, অন্ততঃ আমি ত চিনিতে পারি নাই। শিখ বলিতে পারা যায় না, গুর্খাদল বলিয়াই ভ্রম হয়; অস্ত্রধারী হইলে এ ভ্রমটুকুও হইত না—অধিকাংশ যুবকই এমনি সুস্থ ও বলিষ্ঠকায়। যখন শুনিলাম ইহারাই স্বেচ্ছাসৈনিক—আমাদেরই দেশের ছেলে, তখন আনন্দে বুকটা যেন ভরিয়া উঠিল।

ইহারা অনেকেই বেশ ভদ্রঘরের সন্তান এবং উপার্জ্জনশীল; কোন না কোন আফিসের ক্লার্ক; কয়েকজন প্লীডারও ছিলেন। স্বদেশ, পরিবার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপার্জ্জন সমস্ত ছাড়িয়া বীরোচিত পরোপকার কার্য্যে আত্মদান করিতে প্রবাসে চলিয়াছেন। কে জানে ইহার পরিণাম কি? চোখে জল আসিল। কিন্তু সে আনন্দ-হিল্লোলের মধ্যে অশ্রুর স্থান নাহি আজ, নয়নের জল নয়নেই লীন হইয়া পড়িল।

সভাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, যাহারা বাঙ্গালীর ভীরু নাম দূর করিয়াছে তাহাদের সহিত একটা কথা না কহিয়া কি থাকা যায়! অবসর পাইবামাত্র নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইচ্ছা সুখে যাইতেছ ত?" এক বাক্যে উত্তর ধ্বনিত হইল "অবশ্য অবশ্য।" আকাশে প্রান্তরে জলে স্থলে সেই উৎসাহ-বাক্য শত উচ্ছ্বাসে যেন ছড়াইয়া মিলাইয়া পড়িল। আর গভর্ণর-প্রমুখ দলকে কি তাহার কথা স্পর্শ করে নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছিল। সেদিনকার উৎসাহে রাজা প্রজা জেতা বিজেতার সমীকরণ হইয়া গিয়াছিল তাই সেদিনটি বাঙ্গালির পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন।

একদিন বাঙ্গালী জাতির ভীরুতা অপবাদ কত ব্যঙ্গ কবিতার খোরাক জোগাইয়াছে—কিন্তু আজ! আজ হইতে ইতিহাস নূতন কাহিনী গাইবে; আজ যে প্রাণদানের জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে!

এই যে অল্প বয়সের বীরভাব—আত্মদানের ইচ্ছা—গভর্ণমেণ্ট যদি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইহাকে সুপথে চালিত করেন তবেই দেশের কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে ইহা সম্পূর্ণভাবে সার্থকতা লাভ করিতে পারে। আমাদের মনে হয় এই নীতিই রাজদ্রোহিতা নিবারণের একটি অমোঘ উপায়। যাহারা মরিতে চায় রাজকর্ম্মেই তাহারা মরুক না!

আসল কথা শুধু অস্ত্র বাঁধিলেই চলিবে না, ইচ্ছার গতি বাঁধা চাই। যখন অস্ত্র আইন ছিল না, যখন অবাধে সকলে অস্ত্র ব্যবহার করিতে পাইত তখন কয়জন ভদ্র-সন্তান খুন ডাকাতি করিত বা রাজদ্রোহী ছিল? রাজদ্রোহিতা বলিয়া একটা কথা তখন ভারতের—অন্ততঃ বাঙ্গালার আইন আদালতে উঠে নাই। আর এখন অস্ত্র আইন করিয়াও গভর্ণমেণ্ট অস্ত্র ব্যবহার নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

যে দিন গভর্ণমেণ্ট এই বীরভাবাপন্ন যুবকদিগকে সৈনিক করিয়া লইবেন, আমাদের বিশ্বাস, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে তাহারা গভর্ণমেণ্টের সহিত এক হইয়া পড়িবে। এবং কাজে-কাজেই তখন হইতে গভর্ণমেণ্ট-দ্রোহিতা অতীতের একটা কথা মাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গ্‌লার পুলিশ। পুলিশকে বিশ্বাস করিয়া এমন অকালেও গভর্ণমেণ্টকে কোন দিন অনুতাপ করিতে হইয়াছে কি? আর এক কথা, সৈনিক আইন বড় কড়া আইন; একবার তাহার পাশে বদ্ধ হইলে কোন যুবকের গতি-বিশৃঙ্খলারও ভয় নাই।

যেমন অধুনা এই যুদ্ধ উপলক্ষে ইংরাজ-রাজছত্রের নিম্নে বিলাতে ভারত সৈনিকে ইউরোপীয় সৈনিকে প্রাণের মিলন ঘটিয়াছে সেইরূপ বাঙ্গালী-সন্তানকে যুদ্ধে গ্রহণ করিলে এদেশেও রাজা প্রজার মধ্যে বিশ্বাসের ও কার্য্যের একটি প্রেমময় মহামিলন ঘটিবে। রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষেই ইহা কি মহালাভ নহে?

যাক্ সে কথা, কত বড় বড় লোকে এই প্রস্তাব লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন আর আমার ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রাদপি লোকের এ প্রসঙ্গ উত্থাপন বিড়ম্বনা মাত্র। তবুও মন যাহা বলে, মুখে তাহা বাহির হইয়া যায়।

গভর্ণর সাহেব জাহাজ দেখিয়া চলিয়া যাইবার পর আমরা জাহাজ দেখিতে গেলাম। জাহাজের বেঙ্গলি নামকরণ দেখিলাম সর্ব্বতোভাবে সার্থক! বেঙ্গলির ডাক্তার বাঙ্গালী, স্বেচ্ছাসেবক বাঙ্গালী, খালাসীরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালী। কাপ্তেন কেবল ইংরাজ—কিন্তু তিনি বাঙ্গালীর বেতনভোগী। জাহাজের সমস্ত খরচই শুনিলাম বাঙ্গালীর দান। কেনার খরচ, চালাইবার খরচ আসবাব পত্রের খরচ সবই বাঙ্গালীর; জাহাজের যে ইলেক্‌ট্রিক কারখানা তাহাও বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার কৃত; আর এত বড় একটা উদ্যোগের কর্ত্তা হইতেছেন সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী প্রমুখ বাঙ্গালীর দল। বাঙ্গালী নামের কলঙ্ক-কালিমা তাঁহারা আজ সর্ব্বজন সমক্ষে ক্ষালন করিলেন। তাঁহাকে অন্তরের সহিত আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

জাহাজের নীচের ডেক স্বেচ্ছাসেবকদিগের বাসস্থল, আর উপরের ডেক আহতদিগের উদ্দেশে শুভ্রবস্ত্রশোভিত খট্টাঙ্গে পূর্ণ। ডেকের আশে-পাশে শবালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদি।

উপর ডেকে যাইবার সিঁড়ি নিতান্ত ছোট, অনবরত দর্শক শ্রেণী সেই ক্ষুদ্র পথে উপর নীচে যাতায়াত করিতেছেন। আমরা যখন উপরে উঠিয়াছিলাম তখন ভিড় একটু কম ছিল,—নামিবার সময় দু একটি বাঙ্গালী যুবকের সহায়তা লইয়া নামিলাম। এইরূপ সহায়তা-দানেও তাহাদেরই বা কত উৎসাহ আর তাহা গ্রহণে আমাদেরই বা কত আনন্দ! দেশের ছেলে আজ দেশের মেয়েদের সম্মান রক্ষা করিতে শিখিয়াছে!

ইহার পর আমরা নীচে নামিয়া একটি ছোট ক্যাবিনে গিয়া বসিয়াছি হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করিয়া একটা শব্দ হইল। পাশের ক্যাবিনে দুএকজন ইংরাজ চা পান করিতেছিলেন, সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম

একজনের হাতের পেয়ালা নীচে পড়িয়া টুক্‌রা টুকরা হইয়া গিয়াছে! শুনিয়াছিলাম কাচভাঙ্গা কুলক্ষণ! হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

* * * *

আজ ২৩শে মে সকালে সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, বেঙ্গলি জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে! হা ভগবান! এত আনন্দের এত উৎসবের পরিণাম কি ইহাই! কাগজখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে আবার সেখানা তুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, লোক কেহ মরে নাই, সকলেই রক্ষা পাইয়াছে। কি সান্ত্বনা! ছেলেরা কেহই ভাগ্যক্রমে এ জাহাজে ছিল না; তাহারা অন্য পথে আগে হইতে সিলনে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এখন তাহারা কোথায় যাইবে? তাহাদের গতি কি?

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

সমালোচনা

সাহানা। শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও কেশবধাম শিবালা বেনারস সিটি হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। এখানি কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি বালিকা-কবির আট হইতে পনেরো বৎসর বয়সের রচনা।

চন্দ্রহাস-বিষয়া। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীকালীমোহন সোম, ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত। লেখক 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, জৈমিনি ভারত হইতে তিনি গ্রন্থের উপাখ্যান-ভাগ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ৺রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত 'চন্দ্রহাস' নামক নাট্যগ্রন্থ হইতেও কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছেন। উপাখ্যানের বিষয়টি এদেশে সম্ভবতঃ সকলেরই জানা আছে, কিন্তু লেখার দোষে বিষয়টি এমন নির্জ্জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে দেখিলে কষ্ট হয়। তবে বাঁধানোর জলুসে ও ছাপার চটকে পাঠকের তাক্ লাগাইবার জন্য যথেষ্ট আয়াস করা হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তাহার সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। আড়ম্বরের চাপে শিল্প মারা পড়িয়াছে। গ্রন্থে ছবিও কয়েকখানি দেওয়া হইয়াছে—সেগুলিরও ছাপা এবং পরিকল্পনা জঘন্য। অর্থাৎ বইখানি দেখিলে ভীমের গদার কথাই মনে পড়ে—এমন ভারী জিনিস পাঠকের পানে উঁচাইতে নাই!

অম্বা। নাট্যকাব্য। আলো ও ছায়া প্রণেতৃ প্রণীত। কলিকাতা, রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ৭৫।১।১ নং হারিসন রোড। ১৯১৫। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। 'আলো ও ছায়া' বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'আলো ও ছায়া' যে হাতের লেখা, 'অম্বা'ও সেই হাতের। 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হইবার দেড় বৎসর পরে লেখিকা অম্বা রচনা করেন। অর্থাৎ সে আজ চল্লিশ বৎসরের কথা। লেখিকার প্রতিভা তখন পূর্ণ বিকশিত। 'অম্বা'তে সে প্রতিভার ছাপ আছে। তবে 'অম্বা'কে নাটকের বিভাগে না ফেলিয়া আমরা ইহাকে কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহি। নাটকের কার্য্য-গতির হিসাবে ধরিলে, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে, অম্বায় সে কার্য্য-গতি একটু 'শ্লো'—মৃদু! তবে কাব্যের উপাদান ইহাতে আছে। 'অম্বা'র চরিত্রটুকু লেখিকা সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—উপেক্ষিতা নারীর সকল

তেজ, সকল শক্তি, তাহার হৃদয়ের ভীষণ দ্বন্দ্ব লেখিকার সুদক্ষ তুলিকায় সজীব হইয়াছে। আমাদের চোখের সম্মুখে তেজস্বিনী আর্য্য রমণীর—শুধু আর্য্য রমণী কেন,—রমণীমাত্রেরই হৃদয়ের যে ছবিটুকু জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা জীবন্ত, তাহা প্রাণময়! তুলির দুই-চারিটা মাত্র রেখায় আদর্শ-চরিত ভীষ্মের যে পরিচয়টুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সুন্দর! অম্বা ভীষ্মের উপর প্রতিশোধ-গ্রহণে তৎপর হইলে মহাদেব অম্বাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীষ্মের প্রতি এ বিদ্বেষ কেন? অম্বা উত্তর দিলেন,

"দেহ-বলে গেছিল যে পরের লাগিয়া
কিনিতে নারীর প্রেম, তার ঔদ্ধত্যের
দিতে চাই ন্যায় দণ্ড।"

অবশ্য মহাভারত-কার এ-সকল যুক্তি বা কারণের উল্লেখ করেন নাই। এ যুক্তি 'অম্বা' কাব্য-প্রণেতৃর স্বকপোল-কল্পিত; সুন্দর! মহাদেব অম্বাকে ভীষ্ম-বধের অস্ত্র দিলেন; কিন্তু ভাবিয়া-চিন্তিয়া অম্বা তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। অম্বা কহিলেন,

"দেব, বৃথা অস্ত্রলাভ।
রমণী-হৃদয়ে মোর রমণী-সুলভ
শান্তিরস নিশিদিন করে সঞ্চরণ,
নীরবে, নিভৃত-তলে; উপরে আস্তৃত
প্রতিহিংসা বালুস্তর-সম। শুষ্ক কর
এই অন্তঃশীলা নদী, নহিলে পারি না
ভীষ্মেরে করিতে নাশ। রমণীর দেহে
দেহ পুরুষের মন, নির্ম্মম নিষ্ঠুর;
হস্ত কর বজ্রসার। যদি নারীদেহে
ঘৃণা করি, পুরুষত্ব না চাহে আসিতে,
দয়া করি দাও মোরে পুরুষের দেহ;
পুরুষ পুরুষ সাথে করিব সংগ্রাম।"

তাই পর-জন্মে অম্বার শিখণ্ডীতে পরিণতি! বলিতে কি, এইখানেই কবির পরীক্ষা—সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি শেষ-রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। নারী যতই কেন প্রতি-হিংসা-পরায়ণা হৌন্ না কেন, তিনি নারীই। লেখিকা এইখানে নারী-চরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার শক্তির পরিচয়। মোটের উপর, অম্বা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই বেশ মনোরম হইয়াছে।

ওঁ পিতা নোঽসি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীহরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ৬।১নং দ্বারকা-নাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। এখানি দার্শনিক গ্রন্থ। লেখক বেশ সহজ ও সরলভাবে নিত্য-প্রত্যক্ষ যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এই গ্রন্থে মঙ্গলময় ঈশ্বরের পিতৃত্বের আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে শাস্ত্রাদির বচন অপেক্ষা সংসারের ঘটনা-পরম্পরার উপরই লেখক অধিক নির্ভর করিয়াছেন, তাহার ফলে সম্পাদ্য বিষয়টুকু জনসাধারণের পক্ষেও সহজবোধ্য হইয়াছে।

দারিদ্র্য ও সমবায়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ-চন্দ্র পুরকায়স্থ, এম-এ প্রণীত। সিলেট, করিমগঞ্জ ন্যাশন্যাল পাবলিশিং এজেন্সি লিমিটেড্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ আনা। আদম-সুমারীর বিবরণ হইতে লেখক এ দেশে দারিদ্র্যের আলোচনা করিয়া তাহা নিরাকরণের পক্ষে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফলও হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থের একান্ত অভাব; সমবায় সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া আমাদিগের জানা নাই। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের এ চেষ্টা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য, সন্দেহ নাই। তবে এ দেশের মাটির নিন্দা এমন সুপ্রচলিত, এবং সম্প্রতি কয়েকটি গুরুতর কার্য্যে লাঠালাঠিরও এতখানি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে যে জন-সাধারণের এদিকে সন্দেহ থাকাও অপরাধের বিষয় নহে। যাহা হৌক, গ্রন্থ-খানিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে—এ গ্রন্থের সমধিক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কাহিনী। শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত প্রণীত। ঢাকা, ভারত-মহিলা যন্ত্রে মুদ্রিত। মৈমনসিং, মুক্তাগাছা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। এখানিতে কয়েকটি 'সত্য ভূতের গল্প'

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'ভূতভয়গ্রস্ত' দেশে ভূতের গল্পের প্রচার সম্বন্ধে সাধারণ্যে মতদ্বৈধ থাকিলেও এদিকে যাঁহারা আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের নিকট এ কাহিনী একেবারে নিরর্থক হইবে না। তবে কৌতূহল রসের অবতারণায় লেখকের শক্তি বড়ই অল্প। গল্প সত্য হইলেও লেখকের তাহা বলিবার একটা ভঙ্গী থাকা প্রয়োজন; ইহাতে সেই-টুকুরই অভাব। ভাষা নিতান্তই আড়ষ্ট হইয়া আছে। আর একটা কথা, গল্পগুলি সবই বিদেশীয়ের অনুবাদ। এ দেশের গল্প ইহাতে একটিও নাই! থাকিলে জমিত ভাল!

স্বাভাবিক যোগ। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস প্রণীত। কলিকাতা, নব্যভারত প্রেসে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, "আমি শৈশবে পিতৃহীন। অসহায় দরিদ্রাবস্থায় নানাপ্রকার দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলে আমার এমন কোন সংস্থান ছিল না যে তদ্দ্বারা পাশ্চত্য বিদ্যার আলোকে একটু দাঁড়াইতে পারি। প্রৌঢ় কালেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিভাগ নিবন্ধন শিক্ষাসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের টোলে সংস্কৃত-অধ্যয়নের কোন সুযোগ ছিল না।" তাই 'শাস্ত্রশিক্ষা-বিহীন' গ্রন্থকার 'স্বাভাবিক যোগ' লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রন্থে 'প্রাণী ও প্রাণ', 'সাধন' 'জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি' 'ত্যাগ বা সন্ন্যাস', 'ধ্যান, সমাধি', 'ব্রহ্মসূত্র' প্রভৃতির তিনি আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মত কতখানি গ্রাহ্য, তাহা বিবেচ্য হইলেও গ্রন্থখানি পাঠ করিলে লেখকের চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বল্লাল-চরিত। (সমালোচনা) শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। জেলা ফরিদপুর হাবাসপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ললিত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। লেখক বলেন, "রাজা বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথাদি সামাজিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছে, ভালমন্দ সমস্ত কার্য্যই বল্লালসেন দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে; এবং যে জাতির যে মনঃক্ষোভ তাহা বল্লালসেনের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেদের ত্রুটি পরিহারের চেষ্টা করিতেছেন। যুগীগণ বল্লালসেনকেই আপনাদের পাতিত্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য বল্লালের শিক্ষক গোপাল ভট্টের নামসংযুক্ত আনন্দভট্টের দ্বারা প্রকাশিত এক বল্লালচরিত মুদ্রিত করিয়াছেন। আবার সুবর্ণবণিকগণ আপনাদের বৈশ্যত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য শরণ দত্তের রচনা সম্বলিত আনন্দ ভট্টের দ্বারা লিখিত আর একখানি বল্লালচরিত প্রকাশিত করিয়াছেন। যুগীগণ গ্রন্থের প্রামাণিকতা দেখাইবার জন্য বল্লালের শিক্ষক গোপালভট্টকে খাড়া করিয়াছেন। সুবর্ণবণিকগণ * * শরণ দত্তকে উপস্থিত করিয়াছেন।" গ্রন্থকার তাঁহার এই গ্রন্থে প্রমাণাদির সাহায্য উক্ত উভয় সাক্ষীই যে জাল তৈয়ারী সাক্ষী তাহাই প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে শৃঙ্খলার একান্ত অভাব। মূল গ্রন্থদুইখানি পাঠের সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই, এবং এ সমালোচনাও তেমন সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত নয় বলিয়া আমরা কোনদিকে রায় দিতে পারিলাম না। তবে গ্রন্থকার যদি ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া সংযতভাবে যুক্তি-তর্ক খাড়া করিতেন, তবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থই বল্লাল সম্বন্ধে প্রামাণ্যস্বরূপ গৃহীত হইতে পারিত। তাঁহার যখন তথ্য সংগ্রহে এমন পারদর্শিতা রহিয়াছে, তখন তিনি নিজে বল্লাল সম্বন্ধে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়া, উভয় পক্ষের মিথ্যা জল্পনা ছিন্ন করিয়া, ঐতিহাসিক সত্য প্রচার করিলেই ভাল হইত বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

সুরভি। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা একমি প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, পি, চৌধুরী ৭৫।১।১ হ্যারিসন রোড। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। লেখকের কয়েকটি খণ্ড কবিতা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে; তাহার মধ্যে কয়েকটি কবিতা পূর্ব্বে 'প্রবাসী', 'মানসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ছাপা কাগজ ভালো।

সরলা। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মডর্ণ বুক ডিপো, ৬৩।১ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। লেখক 'ভূমিকায়' বলিয়াছেন, "কোন এক বন্ধুর উপরোধে তাঁহার দূরস্থিতা এক নিঃসন্তান বিধবা আত্মীয়ার পাঠের জন্যই ইহার রচনা হয়। * * আদর্শ বিধবার চিত্র অঙ্কন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।" এ গ্রন্থখানিকে কিছুতেই উপন্যাস বলা যায় না। লেখক নিজে ইহার নাম দিয়াছেন, "কথা-গ্রন্থ।" গ্রন্থখানি কতকটা উপদেশের মত। লেখকের রচনা-কৌশল ইহাতে আদৌ নাই।

অদৃষ্ট-লিপি। শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এ গ্রন্থে লেখিকার চারিটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথম গল্প 'অদৃষ্ট-লিপির' নামেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। গল্পগুলি সুলিখিত। লেখিকার ভাষা বেশ সরল, আড়ম্বরহীন। গল্পগুলি চিত্র-হিসাবে সুন্দর, সুপাঠ্য। তবে ছোট গল্পের আর্টের দিক দিয়া এগুলির বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, মানব-চিত্তের বিশেষ কোন ভাব গল্পগুলিতে লীলায়িত হয় নাই, চরিত্রগুলিতেও বিশেষত্ব বড় নাই। 'অদৃষ্ট-লিপি' গল্পটিতে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত 'কাহাকে' উপন্যাসের ছায়া এতখানি আসিয়া পড়িয়াছে, যে 'অদৃষ্ট-লিপি'র নিজের কোন স্বাতন্ত্র্যই পাঠকের চোখ পড়িবে না। যাহা হৌক, গ্রন্থখানি যে সুখ্যপাঠ্য হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নবীনা। শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ সরকার প্রণীত। নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত মূল্য পাঁচ আনা। এখানি "সংসার-চিত্র", অর্থাৎ উপন্যাস। ইহার রুচি জঘন্য, ভাষা জঘন্য, ভাব জঘন্য। লেখকের ধৃষ্টতা অসাধারণ।

গো-ধন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কিশোরগঞ্জ হইতে শ্রীনবীনচন্দ্র গোপ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, চেরি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য রাজ সংস্করণ আড়াই টাকা; সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা। ইহা গোজাতি-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব-সম্বলিত একখানি সচিত্র গ্রন্থ। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ, এবং সুলিখিত। গো-দুগ্ধের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন কথা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। গো-পালন ভারতবাসীর সখের ও আদরের বস্তু; বাঙ্গালীর ত বটেই। সম্প্রতি গাভীর দুর্দ্দশার সহিত বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যেরও যে অবনতি ঘটিতেছে, সে বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। এই গ্রন্থে শিক্ষিত গ্রন্থকার বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গোজাতির রক্ষণ ও তাহার চিকিৎসা এবং গব্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অমূল্য। নানাদেশীয় গাভীর আলোচনাও বাদ পড়ে নাই। এখনও বহু সম্পন্ন গৃহস্থ গো-পালন-বিষয়ে মনোযোগী-; অনেকে Dairy খুলিবার পক্ষেও উদ্যোগী; অথচ উভয়েরই পক্ষের গো-জাতি সম্বন্ধে সকল তত্ত্ব জানা থাকার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কি ব্যবসায়, কি গৃহস্থালী, উভয় দিক হইতেই গো-জাতির সম্বন্ধে এই সকল বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলে না—আনাড়ির হাতে সকল জিনিষেরই পঞ্চত্ব-লাভ ঘটিয়া থাকে। গ্রন্থখানি সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে লেখক গবাদি সম্বন্ধে আলোচনা ও গোজাতির উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে 'গোজাতীয় পশুর শ্রেণী বিভাগ', তৃতীয় খণ্ডে 'বৃষাদির বিশেষ বিবরণ', চতুর্থ খণ্ডে 'গোপালন', পঞ্চম খণ্ডে 'গব্য', ষষ্ঠ খণ্ডে 'গব্যয়ী' ও সপ্তম খণ্ডে 'গোজাতির রোগ ও চিকিৎসার' আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানির উপকারিতা খুবই। গ্রন্থকারের অধ্যবসায় ও এই হিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহার এতখানি আয়াস প্রকৃতই প্রশংসার্হ। এ গ্রন্থ নির্জ্জীব স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙ্গালীমাত্রেরই গৃহে গৃহে বিরাজ করুক, ইহাই আমাদিগের কামনা।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



শ্রিয়ং পরার্ধ্যাং বিদধদ্ বিধাতৃজিৎ
তমো নিরস্যন্নভিভূতভানুভৃৎ।
নুদন্নিদাঘং জিতচারুচন্দ্রমাঃ
স বন্দ্যতেঽর্হন্ ইহ যস্য নোপমা ॥

তিব্বতীয় চিত্র হইতে

অধ্যাপক সমাদ্দারের অনুমত্যনুসারে

Engraved & Printed by
K.V. SEYNE & BROS.

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]　　　শ্রাবণ, ১৩২২　　　[৪র্থ সংখ্যা

সন্ধ্যায়

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মাণিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে
গেঁথে নিলেম তারে
এই ত আমার বিনিসূতার গোপন গলার হারে।
চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে
এই যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নতশিরে
নির্ম্মাল্য তোমার
আকাশ হয়ে পার ;
ঐ যে মরি মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়া তরী ;
ঐ যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি
রাতের আঙিনায়
ঘুমে আলস কায় ;
ঐ যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুন ধূলি নিল সে বিদায় ;
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে ;
তোমার অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু।
এমনি করেই, প্রভু
এক-নিমেষের পত্রপুটে ভরি'
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি !

২৭ মাঘ। পদ্মা।　　　　শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নালক

১

শিষ্যেরা যেখানে সিদ্ধার্থকে একা ফেলে চলে গেছে—উরাইল বনের সেদিকটা ভারি নির্জ্জন। ঘন ঘন শাল বন সেখানটা দিন রাত্রি ছাওয়া করে রেখেছে। মানুষ সেদিকে বড় আসে না; দুএকটা হরিণ আর দু দশটা কাঠ্‌বেরালী শুকনো শাল-পাতা মাড়িয়ে খুস্‌ খাস্‌ চলে বেড়ায় মাত্র।

এই নিঃসাড়া নিরালা বনটির গা দিয়েই গাঁয়ে যাবার ছোট রাস্তাটি অঞ্জনার ধারে এসে পড়েছে। নদীর ধারেই একটি প্রকাণ্ড বট গাছ;—সে যে কত কালের তার ঠিক নেই। তার মোটা মোটা শিকড়গুলো উঁচু পাড় বেয়ে অজগর সাপের মত সটান জলের উপরে ঝুলে পড়েছে। গাছের গোড়াটি কালো পাথর দিয়ে চমৎকার কোরে বাঁধানো। লোকে দেবতার স্থান বোলে সেই গাছকে পূজো দেয়। ফুল-ফলের নৈবেদ্য সাজিয়ে নদীর ওপারের গ্রাম থেকে মেয়েরা যখন খুব ভোরে নদী পার হয়ে এদিকে আসে তখন কোনো কোনো দিন তারা যেন দেখতে পায় গেরুয়া কাপড়-পরা কে একজন গাছের তলায় বসে ছিলেন, তাদের দেখেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন! কাঠুরেরা কোনো কোনো দিন কাঠ কেটে বন থেকে ফিরে আসতে দেখে গাছের তলা আলো কোরে সোনার কাপড়-পরা দেবতার মত এক পুরুষ! সবাই বোল্‌তো নিশ্চয় ওখানে দেবতা থাকেন কিন্তু দেবতাকে স্পষ্ট করে কেউ কোনোদিন দেখেনি—'পুন্না' ছাড়া। মোড়লের মেয়ে সুজাতা বিয়ের পরে একদিন ওই বটগাছের তলায় পূজো দিতে গিয়ে পুন্নাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই মেয়েকে সে মোড়লের ঘরে আর-একটি মেয়ের সমান মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়েস দশ বছর। সুজাতার ছেলে হয়নি তাই তিনি পুন্নাকে মেয়ের মত যত্ন কোরে মানুষ করেছেন, আর মানত করেছেন যদি ছেলে হয় তবে এক বছর বটতলায় রোজ একটি ঘিয়ের পিদিম্‌ দিয়ে নতুন বছরের পূর্ণিমায় ভাল করে বটেশ্বরকে পূজো দেবেন।

সুজাতার ঠাকুর সুজাতাকে একটি সোনার-চাঁদ ছেলে দিয়েছিলেন তাই পুন্না রোজ সন্ধ্যা-বেলা একটি ঘিয়ের পিদিম্‌ দিতে এই বটতলায় আসে। আজ এক বছর সে আসছে, কোনো দিন কোনো দেবতাকে কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কখনো সে আসবার আগেই ছাওয়ার মত দেবতার মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলিয়ে যেত, কখনো বা সে গাছের তলায় পিদিম্‌টি রেখে যখন একলা পায়ে হেঁটে নদীপার হয়ে ফিরে চলেছে তখন দেখ্‌তো যেন দেবতা এসে সেই পাথরের বেদীর উপরে বসেছেন!

আজ শীতের কমাস ধরে পুন্না ছাওয়ার মত—যেন পাতলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেবতাকে দেখছে, এ কথা সে সুজাতাকে বলেছিল—আর কাউকে না। সুজাতা

সেইদিন থেকে পুন্নাকে দেবতার জন্যে আঁচলে বেঁধে দুটি করে ফল নিয়ে যেতে বোলে দিয়েছিলেন, আর বোলে দিয়েছিলেন যদি দেবতা কোনো দিন স্পষ্ট করে দেখা দেন, কি কথা কন্ তবে যেন পুন্না বলে —দেবতা! আমার সুজাতা মাকে আমার বাবাকে আমার ছোট ভাইটিকে আর আমার মোড়লদাদাকে ভাল রেখো,—বড় হলে আমি যেন একটি সুন্দর বর পাই।

এমনি করে পুন্নার হাত দিয়ে সুজাতা দুটি করে ফল সেই বটতলায় পাঠিয়ে দিতেন। তিনিও জান্‌তেন না, পুন্নাও জান্‌তেন না যে সিদ্ধার্থ রোজ সন্ধ্যাবেলা সেই বটতলায় ঠাণ্ডা পাথরের বেদীটির উপরে এসে বসেন। আজ বছরের শেষ; কাল নতুন বছরের পূর্ণিমা। পুন্না আজ সকাল করে পাঁচটি পিদিম্, পাঁচটি ফল থালায় সাজিয়ে একটি নিজের নামে একটি ভায়ের নামে একটি মায়ের নামে একটি বাপের আর একটি মোড়লদাদার নামে সেই বটগাছের তলায় সাজিয়ে রাখছে। বিকেল-বেলায় সোনার আলো বটগাছের তলাটিতে এসে লেগেছে। রোদে-পোড়া বালির চড়ায় জলের দাগ টেনে বয়ে চলেছে—অঞ্জনা নদীটি। ওপারে দেখা যাচ্ছে অনেক দূর পর্য্যন্ত ধানের ক্ষেত, তার মাঝে মাঝে আম-কাঁঠালের বাগানে ঘেরা ছোট ছোট গ্রামগুলি—মাটির ঘর, খড়ের চাল, একটা পাহাড় সে কতদূরে দেখা যাচ্ছে মেঘের মত। নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা; সবুজ সাড়ির সাদা পাড়ের মত সরু সোজা। সেই রাস্তায় চাষার মেয়েরা চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। তাদের পরণে রাঙা সাড়ি, হাতে রূপোর চুড়ি, পিঠের উপর ঝুলি-বাঁধা কচি ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে হাত দুটি মুঠো করে। একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস নদীর দিক থেকে মুখে এসে লাগলো—একটা চিল অনেক উঁচু থেকে ঘুরতে ঘুরতে আস্তে আস্তে একটা গাছের ঝোপে নেমে গেল।

পুন্না দেখছে বেলা পড়ে এসেছে। বালির উপর দিয়ে চলে আস্‌ছে অনেকগুলো কালো মোষ; একটার পিঠে মস্ত একগাছ লাঠি-হাতে বসে রয়েছে গোয়ালাদের ছেলেটা। সে রোজ সন্ধ্যাবেলা মোষের পিঠে চড়িয়ে পুন্নাকে মোড়লদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। আজও তাই আসছে। অনেক দূর থেকে সে ডাক্ দিচ্ছে—আরেরে পুন্নারে! ছেলেটার নাম সোয়াস্তি। পুন্না তার গলা পেয়েই তাড়াতাড়ি পিদিম্ পাঁচটা জ্বালিয়ে দিয়েই যেদিক দিয়ে সোয়াস্তি আসছিল সেইদিকে চলে গেল।

তখন একখানি সোনার থালার মত পূবদিকে চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠেছে। পুন্না আর সোয়াস্তি মোষের পিঠে চড়ে বালির চড়া দিয়ে চলেছে। উঁচু পাড়ের উপর বটতলাতে ঝিক্ ঝিক্ করছে পুন্নার দেওয়া পিদিমের আলো। সেই আলোয় সোয়াস্তি পুন্না দুজনেই আজ স্পষ্ট দেখলে গেরুয়া বসন-পরা দেবতা এসে গাছের তলায় বসেছেন—পাথরের বেদীটিতে!

পুন্নাকে তাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি চলে গেল। সুজাতা তখন গোরু-বাছুর গোয়ালে বেঁধে ছেলেটিকে ঘুম

পাড়িয়ে সকালের জন্যে পূজোর বাসন গুছিয়ে রাখছেন। পুন্না এসে বল্লে—মা, আজ সত্যি দেবতাকে দেখেছি। কাল খুব ভোরে উঠে যদি তুমি সেখানে যেতে পার তো তুমিও দেখতে পাবে। সোয়াস্তি আমি দুজনেই দেখেছি। কিন্তু ঠাকুরের কাছে কিছু চেয়ে নিতে ভুলে গেলুম মা।

সুজাতা বল্লেন—যদি মনে পড়ত তবে কী চাইতিস্ পুন্না? সোয়াস্তির সঙ্গে তোর বিয়ে হোক্—এই বুঝি?

পুন্না তখন পালিয়েছে। সুজাতা পূজোর সমস্ত গুছিয়ে রেখে যখন ঘরে গেলেন পুন্না তখন ছোট ভাইটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুজাতার চোখে আজ আর ঘুম নেই;—রাত থাকতে তিনি পুন্নাকে ডেকে তুলেছেন। পুন্না গোয়ালের দরজা খুলে এক কোণে একটি পিদিম্ জ্বালিয়ে গোরুগুলিকে দুইতে বসেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গোরুগুলির শীত লেগেছে, তারা একটু ভয় খেয়েছে, চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে—এত রাত্রে কে দুধ নিতে এল?—কিন্তু পুন্না যেমন তাদের পিঠে বাঁ হাতটি বুলিয়ে নাম ধরে ডাকছে অমনি তারা স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুজাতা উঠোনের এক কোণে একটি উনুন জ্বালিয়ে দিয়ে কুয়োর জলে স্নান করতে গেলেন। পুন্না দুধটুকু দুয়ে একটি ধোয়া কড়ায় সেই উনুনের উপরে চাপিয়ে দিলে;—দুধ টক্‌বগ করে ফুটতে লাগলো। সুজাতা ধোয়া কাপড় পোরে পুন্নাকে এসে বল্লেন—তুই গোটাকতক ফুল তুলে আন্, আমি দুধ জ্বাল দিচ্ছি।

মোড়লদের বাড়ির ধারেই বাগান; সেখানে গাঁদা ফুল অনেক। পুন্না সেই ফুলে একটা মালা গেঁথে বটের পাতায় একটু তেল সিঁদুর পূজোর থালায় সাজিয়ে রেখে সুজাতাকে ডাকচে—মা, চলো, আর দেরী কল্লে সকাল হয়ে যাবে; দেবতাকে দেখতে পাবে না। সুজাতা জ্বাল-দেওয়া টাট্‌কা দুধটুকু একটি নতুন ভাঁড়ে ঢেলে পুন্নার হাতে দিয়ে বল্লেন—তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পূজোর থালা আর মন্নুয়াকে নিয়ে যাই।—সুজাতার ছেলের নাম মন্নুয়া।

ভোরের অন্ধকারে গাঁয়ের পথ একটু একটু দেখা যাচ্ছে। পুন্না চলেছে আগে আগে দুধের ভার নিয়ে ঝুমুর ঝুমুর মল বাজিয়ে, সুজাতা চলেছেন পিছনে পিছনে ছেলে কোলে পূজোর থালাটি ডান হাতে নিয়ে। পুন্নার সঙ্গে একলা যেতে সুজাতার একটু একটু ভয় করছিল। সোয়াস্তিদের বাড়ির কাছে এসে সুজাতা বল্লেন—ওরে সোয়াস্তিকে ডেকে নে না!—সোয়াস্তিকে আর ডাক্‌তে হোলো না, সে পুন্নার পায়ের শব্দ পেয়েই একটা লাঠি আর একটা আলো নিয়ে বেরিয়ে এল। তিন জনে মাঠ ভেঙে চলেছেন। তখনও আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে,—রাত পোহাতে অনেক দেরী কিন্তু এরি মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের জমা ঘুঁটের ধোঁয়া সাদা একখানি চাঁদোয়ার মত ক্রমে ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলু বনের ভিতর দু একটা তিতির, বকুল-

গাছে দু একটা শালিক এরি মধ্যে একটু একটু ডাকতে লেগেছে। একটা ফটিং পাখী শিস্ দিতে দিতে মাঠের ওপারে চলে গেল। ছাতারেগুলো কিচ্‌মিচ্ ঝুপ্ ঝুপ্ করে কাঁঠাল গাছের তলায় নেমে পড়ল। আলো নিভিয়ে সুজাতা আর পুন্না‌কে নিয়ে সোয়াস্তি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। তখন দূরের গাছ পালা একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পারে দাঁড়িয়ে সুজাতা দেখছেন—বটগাছের নীচে যিনি বসে রয়েছেন—তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আভা বনের মাথায় আধখানা আকাশ আলো করে দিয়েছে সকালের রঙে।

১০

সুজাতা, পুন্না মনের মত করে পূজো দিয়ে সিদ্ধার্থের আশীর্ব্বাদ নিয়ে চলে গেছে। সোয়াস্তি কিন্তু কিছু তাঁকে দিতে পারে নি তাই সে সারাদিন নদীর ধারে একলা বসে অনেক যত্নে কুশিঘাসের একটি আসন বুনে নদীর জলে সেখানি ঠাণ্ডা করে সিদ্ধার্থকে দেবার জন্যে এসেছে। সিদ্ধার্থ তখনও সে বটতলাতে আসেন নি। সোয়াস্তি কুশাসনখানি বেদীর উপর বিছিয়ে দিয়ে মনে মনে সিদ্ধার্থকে নমস্কার করে নদী-পারে চলে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়; সিদ্ধার্থ অঞ্জনায় স্নান করে সোয়াস্তির দেওয়া কুশাসনে এসে বসলেন। জলে ধোয়া কুশ-ঘাসের মিষ্টি গন্ধে তাঁর মন যেন আজ আরাম পেয়েছে। পূর্ণিমার আলোয় পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত আজ যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন—স্পষ্ট পরিষ্কার। পাথরের বেদীতে কুশাসনে বসে সিদ্ধার্থ আজ প্রতিজ্ঞা করলেন এ শরীর থাক্ আর যাক্ দুঃখের শেষ দেখবোই দেখ্‌বো; —সিদ্ধ না হয়ে বুদ্ধ না হয়ে এ আসন ছেড়ে আর উঠেছিনে;—বজ্রাসনে অটল হয়ে সিদ্ধার্থ আজ যখন ধ্যানে বসে বল্লেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগাস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্যং বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

তখন 'মার'—যার ভয়ে সংসার কম্পমান, যে লোককে কুবুদ্ধি দেয় কুকথা বলায় কুকর্ম্ম করায়—সেই 'মারের' সিংহাসন টল্ মল্ করে উঠল। রাগে মুখ অন্ধকার করে 'মার' আজ নিজে আস্‌ছে মার-মার-শব্দে বুদ্ধের দিকে। চারিদিকে 'মারের' দলবল আজ জেগে উঠেছে! তারা ছুটে আসছে যত পাপ যত দুঃখ যত কালি যত কলঙ্ক যত জ্বালা যন্ত্রণা মলা আর ধূলা জলস্থল-আকাশে দিকে-বিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। পূর্ণিমার আলোর উপরে কালোর পরদা টেনে দিয়েছে—'মার'! সেই কালোর ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ চেয়ে রয়েছে—যেন একটা লাল চোখ, তা থেকে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর উপর আলোর বদলে রক্ত-বিষ্টি! সেই রক্তের ছিটে লেগে তারাগুলো নিভে নিভে যাচ্ছে।

আকাশকে এক হাতে মুঠিয়ে ধরে পাতালকে একপায়ে চেপে রেখে 'মার' আজ নিজ মূর্ত্তিতে সিদ্ধার্থের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে উড়ছে রাঙা চাদর —যেন মানুষের রক্তে ছোপানো! তার কোমরে ঝুলছে বিদ্যুতের তলোয়ার, মাথায়

মুকুটে দুল্‌ছে 'মারের' প্রকাণ্ড একটা রক্ত-মণির দুল, তার কানে দুল্‌ছে মোহন কুণ্ডল তার বুকের উপরে জ্বল্‌ছে অনল-মালা—আগুনের সুতোয় গাঁথা। বুক ফুলিয়ে 'মার' সিদ্ধার্থকে বল্‌ছে—বৃথাই তোমার বুদ্ধ হতে তপস্যা!—'উত্তিষ্ঠ'—ওঠো—'কামেশ্বরোঽস্মি'—'আমি 'মার'! ত্রিভুবনে আমাকে জয় করে এমন কেউ নেই! 'উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ মহ্যবিষয়স্থং বচং কুরুষ্ব'—ওঠো, চলে যাও, আমাকে জয় করতে চেষ্টা করোনা, আমার আজ্ঞাবাহী হয়ে থাক; ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য তোমায় দিচ্ছি, পৃথিবীর রাজা হয়ে সুখভোগ কর; তপস্যায় শরীর ক্ষয় করে কি লাভ? আমাকে জয় করে বুদ্ধ হওয়া কারো সাধ্যে নাই।

সিদ্ধার্থ 'মারকে' বল্লেন—হে 'মার' আমি জন্ম জন্ম ধরে বুদ্ধ হতে চেষ্টা করছি তপস্যা করছি, এবার বুদ্ধ হব তবে এ আসন ছেড়ে উঠবো, এ শরীর থাক্‌ বা যাক্‌ এই প্রতিজ্ঞা—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগাস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

তিনবার 'মার' বল্লে—'উত্তিষ্ঠ'—ওঠো, চলে যাও, তপস্যা রাখ! তিনবারই সিদ্ধার্থ বল্লেন—না! না! না!—'নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিকট হুঙ্কার দিয়ে তখন আকাশ ধরে টান্‌ দিলে 'মার'! তার নখের আঁচড়ে অমন যে চাঁদে-তারায় সাজানো নীল আকাশ সেও ছিঁড়ে পড়ল শত টুকরো হয়ে—একখানি নীলাম্বরী সাড়ির মত। মাথার উপরে আর চাঁদ নেই, তারা নেই; রয়েছে কেবল মহাশূন্য, মহা অন্ধকার! মুখ মেলে কে যেন পৃথিবীকে গিল্‌তে আস্‌ছে! বোধ হল তার কালো জিভ্‌ বেয়ে পৃথিবীর উপর পড়ছে জমাট রক্তের মত কালো নীল! 'মার' সেই অন্ধকার মুখটার দিকে ফিরে দেখেছে কি আর বিদ্যুতের মত দুপাটি সাদা দাঁত শূন্যে ঝিলিক্‌ দিয়ে কড়মড় করে উঠেছে; আর হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেই সর্ব্বগ্রাসী মুখের ভিতর থেকে 'মারের' দলবল। যোগাসন থেকে বুদ্ধদেবকে টেনে ফেল্‌তে পৃথিবীর উপরে নেমে আস্‌ছে 'মারের' দল; চন্দ্র সূর্য্য ঘুরছে তাদের হাতে দুটো যেন আগুনের চরকা! দশদিক অন্ধকার করে ঘুরতে ঘুরতে আস্‌ছে—'মারের' দল ঘুর্ণি বাতাসে ভর দিয়ে, পৃথিবী জুড়ে ধূলার ধ্বজা উড়িয়ে। তারা শূন্য থেকে ধূমকেতু গুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেল্‌ছে আগুনের ঝাঁটার মত! পৃথিবী থেকে গাছগুলোকে উপড়ে, পাহাড় গুলোকে মুচ্‌ড়ে নিয়ে বন্‌-বন্‌ শব্দে ঘুরিয়ে ফেলছে তারা চারিদিক থেকে অনবরত শিলাবৃষ্টির মত; লক্ষ লক্ষ ক্ষেপা ঘোড়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে 'মার'-সৈন্য বুদ্ধদেবের চারিদিকে! তাদের খুর থেকে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে, তাদের মুখ থেকে রক্তের জলন্ত ফেণা আঁজলা আঁজলা ছড়িয়ে পড়ছে—সেই বোধিবটের চারিদিকে, সেই পাথরের বেদীর আশে পাশে। উরাইল বনের প্রত্যেক গাছটি পাতাটি ফুলটি এমনকি ঘাসগুলিও আজ জ্বলে উঠেছে; জলন্ত

রক্তে অঞ্জনার জল ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুনে মাথা। বিদ্যুতের শিখায় তলোয়ার শাণিয়ে মশাল জ্বালিয়ে দলের পর দল যত রক্তবীজ তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ছে আজ বুদ্ধদেবের উপরে। তাদের আগুন নিশ্বাসে আকাশ গলে যাচ্ছে বাতাস জ্বলে যাচ্ছে, পৃথিবী দেখা যাচ্ছে—যেন একখান্ জ্বলন্ত কয়লা ঘুর্ণি বাতাসে ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে; তার মাঝে জ্বলন্ত একটা তাল গাছ ঘুরিয়ে 'মার' ডাকছে—হান্ হান্! পায়ের নখে রসাতল চিরে জেগে উঠেছে মহামারী। আজ 'মারের' ডাকে রসাতলের কাজল অন্ধকার কাঁথার মত সর্ব্বাঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে আর্ত্তনাদ করে ছুটে আসছে—সে 'মারী'! তার ধুলো-মাথা কটা চুল বাতাসে উড়ছে—আকাশ-জোড়া ধূমকেতুর মত! দিকে দিকে শোকের কান্না উঠেছে, ত্রিভুবন থরথর কাঁপছে! মহামারীর গায়ের বাতাস যেদিকে লাগ্ল সেদিকে পাহাড় চূর্ণ হয়ে গেল, পাথর ধুলো হয়ে গেল, বন উপবন জ্বলে গেল, নদী সমুদ্র শুকিয়ে উঠলো। আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না! সব মরুভূমি হয়ে গেছে, সব শুয়ে পড়েছে, সব নুয়ে পড়েছে, জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে, ধুলো হয়ে ছাই হয়ে উড়ে গেছে! জগৎ-জুড়ে উঠেছে 'মারীর' আর্ত্তনাদ, 'মারের' সিংহনাদ, আর শ্মশানের মাংস-পোড়া বিকট গন্ধ!

তখন রাত এক প্রহর। মারের দল, মারীর দল উল্কামুখী শেয়ালের মত, রক্ত-আঁখি বাদুড়ের মত মুখ থেকে আগুনের হল্কা ছড়িয়ে চারিদিকে হাহা হুহু কোরে ডেকে বেড়াচ্ছে, কেঁদে বেড়াচ্ছে! আকাশ ঘুরছে মাথার উপর, পৃথিবী ঘুরছে পায়ের তলায় ঘর্ঘর শব্দে,—প্রকাণ্ড জাঁতার পাথর দুখানা যেন বুদ্ধদেবকে পিষে ফেল্তে গুঁড়িয়ে ফেল্তে চেষ্টা করছে! 'মার' দুহাতে দু'টো বিদ্যুতের মশাল নিয়ে বুদ্ধদেবকে ডেকে বল্ছে—পালাও পালাও এখনও বল্ছি তপস্যা রাখ। বুদ্ধদেব 'মারের' দিকে চেয়েও দেখছেন না, তার কথায় কর্ণপাতও কচ্চেন না! 'মারের' মেয়ে 'কামনা' তার ছোট দুই বোন ছলাকলাকে নিয়ে বুদ্ধদেবের যোগ ভঙ্গ করতে কত চেষ্টা করছে—কখনো গৌতমী মায়ের রূপ ধরে, কখনো যশোধরার মত হয়ে বুদ্ধের কাছে আজ হাত জোড় করে কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে! তাঁর মন গলাবার ধ্যান ভাঙবার চেষ্টায় কখনো তারা স্বর্গের বিদ্যাধরী সেজে গান গায়, নাচ করে কিন্তু কিছুতেই বুদ্ধদেবকে ভোলাতে আর পারে না। বজ্রাসনে আজ তিনি অটল হয়ে বসেছেন, তাঁর ধ্যান ভাঙে কার সাধ্য! যে 'মারের' তেজে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পমান, যার পায়ের তলায় ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, জল স্থল আকাশ,—সেই 'মারের' দর্প চূর্ণ হয়ে গেল আজ বুদ্ধের শক্তিতে! 'মার' আজ বুদ্ধের একগাছি মাথার চুলও কাঁপাতে পাল্লে না, সেই অক্ষয়বটের একটি পাতা, সেই পাথরের বেদীর একটি কোণও খসাতে পাল্লে না! বুদ্ধের আগে 'মার' একদণ্ডও কি দাঁড়াতে পারে! বুদ্ধের দিকে ফিরে দেখবারও তার সাহস নেই! দুই হাতের মশাল নিভিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে 'মার' আস্তে আস্তে পালিয়ে গেছে—নরকের নীচে—ঘোর অন্ধ-

কায়ে—চারিদিক কালো করে দিয়ে! বুদ্ধদেব সেই কাজল অন্ধকারের মাঝে নির্ভয়ে একা বসে রয়েছেন ধ্যান ধরে পহরের পর প্রহর।

রাত শেষ হয়ে আস্‌ছে কিন্তু 'মারের' ভয়ে তখনও পৃথিবী এক একবার কেঁপে উঠছে;—চাঁদও উঠ্‌তে পারছে না, সকালও আস্‌তে পারছে না। সেই সময়ে ধ্যান ভেঙে 'মারকে' জয় করে সংসার থেকে ভয় ঘুচিয়ে বুদ্ধ দাঁড়ালেন। তিনি আজ সিদ্ধ হয়েছেন, বুদ্ধ হয়েছেন, দুঃখের শেষ পেয়েছেন। ডান হাতে তিনি পৃথিবীকে অভয় দিচ্ছেন, বাঁ হাতে তিনি আকাশে দেবতাদের আশ্বাস দিচ্ছেন। তাঁর সোনার অঙ্গ ঘিরে সাত রঙের আলো! সেই আলোতে জগৎসংসার আনন্দে জয় জয় দিয়ে জেগে উঠেছে—নতুন প্রাণ পেয়ে নতুন সাজে সেজে। বুদ্ধের পায়ের তলায় গড়িয়ে চলেছে নৈরঞ্জন নদীটি একূলে ওকূলে শান্তিজল ছিটিয়ে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্রোতের ফুল

(৩১)

বিপিন যখন প্রেমানন্দ স্বামীর আকর্ষণী শক্তিতে মন্ত্রস্তম্ভিতের মতো হইয়া বিশ্বসংসার ভুলিতে বসিয়াছিল, সংসার কিন্তু তখন তাহাকে ভুলিয়া থাকে নাই।

বিপিন মালতীকে লইয়া চলিয়া আসিলে হরিবিহারী ও গিন্নি উভয়েই পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গিন্নি দুর্ব্বলের বল অনাথের নাথ লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রত্যহ একশ-আটপাত তুলসী ও ডবল ভোগ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং রামলাল আচার্য্যকে ডাকাইয়া ডাইনি মালতীর দিক হইতে বিপিনের মন ফিরাইবার জন্য গ্রহশান্তির আয়োজন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য-ঠাকুর সময় বুঝিয়া যে লম্বা চওড়া ফর্দ্দ দিলেন তাহাতে কনকধুস্তুরের ফুল, অরুণবর্ণ অশ্ব, নীলবস্ত্র, কম্বল, মৃগমদ ও নবরত্ন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে দেশে দেশে লোক ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

হরিবিহারী তাঁহার বুদ্ধির ভাঁড় নিবারণকে ডাকিয়া অনন্তর-করণীয় সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিবারণ পরামর্শ দিল মালতীর শ্বশুরবাড়ীতে এবং বিপিনকে দুখানি পত্র দেওয়া হোক। মালতীর ভাশুরকে লেখা হোক বিধবার বিবাহ কুলত্যাগেরই সামিল; ইহাতে তাহাদের কুলের কলঙ্ক, বংশের অপমান; তাহাদের উচিত ইহা রোধ করা, টাকা যত লাগে তাহা হরিবিহারী দিবেন। এবং বিপিনকে এই মর্ম্মে চিঠি লেখা হোক যে মালতীকে তাহার ভালো লাগিয়া থাকে বেশ ত, মালতী তাহার কাছেই থাকুক, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না; বিবাহ যদি করে তবে তাহাকে ত্যাজ্য-পুত্র করা হইবে।

হরিবিহারী এই সৎপরামর্শে আনন্দিত হইয়া দু-জায়গাতেই চিঠি লিখিলেন এবং বিপিনের চিঠিতে স্বয়ং বুদ্ধি খরচ করিয়া আর এক লাইন যোগ করিয়া দিলেন যে বিপিন যদি শীঘ্রই বাড়ী ফিরিয়া না যায় তাহা হইলে নিবারণ-পুত্র পটলার সহিত বিনির বিবাহ দিবেন।

বিপিনের চিত্ত যখন সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে দোল খাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সে পিতার চিঠি পাইল। একে সে ভাবপ্রবণ উত্তেজনাশীল প্রকৃতির লোক, তাহার উপর প্রেমানন্দের প্রবল প্রভাব তাহাকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই অবস্থায় বিপিন এই চিঠি পাইয়া লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে পাগল হইয়া পিতাকে যে চিঠি লিখিল তাহা পড়িয়া হরিবিহারীর মতন নিশ্চেষ্ট লোকও নিজে উদ্যোগী হইয়া উকিল ডাকাইয়া বিপিনকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বিপিন পিতৃসংসারের সহিত সম্পর্ক একেবারে চুকাইয়া একরকম নিশ্চিন্ত হইল। এক একবার তাহার মায়ের জন্য বড়ই মন-কেমন করিত। কিন্তু সে তাহা দমন করিয়া ভাবিত গুরুদেব তাহাকে একে একে বন্ধন-মুক্ত করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে সব দিক ঠিক হইয়া যাইবে। এক একবার বিনির ভাগ্যের কথা মনে করিয়া তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিত, কিন্তু তাহার পিতামাতাই যদি তাহার শত্রুতাচরণ করেন তবে সে আর কতদিন সংগ্রাম করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে। না, না, এসব চিন্তা আর না, ইহাতে শুধু বিক্ষেপ, শুধু অশান্তি, শুধু আধ্যাত্মিক অবনতি। বৈরাগ্যমেবাভয়ম্—বিরতিই চরম সুখ।

মালতীর ভাসুর এতদিন ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধে দিব্য উদাসীন ও পরম নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু এখন হরিবিহারীর পত্রে যত টাকা লাগে পাইবার প্রত্যাশায় অকস্মাৎ তাহার বধূর প্রতি মমতা ও কুলমর্য্যাদার প্রতি সতর্কতা অত্যন্ত কঠোরভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তারকের বাড়ী সন্ধান করিয়া বাহির করিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গেরুয়া রঙের একখানি মলিদার চাদর মুড়ি দিয়া দরজার ধারে একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া বসিয়া তারক মালাজপ করিতেছিল, ঝুলির ছিদ্র দিয়া শীর্ণ তর্জ্জনী অঙ্গুলীটি সোজা হইয়া বাহির হইয়া ছিল, আঙুলের অষ্টধাতুর তারের পুঁটে দেওয়া আংটিটি চকচক করিতেছিল। এমন সময়ে মালতীর ভাসুর মুকুন্দ একটা কালো কাশ্মীরার কোটের উপর একটা চেক আলোয়ান মাথা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া আসিয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিল—মশায় এটা কি তারক বাবুর বাড়ী?

তারক বলিল—হাঁ, আপনি কি চান? আপনি?

—আমাকে চিন্তে পারবেন না। আমি আসচি বারাসাত থেকে, আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।—বলিয়া মুকুন্দ দুই হাতে গায়ের কোট ও আলোয়ান কোমরের কাছে গুটাইয়া তারক যে বেঞ্চিতে বসিয়া ছিল সেই বেঞ্চিতে বসিতে গেল। তারক অমনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ হাঁ করেন কি? করেন কি?

মুকুন্দ থতমত খাইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিল—কেন হয়েছে কি? কথা কটা বল্‌তে হবে তাই একটু বসব।

তারক বলিল—দেখছেন না আমি মালা জপ করছি?…

—তাতে কি? আমি ত ব্রাহ্মণ।

—হোন না কেন ব্রাহ্মণ। পায়ে জুতো আছে ত? জুতো পরে আমার মালা ছোঁবেন?

—আচ্ছা, না হয় নাই ছুঁলাম। আমার কথা অল্প, আমি দাঁড়িয়েই বলে যাই। …আমি শুনলাম মথুরাপুরের জমিদারের ছেলে বিপিন বাবু এখানে আছেন?

—হাঁ আছেন ত?

—তাঁর সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক এসেছে?

—হাঁ, তার নাম মালতী। তাকে বিপিন বিয়ে করবে বলে।

—আমি সেই মালতীর ভাসুর। আমার ভাদ্দর্‌-বৌকে আমি বাড়ীতে না রেখে দূর করে দিয়েছিলাম কেন জানেন? আমি কি আর আমার ভাইয়ের বিধবা বৌকে একবেলা দুটি হবিষ্যি দিতে পারতাম না? আমি কি এমনি কশাই মশাই? কিন্তু তাকে ভদ্রলোকে ঘরে ঠাঁই দিতে পারে না, এমন সে। বুঝতে পারছেন ত কথাটা?

তারকের মালাজপ স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। সে বিস্মিত হইয়া তাহার বসা গাল আরো তুবড়াইয়া বলিল—অ্যাঁ বলেন কি? তাকে ত বেশ চুপচাপ লক্ষ্মীটির মতো দেখতে।

মুকুন্দ বলিল—ঐ ত, ঐখানেই ত ওর বাহাদুরী; ধরবার ছোঁবার জোটি নেই…

—তা আপনি কি করতে চান?

—আমি যখন শুনলাম যে সে আপনার বাড়ীতে এসে আছে তখন মনে করলাম নিশ্চয় ভদ্রলোক না জেনে অমন নষ্ট মেয়েমানুষকে নিজের পরিবারে ঠাঁই দিয়েছেন; কিন্তু আমাদের ত উচিত নয় তাঁকে ঠকানো। যদিও নিজের ঘরের কুচ্ছো বলতে নিজেরই মুখ হেঁট হচ্ছে, কিন্তু…

তারক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—না না না, তা আপনি খুব ভালো কাজই করেছেন। আপনি—হেঁ হেঁ—দাঁড়িয়ে রইলেন যে…বসুন বসুন এই বেঞ্চিতেই বসুন, আমি ত এখন আর মালাজপ করছিনে।…তা আমি বিপিনকে বলব।

মুকুন্দ বেঞ্চিতে বসিয়া বলিল—বলব নয়, মেয়েটাকে দূর করে দেবেন। আপনাকে তবে একটা গোপনীয় কথা খুলেই বলি, আপনাকে ভালো মানুষ বলেই ত ঠেকছে, আবার আপনি বিপদে-টিপদে পড়বেন?

বিপদের নাম শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া তারক দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিক ঠাওরেছেন, আমি একেবারে নেহাত ভালো মানুষ। সংসারের মার-পেঁচ কিছুই বুঝিনে। বিপদ-টিপদের কথা কি বলছেন…শুনে আমার গা কাঁপছে। দোহাই…আপনার নাম জানিনে…মালতীর ভাসুর মশায়, আমাকে বাঁচান!

মুকুন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল—সেই জন্যেই ত আমার গাঁটের পয়সা খরচ করে এতদূর

আসা।…শুনুন সব খুলে বলি।…আমি পুলিশ-আদালতে নালিশ করেছি যে বিপিন আমার ভাদ্দরবৌকে ফুসলে বার করে এনেছে। আর হাইকোর্টে দরখাস্ত করেছি বিয়েটা যাতে রদ হয়, আর মালতী যাতে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে থাকে। হাজার হোক কূলের বৌ ত সে, অমনি চোদ্দটা বিয়ে করে বেড়াবে সেটা ত আমাদেরই লজ্জার কথা। লোকে বলবে ঐ মুকুন্দ মজুমদারের ভাইয়ের বৌ। কি বলেন আপনি? তাই বলছি, আপনার বাড়ীতে শেষে কি পুলিশের হাঙ্গামা হওয়া ভালো হবে?

মুকুন্দ তারকের গা ঠেলিয়া দিল। তারক পুলিশ ও আদালতের নামে ভীত হইয়া মুকুন্দর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না না মশায় দোহাই আপনার, আপনি ত ব্রাহ্মণ, পায়ের ধূলো মাথায় দিন, আমার বাড়ীতে পুলিশ-হাঙ্গামা করবেন না। আমি আজই এই রাত্রেই ওদের তাড়িয়ে দেবো।

মুকুন্দ বলিল—তা ত আপনি দেবেনই আমি জানি, হাজার হোক আপনি ভদ্রলোক ত। কিন্তু আপনাকে আরও একটা কাজ করতে হবে, ওরা কোথায় যায় তার খোঁজটি আপনাকে রাখতে হবে; নইলে পুলিশ যখন ওদের সন্ধান পাবে না তখন আমি বলে দেবো আপনিই ওদের লুকিয়ে রেখেছেন। বুঝেছেন ত?

তারক বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ খুব বুঝেছি। আমি রাখব রাখব খবর রাখব!

—আচ্ছা তবে বসুন। আমি আসি। --বলিয়া মুকুন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারকও উঠিয়া বলিল—একটা কথা বলতে ভয় হচ্ছে, একবার একটু এই অধমের বাড়ীতে পা ধুয়ে গেলে ভালো হত না।

মুকুন্দ বলিল—না না, সে আজ থাক, আপনার সঙ্গে ত আমার পরে আরও দেখা হবে।

তারক মনে মনে বলিল—না দেখা হলেই ভালো হত।—প্রকাশ্যে বলিল—আজ্ঞে আজ্ঞে তা ত বটেই…আচ্ছা তবে প্রণাম।

মুকুন্দকে বিদায় করিয়া দরজায় খিল দিয়া তারক বাড়ীর ভিতর গেল এবং উদ্বেগ-জড়িত কণ্ঠে স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—কৈ গো কোথায় গেলে?

তারকের স্ত্রী রান্নাঘরে রুটি সেঁকিতেছিল, মালতী রুটি বেলিয়া দিতেছিল, এবং ডেরিডায়রি পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি কান্নাকাটি করিয়া হাট বাধাইয়া তুলিয়াছিল। তারকের ডাক শুনিয়া তাহার স্ত্রী উৎকর্ণ হইয়া ছেলেদের ধমক দিয়া বলিল—আঃ থাম না তোরা একেবারে হাট বাধিয়ে তুলেছিস! কিছু কি শোনবার জো আছে ছাই। উনি বোধ হয় ডাকছেন।…

ছেলেরা সব ক্ষণেকের জন্য সন্ধি করিয়া চুপ করিল। তখন আবার তারকের আহ্বান শোনা গেল—ওগো শুনচ?

মালতী বলিল—হ্যাঁ তারক বাবুই ডাকছেন।

একটা ছোট মেয়ে মাতার বাহুর পাশ দিয়া মাথা গলাইয়া স্তনপান করিতেছিল; সেটাকে সরাইয়া দিতেই সে তারস্বরে হাতপা ছুড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

তাহার সেই সরব আন্দোলন ও আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তারকের গৃহিণী খুন্তি হাতে করিয়াই বাহির হইয়া আসিল, তাহার গায়ে কাপড়টা পৈতের মতো জড়ানো, আগুন-তাতে ছিল বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা নয়; স্বামীর আহ্বানে বাঁ হাতে আঁচলের একটা খুঁট মাথার মাঝখানে একটু তুলিয়া দিয়াছিল কিন্তু পশ্চাতের খোঁপাটা বাহির হইয়াই ছিল। সে স্বামীর সম্মুখীন হইয়া বলিল—কেন? কেন ডাকছ?

—ঐ যে বৌটি বিপিনের সঙ্গে এসেছে তার ভাসুর এসেছিল। তিনি বল্লেন বৌটির চরিত্তির ভালো নয়, সেই জন্যেই তাঁরা ওকে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছিলেন, আমাকেও বলে গেলেন আজকে রাত্রেই দূর করে দিতে; না দিলে পুলিস এসে হাঙ্গাম করবে। বৌটি ত ওখানে আছে, তাকে বল।

তারকের স্ত্রীকে কিছু বলিতে হইল না, মালতী সব শুনিতেছিল। একজন অপরিচিত পুরুষের মুখে নারীর এই চরম অপমানের কথা শুনিয়া মালতীর চোখ মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল এবং এই মাঘমাসের রাত্রেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল।

তারকের স্ত্রী গালে হাত দিয়া ঘাড় কাত করিয়া স্বামীকে বলিল—ওমা বল কি গো? শেষকালে কি পরের দায়ে আমাদের হাতে দড়ি পড়বে নাকি? এতগুলি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে কি শেষে পথে ভাসব?—ওগো ভালো মানুষের ঝি, শুনছ তোমার গুণের কথা। বেরোও আমার বাড়ী থেকে এখনি এই দণ্ডে।

তারকের স্ত্রী ঘনঘন খুন্তি সঞ্চালন করিয়া মালতীকে বারবার দ্বার নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। মালতী তেজস্বিনী মেয়ে, সে একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার পাত্র নয়। সে এতদিন এ বাড়ীতে আছে, তারক তাহাকে দেখে নাই, তাহার গলা শুনে নাই। আজ অপমানের আঘাত পাইয়া উদ্ধত ফণিনীর মতন সে বাহিরে আসিয়া বলিল—ভয় নেই আপনাদের। বিপিনবাবু ফিরে এলেই চলে যাব।

মালতী উহাদের আর গ্রাহ্য না করিয়া দ্বিতলে গিয়া আপনার ও বিপিনের সমস্ত সামগ্রী গুছাইয়া লইতে লাগিল। তারক বিপিনের প্রতীক্ষায় বাহিরে আসিয়া শীতে জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া হি হি করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে বিপিন আসিয়া দরজার কড়া নাড়িল। তারক উঠিয়া দরজার খিল খুলিয়া দিয়াই বিনা ভূমিকায় হঠাৎ বলিল—এ তোমার ভারি অন্যায়।

বিপিন হাসিয়া বলিল—হাঁ ভাই একটু রাত হয়ে গেছে। গুরুজীর সঙ্গে আজ অনেক সুন্দর সুন্দর কথা হল। খেয়ে নিয়ে বলব তোমায়।

তারক বিরক্তির স্বরে বলিল—না না বক্তৃতা শোনবার জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে না। এ তোমার কি অন্যায় ব্যাভার?

বিপিন তারকের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—কি বলছ? কি অন্যায় করেছি?

—আমার বাড়ীতে একটা বেশ্যা এনে রেখেছ!

বিপিন দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া ঘুসি তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল—দেখ্ তাড়কা রাক্ষুসী, এক ঘুসিতে তোর ঐ মূলোর মতো দাঁতগুলো ঝরিয়ে একেবারে বাকরোধ করে দেবো! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে জানো না ষ্টুপিড!

তারক কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—এ ত আমার ভারি বিপদ হল দেখছি। মালতীর ভাসুর এসে বলবে তোমায় পুলিশে দেবো, তুমি বলবে ঘুসি মারব?...

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—মালতীর ভাসুর?

—হ্যাঁ। সেই ত এসে এইসব বলে গেল?

—কি বলে গেল বল।—বলিয়া বিপিন তারকের হাত ধরিয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিল। তারক দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতো আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনর্গল সমস্ত কথা বলিয়া গেল। বিপিন চুপ করিয়া শুনিল। সে চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় মালতী সেখানে আসিয়া বলিল—বিপিনবাবু, শিগগীর একখানা গাড়ী ডাকুন; এ বাড়ীতে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন?

বিপিনও বুঝিতেছিল, আত্মসম্মানবোধ যাহার আছে তাহার এ বাড়ীতে আর এক দণ্ডও থাকা উচিত নয়। কিন্তু সে এই রাত্রে এই সুন্দরী রমণীকে সঙ্গে লইয়া যায় কোথায়? বিপিন মহাসমুদ্রে পড়িয়া কূল পাইতেছিল না, সে যে সংসার-ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সম্পূর্ণ অসহায়। সে কাতরভাবে মালতীর মুখের দিকে চাহিল। মালতীর চক্ষু দুটি বড় হীরার সূচীর মতো জ্বলিতেছিল। মালতী বলিল—চুপ করে ভাবছেন কি? চলুন।

বিপিন হতাশভাবে বলিল—মালতী কোথায় যাব?

মালতী জোরের সহিত বলিল—সে ভাবনার সময় এখন নেই, একখানা গাড়ী ত ডাকুন। ঘণ্টা-হিসেবে গাড়ী করবেন; গাড়ী পথে পথে নিয়ে বেড়াবে। সেই সময়ে যা হয় একটা ঠিক করে ফেলা যাবে।

বিপিন যন্ত্রচালিতের ন্যায় নিজেই গাড়ী ডাকিতে বাহির হইল। তাহাদের চিরপুরাতন ভৃত্য নিধিরাম যে পাশের ঘরে পড়িয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অচেতন আছে, একথা তখন তাহার মনে আসিল না। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিপিনের মনে হইল আজ যেন কলিকাতার সমস্ত গ্যাসের আলো ধূম ও কুয়াশা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে, অজগরের মতো পথগুলা পথ ভুলাইবার জন্যই যেন অসংখ্য শাখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, অট্টালিকার অরণ্য রুদ্ধ-দ্বার অর্গল বাহুদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া দুটি গৃহহীন নরনারীর দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিপিন একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ঘণ্টা-হিসাবে ভাড়া করিয়া আনিল। তারপর সমস্ত জিনিষ তারকের বাড়ীর একটা ঘরে গুছাইয়া রাখিয়া শুধু একটা বিছানার মোট ও একটা কাপড়ের ট্রাঙ্ক গাড়ীর মাথায় চাপাইয়া বিপিন ও মালতী অভুক্ত অবস্থাতেই গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। কেহ একবার বলিল না, খাইয়া গেলে ভালো হইত। এতগুলা রুটি যে ন দেবায় ন ধর্ম্মায় নষ্ট হইল এজন্য তারকের স্ত্রী কয়লার উনানের আঙারের মতন গনগন করিতে লাগিল। এবং ছেলেটাকে চড় কসাইয়া

মেয়েটার কথা নিংড়াইয়া সে এক মহামারি কুরুক্ষেত্র গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিল।

এই গোলমালে নিধিরামের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে তাহার মুনিবদের গাড়ীতে চড়িতে দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের পুঁটুলিটি বগলে করিয়া গাড়ীর কোচবাক্সে আপনার স্থান করিয়া লইল। তারক জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

বিপিন বলিল—যমের বাড়ী।

তারক ভাবিল, তাইত। সে জায়গাটার সন্ধান ত পুলিশের ভয়েও করা মুস্কিল এবং চেষ্টা করিয়া সন্ধান পাইলেও ভূত হইয়া পুলিশকে পাওয়া ছাড়া আর কোনো প্রকারে ত পুলিশকে সন্ধান জানাইবার উপায় নাই। তারক মহা সমস্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—তাইত!

গাড়োয়ান গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল--বাবু, কোথায় যেতে হবে?

বিপিন বলিল—তোমার যেখানে খুসি, পথে পথে নিয়ে বেড়াও।

গাড়ী নিশিতে-পাওয়া রোগীর মতন এ-পথ ওপথ করিয়া টলিয়া টলিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে দুড়ুম করিয়া সাড়ে নটার তোপ পড়িল, আর সেই ফাঁকা তোপের শব্দ শুনিয়াই ঘরে ঘরে লোক বোমকালী বলিয়া চমকিয়া উঠিল। গাড়োয়ান হাঁকিল—বাবু, আর কত ঘুরব?

বিপিন ও মালতী এতক্ষণ ভাবনার মধ্যে ডুব দিয়া একেবারে তলাইয়া গিয়াছিল। তোপের শব্দে আর গাড়োয়ানের ডাকে সচকিত হইয়া নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বিপিন বলিল—তাইত কোথায় যাব?

মালতী বলিল—শুনেছি কলকাতায় কোথায় কোথায় সব হোটেল আছে, সেই-খানে চলুন না।

বিপিন বিপন্নের ভাবে বলিল--হোটেল? তাইত। সে-সব কোন রাস্তায় তা ত জানিনে।

—গাড়োয়ানকে বলুন সে খুঁজে কোথাও নিয়ে যাবে।

—কোথায় অচেনা জায়গায় রাত্রে গিয়ে শেষকালে কি বিপদে পড়ব?

—অত ভাবলে ত চলবে না, এক জায়গায় ত যেতে হবে। সমস্ত রাত ত আর গাড়ীতে ঘোরা চলবে না।

বিপিন একটু চিন্তা করিয়া বলিল—এক খুড়িমার কাছে গেলে হত, কিন্তু তাঁদের ঠিকানা ত জানি না, শেষে কি কাশীর গুণ্ডার হাতে পড়ব?...একমাত্র পথ আমি দেখতে পাচ্ছি।...গুরুজীর আশ্রমে গেলে হয়।

মালতী বিস্মিত হইয়া বলিল--গুরুজী? আপনার আবার গুরুজী কে? তাঁর আশ্রম কোথায়?

—আশ্রম তাঁর খড়দায় গঙ্গার ধারে। তাঁর নাম শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ স্বামী। সন্ন্যাসী তিনি। মহাপুরুষ! অসাধারণ লোক!

মালতী বলিল—প্রেমানন্দ! হন না তিনি প্রেমানন্দ, হন না তিনি মহাপুরুষ! কিন্তু সন্ন্যাসীর আশ্রমে আমরা যাব কেন?

বিপিন এই প্রশ্নে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিল—দেখ মালতী, তোমার

আমার সাংসারিক মিলন হওয়া বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, নইলে এমন সব অঘটন কেন ঘটবে। গুরুজীও বলছেন তোমার সঙ্গে আমার সাংসারিক মিলন মঙ্গলকর হবে না। চল আমরা দুজনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করি; কামনা বিসর্জ্জন দিয়ে আমরা দুজনে আধ্যাত্মিক যোগে মিলিত হব, দুজনে পাশাপাশি থেকে পরস্পরকে ভালো বেসে জগতের সেবা করব। আমার মন আজ কদিন থেকে এই কথাই বলছে; আমি বাসনা বিসর্জ্জন দিতে পারিনি বলে ভগবান আজ একেবারে ঘাড়ে ধরে পথে বা'র করেছেন; সব বাড়ীর দরজা বন্ধ; শুধু সেই প্রেমিক ভক্তের আশ্রমের কোনো দ্বারে অর্গল নেই। চল আমরা সেইখানে যাই। সন্ন্যাসই আমাদের চরম অবলম্বন, ভগবানের ইঙ্গিত নানা প্রকারে শুধু এই কথাই আমাদের বলছে।

বিপিনের কথাটা মালতীর বুকে শেলের মতো গিয়া বিঁধিল। সে এত অপমান, এত নির্য্যাতন, এত বিপদ মাথায় করিয়া যে বিপিনের সঙ্গে অকূলে ভাসিয়াছে সে কি এইজন্য? হিন্দু বাঙালী ঘরের বিধবা সে, সে যে কতখানি ভালোবাসিয়া তবে এত বড় সংস্কারের গণ্ডি পার হইয়া বিপিনকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, সেই ত্যাগের সেই ভালোবাসার গভীরতা বিপিন বুঝিল না? আজ একটু অসুবিধায় পড়িয়া বিপিন কিনা অনায়াসে চিরজন্মের বিচ্ছেদের কথা মুখে আনিতে পারিল, একবার ভাবিয়া দেখিল না মালতী তাহার জন্য কি না সহ্য করিয়াছে, কি না ত্যাগ করিয়াছে! মালতী মিনতির স্বরে বলিল—যা আপনার ইচ্ছে হয় করবেন, নবকিশোর বাবু ফিরে আসা পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। আজকে হোটেলেই চলুন।

আবার নবকিশোরের নাম? বিপিনের উপর মালতী নির্ভর করিতে পারে না? এই কি তাহার ভালোবাসা? নবকিশোরই যদি তাহার অধিক হিতৈষী হয় তবে সে নবকিশোরের সহিতই বুঝা-পড়া করুক, বিপিনের সহিত তাহার আর কোনো সম্পর্ক না থাকাই ভালো। বিপিন ত তাই চায়, ভগবানের অলক্ষ্য মঙ্গলহস্ত তাহার বন্ধনগুলি যে একে একে খুলিয়া দিতেছে, এ যে গুরুদেবেরই পরম কৃপার ফল, ইহা কি সে বুঝে না? ভালো, তাহাই হোক মালতীকে নবকিশোরের জিম্মায় সোপর্দ্দ করিয়াই বিপিন একেবারে মুক্ত হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বিপিন গাড়োয়ানকে কোনো হোটেলে লইয়া যাইতে বলিল। গাড়োয়ান অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহাদিগকে এক হিন্দু-নিবাসে উপস্থিত করিল। অনেক ডাকাডাকি, কড়া খটখটির পর হোটেলের চাকরদের তুলিয়া তাহারা আশ্রয় পাইল। যথারীতি বচসার পর গাড়ীভাড়া চুকাইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয় ও শূন্য উদর লইয়া বিপিন ও মালতী হোটেলের দুই ঘরে দুটি বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। নিধিরাম আপনার কম্বলখানি বিছাইয়া মালতীর ঘরের দরজার সামনে পড়িয়া রহিল।

(৩২)

ভোর না হইতেই কলিকাতার নিদ্রিত-

দের জাগাইবার উৎকট চেষ্টা পথে পথে চলিতে লাগিল। কলে কলে বাঁশি বাজিল, ময়লা-ফেলা গাড়ী উৎকট শব্দে ছুটিতে লাগিল, ট্রাম চলিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কাকের কলরব, ভিখারী বষ্টমের করতাল বাজাইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং নানা ফেরি-ওয়ালার কড়ি-কোমল সাধা সুরের আর্ত্তনাদ প্রবল হইয়া উঠিল। এততেও যাহার ঘুম না ভাঙে সে কুম্ভকর্ণের আধুনিক সংস্করণ। সুতরাং বিপিন ও মালতীকে পরিতৃপ্তির পূর্ব্বেই নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল।

বিপিন নবকিশোরের চিঠির আশায় একবার তারকের বাড়ীতে গেল। কোনো চিঠি আসে নাই। তারক বলিল—চল তোমার বাসাটা দেখে আসি; চিঠি এলে আমি পৌঁছে দেব 'খন।—মুকুন্দকে বিপিনের নূতন বাসার সন্ধান দিতে হইবে বলিয়া তারকের এত আগ্রহ।

বাসায় ফিরিবার সময় বিপিন আপনাকে বড় বিব্রত বোধ করিতে লাগিল।

মাতার আদরের ধন বিপিন চিরদিন পরের যত্নে ও বিলাসিতায় একেবারে অকর্ম্মা হইয়া গিয়াছিল; বড় হইয়া যখন সে মাতার সঙ্গচ্যুত হইয়া বিদেশে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন তাহার পরম আশ্রয় ছিল বলিষ্ঠ সতেজ নবকিশোরের বন্ধুত্ব। আজ অপরিচিত নূতন বাসার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার ভার পড়িয়াছে একা তাহার উপর! সে ত কখনো নিজের বা পরের আরামের জন্য মাথা ঘামায় নাই, আজ হইতে একটি নূতন অগঠিত অসম্পূর্ণ সংসারের সমস্ত খুটিনাটি তাহাকেই বহন করিতে হইবে। আজ তাহাকে চাল ডাল তরকারি, তেল লুন লকড়ি, হাঁড়ি কুঁড়ি, হাতা খুন্তি বেড়ির তুচ্ছ ভাবনা ভাবিতে হইবে।

সে খুঁজিয়া পাতিয়া করিয়া কর্ম্মিয়া লইবার লোক মোটেই নহে। অথচ এই সমস্ত কাজ, শেক্সপীয়র গেটে বঙ্কিম রবীন্দ্র ভুলিয়া গিয়া, তাহার নিজে না করিলে নয়, ইহাই মনে হইয়া তাহার মন ক্লান্ত ভীত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। বাসায় ফিরিতে তাহার পা উঠিতে চাহিতেছিল না। সে এক এক বার মনে করিতেছিল, বিলাতে যেমন এক এক পরিবার সারা জীবনটা হোটেলেই পরের হেফাজতে কাটাইয়া দেয়, সেও তেমনি কাটাইয়া দিবে, ঘরকন্নার হাঙ্গামা সে ঘাড়ে করিবে না। সব চেয়ে সুবিধা হয় সে যদি প্রেমানন্দের আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইতে পারে! সেই চিন্তাটাই বড় নিশ্চিন্ত আরামের।

যখন বিপিন নিশ্চিন্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, তখন নিশ্চিন্ত থাকিবার সুবিধা পাইয়াও মালতীর নিশ্চিন্ত থাকিতে ভালো লাগিতেছিল না।

মালতী আজ এই অস্থায়ী অচেনা গৃহের সর্ব্বময়ী গৃহিণী। তাই সে দুঃখের মধ্যেও আনন্দ বোধ করিতেছিল। সে প্রাতঃকালেই স্নান করিয়া নিধিরামকে বলিল—নিধিদা, হোটেলের ঐ ম্লেচ্ছ নোংরা রান্না ত মুখে রুচবে না; তুমি হোটেলের ম্যানেজারকে বলে এই ঘরের একপাশে রান্নার হুকুম নিয়ে এস; আমরা বরং ঘরে

কলি ফেরাবার খরচ দিয়ে যাব; আর বাজার থেকে একটা লোহার আখা, কাঠ, হাঁড়ি, চাল ডাল তরকারি সব কিনে নিয়ে এস, আমি রাঁধব।

নিধিরাম বিনা বাক্যব্যয়ে জোগাড় করিতে বাহির হইয়া গেল; মালতী কোমড়ে কাপড় জড়াইয়া, সিক্ত চুল চূড়ার আকারে মাথার উপর তুলিয়া গৃহ-কর্ম্মে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়া দিল।

বিপিন আসিয়া দেখিল, তাহার করিবার জন্য কিছুই বাকী নাই; মালতী নিজেই সমস্ত জোগাড় করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। বিপিন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। গৃহকর্ম্মের মধ্যেই রমণীর আসল রূপটি প্রকাশ পায়; বিপিন মালতীকে অত্যন্ত সহজভাবে এই অচেনা জায়গার অসীম অসুবিধার মধ্যে তাহারই আরামের জন্য গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। মালতীর এই কল্যাণী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ বিপিনের কখনো ঘটে নাই। আজ এই দুর্দ্দিনেও তাহার প্রফুল্ল মুখ ও সুনিপুণ তৎপরতা বিপিনের মন এক নূতন রসাবেশে আপ্লুত করিয়া তুলিল। প্রেমানন্দের মোহ তাহার মনে যে ব্যবধান রচনা করিতেছিল মালতীর আচরণে আজ তাহা বুঝি ঘুচিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইল।

এতদিন সমস্ত সংসার ভুলিয়া সর্ব্বস্বের মূল্য দিয়া বিপিন যাহাকে চাহিয়াছিল, তাহাকে আজ পাইয়াছে, আজ উভয়ের মাঝখানে কোনো বাধা নাই, আজ বিপিনের বড় আনন্দের দিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজ কোনো বাধা নাই বলিয়াই মিলনেরও কোনো ব্যগ্রতা নাই, আজ বিপিন নিজেই নিজের বাধা হইয়া উঠিয়াছে।

হোটেলে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া দুদিন গেল; মালতীকে একা ফেলিয়া বিপিন কোথাও যাইতেও পারে না, আর উভয়ের মধ্যে আবার এমন একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে যে উভয়ের উভয়কে লইয়াই যথেষ্ট বোধ হয় না। বিপিন বসিয়া বসিয়া শুধু গুরুজীর কথা বলে আর ভাবে, আর মালতী ভাবে পুরুষগুলা কি দুর্বোধ্য জাত, একটুখানি স্থিরতা নাই ধৈর্য্য নাই নিষ্ঠা নাই, অবস্থার পর অবস্থার ক্ষণিক উন্মাদনা শুধু চাখিয়া ফিরিতে চায়! মালতীর মনে হইতেছিল বিপিনের এই যে সন্ন্যাস-গ্রহণের ধুয়া, তাহা তাহাকে ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইবার ছল মাত্র। সত্য বটে জমিদারের ছেলে বিপিন ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত পাইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে যে চাহিবে ইহা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু দুঃখ কি শুধু সেই মালতীর জন্য পাইতেছে, মালতী কি বিপিনের জন্য কোনো দুঃখ স্বীকার করে নাই? হিন্দু বাঙালী-ঘরের মেয়ে সে, বিধবা হইয়া বিবাহ করিতে যে স্বীকার করিয়াছে, ইহার জন্য যে লজ্জা ধিক্কার ও লাঞ্ছনা তাহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে, তাহা যে তাহার অগ্নিপরীক্ষার চেয়েও ভীষণ! তাহা কি তুচ্ছ হইল? সেই অগ্নিপরীক্ষা সে যাহার মুখ চাহিয়া অবাধে স্বীকার করিয়াছিল, সেই কিনা আজ তাহার সকল আশ্রয় নষ্ট করিয়া দিয়া নিরুপায় অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে?

এর চেয়ে অপমান তাহার নামের মিথ্যা কলঙ্কে বা কুৎসায় ত তাহার বোধ হয় নাই।

মালতী হোটেলের ঘর হইতে বসিয়া বসিয়া দেখে কত বর বাদ্যযন্ত্রের কোলাহল ও আলোর সমারোহ করিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছে; কত বধূ নববিবাহের রঙিন সজ্জায় ম্লান মুখে অপরিচিত স্বামীর সহিত শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। দেখিয়া দেখিয়া তাহার নিশ্বাস পড়িত; নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া লজ্জায় অপমানে তাহার সমস্ত অন্তর তাহাকে শত ধিক্কার দিয়া উঠিত।

বিপিনের সহিত একটা শেষ বোঝা-পড়া হওয়া দরকার হইয়া উঠিয়াছে। বিপিন যদি তাহাকে বিবাহ নাই করে তবে বিপিনের কাছে থাকা তাহার আর এক দণ্ডও উচিত নয়। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানোও এর চেয়ে সম্মানের, এর চেয়ে সুখের। এই সময় নবকিশোর থাকিলে ঠিক হইত। কিন্তু কেহ যদি সাহায্য করিবার নাই থাকে, তবে তাহাকে নিজেই নিজের অদৃষ্টের একটা হদিস বুঝিয়া লইতে হইবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা বড় লজ্জার কথা। কিন্তু উপায় আর নাই।

মালতী সঙ্কল্প ও সাহস সঞ্চয় করিয়া বিপিনের কাছে কথাটা যখন উত্থাপন করিতে গেল, তখন সে কথা বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুন্দর মুখের ক্রন্দন জগতে অতুলনীয় সুন্দর। বিপিন বসিয়া বসিয়া মুগ্ধ নেত্রে দেখিতে লাগিল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, না না, এসব মোহ, ইহা মারের মারিবার ফাঁদ। সে তখন বল সংগ্রহ করিয়া মালতীকে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়ায় কল্যাণ নাই, এমনি বা এর চেয়েও বেশী বিপদ ঘটিবে; আসল আনন্দ আধ্যাত্মিক মিলনে। গুরুজীর কৃপায় তাহাদের যথার্থ মিলন ও কল্যাণের আনন্দ লাভ হইবে।

এমন সময় তারক পথ দেখাইয়া মুকুন্দকে হোটেলে লইয়া আসিল। মুকুন্দ পুলিশ-আদালতে ও হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা রুজু করার কথাটা বিপিন ও মালতীকে সালঙ্কারে ও সাড়ম্বরে শুনাইয়া গেল।

বিপিন বলিল—দেখছ মালতী, ভগবানের কত রকমের নিষেধ কতবারে কত রকমে আসছে? চল আমরা গুরুজীর আশ্রয়ে যাই।

মালতী মিনতির স্বরে বলিল—আর অল্প অপেক্ষা করুন, নবকিশোর বাবুকে আসতে দিন।

আবার নবকিশোর! মালতী মনে করিতেছিল বিপিনের এই যে ক্ষণিক দুর্বলতা তাহা নবকিশোরের বলিষ্ঠ মনের আশ্রয় পাইলেই দূর হইয়া যাইবে; নবকিশোরের এমন একটি শক্তি আছে যাহার দ্বারা সে অনায়াসে তাহাদিগকে সকল তুফান কাটাইয়া বন্দরের ঘাটে পৌঁছাইয়া নিরাপদে নঙ্গর করাইয়া দিবে। সে ভগবানের নিকট অনুক্ষণ প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে ভগবান নবকিশোরকে শীঘ্র প্রেরণ কর।

এদিকে নবকিশোরের প্রতি মালতীর বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাবকে প্রণয়ের

পক্ষপাত মনে করিয়া বিপিন ক্রমশ বন্ধুর প্রতিও বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে করিতেছিল এত সমস্ত কাণ্ড সব ত নবকিশোরের বুদ্ধিতেই সংঘটিত হইয়াছে। বিপিন ইহার মধ্যে আগাগোড়া তাহার বন্ধুর একটা মতলবের খেলা দেখিতে পাইল। তাহার এ-সমস্ত কাণ্ড বিপিনের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া সমাজ-সংস্কারের সুনাম সস্তায় নিজে ভোগ করিবার ফন্দি! উঃ! কি ভীষণ প্রতারণা! বিপিনের সরলতার সুযোগ লইয়া সে তাহার কি সর্ব্বনাশ না করিয়াছে? পাঠশালার ছুতা করিয়া তিন-তিনখানা তালুক নিজে হস্তগত করিয়াছে; পৈতৃক জমিদারী ও পিতা মাতার স্নেহ হইতে তাহারই জন্য বঞ্চিত হইতে হইয়াছে; অবশেষে মালতীরও মন হরণ করিবার ফন্দি খেলাইয়াছে—সে ফন্দিগুলা যে কি তাহা ঠিক স্পষ্ট এখন জানা না গেলেও নিশ্চয় কিছু আছে, নতুবা মালতী এত তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছে কেন? এই ফন্দিগুলা যতই বিপিন ঠাহর করিতে পারিতেছিল না, ততই সেগুলাকে নিগূঢ় ভীষণ বলিয়া অনুভব করিতেছিল। গুরুজীর কৃপায় তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, বিপিন বুঝিয়াছে সংসার মারের মায়াচক্র। বিপিন আর এ মায়ায় ভুলিতেছে না।

এইরূপে আরো দুদিন গেল। তার পর-দিন অকস্মাৎ নবকিশোর আসিয়া উপস্থিত হইল। কতক সংবাদ সে তারকের কাছে শুনিয়া আসিয়াছিল। হোটেলে আসিয়াই বিপিনকে বলিল—বেশ লোক যা হোক! এতদিন এই হোটেলে পড়ে আছ, একটা বাড়ী ভাড়া করে নিতে পারনি। নাও ওঠ!

নবকিশোরের সরল বলিষ্ঠ ব্যবহারের কাছে বিপিনের দুর্ব্বলচিত্ত পাশাপাশি হইবা মাত্রই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে কুণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন? কোথায় যাব?

—বাড়ীভাড়া করে' সব ঠিক করে এসেছি; দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী, বেলা দ্বিপ্রহর, এখন হুজুর চলুন। এখানে যেতে নাহি দিব বলবার কেউ নেই, থাকতে নাহি দিব বলবার আমি হাজির। ওঠ ওঠ, উঠে পড়।

বিপিন সবিস্ময় সম্ভ্রমে বলিল—তুমি এলেই বা কখন আর বাড়ী ভাড়া করলেই বা কখন?

—এসেছি পাঞ্জাব মেলে ভোরে। তারকের কাছে সব শুনেই ছুটে গিয়ে বাড়ী-ভাড়া করে সেখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করে এই চলে আসচি।

বিপিন মুখখানি যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল—শুনেছ। আদালতে নালিশ করেছে।

নবকিশোর উপেক্ষার ভাবে বলিল—ওঃ! তার জন্যে কিছু ভেবনা, মালতী সাবালগ; তার যা খুসি সে করতে পারে, যেখানে খুসি থাকতে পারে। ওর ভাসুরের ক্ষমতা নেই ওর বিয়ে বন্ধ করে কি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

নবকিশোরের এই আশ্বাসবাক্যে বিপিনের মুখ তেমন প্রসন্ন হইল না; সে যেমনটি মনে করিয়াছিল তেমন ত ঘটিল না; তাহার উপর সে দেখিল যে মালতী এই কদিন তাহার কাছে বিমর্ষ হইয়া কাটাইয়াছে, আজ সে উৎফুল্ল হইয়া নব-

কিশোরের কথা যেন সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া পান করিতেছে, তাহার চোখমুখ হাসিতে জ্বলজ্বল করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন হাসি ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

নবকিশোর কিন্তু বিপিনকে লক্ষ্য না করিয়াই বিয়েবাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তার মতন অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল—আদালতের ল্যাঠা চুকে গেলেই চটপট বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। কিন্তু সেখানেও এক মুস্কিল আছে···আমি আজ কদিন ধরে তাই ভাবছি।..

মালতী উৎকণ্ঠিত হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিল। বিপিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি?

নবকিশোর বলিতে লাগিল—ভাবছিলাম বিয়েটা কি প্রণালীতে সম্পন্ন হবে। প্রচলিত হিন্দু প্রণালীতে বিবাহ দিতে হলে শালগ্রাম শিলা আর অগ্নিকে ভগবান স্বীকার করে বিয়ে করতে হবে, কিন্তু তা যখন আমাদের বিশ্বাসের প্রতিকূল তখন সে বিবাহপ্রণালী গ্রহণীয় ত নয়ই। আবার শালগ্রাম ও অগ্নি-হোম ত্যাগ করে বিবাহ দিলে আইন-সঙ্গত হবে না। আইনের মতে রেজেষ্টারী করে বিয়ে হতে পারে, কিন্তু তাতে স্বীকার করতে হয় আমি হিন্দু নই; এ কথনো স্বীকার করা যেতে পারে না—আমরা হিন্দু, একশবার হিন্দু, আমাদের দেশের এতবড় অতীত ঐতিহ্য ছেড়ে একেবারে অহিন্দু হতে আমরা কথনো স্বীকার করতে পারি না।... তা বিয়ের জন্যে তোমরা ভেব না, একটা উপায় ভেবে ঠিক করবই। এখন চল।

সকলে গিয়া জিনিষপত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিল। 'নবকিশোর বাবু যাহা হয় একটা সুব্যবস্থা করিবেনই,' ভাবিয়া মালতী আশ্বস্ত হইয়া সকল ভাবনা ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল বিপিন ভাবিতেছিল—নবকিশোরের সবই বাড়াবাড়ি। এও একটা বোধ হয় নবকিশোরের ফন্দি! আমার সঙ্গে মালতীর যাতে বিয়ে না হয় তারই একটা চাল!

বিপিন নবকিশোরকে আর তেমন প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। আবার তাহার দুর্ব্বল মন তাহার প্রতি ভালো করিয়া রাগ করিতেও পারিতেছিল না; সে মনে মনে নবকিশোরের প্রতি একটু বিরূপ হইয়া থাকিলেও তাহার এমন শক্তি ছিল না যে সে সেকথা প্রকাশ করিয়া বলে। কাজেই তাহার রুদ্ধ রোষ পুটপাকের মতো তাহার অন্তরকে জারিয়া ছাই করিয়া ফেলিতেছিল, অথচ বাহিরে তাহার কোনো প্রকাশ ছিল না।

(৩৩)

মোকদ্দমা চুকিয়া গিয়াছে। বিপিন এখন মালতীকে স্বচ্ছন্দে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু বিপিনের মন এই মোকদ্দমার আবর্ত্তে পড়িয়া সংসারের প্রতি আরো বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল!—দিনের পর দিন আদালতে যাওয়া আসার কষ্ট, স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় সকলের সম্মুখে দাঁড়ানোর লজ্জা, সমস্ত দর্শকের সকৌতুক দৃষ্টির আঘাত, এবং সর্ব্বোপরি বিপক্ষ-পক্ষের উকিলদের অভদ্রোচিত বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন বিপিনকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে এই-সকলের মধ্যে ভগবানের মঙ্গলহস্তের স্পষ্ট নিবারণ

দেখিতে পাইতেছিল। এদিকে মালতী কিন্তু ডাক্তারের বয়স-পরীক্ষা, উকিলের জেরা ও বিদ্রূপ সহ্য করিতেছিল শুধু এত দুঃখের ও অপমানের পর বিপিনের প্রণয়ে সান্ত্বনা পাইয়া পুরস্কৃত হইবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া।

যতদিন মোকদ্দমা চলিতেছিল ততদিন মাথা ঘামাইয়াও নবকিশোর বিপিনের বিবাহ দিবার একটা পদ্ধতি মনের মতো খুঁজিয়া পাইল না; কোনোটায় মতে বিশ্বাসে বাধে, কোনোটায় আইনে বাধে, কোনোটায় ধর্ম্মে বাধে। তাহার মনে হইতে লাগিল কি মুস্কিল! রেজেষ্টারী বিবাহের আইনটা এমন কেন হইল? এতদিন এই আইনটা চলিয়া আসিতেছে অথচ ইহার সংস্কার যে প্রয়োজন তাহা কাহারও মাথায় আসে নাই? কিন্তু যাহা হয় নাই তাহার জন্য দুঃখ করিয়া ফল কি? এখন উপায়? উপায় সে কিছু খুঁজিয়া পাইল না। তবে কি ইহাদের বিবাহ হইবে না? তাইত! রফা করিবার মতন লোক ত নবকিশোর নয়।

নবকিশোর যখন বিপিনের বিবাহ ও সংসার পাতাইবার উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া ফিরিতেছিল, বিপিন তখন দিব্য সুযোগ পাইয়া প্রত্যহ পরম নিশ্চিন্তভাবে প্রেমানন্দের আশ্রমে যাতায়াত করিতেছিল। মালতী ভীত হইয়া উঠিল। বিপিন পাছে মালতীকে স্বার্থপর অধার্ম্মিক বা এমনি কিছু ভাবিয়া তাহার উপর রাগ করে এই ভয়ে সে বিপিনকে কিছু বলিতে পারিতেছিল না, অথচ তাহাকে প্রেমানন্দের প্রভাব হইতে রক্ষা করাও আবশ্যক ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছিল। একদিন সে নিতান্ত ভীত হইয়া নবকিশোরের শরণাপন্ন হইল। বিপিন তখন চলিয়া গিয়াছে। মালতী নবকিশোরকে বলিল—আপনার বন্ধু আজকাল কোথায় যাতায়াত করছেন খবর রাখেন কি?

মালতীর ম্লান মুখ ও হতাশাকরুণ স্বর শুনিয়া ভীত হইয়া নবকিশোর বলিল—না। কেন? কোথায় সে যায়?

—সন্ন্যাসীর আখড়ায়। তিনি সন্ন্যাসী হবার সংকল্প করছেন?...

শ্রবণমাত্র নবকিশোর হাহা হাহা করিয়া হাসির রবে ঘর ভরিয়া ফেলিয়া বলিল—বিপিন হবে সন্ন্যাসী!.. তাহলে তার গেরুয়া কাপড় কুঁচিয়ে দেবার জন্যে আর আলখেল্লা গিলে করে দেবার জন্যে দিদিদাকে, আর তার নিয়ম সংযম পালন করাবার জন্যে আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী হতে হবে।...চাই কি তোমারও সন্ন্যাসিনী হওয়া দরকার হতে পারে।...

মালতী নবকিশোরের হাসি ও শ্লেষবাক্যে লজ্জিত ও আশ্বস্ত হইয়াও বলিল—আপনি হাসছেন, কিন্তু আমার বড় ভয় হচ্ছে। তিনি রাতদিন মুখ ভার করে বসে শুধু সন্ন্যাসের কথাই ভাবেন। আমাকে সুদ্ধ সন্ন্যাসিনী হতে বলেন।...বলেন যে আমাদের মিলন ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। আর তাঁর গুরু তাঁকে বুঝিয়েছেন যে এ রকম মিলন ধর্ম্মসঙ্গত হবে না।...

নবকিশোর গম্ভীর হইয়া বলিল—গুরু! গুরু কে? বাঁদরটা শেষকালে একটা গুরু ফেঁদে বসল নাকি? কে সে?...

—তাঁর নাম নাকি প্রেমানন্দ। খড়দায় তাঁর আশ্রম। সেই আশ্রমেই রোজ যান ...চিরদিনের জন্তেই যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছেন।

প্রেমানন্দের নাম শুনিয়া নবকিশোর চিন্তিত হইল। সে প্রেমানন্দকে একদিন দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে লোকটার আকর্ষণী শক্তি অসাধারণ এবং আজকাল যে দলে দলে নব্য যুবকেরা বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার চেলা হইতেছে এ খবরও তাহার অবিদিত ছিল না। এই ফ্যাশানের বশবর্ত্তী হইয়া বিবিধ বিক্ষেপে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত বিপিনও সেই দলে সহজে ভিড়িয়া যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়।

নবকিশোর অত্যন্ত চিন্তিত হইলেও বাহিরে প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়া মালতীকে বলিল—তুমি ক্ষেপেছ? বিপিন হবে সন্ন্যাসী? তোমার কিছু ভয় নেই।...... তোমার উড়ুকুখু পাখীটির ডানাদুটি শীগগির বিবাহের সোনার শিকলে বেঁধে তোমার হাতে দেবো।...তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

নবকিশোরের প্রতি মালতীর অগাধ বিশ্বাস। সে সান্ত্বনা পাইয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু নবকিশোরের মনের মধ্যে অমঙ্গল-আশঙ্কার মেঘ যেন কালো হইয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিতে লাগিল।

নবকিশোর অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ঠিক করিল তবে আর ইহাদের বিবাহে একদিনও বিলম্ব করা উচিত নয়।

পরদিনই নবকিশোর বিপিনকে বলিল—বিপিন, কোন্ পদ্ধতি অনুসারে বিয়ে হওয়া উচিত আমি ত অনেক ভেবে চিন্তেও ঠিক করতে পারলাম না। যে পদ্ধতিতে বিবাহ করা তোমার অভিরুচি বল, আমি তারই যোগাড় করে দেবো।

বিপিন মাথা নত করিয়া বলিল—আমি বিয়ে করব না।

নবকিশোর যদি জোর করিয়া বিবাহ দিয়া দিত, বিপিন হয়ত আপত্তি করিত না। কিন্তু নবকিশোর তাহারই উপর ভার দেওয়াতেই সে অবকাশ পাইয়া বলিল—আমি বিয়ে করব না।

নবকিশোর এই উত্তর শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিল—মূর্খ, লজ্জা করল না ঐ কথা মুখে উচ্চারণ করতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকল আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে এতদূর টেনে এনে এখন তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাও! কাপুরুষ!

নবকিশোরের উষ্ণতায় বিপিনও উত্তপ্ত হইয়া বলিল—ভদ্রঘরের মেয়েকে যে এতদূর টেনে এনেছি তার জন্যে দায়ী আমি, না, তুমি? তুমিই ত আগাগোড়া আমার প্রবৃত্তির ইন্ধনে বাতাস দিয়ে দিয়ে এই দারুণ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছ। এখন আমার চৈতন্য হয়েছে। তুমি নিজে মালতীকে ভালোবাস, মালতীও তোমায় আমার চেয়ে ঢের বেশী ভালোবাসে। তুমিই মালতীকে বিয়ে করগে।

এতদিন ধরিয়া যে সন্দেহবিদ্বেষের উত্তাপ তিল তিল করিয়া বিপিনের অন্তরে বিপিনেরও প্রায় অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হইতে-ছিল তাহা আজ নবকিশোরের তিরস্কারে হঠাৎ অগ্নিগিরির উৎক্ষেপের ন্যায় বিপিনের

মুখ ফাটিয়া তাহাদের এতদিনের সুখ সান্ত্বনার আয়োজন সমস্ত এক নিমিষে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া খাক করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। এ আগুন নিভাইতে অনেক দিনের চোখের জল লাগিবে, নষ্ট ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া পাইতে বহুদিনের শ্রম-সাধনার আবশ্যক হইবে।

নবকিশোর বিপিনের কথার বিষে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। মালতীর সাক্ষাতে এমন রূঢ় ও গর্হিতভাবে যে বিপিন এই কথা কেমন করিয়া বলিতে পারিল তাহা নবকিশোর সহসা ধারণা করিতে পারিল না। সে যে মালতীকে একটুও ভালোবাসে ইহা সে নিজের কাছেই স্বীকার করিত না; কিন্তু বিপিন যখন সেই অতিগুপ্ত খবরটিকে তাহার অন্তরের অন্ধকার গুহা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিল তখন সেই কথার মধ্যেকার সত্যের সর্ষপপ্রমাণ বীজটি অকস্মাৎ যাদুকরের মায়াবৃক্ষের ন্যায় অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত হইয়া উঠিল,—তাহার প্রকাশের সৌন্দর্য্য মোহ আর ঢাকিয়া রাখিয়া অস্বীকার করা গেল না। সে চকিতে মনের মধ্যে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়া লইল সেই হেমন্তের স্নিগ্ধ বৈকালে মালতীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনেই তাহার জড়তাবর্জ্জিত সরল সাহস দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল; তারপর চৌধুরীবাড়ীতে মালতীর নির্য্যাতন দেখিয়া সে সহানুভূতিতে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, মালতীকে সে আশ্বাস ও নির্ভয় দিয়া মালতীর বিশ্বাস লাভ করিয়াছিল; সব শেষে সেই যে দিন তাহার পিতা মালতীকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া নবকিশোরের মনে ক্ষণকালের জন্যও আশা ও আনন্দের মোহ রচনা করিয়াছিলেন;—আজও সে সকলের স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে সজীব হইয়া আছে; সুপ্ত ছিল মাত্র, বিপিনের নির্দ্দয় আঘাতে বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া এক মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়াছে। নবকিশোর নিজের মন হাতড়াইয়া দেখিয়া মালতীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল সে বিপিনের নির্লজ্জ আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া আরক্ত নত বদনে দাঁড়াইয়া আছে। নবকিশোরের মনে হইল এই নির্লজ্জ কাপুরুষের রূঢ় আঘাত হইতে মালতীকে বাঁচাইবার অধিকার ও উপায় তাহার হাতে আছে। তখন সে নিজের উত্তেজনায় দ্বিধা মাত্র না করিয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—মূর্খ! তুমি কাপুরুষের মতো একে যদি ত্যাগ কর, আমি কখনো ত্যাগ করতে পারব না। মালতী যদি স্বীকার করে, আমিই তাকে গ্রহণ করব।

—বাস! আজ থেকে তবে আমি খালাস! মালতীর সম্বন্ধে আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই! আমি খালাস!—বলিতে বলিতে বিপিন ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বিপিনের কেবলই মনে হইতে লাগিল এই নিষ্ঠুর বাক্য হয় ত মালতীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে তীরের মতো গিয়া বিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যে তীর একবার ধনুক ছাড়িয়া যায় তাহাকে আর ত ফেরানো যায় না!

মালতীর আজ অপমানের চরম। সে যাহাকে ভালোবাসিয়া এত দুঃখ সহ্য করিতেছিল আজ সেই অনায়াসে তাহাকে পরের হাতে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল! মালতী নবকিশোরকে পরমবন্ধু মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিত, আজ সেই নবকিশোরের প্রচ্ছন্ন প্রণয় তাহার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া তাহাকে লজ্জায় মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। নবকিশোরের প্রতি তাহার বন্ধুত্বের নির্ভরকে প্রণয়ব্যাকুলতা বলিয়া ভুল করিয়া তাহার প্রতি নবকিশোর ও বিপিন উভয়েরই আচরণ মালতীকে চরম আঘাত করিল। তাহাকে লইয়া পুরুষদের এই নির্লজ্জ কৌতুক তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। বিপিন যখন ঘর হইতে প্রস্থান করিল তখন মালতী যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষণেকের জন্য হতচৈতন্য ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। গভীর নিস্তব্ধ নৈশ অন্ধকারে তাহার হৃদয় যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল, বড় বড় কালো কালো চাকা যেন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সনসন শব্দ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, আর তাহার মধ্যে সবুজ আগুনের হাজারলক্ষ ফুলকি লোষ্ট্রাহত মৌমাছির মতো ভন্ ভন্ করিয়া উড়িতে লাগিল। তারপর যখন চৈতন্য হইল, গভীর বিষাদে তাহার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল যেন তাহার স্বল্পাবশেষ সুখসৌভাগ্য চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

তখন অশ্রুজলের একটা বিপুল আবেগ মালতীর বুকের মধ্যে বার বার ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠ ও চক্ষু পর্য্যন্ত আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। জগৎসংসারে তাহার আপনার বলিতে, আহা বলিয়া স্নেহ করিতে, আশ্রয় বলিয়া দাঁড়াইতে, মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া বলিতে কেহ কোথাও যে নাই, এ কথা কাল ত তাহার মনে ছিল না,— আজ একি হইল যাহাতে তাহার কেবলই মনে হইতেছে বিপিন তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল নহে? নবকিশোরকেও আর বিশ্বাস নাই। কেন মনে হইতেছে, এই বিশ্বভুবন অত্যন্ত বৃহৎ ও কঠোর এবং সে বালিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র দুর্ব্বল অসহায়?

দেখিতে দেখিতে অশ্রুজলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কী মর্ম্মভেদী সেই অশ্রুজল! তাহার মনে হইতে লাগিল, হে ভগবান! আমায় এমন কোনো জায়গা দাও যেখানে আমি আপনাকে ইহাদের সকলের দৃষ্টি হইতে লুকাইতে পারি। হে ভগবান! এস তুমি মৃত্যুরূপে এস! সকল লজ্জা, সকল গ্লানি, সকল দুঃখ, তোমাতে ঢাকা পড়ুক!

মালতীকে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নবকিশোর বুঝিল সে নিজের উত্তেজনার বশে নিজের অজ্ঞাতসারে মস্ত একটা আঘাত করিয়া বসিয়াছে। তখন সে নিজেকে মালতী ও বিপিনের নিকট অত্যন্ত অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এ অপরাধ ক্ষালনের ক্ষমতা নির্ম্মমভাবে তাহার অধিকারের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে, বিপিন বা মালতী তাহাদের আচরণ দ্বারা এই আচরণটিকে কোনরকমে ঢাকিয়া না ফেলিলে এই মূঢ়তা চিরকাল তাহাকে ধিক্কার দিবে ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া নবকিশোর নিতান্ত

লজ্জিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল; আপনার নিষ্ফলতায় আপনাকে দগ্ধ করিতে লাগিল; সেও যে বিপিনের সহিত মিলিত হইয়া এমন কদর্য্য অপমানে মালতীকে জর্জ্জরিত করিয়াছে এই মূঢ়তার বেদনায় সে অভিভূত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর মতো নিরুপায়ভাবে শাস্তির অপেক্ষা করিয়া রহিল, ক্রন্দনকাতরা মালতীর কাছে একটি সান্ত্বনার কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কল্পনাপ্রবণ বিপিন যখন দেখিল যে কল্পনা ও বাস্তবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ তখন তাহার দুর্ব্বল চিত্ত স্বভাবতই ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। বিপিন এখন নিজের ভরসায় সংসারে দাঁড়াইতে গিয়া দেখিল সে কতবড় অসহায়, সে কতবড় অক্ষম। সে সমুদ্রবক্ষে নৌকার ললিত নৃত্য দেখিয়া ভাবিয়াছিল সেখানে বুঝি শুধু আনন্দের হিল্লোল, সে বুঝি শুধুই মধুর বায়ুর মুখে রঙ্গে ভাসিয়া যাওয়া, সে বুঝি জলখেলা; কিন্তু নৌকার বুকে পা রাখিয়াই সে দেখিল, দূর থেকে সে বড় ভালো, কাছে গেলে চাঁদে সুধা নাই; কল্পনা ও কর্ত্তব্যে বিষম অন্তর; ইহা ত শুধু বসিয়া বসিয়া দোল খাওয়া নয়, এযে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সচকিত সচেতন থাকা দরকার, কখনো একটু অন্যমনস্ক হইবার জো নাই, এক হাতে নৌকার জল সেচিতে হইবে এবং অনভ্যস্ত হাতে প্রাণপণে দাঁড়ও টানিতে হইবে। দক্ষিণে বামে একটু কাত হইলেই একেবারে জলে গিয়া পড়িবার আশঙ্কা অহরহ বুকের পাশে কাঁটার মত লাগিয়াই আছে। একটু অমনোযোগ, এতটুকু ভুল, একটু নড়াচড়া হইলেই একেবারে সর্ব্বনাশ! আজ তাহার আশ্রয়স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সে স্থান তাহার কোনো কালেই খুব বিস্তীর্ণ ছিল না, কিন্তু নিরাপদ নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট ত ছিল। সেই অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার বশেই ত সে মনে করিয়াছিল মালতীকে পাইলে তাহার জীবনটা একটা সুকবির গানের মতো সহজ মোলায়েম সুরে বহিয়া যাইবে। কিন্তু এখন ঠেকিয়া দেখিল সে শুধু মরীচিকা, তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া মরাতে সুখ থাকিতে পারে, কিন্তু স্বস্তি নাই। সুখ চেয়ে স্বস্তি ভালো। মালতীকে পাওয়ার সুখের পশ্চাতে যে বিষম উদ্বেগ রহিয়াছে, তাহার আওতায় সেই ভাবময় সুখ কতক্ষণ টিকিবে? প্রেমানন্দ স্বামীর আশ্রমে নিশ্চিন্ত একটু আশ্রয়, অচেষ্টালব্ধ সামান্য অন্নবস্ত্র জুটিলেই বিপিন বাঁচিয়া যায়। মালতীর অদর্শনে তাহার বুকে তুষের আগুন জ্বলিবে। তা জ্বলুক, তাহাও এই দুরন্তদারুণ জীবনসংগ্রামের চেয়ে ঢের সহজে সহনীয়; আর মালতীর বিরহদুঃখের মধ্যেও ত আনন্দ আছে, ভালোবাসিয়া অন্তরের সার্থকতা, প্রেমাস্পদের চিন্তায় তন্ময়তা। মালতীকে ত্যাগ করিয়া সে সন্ন্যাসীর আশ্রমে গেলে মালতীর প্রেম তাহার নিকট অখণ্ড শাশ্বত সম্পূর্ণ হইয়াই থাকিবে, সেই প্রেমকে সংসারের সংঘর্ষে জীবনের জটিলতায় পদে পদে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ দেখিতে হইবে না।

বিপিনের সমস্ত সংঘাত হইতে সরিয়া পড়িবার একমাত্র অন্তরায় ছিল মালতী— তাহাকে বিপিন কোথায় ফেলিবে ঠিক

করিতে পারিতেছিল না। গুরুজীর আশ্রমে লইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু মালতী ত তাহাতে সম্মত ছিল না। এইখানেই বিপিনের একটু গোল বাধিয়াছিল। কিন্তু যখন নবকিশোর মালতীর ভার গ্রহণ করিল, এমন কি মালতীকে বিবাহ করিতেও স্বীকৃত হইল, তখন বিপিন মালতীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইল বটে কিন্তু নবকিশোরের সৌভাগ্যের ঈর্ষায় জ্বলিতে লাগিল। মালতীকে এইরূপ অবস্থায় ত্যাগ করাতে তাহার প্রতি বিপিন যে কিছুমাত্র অবিচার করিতেছে তাহা তাহার মনে হইল না; মালতী নবকিশোরকে ভালোবাসে, হয়ত বা বিপিনের চেয়ে বেশীই ভালোবাসে; নবকিশোরকে বিবাহ করিয়াই সে সুখী হইতে পারিবে, বিবাহসম্বন্ধ ত এক মেয়ের কত লোকের সঙ্গেই হয়—অবশেষে যাহার সহিত বিবাহ হয় সেই ত সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসে। যদিই বা মালতী বিপিনকে একটু ভালোবাসিয়া থাকে তবে সে ভাব সে দুঃস্বপ্নের মতো দু দিনেই ভুলিয়া যাইবে।

মানুষ যখন কোনো কাজ করিতে নিতান্ত ইচ্ছা করে তখন তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিবার মতো যুক্তির অসদ্ভাব কিছুতেই হয় না। যখন কোনো অশান্তি বা অসুখ উপস্থিত হয় তখন লোকে নিজের দিকে না চাহিয়া সমস্ত দোষ পরের উপর নয় অদৃষ্টের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

বিপিন এতদিন প্রত্যেক বাধার মধ্যে ভগবানের নিষেধ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এখন সমস্ত দোষ নবকিশোরের উপর চাপাইবার সুযোগ পাইয়া বিপিন নিজেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত ও দায়িত্বমুক্ত বোধ করিতে লাগিল। সে কতকটা প্রফুল্ল ভাবেই গুরুজীর আশ্রমে যাইবার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু পোঁটলাপুঁটলি যতই দড়িদড়া দিয়া কষা হইতে লাগিল, বিপিন অনুভব করিতে লাগিল তাহার মনের একধারে যেন টান পড়িতেছে, মন যেন বেদনায় টনটন করিয়া উঠিতেছে। যখন তাহার যাইতে স্পষ্টই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, তখন তাহার থাকিতেও লজ্জা বোধ হইতেছিল; তাহার মনে মনে ভারি অভিমান হইতে লাগিল যে নবকিশোর তাহাকে তিরস্কার করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিল না, মালতী অশ্রুভরা মিনতিতে তাহাকে সাধিল না। তবু বিপিন প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিতে লাগিল, যদি বিলম্বেও কেহ তাহাকে ফিরাইতে আসে। মালতীকে ছাড়িয়া গেলে তাহার জীবনের যে কতখানি খালি হইয়া যাইবে তাহা বিপিন ক্রমশ বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু নবকিশোর বা মালতী সেরূপ প্রকৃতিতেই গঠিত নয় যে যুক্তি যেখানে হার মানিয়াছে, হৃদয়ের যেখানে অবমাননা হইয়াছে, সেখানে গিয়া দয়া ভিক্ষা করিবে। মালতীর আত্মমর্য্যাদার ভাব এবং নবকিশোরের লজ্জা এমন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাহারা বিপিনকে আর কোনো অনুরোধ করিতে পারিল না।

বিপিন যখন দেখিল যে কেহই তাহাকে সাধিতে আসিল না, তখন সে আহত অভিমানের প্রবল ধাক্কায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ছিটকাইয়া পড়িবার উপক্রম

করিল। কিন্তু তখনো আশা একেবারে ছাড়িতে পারিতেছিল না।

গাড়ীতে মোট তুলিয়া বিপিনের মনে হইল এইবার মালতী তাহার সম্মুখ দিয়া স্খলিত হইয়া, চিরদিনের মতো অনায়ত্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে; এখনো ইচ্ছা করিলে সে বাহু বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে পারে। অল্পক্ষণ ইতস্তত করিয়া বিপিন একটা দীর্ঘনিশ্বাসে সেই দুরাশাকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া গাড়ীতে চড়িতে যাইবে, ঠিক সেই সময় মালতী আসিয়া তাহাকে বলিল—একটু দাঁড়ান, আমিও যাব।

আনন্দে বিপিনের মন নৃত্য করিয়া উঠিল। মালতী ইচ্ছা করিলে নবকিশোরকে বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত; সে সুখ ত্যাগ করিয়া এই নবীন বয়সে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে পুষিয়া তাহার সন্ন্যাসিনী হওয়া উচিত নয়;—মালতীকে এমন-সব কথা একবার বলিবার জন্য অভিমান বিপিনকে একটু ইঙ্গিত করিল; কিন্তু বিপিনের প্রণয় তাহাকে সে কথা বলিতে দিল না, কি জানি অভিমানিনী মালতী যদি সে কথা শুনিয়া সত্যসত্যই থাকিয়া যায়। মালতীর সহিত একই আশ্রমে থাকিলে অন্তত দেখার আনন্দ ত সে পাইবে। তাহার আভাস ত এখনি সে মনের মধ্যে স্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছে। কিন্তু পাছে সেই আনন্দ ধরা পড়িয়া তাহার বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইয়া যায় এই ভয়ে বিপিন যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

মালতীর মন কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না—তাহার তেজস্বী মন নৈরাশ্যকে স্বীকার করে না এবং আশাকেও আঁকড়িয়া ধরিয়া একেবারে ব্যাকুল হইয়া ওঠে না। মালতীও ঠিক বিপিনের মতোই ভাবিয়াছিল যে বিপিনকে ত সে এখন পাইতেছে না, কিন্তু তাহাকে চোখের দেখার সৌভাগ্য সে ত্যাগ করে কেন। বিপিনের প্রণয় নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া বেগহীন হইয়া পড়িয়াছিল; সেই নষ্ট বেগ সে ফিরিয়া পাইতে পারিবে যদি মালতী তাহার প্রণয় দিয়া বিপিনের মধ্যে নূতন আগ্রহ সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে; রক্তহীন রোগী যেমন অপরের সুস্থ তাজা রক্ত পাইয়া বাঁচিয়া ওঠে, তেমনি বিপিনের অবসন্ন প্রণয় মালতীর প্রণয়ের নিকট হইতে বললাভ করিয়া নূতন হইয়া উঠা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। মালতী বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিল যে এই পথ ছাড়া তাহার যাইবার অন্য পথ নাই; সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল সংগ্রাম যতই কেন বিলম্বিত ও কঠোর হোক না তাহার প্রণয়ের জয় নিশ্চিত, কিন্তু অন্য আর যে-কোনো পথের অন্তে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে ধ্রুব সর্ব্বনাশ।

তৎক্ষণাৎ আপনার তোরঙ্গ বিছানা গুছাইয়া লইয়া মালতী গাড়ীতে গিয়া চড়িল।

মালতী যখন স্বেচ্ছায় নবকিশোরকে ত্যাগ করিয়া বিপিনের সঙ্গ গ্রহণ করিল তখন নবকিশোর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তখন আবার সে নিজের স্বাভাবিক হৃদয়-বল যথাসম্ভব আহরণ করিয়া শুচি তেজস্বিতার সহিত বিপিন ও মালতীর নিকট

আসিয়া বলিল—তোমরা যাচ্ছ যাও, আমি এই বাড়ীতেই তোমাদের অপেক্ষা করে বসে থাকব, যেদিন ইচ্ছে হবে ফিরে এস।—ফিরে তোমাদের আসতেই হবে। বিপিন, তোমার আর আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই করতে হবে।

শেষের কথাটা নবকিশোর জোর দিয়া বলিল। মালতী ও বিপিন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, নবকিশোরের দিকে কেহই চাহিল না; তাহারা পরস্পরের দিকেও চাহিতে পারিতেছিল না। উভয়ে শূন্য দৃষ্টিতে গাড়ীর জানালা দিয়া দুজনে দুদিকে রাস্তার চঞ্চল জনপ্রবাহের পশ্চাতে ক্রমশ অপস্রিয়মাণ অট্টালিকাশ্রেণীর দিকে চাহিয়া রহিল।

আর নবকিশোর দীন অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত পরাজিত স্তব্ধ হইয়া সেই ক্রমশ দূরগামী গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার হৃদয়ের সমস্ত বল তেজ দর্প সাহস বিশ্বাস উৎসাহ যেন একেবারে এক ধাক্কায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে কেমন করিয়া হইবে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

ক্রমশ

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবর্-ই-নূরজাহান্

"বর্ মাজারে মা গরীবাঁ নঃ চেরাগে নঃ গুলে!
নঃ পরে পরমানা সুজদ্ নঃ সুতায়ে বুল্‌বুলে॥"

আজকে তোমায় দেখ্‌তে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান!
সন্ধ্যা রাতের অন্ধকার আজ জোনাক পোকায় স্পন্দমান।
বাংলা থেকে দেখ্‌তে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরাণ দেশের শকুন্তলা! কই সে তোমার রূপ অতুল?
পাষাণ-কবর-বোরকা খোলো দেখ্‌ব তোমায় সুন্দরী!
দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি।
জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার,
জাগ তুমি জাহান্-নূরী আলোয় ভর দিক আবার;
কর গো হতশ্রী ধরায় রূপের পূজা প্রবর্ত্তন—
কত যুগ আর চল্‌বে অলীক পরীর রূপের শব-সাধন?
জাগাও তোমার রূপের শিখা, মরে মরুক পতঙ্গ;
রতির মূরতিতে জাগ, অঙ্গ লভুক অনঙ্গ।

রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুল্‌বুলে তা জানেগো,
গোলাপ ঘিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোঁট হানে গো ;—
তুচ্ছ রূপার তরে মানুষ করছে কত দুষ্কৃতি,
রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বদ্ রীতি ?
খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুইধারে,
রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদ্দারে।

* * * *

রূপের আদর জান্‌ত সেলিম, রূপ-দেবতায় মান্‌ত সে ;
সোনার চেয়ে সোনামুখের ঢের বেশী দাম জান্‌ত সে ;
বিপুল ভারতভূমির সোনা সঞ্চিত তার ভাণ্ডারে
তবুও কেন ভরল না মন ? হায় তৃষিত চায় কারে ?
তোমার সোনামুখটি স্মরি' পাগল-সমতুল্য সে,
রূপের ছটায় ঝল্‌সেছে চোখ পুণ্য পাতক ভুল্‌ল সে,—
রক্ত-সাগর সাঁৎরে এসে দখল পেল পদ্মটির
রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।—
টাঁকশালে সে হুকুম দিল তোমায় পেয়ে পূর্ণকাম
"টাকায় লেখ জাহাঙ্গীরের সঙ্গেতে নূরজাহাঁর নাম।"
মোহরে নাম উঠ্‌ল তোমার, লেখা হল তায় শ্লোকে,
"সোনার হ'ল দাম শতগুণ নূরজাহানের নাম যোগে।"

* * * *

মরুভূমির শুষ্ক বুকে জন্মেছিলে সুলতানা !
গরীব বাপের গরব মণি সাপের ফণা আস্তানা।
তোমায় ফেলে আস্‌ছিল সব, আস্‌তে ফেলে পারল কই ?
দৈন্য দশার নির্ম্মমতা, টিঁকল না দু দণ্ড বই।
জয়ী হ'ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল স্নেহের পুতুল বুকের ধন।
মরুভূমির মেহেরবানী ! তুমি মেহের-উন্নিসা !
তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চির দিন নিশা !
পথের প্রসূন ! তোমার রূপে দুর্নিয়তি আকৃষ্ট—
ফেলে দেওয়া কুড়িয়ে নেওয়া এই তো তোমার অদৃষ্ট !

* * * *

দিনে দিনে উঠ্‌লে ফুটে পরীস্থানের জরীন গুল্!
মলিন ক’রে রূপরাণীদের ফুট্‌ল তোমার রূপের ফুল।
রূপে হ’লে অপ্সরী আর নৃত্যগীতে কিন্নরী,
শ্লোকরচনায় সরস্বতী ধী-শ্রীমতী সুন্দরী,
তীর ছোড়া আর ঘোড়ায় চড়ায় জুড়ি তোমার রইল না,
এমন পুরুষ ছিল না যে মূরত বুকে বইল না।
রূপের গুণের খ্যাতি তোমার ছাইল ক্রমে সব দিশা
নারীকুলের সূর্য্য তুমি, তুমি মেহের-উন্নিসা!
বাদ্‌শাজাদা দেখ্‌ল তোমায়—দেখ্‌ল প্রথম নওরোজে,
খুশী দিনের খুস্‌রোজে তার জীবন মরণ দুই যোঝে।
খস্‌ল হঠাৎ ঘোম্‌টা তোমার, সরমরাঙা মুখখানি
এঁকে গেল যুবার বুকে রূপরাণী গো রূপরাণী!
বাদ্‌শাজাদা চাইল তোমায়, বাদ্‌শা হ’লেন তায় বাদী;
শের আফ্‌গানের বিবি তুমি হ’লে অনিচ্ছায় কাঁদি।
বাঘ মারে শের শুধু হাতে তোমায় পাওয়ার হর্ষে গো
বর্দ্ধমানের মাটি হ’ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো।

* * * *

দিনের প’রে দিন গেল ঢের ছ’টা ঋতুর ফুল-বোনা,
বাদ্‌শা-জাদা বাদ্‌শা হ’ল তোমায় তবু ভুল্‌ল না;
অন্যায়ের সে বৈরী চির ভুল্‌ল হঠাৎ ধর্ম্ম-ন্যায়
ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল রূপের মোহের কী বন্যায়!
কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ
উদারচেতা সিংহ-জেতা সিংহ-তেজা শের আফ্‌গান;
সেলিমের দুধ-মায়ের ছেলে সুবাদারীর তৃষ্ণাতে
মারতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে;
তেজস্বী শের ঘৃণ্য কুতব পাশাপাশি ঘুমায় আজ
রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগ্‌ছে জাহাঙ্গীরের লাজ।
সকল লজ্জা ডুবিয়ে তবু জাগ্‌ছে নারী, তোমার জয়!—
সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার তুচ্ছ নয়।

* * * *

পাল্কী এল "আগ্রা চল" শাহান্‌শাহের অন্দরে,
কাছে গিয়ে দেখ্‌লে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্তরে।

মহলে কই বাদ্‌শা এলেন? মৌনে ব্যথা সইলে গো
চোদ্দ আনা রোজ খোরাকে রং-মহলে রইলে গো।
রেশ্‌মী পটে নক্সা এঁকে, গ'ড়ে ফুলের অলঙ্কার,
বাঁদী দিয়ে বিক্রী ক'রে হ'ত তোমার দিন্-গুজার;
সাদা-সিধা সুতির কাপড় আপনি পরে থাক্‌তে গো,
চাকরাণীদের রাণীর সাজে সাজিয়ে তুমি রাখ্‌তে গো।
স্পর্শে তোমার জুঁই-বুরুজের শিলায় শিলায় ফুট্‌ল ফুল,
রূপে গুণে ছাপিয়ে গেল রং-মহলের উভয় কূল।

* * * *

কথায় বলে মন না মতি,—সেলিমের মন ফিরল শেষ,—
হঠাৎ তোমার কক্ষে এল, দেখ্‌ল তোমার মলিন বেশ;
দেখ্‌ল তোমার পুষ্প-কান্তি, দেখ্‌ল জ্যোতির পুঞ্জ চোখ,
ভুলে গেল খুনের আড়াল, ভুল্‌ল সে দুধ-ভায়ের শোক।
বাদ্‌শা সুধান্ "এ বেশ কেন? নিজের দাসীর চাইতে ম্লান!"
জবাব দিলে "আমার দাসী—সাজাই যেমন চায় পরাণ।
তোমার দাসীর অঙ্গে খামিন্! তোমার খুশীর মতন সাজ।"
বাদ্‌শা বলেন "সত্যি কথা, দিলে আমায় উচিত লাজ,
আজ অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের! সুন্দরী!
চল আমার খাস্‌মহলে মহল-আলো অপ্সরী।
সিংহাসনে আসন তোমার, আজ থেকে নাম নূরমহল,
বাদ্‌শা তোমার গোলাম, জেনো, ক'রেছ তার দিল্ দখল্।"

* * * *

পাঁচ হাজারের এক এক মোতি, এম্‌নি হাজার মোতির হার
বাদ্‌শা দিলেন কণ্ঠে তোমার সাত সাগরের শোভার সার।
বাদ্‌শার উপর বাদ্‌শা হ'লে, বাদ্‌শা হ'লেন তোমার বশ
অফুরান্ যে স্ফূর্ত্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।
দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দ্দাতে,
জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চ্চাতে।
পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আসল শাহান্‌শা,
সেনা-নায়ক ভাইটি তোমার যোদ্ধৃ কবি আসফ জা।
দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব
বাড়ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব।

নূতন কত শিল্প প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে*
ফুলের আত্মা আতর হ'ল অমর হ'লে ইঙ্গিতে !
তুমি গো সাম্রাজ্য লক্ষ্মী কর্ম্মে সদা উৎসাহী
জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদশাহী ;
নারীর প্রতাপ, প্রতিভা আর নারীর দেখে মন্ত্রবল
দরবারী সব চট্‌ল মনে, উঠ্‌ল জ্বলে ওম্‌রাদল ;
বাদশাজাদা খুরম্‌ এবং দশহাজারী মহব্বৎ
বিষম হ'ল বৈরী তোমার তবুও তুমি সূর্য্যবৎ
রইলে দীপ্ত, রইলে দৃপ্ত করলে নিরোধ সব হানা
ধী-শ্রী-ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুল্‌তানা !
বাদ্‌শা যখন নজর-বন্দী মহব্বতের ফন্দীতে
চল্‌লে তুমি সিংহী সম চল্‌লে স্বয়ং রণ দিতে ;
হাতীর পিঠে হাওদা এঁটে ঝিলাম-নদের তরঙ্গে
ঝাণ্ডা তুলে লড়্‌তে এলে মাত্‌লে তুমি কি রঙ্গে ;
শত্রু মেরে করলে খালি তীরে-ভরা তিন্‌টে তূণ,
আঘাত পেয়ে কর্ণে কাঁধে যুঝ্‌লে তবু চতুর্গুণ ;
দুষ্‌মনেরা উঁচু ডাঙায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,
তোমার হানায় অধীর তবু ভাব্‌ছে কি যে করবে গো ;
হঠাৎ বেঁকে বস্‌ল হাতী বিমুখ হ'ল অস্ত্র-ঘায়
ফিরলে তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষুব্ধ রোষের যন্ত্রণায়।
বন্দী স্বামীর মোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী
মহব্বতের মুঠা শিথিল করলে ইরাণ-নন্দিনী,
জিতে তবু হারল শত্রু, করলে তুমি কিস্তিমাৎ
তোমার অস্ত্র অমোঘ সদা, তোমার অস্ত্র সে নির্ঘাত ;
ফকীর-বেশে শত্রু পালায়, তোমার হল জয় শেষে,—
তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহব্বত-খাঁ যায় ভেসে।

* * * *

আজ লাহোরের সহরতলীর কাঁটাবনের আব্‌ডালে
লুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঞ্জালে,
জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার যায় ঝরি,
আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী !

হোথা তোমার স্বামীর সমাধ্ যত্নে তোমার উজ্জল ভায়
ঝলমলিছে শাহ্-ডেরা রতন-মণির আলপনায়।
গরীব বাপের গরীব মেয়ে তুমি আছ এক্লাটি,—
সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি!
শাহ-ডেরার সুপ্ত মালিক জেগে তোমায় ডাক্‌ছে না,
তুমি যে তার নাইকো পাশে সে খোঁজ সে আজ রাখ্‌ছে না।
সূক্ষ্ম সোনার সুতায় বোনা নাই সে গদি তোমার হায়!
আজ্‌কে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায়।
বিস্মরণী লতার বনে ঘুমাও মাটির বন্ধনে
গোরী! তোমার গোরের মাটি রূপের গোপীচন্দন এ।
সোহাগী! তোর দেহের মাটি স্বামী-সোহাগ-সিঁদুর গো,
জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্বনারীর শ্রীদুর্গ!

* * * *

শিয়রে কি লিখন লেখা! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক
এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক
হে সুল্‌তানা! লিখেছ এ কী আফ্‌শোষে সুন্দরী!
লিখ্‌ছ তুমি "গরীব আমি" পড়্‌তে যে চোখ্ যায় ভরি।—
"গরীব-গোরে দীপ জ্বেল না ফুল দিয়ো না কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুল্‌বুলে।"
সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বলে না, নূরজাহান!
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে আজ পুষ্পলতার লুপ্তপ্রাণ।
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলায় ডুব্‌ছ কালের সঙ্কেতে।
ডুব্‌ছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুব্‌বে না,
রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা।
সেথায় তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠ্‌ছে ফুটে সর্ব্বদাই,
অনুরাগের চেরাগ যত উজল জ্বলে বিরাম নাই,
চিত্ত-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি'
মোগল-যুগের তিলোত্তমা! চিরযুগের সুন্দরী!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ওবেলায়

(গল্প)

এবার দার্জিলিঙে এসে এই কাহিনীটি শুনলুম।

অনেক দিনের কথা। ভুটিয়া-বস্তীতে এক ইংরেজ পাদ্রী বাসা বেঁধেছিলেন। ভুটিয়ারা সবাই তাঁকে বড় ভালোবাসত—বিশেষ করে ভুটিয়া-শিশুগুলি।

বিপদ-আপদে এই পাদ্রীসাহেব ভুটিয়াদের বল ভরসা সবই। কারুর অসুখ করলে বুক দিয়ে পড়ে তিনি সেবা করতেন,—তাঁকে ডাকতে হত না। এমন তাঁর যত্ন যে আপনার জনের যত্ন তার কাছে হার মেনে যেত।

পাদ্রীসাহেবের নিজের কোনো সংসার ছিল না। ভুটিয়াদের নিয়েই তাঁর সংসার। তাদের ভালোমন্দ নিয়েই তাঁর ভাবনাচিন্তা। ভুটিয়া-পাড়ায় যেখানে যা-কিছু ঘটত পাদ্রী সাহেবের অজানা থাকত না, এবং ছোটো-বড় যে-রকম অনুষ্ঠানই হোক না তার মধ্যে তাঁর হাত, তাঁর পরামর্শ থাকতই থাকত। কোথাও বিবাদ বাধলে সকলের আগে তাঁরই ডাক পড়ত এবং বিবাহের মিলন-সূত্রটি বাঁধা হবার সময়ও তাঁকে বাদ দেওয়া চলত না।

ভুটিয়া-শিশুগুলি যেন তাঁর প্রাণ ছিল। তাদের বুকে করে, কোলে করে, পিঠে করে, কাঁধে চাপিয়ে, মাথায় বসিয়ে, চটকে, টিপে, কাঁদিয়ে, হাসিয়ে তাঁর মনের আশ যেন মিটত না। তাঁর কাছে সুন্দর কুৎসিত ছিল না—ছেলে হলেই হল। রাস্তার উপর থেকে ধূলাকাদা-মাখা ছেলে অবলীলাক্রমে তিনি বুকে তুলে নিয়ে চুমু খেতেন; মনে কোনো ঘৃণা হত না। অনেক সময় নিজের হাতে তাদের গায়ের ময়লা পরিষ্কার করে দিতেন। তাতে তাঁর আনন্দই ছিল। ছেলেরাও তাঁর ভারি ন্যাওটা। দেখবামাত্র ছেলের পাল তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত—কেউ লাফিয়ে বুকে উঠত, কেউ কাঁধে উঠত, কেউ দুহাত দিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

ভুটিয়াদের মানুষ করে তোলবার জন্যে তাঁর মনে অনেক-কিছু সংকল্প ছিল। কিন্তু নিজের সামর্থ্য ও সংস্থান তেমন ছিল না বলে বেশী কিছু করে উঠতে পারেন নি। যা করতে পেরেছিলেন সে একটি স্কুল। স্কুলটিও যে রীতিমত বাড়ি-তুলে তৈরি করতে পেরেছিলেন তা নয়,—স্কুলের জন্য নিজের বসবার ঘরটি ছেড়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাইতেই স্কুল চলত,—পাড়ার সব ছেলে সেখানে একত্র হত। একসঙ্গে সবাইকে তিনি পেতেন—এতে তাঁর ভারি আনন্দ ছিল। সেখানে পড়াশুনা যত না হত, খেলাধুলা তার চেয়ে ঢের বেশী হত, সেই জন্য ছেলেরা সে জায়গাটা ছাড়তে চাইত না।

এই স্কুলে আর-একটি ব্যাপার হত, সে নানারকম উৎসবের অনুষ্ঠান। এই সব

উৎসবে আলো জ্বালিয়ে, ফুল ছড়িয়ে, নিশান উড়িয়ে, বাঁশি বাজিয়ে যে ঘটাটা হত তার রেশ অনেক দিন পর্য্যন্ত ছেলেদের মনের মধ্যে বাজতে থাকত। কিন্তু সব চেয়ে জমত বড়-দিনের উৎসবটি। সে সময় খাওয়া-দাওয়া আর সব আমোদ তো থাকতই তার উপর লাভ হত নানা রকমের নানা রঙিন খেলনা। এই খেলনাগুলি পূরা-আকারে না হোক, টুক্‌রো টুক্‌রো হয়েও সারা-বছর দিনরাত ছেলেদের হাতে হাতে ঘুরত।

(২)

সে বৎসর উৎসবের দিন ভোর না হতেই ছেলেরা পাদ্রীসাহেবের দরজা ঠেলতে আরম্ভ করেছে। পাদ্রীসাহেব কিছুতেই তাদের ঘরে ঢুকতে দেবেন না। তিনি ঘরের ভিতর থেকে চীৎকার করে বলছেন—"ওরে, এখন না! এখন তোরা যা! ওবেলা আসিস!" কিন্তু সে কথায় কান দেয় কে? শেষে তারা সকলে মিলে এমন ঠেলাঠেলি আরম্ভ করলে যে দরজা বুঝি ভেঙে পড়ে।

পাদ্রীসাহেব দেখলেন, ভালো-মুখে বল্‌লে হবে না। তখন তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন। ছেলেরা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল—তার পর কেউ ছলছল-চোখে, কেউ কাঁদো-কাঁদো মুখে—করুণ দৃষ্টিতে পাদ্রী সাহেবের দিকে চাইতে চাইতে ধীরে ধীরে চলে গেল।

আর কোনো বাধা ছিল না। আজকের উৎসবের জন্য তাঁর ঘরটি তিনি নতুন রকম করে সাজাচ্ছিলেন; মতলব ছিল এখন কারো কাছে ফাঁস করবেন না, সন্ধ্যার অন্ধকারে ছেলেদের একেবারে তাক্ লাগিয়ে দেবেন। সেই জন্য এবারকার উৎসব সকাল থেকে আরম্ভ না হয়ে সন্ধ্যাবেলা হবার আয়োজন হয়েছিল। তৈরি-করা গাছ দিয়ে, লতাপাতাফুল দিয়ে, ঝরণা দিয়ে ঘরের মধ্যে এমন একটি বাগান গড়ে তুলছিলেন যে দেখলেই যেন ছেলেদের মনে হয়—এ কী! এ যে স্বর্গের নন্দন কানন! দিনের আলোয় এর মূর্ত্তি তেমন ফুটবে না; সেই জন্য সন্ধ্যাবেলাকার ঝাপসা আলোর অপেক্ষায় ছিলেন। এখন ছেলেদের ঘরে ঢুকতে দিলে এর মোহিনী মায়া নষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্য বাধ্য হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর জন্যে তাঁর মনে কিন্তু একটি তীক্ষ্ণ বেদনা বিঁধে রয়ে গেল।

সমস্ত দিন তিনি ঘর সাজাতে ব্যস্ত। জানলার ফাঁক দিয়ে এক একবার তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন—ছেলেগুলো আশেপাশে ম্লানমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আজ তারা কোনো খেলাতেই মন দিতে পারছে না। আজ যেন তারা পথের কাঙাল—আশ্রয় নেই, আত্মীয় নেই, তাদের জীবনের স্ফূর্ত্তিই যেন উবে গেছে—এমনি তাদের মুখের ভাব!

পাদ্রীসাহেব জানালা দিয়ে ঘন ঘন আকাশের দিকে চাচ্ছিলেন—কখন্ দিনের আলো একটু ম্লান হয়ে আসে।

বিকেল যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় তিনি ঘর থেকে একবার বেরিয়ে এলেন ছেলেদের বলতে—ভালো কাপড়-চোপড় পোরে উৎসবের জন্য তারা তৈরি হয়ে

আসুক। কিন্তু বাইরে এসে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। ভাবলেন, বলবার আর তারা অপেক্ষা রাখেনি, নিজেরাই গেছে। * * *

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল। ধূসর সন্ধ্যাকে হঠাৎ একটা কালো পর্দ্দা দিয়ে কে যেন মুড়ে ফেল্লে। জোর বাতাস বইতে লাগ্‌ল, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

পাদ্রীসাহেব একলাটি ঘরের মধ্যে বসে বসে ভাবছিলেন—কখন ছেলেরা আসে! বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়ছিল, ঝড়ের গর্জ্জন ভীষণ হয়ে উঠছিল! এই ঝড়বৃষ্টি ঠেলে ছেলেরা কেমন করে আসবে তাঁর একটা দুর্ভাবনা হচ্ছিল বটে কিন্তু মনে এ আশাও হচ্ছিল যে বৃষ্টি হয় ত শীঘ্রই থেমে যাবে, এবং ছেলেরা আজকের এই উৎসব থেকে কিছুতেই বাদ পড়তে চাইবে না। * * *

ঘন ধারায় বৃষ্টি পড়ছে—উন্মত্ত গর্জ্জনে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়ে ঝড় ছুটোছুটি করছে—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। প্রদীপের ম্লান আলোয় পাদ্রীসাহেব ঘরের মধ্যে একা। ছেলেরা কৈ? ছেলেরা কৈ? উৎসবের আনন্দগুলি কৈ?—তাঁর প্রাণের মধ্যে থেকে কেবলই এই ব্যাকুল প্রশ্ন উঠছে। এত সাজসজ্জা সবই নীরস হয়ে শুকিয়ে উঠল যে! ভার হয়ে বুকে চেপে বসেছে যে! ঝড় বহে চলেছে—তার পিছে পিছে সময়ও বহে চলেছে,—কিন্তু অতিথি কৈ? অতিথি কৈ? উৎসবের আলোর শিখাগুলি যে এখনো জ্বলল না। আজকের এত আয়োজন যে ব্যর্থ হয়ে যায়!

একটি ব্যাকুল বেদনা পাদ্রী সাহেবের প্রাণটিকে কাঁদিয়ে তুলতে লাগল। তাঁর কেবলই মনে পড়তে লাগল—ছেলেদের সেই ম্লান মুখগুলি! মনে হচ্ছিল, আজ তিনি যে আঘাত তাদের দিয়েছেন সেই আঘাত ফিরে ফিরে তাঁর বুকে এসে বাজছে! * * *

ঝপ্ করে একটা শব্দ করে সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল! বাতাস আর বইছে না, বৃষ্টিধারা আর নেই।

পাদ্রীসাহেবের মন আশান্বিত হয়ে উঠল—এইবার ছেলেরা আসবে। তিনি উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় বসে রইলেন। এতক্ষণে তারা বাড়ী থেকে বেরিয়েছে!—এতক্ষণে তারা মাঝপথে!—ঐ বুঝি এল! তিনি উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। কিন্তু কৈ? কেউ তো আসেনি!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলি ভীষণ হয়ে তাঁর ব্যাকুল মনকে আরো ব্যাকুল করে তুলতে লাগল। সময় তো বহে যায়—তবু তো তারা আসে না! তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল—তারা অভিমান ভরে চলে গেছে, ব্যথা পেয়ে চলে গেছে; আর ফিরে আসবে না—ফিরে আসবে না! * * *

হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া তাঁর ঘরের দুখানা দরজা ধরে সজোরে একবার নাড়া দিয়ে চলে গেল। ঘরের উপরকার টিনের চালখানা একবার ঝন্‌ঝন্ করে উঠল,

দেয়ালের গা থেকে ফুলের মালাগুলো খসে খসে পড়তে লাগল! দরজা-জানলার ফাঁক দিয়ে কেমন-একটা শির্-শিরে বাতাস এসে তাঁর সমস্ত শরীরটাকে শিউরে দিতে লাগল। * * *

হঠাৎ ঘরের বাহিরে মৃদু পায়ের শব্দ, অস্ফুট কলধ্বনি শোনা গেল। মনে হল, কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে, টিপে টিপে পা ফেলছে। কিন্তু ঘরের ভিতর কেউ আসছে না। এ নিশ্চয় তাদের অভিমান—অভিমানের নীরব তিরস্কার!

পাদ্রীসাহেব উঠে গিয়ে দরজা খুলে হাত ধরে তাদের আনতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দরজা আর খুলতে হল না। ঝড়ের ঝাপটে দরজা আপনি খুলে গেল। কে যেন হুহু শব্দে ঘরের মধ্যে ছুটে এল—আলো নিবিয়ে, ফুল ছিঁড়ে, সমস্ত সাজসজ্জা একেবারে ওলট-পালট করে দিয়ে তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠল।

পাদ্রীসাহেব অনেক চেষ্টা করলেন, বাতি আর জ্বলল না; যেন কার তীব্র ফুৎকারে বার বার নিবে যেতে লাগল। বাইরে তখনো চাপা গলার মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। পাদ্রী সাহেব স্নেহের স্বরে ডাকলেন—"ওরে তোরা আয়! আর দেরী করিস্ নে!"

একদল ছেলে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল। তাদের কারো মুখে একটি কথা নেই—এতটুকু হাসি নেই!

পাদ্রী মনে মনে বললেন—এ অভিমান শীঘ্রই ঘুচবে—রোসো আগে খেলনা বার করি। তিনি অন্ধকারের মধ্যে হাৎড়াইরা ছেলেদের জন্য খেলনা বার করতে লাগলেন—

—এই নে তোর বাঁশি!

—এই নে তোর ফানুস!

—এই নে তোর কলের গাড়ি!

—এই নে তোর বিবি-পুতুল!

—এই নে—

কিন্তু এ কি! সমস্ত খেল্‌না মাটিতে গড়াগড়ি যে! কেউ যে তাঁর উপহার নেয় নি! তিনি সমস্ত উপহার উজাড় করে ফেললেন, কৈ কারো মুখে তো হাসি ফুটে উঠল না! তিনি সকলকার দিকে চেয়ে দেখলেন—এখনও সেই ম্লান মুখ, সেই ছলছল চোখ!

—ওরে তোদের এ কী দুর্জ্জয় অভিমান!

* * * *

পাদ্রীসাহেব গভীর রাত্রে বার হয়ে দেখলেন ভুটিয়া-বস্তীর একটা অংশ—যেখানে ছেলেরা থাকত সেখানটায় একটা গভীর গহ্বর দৈত্যের মতো হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে পড়ে আছে—বাড়ি ঘর দুয়ার সমস্ত কোন্ অতলে ধ্বসে চলে গেছে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ককারের অহঙ্কার

(বক্তা খোদ কর্ত্তা)

বকলমে স্বাক্ষরকারী :—

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শনে আমার দর্শন পাওনা বলিয়া আমার প্রতি আক্রোশ করিবার কোন কারণ নাই। কেননা, কণাদ কপিল আমাকে শীর্ষে স্থান দিয়াছেন, আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ন্যায়সূত্রকার গোতম অক্ষপাদ আখ্যা ও বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ স্বয়ং' আমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, তাই প্রকৃততত্ত্ব তাঁহার নিকটে করামলকবৎ প্রতীয়মান। চার্ব্বাকের আমিই বাক ফুটাইয়াছি। তিনিও লোকায়তদর্শনে সকল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। শারীরকসূত্রে ও বৈশেষিকদর্শনে আমি আছি; সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় আমি 'আদাবন্তে চ' রহিয়াছি। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ও কুসুমাঞ্জলি আমার কৃতিত্বের নিদর্শন। ইংরাজীওয়ালারা কোমত কোঁত কম্‌টে কম্‌ট প্রভৃতি যত রকমেই তাঁহাদিগের ফরাসী গুরুর নাম বিকৃত করুন, আমাকে এড়াইতে পারিবেন না। ক্যাণ্ট, ফিকটে, কুজিন, ডেকার্ট, লক, বার্কলে, ম্যাকশ, প্রভৃতি বৈদেশিক দার্শনিকও আমার অধিকারভুক্ত।

আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিকে, অবিকৃতি মূলপ্রকৃতিতে, প্রকৃতিবিকৃতিতে, ক্ষণিকবাদে, অধিকরণে, অহঙ্কারে, আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যায় ন্যায়ের কচকচিতে, কালীশঙ্করীতে, অবচ্ছেদকে, পূর্ব্বপক্ষে, কাকাক্ষিগোলক-ন্যায়ে, সূচিকটাহন্যায়ে, গতানুগতিকন্যায়ে, কাকতালীয়ন্যায়ে আমি, আবার কুম্ভক রেচক পূরক প্রভৃতি যোগশাস্ত্রের ক্রিয়ায়ও আমি। নবদ্বীপের ন্যায়দীপ রঘুনাথ আমারই কটাক্ষে কাণাভট্টে পরিণত। জরন্মীমাংসকে আমি, আবার শঙ্কর তর্কবাগীশ, কালিদাস বিদ্যারত্ন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, প্রভৃতি নৈয়ায়িক বৈদান্তিক আমার অধিকারভুক্ত। এতদ্ভিন্ন বহু তর্কবাগীশ, তর্কপঞ্চানন, তর্কালঙ্কার, তর্কভূষণ, তর্কচুঞ্চু, তর্করত্ন, তর্কতীর্থ আমার পায়ে গড়াগড়ি যান।

শিক্ষাকল্পব্যাকরণেও আমি মূর্ত্তিমান্। আবার আমার মাহাত্ম্যে অভিধানের নাম হইয়াছে কোষ। কলাপ-কাতন্ত্রে, সিদ্ধান্তকৌমুদীতে, কাশিকায়, সংক্ষিপ্তসারে, কবিকল্পদ্রুমে, শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়, প্রাকৃতপ্রকাশে, এমন কি, ব্যাকরণকৌমুদী ও উপক্রমণিকায়, কোথায় আমি নাই? আমিই সূত্রের সহিত বার্ত্তিক যোগ করিয়া

দিয়াছি, কাত্যায়ন-কৈয়ট-ক্রমদীশ্বরের মাথায় চড়িয়াছি, ভট্টোজিদীক্ষিতকে দীক্ষিত করিয়াছি, সংস্কৃত রোমক গ্রীক প্রভৃতি ক্লাসিকাল ভাষা গড়িয়াছি। সকল অক্ষরে, বিশেষ করিয়া যুক্তাক্ষরে, আমিই জড়াইয়া আছি, কণ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণকালে কণ্ঠ ও অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণকালে নাসিকা আমিই চাপিয়া আছি।

কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়াত্মক বাক্যে, প্রাতিপদিকে, প্রকৃতিতে, বিভক্তিতে, কৃৎপ্রত্যয়ে, কৃত্য-প্রত্যয়ে, কর্ত্তৃবাচ্য কর্ম্মবাচ্য কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে (কেবল ভাববাচ্যে আমার অভাব) আমি। কোন পুরুষে আমি নাই, কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে আছি। কারকে আমি, একবচনেও আমি আছি। ক্র্যাদিগণে আমি, ক্রিয়ার কালবোধক বিভক্তিতে আমি। কর্ম্মধারয়ে, একশেষদ্বন্দ্বে, অলুক্ সমাসে, শাকপার্থিবা-দিত্বাৎ সমাসে, আমি। বিকল্পবিধানে আমি। আমারই মুখরক্ষার জন্য 'তি', 'ত', 'তবৎ' 'ক্তি' 'ক্ত' 'ক্তবতু' সংজ্ঞালাভ করিয়াছে; 'গুণবৃদ্ধ্যোরভাজনং' ক্বিপ্‌প্রত্যয় ও ইগুপধাজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ আমারই জয়জয়কার। স্বার্থে কন্, সমাসান্ত ক, এবং ষ্ণিক ও ণক প্রত্যয়—এই চারিটী অস্ত্রে সকল শব্দকে কৃত্রিম উপায়ে স্বকীয় অধিকারে আনিবার জন্য ক্রূরকর্ম্মা আমিই কৌশল প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা কখন লক্ষ্য করিয়াছ কি?

শুধু নীরস দর্শন-ব্যাকরণে কেন, সরস কাব্যেও আমি প্রকাশমান। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং' ইতি লক্ষণেই আমি বার বার তিনবার তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। অলঙ্কারেও আমার ঝঙ্কার সুস্পষ্ট। কাব্য-প্রকাশ কাব্যাদর্শ কণ্ঠাভরণ ধ্বন্যালোক চন্দ্রালোকে তাহা দেখিতে পাইতেছ নাকি? কাকু আমারই স্বরবিকার, লক্ষণা আমারই কল্পনা, অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য আমারই অধিকার। অবাচকতা শ্রুতিকটুতা চ্যুতসংস্কৃতি প্রভৃতি দোষেও আমি ঢাকা পড়ি না। যমক রূপক দীপক ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা কাব্য-লিঙ্গ পরিকর, সহোক্তি অতিশয়োক্তি স্বভাবোক্তি সমাসোক্তি বিশেষোক্তি, সমস্তই আমার শক্তির বিকাশ। আবার ছন্দঃশাস্ত্র বৃত্তরত্নাকরে আমাকে দেখিতে পাইবে। শ্লোক যুগ্মক বিশেষক কলাপক কুলক সকলই আমার কৌশল। তোটক তূণক দোধকে আমিই পদান্তে আছি, পজ্ঝটিকায় আমিই ঝটিকা উৎপাদন করিয়াছি, বসন্ত-তিলকে আমিই তিলক পরাইয়াছি, পথ্যা-বক্ত্রের বক্ত্রে আমিই শোভা পাইতেছি, শার্দ্দূলবিক্রীড়িতের ক্রোড়ে আমিই ক্রীড়া করিতেছি। আমারই করুণায় মন্দাক্রান্তা শোক'ভারাদলসগমনা'।

শতক, শতশ্লোকী, কোষকাব্য, কথা, আখ্যায়িকা, প্রহেলিকা, নাটক ত্রোটক রূপক প্রকরণ, সব আমারই প্রকারভেদ। ভূমিকা বিষ্কম্ভক প্রবেশক প্রবর্ত্তক কথোদ্‌ঘাতে আমাকে পাইবে, অঙ্ক গর্ভাঙ্কে আমাকে পাইবে, 'আকাশে' 'জনান্তিকে' 'কর্ণে' 'নেপথ্যে মহান্ কলকলে' আমাকে পাইবে, আবার পটক্ষেপণেও আমাকে পাইবে। বিদূষক, পারিপার্শ্বিক, কঞ্চুকী, পরিব্রাজিকা, শকার, নায়ক নায়িকা, স্বকীয়া পরকীয়া, অভিসারিকা স্বাধীনভর্ত্তৃকা কল-

হান্তরিতা, কন্যাত্বজাতোপযমা সলজ্জা নব-যৌবনা—কেহই আমাছাড়া নহেন। সাত্ত্বিক ভাবে, কামজ দশকগণে, স্তোকবাক্যে, কৃতক-কোপে, কৃতককলহে, আমি লাগিয়াই আছি।

ভক্ষ্যসম্পৃক্ত ষড়্‌রসের মধ্যে মুখপ্রিয় মিষ্ট বা মধুরে না থাকিয়া কটুতিক্তকষায়ে থাকি, তাই সেই কসুর কাটাইবার জন্য আমি কাব্যসম্পৃক্ত নবরসের মধ্যে করুণরসে থাকিয়া তাহাকে মধুর করিয়াছি। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought—ইংরাজ কবির এই বাক্য আমার কথার পোষক। পক্ষান্তরে আমি ভয়ানকরসেও রহিয়াছি।

বাল্মীকি বা রত্নাকর আদিকবি আমারই মহিমায়। তাই ক্রৌঞ্চবধদর্শনে কবির বক্ত্র হইতে প্রথম শ্লোকের অভি-ব্যক্তি, শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ। বিক্র-মাদিত্যের সভাকবি কালিদাস নিজ নামের আন্ডক্ষরে আমার মান রাখিয়াছেন, আর আমিও তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছি। কথায় বলে, যাকে রাখ সেই রাখে। আমারই যোটকতায় নীলকণ্ঠসম্ভব জাতুকর্ণী-পুত্র শ্রীকণ্ঠকবি করুণরসে কৃতী। ধাবক আমারই কল্যাণে কাব্যবিক্রয়ে কাঞ্চনলাভ করিয়াছিলেন। শূদ্রক মৃচ্ছকটিককার আমারই কৌশলে। কবিকর্ণপূর আমার কৃপায় ভরপুর। কৃষ্ণকর্ণামৃত, চমৎকার-চন্দ্রিকা, চৈতন্যচন্দ্রিকা আমারই বর্ত্তত্বে বৈষ্ণবের কর্ণে অমৃতক্ষরণ করে।

রামায়ণের কাণ্ডই ত আমাকে লইয়া—লঙ্কাকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে আমার কিচ্‌কিচি শুনিতে পাও না কি? ত্রিশঙ্কু, ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ, জনক, কুশধ্বজ, কেকয়, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি ক্ষত্রিয় নৃপগণে, তাড়কা নিকষা কালনেমি কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষস-রাক্ষসীতে, কপি-কটকে, গুহকে, বিশল্যকরণীতে, জম্বুকে, অভিষেকে, দণ্ডকারণ্যে, কিষ্কিন্ধ্যায়, লঙ্কায়, অশোকবনে, কোথায় আমি নাই? বিশেষতঃ, কুব্জার কুমন্ত্রণায়, কেকয়ীর ক্রূরতায়, কৌশল্যার ক্রন্দনে, জানকীর অশোকবনে বাসক্লেশে ও অলীককলঙ্ক-কথায়, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে, কুশীলবের রামকথাকীর্ত্তনে, আমার কৃতিত্ব। আমারই জন্য লক্ষ্মণ সৌভ্রাত্রের আদর্শ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন শৌর্য্যবীর্য্যের আধার (কুম্ভকর্ণও কম কি?)

মহাভারত-কার কৃষ্ণদ্বৈপায়নে আমি, টীকাকার নীলকণ্ঠেও আমি। কুরুক্ষেত্রে, কপিধ্বজরথে, অক্ষৌহিণী সেনামধ্যে আমি বিরাজ করিতেছি। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণার কথায়, তক্ষক-পরীক্ষিতকথায়, কৌরবের ক্রূরতায়, শকুনির কপট অক্ষক্রীড়ায়, বৃকোদর কর্ত্তৃক রক্তপানে, শ্রীকৃষ্ণের রথচক্রধারণে, কর্ণের কবচকুণ্ডলদানে, ও অতিথিসৎকারার্থ বৃষকেতু-বধে আমি ('করাতে কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর')। কুন্তী, কর্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৌরব, কীচক, বকরাক্ষস, ঘটোৎকচ সকলেই আমার অধিকারভুক্ত। আবার আমার সন্তোষের জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণা, যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীমসেন বৃকোদর, অর্জ্জুন কিরীটী।

কালিদাসকৃত শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র আমারই প্রভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্য। আমার অভাবেই রঘুবংশ 'রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং?'

বলিয়া ধিক্কৃত। পক্ষান্তরে, আমি মেঘদূতে নাই বলিবার যো নাই, কবি 'কশ্চিৎকান্তা' বলিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়া আমারই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; 'যক্ষশ্চক্রে জনক-তনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু' ইত্যাদিও আমারই চক্রান্তে; পরন্তু অলকা হইতে কুবের-কর্তৃক বহিষ্কৃত কুবেরকিঙ্কর যক্ষের বিরহ-কাহিনীতে আমি বহুস্থলে ঝঙ্কৃত—'কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু' প্রভৃতি বাক্যই তাহার সাক্ষ্য। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ' কালিদাস-সম্পর্কে এই কিংবদন্তীতেও আমি প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত। 'একোঽভূৎ নলিনাৎ' প্রভৃতি কর্ণাটরাজপ্রিয়ার কাণ্ডেও আমি প্রকট।

কালিদাসের খণ্ডকাব্যের অনুকরণ পদাঙ্কদূতে আমার পদাঙ্ক দেখিতে পাও না কি? আমি কিরাতার্জ্জুনীয়ে আছি, শিশু-পালবধে না থাকিলেও কোলাচল-মল্লিনাথ-সূরির সর্ব্বঙ্কষা টীকায় আছি। নাটকের মধ্যে আমি বিশেষভাবে মহানাটক মৃচ্ছকটিক চণ্ডকৌশিক মুদ্রারাক্ষস অবিমারক প্রিয়দর্শিকার শেষ রক্ষা করিয়াছি। ইহা ছাড়া কামন্দকী কপালকুণ্ডলা মকরন্দ মদয়ন্তিকা মালবিকা বকুলাবলিকা নিপুণিকা কুরঙ্গী চাণক্য রাক্ষস প্রভৃতি বহু নাটকীয় পাত্রপাত্রী আমার বশ্যতা স্বীকার করেন।

গদ্যকাব্যে কাদম্বরী আমার প্রধান কীর্ত্তি। শুধু নায়িকা কাদম্বরী কেন, শূদ্রক শুকনাস কপিঞ্জল ইহার সাক্ষী। আর চণ্ডাল-দারিকা ও তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীর কথা তুলিব কি? দশকুমারচরিতে, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায় আমি বিরাজ করিতেছি। কথাসরিৎসাগরে, বৃহৎকথায়, কামন্দকীয় নীতিসারে, কৌটিল্য সূত্রে, চাণক্যশ্লোকে, আমার সাক্ষাৎ পাইবে। পঞ্চতন্ত্রকে কাকোলূকীয়ে, কাককূর্ম্মকথায়, মূষিককপোতকথায়, করটক-দমনক-কথায়, কল্যাণকটকে, শক্তুশরাবে, করালকেসর কর্পূরপট কাষ্ঠকূট বীণাকর্ণ প্রভৃতি রকমারি নামে, 'কথমেতৎ' ও 'কস্মিংশ্চিৎ' বলিয়া কথারম্ভে আমাকে পাইবে।

কাঁকড়া অক্ষর ও বিভক্তিবাহুল্যের জন্য যদি কটমট সংস্কৃত ভাষা দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠ, তাহা হইলে না হয় কোমলপ্রকৃতি বাঙ্গলা ভাষার কথাই কহিতেছি।

প্রাকৃত ভাষার বিকার বাঙ্গলা ভাষার আধুনিক ব্যাকরণকার পণ্ডিত নকুলেশ্বর আমার অনুগৃহীত। প্রশ্নসূচক বাক্যে কি, কেন, কোথায়, কৈ, অনুজ্ঞায় করুক, বলুক, হউক, যাউক, সম্বন্ধ পদে আজকার, কালকার, সত্যিকার, বিদ্যাসাগরী ভাষায় করিবেক, যাইবেক, দেখিবেক, রাঢ়ের গ্রাম্য ভাষায় যেতেক্ নারি শুতেক্ নারি, এ সকলই আমার রকম রকম কারসাজি। কর্ম্মের পিছনে 'কে' লাগিয়া আছে, সে যে আমিই তাহা বুঝ না কি? 'যতেক', 'এতেক', 'কতক', 'কয়েক' স্থলে আমিই উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছি। আমারই জোরে 'জলকে যেতে আঁচলে ধরে কালা।'

আবার বাঙ্গলা ভাষাকে 'সাধু' সাজাইতে হইলেও আমার ডাক পড়ে। কৃ ধাতুর যোগে যৌগিকক্রিয়ানির্ম্মাণে আমি করিৎকর্ম্মা। আমার যোগসাযোগে রন্ধন করা, ভক্ষণ করা, শয়ন করা, উপবেশন করা, ভিন্ন সাধুভাষার একদণ্ড চলে না। আমারই

দাপটে 'সাহিত্যিক' 'ঔপন্যাসিক' 'ঐতিহাসিক' প্রভৃতি জীবের উদ্ভব। আর কিছুকাল আসকারা পাইলে 'কাব্যিক,' 'গাল্পিক' 'গাঙ্খিক' 'পাঙ্খিক' বানাইয়া ছাড়িব!

বাঙ্গলা সাহিত্যে 'ক' 'খ' জানিলেই গ্রন্থকার হয়—(কবি ও পাঁচালীওয়ালারা আবার অনেকে আরও এক কাঠি সরেস ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা কেহ কেহ একেবারে নিরক্ষর ছিলেন।) সুতরাং এক্ষেত্রে আমার কীর্ত্তি জল্-জল করিতেছে। মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, 'ত্র্যাহিক', দৈনিক, সব রকম কাগজেই আমি। প্রভাকর-ভাস্কর-নব বিভাকরে আমারই কর শোভা পাইত, এক্ষণে নায়ক, দর্শক, সাধক, বিক্রমপুর, কুশদহ, দৈনিকচন্দ্রিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় কাগজে আমি জোনাকির আলোক বিকীর্ণ করিতেছি। কায়স্থকৌস্তুভ আমারই কীর্ত্তিতে উজ্জ্বল। 'কায়স্থপত্রিকা'র দুই দিক্ রক্ষা করিবার দরকারে আমি আকার গ্রহণ করিয়াছি। খবরের কাগজের প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রে আমি, লেখক-সমালোচকে আমি, আর্টিকেলে আমি, 'সডাক' বার্ষিক মূল্যে আমি। পুস্তক বা কেতাবে আমি, সংস্করণ-সঙ্কলনে আমি, প্রকাশকে আমি, কম্পোজিটরে আমি, ভূমিকা অবতরণিকা-গৌরচন্দ্রিকায় আমি, ক্রোড়-পত্রে আমি, ক্রমশঃ প্রকাশ্যে আমি, করকমলে উপহারে আমি, ক্যাটালগে আমি, সার্কুলেটিং লাইব্রেরীতে আমি, পাঠক-পাঠিকায় আমি। মৌলিকে আমি, অনুকরণে বা অবিকল নকলে আমি, কোটেশন-কণ্টকিত কলমবাজীতে আমি, ভাবুক কবিতে আমি, কপোল-কল্পিত কথায় আমি, কষ্টকল্পনায় আমি। মৌখিক বক্তৃতায়, ডাকের কথায়, রূপকথায়, ছড়াকাটায়, কবির লড়াইএ, কলেজীয় কবিতাযুদ্ধে, আধুনিক কার্টুনে আমি। রূপকথায় কঙ্কাবতী, কেশবতী রাজকন্যা, পক্ষিরাজ ঘোটক, রাক্ষস, কোটালপুত্র, সকলেই আমার সম্পর্ক রাখেন।

প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস-কাশীদাস, ক্ষেমানন্দ কেতকীদাস, কবিকঙ্কণ-কবিরঞ্জন-কবিচন্দ্র-কবিবল্লভ, রায়গুণাকর, সাধক কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস-কবিরাজ, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, আমার উপাসক। হাকন্দপুরাণে, কাল-কেতুতে, কর্পূরে, ধূমকেতুতে, কালীদহে কমলে কামিনীদর্শনে আমাকেই প্রত্যক্ষ কর। আবার অক্রূরসংবাদে, কড়চায়, ভক্তমালে আমার সাক্ষাৎ পাও।

আধুনিক কালের কলেজে কৃতবিদ্য ব্যক্তি-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমে আমি রহিয়াছি। আমি মধুসূদনে নাই, তাই মাইকেল নামকরণ করাইলাম, প্যারীচাঁদকে টেকচাঁদ ঠাকুর নাম ভাঁড়াইলাম, ইন্দ্রনাথকে 'পাঁচু-ঠাকুর' বানাইলাম, রবীন্দ্রনাথের ক-অক্ষরের অভাব পূরণের জন্য তাঁহাকে ডকটর ও কবি-সম্রাট্ উপাধি দেওয়াইলাম। কান্তকবি (রজনীকান্ত সেন) ও রজনীকান্ত গুপ্ত আমারই কল্যাণে লোকপ্রিয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ উভয় কায়স্থই আমার অনুগত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আমায় ডবল ডোজে চড়াইয়াছেন, তাই তাঁহার কলম হইতে 'মিঠেকড়া' জন্মিয়াছে। অক্ষয় দত্ত, অক্ষয় সরকার (কদমতলার), অক্ষয়

মৈত্রেয়, অক্ষয় বড়াল, চারি অক্ষয়েই আমি অক্ষয় হইয়া আছি।

জয়দেবের বাসস্থলী কেন্দুবিল্বে আমি, চণ্ডীদাসের সমাধিস্থান কীর্ণাহারে আমি, রায়গুণাকরের কর্ম্মক্ষেত্র কৃষ্ণনগরে আমি, মধুসূদনের জন্মস্থান কপোতাক্ষকূলে আমি, বিদ্যাসাগরের অবকাশযাপন-স্থান কর্ম্মাটাড়ে আমি, বঙ্কিম-সঞ্জীবের বাসগ্রাম কাঁঠালপাড়ায় আমি, বোসজার বিশ্বকোষ-কুটীর কাঁটাপুকুরেও আমি।

কৃষ্ণচন্দ্রের সদ্ভাবশতক, রাজকৃষ্ণের কাব্য-কলাপ, কালীকৃষ্ণের কামিনীকুমার, অক্ষয় বড়ালের কনকাঞ্জলি, ক্ষীরোদপ্রসাদের কবি-কাননিকা, মানকুমারীর কাব্যকুসুমাঞ্জলি, স্বর্ণকুমারীর 'ছিন্নমুকুল' 'কাহাকে' এই কয়েকস্থলে লেখক ও পুস্তক উভয়ত্রই আমি। করুণানিধান, কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, তিনজন নবীন কবি আমারই প্রসাদে কবিকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরের দেওয়ান ৺ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত আমারই গুণে উৎকৃষ্ট ইতিহাস। আমারই অসকৃৎ সংযোগে তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' বাণভট্টের মূল অপেক্ষাও সুললিত। বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগরও 'কথামালা' লিখিয়া আমার আবদার রক্ষা করিয়াছেন। পুরুষপরীক্ষা, প্রবোধচন্দ্রিকা, কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত, পত্রকৌমুদী, কুপিতকৌশিক, কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব, নবনাটক, কলিনাটক প্রভৃতি সেকেলে পুস্তকেও আমার আটক নাই। কাঠের অক্ষরে কেরি-উইলকিন্সের কীর্ত্তিতে আমিই প্রকাশমান।

বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের, লোকরহস্যের, কমলাকান্তের দপ্তরের, কৃষ্ণকান্তের উইলের ও কপালকুণ্ডলার উৎকৃষ্টতার নিদান আমিই। কপালকুণ্ডলা, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি, কুলসম, নবকুমার, রুক্মিণীকুমার, ভবানী পাঠক, প্রভৃতির চরিত্রমাধুর্য্য আমারই জন্য। সেকাল ও একাল, কৃষ্ণকুমারী, কর্ম্মদেবী, কমলে কামিনী, কবিতাবলী, কল্পতরু, ক্ষুদিরাম, মাধবীকঙ্কণ, কালাচাঁদগীতা, অবকাশরঞ্জিনী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, কঙ্কাবতী, কণ্ঠমালা, কামিনী ও কাঞ্চন, এবং রবীন্দ্রনাথের কণিকা, ক্ষণিকা, কড়ি ও কোমল, কথা ও কাহিনী, নৌকাডুবি, ডাকঘর, সবই আমার কীর্ত্তিকথা।

আমারই গুণে কাব্যচিন্তা ও কাব্যসুন্দরী উৎকৃষ্ট সমালোচনাগ্রন্থ। তর্কালঙ্কারের 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল' ইত্যাদি প্রকৃতিবর্ণনেও আমি, আবার মাইকেলের 'একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে' ইত্যাদি করুণরসেও আমি। আজকালকার কীর্ত্তিমান্ বক্তা ও লেখক পাঁচকড়ি বাবু কয় কড়া কড়ির জন্য আমারই নিকট ঋণী। আর আমার স্বীকারোক্তির বকলমে স্বাক্ষর-কারী এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি যে 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' লিখিয়া শস্তায় কিস্তি পাইয়া বৈয়াকরণ-কেশরী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেও আমার ঘটকালীতে—ইতি কিমু বক্তব্যম্ ?*

* হুঁঃ, আমাকে টিটকারী করা! 'ক'এর সকল কথাই ত কাণ করিয়া শুনিলাম। কিন্তু কূলের কথা প্রকাশ করিয়া কহিব কি ? তবে শ্রবণ করুন। 'ক'এর মতিস্থির নাই, সন্ধিকালে কখন 'গ' কখন 'ঙ' হইয়া

যান, স্বয়ং বাগ্‌দেবী ও সমগ্র বাঙ্ময় তাহার সাক্ষী। বিকৃত উচ্চারণেও 'ক' 'গ' হইয়া পড়েন, কাগে বগে তাহা টের পায়, শাগেও তাহা ঢাকা পড়ে না, আর 'বিগারে'র ক্রিয়ায় ত একেবারে বিগড়াইয়া বসেন। তাহার পর 'ষ'এ যুক্ত হইলে বাঙ্গালা উচ্চারণে কনিষ্ঠ কিন্তু মহাপ্রাণ 'খ'এর দিকে হেলেন ও তাহার দখলী সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন। যাক্, সে সকল স্থলে নিজের বর্গ ছাড়েন না, ইহাও মন্দের ভাল। কিন্তু অভ্যস্ত ধাতুতে যে 'ক'কার 'চ'কার হইয়া পড়েন (লিটের 'চকার' ইহার প্রমাণ), তখন যে জাতিকুল পর্য্যন্ত থাকে না। আরও দেখুন, প্রাকৃত ভাষায় বিকার ঘটিলে 'ক'ই আগে কাবু হয়েন (নকুল = নেউল, দেবকুল = দেউল, ব্যাকুল = বাউল, শূকর = শূওর, গুবাক = গুয়া, কেতকী = কেয়া, শুক = শূয়া, বণিক্ = বেণে, আলোক = আলো।) এই ত ক্ষমতা! ওদিকে আবার পরের ঘরের দিকেও লক্ষ্য আছে; অসহায় (= হসন্ত) 'চ' 'জ' বা 'শ' পাইলে নিজে তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া লয়েন—জলমুক্, বণিক্, দিক্, ইহার সাক্ষ্য দিক। নিজের এত গলদ, অথচ অহঙ্কার—অথবা ভাষাকথায় দেমাক, ঠেকার, ঠসক দেখে কে? আমাকে ঘাঁটাইলেই কূলের কথা প্রকাশ করিয়া দিব। ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকা-কারের টীকা।

বর্ষার আগমনী

বৃষ্টি-মুকুল মঞ্জীর পায়
কুটজ কাঞ্চী পরি,
কণ্ঠে জড়ায়ে সৌরভময়
মালতীর সাতনরী,
কদমের ফুল কর্ণে দোলায়ে
যূথিকা-বলয় হাতে,
এস সুন্দরী মোহিনী বরষা
আজিকে আষাঢ়-প্রাতে।

বলাকার শ্রেণী সরণি দেখায়ে
উড়িয়া চলিবে আগে,
ইন্দ্রধনুরা সাজাবে তোরণ
সম্মুখে অনুরাগে,
কামিনী-বকুল ঝরিয়া ভূতলে
কোমল করিবে পথ,
দখিয়াল-গীতি শ্রান্তি হরিবে
বাতাস বহিবে রথ।

ধরণী সে হের বরিতে তোমায়
কত উল্লাস মনে!
ইন্দ্র-গোপের চুমকিতে রাঙা
পাতিয়াছে তৃণাসনে,
ভূমি-চম্পক ফুটায়ে যতনে
উপাধানখানি গড়ি
সেগুনে সাজায় পুষ্প-চামরে
ব্যজন করিতে, মরি!

স্বাগত সরসা বরষা রূপসী
নিশি রচি নভ-গায়
মেঘ-মৃদঙ্গে করি করাঘাত
বিদ্যুৎ-পতাকায়!
সার্থক হোক সকল বিশ্ব
আগমনে তব রাণী,
প্রীতির বন্যা উছলি পরাণে
ধুয়ে দিক সব গ্লানি।

শ্রীনলিনীনাথ দে।



চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে'।—"ফাল্গুনী"—রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত।

উপনিষদে আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসের একটী প্রমাণ

বেদ, উপনিষদ, আর্য্যদিগের সর্ব্বাদি-গ্রন্থ। এই সমস্ত গ্রন্থে আর্য্যদিগের সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহা যে বিশেষ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

'উত্তরকুরু' ও 'কুরু' আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে একই পর্য্যায়ভুক্ত দেখিতে পাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে কুরুদেশের ভীষণ দুর্ভিক্ষের একটী উপাখ্যান পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"মটচীহতেষু কুরুষ্বাটীক্যাসহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস। ১

"সহেভ্যং কুল্মষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে তং হোবাচ নেতোঽন্যে বিদ্যন্তে যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি।২

এতেষাং মে দেহীতিহোবাচ তানস্মৈ প্রদদৌ হন্তানুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈমে পীতং স্যাদিতি হোবাচ।৩

নস্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতিনবা অজীবিষ্যমিমান খাদন্নিতি হোবাচ কামোম উদকপানমীতি।৪

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ১ম অধ্যায় ১০ম খণ্ডঃ।

"পাষাণবৃষ্টির দ্বারা শস্যসম্পত্তির নাশে কুরুদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, চক্রতনয় উষস্তি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্রাপ্ত যৌবনা নিজ ভার্য্যা আটিকীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে অন্ন-লাভ হেতু মরণাপন্ন অবস্থায় হস্তিপকদিগের গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন।১

উষস্তি যদৃচ্ছাক্রমে কুৎসিত মাষকলায় ভোজনকারী এক জন হস্তিপকের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত কলায় যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। উষস্তিকে কলায় যাচ্ঞা করিতে দেখিয়া ঐ হস্তিপক বলিয়াছিলেন, আমি যাহা ভক্ষণ করিতেছি, এই উচ্ছিষ্ট কলায় ভিন্ন আর আমার কলায় নাই, আমার যাহা কিছু ছিল, তাহা এই পাত্রেই রাখা হইয়াছিল।২

হস্তিপকের বাক্য শ্রবণ করিয়া উষস্তি বলিয়াছিলেন, উহা হইতে আমাকে কিছু দাও। হস্তিপক তাঁহাকে উহারই কিয়দংশ প্রদান করিয়াছিল। পরে যখন হস্তিপক উষস্তিকে পানীয় গ্রহণ করিতে বলিয়াছিল, তখন উষস্তি বলিয়াছিলেন, ঐ পানীয় গ্রহণ করিলে আমার উচ্ছিষ্টভোজন করা হইবে।৩

তচ্ছ্রবণে হস্তিপক বলিয়াছিল, আপনি এই যে কলায়গুলি গ্রহণ করিলেন, এইগুলি উচ্ছিষ্ট নয়? উষস্তি উত্তর করিয়াছিলেন, এই কলায়গুলি ভক্ষণ না করিলে আমার জীবনরক্ষার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই আমি এইগুলি ভক্ষণ করিয়াছি।

এখন পানীয় আমার ইচ্ছানুসারে অন্যত্রও পাইতে পারি অতএব উচ্ছিষ্ট জল পান করিব না।"৪

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামির অনুবাদ।

এখানে পাষাণবৃষ্টি শিলাপাত বলিয়াই বোধ হয়। উষস্তি ও হস্তিপকের মধ্যে কথোপকথন হইতে জাতি ও স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার যে তৎসময়ে বিশেষভাবেই বর্ত্তমান ছিল, তাহার স্পষ্ট আভাসই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এতদুভয়ের মধ্যে উষস্তিকেই উচ্চজাতীয় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। উষস্তি অতঃপর কোন রাজার যজ্ঞে ঋত্বিক কার্য্যে বৃত হইয়া ধন প্রাপ্ত হন, উপাখ্যানের উপসংহারে এরূপ উল্লেখ আছে। ইহা হইতে উষস্তি কেবল উচ্চজাতি ছিলেন বলিয়াই বুঝা যায় না পরন্তু তিনি যে সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন তাহাই বুঝা যায়। কারণ ঋত্বিক্ কার্য্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অধিকার থাকার কোন প্রমাণ শাস্ত্রে আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অপর জাতির স্পৃষ্টান্ন ভোজন কেবল আপদ্ধর্ম্ম রূপেই শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহাতেই

উষস্তি কেবল প্রাণরক্ষার্থই উচ্ছিষ্ট মাষকলাই খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাণরক্ষা হইলেই তিনি আর উচ্ছিষ্ট জলপানে সম্মত হইলেন না। সুতরাং এখানে আমরা জাতিধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাবের পরিচয়ই প্রাপ্ত হইতেছি। ইহা হইতে উত্তরকুরুবাসের সময়ই যে আর্য্যদিগের মধ্যে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই। পারসীক-দিগের মধ্যে যে ভারতীয় আর্য্যদিগের অনুরূপ উপনয়নপ্রথা ও জাতিবিভাগ দৃষ্টহয় তাহাতেও সপ্রমাণ হয় যে আর্য্যদিগের পরস্পর বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

ছান্দোগ্যোপনিষদে কুরুদেশের নাম যেমন আমরা প্রাপ্ত হই, তেমনই কেকয় দেশ (৫।১১। ৪-৫) ও গান্ধার দেশের নামও (৬।১৪।১-২) প্রাপ্ত হই। শেষোক্ত দেশ দুইটী ভারত বহির্ভূত দেশ—ভারতান্তর্ভূত কোন দেশের নামই ছান্দোগ্যে উল্লিখিত দেখা যায় না। সুতরাং কুরুদেশ যে উত্তরকুরু দেশকেই বুঝাইতেছে তাহা আমরা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

ছান্দোগ্যোপনিষদে কেবল যে কুরুদেশের নামই পাওয়া যায় তাহা নহে; পরন্তু শাস্ত্রাদিতে আর্য্যদিগের আদি বাসভূমিতে ছয় মাস দিবা ও ছয় মাস রাত্রি থাকার যেরূপ আভাস রহিয়াছে, তাহার বর্ণনাও পাওয়া যায়; যথা :—

"অথ তত ঊর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্ত মেতৈকল এব মধ্যস্থাতা। তদেষ শ্লোকঃ॥১

নবৈতত্র নানিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন দেবাস্তে-নাহং সত্যেন মাবিরাধিষি ব্রহ্মণেতি॥২

নহবা অস্মাউদেতি নানিম্লোচতি সকৃদ্দিবা হৈবাস্মি ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ॥"৩

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ তৃতীয় অধ্যায় ১১শ খণ্ডঃ।

"অনন্তর ঐ স্থান হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া উদয়ের পর আর উদয়াস্ত ভোগ করিতে হয় না। ঐ স্থানে সূর্য্য একভাবে মধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে বক্ষ্যমান শ্লোক উক্ত হইয়াছে।১

ঐ শ্লোক, যথা—ঐস্থানে ক্রমিক উদয়াস্ত নাই। ঐস্থানে সূর্য্য কখন অস্তগমন করেন না; অতএব ঐস্থানে অস্তগমনের পর যে উদয় তাহাও হয় না। দেবতারা শ্রবণ করুন, আমি সত্য বাক্য বলিতেছি। ঐ সত্যের প্রসাদে আমি ব্রহ্মভাব লাভ বর্জ্জিত হইব না।২

যিনি এই ব্রহ্মরহস্য অবগত হন তাঁহার পক্ষে একেবারেই দিবা হয়—সূর্য্য উদয় হন না বা অস্তগমন করেন না।"৩

উপরিবর্ণিত স্থান-মাহাত্ম্য শ্লোকাকার প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে ঐস্থান পবিত্র স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং আর্য্যগণ এরূপ স্থানেই তখন অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন যে সেখানে প্রতিদিবস সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হইত। তাহাতেই উত্তরকুরুর ছয়মাস একক্রমে দিবা অসম্ভাব্য ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। এই জন্যই ইহার সম্বন্ধে প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য এরূপ শপথ-সহকৃত উক্তির প্রয়োজন হইয়াছে।

উপনিষদ্-বর্ণিত চিরদিবালোক-বিভাসিত স্থান যে চিরভাস্বর ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তুলিত হইয়াছে তাহাতেই আমরা আমাদের পরম দিব্যধাম ব্রহ্মলোকের আদর্শ যে কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রকৃত রহস্য উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হই। মহর্ষি মনু তদীয় সংহিতায় প্রথম আর্য্যাধিবাসকে যে ব্রহ্মাবর্ত্ত আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা যেমন ব্রহ্মার অধিষ্ঠানরূপে কল্পিত দেখিতে পাই,

তেমনই দেবস্থানরূপেও কল্পিত দেখিতে পাই যথা—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥"

ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্যদিগের আদিস্থান, উত্তর-কুরুও আদি অধিস্থান। উত্তরকুরুর ছয়মাস ক্রমাগত দিবা ও ব্রহ্মাবর্ত্তস্বরূপ ব্রহ্মধামের চিরদিবালোকের সাদৃশ্য হইতে ব্রহ্মাবর্ত্তকে আমরা উত্তর কুরুর সহিত অভিন্ন মনে করিবার যথেষ্ট কারণই প্রাপ্ত হইতেছি।

প্রাগুক্ত পর্য্যালোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারি যে উপনিষদের উল্লিখিত দিব্যধামই কালক্রমে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মাবর্ত্ত, উত্তরকুরু প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রচর্ত্তী।

বৈদিক সভ্যতা

যজ্ঞ ঃ—দেবতার তৃপ্তি-সাধনের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করিবার বিধি হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্মে প্রচলিত দেখা যায়। বৈদিককাল হইতেই ভারতের ঋষিগণ যজ্ঞকার্য্য-সম্পাদনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন; 'হোতা' 'পাতা' 'অধ্বর্য্যু' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ঋত্বিকগণ যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতেন। অগ্নি না হইলে কোন যজ্ঞই সম্পন্ন হইত না; এইজন্য ঋগ্বেদের অনেক স্থলে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সায়ণ বলেন,—"যথা রাজ্ঞ পুরোহিতঃ তদভীষ্টং সম্পাদতি, তথা অগ্নিরপি যজ্ঞস্য অপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি যদ্বা সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগে আহবনীয় রূপেণ অবস্থিতং"। পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্তে অবস্থিতা সরস্বতী নদীর তীরেই বড় বড় যজ্ঞ সম্পাদিত হইত, তাহার তীরভূমি প্রতিনিয়ত বেদমন্ত্রে মুখরিত থাকিত; এইজন্যই পরবর্ত্তীকালে সরস্বতীকে মন্ত্রের দেবী বা বাগ্দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকিবে। (Muir)

জাতিভেদ ঃ—বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল না। ১।৭।৯ ঋকে পঞ্চক্ষিতি শব্দ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। সায়ণ পঞ্চক্ষিতি অর্থে চারিজাতি এবং নিষাদ—এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী যাহা বলেন, তাহা এই,—প্রাচীন কালে ইদানীন্তন জাতি-বিভাগের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। * * ক্ষিতি শব্দে কিরূপে জাতি বা বর্ণ বুঝাইবে? ক্ষিতি শব্দের অর্থ স্থান। আমার বোধ হয় যে পাঞ্চাল প্রদেশের পঞ্চনদান্তর্গত পঞ্চভূভাগ, যেখানে আর্য্যেরা প্রথমে বাস করিয়াছিলেন, এই মন্ত্রে তাহারই উল্লেখ আছে। এই পঞ্চনদের নামও অন্যত্র দৃষ্ট হয়। মোক্ষমূলর ও সায়ণের অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, "If, then, with the document

before us, we ask the question, does caste, as we find in Manu and at the present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided no"—Chips from a German workshop. Vol II. ঋগ্বেদের মধ্যে ঋত্বিক শ্রমজীবী ও রাজপুরুষগণের উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু এই তিনশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে আহারাদি ও বিবাহ-কার্য্য নিষিদ্ধ ছিল না। বেবার এই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "There were no castes as yet; the people is still one united whole and bears but one name that of the visas.—Indian Literature (Translated) P.38. Muir সাহেব কর্ত্তৃক রচিত Sanskrit Texts নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে কিন্তু সেরূপ সূক্ষ্ম বিচারের স্থান আমাদের নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমান কালে আমরা জাতিভেদ বলিতে যাহা বুঝি ঋগ্বেদের কোথাও তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায় না।

১।১০।১ ঋকে আবার ব্রাহ্মণ শব্দ লইয়া এই রূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সায়ণ 'ব্রাহ্মণঃ' অর্থে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন। পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী ইহার অর্থ করিয়াছেন ব্রহ্মাদি অন্যান্য ঋত্বিকেরা; উইলসন্ সাহেব সায়ণের অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, The Brahma of a sacrifice does not necessarily involve the notion of a Brahman. আমাদিগেরও সেই কথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ ঋগ্বেদে ব্রহ্ম অর্থে স্তুতি; ব্রাহ্মণ একজন স্তুতিবাদক পুরোহিত। সুতরাং 'ব্রাহ্মণঃ' অর্থে স্তুতিবাদকগণ বা পুরোহিতগণ। ঋগ্বেদে সপ্তজন হোতার (১।১৫—৩।১৬ জন) কথা পাওয়া যায়,—সপ্ত হোতা প্রাচী বষট্ কুর্ব্বন্তি—সায়ণ। তাহাদিগের মধ্যে যজমান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, হোতা মন্ত্র পাঠ করিতেন, উদ্গাতা মন্ত্র গান করিতেন, পোতা হব্য প্রস্তুত করিতেন, নেষ্টা অগ্নিতে হব্য নিক্ষেপ করিতেন, ব্রহ্মা সমুদায় তত্ত্বাবধান করিতেন, ও রক্ষ দ্বার রক্ষা করিতেন। সায়ণও অনেক স্থলে ব্রহ্মা বলিতে এই স্তুতিবাদক হোতা অর্থ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার 'ব্রাহ্মণঃ' অর্থে ব্রাহ্মণ দেখিয়া মনে হয় যে তিনি জোর করিয়াই বেদের মধ্যে জাতিভেদ দেখাইতে চান।

বেশভূষা:—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, The first step in the march from barbarism to civilization is indicated by the dress of a nation.—Indo-Aryan Vol I. P 166. এ কথা সত্য। বেশভূষার দ্বারা সভ্যতার অনেকটা পরিমাপ করা যায়। বৈদিক যুগে নানা প্রকারের বেশভূষা উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

২।৩।৬ ঋক পাঠ করিয়া অনুমান হয় যে তৎকালে আর্য্যগণ টানা-ও পোড়েন দিয়া বস্ত্র বয়ন করিবার

প্রণালী অবগত ছিলেন। 'বয়েব রণিতে' শব্দের ব্যাখ্যায় সায়ণ বলেন, 'বান কুশলে ইব × × পরস্পরৌ গচ্ছন্তৌ'। ইহা ব্যতীত ২।৩৮।৪ ঋকেও বস্ত্রবয়ন-কারিণী রমণীদিগের উল্লেখ দেখা যায়। উইলসন্ সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে, বৈদিক যুগে আর্য্যগণ বস্ত্র-বয়ন ও তাহার ব্যবহার অবগত ছিলেন।

ইহা ব্যতীত বৈদিককালেও আর্য্য রমণীগণ অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। ৯।৪৬।২ ঋকে বিবাহ-কালে পিতৃকর্ত্তৃক সালঙ্কারা কন্যা-সম্প্রদানের কথা দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত বেদের দেবতাগণের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের অনেকেরই দেহ নানা অলঙ্কারে ভূষিত এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রুদ্রের দেহ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। সেইরূপ মরুৎ ও অশ্বিনীগণেরও। এমন কি মনুষ্যগণও যে তাঁহাদিগের আরাধ্য দেবতাগণের অনুকরণে অলঙ্কার ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠেন, এ কথাও বেদে আছে। এতদ্ব্যতীত যজ্ঞাবসানে ঋত্বিকগণকে স্বর্ণের তাল বা স্বর্ণালঙ্কার-দানের কথাও ঋগ্বেদের বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন যুগের বহু অলঙ্কারই এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। আর নাম করিলেও তাহাদিগকে চেনা যাইবে না। উদাহরণস্বরূপ আদি ও রুক্ম নামক অলঙ্কারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। (৭।৫৬।১)

আহার :—বেদের আর্য্যগণ মাংস-ভোজী ছিলেন। বেদের কথা ছাড়িয়া দিয়া পরবর্ত্তী রামায়ণী যুগের আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই মাংস-ভক্ষণে তাঁহাদিগের আপত্তি ছিল না। ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলের ৩১ সূক্তে ১৫ ঋকে আছে,—

"হে অগ্নি! যে যজমান ঋত্বিকদিগের দক্ষিণা দান করিয়াছে, তুমি সেই পুরুষকে স্যূত বর্ম্মের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে রক্ষা কর। যে যজমান সুস্বাদু অন্নের দ্বারা অতিথি দিগকে সুখী করিয়া, স্বগৃহে পশুবলিযুক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সেই স্বর্গের উপমাস্থল হয়।"—(৺রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ) মূলে "জীব যাজং যজতে" আছে। সায়ণ ইহার অর্থে পশুবলিসহিত যজ্ঞ বা পশু-নিষ্পাদ্য যজ্ঞ এই উভয় অর্থ করিয়াছেন। উইলসন্ সাহেব বলেন, আর্য্যগণ অতিথির প্রীতি-সাধনের জন্য তাঁহার উপস্থিতিতে গাভী হনন বা রন্ধন করিয়া তাঁহাকে আহারের জন্য আহ্বান করিতেন। Rosen ও Langlois এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। কোলব্রুক এই প্রসঙ্গে বলেন, It seems to have been anciently the custom to slay a cow on this occassion (The reception of a guest) and a guest was therefore called Goghna or cow-killer—Religious Ceremonies of the Hindus. রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও এই মতের সমর্থন করেন। তিনি বলেন, The Sutras, both Kalpa and Grihya and the Vedas themselves display even less reserve and reticense. They distinctly affirm that bovine meat

was used as food and in details points out the different occasions when cattle should be slaughtered and eaten. Gobhila recommends beef for Sraddhas. (যথা ত্বষ্টা উৰ্দ্ধং অষ্টমাং গৌ) এ বিষয়ে পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতীও এই মতের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, "তৎকালে গো-মাংস অভক্ষ্য ছিল না। অশ্বালায়ণ গৃহ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অশ্বমেধ প্রকরণে এবং শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসেনীয় সংহিতায় পুরুষমেধ-প্রকরণে আর্য্যগণের বিবিধ মাংস ব্যবহারের কথা আছে। গোমেধ, অশ্বমেধ, অজমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজে অতিথির সমাগম হইলে "মহোক্ষং বা মহাজং" অর্থাৎ বৃষ বা অজ বধ করিয়া অতিথি সৎকার হইত। উত্তরচরিতের চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই, জনক বৎসতরী ভোজন করিয়াছিলেন। এই কারণেই অতিথির নাম গোঘ্ন হইয়াছে। বেদে অশ্বমাংস ভোজনের কথাও উল্লিখিত দেখা যায়। (১।১৬২।৬)

বেদে রমণীজাতি :—বেদের সময় রমণীজাতির অবস্থা আর্য্যসমাজে কিরূপ ছিল, তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া জানিতে পারা যায় না। সত্য বটে, ঋগ্বেদের স্থল-বিশেষে রমণীগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইতে তাহাদিগের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না।

সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল কি না ঠিক বলা যায় না। তবে ঋগ্বেদের মধ্যে বিদুষীগণের যে পরিচয় পাই তাহা হইতে মনে হয় যে রমণীগণ তৎকালে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহাদিগকে সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্তঃপুর-মধ্যে বন্দিনী করিয়া রাখিবার প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অত্রিগোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী ৫।২৮ সূক্তের ঋষি; তিনি ৩য় ঋকে দাম্পত্য শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। এইরূপ অনঙ্গের ভার্য্যা অঙ্গিরার কন্যা শাশ্বতী আর এক নারী ঋষি। তিনি ৮ম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের চতুস্ত্রিংশ ঋকের ঋষি। অপালা আর একজন ঋষি; তিনি ৮।৯১ সূক্ত রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ১।১৬৬।৪ ঋকে সস্ত্রীক যজ্ঞ-সম্পাদনের কথা আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, তৎকালে রমণীগণকে নির্ব্বোধ ও বিলাসের সামগ্রীমাত্র বলিয়া কেহ মনে করিত না। সায়ণ বলেন, খেল নামে এক রাজা ছিলেন। বিশপলা তাঁহার স্ত্রী। তিনি স্বামীর সহিত যুদ্ধে গিয়াছিলেন, যুদ্ধে তাঁহার একটি চরণ ছিন্ন হয়।

বেদের সময়েও বোধ হয় পুরুষগণ একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারিতেন। কক্ষীবান ঋষি অধ্যয়ন-সমাপনান্তে গৃহ-প্রত্যাগমন-কালে পথিপার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। দৈবক্রমে স্বনয় নামে একজন রাজা সেই পথ দিয়া যাইবার কালে নিদ্রিত কক্ষীবানকে দেখিতে পান এবং তিনি

তাঁহার রূপে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার গৃহে লইয়া যান ও তাঁহার হস্তে আপনার দশ কন্যাকে সমর্পণ করেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে একাধিক পত্নী-গ্রহণ অপ্রচলিত ছিল না।

বেদের সময় বিবাহের পূর্ব্বে কোন কোন কুমারীর পুত্র প্রসবের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পুত্র কানীন পুত্র নামে অভিহিত হইত। ১।১১৬।২১ ঋকে পৃথুশ্রবা নামক একজন রাজার কথা আছে। সায়ণ বলেন, ইনি কানীন পুত্র। তৎকালে কানীন পুত্র সমাজে নিন্দনীয় হইতেন কি না, বেদ হইতে তাহা অবগত হওয়া যায় না।

বেদে দাম্পত্য-জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় না যে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা সামান্য ছিল। ৮।৩১।৯ ঋকে লিখিত আছে যে, দেবতারাও যজ্ঞরত দম্পতীর স্তুতি কামনা করেন এবং দম্পতীর জীবন চির-সুখময়।

বেদের সময় ভদ্র ও সুগঠন কন্যা আপনার মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। Muir সাহেব ঋগ্বেদের ১০।২৭।১২ ঋক আলোচনা করিয়া বোধ হয় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়া থাকিবেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, "May we not infer from this passage that freedom of choice in the selection of their husbands was allowed, sometimes at least, to women in those times? Sanskrit Texts Vol V. P. 458-59. আলোচ্য ঋকৃটির অর্থ এই যে কোন কন্যা অর্থেই সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু ভদ্রা আপনার মনোমত পতি গ্রহণ করেন। এই সূক্তে অন্ধ কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অপলা ত্বক-রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় ব্যাধিগ্রস্ত রমণীর পক্ষেও বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

বৈদিক যুগে নগরাদি ঃ—বৈদিক যুগে আর্য্যগণ গ্রাম ও নগরের পার্থক্য বুঝিতেন। গ্রামনী, পুরপতি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয়। নগরে শত দ্বার ও স্তম্ভবিশিষ্ট গৃহ থাকিত। দস্যু ও রাক্ষস-গণ নগরের আর্য্যগণকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিত। এই জন্য আত্মরক্ষাহেতু তাঁহারা সুরক্ষিত নগর নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতেন। ৭।৮ সূক্তে বশিষ্ঠ ঋষি অয়ো-নির্ম্মিত নগরের দ্বারা আত্মরক্ষা করিবার জন্য স্তব করিয়াছেন। ৭।১৫।১৫ ঋকে আবার তিনি অয়োনির্ম্মিত ও শতগুণা পুরীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই অয়োনির্ম্মিত নগর কি? ইহার উত্তরে সায়ণ বলেন, এই শব্দের দ্বারা নিরাপদ নগর বুঝাইতেছে।

এতদ্ব্যতীত ২।৪১।৫ ঋকে স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ আছে। আর্য্যগণ এই সকল গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি অবগত ছিলেন।

বৈদিক-যুগে এইরূপ বৃহৎ অট্টালিকা নিতান্ত অল্প ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ এরূপ অট্টালিকার উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। একবার অসুরগণ কঠোর পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর একবার তাহারা শতদ্বার বস্ত্রগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অত্রি ঋষিকে ভিতরে পুরিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল।

বেদে জ্যোতিষ ঃ—পৃথিবীর সূর্য্য-পরিক্রমের দ্বারা যে বৎসর-গণনা করা হয়, দ্বাদশ অমাবস্যা গণনা করিলে, তাহা অপেক্ষা কয়েকদিন কম হয়। এই জন্য সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসর গণনা করিবার জন্য চান্দ্র বৎসরের প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটি পৃথক মাস ধরিতে হয়। ইহাকে মলমাস বলে। ১।২৫।৮ ঋক হইতে জানা যায় যে আর্য্যগণ এই উভয় গণনা-পদ্ধতিই অবগত ছিলেন। সেই ঋকটির অনুবাদ এই ঃ—"যিনি ধৃতব্রত হইয়া স্বস্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন ও অপর যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয়, তাহাও জানেন।" (৺রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

আশ্চর্য্যের বিষয় ঋক্‌বেদের ঋষিগণ মাধ্যাকর্ষণ ও পৃথিবীর গতি-সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত ছিলেন। ঐতরেয় আরণ্যকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যের প্রকৃত উদয় বা অস্ত নাই। ইহা পৃথিবীর দৈনিক গতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত সূর্য্য যে পৃথিবীর ধারক তাহা ঋগ্বেদের অনেক ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। ১০ মণ্ডলের ১৪৯ সূক্তের একটি ঋকে আছে, সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবী মরম্ণাদ্‌ অস্তম্ভনে সবিতা দ্যাম দৃং হৎ। ইহার অর্থ এই যে, সবিতা যন্ত্রসকল (সংযমন শক্তি) দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, রোধশূন্য হইয়া সবিতা দ্যুলোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহা মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞান-সূচক সন্দেহ নাই। বেদে পৃথিবীর গতি শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ১৩১০ সালের ভারতীতে দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীর গতি বৈদিক আর্য্যগণের নিকট পরিজ্ঞাত ছিল; তাহার প্রমাণ বেদে পৃথিবীবাচক গো, গ্মা, জ্যা, ক্ষ্মা, ক্ষা, ক্ষমা, ক্ষোণি ক্ষিতি, অবনি, রিপ, গাতু ও নির্ঋতি শব্দের দ্বারা গতি বুঝাইয়া থাকে। গম ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিলে গো পদ সিদ্ধ হয়। গো পৃথিবীর নাম কেন? তাহার উত্তরে যাস্ক বলেন, যেহেতু ইহা দূর-পথে গমন করে ও যে হেতু ইহাতে জীবগণ বিচরণ করে। গ্মা পদও গম্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং গো ও গ্মা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই; জ্যা-পদ-জম্-ধাতু হইতে হইয়াছে। বেদে জম্ বা জমতির অর্থ গতি। সুতরাং জ্যা-শব্দের দ্বারাও পৃথিবীর গতি বুঝাইতেছে। এইরূপ ক্ষ্মা, ক্ষা, ক্ষমা ও ক্ষিতি এই পদ চারিটি গত্যর্থক ক্ষি ধাতু দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারা যায়। এই সব আলোচনা করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে পৃথিবীর গতির বিষয় আর্য্যগণ বিশেষরূপই অবগত ছিলেন। নতুবা গতি-ক্রিয়া লইয়া তাঁহারা পৃথিবীর এতগুলি নাম করিতেন না।

ঋগ্বেদের জনপদ ঃ—ঋগ্বেদে যে সব আর্য্যসভ্যতা-পরিপোষক জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিব। আর্য্যগণ সিন্ধুনদের তীরেই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। এই অনুমান কতদূর সঙ্গত তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, সিন্ধুনদের তীরভূমি যে একটি প্রসিদ্ধ ও পুরাতন জনপদ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

এইখানেই প্রথম অশ্বযজ্ঞের আয়োজন হয়। এই সময়ে আর্য্যগণ বোধ হয় অশ্বমাংস ভোজন করিতেন। এই অশ্বযজ্ঞই ক্রমে মহাভারতের সময় অশ্বমেধের আকার ধারণ করে। সিন্ধুর পরই আর্য্যাবর্ত্তে অবস্থিতা সরস্বতীর কথা বলিতে হয়। এই সরস্বতীর তীরে বহু যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে সরস্বতীর তীরভূমি প্রতিনিয়ত যজ্ঞীয় মন্ত্রে মুখরিত থাকিত বলিয়াই কালক্রমে সরস্বতী বাগ্‌দেবীরূপে পরিচিতা হইয়াছে।

এই দুইটি প্রধান নদী ব্যতীত ঋগ্বেদে (৭।৭৫।৫) আরও আটটি নদীর নাম পাওয়া যায়;—গঙ্গা, যমুনা, শতদ্রু, পরঞ্চী, মরুদ্‌ধা, অসিক্নী, বিতস্তা ও আর্জ্জীকীয়া। ইহা ব্যতীত ঐ স্থানেই সুষেমানামক আর একটি নদীর নাম পাওয়া যায়। যাস্ক বলেন, এই সুষেমা সিন্ধু নদের নামান্তর। ঐ আটটি নদীর মধ্যে যাস্কের মতে পরঞ্চী নদী ইরাবতী।

ঋগ্বেদে গঙ্গা ব্যতীত জাহ্নবী শব্দও পাওয়া যায়। (৩।৫৮।৬) উইলসন সাহেব বলেন, It may imply to the Ganges, Jahnavi, if we have reason to suppose the legend of her origin from Jahnu, was known to the vedas বৈদিক আর্য্যগণ গঙ্গা-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক গল্প কি করিয়া অবগত হইলেন, অন্য একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

৫।৪২।১৭ ঋকে যমুনার উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদের সময় হইতেই যমুনার তীরে গাভী সকল "শ্রতং" ছিল। ইহা হইতেই ভাগবতের গল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ৭।১৮।১৯ ঋকে আর একবার যমুনার উল্লেখ আছে।

৫।৫৩।৯ ঋকে রসা, অনিভতা ও কুভা নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদিগের স্থান আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

৫।৬১।১৬ ঋকে গোমতী নদীর নাম পাওয়া যায়। এই গোমতী নদী অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত।

আর্য্যগণ এই নদী-বহুল জনপদে বাস করিতেন। এই উর্ব্বর ভূমি লইয়া আর্য্যগণের মধ্যে বিবাদ হইত। এক আর্য্য নৃপতি অন্য আর্য্য নৃপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, বেদে এরূপ কথাও দেখা যায়।

তৎকালে এক জনপদ হইতে অন্য জনপদে গমনাগমনের কোনরূপ বন্দোবস্ত থাকাই সম্ভব। কেন না ঋষিগণ যজ্ঞ-সম্পাদনব্যপদেশে গমনাগমন করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এক সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি পিবজনের পুত্র সুদাস রাজার পৌরোহিত্য করিয়া এক জনপদ হইতে অন্য জনপদে প্রত্যাগমন-কালে বিপাশা ও শতদ্রু নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি ঋকের দ্বারা উক্ত নদীদ্বয়ের স্তব করেন।

এতদ্ব্যতীত ধন-লাভ ও বাণিজ্যের জন্য স্থলের কথা কি জলপথেও গমনাগমনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। (৫।৫৫।৬)

আর্য্য জনপদ ব্যতীত বৈদিক কালে কতিপয় অনার্য্য দেশের কথাও বেদে দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ কীকট দেশের উল্লেখ

করা যায়। প্রমগন্দ এই জনপদের রাজা ছিলেন। সায়ণ বলেন, সুদ লইয়া যে টাকা দেয় তাহার নাম মগন্দ; প্রমগন্দ তাহার পুত্র। এই কীকট দেশ বর্ত্তমান বিহার প্রদেশে অবস্থিত। উইলসন্ সাহেব বলেন, "Kikat is usually identified with South Behar. বেবার আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন, It seems not impossible that the native inhabitants being particullarly vigorous, retained more influeuce in Magadh than elsewhere after the country had been Brahminised.—Indian Literature (Translation) P. 79. সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যগণ পার্শ্ববর্ত্তী জনপদের সকল তথ্য রাখিবার অন্ততঃ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। আর্য্যগণ নিতান্তই pastoral life যাপন করিতেন ও সে যুগে একদেশের সহিত অন্যদেশের কোনই সম্পর্ক ছিল না, এমন কথা বলা চলে না।

এই সব জনপদ ব্যতীত গান্ধার দেশেরও নাম আছে। তথায় উৎকৃষ্ট লোম পাওয়া যাইত। অতএব কোন্ বিশেষ দেশে কোন্ বিশেষ দ্রব্য পাওয়া যাইত, আর্য্যগণ তাহারও সংবাদ রাখিতেন। এই সকল প্রমাণসত্ত্বেও কি কেহ মনে করিবেন যে, আর্য্যগণ কেবল গরু চরাইয়া ও মাটিতে লাঙ্গল দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন?

৪।৩০।১৮ ঋকের সময় আর্য্যগণ সরযূ নদী অতিক্রম করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। রাজ্যলিপ্সা ও প্রাধান্য-লাভ চিরদিনই মানুষকে উন্মত্ত করে। আর্য্যগণও নানা ক্ষুদ্র রাজ্য-সংস্থাপনের পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

৩।২৩।৪ ঋকে সরস্বতী ব্যতীত দৃষদ্বতী ও অপয়ার নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, আর্য্য সভ্যতা বহুদূর-বিস্তৃত হইয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

দুর্নিবার

সে যদি তেমন ক'রে চায়;
নিমেষে অমনি থেমে যায়
শোণিতের নিত্য নৃত্য, সব দেহ সর্ব্ব চিত্ত
শ্বাস রোধি' চকিতে দাঁড়ায়
অচল পাষাণ ছবিপ্রায়।

সে যদি তেমন ক'রে চায়
সব যাওয়া অমনি ফুরায়।
পাষাণে বাঁধিয়া বুক যবে গো ফিরাই মুখ
সে আঁখি পিছন হ'তে হায়!
মায়া-কর পিঠেতে বুলায়।
চলিতে চরণ তুলি' ফেলিতে তা যাই ভুলি'
সমুখ বিমুখ সম ভায়,
মুখ যে আপনি ফিরে যায়।
নিখিল ভুবনজন ডাকে যদি প্রাণপণ
আপন পরাণ যদি ফাটে
সে মায়া-বাঁধন নাহি কাটে।
কোথা কেবা কোথা কি যে কোথা আমি রহি নিজে
শুধু সে কুহকী আঁখি ভায়;
সে যদি তেমন ক'রে চায়।

*

সে যদি তেমন ক'রে ডাকে ;
থাকি না যেথানে কেন কাণে আসি পশে যেন
মরম পূরিয়া যেন থাকে।
মরু গিরি পারাবার পার হ'য়ে অনিবার
পিয়াসা আকাশে ভাসি আসে
ব্যাকুল বাহুর ডোরে বাঁধি ল'য়ে দৃঢ় মোরে
না জানি কেমনে টানে পাশে।
কোথা রহে ধর্ম্ম লাজ সংসারের কর্ম্ম-কাজ
পুরুষ গৌরব কোথা থাকে
সে যদি তেমন ক'রে ডাকে !
সে যদি তেমন ক'রে বলে
লাভ-ক্ষতি সুখ-দুঃখ কে হিসাব করে সূক্ষ্ম
পশি আমি অনলে বা জলে ?
সম্ভব বা অসম্ভব নাহি রহে অনুভব
চাহি না সমুখে কিম্বা পিছে
আশে-পাশে নব রাগে তাহারি নিদেশ জাগে
সে বিনে সকলি আর মিছে।
প্রবল সে চির দুর্নিবারে
ক্ষণেক ভুলিতে কেবা পারে ?
তাই মোর লয় মনে পঁহুছিল যেই ক্ষণে
জীবনের অন্তিম কিনারে ;
মৃত্যুর ভৈরব রবে মুগ্ধ ঝাঁপ দিয়া যবে
পড়িবারে চাহিব—পাথারে
তথনো পিছন থেকে সে যদি বারেক ডেকে
আমারে থামিয়া যেতে বলে,
নারিব লঙ্ঘিতে বাণী প্রাণশিখা-রেখাখানি
নিবিতে নিবিতে র'বে জ্বলে।
জাগি'রবে একধার চিরশান্তি পারাবার
মরণের বিরাট মাধুরী
সবলে টানিবে নিতি তাহার আহ্বান-গীতি
আমারে রাখিবে ক'রে চুরি।
চেতনার শতদল মুদি রবে অচপল
সে শুধু জাগিবে এক দ'লে
সে যদি মরিতে নাহি বলে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

যুদ্ধের দস্তুর*

(গল্প)

রুশ ও তুর্কী উভয় দলের সৈন্যেরা সবেমাত্র গুলিবর্ষণ সুরু করিয়াছে।

চারিদিকে এমনি জমাট কুয়াশা যে, শত্রুপক্ষ প্রায় নজরের আড়াল হইয়াছে ; একসঙ্গে জমায়েৎ বিশৃঙ্খল সৈন্যদিগকে দূর হইতে কতকগুলি টুক্‌রা মেঘের মত দেখাইতেছিল। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া কসাকেরা মিছা তাহাদের দৃষ্টিকে ব্যথিত করিতেছিল ; কারণ, এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি কাহার আছে যে, আঁধারের সে যবনিকা ভেদ করিতে পারে !

প্রথমে তুর্কীরাই অগ্নিবৃষ্টি সুরু করিয়াছিল। রুশেরা শুধু জবাব দিতেছিল। কোন পক্ষই শত্রুকে দেখিতে পাইতেছিল না। সকলের অগোচরে শত্রুরা গুঁড়ি মারিয়া পাছে একেবারে কাছে আসিয়া পড়ে, সেই ভয়ে অগ্নিবৃষ্টির বিরাম ছিল না। এমন অবস্থায় উভয় পক্ষের সৈন্যেরা একরূপ নারাজ

* রুশ ঔপন্যাসিক ভ্যাসিলি নেমিরোভিচ্ ডানশেঙ্কো হইতে।

হইয়াও, পরস্পরের প্রতি এলপাতাড়ি গুলিবৃষ্টি করিয়া জানাইয়া দেয় যে, তাহারা খুব কাছে-কাছেই আছে!

রজনী ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল,—তুষারক্ষেত্রের উপর বিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলির উপরে একটা আঁধারের আস্তরণ বিছাইয়া দিয়া! রাত্রি যত গভীর হইয়া উঠিল, অগ্নিবৃষ্টিও তত কমিয়া আসিতে লাগিল এবং বন্দুকের শব্দও চারিদিককার স্যাঁৎসেতে ভিজা আবহাওয়ায় ততই থামিয়া পড়িতে লাগিল। শেষে অন্য সব শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। মাঝে মাঝে শুধু আহতের আর্ত্তনাদ, বা মরন্ত ঘোড়ার চীৎকারে রণক্ষেত্রের নীরবতা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সারাদিনের হাঁটুনি ও লড়াইয়ের শ্রমে সৈন্যদের দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, মৃত সঙ্গীদের সরাইয়া রাখিবার ভাবনাও তাহাদের আর ভাবিবার অবসর ছিল না। তখন তাহাদের প্রাণে শুধু একটিমাত্র কামনা জাগিতেছিল,—সে শুধু বিশ্রামের কামনা, নিদ্রার কামনা!

"নূতন বছরের আমোদ-আহ্লাদ সব মাটী!"—কথাগুলি যিনি বলিলেন, তিনি একজন কর্ণেল, আকার ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ। কথাগুলি যাঁহাকে বলা হইল, তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ, কৃশ; একখণ্ড বস্ত্রের বন্ধনীতে তাঁহার একখানা হাত ঝুলিতে-ছিল। একটি তুর্কী বাড়ীর বারান্দায় তাঁহারা দুইজনে বসিয়াছিলেন।

"কপাল বড় মন্দ হে! চিঠিপত্রও কিছু পাওয়া গেল না।"

"সেজন্যে আমি বড় মাথা ঘামাচ্ছি না। যুদ্ধক্ষেত্রে ডাকঘরের বন্দোবস্ত যে কেমন চমৎকার, তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে!"

"তবু ক লাইন চিঠি পেলে মনটা কিছু খুসি থাকে। লড়াই কর্ত্তে কর্ত্তে বড়দিনটা কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা জান্তেও পারলাম না, আবার আজকের হালখাতার দিনটাও তেমনি করেই কেটে গেল আর কি! হা ভগবান! দেশের বাড়ীতে এখন কি রকম হাসি-খুসিই চল্‌ছে! আমি চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাই, ছেলেপুলেরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে! আমার বোধ হয়, তোমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরাও এতক্ষণে আমাদের বাড়ীতে এসেছে! আমাদের কোন খবর না পেয়ে নিশ্চয়ই তারা ভারি ভাবিত হয়ে উঠেছে—"

"আচ্ছা, তোমার হাত এখন কেমন?"

"খুব ভালো; তবে মন্দও হতে পারে, ভালও হতে পারে!"

"বেশ ত, এই অছিলেয় তুমি ছুটির দরখাস্ত কর না কেন?"

"বল কি! ফৌজে এখন কর্ম্মচারীর যে অভাব হয়েছে! বিশেষ এতকাল আমরা একসঙ্গে আছি যে, ছাড়াছাড়ির কথা মনেও আমি ভাবতে পারি না। না—আমি যাব না। যদি আমরা কখনও ফিরতে পারি, তাহলে দুজনেই একসঙ্গে ফিরব।"

রাতি তখন বেশ থম্‌থমে হইয়া আসি-য়াছে। গাঁয়ের পথে হঠাৎ একটা জলন্ত মশালের রাঙ্গা আলো এবং একযোড়া মস্ত গোঁফে দুই ভাগে ভাগ-করা একখানা মুখ দেখা গেল।

মশালের দিকে চাহিয়া কর্ণেল বলিলেন, "প্যাণ্টেলিফ আস্‌ছে, না?"

সেই গাঢ় অন্ধকারকে সমুজ্জ্বল করিয়া মশালটা আঙ্গিনায় ঢুকিল। একজন ঘোড়-সওয়ার কর্ণেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"ফাঁড়িতে, হুজুর! লড়াই ফের সুরু হয়েছে!"

"আচ্ছা, যাও! আরে—এ কি?"

আঙ্গিনায় জনকয়েক সৈন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছিল।

প্যাণ্টেলিফ মশালটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল। সেই আলোয় দেখা গেল, কয়জন লোক কাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"ওরে বুড়ো নেড়ে,—আয় বল্‌ছি, আয়! তোদের জ্বালায় কি একদণ্ড সুস্থির থাক্‌তে পার্ব্ব না? নিপাত যা—তোরা নিপাত যা!"

কর্ণেল উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ওহে বাপু,—সব ওখানে দাঁড়িয়ে হচ্ছে কি?"

"হুজুর, এ একজন তুর্কী। লোকটা ঝোপের নীচে লুকিয়ে ছিল, আমরা হঠাৎ বেটাকে ধরে ফেলেছি!"

"ঝোপের নীচে লুকিয়ে ছিল, কি রকম?"

"কাপুরুষের মত জড়সড় হয়ে ঝোপের তলায় পড়েছিল, হুজুর! লেফটেনাণ্ট ভাসিলিয়েফ বল্লেন, একে আপনার কাছে হাজির করতে। এর নাম হচ্চে মামুদ।"

মশালটা বন্দীর মুখের সামনে ধরা হইল; তাহার নাক খুব লম্বা, গোঁফ বেশ ঘন, নাকের মাঝখানটা ফুলা। কপালে একটা নূতন ক্ষত। পুরাণো তাঁবু হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া একখানা ময়লা কাপড়ে তাহার মাথার ক্ষত বাঁধা।

বন্ধুর দিকে ফিরিয়া কর্ণেল সোল্লাসে বলিলেন, "বাহবা কি বাহবা! আমরা যে একজন হোম্‌রা চোম্‌রা অফিসারকে পাকড়াও করেছি!"

তাঁহার বন্ধু মেজর বন্দীর দিকে তীক্ষ্ণ নেত্রে মনোযোগের সহিত চাহিয়া ছিলেন।

"শুধু হোম্‌রা-চোম্‌রা অফিসার নয় হে, লোকটা আমাদের চেনা-শুনো। তুমি কি একে চিন্তে পার্‌ছ না? ওর কপালের কাটা দাগটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি! ওর বাঁ হাতে নিশ্চয়ই দুটো আঙ্গুল নেই!"—সৈন্যদের দিকে ফিরিয়া তিনি হুকুম দিলেন, "ওরে, ওকে ওর বাঁ হাতটা বার কর্ত্তে বল্‌তো!"

"হাঁ—হাঁ—ঠিক! এ হচ্ছে মামুদ বে, একজন তুর্কী কর্ণেল।"

"হুঁ—ফেরার বন্দী। লোকটার বরাত ভারী খারাপ দেখছি। প্রধান সেনাপতি বোধ হয় ওকে গুলি করে মার্‌ত্তে হুকুম দেবেন। আহা, বেচারার জন্যে আমার দুঃখ হচ্চে। ওকে এখানে নিয়ে আয় ত রে! তোরা খালি একজনকে এখানে পাহারায় রেখে যত শীগ্‌গির পারিস, সব সরে পড়্‌!"

মামুদ বে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারের কাছে একজন সিপাহী বন্দুক ঘাড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

বন্দীকে একটি দৈত্যবিশেষ বলিলেও চলে।

তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশী। চোখ দুটিতে ভারি একটা দুঃখের ভাব মাখানো। গোঁফজোড়া পাকিয়া ধব্‌ধবে হইয়া গিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া তাহা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার পরণে ছেঁড়া-খোড়া কাপড়। কাঁধের উপরকার কাপড়খানায় টাট্‌কা রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে!

কর্ণেল কঠোর স্বরে কহিলেন, "বন্দীর কাঁধে ও কিসের রক্ত?"

"হুজুর, লোকটা যখন ঝোপের তলায় ছিল, তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাদের গলা প্রায় ভেঙ্গে যাবার যোগাড় হয়েছিল। আমাদের ডাকাডাকির উত্তরে ও তার পা দুটোকে আমাদের দিকে রেখে গঙ্গা-ফড়িংয়ের মত শুধু নাচাচ্ছিল। কাজেই কিরিলিয়েফ শেষটা মহা খাপ্পা হয়ে ওকে বেওনেটের এক খোঁচা না দিয়ে আর থাকতে পারলে না। খোঁচা খেয়ে ও তখন গুড়্‌গুড়্‌ করে বেরিয়ে পড়ল! লেফ্‌টেনাণ্ট ভাসিলিয়েফ মানা না করলে আমরা তখনি ওর দফা রফা করে দিতাম।"

"সাইমন, বন্দীর জন্যে একখানা চেয়ার নিয়ে এসো!"

বন্দী আসনের উপর বসিলেন। তাঁহাকে এখন আরও ছন্ন-ছাড়ার মত দেখাইতেছিল। এই নূতন হুকুমদারদের কাছে আসিয়া তিনি বড় বেশী সান্ত্বনা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার নাক যেন গোঁফ-জোড়ার ভিতরে বসিয়া গিয়াছিল, মাথা দুই কাঁধের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল!

মেজর তুর্কী ভাষা জানিতেন। তিনি বলিলেন, "এর আগে আমাদের দেখাশোনা হয়েছে, না? আপনার নাম কি মামুদ বে নয়?"

তুর্কীর মাথা যেন আরও নীচে নামিয়া গেল। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝা গেল যে, তিনি একেবারে নিরাশার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

"যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, বলুন! আপনি কি অন্য লোক?"

"আমি কখনো মিথ্যা বলি নি"—বন্দী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "কাল আমি ক্যানালিক থেকে পালিয়ে এসেছি। আজ আবার আমি আপনাদের কাছে বন্দী হলুম। পায়ে হেঁটে বেশী দূর পালানো ভারী শক্ত" —বন্দী ম্লান হাস্য করিলেন—"বিশেষ, পায়ে আর মাথায় চোট্‌ লাগ্‌লে ত কথাই নেই। এখন আবার আমার কাঁধ জখম হয়েছে,—সেটা—"

কণ্ঠস্বরে পদোপযুক্ত কাঠিন্যপ্রকাশের বিফল চেষ্টা করিয়া মেজর বলিলেন, "বসুন আপনি। এ কথা জানেন তো, যে যুদ্ধের দস্তুর হচ্ছে—"

"আমাকে তা মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই। আপনাদেরই জিৎ। আমাকে গুলি করে মারবার হুকুম দিন। সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েই আমি পালিয়েছিলাম। মৃত্যু-খেলায় আমি হেরেছি। মৃত্যুই আমার দণ্ড।"

মেজরের স্বর করুণায় কোমল হইয়া আসিল।

"আপনার সঙ্গে কি কোনরকম খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে?"

"কিছু না। যাঁর কাছে আমি বন্দী ছিলাম, তাঁর চেয়ে দয়ালু লোক আর থাকতেই পারে না। তাঁর নিজের বিছানায় আমাকে তিনি শুতে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি খাবার-দাবার সব পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে শত্রুর মত না দেখে ভাইয়ের মতই দেখেছিলেন।"

"তবে, আপনি কি ভেবেছিলেন যে, যখন আপনাকে রুসিয়ায় পাঠানো হবে, তখন আপনি কষ্ট পাবেন?"

"আমি জানি, রুশেরা তাদের বন্দীদের সঙ্গে কুব্যবহার করে না।"

"তবে আপনি পালালেন কেন?"

"কারণ জেনে এখন লাভ কি? আমি আপনাদের হাতের মুঠোয়। আপনারা কর্ত্তব্য পালন করুন; কিন্তু কাজটা শীঘ্র শেষ করে ফেলুন—শীঘ্র শেষ করে ফেলুন।"

বৃদ্ধ তুর্কীর বুকের মধ্য হইতে যেন একটা রুদ্ধ ক্রন্দনের অস্ফুট স্বর ফুটিয়া উঠিল। তিনি যেন এখনই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন।

"কি আশায় যে আপনি পালাচ্ছিলেন, আমি ত' কিছুতেই সেটা বুঝতে পারছি না। তুর্কীরা সব যায়গাতেই রণে ভঙ্গ দিচ্ছে। আপনাদের ফৌজে আহারের সংস্থান নেই। সহর ছেড়ে বাসিন্দারাও পালাচ্ছে। আপনার আর কিছুকাল ধৈর্য্য ধরে থাকা উচিত ছিল। এ যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হবে। তখন আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হোত; আপনিও অনায়াসে ঘরে ফিরে যেতে পার্ত্তেন।"

"ঘরে? কোথায় ঘর?"

"অপরাধ নেবেন না। আপনার কথা আমি বুঝ্‌তে পারছি না।"

"বুঝিয়ে দি'চ্ছি। কি যে হচ্ছে, আমি তা ঠিক জান্‌তে পারছি। আমি ভুল বল্‌ছি না। ইস্তাম্বুল থেকে হুকুমনামা বেরিয়েছে যে, রাজ্যের সব লোক যেন এসিয়া মাইনরে চলে যায়। অন্য অন্য সকলের সঙ্গে হয়ত আমার পরিবারবর্গও এসিয়া মাইনরে গিয়েছে। তাদের আমি কি করে আবার দেখ্‌তে পাব? বেশী বলা বাহুল্য। আমার যা কর্ত্তব্য ভেবেছি, আমি তা করেছি। এখন আপনাদের কর্ত্তব্য আপনারা করুন। মৃত্যুর হাত থেকে কোথাও ছাড়ান নেই। যা হবার, তা হবেই। এ যে কপালের লেখা! নিয়তি যেটুকু সময় দিয়েছে, তার বেশী কেউ বাঁচতে পারে না। আমি যা করেছি, তা আমার নিজের জন্য করিনি—"

বন্দীর স্বরভঙ্গ হইল। হতাশভাবে তিনি মাথা নাড়িলেন।

মেজর নম্রভাবে কহিলেন, "আপনি আপনার পরিবারের কথা বল্‌ছেন। আমারও পরিবার আছে।"

"আপনি যে আবার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পার্ব্বেন, এজন্যে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করুন। আপনি যে শত্রুর হাতে বন্দী হন নি, এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিন।"

"আমি যে আপনাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করছি, এসব আপনার পরিবারের মঙ্গলের জন্য, জানবেন।"

বহুক্ষণ সকলে স্তব্ধ রহিলেন।

কর্ণেল বলিলেন, "ওহে, জিজ্ঞাসা কর না, ওঁর ক'টি ছেলে-মেয়ে!"

অতি অস্পষ্টস্বরে মামুদ বলিলেন, "চারটি।"

"তারা কি বেশ বড়-সড়?"

"না—সব ছোট। আমার বড় মেয়েটি এই সবে ছ-বছরে পড়েছে।"

মেজর আপন-মনে বলিলেন, "আমারও বড় মেয়েটির বয়স ঠিক ছয়।"

মেয়ের কথা মনে করিয়া বন্দী প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আমার মেয়ে কালে রূপবতী হবে। তার ডাগর চোখদুটি এখনি ঝল্‌কে ওঠে। পাঁচমাস হোল, তাকে শেষ দেখেছি; বিদায় নেবার সময় সে কেঁদে-কেটে রসাতল বাধিয়ে তুলেছিল। আমার ছোট খোকাটির বয়স এখনো এক বছর হয়নি। আমি যখন বাড়ী ছেড়ে আসি, সে বেচারী তখনো হাঁট্‌তে শেখেনি। তারা সবাই আড্রিয়ানোপলের কাছে থাকে; সেখানে আমার চমৎকার একখানি বাড়ী আর বাগান আছে। আমরা বড় সুখে ছিলাম। তারপর এই যুদ্ধ বাধল। যে লড়াই বাধিয়েছে, আমার অভিশাপ তাকে দগ্ধ করুক! ভগবান ন্যায়বান। যারা এই রক্তের সাগর বইয়েছে আর আমাদের নিষ্পাপ সুখের সংসারে আগুন জ্বেলেছে, ভগবান নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি দেবেন।"

মেজর বলিলেন, "আপনার কথা ঠিক। এরকম যুদ্ধে কার উপকার হয়? আমি বারবার মনে মনে এই কথা নিয়ে তোলা-পাড়া করে দেখেছি। আমারই কথা ধরুন, না হয়! মনে করুন, আমি যদি কাল মরে যাই, তবে আমার পরিবারের কি হাল হবে?"

জেরা করার ধরণ-ধারণ একেবারে বদলিয়া গেল। তিনজনে একসঙ্গে বসিয়া বসিয়া এখন আপন আপন পরিবারের সুখ-দুঃখের কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। মেজর বন্দীর সকল কথা তর্জ্জমা করিয়া কর্ণেলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কর্ণেলও বন্দীর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

কর্ণেল কহিলেন, "ওঁকে বল যে, ছেলেমেয়েদের ভালোর জন্যে উনি রুসিয়ায় না গিয়ে এরকম ভাবে জীবনকে বিপন্ন কর্‌তে গেলেন কেন? মাসকতকের হের্‌ফেরে এমন আর কি হোত?"

মামুদ দুঃখিতভাবে বলিলেন, "আমার দেশের লোকেরা,—বিশেষ স্ত্রীলোকেরা যদি রুসদের ভাল করে জানতো! তাহলে যতদিন আমরা না ফিরে যেতাম, ততদিন তাঁরা বাড়ী-ঘর ও ছেলেমেয়েদের নিশ্চিন্ত হয়ে দেখতে শুন্‌তে পারতো। কিন্তু তারা ত' তা বোঝে না। আর দিনকয়েকের মধ্যে বাসিন্দারা সবাই পালাবে; আপনাদের সৈন্যেরা যখন আড্রিয়ানোপলে গিয়ে হাজির হবে, সহর তখন একেবারে খালি হয়ে পড়্‌বে। সহরে পড়ে থাক্‌বে শুধু জনকতক ক্রিশ্চান।

"কেন আমি পালিয়ে এসেছি? আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে। যাদের আমি ভালবাসি, তাদের কি দশা হবে, আপনি কি তা জানেন? না, জানেন না। বল্‌ছি, শুনুন। আমার স্ত্রী আতঙ্কে

সারা হয়ে, বাড়ী, ঘর, বাগান, সব ছেড়ে পালাবে। যা পড়ে থাক্‌বে, গ্রীক কি আর্মেনিয়ানরা তা লুঠতরাজ কর্‌বে। আমার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে ইস্তাম্বুলে যাবে বটে, কিন্তু সরকার থেকে সে কোন সাহায্য পাবে না। আর এতগুলো হতভাগা পরিবারকে সাহায্য কর্‌বার টাকা সরকার কোথা থেকেই বা পাবেন? সরকার শুধু তাদের এসিয়া মাইনরে, কিম্বা 'স্কুটারি'তে পাঠিয়ে দেবেন। তারপর আমার পরিবারের কথা সকলেই ভুলে যাবে। একাকিনী অবলা রমণী সে, এমন বিপাকে পড়্‌লে কি কর্ব্বে, বলুন তো? তার হাতে এক-মাত্র উপায় আছে। আমার মেয়েগুলি নীরোগ সুন্দর, সে তাদের বেচে ফেলবে। বাঁদীর মত পরের ঘরে তারা মানুষ হবে, বাপের নাম পর্য্যন্ত জানবে না, শুনবে না। বড় হলে, কোন ধনীর কাছে আবার তাদের বিক্রী করা হবে। আমার ছেলেরাও দাস হবে। আর আমার স্ত্রী? তার দুঃখ কমে গেলে সেও কোন হারেমে গিয়ে ঢুক্‌বে। আমি যদি এক বছর পরে দেশে ফিরি, তখন গিয়ে কি দেখ্‌তে পাব? কিছু না! না বাড়ী-ঘর, না স্ত্রী, না পুত্র-কন্যা! তাদের যে কি দশা হল, তাও আমি জান্‌তে পারব না। তাদের খোঁজ দিতে পারে, এমন কোন লোককেও আমি দেখ্‌তে পাব না। আমি আমার সব হারাব। আমার বাড়ীর মালিক হবে অন্য কেউ। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কেন আমি পালিয়েছি! মনের যাতনা সইবার সাহস আমার আর ছিল না, তাই আমি পালিয়েছি।"

মেজর বলিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ। যুদ্ধ ভারি নিষ্ঠুর, ভারি নিষ্ঠুর ব্যাপার।"

বন্দী আবার বলিলেন, "এই হতচ্ছাড়া যুদ্ধের আগে আমি বাড়ীর বাইরে সহজে পা বাড়াতাম না। আমি আমার সব ছেলেমেয়েগুলির জন্মকালে উপস্থিত ছিলাম। দিনে দিনে তাদের আমি বাড়তে দেখেছি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বুদ্ধি কি রকমে পেকে উঠেছে, তাও আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। তাদের সবগুলিই কখন্ আমাকে সবপ্রথমে চিনতে পেরেছিল, আমার তা বেশ মনে আছে। কখন্ তারা প্রথমে কথা কইবার চেষ্টা করেছিল, আমার প্রাণে তা গাঁথা আছে। ক্ষুদে ক্ষুদে তাদের পল্‌কা পাগুলি, পাখীর ছানার মতই তাদের ছোট্ট মুখের সেই রাঙ্গা রাঙ্গা হাঁ,—সমস্ত—সমস্ত—আমার সমস্তই মনে আছে। প্রতিদিন এখন কে তাদের খাওয়াবে দাওয়াবে? তাদের গর্ভধারিণী? সে অভাগিনীও যে এখন বিপাকে পড়ে! আগে—"

বন্দী কথা শেষ করিতে পারিলেন না। তাঁহার শক্তি ও সাহস, দুইই লুপ্ত হইয়াছিল।

কর্ণেল অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে বলিলেন, "বৃদ্ধ, আপনার আর আমাদের মাঝে তফাৎটা কি? হ্যাঁ, আমরা সকলেই ঐ এক গর্ত্তে পড়ে আছি।"

মেজর বলিলেন, "আচ্ছা, বন্দীকে নিয়ে আমরা কি কর্‌ব? এঁকে আজই সেনা-পতির কাছে না পাঠিয়ে, আমাদের কাছে রাখলে হয় না?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেশ ত! আজ উনি এখানেই থাকুন। ঠিক কথা—যা বলেছ। আজ উনি থাকুন।"

"কাল পর্য্যন্ত ওঁকে আমাদের সঙ্গে রাখা চলবে ত?"

"কেন চলবে না! উনি এখানেই থাকুন, আমি সাইমনকে ওঁর জন্যে বিছানা-পত্তর তোয়ের করতে বলব। চার-চারটি সন্তান! আহা, চার-চারটি সন্তান!"

"আচ্ছা, সেনাপতি যদি ওঁকে গুলি করে মারতে হুকুম দেন?"

"হুঁ, কি বলচ—সেনাপতি যদি ওঁকে গুলি করে মারতে চান? এ সবই দৈবের উপর নির্ভর করে। বন্দীর যে চারটি ছেলেমেয়ে, সেনাপতিকে কি এ কথা কোন গতিকে জানিয়ে দেবার উপায় নেই?"

"তোমার কি মনে হয় না যে, যুদ্ধের মধ্যে অনেক ঘৃণাকর ব্যাপার আছে?"

"অ্যাঁ, তা—যা বলেছ,—হ্যাঁ, আছে বৈ কি!"—কর্ণেল বড়ই অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন—"কিন্তু কর্ত্তব্য ত' পালন করতেই হবে। আমরা শপথ করেছি, মনে আছে ত?—যাক, সব চুলোয় যাক্! এ লক্ষ্মীছাড়া ব্যাপারটা মন থেকে এখনকার মত মুছে ফেলতে পারলে অন্ততঃ কাল পর্য্যন্ত শান্তিতে থাকা যাবে। বন্দী মদ খান কি না, জিজ্ঞাসা কর। উনি আজ রাতে আমাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করবেন।"

কর্ণেল ও মেজরের সহিত বন্দী শয়ন করিলেন। বাহির হইতে মাঝে মাঝে দুই চারিটা বন্দুকের আওয়াজ আসিতেছিল। তা-ছাড়া আর সব নীরব-নিঝুম।

মেজরের ঘুম চটিয়া গিয়াছিল। তিনি কেবলই এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন। লেপখানা একবার ছুড়িয়া ফেলিতেছিলেন, আবার গায়ের উপর টানিয়া লইতেছিলেন। এইবার লইয়া দশবার তিনি খবরের কাগজ পড়িবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কাগজখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল। মাঝে-মাঝে তিনি ঘুমন্ত বন্দীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন; অভাগার ওষ্ঠ হইতে দুঃস্বপ্নের অস্পষ্ট ভাষা বাহির হইতেছিল। মেজরের চিন্তাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমাগত সন্তানের দিকে ফিরিয়া আসিতেছিল। বন্দীর সন্তান নয়,—তিনি ভাবিতেছিলেন, নিজের সন্তানের কথা।

অবশেষে, যখন তিনি চোখের পাতা মুদিলেন, তখনও তিনি সে ভাবনা ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তা সেই রক্তাক্ত রণক্ষেত্র হইতে হাজার-হাজার মাইল পার হইয়া, যেখানে, চারিদিকের নিরালা শস্যক্ষেত্রের শ্যামলতার মাঝে তাঁহার শান্তিসুপ্ত পরিবারবর্গ বাস করিতেছিল, সেইখানে ছুটিয়া গেল। সেখানে যুদ্ধ নাই, মৃতদেহ নাই, ধ্বংশপাথারে রক্তের ঢেউ নাই!

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি একটি মাঝারিগোছের ঘরে গিয়া হাজির হইয়াছেন। এককোণে ছোট বাতির মৃদু আলোয় দুটি ছোট বিছানা দেখা যাইতেছে। বিছানার মশারীর মধ্য হইতে ঘুমন্তের নিশ্বাস-শব্দ আসিতেছে। মেজর একটি বিছানার মশারী তুলিয়া ধরিলেন। ভিতরে একটি ছোট্ট মেয়ে ঘুমাইয়া আছে,—গা হইতে লেপখানা সে খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

আপনার মোটা মোটা পা-দুখানি সে দুমড়াইয়া পেটের কাছে গুটাইয়া আছে, ঠোঁট-দুখানি তার ফাঁক-করা। এই চুলবুলে মেয়েটি সারাদিনের দুরন্তপনার পর এখন একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। মেজরের স্নেহমাখা দৃষ্টি বহুক্ষণ ধরিয়া সেই ঘুমন্ত ননীর পুতলির পানে স্থির হইয়া রহিল।

মেজর আপন-মনে বলিলেন, "ঘুমাও দুলালী, ঘুমাও স্বর্গের পরী।"

তিনি দ্বিতীয় বিছানার দিকে গেলেন। মনুষ্যত্বের এই ছোট টুকরাটির দিকে একবার চাহিয়া দেখ! এখনো বয়স তাহার দুই বছর হয় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে এই বীরপুরুষ দিনভোর শুধু যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি রব ছাড়া আর কিছুই জানে না। তার কচি কচি গালদুটিতে আঁচড়া-আঁচড়ির দাগ। শত্রুদের একজনের সঙ্গে সে ক্ষণিক সন্ধি করিয়াছে, তাহার পাশে যে বিড়ালটি পায়ের মধ্যে মাথা লুকাইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে, তাহাকে দেখিলে এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। মেজরের খোকাটি কেমন মোটাসোটা! গোল মাথাটি তাহার কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলে ভরা। যাদুর রাঙ্গা রাঙ্গা নধর গালে ঐ যে ছোট টোলটি, ঐখানটিতে চুমা খাইবার জন্য মেজরের মনে ভারী সাধ হইতে লাগিল। কিন্তু না, —চুমা খাইতে গেলে সোনামণির ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে!

পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়া মেজর আস্তে আস্তে পাশের ঘরটিতে গেলেন। সেখানে তাঁহার স্ত্রী বড় ছেলের সঙ্গে শুইয়া আছেন। বড় খোকার বয়স ছয় বৎসর। আপনার ভাই-বোনের চেয়ে বয়সে বড় বলিয়া মনে মনে তাহার বড়ই গর্ব্ব! বাতির শিখা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে; নীলরঙ্গের মৃদু আলোয় মাতা-পুত্রের দেহ রঞ্জিত। বিছানার পাশটিতে ছোট টেবিলের উপর মেজরের ফোটোগ্রাফ ও একখানা খোলা খবরের কাগজ রহিয়াছে। মেজর বুঝিলেন, ঠিক ঘুমাইবার আগেই তাঁহার প্রিয়তমা খবরের কাগজে তাঁহারই কথা পড়িতেছিলেন। ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে মেজরের আরও কয়খানি ছবি টাঙ্গানো। তাঁহার স্মৃতি এখানে কেহ ভুলে নাই। সাবধানে হেঁট হইয়া মেজর তাঁহার প্রিয়ার ওষ্ঠে চুম্বনের দাগ আঁকিয়া দিলেন। তারপর চোখ বুজিয়া তিনি স্ত্রীর কপালে আর একটি চুম্বন করিলেন।

এখানে চারিদিকে অগাধ শান্তি, গভীর সুপ্তি ও মধুর প্রেম বিরাজ করিতেছে! এই সব ঘুমন্ত মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত অশুভ, হতাশা ও ঘৃণা-হিংসার চিন্তা দূর করিবার জন্য এখানে যেন কোন অশরীরী দেবদূত একান্ত প্রাণে প্রার্থনারত রহিয়াছে।

তখন সুস্বপ্নমুগ্ধ সুপ্ত মেজরের দিকে কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, তাঁহার মুখে পুলক-হাসির লীলা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ তাঁহার মুখের হাসি মুছিয়া গেল। হাসির পরিবর্ত্তে তথায় জাগিয়া উঠিল, একটা বিস্ময় ও ভয়ের ভাব। তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। তিনি যেন তখন একটা বিচিত্র-ভয়াল দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তাঁহার শোণিত-

প্রবাহ শীতল হইয়া শিরায় শিরায় বহিয়া চলিয়াছিল।

তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট বাড়ীর যে ঘরখানি একটু পূর্ব্বে এমন নিসাড় ছিল, তাহা এখন অস্পষ্ট স্বরলহরীতে ভরিয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়েরা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। তাহাদের মাথার উপর এক-খানা মিশমিশে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহারা সভয়ে উর্দ্ধমুখে সেইদিকপানে তাকাইয়া! কি লুকানো ঐ মেঘের মধ্যে,—কি লুকানো আছে? পিতার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইল—সে বুক যেন এখনি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে!

ধীরে ধীরে ধীরে কালো মেঘ দুলিতে দুলিতে নামিয়া আসিতেছে, কাঁপিতে কাঁপিতে নামিয়া আসিতেছে!

শিশুরা সব বিছানার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। তাহারা ভয়ে চেঁচাইতে লাগিল, কিন্তু কোনখান হইতে কোন উত্তর আসিল না। তাহারা মাকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কালো মেঘ মাঝ-খানে পড়িয়া তাহাদের মাকে চোখের আড়াল করিয়া দিল। সেই রহস্যময়, ভীষণ, অস্পষ্ট মেঘখানা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যেন একটা স্পষ্ট আকার ধারণ করিল। অবশেষে সকলেই দেখিতে পাইল—কি সে জিনিষটা! সে এক দীর্ঘাকৃতি লোকের মৃতদেহ এবং সেই দেহের চারিপাশ ঘিরিয়া চারিটি শিশু! শিশুরা যাতনায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে—তাহাদের ছোট বুক যেন ভাঙ্গিয়া দুইয়া যাইতেছে।

খানিকপরে সাহসে ভর করিয়া মেজরের ছেলেমেয়েরা মৃতদেহের কাছে আগাইয়া আসিয়া দেখিতে লাগিল। মেজরের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সে শব কাহার? কপালে সেই কাটা দাগ, সেই সাদা চুলে ভরা মস্ত মাথা, সেই ঘন, ধব্‌ধবে গোঁফ! কাঁধের সেই নূতন ক্ষত-চিহ্ন, রক্তাক্ত বস্ত্র ও ছেঁড়াখোড়া ইজার পর্য্যন্ত ঠিক-ঠিক দেখা যাইতেছে।—না, কোন সন্দেহ নাই! মেজরের বুকটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতে লাগিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!

মেজরের ছোট মেয়েটির রাঙ্গা গাল পাঙ্গাস হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে,—কে এ কাজ করেচে?"

মেজরের বড় ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "কে মার্‌লে একে?"

শবকে ঘিরিয়া যে চারিটি অচেনা, কালো শিশু বিদ্যুতের মত চোখ লইয়া বসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আঙ্গুল তুলিয়া মেজরকে দেখাইয়া তাঁহাকেই দোষী করিল।

"ওই আমাদের বাপকে মেরেচে! ওই আমাদের পথে বসিয়েচে—আমাদের ভিখারী করেচে!"

মেজর কথা কহিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার নিজের সন্তানেরা শঙ্কিত মুখে তাঁহার কাছ হইতে সরিয়া গেল। ছোট ছেলেমেয়েদুটি যেন আত্মরক্ষার জন্য আপনাদের হাতগুলি তুলিয়া ধরিল। মেজর তাঁহার মেয়ের কাছে আগাইয়া আসিলেন, কিন্তু সেও

ভয়ে পলাইয়া গেল। তারপর সে মেজরের হাত দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল, "রক্ত! রক্ত!"

মেজর নিজের হাতের দিকে চাহিলেন। শিশুর কথা ঠিক। তাঁহার হাতদুটি—রক্তে রাঙ্গা।

মেজর আবার কথা কহিবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন কাহার লৌহহস্ত সজোরে তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া শ্বাসরোধ করিতে চাহিতেছে! তিনি মুক্তির জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন,—হাঁ, মরিয়া হইয়া! সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া! তারপর আর একবার শেষ চেষ্টা—তারপর, জাগরণ!

গায়ের লেপখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া তিনি একলাফে বিছানা ছাড়িয়া মাটিতে পড়িলেন।

বন্দী তখন উঠিয়া বসিয়াছেন। কর্ণেলও টেবিলের ধারে বসিয়া আছেন।

"কিহে মেজর, তুমি ত' দেখ্‌ছি দিব্যি একচোট ঘুমিয়ে নিলে!"

"হ্যাঁ, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।"

একটু বিচলিত হইয়া কর্ণেল বলিলেন, "কি! তুমিও?"

"—'তুমিও' বলছ, তার মানে?"

"আমি নিজে এক বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।"

"তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ? বন্দীর বিষয়ে কিছু?"

"তাই বটে। নইলে আর কি দেখ্‌ব, বল? তুমি আমার একরত্তি ভলোডিয়াকে জান ত?"

"বেশ জিজ্ঞাসা কর্‌ছ, যাহোক! আমি না তার ধর্ম্মপিতা? আমি তাকে জানি নে?"

"তাইত' হে—আমি যে দেখ্‌ছি বেজায় গাধা! আমার মাথাটা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে। যাক্‌—শোন বলি! ভলোডিয়া কাল সারারাত স্বপ্নে আমার পা ধরে মিনতি করেছে,—যাতে বন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?' সে বল্লে, 'বন্দীর ঘরেও ছোট ছোট ভলোডিয়া আছে। তাদের কাছে যাবার জন্যে বন্দীকে আমি ছেড়ে দিতে বল্‌ছি।'—আচ্ছা, কাল রাতে মদে কিছু ছিল বলে কি তোমার মনে হয়?"

মেজর পলকহীন নেত্রে কর্ণেলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

"তোমার স্বপ্নের কথা আমাকে বল।"

মেজর তখন স্বপ্নের কথা খুলিয়া বলিলেন।

কর্ণেল কহিলেন, "বাস্তবিক, এ সব শুন্‌লে আপনা-আপনি মনে একটা কুসংস্কার জন্মে যায়। ওসব কথা থাক্‌—এখন ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি কর্‌তে হবে ত'। যত শীঘ্র পারা যায় বন্দীকে সেনাপতির কাছে পাঠানো ছাড়া আর ত' কোন উপায় দেখি না। তার নসিবে কি আছে সে কথা সেনাপতিই বল্‌তে পারেন, আমরা না। বন্দীকে আর বেশীক্ষণ আমাদের কাছে রাখ্‌লে, আমরা পাগল হয়ে যাব।"

"তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। বন্দীকে আমি নিজে সেনাপতির কাছে নিয়ে যাব। কি বল?"

কর্ণেল নানাদিকে চাহিতে লাগিলেন, যাহাতে মেজরের সঙ্গে তাঁহার চোখোচোখি না হয়। বলিলেন, "বেশ ত'! তাতে আর আমার আপত্তি কি?"—তাহার পর পদস্থ

কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে যে স্বরে হুকুম দেন, সেইরূপ স্বরে তিনি কহিলেন, "এখন যত শীঘ্র ইচ্ছা তুমি যেতে পার। সেনাপতির কাছে গিয়ে, বন্দীকে তুমি তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে আস্‌বে।"

***

মামুদ বে'কে সঙ্গে লইয়া মেজর ঘোড়ায় চড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। তাঁহার মনের ভিতরটা আগেকার মতই গুমোট করিয়া ছিল। খানিকপরে তাঁহারা রুশ ফৌজের শেষ ফাঁড়িতে গিয়া পৌঁছিলেন।

কুয়াশার ভিতর হইতে একজন কসাক সওয়ার বাহির হইয়া আসিল।

সামনের একটা সুঁড়িপথ দেখাইয়া দিয়া মেজর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বাপু, এ পথটা কোথায় গিয়েছে, বল্‌তে পার?"

"শত্রুদের আড্ডায়, হুজুর!"

"আজ কোন তুর্কীকে তুমি দেখ্‌তে পেয়েছ?"

"না হুজুর—একজনকেও না। তারা দেখ্‌ছি আজকে বেজায় ঠাণ্ডা বনে' গেছে। কিন্তু কাল তারা পাগলের মত বিষম গোলমাল করেছিল। ভগবানের দয়ায় আজ আমরা একটু শান্তিতে আছি।"

মেজর বন্দীকে তাঁহার পিছনে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া সেই সুঁড়িপথের ভিতর ঢুকিলেন। কিন্তু তাঁহারা বেশীদুর যাইতে না যাইতেই সেই কসাক সওয়ার ঘোড়া ছুটাইয়া আবার তাঁহাদের কাছে আসিয়া হাজির হইল।

মেজর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, ব্যাপার কি?"

"হুজুর, একটা কথা আপনাকে বল্‌তে ভুলে গিয়েছি। তুর্কীরা বেশী তফাতে নেই, তারা হঠাৎ একটা হাঙ্গাম বাধিয়ে তুলতে পারে।"

"বহুৎ আচ্ছা! আমিও চোখ বুজে থাক্‌ব না।"

"হুজুর, আপনার বন্দী পালাতে পারে।"

"কোন ভয় নেই। তুর্কীরা কোথায়, কি রকমে আছে, বন্দী আমাকে সে সব দেখিয়ে দেবে বলেছে। তুমি যেতে পার।"

কসাক প্রস্থান করিল। অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহারা দুইজনে নীরবে বহুদুর অগ্রসর হইলেন।

তারপর মেজর ঘোড়া থামাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"মামুদ বে, আমার কথা শুনুন। এখান থেকে তুর্কী ফৌজ বেশী তফাতে নেই। আপনি পালান! আড্রিয়ানোপলে আপনার ছেলেমেয়েদের কাছে যান। শুনতে পাচ্চেন, যা বল্‌ছি? আমারও ছেলে আছে, মেয়ে আছে। এ কি, কি জন্যে আপনি এখনো যাচ্ছেন না? আর সময় নেই। আপনি যদি বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে আমার মন বদ্‌লে যেতে পারে। দোহাই আপনার!—মশাই, আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন না?"

মামুদ বে যেন পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছেন! কেবল তাঁর চোখদুটি জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন।

অতি ধীরভাবে মেজর কহিলেন, "আপনাকে আবার বলছি, আপনি স্বাধীন, নিজের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন।"

এই কল্পনাতীত সত্য যেন বন্দী এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। মামুদ বে হঠাৎ হেঁট হইয়া মেজরের হাত ধরিয়া আবেগভরে তাহা চুম্বন করিলেন।

"রুশ, শুনুন। আপনি আমাকে এমন ঋণের পাশে বাঁধলেন, যা আমি কখনো শোধ করতে পারব না। আপনি কোনদিন বন্দী হলে শত্রুশিবিরে আপনারই মত সদাশয় এক তুর্কীকে দেখতে পাবেন—এ কথা বলা আমার পক্ষে সঙ্গত নয়। কিন্তু,—একটি কথা। ঈশ্বর এক। ধর্ম্ম ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর এক। আমি শপথ করছি, আমি আর আমার ছেলেমেয়েরা যতদিন বাঁচব, ভগবানের কাছে ততদিন প্রত্যহ আপনার জন্য প্রার্থনা করব যে, আপনার ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে তিনি যেন আপনাকে রক্ষা করেন, যেমন আমার ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে আপনি আমাকে বাঁচালেন। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। বিদায়, রুশ! বিদায়!"

তারপর,—পাছে মেজর তাঁর মন বদ্‌লান যেন এই ভয়েই—হঠাৎ ঘোড়াকে জোরে চাবুক কশাইয়া মামুদ বে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মেজর খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধ হয়, আরও কিছু আগাইয়া নিরাপদ ব্যবধানে চলিয়া যাইবার জন্য তুর্কীকে তিনি সময় দিতে চাহেন।

যখন তিনি রুশ ফাঁড়ির কাছে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সেই কসাক অশ্বারোহীর সহিত আবার তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

মেজর কহিলেন, "ওহে বাপু, তুমি ত' ঠিক বলেছিলে! বন্দী পালিয়ে গেছে!"

কসাক ভাল করিয়া তীক্ষ্ণ নেত্রে মেজরের মুখটা দেখিয়া লইল। পদস্থ কর্ম্মচারীর দিকে কোন সাধারণ সৈনিক সে-রকম দৃষ্টিতে চাহে না! তারপর বলিল, "তার জোর বরাত, হুজুর! আমাদেরও বন্দীর অভাব নেই।"

মেজর যখন ঘরে ঢুকিলেন, কর্ণেল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল হে?"

"হুজুর, আমাকে গ্রেপ্তার করুন। আমি বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছি।"

কর্ণেল কিছু বলিলেন না। সামনে আসিয়া নীরব আনন্দে মেজরকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই তাঁহার উত্তর।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আধুনিক ভারত

তৃতীয় কাল-বিভাগ

ইংলণ্ডের ভারতসাম্রাজ্য

ইংরাজের ভারত-বিজয়ে ভারতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, সেই পরিবর্ত্তনের ইতিহাসে এই সিপাহী-বিদ্রোহ, একটা সুনির্দ্দিষ্ট কালবিভাগের আরম্ভ সূচনা করে। তখন হইতেই এই ইতিহাসের সেই তৃতীয়ভাগ আরম্ভ হইল, যে-ভাগে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা উত্তরোত্তর মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে।

*

* *

১৮৫৭—৫৮ অব্দের ঘটনায়, ইংরাজদের ত্রুটিগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভারতের শাসনতন্ত্র নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য আইনের যে পাণ্ডুলিপি ইতিপূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল, ইংলণ্ডীয় মহাসভার দুই বিভাগেই, বহু বাদানুবাদের পর ঐ পাণ্ডু-লিপি ২রা অগষ্ট ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আইনরূপে গৃহীত হইল। কোম্পানী স্বীয় বিশেষাধিকার হইতে বঞ্চিত হইল এবং কোম্পানীর অধিকৃত সমস্ত ভূসম্পত্তি ইংলণ্ডের রাজার অধিকারভুক্ত হইল। ভারতের রাজপ্রতি-নিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লর্ড ক্যানিং, ১লা নভেম্বর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এক রাজকীয় ঘোষণা-পত্র জারি করিলেন। ঐ ঘোষণাপত্র ভারতের অধিকার-পত্র হইয়া দাঁড়াইল।

মহারাণী ঘোষণা করিলেন যে, তিনি স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবেন, কোম্পানীর নিয়োজিত কর্ম্মচারীদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে বাহাল রাখিবেন, কোম্পানীর সহিত রাজাদিগের যে-সব সন্ধি হইয়াছিল সেই-সব সন্ধি মান্য করিবেন, এবং স্বকীয় অধিকারসকল যেরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবেন, রাজাদিগের অধিকারও সেইরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবেন।

পুরাতন ভূস্বামীদিগের ভূসম্পত্তিতে স্বকীয় স্বত্বাধিকার বজায় থাকিবে (কোম্পানী উহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া ঐ সকল অধিকার চাষাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন) এইরূপ অঙ্গীকার করা হইল।

তাহার পর, মহারাণী ঘোষণাপত্রে এই কথাগুলি সংযোজিত করিলেন :—

"যে সকল কর্ত্তব্যের বন্ধনে, যে সকল দায়িত্বের বন্ধনে আমরা সমস্ত প্রজামণ্ডলীর সহিত আবদ্ধ, সেই একই কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের বন্ধনে আমরা ভারত-রাজ্যের অধিবাসীদিগের সহিতও আবদ্ধ। সর্ব্বশক্তি-মান ঈশ্বরের সাহায্য, ঐ সকল কর্ত্তব্য যথাযথরূপে ও ধর্ম্মতঃ পালন করিতে আমাদিগকে সমর্থ করিবে। খৃষ্টধর্ম্মের সত্যতায় আমাদের নিজের একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে, ঐ ধর্ম্মের সান্ত্বনা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি ; কিন্তু ইহা আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস আমাদের কোন প্রজার উপর বলপূর্ব্বক চাপাইয়া দিবার আমাদের কোন অধিকারও নাই, ইচ্ছাও নাই। আরও এই কথা আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, কোন বিশেষ ধর্ম্মবিশ্বাসের দরুণ কিংবা ধর্ম্মানুষ্ঠানের দরুণ

কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রদর্শন করা হইবে না। পরন্তু সকলেই অপক্ষপাত-সহকারে ও সমানরূপে আইনের আশ্রয় লাভ করিবে; ইহাই আমাদের ইচ্ছা ও আদেশ। এবং আমাদের যাঁহারা প্রতিনিধি তাঁহাদের প্রতি আমাদের এই উপদেশ ও আদেশ যে, তাঁহারা যেন আমাদের কোন প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করেন—যদি করেন, তবে তাঁহারা আমাদিগের অপ্রীতিভাজন হইবেন......আরও আমাদের এই ইচ্ছা যে, যতদূর সম্ভব, জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমাদের সকল প্রজাই অপক্ষপাত-সহকারে ও উদারভাবে আমাদের রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে।"

মহারাণী আরও ঘোষণা করিলেন যে, বিদ্রোহীদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিবেন যদি তাহারা ১৮৫৯ অব্দের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র সরকারের হস্তে প্রত্যর্পণ করে এবং স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আইসে। কেবল যাহারা ব্রিটিশ প্রজাদিগকে হত্যা করিয়াছিল তাহারাই ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইবে।

রাণীর অঙ্গীকারগুলি ইংলণ্ড রক্ষা করিয়াছেন। রাণী যে কার্য্যানুক্রমের রেখাপাত করিয়াছিলেন, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইতে ইংলণ্ড তাহার অনুসরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

এই কার্য্যানুক্রমের পারম্পর্য্য পর্য্যালোচনা করাই আমাদের পক্ষে সুবিধা। প্রথমে সাধারণ রাষ্ট্রনীতি; তাহার পর, শাসনকার্য্য, সামরিক বন্দোবস্ত, বিধিব্যবস্থা ও শিক্ষা; পরিশেষে বৈষয়িক ও ভৌতিক উন্নতি।

১

অশোক ও আকবর যে কার্য্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের রাজবিধির দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই তৃতীয়বার,—ভারতের সমস্ত রাজ্য এক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কোম্পানী রাজাদের সহিত যে সব সন্ধি করিয়াছিল সেই সন্ধির প্রভাবে রাজারা কোম্পানীর অধীনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানী রাজাদিগকে বিজিত শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিত, আশ্রিত বলিয়া জ্ঞান করিত না। তাহাদিগকে রক্ষা করা দূরে থাক্, কোম্পানী তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিবার চেষ্টা করিত, এমন কি তাহাদিগকে বেদখল করিবার চেষ্টা করিত। তথাপি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজারা কোম্পানীর অনুগত ছিল, (১) অনেকে কোম্পানীকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিল। তাই, এই সব বিদ্রোহের গোলযোগ চুকিয়া গেলে, ইংলণ্ড স্বকীয় রাজশক্তির একটা নূতন পত্তনভূমি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ভারতের সমস্ত খণ্ডরাজ্য, দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য ও ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত রাজ্য—সমস্তই এক সাম্রাজ্যের অধীনে আসিবে এবং তাহার অধিস্বামী হইবেন—ইংলণ্ডের অধিপতি।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এক বক্তৃতায় লর্ড ক্যানিং এই রাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন:

"দিল্লীর রাজবংশের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। পেশোয়ার উত্তরাধিকারের শেষ-দাবিদার অন্তর্হিত

---

(১) সিংহাসনচ্যুত রাজারাই বিদ্রোহের নেতা ছিল। সিংহাসনস্থ রাজারা সকলেই অনুগত অথবা উদাসীন ছিল। ইহার ব্যতিক্রমস্থল—সেই সব মধ্যমশ্রেণীর সামন্ত-ভূপতিগণ যাহাদের কু-শাসনের উপর দোষারোপ করা হইয়াছিল।

হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডেশ্বরীই সমস্ত ভারতের অবিসম্বাদিত অধীশ্বরী এবং ইংলণ্ডের রাজশক্তিই ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তি। এই সর্ব্বপ্রথম, ইংলণ্ড সমস্ত রাজাদিগের সম্মুখে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের অধিস্বামিত্ব এক্ষণে এমন একটা বাস্তবতা লাভ করিয়াছে, যাহা ইতিপূর্ব্বে আর কখন করে নাই। ভারতের সমস্ত ভূপতিরা ইহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, সকলেই উহা আগ্রহের সহিত স্বীকার করিতেছে।"

আর এক স্থলে লর্ড ক্যানিং ঝটিকা-তাড়িত উত্তাল-সাগর তরঙ্গের বেগ-নিরোধক প্রাচীর-বাঁধের সহিত সমস্ত ভূপতিদিগের তুলনা দিয়া এইরূপ বলিয়াছেন:—

"যে সকল রাজা আমাদের অনুরক্ত তাহাদিগকে বজায় রাখিলে আমাদের সাম্রাজ্যের শান্তি কমিবে না, বরং আরও বর্দ্ধিত হইবে। যদি কখন বিদেশীয় শত্রুকর্ত্তৃক ভারতআক্রমণের আশঙ্কা হয়, যদি পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ইংরাজ-স্বার্থ ইংলণ্ডের প্রাচ্য সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করিয়া তুলে, তখন দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যগুলিই সাম্রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রক্ষা-দুর্গরূপে পরিণত হইবে।"

এই রাষ্ট্রনীতির ফলে লর্ড ড্যালহৌসির রাজবিধি রহিত হইল:—উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনে এবং উত্তরাধিকারের নিয়ম নির্দ্ধারণে রাজারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। কোন রাজার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করিয়া লওয়া দূরে থাক,—ভারত-সরকার, প্রাচীন রাজবংশদিগকে স্বকীয় সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিয়াছেন; তাই, যে মহীশূর রাজ্যের শাসনকার্য্য ইংরাজেরা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সেই মহীশূর-রাজ্য মহীশূরের প্রাচীন রাজবংশ পুনঃপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু রাজাদিগের দরবারে একজন করিয়া ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকেন এবং তাঁহাদের রাজ্যের মধ্যে এক একদল ইংরাজ-রক্ষীসৈন্য প্রহরীস্বরূপ অবস্থিতি করে। রাজারা আপনাদিগের মধ্যে কিংবা কোন এসিয়িক বা য়ুরোপীয় রাজশক্তির সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে পারেন না।

এক্ষণে ছোট বড় ৭০০ খণ্ডরাজ্য ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রাজাদিগের রাজ্যের পরিমাণ, সমস্ত ভারতের এক তৃতীয়াংশ এবং উহার লোক সংখ্যা ৬৩,০০০০০০।

ব্রিটিস সরকারের আশ্রয়ে থাকিয়া, এক্ষণে রাজারা ইংলণ্ডের অনুগত মিত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। ভারতে ইংলণ্ডের যুবরাজের আগমন, সাম্রাজ্যের পরিঘোষণা, রাণীর দুটি "জুবিলি", রাণীর মৃত্যু,—এই সব উপলক্ষে, খুব ধুমধামের সহিত রাজভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন রুশের সঙ্গে গোলযোগ বাধে, এবং তাহার পর, বোয়ার-যুদ্ধের সময়, চীন-অভিযানের সময়, সমস্ত রাজারা ইংলণ্ডকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশ্য, শুধু জ্বলন্ত মুখভারতী প্রকৃত আনুগত্যের—বিশেষত প্রাচ্য রাজাদিগের আনুগত্যের তেমন সুদৃঢ় প্রতিভূ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ব্রিটিশ প্রাধান্য বজায় রাখা অধিকাংশ রাজাদিগের স্বার্থ। খুব কম রাজবংশই জাতীয় ভাবাপন্ন; প্রাচীন রাজবংশের সংখ্যা আরও কম। সামন্ত ভূপতিদিগের অগ্রগণ্য নিজাম—একজন মুসলমান। তাঁহার এক কোটি হিন্দুপ্রজা।

ভারতবাসীরা স্বকীয় রাজার প্রতি তেমন আসক্ত নহে। ইংরাজরাজশক্তির অধঃপতনে প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজবংশও যে সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ভারতেশ্বরের প্রতিনিধি ভাইসরয় অধীন রাজাদিগের শাসনকার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখেন। জার্ম্মানীতে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, কতকগুলি আইন সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতিই প্রযুয্য। ভারতের সেরূপ কোন সাধারণ আইন নাই, কিন্তু Sir Henry Maine একটা কথা ঠিক্ বলিয়াছেন—প্রত্যেক খণ্ডরাজ্যেই, রাজার সহিত ভাইস্রয়ের আধিপত্য-অধিকারের একটা ভাগাভাগি আছে। ভারত-সাম্রাজ্যের সহিত খণ্ডরাজ্য সমূহের যে সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধির সর্ত্ত-অনুসারে, প্রত্যেকেরই আধিপত্যের একটা অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড চান যে, রাজারা যথেচ্ছাচারীর ন্যায় প্রজাশাসন না করেন, পরন্তু স্ব স্ব প্রজাবর্গের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার রাজাদিগকে এইরূপ অভিভাষণ করিয়াছিলেন :—

"রাণীর প্রতিনিধিস্বরূপ আমি কতকগুলি কথা আপনাদিগকে পুনর্ব্বার বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছি—সে কথা আমার পূর্ব্বেও অন্যের নিকট আপনারা শুনিয়াছেন। মহারাণীর রাজসরকার আপনাদিগের নিকট এবং আপনাদিগের উত্তরাধিকারীদিগের নিকট এই অঙ্গীকার করিতেছেন যে আপনারা আপনাদের প্রাচীন অধিকারসকল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে পারিবেন, এবং আইনবিরুদ্ধ না হইলে আপনাদের সমস্ত প্রচলিত প্রথা আপনারা স্বাধীনভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন। আপনাদের পদমর্য্যাদা ও বহুশতাব্দী হইতে আপনারা পুরুষানুক্রমে যে আধিপত্য ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য মহারাণীর রাজসরকার আপনাদিগকে সাহায্য করিবেন।

কিন্তু এই লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আপনাদের আন্তরিক সাহায্য আবশ্যক। আমরা যেমন আপনাদের অধিকারসমূহের প্রতি—আপনাদের বিশেষ অধিকার সমূহের প্রতি—সম্মান প্রদর্শন করিতেছি, আপনাদিগের আশ্রিত প্রজাদিগের অধিকারাদির প্রতিও সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা আপনাদের রাজশক্তি বজায় রাখিব, কিন্তু ইহার প্রতিদানস্বরূপ আমরা চাহি যে আপনারা ভাল করিয়া প্রজা-পালন করিবেন; আমরা চাহি যে, সমস্ত রাজস্থানে ন্যায়ধর্ম্ম ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইবে; প্রত্যেক ব্যক্তির স্বত্বাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে; ভ্রমণকারী সর্ব্বত্র নিরাপদে ভ্রমণ করিতে পারিবে; কৃষিজীবী নিজ শ্রমের ফল, এবং বণিক নিজ বাণিজ্যের পণ্যসামগ্রী অবাধে সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। আপনারা রাস্তা প্রস্তুত করিবেন এবং যাহাতে করিয়া প্রজাবর্গের অবস্থার উন্নতি হয়, রাজস্বের বৃদ্ধি হয়—সেইরূপ জলসেচনপ্রণালী প্রভৃতি হিতকর অনুষ্ঠান রাজ্যের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবেন; শিক্ষার বিস্তারে উৎসাহ দিবেন এবং রুগ্ন ও পীড়িতদিগের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিবেন।

ইহা আপনারা নিশ্চিত জানিবেন, এই সকল কাজে আপনাদেরই লাভ হইবে। যদি আপনাদিগকে হীনবল করিবার আমাদের ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে বলিতাম :—আপনারা দারিদ্র্যের মধ্যে, অজ্ঞতার মধ্যে, অরাজকতার মধ্যেই চিরকাল অবস্থিতি করুন। আপনাদিগকে শক্তিশালী দেখিতে ইচ্ছা করি বলিয়াই আমরা চাহি, আপনারা ধনশালী হউন, আপনাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হউক, সুশাসন প্রবর্ত্তিত হউক।

মহারাণী তাঁহার যে সকল প্রজাদের উপর ভারত-

শাসনের ভার দিয়াছেন, সেই প্রজাদিগের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। বিধাতা সেই সকল ভূপতিদিগকেই রক্ষা করেন, যাহাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর কোন লক্ষ্য নাই—সে লক্ষ্য প্রজাবর্গের হিতসাধন।

আমি এখানে কয়েক বৎসর মাত্র অবস্থিতি করিব। আমার নিকটে যে সকল সুদক্ষ ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী আছেন তাঁহারাও অনতিবিলম্বে ইংলণ্ডে চলিয়া যাইবেন, কিন্তু যে রাজশক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ আমরা এখানে আছি, সে রাজশক্তি শতশত বৎসরকাল তিষ্ঠিয়া থাকিবে। প্রতিদিনই এই সাম্রাজ্য আমাদের মহারাণীর সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বাষ্পীয় জাহাজ ও রেলপথ প্রতি বৎসর ভারতকে আরও গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিবার জন্য ইংলণ্ডকে সমর্থ করিতেছে। এই সকল বন্ধন লৌহের বন্ধন নহে, ইহা স্বর্ণময় প্রীতির বন্ধন, শান্তির বন্ধন। দিগ্বিজয়ের দিন চলিয়া গিয়াছে; এক্ষণে উন্নতির দিন আরম্ভ হইয়াছে।

রাজা, মহারাজা, আপনারা সোজাপথে অগ্রসর হউন। আপনাদের পুত্রপৌত্রদিগকে, আপনাদের প্রজাবর্গের উত্তরবংশীয়দিগকে এই ধ্রুব আশ্বাসবাক্য শুনাইয়া দিন যে, তাহারা এমন এক রাজশক্তির অনুগ্রহ ও আশ্রয় লাভ করিয়াছে যে-রাজশক্তি তাহাদের মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই চাহে না।" (২)

এই লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে লর্ড মেয়ো তিনটি মূলসূত্র স্থাপন করেন। ভারত-সরকার এই তিনটি মূলসূত্রের অনুসরণ করিয়াছেন।

প্রথম মূল সূত্রটী এই:—কোন রাজার আচরণে, ভাইস্‌রয়ের হস্তক্ষেপ আবশ্যক হইলেও, মিতব্যবহার অবলম্বন করা উচিত; এইরূপ অবস্থায়, ভাইস্‌রয়, সেই রাজ্যের শাসনভার ইংরাজ বা দেশীয় মন্ত্রিদের হস্তে অর্পণ করিবেন; আবশ্যক হইলে সেই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা করিবেন, অথবা কোন উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে স্থাপন করিবেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরোদা রাজ্যের জন্য এবং ১৮৮৯ হইতে ১৮৯১ পর্য্যন্ত কাশ্মীর রাজ্যের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মূলসূত্র:—যে সকল রাজ্যে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, সেই সকল রাজ্যের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পাইলে তবেই সেই রাজ্য সুপরিচালিত হওয়া সম্ভব। প্রায় সকল খণ্ডরাজ্যেই নিজের আইন আছে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচার করিবার অধিকার আছে; তাহারা নিজেই রাজকর সংগ্রহ করে, কেহ কেহ পণ্যশুল্কও সংগ্রহ করে; ১৮৯৯ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত—সমস্ত সামন্ত রাজাদিগের রাজস্ব ১৫,৩০০,০০০ পৌণ্ড পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে কেবল ৬১৫,০০০ পৌণ্ড তাহারা ভারত-সরকারকে প্রদান করে। ঐ সময়ের মধ্যে, ঐ সকল রাজ্যের কার্য্যোপযোগী সৈন্য সংখ্যা ৮৬,০০০ ছিল। তা ছাড়া উহারা সাম্রাজ্যের সৈন্যমণ্ডলীকে ১৭,০০০ সৈন্য যোগাইয়াছিল। এই শেষোক্ত সৈন্য য়ুরোপীয় রীতি-অনুসারে অস্ত্রসমন্বিত ও সুশিক্ষিত।

কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের শ্রীবৃদ্ধিসাধন খুবই অসমানভাবে হইয়াছিল। নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যর শালার-জং, হাইদ্রাবাদকে এসিয়া-সুলভ সামন্ততন্ত্র-রাষ্ট্র হইতে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছেন। মাধবরাও, পরম্পরা-ক্রমে ত্রিবাঙ্কুরে, গোয়ালিয়ারে ও বরোদায়

যে শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার সহিত ইংরাজশাসিত ভারতের শাসন প্রণালীর অল্পই প্রভেদ লক্ষিত হয়। ভূপালের বেগমেরা স্বকীয় রাজ্যটিকে খুবই সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। (৩)

স্বকীয় কার্য্য সুসম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে লর্ড মেয়ো আর একটি তৃতীয় মূলসূত্র স্থাপন করিলেন। সেই মূলসূত্র ভাবী ভূপতিদিগের সুশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা। তিনি কাথেওয়ারের রাজাদিগের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং রাজপুত রাজারা স্বয়ং আজমীরের মেয়ো কলেজ স্থাপনের জন্য ৭০,০০০ পৌণ্ড চাঁদা স্বাক্ষর করিলেন (৪)। কিন্তু এমনও অনেক রাজা আছে যাহারা তরুণ বয়সে অন্তঃপুরের ভোগ বিলাসে হীনবীর্য্য হইয়া রাজ্য শাসন করিতেও অসমর্থ, পুত্র উৎপাদনেও অসমর্থ।

মোটের উপর বলিতে গেলে, ঊনবিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, দেশীয় রাষ্ট্রসমূহে যে রূপান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় সভ্যতা ও প্রাচ্য সভ্যতার অনুকূলে শুভ-সূচনা করা যাইতে পারে। ১৮৫০-এর পূর্ব্বে, সামন্ত রাজ্যসমূহের অন্তর্ভূত মুসলমান রাজ্যগুলি নিরঙ্কুশ ও নিষ্ঠুর বিদেশী সৈনিক-দলের অনুগ্রহাধীন ছিল, এবং তদন্তর্ভূত হিন্দুরাজ্যগুলিও ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবাধীন ছিল ;—ব্রাহ্মণেরা তাহাদের মধ্যে নানাবিধ মূঢ় সংস্কার এবং নিতান্ত স্থূল ও দুর্নীতিজনক অনুষ্ঠানাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

ঐ সমস্ত রাজ্যের রাজারা ভোগসুখে, ষড়যন্ত্রে, কুচক্রে, বিদ্রোহে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল; ঐ সমস্ত রাজ্যে, নিষ্ঠুর দণ্ডাদি প্রচলিত, প্রজারা করভারে নিষ্পেষিত, রাজদরবারের বিলাসিতায় ও রাজবল্লভ দিগের ধনগৃধ্নতায় রাজকোষ ক্ষয়গ্রস্ত। না-ছিল রাস্তা, না-ছিল খাল, না-ছিল ডাকের বন্দোবস্ত, না-ছিল পুলিস। আজকাল অনেক রাজাই শিক্ষিত হইয়াছে, এবং প্রায় সকল রাজ্যই সুশাসিত হইতেছে। এখন ঐ সকল রাজ্যে রেল-পথ, ডাক,

(৩) সর-সালার জং (১৮২৯—৮৩), তাঁহার পিতৃব্যের উত্তরাধিকারীস্বরূপ, নিজামের প্রধান মন্ত্রীপদে (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হন। এতদিন ইংরাজেরা বেরার প্রদেশের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া উদ্বৃত্ত রাজস্ব নিজামকে দিতেছিলেন, এক্ষণে সর সালার জং সেই বেরার ইংরাজকে একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। (১৮৫৩) রাষ্ট্রিক সামাজিক আর্থিক সংস্কার সাধন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ-সরকারকে, আনুগত্য সহকৃত সাহায্য প্রদত্ত হয়। নিজামের মৃত্যুতে তিনি প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা (১৮৬৯)। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রা। (১৮৭৬) ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু।

মাধবরাও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৪ হইতে ১৮৭২ পর্য্যন্ত ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান; গোয়ালিয়ারে প্রধানমন্ত্রী; ১৮৭৫ হইতে ১৮৮৩ পর্য্যন্ত বরোদার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনীতিকুশল সচিবদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—গোয়ালিয়ারের দিনকররাও, জম্মুর কৃপারাম, আলোয়ারের পণ্ডিত মানফল, কোল্হাপুরের মাধোরাও বারোএ, এবং মহীশূরের পুর্ণিয়া। (Sir Richard Temple India id 1880 p 76) দ্রষ্টব্য

(৪) রাজকোটের রাজকুমার-কলেজ, ইন্দোরের ডালি-কলেজ, লাহোরের এচিসন-কলেজ—এইগুলা উল্লেখযোগ্য। এই সকল কলেজের ছাত্র সংখ্যা সর্ব্বসমেত দুইশতের উপর।

টেলিগ্রাফ স্থাপিত হইয়াছে। রাজ্যের অধিবাসীরা ও ভ্রমণকারীরা এখন নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে। রাজকর বেশী নহে, দুর্ভিক্ষাদি সত্ত্বেও সেখানে বৈষয়িক ও ভৌতিক উন্নতি স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এইরূপে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট, ভারতকে একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করিলেন। ভারতের নিজস্ব অভাবপ্রয়োজন, ভারতের নিজস্ব রাষ্ট্রনীতি। এই নূতন অবস্থার দরুণ, একটা নূতন নামের প্রয়োজন হইল। ১৮৭৬ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে মহারাণী "কাইজার-ই-হিন্দ" অর্থাৎ ভারত-সাম্রাজ্ঞী এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। (৫)

এক্ষণে ভারত-সাম্রাজ্য, একটা সাম্রাজ্য-সাধারণ রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে চাহিলেন। পূর্ব্বদিকে উচ্চ ব্রহ্মদেশঅধিকার; যুন্নানের পশ্চিমে যাহাতে ভারতের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশে চীনের সহিত সন্ধিস্থাপন; যে-শ্যামদেশের পশ্চিম উপকূল ভারতসাম্রাজ্যভুক্ত, সেই শ্যামদেশে নানা ষড়যন্ত্রের প্রতিবিধান; উত্তরে,—আসাম, হিমালয় ও কাশ্মীরের রক্ষী-সৈন্যেরা তিব্বত পর্য্যন্ত ঠেলিয়া চলিয়াছে; পশ্চিমদিকে চিত্রল-বিজয়, বেলুচি-স্থানে রেলপথ নির্ম্মাণ। পারস্যদেশে কতকগুলি গ্রাম এবং পারস্য-উপসাগরে কতকগুলি দ্বীপ অধিকার-করা; বৈদ্যুতিক রজ্জুর দ্বারা, কারাচির সহিত আরব্য উপকূলের যোগ-বন্ধন; Keweitএর সুলতানের সহিত মৈত্রীবন্ধন; পারস্যদেশের একটা বৃহৎ টেলিগ্রাফ-লাইনের কার্য্যভার এক ইংরেজ-কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ; পরিশেষে, ভারত-উপনিবেশ এডেনের বিস্তার সাধন;—১৮৯৮ পর্য্যন্ত এই এডেন-উপনিবেশ, সোমালিদিগের উপকূলকে আপন আশ্রিতের ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল।

অতএব, ভারতের ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য, ভারতীয় ক্রমবিকাশের একটি লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। ইংরেজেরা যাহাকে "ব্রিটানিকী শান্তি" (Pax Britanica) বলিতে ভাল বাসেন, ইংরেজ-সরকার ভারতকে সেই শান্তি এবং সেই শান্তির সঙ্গে—যে-একতাসাধনের চেষ্টা ত্রিশ শতাব্দী কাল ব্যর্থ হইয়াছিল সেই রাষ্ট্রীয় একতাও প্রদান করিয়াছেন। ভারতের এই সমস্ত খণ্ডরাষ্ট্র লইয়া সমগ্র একটি রাজ্য গঠিত হয় নাই, পরন্তু একটি রাষ্ট্রসমবায় (confederation) গঠিত হইয়াছে। এই সম্মিলনের ফলে, ঐ সকল রাষ্ট্রের অধিবাসী-গণ স্বাধীনতা হইতেও বিচ্যুত হয় নাই, স্বকীয় নিজত্ব হইতেও বিচ্যুত হয় নাই। তাছাড়া, এই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ভারতকে এসিয়ার মধ্যে একটি প্রবল রাষ্ট্রশক্তি করিয়া তুলিয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের দিগ্বিজয়, ব্রিটিশ ভারতের প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে, ও এসিয়ার ইতিহাসে ইহা একটি অভিনব তথ্য। মোগল-অভিযানের শেষ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এসিয়ার লোকেরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। একটা এসিয়া-সাধারণ রাষ্ট্রনীতি

(৫) ভারত সাম্রাজ্যের নিজস্ব পতাকা—নীল কাপড়ের উপর, ভারত-তারকা; কিন্তু সরকারী ক্রিয়া-কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে প্রায়ই ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলিত হইয়া থাকে।

ছিল না। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারত ও জাপান উভয়েরই এক একটা নিজস্ব লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং এক্ষণে তাহা য়ুরোপকে গণনার মধ্যে আনিতেই হইবে। কেননা, জাপান স্বাধীন এবং ইংরাজদিগের দ্বারা পরিচালিত হইলেও ভারতগভর্ণমেণ্টেরও কতকগুলি নিজস্ব উচ্চাভিলাষ আছে। সেদিন নিশ্চয়ই বেশী দূরবর্ত্তী নহে যেদিন ভারতীয় লোকমত উহার কতকগুলি অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য দাবী করিবে। (৬)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন

ফ্রেডারিক নিট্‌শে

ফ্রেডারিক নিট্‌শের নাম আজ সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দুই-এক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে নিট্‌শের নাম শুনিয়াছে এমন-লোক খুব কম দেখা যাইত। কিন্তু আজকাল বাঙ্গলা সাহিত্যে যখন-তখন নিট্‌শের নাম ও মত লইয়া আলোচনা চলিতেছে। সুতরাং এ সময় তাঁহার জীবনের দুই-চারিটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের স্যাক্সনী প্রদেশে, লুটযেন নামক সহরের কাছে ফ্রেডারিক নিট্‌শে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাদরির সন্তান। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে একটি বৃত্তি পাইয়া তিনি 'পোর্টা'র স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হন। দুই বৎসর পরে তিনি সেখানে 'জার্ম্মেনিয়া ক্লব' নামে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে মাসে একবার করিয়া সভ্যগণ পরস্পরে কবিতা, প্রবন্ধ, স্থাপত্য-পরিকল্পনা ও সঙ্গীত রচনা লইয়া আলোচনা করিতেন। জীবনের প্রথম হইতেই নিট্‌শের বিশ্বাস ছিল যে, ললিত-কলামাত্রই মানবাত্মার প্রকাশ, সেই জন্য আর্ট তাঁহার কাছে সাধারণ 'ক্যাল্‌চার' বা তুচ্ছ আনন্দের সামগ্রী ছিল না।

কিছুদিন পরে তিনি "বন য়ুনিভার্সিটি"তে ভাষাতত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চোখ খারাপ থাকিলেও, তাঁহাকে সৈন্যদলে যোগদান করিতে হয়। সামরিক বিভাগে বৎসরকাল কাজ করার পর হঠাৎ একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটায় তিনি সৈন্যদল ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। এই সময়ে তিনি

---

(৬) এ পর্য্যন্ত ভারতীয় লোকমত দিগ্‌বিজয়ের প্রতিকূলে বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ-অধিকারের প্রতিকূলে ছিল। এই সকল দিগবিজয়ের ফলে, ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্ম্মের সংখ্যা বাড়িয়া যায়—সুতরাং কতকগুলি বাঞ্ছিত রাষ্ট্রীয় সংস্কার ঠেলিয়া রাখিবার পক্ষে ইংরাজেরা বেশ একটা যুক্তি দেখাইতে পারে। কিন্তু যখন ভারতে একটা ভারতীয় রাষ্ট্রবুদ্ধি গঠিত হইবে, তখন ভারতবাসীরাই জাপানীদের ন্যায় রাজ্য বিস্তার-নীতির পক্ষপাতী হইয়া উঠিবে। এক্ষণে এই স্বদেশীয় রাষ্ট্রবুদ্ধি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

'বাসলে'তে ভাষা-তত্ত্বের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন।

নিট্‌শে এখানে ভাষাতত্ত্বের উপর যে সকল বক্তৃতা দিতেন, শ্রোতৃবর্গ তাহাতে একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। শব্দের কসরৎ না দেখাইয়া, 'হোমারিক' যুগ ও 'গ্রীক ক্যাল্‌চারকে' ভিত্তি করিয়া তিনি এক নবধর্ম্ম প্রচার করেন। সুখ ও দুঃখ এবং অবহেলা ও তাচ্ছল্যের নিদারুণ আঘাতেও তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের এই নূতন মত হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। অবশেষে তিনি উন্মাদরোগ-গ্রস্ত হন্ এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লুট্‌যেন সহরে সন্ন্যাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিট্‌শের বিশ্বাস ছিল যে, আধুনিক খৃষ্টধর্ম্মে দুর্ব্বলতার পূজা করা হয়। সঙ্গীতবিৎ ওয়াগনারের ইচ্ছা ছিল,—যে খৃষ্ট মানুষের জন্য আপনি ব্যথা-বেদনা সহিয়াও মানুষকে উচ্চতর আনন্দলোকে তুলিয়াছেন, সেই খৃষ্টের ধর্ম্ম যাহাতে অখণ্ড হইয়া উঠিতে পারে,—তিনি সেই চেষ্টা করিবেন। ওয়াগনারের এই কল্পনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিট্‌শে "The Anti-Christ" ও "The Case Against Wagner" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। "Thus Spake Zarathustra নামক গ্রন্থে তিনি তাঁহার বিখ্যাত মহামানব (Superman) ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নরশক্তির সাফল্যের আলোচনা করিয়াছেন।

—T. P.'s Magazine হইতে

আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসার অপূর্ব্বত্ব

একালে অস্ত্র-চিকিৎসায় আমেরিকাই পৃথিবী মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। ডাঃ উইলিয়ম জে, মেয়ো ও ডাঃ চার্লস এইচ মেয়ো নামক ভ্রাতৃযুগলের অস্ত্র-চিকিৎসা দেখিবার জন্য য়ুরোপ হইতে আমেরিকায় দলে দলে লোকজন আসিয়া থাকে। ডাঃ হার্ভে কাসিং মস্তিষ্কের অস্ত্র-চিকিৎসায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ডাঃ অলেক্সিস কারেল জাতিতে ফরাসী হইলেও আমেরিকায় বাস ও চিকিৎসা করেন।

আমেরিকার অস্ত্র-চিকিৎসকগণ মানুষের অঙ্গহীনতা দূর করিয়া চিকিৎসাজগতে যুগান্তর আনিয়াছেন। তোমার হাতের কোন আঙ্গুল যদি, হাত হইতে ছিঁড়িয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসার গুণে সে কাটা আঙ্গুল পুনরায় বেমালুম যোড়া লাগিতে পারে। হৃৎপিণ্ড আহত হইলে সাধারণ ক্ষতের মতই সে স্থানটি অনায়াসে সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। মস্তিষ্কের মধ্যে স্বাধীনভাবে ছুরি চালাইতে আমেরিকার অস্ত্র-চিকিৎসকেরা একটুও ইতস্ততঃ করেন না। এক দেহের অঙ্গবিশেষ এখন অনায়াসে অন্য দেহে যুড়িয়া দেওয়া যায়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে এক নিগ্রো বালকের বুকে কেহ ছুরি মারে। ছুরির ফলা বালকের

হৃৎপিণ্ডের মাঝখানে বরাবর ঢুকিয়া গিয়াছিল। বালককে যখন অস্ত্র-চিকিৎসার টেবিলের উপর শোয়ানো হইল, মৃত্যু তখন তাহার শিয়রে। এমন কি, তাহার পা-দুইটিও তখন ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের উপর সার্জ্জনরা ছোট গবাক্ষের মত একটি ছিদ্র করিলেন। সেইখান দিয়া ক্ষত-স্থান দেখা যাইতে লাগিল,—নাড়ীর প্রতি স্পন্দনে কাটা ঘায়ে তখন ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরিতেছিল। একজন সার্জ্জন বুকের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়া হৃৎপিণ্ডটাকে টানিয়া উপরে তুলিয়া ধরিলেন, এবং ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিলেন। এই অস্ত্র-চিকিৎসা পঞ্চান্ন মিনিটকাল স্থায়ী হইয়াছিল। বালকটি কিছুদিনের মধ্যে একেবারে আরোগ্য লাভ করিল।

যদি কাহারও গায়ের চাম্‌ড়া পুড়িয়া বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, সার্জ্জনরা তাহা হইলে অন্য কোন লোকের কাটা হাত-পা বা কোন সদ্য-মৃত লোকের গা হইতে চামড়া খুলিয়া আনিয়া তথায় লাগাইয়া দেন। জনস্‌ হপকিন্স য়ুনিভার্সিটির ডাঃ জন ষ্টেজ ডেভিস্‌ এশ্রেণীর অস্ত্র-চিকিৎসা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এখন চিকিৎসক-মহলে এ পদ্ধতিটা খুব চলিয়া গিয়াছে।

রকফেলার ইনষ্টিটিউটের ডাঃ অলেক্সিস কারেল অঙ্গহীনতা দূর করিবার জন্য অপর দেহ হইতে অঙ্গবিশেষ কাটিয়া আনিয়া অঙ্গহীন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলেন। এ কাজে তাঁহার মত দক্ষতা পৃথিবীতে আর কাহারও নাই। তিনি যে শুধু জীবিত বা সদ্যমৃত লোকের দেহ হইতেই প্রয়োজনীয় অঙ্গ কাটিয়া লন, তাহা নহে; তিনি নরদেহের নানা অঙ্গ পূর্ব্ব হইতেই কাটিয়া মাসের পর মাস ধরিয়া এমন কৌশলে তাহা জিয়াইয়া রাখেন যে, সে-সকল বিচ্ছিন্ন অঙ্গের মধ্যে পেশী ও শিরার কাজ সমান জীবন্তভাবেই চলিতে থাকে! পরে প্রয়োজন হইলেই এই-সকল অঙ্গ তিনি রোগীর দেহে যুড়িয়া দেন! (সম্প্রতি ফ্রান্সের রণক্ষেত্র হইতে খবর আসিয়াছে, গোলার আঘাতে একজন সেনাপতির বাহু উড়িয়া যাওয়ায় ডাঃ কারেল এক মরণোন্মুখ সৈনিকের হাত কাটিয়া লইয়া সেনাপতির কাঁধে যুড়িয়া দিয়াছেন।)

—The World's Work হইতে

কলাবিদের আদর্শ

য়ুরোপের শিল্পীরা সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া কাজ করেন, এ কথা বোধ করি সকলেই জানেন। জগতের রাজপথে মৌন মানসী প্রতিমাকে আমরা সকলেই দেখিতে পাই, কিন্তু সে প্রতিমাকে যে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, সে চিরদিন পর্দার আড়ালেই থাকিয়া যায়, আমরা তাহাকে অনুমান করিতে পারি, অনুভব করিতে পারি না।

শিল্পীরা স্ত্রী-আদর্শকে যতখানি কদর করেন পুরুষ-আদর্শকে তত করেন না। ইহার কারণ, স্ত্রী-আদর্শের দুর্লভতা। সুগঠন ও সুশ্রী স্ত্রী-আদর্শ শিল্পীর ভাগ্যে সহজে জোটে

না ; পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে এজন্য বড়ই বেগ পাইতে হইত, কিন্তু আজকাল "The Artists' Model's Club" স্থাপিত হওয়াতে তাঁহাদের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। এখানে আদর্শের যোগ্য বহু রমণী একসঙ্গে বসবাস করেন এবং শিল্পীরা এখান হইতে আপনাদের পছন্দমত আদর্শ বাছিয়া আনিতে পারেন।

শিল্পীর আদর্শ হইয়া জীবন কাটাইতেছেন, এমন এক রমণী এইভাবে আপনার কথা বলিয়াছেন ঃ—

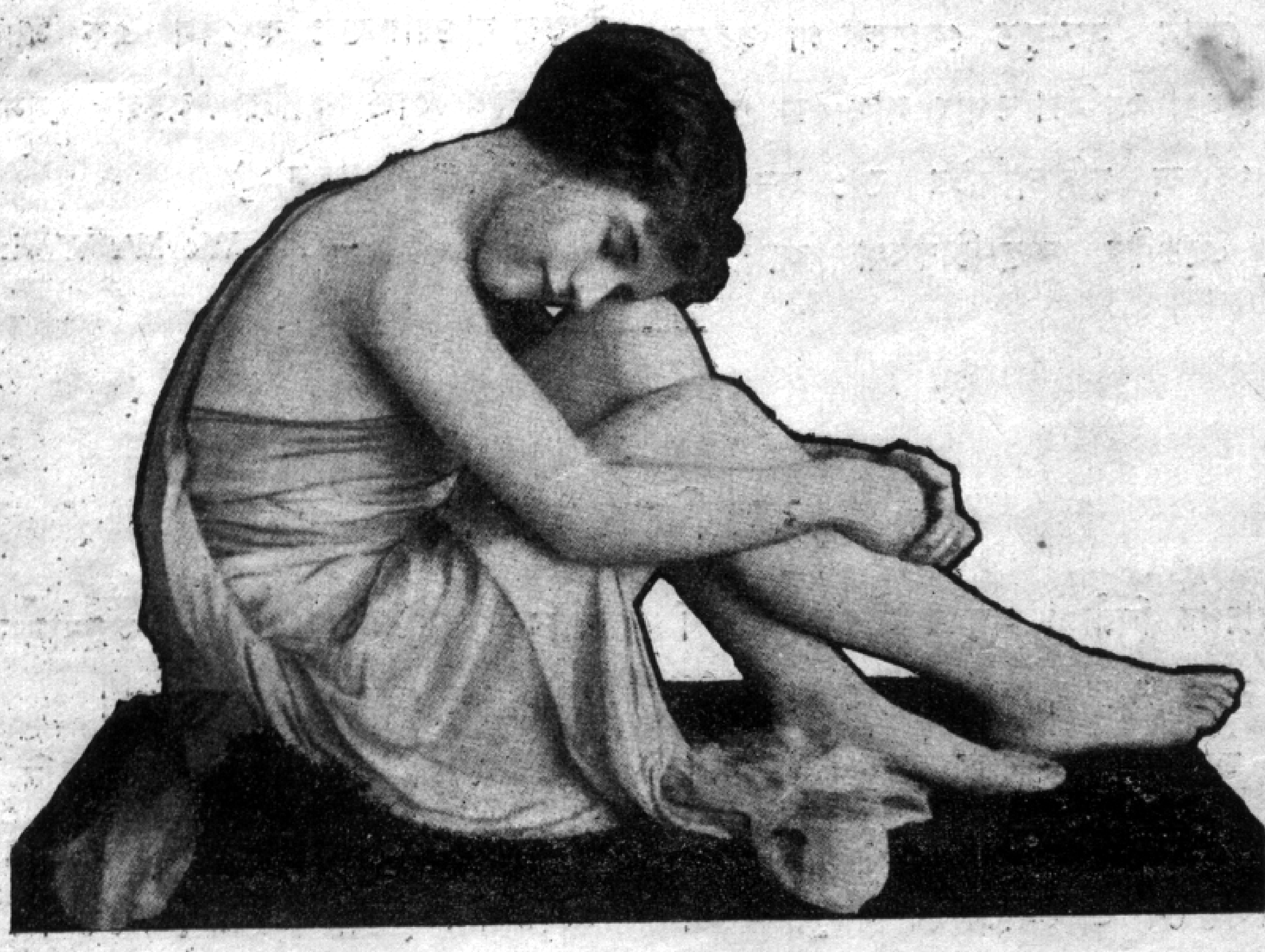
"আদর্শের জীবন সুখের নয়। ফুলের বিছানায় শুইয়া এ কাজ চলে না—এ কাজ বড় দুঃখের কাজ। ধর, তোমাকে ছয় ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে। ঘণ্টায় দশ মিনিট করিয়া তুমি বিশ্রামের অবকাশ পাইবে। এই ছয়ঘণ্টা কাল, (বিশ্রামের সময় ছাড়া) তোমাকে এক ভঙ্গিমায় আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, মাথা একটু উঁচু কি নীচু করিলে চলিবে না—কারণ, তাহা হইলে তোমার ভঙ্গিমা খারাপ হইয়া যাইবে!

লণ্ডন সহরে আমরা এইরূপ রোজগার করি ঃ—

শিল্পী যখন শুধু আমাদের মাথাকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করেন, তখন বেলা দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত খাটিয়া আমরা পাঁচ শিলিং পাই। ঘণ্টা-হিসাবে ধরিলে ঘণ্টায় এক টাকা।

শিল্পী যখন আদর্শের সর্ব্বাঙ্গ নকল করেন, তখন দশটা-চারিটা খাটিয়া সাত শিলিং পাওয়া যায়। তাহা হইলে ঘণ্টা-হিসাবে দাঁড়াইল, ঘণ্টায় এক শিলিং ছয় পেন্স।

যে-সকল রমণী খুব বেশী খাটিতে পারেন, তাঁহাদেরও আয় বছরে আশী পাউণ্ডের বেশী নয়। তবে যদি কোন রমণীর গড়ন বেশ ভাল



কলাবিদের আদর্শ

হয়, মুখের ডৌল বা হাত-পা খুব সুন্দর হয়, তবে তিনি আপনার দাম চড়াইতেও পারেন। কারণ, আদর্শ অসাধারণ হইলে শিল্পী একেবারে বর্ত্তিয়া যান এবং টাকা খরচ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না।

শরীর বাঁচাইবার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়। সারাদিন আদর্শরূপে বসিয়া থাকিয়া আমরা এমন শ্রান্ত হইয়া পড়ি যে বায়ুসেবন বা শারীরিক ব্যায়ামের জন্য আমাদের মনে মোটেই কোন উৎসাহ থাকে না; অথচ ব্যায়াম না করিলে ও খোলা হাওয়ায় না বেড়াইলেও চলে না। আবার বেশী খাইলে মোটা ও কম খাইলে রোগা হইবার ভয়ও আছে। সুতরাং এদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

আদর্শের দেহে 'প্ল্যাষ্টারে'র প্রলেপ দিয়া শিল্পীরা আদর্শকে নিজেদের মনের মত করিয়া লন। গায়ে এই কাদার প্রলেপ মাখাটা বড় কষ্টকর ব্যাপার। আমার মনে আছে, আমি যেদিন সর্ব্বপ্রথম আদর্শের জন্য বসি, সেদিন কেবল আমার গলা ও বুককে আদর্শ করা হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমার দম আটকাইয়া আসিতেছে! তাড়াতাড়ি ভয়ে আমি সমস্ত প্রলেপ গা হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম। অবশ্য দুই-চারদিনের অভ্যাসে এ-সব কষ্টবোধ আর থাকে না।

আমরা কাজ পাই দুই-জায়গায়। এক শিল্প-বিদ্যালয়ে আর এক শিল্পীর গৃহে। আমাদের মধ্যে অনেকে শিল্প-বিদ্যালয়ে গিয়া কাজ করিতে রাজি হয় না; কারণ, এখানকার কাজে কষ্ট বেশী। আমি কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজই পছন্দ করি। এখানে কষ্টের মাত্রা বেশী হইলেও, টাকাটা বেশ নিয়মিতরূপেই পাওয়া যায়।

শিল্পীদের গৃহে কাজ করিতে গিয়া অনেক সময় আমরা আত্ম-সম্মানে আঘাত পাই। এক-একজন শিল্পী আছেন, যাঁহারা আমাদিগকে প্রাণশূন্য



কলাবিদের আদর্শ

পাষাণ-প্রতিমা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভাবেন, নির্দ্দয় বাক্যে আমাদের মনে ব্যথা লাগে না, অবসাদ বলিয়া কোন-কিছু আমাদের ভিতর নাই।

যাঁহারা কর্ম্ম দেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেক দয়ালু ও হৃদয়বান শিল্পীও দেখিয়াছি। আমাদের দলে যাহারা গরীব, তাহারা দুঃখ-কষ্টে বা অসুখে পড়িলে, অনেক সহৃদয় শিল্পী তাহাদিগকে সাহায্য দান করেন। প্রয়োজন হইলে আমরাও অনেক দরিদ্র শিল্পীকে সাহায্য করিয়া থাকি। আদর্শের জন্য বসিয়াও আমরা তাঁহাদের কাছ হইতে পয়সা-কড়ি কিছু লই না।

আমাদের অনেকে শিল্পীর আদর্শ হইবার শক্তি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়। তাহারা শিশুকাল হইতেই একাজে আশ্চর্য্য নিপুণতার পরিচয় দেয়।"

—The London Magazine হইতে

প্রাচ্য চিত্রকলা

"বোষ্টন মিউজিয়ম অফ্ ফাইন আর্টসে" সম্প্রতি পারস্য, আরব ও ভারতীয় চিত্রাবলী এবং সচিত্র পুস্তক-প্রচ্ছাদনী ও চিত্র-বিচিত্র পুঁথির এক চমৎকার প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ডেনম্যান ডব্লু রস পৃথিবী-পর্য্যটনে বাহির হইয়া প্রাচ্য চিত্রকলার এই সকল নমুনা যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। ফ্রান্সে গত কয় বৎসর ধরিয়া যে-সকল পারস্য ও ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হইতেছিল, বোষ্টন মিউজিয়মে এইসঙ্গে সেগুলিকেও দেখানো হইতেছে।

এই প্রদর্শনীর যে বিশেষ একটা মূল্য আছে, সে কথা বলা বাহুল্য। দশম হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, প্রাচ্য চিত্রমালা ও হস্তলিপি রচনার যত-রকম পদ্ধতি দেখা যায়, এই প্রদর্শনীতে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম যুগের পারস্য-চিত্রে তুর্কী ভঙ্গীর ছাপ্ বড় স্পষ্ট। পঞ্চদশ শতাব্দীর শিল্পে চীনদেশের প্রভাব পড়িয়াছে। কারণ, তৈমুর লংএর রাজত্ব-কালে চীনদেশ পারস্যের সংস্রবে আসিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পারস্য-কলার নক্সা ও রংফলানো একেবারে খাঁটি—পরদেশী রীতি-পদ্ধতির আঁচটুকু পর্য্যন্ত তাহার উপর পড়ে নাই। এই সময়ের ছবিগুলিতে বিচিত্র বর্ণের অভিরাম লীলা দেখিলে মন মজিয়া যায়। আর তাহাদের রেখার কারিগরীও সুন্দর! চিত্রকরেরা সমসাময়িক যুগের উৎসব, যুদ্ধ, রাজসভা ও ঘর-সংসারের দৃশ্য অঙ্কন করাতে, তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাচ্য কলায় ভারতীয় চিত্র-পদ্ধতির প্রাধান্য দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল রাজত্বকালে ভারতীয় চিত্রকলা উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। ভারত শিল্পে রাজা-মহারাজার মূর্ত্তি-চিত্রই সকলের চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহাদের রেখাপাত ও বর্ণ-রঞ্জনেও যথেষ্ট লালিত্য আছে; এবং বিশেষ করিয়া

উল্লেখযোগ্য তাহাদের সূক্ষ্ম নক্সা এব চমৎকার স্বভাবানুগামিতা।

"Hydraulic Automata" নামক বিখ্যাত পুঁথির সচিত্র পত্রগুলিও অল্প চিত্তগ্রাহী নহে। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে তাহার অঙ্কনকাল আরম্ভ হইয়াছে। এই পুঁথিখানি কনস্তান্তিনোপলে আবিষ্কৃত হয় এবং এ ধরণের পুঁথির মধ্যে এইখানিই না কি প্রথম! পুঁথির বারোখানি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে যে-সকল মূর্ত্তিপট আছে, তাহার মধ্যে "পুষ্পধারী যুবকে"র ছবিখানি অন্য সকলগুলিকেই হার মানাইয়াছে। ইহার রেখামালার কোমলতা, সোনালি রংমাখানো নীল পোষাকের উজ্জ্বলতা এবং সমগ্র রচনার সৌন্দর্য্য ও সরলতা, সপ্তদশ শতাব্দীর পারস্যদেশের ওস্তাদ-পটুয়া আগা মিরাককে মনে করাইয়া দেয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিত্রের মধ্যে, সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত-পারস্য রচনা-পদ্ধতির সংমিশ্রণে যে যুবকের পটখানি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে উপভোগ্য। এই ছবিটি দেখিলে প্রাচীন ইতালীয় রচনা-পদ্ধতির কথা স্মরণ হয়।



একটি যুবার ছবি
(ভারত পারস্য অঙ্কন পদ্ধতি)

—Art and Progress হইতে

পুরুষ ও রমণীর মন

চরিত্র হইতেছে মানস-বস্তু। রমণীর সাধারণ চরিত্র পুরুষ-চরিত্র হইতে ভিন্ন। হিমান্স এবং উইর্স্মা নামক দুইজন জার্ম্মান প্রোফেসর, এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এক এক বিষয় ধরিয়া অনেক প্রশ্ন করিয়া তাঁহারা পুরুষ ও রমণীদের উত্তর চাহিয়াছিলেন। তাহার পর সেই সকল উত্তর দেখিয়া তাঁহারা মোটামুটি একটা মীমাংসা করিয়াছেন।

নর-চরিত্রে নিম্নলিখিত গুণগুলির অধিক

বিকাশ হয়। তাহারা অধীনস্থ লোকের প্রতি সদয়, হাস্যরসে সিদ্ধ, সমালোচনায় উৎসুক, নিয়মিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তর্কপ্রিয় ও খেলাধূলা ভালবাসে। পুরুষ স্বাধীনতাপ্রার্থী, টাকা রোজগার করিতে চায়, শোক-দুঃখ সহজে ভুলিয়া যায়, যাহা পড়ে তাহা ঠিক্‌ঠাক মনে রাখিতে পারে, এবং নানা বিষয় লইয়া স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক নাড়াচাড়া করে।

নারী-চরিত্রে নিম্নলিখিত গুণগুলির চর্চ্চা হয় বেশী। তাহারা পরিশ্রমী, আবেগময়, মিছা সাজসজ্জা করিতে চাহে, ধৈর্য্যশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, আত্মীয়তায় নিপুণ, সহমর্ম্মী, এবং লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার করিতে উৎসাহী। তাহারা হঠকারী, মিতাচারী, বৈচিত্র্যের অভিলাষী, অল্পেই উত্তেজিত হয় এবং লক্ষ্যহীন বাজে কাজে পুরুষ অপেক্ষা সমধিক মনোযোগী।

যে-সকল ইন্দ্রিয় দিয়া আমরা বহিঃ প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করি, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায়, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয়গুলির কাজও একরূপ নয়। পুরুষের চেয়ে রমণীর স্পর্শশক্তি অধিক প্রখর। রমণীরা প্রায়ই সুরান্ধ হয় না; অর্থাৎ দুটি সুরের পার্থক্য তাহারা সহজেই ধরিতে পারে। রাগ-রাগিণীর প্রভেদ তাহারা যেমন বুঝিতে পারে, পুরুষ তেমন পারে না।

বর্ণান্ধতা সম্বন্ধেও সেই কথা। শতকরা চারিজন পুরুষ বর্ণান্ধ। তাহারা উজ্জ্বল লোহিত এবং উজ্জ্বল সবুজের বিভেদ মোটেই টের্ পায় না। কিন্তু স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা একজন মাত্র বর্ণান্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, রমণীরা যদিও বর্ণান্ধ নহে, তথাপি সন্তানের দেহে তাহারাই বর্ণান্ধতা সঞ্চারিত করে। অর্থাৎ কোন বর্ণান্ধ পুরুষের ঔরসজাত সন্তান বর্ণান্ধ হয় না; কিন্তু স্বামী বর্ণান্ধ না হইয়া যদি পত্নী বর্ণান্ধ হয়, তবে তাহার গর্ভজাত সন্তানও বর্ণান্ধ হইবে। আবার সন্তানদের ভিতর যাহারা পুরুষ, তাহাদের সন্তানেরা বর্ণান্ধ হইবে না, কিন্তু যাহারা রমণী, তাহাদের গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে বর্ণান্ধতা থাকিবে।

অনেক সময় খবরের কাগজে পড়া যায় যে, অমুক ব্যক্তি খুব সামান্যরূপে আহত হইয়াও (ধরুন, ঠোঁট কাটিয়া) রক্তস্রাবের ফলে মরিয়া গিয়াছে। রক্তের মধ্যে এমন একরূপ পদার্থ আছে যে, রক্ত যখন বাতাসের সংস্পর্শে আসে, উক্ত পদার্থ তখন রক্তকে ঘনীভূত করে। যাহার শোণিতে ঐ পদার্থ নাই, সামান্য আঘাতে রক্তপাতের ফলে তাহারই মৃত্যু হয়। এই পীড়াটিও রমণীর দ্বারা গর্ভজাত সন্তানের দেহে সংক্রামিত হয়।

এ যুগে মানুষের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি কমিয়া গিয়াছে। নানারূপে জ্ঞানলাভ করি বলিয়া আমরা চোখ দিয়া দেখিয়া সকল জিনিষকে জানিবার চেষ্টা করি না। সমুদ্রগামী জাহাজের সমস্তটা আমরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখি না। কতকটা চোখে দেখি, বাদ-বাকী সমস্ত পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের দ্বারা সারিয়া লই। অসভ্য মানব বা পশুপক্ষীরা সকল জিনিষ সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে; এবং রমণীরাও এদিকে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্মৃতিশক্তি আছে, দুই-প্রকার। এক,— অর্থহীন জিনিষ মনে রাখিতে পারা। যেমন, কথা, অঙ্ক, নাম ও সংখ্যা প্রভৃতি। কোন লোকের নামে কিছু মানে থাকে না; আর ইহা মনে রাখিতেও মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় না; ময়না পাখীর বুলি-পড়া এই-রকম। দ্বিতীয়ঃ—কোন ভাব মনে রাখিতে পারা। এমন অনেক পণ্ডিত লোক দেখা যায়, যাঁহারা বন্ধুবান্ধবের নাম বা কবে কোন্ তারিখ তাহা মনে রাখিতে পারেন না। অথচ অনেক গণ্ডমূর্খ এ-সব বিষয়ে পণ্ডিতকে টেক্কা দিতে পারে। কিন্তু ভাব মনে রাখাই শক্ত কথা। বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকের কতগুলা কথা স্মরণ রাখিয়া কিছু লাভ নাই। বড় বৈজ্ঞানিকেরা সেই পুস্তকের পরীক্ষা-পদ্ধতি ও ভাবপুঞ্জই স্মরণ রাখেন। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, পুরুষেরা সাধারণতঃ ভাবই স্মরণ রাখে; কিন্তু রমণীদের বেশী মনে থাকে বাক্য।

এই স্মৃতিশক্তির বিচার দ্বারা বলা যায়, মানসিক বিচার-শক্তিতে রমণী অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠতা অধিক। আবার, পুরুষের যতটা বিশ্লেষণ-ক্ষমতা আছে, রমণীর ততটা নাই।

—Pearson's Magazine হইতে

নৃত্য-কাব্যের কথা

জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে রুশ-নৃত্যের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছিল। গতবারের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী আনা পাভলোভা-কথিত একটি প্রবন্ধের স্থলবিশেষ উদ্ধৃত হইল।

"প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে রুশ সম্রাটেরা আপনাদের প্রজাগণকে নৃত্য-কলা শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। ইতালী, ফ্রান্স বা স্পেন দেশে যখনই কোন নূতন নট নাম কিনিয়াছেন, তখনই তাঁহারা রুশরাজ্য হইতে আমন্ত্রণ-পত্র লাভ করিয়াছেন। ফলে, আমাদের জাতীয় নৃত্যকলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিদেশী কালোয়াতদের ভাল দিকটাও দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

বর্ত্তমান সম্রাটের তত্ত্বাবধানে রুশদেশের জাতীয় নৃত্য-বিদ্যালয় অতিক্রত উন্নতি লাভ করিয়াছে। 'অপেরা হাউস', 'ফ্রেঞ্চ থিয়েটার' ও নৃত্য-বিদ্যালয়ের পরিপোষণের জন্য রুশ-সম্রাট প্রতি বৎসর ষাট লক্ষ টাকা খরচ করেন! নৃত্যবিদ্যালয়ের ছাত্রদের সর্ব্বদা সাবধানে চোখে-চোখে রাখা হয়; শিক্ষকেরাও খুব যত্নের সহিত শিক্ষা দেন। সে শিক্ষার কঠোরতাও বড় অল্প নহে। আমাদের জীবনের সহিত নৃত্য-কলা এমনভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, দেশের ছোটখাটো বিদ্যালয়গুলি পয়সার

অভাবে উঠিয়া যায় না,—বড় বড় ওস্তাদেরা সেখানে গিয়া বিনামূল্যে শিক্ষা দিয়া তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করেন।

রুশেরা নৃত্যকলা দ্বারা আপনাদের ভাবপ্রকাশ করে। একান্ত দুঃখ বা উন্মাদ আনন্দকে তাহারা নৃত্যকলায় ফুটাইতে পারে। রুশদেশের শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের রমণীরা নৃত্য-বিদ্যায় যে-সকল ভঙ্গী শিক্ষা করে, আপনাদের মনের ভাবকে তাহারা সেই ভঙ্গীর সাহায্যে ফুটাইয়া তোলে। ধর,—তাহারা শ্রান্ত হইয়াছে; নির্দ্দোষ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় তাহারা সেই শ্রান্তিকে প্রকাশ করিবে। যাহারা আসল নৃত্যকলায় অনভ্যস্ত, তাহারা এ-রূপ ছন্দপূর্ণ ও কবিত্বময় ভঙ্গিমায় মানসভাব প্রকাশ করিবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত।



নর্ত্তকী পাভ্‌লোভা

নৃত্যকলায় কোন্ দেশের নটেরা সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ও বিষাদকে জাগাইতে পারে,—আমাকে সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে আমি বলি, বিষাদ, দুঃখ, আনন্দ, উল্লাস ও আমোদ—একাধারে এই সবগুলির বিচিত্র সমাহার রুশ-নৃত্যে যতটা দেখা যায়, ততটা আর কোথাও নয়।

নৃত্যকলা কাব্য ও গীতকলার সগোত্রজ। আমরা যে-ধরণে কাপড়-চোপড় পরি, আমাদের নাচও সেই ধাঁজের উপযোগী হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রাচীন গ্রীক নৃত্য-কলার কথা ধরা যাক্। গ্রীকদের নৃত্য-ভঙ্গীতে একটা অবাধ স্বাধীনতা ছিল। তাহাদের ঝল্‌ঝলে ঢিলা পোষাক এই স্বাধীনতার উপযোগী। ইংরাজী স্কুলে নাচ শিখাইতে হইলে, নাচকে ঠিক ললিত কলার মত করিয়া শিখাইতে হইবে; কারণ, বিদ্যালয়ে যে-ভাবে ব্যায়াম বা জিম-নাষ্টিক শেখানো হয়, তেমন গৌণভাবে নাচ শিখাইলে কোন ফল হইবে না।

রুশিয়ায় নয় হইতে বারো বছর বয়সের ভিতরেই ছেলেমেয়েদের প্রায় নাচ শিখিতে পাঠানো হয়। তাহারা যে শুধুই নাচ, গান ও নাটকীয় কলায় শিক্ষা পায়, তাহা নহে;

পরন্তু সেইসঙ্গে তাহারা সাধারণ শিক্ষাও লাভ করে। কে কেমন নাচ শিখিতেছে, তাহা পরখ করিবার জন্য প্রতি বৎসরই ছাত্রদের পরীক্ষা লওয়া হয়। পরীক্ষায় যে ছাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারে না, বিদ্যালয় হইতে তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়।

যে-সকল শিক্ষিত নট নৃত্য-নিপুণ হইবার জন্য প্রথম যৌবনের কয়েক বৎসর ব্যয় করিয়াছে, নাচের সঙ্গে শুধু তাহাদের পা নাচে না; মাথা ও চোখ নাচে, মুখ ও গলা নাচে, বাহু ও হাত নাচে—এক কথায় তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ছন্দে ছন্দে নৃত্য করে।

বিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্রেরা আপনা-আপনি নাচ অভ্যাস করিবার জন্য বড় অল্প কাল কাটায় না। আমার মনে আছে, একজন যুবা দিনে ছয় ঘণ্টা ধরিয়া নাচ অভ্যাস করিতেন। সকল বিভাগের মত নাচেও কঠোর সাধনা এবং ব্যক্তিগত শক্তির প্রয়োজন। নহিলে সিদ্ধি দুর্লভ। এমন কি, যে-সকল নট সিদ্ধি ও যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও আলস্য সাংঘাতিক। তাঁহারা যদি কেতা-দুরস্ত রাখিতে চান, তবে প্রতিদিনই তাঁহাদিগকে নৃত্য অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাস করিয়া করিয়া নাচে তাঁহাদিগকে এতটা পাকা হইতে হইবে, যে, রঙ্গমঞ্চে গিয়া নৃত্যে উপযোগী ভাবের সমাবেশ ছাড়া তাঁহারা আর কিছু ভাবিতে পারিবেন না;—অভ্যাস-বশে নাচ তাঁহাদের আপনিই চলিতে থাকিবে।

রুশ দেশে বৃদ্ধ নটের স্থান নাই। সাধারণতঃ কুড়ি বৎসর নাচের পরই নটের কার্য্যকাল শেষ হইয়া যায় এবং সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহারা পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন।

—The Strand Magazine হইতে

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

নবাব

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সমাধি

"তুমি অমন করে কেঁদো না পরী, আমার ওতে বুক ভেঙ্গে যায়। তুমি বরং ফন্তেন্‌রোয় যাও—নিজের কাজকর্ম্ম দেখ'গে। ব্রেহিম্নের দশ হাজার ফ্রাঙ্ক হাতে পেলে তোমার আর ভাবনা কি? আমি সেখানে গিয়েই তোমায় টাকা পাঠাব। সে আমার হাতের গড়া মূর্ত্তি চায়—তা তাকে দেব—রীতিমত তার দামও আদায় করে নেব। আবার আমার টাকা-কড়ি হবে—অনেক টাকা! কে জানে, হয়ত সুলতানাও হতে পারি একদিন।"

"তাই হও—তুমি সুলতানাই হও। কিন্তু আমায় আর তা চোখে দেখতে হবে না—আমি ততদিন বাঁচছি না।"

ক্রেনমিজ্‌ চোখের জল মুছিয়া গাড়ীর এককোণে জড়সড় হইয়া বসিল।

ফেলিসিয়া পারি ত্যাগ করিতেছিল।

এখানকার এই ভয়ঙ্কর শূন্যতা, তীক্ষ্ণ নৈরাশ্য ও কঠোর বিদ্রূপ-লাঞ্ছনার মধ্য হইতে সে এখন পলাইয়া বাঁচিতে চাহে। মোরার মৃত্যু তাহাকে কি ভীষণ আঘাত দান করিয়াছে! একটা তীব্র দুরাকাঙ্ক্ষার বশে সে ডিউকের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল। নিজের সহিত নারীর সকল সম্মান, সকল গৌরব, লজ্জা-সরম অবধি সমস্তই সে ডিউকের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। আর আজ ডিউক যাইবার সময় তাহার কিছুই ফেলিসিয়ার জন্য রাখিয়া যান নাই —ফেলিসিয়াকে এই কঠিন নগরের পথের উপর বসাইয়া গিয়াছেন; সারা জীবনের মত তাহাকে নিঃস্ব সর্ব্বহারা করিয়া গিয়াছেন। গভীর বেদনায় ফেলিসিয়ার বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও চোখে তাহার অশ্রু ঝরিবার আজ উপায় নাই! শোক-চিহ্ন ধরিবার অধিকার হইতেও সে বঞ্চিতা—এতটুকু সম্মান অবধি আজ ফেলিসিয়ার নাই! কিন্তু কি করিয়াছে ফেলিসিয়া যে, সারা জীবন তুষের আগুনে এমন করিয়া তাহাকে পুড়িতে হইবে! ডিউকের সহিত সেণ্ট জেম্‌সে দুই চারিটিমাত্র সন্ধ্যা-যাপন—দুই-চারি রাত্রি থিয়েটারে একত্রে বক্সে বসিয়া অভিনয় দেখা—ইহারই মধ্যে প্রাণহীন প্রণয়-হীন অভিসারের শত কলঙ্ক-রেখা কে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়াছে! উদ্‌ভ্রান্ত নারী,—জগতে চলিবার ঠিক পথটি তাহার জানা ছিল না—আজ তাই সে সকলের চক্ষে একটা কলঙ্কের নিশানের মত পড়িয়া রহিল!

একবার ফেলিসিয়ার মনে হইল, সে আত্মহত্যা করিবে। পরক্ষণেই মনে হইল, না, তাহা হইলে তাহার ভগ্ন হৃদয়ের ইঙ্গিত করিয়া এখনই কুৎসার ধারা পারি-ময় ছড়াইয়া পড়িবে! খবরের কাগজে অমনি মোটা কালো অক্ষরে কালিমার মালা দুলিতে থাকিবে! তবে উপায় কি—কি উপায় আছে? ফেলিসিয়া স্থির করিল, সে নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে—পারিতে আর থাকিবে না। কিন্তু দেশ বেড়াইতে গেলে অর্থ চাই,—প্রচুর অর্থ! ফেলিসিয়ার যে তাহার অভাব বড় বেশী। তখন তাহার মনে পড়িল, বের কথা! এক্সিবিশনে তাহার গড়া মূর্ত্তি দেখিয়া বে'র মুখে প্রশংসার বৃষ্টি ঝরিয়াছিল—বে তাহাকে বহু অর্থ দিয়া টিউনিসে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিল—তাহার গড়া মূর্ত্তি দিয়া বে টিউনিসের প্রাসাদ সাজাইবে। তখন ফেলিসিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই—প্রাচ্যের বিপুল প্রলোভন তাহাকে এতটুকুও চঞ্চল করিতে পারে নাই! কিন্তু আজ! আজ তাহার মনে হইল, এ দুর্দ্দিনে ঐ একটি, একটিমাত্র উপায় আছে! তাই সে আর এক মুহূর্ত্তও দ্বিধা করিল না। কয়েকখানা টেলিগ্রামে কথাবার্ত্তা-চলাচলের পর দর ঠিক হইয়া গেলে, ফেলিসিয়া টিউনিস-যাত্রার উদ্যোগ করিল। চটপট জিনিষ-পত্র গুছাইয়া লইয়া সে একদিন পারি ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে ষ্টেশনের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িল। পারিতে আর একদণ্ডও নহে। সারা আকাশ যেন এখানে তাহাকে চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিয়াছিল। তাই সে এক অজানা দেশে নূতন জীবন-যাপনের কল্পনায় বিভোর হইয়া শত

দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা দেখিল।

জেনোয়ায় বে'র সজ্জিত বজরা তাহার অপেক্ষা করিবে। সেখান হইতে বরাবর সে টিউনিসে যাইবে। সেখানে তাহার থাকিবার জন্য প্রকাণ্ড বাড়ী--গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন—অভ্যর্থনার চূড়ান্ত আয়োজন হইয়াছে!

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ফেলিসিয়া ইতালির সুদৃশ্য বন্দরের ছবি দেখিতেছিল। শ্বেত মর্ম্মরে বাঁধা ঘাট—চিত্র-বিচিত্র পোষাক পরিয়া ইতালিয় কিশোর-কিশোরী নৌ-বিহারে বাহির হইয়াছে—কোথাও মধুর বাদ্য বাজিতেছে, লতা-পাতার মালা মাথায় পরিয়া কোথাও ইতালিয় বালক-বালিকার দল গান ধরিয়াছে! তাহার পর কোথায় সুদূর টিউনিস! মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য—মাঠে কালো-কালো ছেলেমেয়েরা সরল আনন্দে নৃত্য করিতেছে, খেলা করিতেছে! চমৎকার বৈচিত্র্য!

আর এখানে পারির আকাশ—কি বিশ্রী কদর্য্য বেশ ধরিয়া তাহাকে বিদায় দিতেছে। কাল রাত্রি হইতে বৃষ্টির আর বিরাম নাই। পথে কাদা জমিয়া একটা নিরানন্দময় অবসাদের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। অসহ্য এ দৃশ্য! ইহার মধ্য হইতে পলাইতে পারিলে ফেলিসিয়া বাঁচে!

আজ পারির এই নিরানন্দময় বুকের উপর আর এক নিরানন্দময় ব্যাপারের অভিনয় চলিতেছিল। আজ ডিউক মোরার সমাধি। সেই কাদায়-জলে ভরা পথের উপর জনস্রোতের যেন আর বিরাম নাই। কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে—সারি দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। সমাধি-যাত্রায় এত বড় বিরাট সমারোহ পারির লোক বহুকাল চক্ষে দেখে নাই! ফেলিসিয়ার গাড়ী একটা মোড় বাঁকিয়া বড় রাস্তায় ক্রমে এই গাড়ীর ভিড়ে পড়িয়া গেল; তখন তাহার গতি অত্যন্ত মৃদু হইয়া আসিল। ওদিকে গাড়ীর মধ্যে ফেলিসিয়ার মন উধাও কল্পনায় ভাসিয়া দুরন্ত ঘোড়ার মতই ছুটিয়া চলিয়াছে—বাহিরের এই রুদ্ধ স্রোত তাহাকে একেবারে বিষম বিরক্ত করিয়া তুলিল। সে চীৎকার করিয়া কোচম্যানকে কহিল, "জোরে হাঁকাও, গাড়ী।"

কোচম্যান সবিনয়ে উত্তর দিল, জোরে চালাইবার উপায় নাই। ডিউকের সমাধি-যাত্রী গাড়ীর ভিড়ে পড়িয়া তাহাকে লাইন ধরিয়া মন্দ গতিতে যাইতেই হইবে; বে-লাইনে বেগে চালাইবার হুকুম নাই। ফেলিসিয়া রাগে উত্তপ্ত হইয়া কহিল, "অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাও।"

ফেলিসিয়ার মাথার মধ্যে একটা ঘূর্ণী বাতাস ছুটিয়াছিল। যাহার হাত এড়াইবার উদ্দেশ্যে সে এত ত্বরা করিয়া আজন্মের বাস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাই আবার এ কি পাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহে! স্মৃতির দুরন্ত দাহে তাহার মনখানা যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। সে একবার গাড়ীর জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল—সৈন্যের দল বন্দুক নামাইয়া অত্যন্ত গম্ভীর চালে পথে চলিয়াছে, তাহাদের পিছনে সীমাহীন জন-তরঙ্গ! ফেলিসিয়া আর দেখিতে পারিল না; তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

তাহার সকল লজ্জা, সকল অপমান, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল দৈন্য যেন এই জনতা-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে। ফেলিসিয়া কোচম্যানকে কহিল, "প্রথম যে গলি পাবে, সেই গলিতে ঢুকে গাড়ী জোরে হাঁকিয়ে যাও।" তাহার পর সে গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পথে তখন সমাধি-যাত্রার রীতিমত ঘটা বাধিয়াছিল। রাজ্যের যত সম্ভ্রান্ত, পদস্থ কর্ম্মচারীর দল সেই কাদায় হাঁটিয়া ডিউকের প্রতি সারা নগরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছিল। মৃতের প্রতি জীবিতের শেষ শ্রদ্ধা, শেষ সম্মান! প্রথমেই বিপুল বাদ্য-সমারোহ, পরে পাঁচখানি গাড়ীতে পাদ্রীর দল,—সকলেরই পরিধানে কৃষ্ণ পরিচ্ছদ—তাহার পর ডিউকের সমাধি-শকট, গাঢ় কালো রঙের ছয়টি ঘোড়া সে গাড়ী টানিয়া চলিয়াছে। কফিনের উপর একখানি তরবারি, একটি ইউনিফর্ম্ম-পোষাক, পালক-দেওয়া টুপি, স্বর্ণখচিত তাহার গায়ে বড় বড় মুক্তায় গ্রথিত প্রকাণ্ড একছড়া মালা! ডিউকের গাড়ীর পিছনে শোকচিহ্নধারী কমিটির সদস্য, এবং ডিউকের বন্ধু ও আত্মীয়ের দল হাঁটিয়া চলিয়াছে। সকলেরই মুখে আয়োজনোচিত শোকের উদাস গম্ভীর ভাব। এতগুলি লোকের মধ্যে প্রকৃত শোকের বেদনা যদি কাহারও বুকে বাজিয়া থাকে, তবে সে নবাবের! তাঁহার মুখে কে যেন গভীর হতাশার ছাপ টানিয়া দিয়াছে! নবাবকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন ঐ পুরুষটির সহিত আপনার প্রাণের সমস্ত সাধ, আশা, আপনার সকল ঐশ্বর্য্য-গৌরব মাটীর নীচে সমাহিত করিতে চলিয়াছেন!

সমাধি-যাত্রীর দল ক্রমে গোরস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানকার করণীয় সমস্ত ব্যাপার শেষ হইলে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি দেখা দিল। তখন চারিধারে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া গেল। সকলে ব্যস্ত হইয়া বৃষ্টি হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ছুটিয়া মাথার উপর একটু আশ্রয়-লাভের চেষ্টা দেখিল। হেমারলিঙ আসিয়া একটা ঝোপের মধ্যে দাঁড়াইল—আকাশের পানে অধীর দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে, এমন সময় সে দেখে, নবাব সেই ঝোপটার দিকেই আসিতেছেন। নবাবের প্রকৃতি হেমারলিঙের বিলক্ষণ জানা ছিল; তাহার একটু ভয় হইল—কি জানি, এখানে কেহ নাই, যদি নবাব মনের ঝাল মিটাইয়া লয়! কাছাকাছি অপর কোথাও সরিয়া পড়িবার উপায় ছিল না। হেমারলিঙ কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময় নবাব আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "লাজেয়ার—" হেমারলিঙের পূর্ব্ব নাম ছিল, লাজেয়ার। সে একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না। নবাব আবার ডাকিলেন, "লাজেয়ার—"

পরক্ষণেই হেমারলিঙ আপনার স্কন্ধে নবাবের ভারী হাতের তপ্ত স্পর্শ অনুভব করিল। সে ঈষৎ চমকিয়া উঠিল। নবাব কহিলেন, "শোন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আমি শুধু তোমায় অনুরোধ করছি, তুমি আর আমার পিছনে লেগো না।"

হেমারলিঙ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নবাব আবার কহিলেন, "এ যুদ্ধে তোমারই জিত, আমার হার। দেখ, আমি ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, আর যুঝতে পারছি না। পুরাণো

বন্ধু বলে আমায় দয়া কর। আমায় মুক্তি দাও।"

হেমারলিঙের প্রাণের কম্পন তখনও থামে নাই। পায়ে যত বলই থাকুক, অপরাধীর মন ভয়ে অতি সহজেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। হেমারলিঙের মনে পড়িল, সেই অতীত দিনের কথা। দারিদ্র্য যখন পিষিয়া মারিতেছিল, তখন দুই বন্ধুতে ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টায় সুদূর টিউনিসে যাত্রা করে। নির্ব্বাসনে থাকিয়া রৌদ্রে ছুটিয়া দুইজনে পয়সার চেষ্টায় কি কষ্টই না সহ্য করিয়াছে! দারিদ্র্যের সমস্ত কঠিন অত্যাচার দুই বন্ধুতে নীরবে মাথা পাতিয়া লইয়াছে! নবাব কহিলেন, "তোমার তাড়া নেই, বোধ হয়? এস না, একটু বেড়াই। বৃষ্টিও ধরে গেছে, আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। তোমাকে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি আমার অতীত বিশ বচ্ছর আজ ফিরে পেয়েছি— !"

হেমারলিঙ কহিল, "হাঁ, আমারও বড় ভালো লাগছে। কিন্তু তুমি জানো, আমার পায়ের বেদনার জন্য বেশী চলবার ক্ষমতা আমার নেই।"

নবাব কহিলেন, "তোমার পায়ের কথা আমি ভুলে গেছলুম। এসো, আমার হাতে ভর দিয়ে এসো।"

ভাইয়ের মত যত্নে নবাব তখন হেমারলিঙের হাত ধরিলেন। খানিকটা চলিয়া উভয়ে একটা বেঞ্চে আসিয়া বসিল। নবাব ডিউকের পানে চাহিয়া কহিলেন, "বেচারা ডিউক—

হেমারলিঙ কহিল, "এ মৃত্যুতে দেশের বড় ক্ষতি হল।"

নবাব কহিলেন, "আমার যা ক্ষতি হয়েছে, তার আর সীমা নেই! আর যদি কিছুদিনও বাঁচতেন; তোমারই বরাত, লাজেয়ার! তা ছাড়া তোমার ক্ষমতাও খুব!"

হেমারলিঙ কহিল, "তা যদি বললে, ক্ষমতা আমার নয়, এর জন্য মেরির কাছে আমি ঋণী!

"মেরি!"

"হাঁ, ব্যারণেস! বিয়ের সময় সে ক্রীশ্চান হয়—তখন তার পুরোণো নাম বদলে মেরি নাম দেওয়া হয়। তার একটা শক্তি আছে, বটে! ব্যাঙ্কের কাজ সে বেশ বোঝে! সে-ই ত সব চালায়—আমার যা-কিছু দেখা-শোনা, সব সে-ই করে।"

নবাব একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোমার মত বরাত কটা লোকের হয়!" নবাব আপনার স্ত্রীর কথা ভাবিতেছিলেন! একটা জানোয়ার সে! হৃদয়-হীনা!

তাহার পর উভয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল—সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হেমারলিঙই কথা কহিল। হেমারলিঙ বলিল, "মেরি তোমার উপর বড় চটেছে। তোমার সঙ্গে এই আমি কথা কচ্ছি, এ দেখলে সে একেবারে রসাতল বাধিয়ে দেবে।"

নবাব কহিলেন, "কিন্তু কৈ, আমি ত তার কোন ক্ষতি করিনি।

"বিশেষ ভাল ব্যবহারও করনি তুমি। আমাদের বিয়ের পর সেই কাণ্ডখানা মনে পড়ে? তোমার স্ত্রী বলে পাঠালে, যে একটা বাঁদীর সঙ্গে সে দেখা করতে পারবে না! কেন, আমাদের বন্ধুত্ব কি এ সামান্য কুসংস্কারটুকু ভুলতে পারত না? জানো,

মেয়ে মানুষ এ-সব অপমান জীবনে ভোলে না।"

"কিন্তু আমার তাতে কি হাত ছিল, বল? তুমি ত জান, আফসিন্‌দের দর্প কতখানি!"

নবাবের কিন্তু এ দর্প ছিল না, হেমারলিঙ্‌ তাহা বুঝিত। তাহার উপর এই শ্মশানের বুকে বসিয়া মনের ভাব তাহার কোমল হইয়া আসিয়াছিল। সে কহিল. "শোন বার্ণার্ড, এক উপায় আছে। আমাদের পুরানো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে তোলবার একটি মাত্র উপায় আছে। তোমার স্ত্রী আমাদের এই ব্যবধান দূর করতে পারে। তার সেই অপমানের কথা ব্যারণেসের বুকে কাঁটার মত বিঁধে আছে! আমাদের বাড়ীর মধ্যকার এই গোলটুকু যদি মিটে যায় তাহলে আবার আমরা আগেকার মত বন্ধুভাবে পরস্পরে মিশতে পারি—"

নবাব কহিলেন, "কি করলে মেটে, বল।"

"শোন তবে, বলি। আসছে শনিবার ব্যারণেস একটা পার্টি দিচ্ছেন। তাতে পারির সমস্ত বড় বড় লোকই আসবেন। তুমিও তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো! অবশ্য নিমন্ত্রণ-পত্র পাবেও। তোমার স্ত্রী এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে মেশামিশি করুক—সব গোল চুকে যাবে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি বড় বিপদে পড়েছ—আমি তোমায় সে বিপদ থেকে উদ্ধার করব। বে'কে তুমি ধার দিয়ে খুব এক চাল চেলেছিলে বটে, কিন্তু কি করবে? তোমার পড়তা যে খারাপ যাচ্ছে! রঙ্‌ পেয়েও খেলা গুছিয়ে নিতে পারছ না—কেবলই হার হচ্ছে।"

নবাবের দর্পিত শির আজ এতখানি নত দেখিয়া হেমারলিঙ্‌ মনের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেছিল। তাহায় দয়াও হইল—আহা, পুরাতন বন্ধু! কিন্তু এ দায় হইতে উদ্ধার-লাভের এক উপায় মাত্র আছে—সে উপায় কি হেমারলিঙ আজ তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছে! কিন্তু জাঁমুলে একেবারেই বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন—মোরাকে হারাইয়া তিনি যে আজ সব হারাইয়াছেন!

হেমারলিঙ্‌ কহিল, "তুমি ডিউককে হারিয়েছ বটে, কিন্তু আমায় ফিরে পাচ্ছ।"

নবাব কহিলেন, "কিন্তু শোন দেখি, এতে কোন ফল হবে কি? লি মার্কার ত তার রিপোর্ট লিখে শেষ করে ফেলেছে।"

হেমারলিঙ্‌ কহিল, "আর একটা নতুন রিপোর্ট লিখতে কতক্ষণ? এক, দুই, তিন, চার হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ কর—সব ঠিক হয়ে যাবে।"

নবাব স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—সবিস্ময়ে কহিলেন, "এ কি সম্ভব! লি মার্কার—অত কড়া লোক—"

"পয়সায় কে না নরম হয়? শোন, টাকাটা কি আর নগদ হাতে দেবে? একটু ফিকির চাই। লি মার্কারের ছবির ভারী সখ। খুব দামী ছবিতে সে ঘর সাজিয়েছে। সোয়ানবাক্‌-টাক কি এমনি কারো ছবি একখানা দাও দেখি—বলো, আপনার ঘরে টাঙ্গাবার জন্য একখানা ছবি পেলুম—সেখানা টাঙ্গাবার অনুমতি দেন যদি—! ছবিখানা কোন ধর্ম্ম-বিষয়ের হলে ত আর কথাই নেই—" নবাব ভাবিতে লাগিলেন,

তাই ত!...কিন্তু কি করিয়া ছবির প্রস্তাব তুলিবেন, তিনি!

হেমারলিঙ্ কহিল, "সে আমি ঠিক করে দেব। মোদ্দা, আগে তুমি ব্যারণেসের সঙ্গে সন্ধি করে ফেল! তাহলেই দেখবে, চারিধার ফরসা হয়ে গেছে। আমার যা কিছু এই মান সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য বল, এর সমস্তর মূলে মেরির বুদ্ধি! মেরির সঙ্গে ভাব করে ফেল, বার্ণার্ড, কোন ভাবনা থাকবে না।

"বেশ, তুমি তাহলে ভার নিচ্ছ—আমায় এ বিপদ থেকে টেনে তুলবে?"

"অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই, বার্ণার্ড। শনিবার আমাদের ওখানে তোমরা সস্ত্রীক এসো—সেখানেই তখন মেরির সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে ফেলব। লি মার্কারের ওখানে কবে যাওয়া যায়—বুঝলে?"

"হাঁ—তাহলে তুমি, আমায় লি মার্কারের ওখানে নিয়ে যাবে—?"

"হাঁ হে, হাঁ।"

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

দেড়ে টিকটিকি

(ইস্‌হাক্ বিন্ খলিফা)

বেঁটে দাউদের লম্বা দাড়ি!
গোঁফে ও দাড়িতে একটি গাড়ী!
আগে চলে দাড়ি পিছে দাউদ
বাপের পিছনে যেন সে পুত!
চড়াই পেয়েছে ময়ূর-পুচ্ছ!
দাড়ি বিনা মিঞা দাউদ তুচ্ছ।
দাড়ি সে রেখেছে, বর্ষা জাড়ে—
লুকাতে বুঝি ও দাড়ির আড়ে।
একদা দাউদ মিঞারে ধরি,
দাড়ি বাদ দিয়া ওজন করি,
তেরিজ কষিয়া দেখিনু ভাই
দাউদের কোনো ওজনই নাই!
ছায়া যেন দাড়ি বহিতে আছে
দাউদ সে জটা দাড়ির গাছে!
দাড়ি নেড়ে চেড়ে আছে বাঁচিয়া
দেড়ে টিক্ টিকি দাউদ মিঞা!
দাড়ি পুষে হল দাউদ রোগা!
ফড়িঙের গায়ে দাড়ির চোগা!
ফিরিছে কাহিল দাড়ির মুটে
নগরের কুটো দাড়িতে খুঁটে।
নিবিড় জমাট দাড়ির কাঁড়ি
চামচিকাদের বাগান-বাড়ী!
হেসে ছিঁড়ে যায় পেটের নাড়ী
ছনকের মুখে মুনকে দাড়ি!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

বৈজ্ঞানিক জীবনী। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, এফ, সি এস প্রণীত। কাত্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা; বাঁধাই দেড় টাকা। লেখক এই গ্রন্থে "একদিকে সুশ্রুত, নাগার্জ্জুন, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ও গেলিলিও, নিউটন প্রভৃতি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবন-বৃত্তান্ত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা" করিয়াছেন। লেখক 'ভূমিকা'য় আর একটি কথা বলিয়াছেন, "কোনও বৃহৎ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্যক বুঝিতে হইলে উহার আবিষ্কারককে জানা উচিত। কিরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে সেই সত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহার বর্ণনা কেবল কৌতূহলোদ্দীপক নহে, প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপাদানও বটে।" কথাটা খুব ঠিক! সুখের বিষয়, কয়টি জীবনীর আলোচনাতেই লেখক এই ধারাটুকু রক্ষা করিয়াছেন, ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। লেখকের এ প্রচেষ্টায় তাঁহার স্বদেশানুরাগেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রাচীন বৈজ্ঞানিক জীবনীর সশ্রদ্ধ ও নিরপেক্ষ আলোচনাটুকু প্রকৃতই উপভোগ্য—তাহাতে অবান্তর উচ্ছ্বাস বা অনাবশ্যক প্রসঙ্গের এতটুকুও উল্লেখ নাই। একশ্রেণীর লোকের ধারণা, প্রাচীন ভারতে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ইহা যে দারুণ ভ্রমাত্মক, সুশ্রুতের আলোচনা পাঠ করিলে সহজেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। Anatomy সম্বন্ধেও সুশ্রুতের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি মানব শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, শরীরের কোন্ স্থানে কয়টি স্নায়ু, অস্থি, শিরা প্রভৃতি আছে, তাহাও সঠিক নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ১৬২১ খৃঃ অব্দে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক উইলিয়ম হার্ভে দেহের মধ্যে রক্তের গতি (Circulation of blood) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাহার বহু-শতাব্দী পূর্ব্বে সুশ্রুত রক্তের গতি নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন। সুশ্রুত বলেন, "১৭৫টি রক্তবাহিনী শিরার দ্বারা রক্ত সমগ্র দেহে চলাচল করিতেছে। এই সকল শিরা যকৃৎ ও প্লীহা হইতে উদ্গত হইয়া সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শোণিত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যতক্ষণ স্বীয় শিরামধ্যে বিচরণ করে (circulates) ততক্ষণ ধাতুসমুদায়ের পূরণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা, স্পর্শ-জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার গুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই রক্ত দূষিত হইলে রক্ত-জন্য নানাপ্রকার পীড়া জন্মে।" এ সংবাদটুকু ভারতবাসীগণের গৌরবের—সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতে অস্ত্রচিকিৎসারও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। রামায়ণ মহাভারতে দেখা যায়, উপযুক্ত অস্ত্রচিকিৎসকগণ সেনাসমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন উভয়েই অস্ত্রচিকিৎসক ও অস্ত্র-চিকিৎসার উপযুক্ত বন্ধনী (Bandage) ঔষধাদি সংগ্রহ করিতেছেন। সুশ্রুত অস্ত্র-চিকিৎসাকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, (১) ছেদ্যক্রিয়া—কোন অঙ্গ ছেদন করা; (২) ভেদ্যক্রিয়া—কোন স্থানে ভেদ করা; (৩) লেখ্যক্রিয়া—কোন স্থানের চর্ম্ম উত্তোলন করা; (৪) বেধ্যক্রিয়া—দূষিত রক্তাদি বাহির করিয়া দিবার জন্য শিরাদি ভেদ করা; (৫) এষ্য ক্রিয়া—নালীঘা প্রভৃতি রোগে ক্ষতাদির পরিমাণ অন্বেষণ করা; (৬) আহার্য্যক্রিয়া—অশ্মরী প্রভৃতি রোগোদ্ভূত দ্রব্যাদি বাহির করা; (৭) বিস্রাব্য ক্রিয়া—স্রাব উৎপাদন করা; (৮) সীবন—সেলাই করা। পঞ্চাননবাবু অস্ত্রাদির চিত্রাদিও সংগ্রহ করিয়াছেন—এ গ্রন্থে বহু যন্ত্রের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—তাহা হইতে বিষয়টি সম্পূর্ণ বুঝা যায়। অস্ত্র-প্রয়োগ-কল্পে সুশ্রুত ১২৫ রকমের অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিরূপ দুরূহ অস্ত্র-চিকিৎসাও তৎকালে প্রচলিত ছিল, পঞ্চানন বাবু তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন—গর্ভস্থ মৃতসন্তান ছেদন করিয়া বাহির করিবার প্রক্রিয়ার বর্ণনাও সুশ্রুতে আছে। সে অস্ত্রের চিত্রও

এ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। সুশ্রুতে বহুবিধ বন্ধনীরও (Bandage) উল্লেখ দেখা যায়। বন্ধনপ্রণালী চতুর্দ্দশ প্রকারের ছিল। দুঃখ ইহাই যে আধুনিক বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকে এ সকল তত্ত্বের ধারও ধারেন না—তাঁহারা সাধারণের মধ্যে এ সকল তথ্যপ্রচারে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা শুধু নিজেদের ব্যবসায়টুকু বুঝিয়াই ক্ষান্ত আছেন; তাঁহাদের যে এদিকে একটা গুরুতর কর্ত্তব্য আছে, এ কথা তাঁহাদিগের মনে আছে বলিয়াও বুঝা যায় না। যাহা হৌক, এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য পঞ্চানন বাবু সমস্ত দেশের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, কোথাও পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার নাই—তাহার ফলে নিতান্ত অল্প-শিক্ষিত ব্যক্তিও এ গ্রন্থ সহজে বুঝিতে পারিবেন, ইহার ভিতরকার কঠিন ও জটিল রহস্যগুলি আয়ত্ত করিতে পারিবেন। বহিখানি এমনি কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে যে, উপন্যাসের মতই উপভোগ্য। এই গ্রন্থের সকল প্রবন্ধগুলিই 'ভারতী' পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল—এবং 'ভারতী' পত্রিকায় ইহার চিত্রাদিও সে সময় বাহির হইয়াছিল। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই কাগজ চমৎকার। বহিখানি বঙ্গভাষার সম্পদস্বরূপ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

নামিকো। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত; কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি জাপানী উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। লেখক 'ভূমিকা'য় লিখিয়াছেন, "কবি-কল্পনা নামিকোর ভিত্তি নয়; সুবিখ্যাত জাপানী যোদ্ধা মার্শাল প্রিন্স্ ওয়ামার কন্যার জীবনের করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত।" বাস্তবিক উপন্যাসখানি সর্ব্ববিষয়েই উপভোগ্য হইয়াছে—ইহার মধ্য দিয়া যে করুণ রসের ধারা বহিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন শান্ত, তেমনই অনাবিল। উপন্যাসের আর্ট ইহাতে প্রচুর। কয়েকটি দৃশ্য প্রকৃতই নাটকীয় ভাবের ছায়াপাতে মধুর,—ছবিতে আঁকিয়া রাখিবার যোগ্য। উপন্যাসখানির অন্তরগত মূল ভাবটি সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বজাতির সম্পত্তি; তাই এ গ্রন্থের সর্ব্বত্রই পাঠকের প্রাণ সজীব থাকে—উপন্যাস-লোকের কাল্পনিক চরিত্রগুলির সুখে-দুঃখে আমাদের সহানুভূতি সর্ব্বত্রই ঝরিয়া পড়ে—তাহা আগাগোড়াই সজাগ থাকে। "প্রাচীনে ও নবীনে, তরুণে ও প্রবীণে সংঘর্ষ দেশে দেশে সকল জাতির মধ্যেই অল্পবিস্তর বিদ্যমান, জাপানেও অন্যথা নয়।" উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া এ সত্য বুঝিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। গ্রন্থের নায়িকা নামি সুবিখ্যাত যোদ্ধা ভাইকাউণ্ট লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল কাতাওকার জ্যেষ্ঠা কন্যা—আট বৎসর বয়সে জননীকে হারাইয়া পিতার আদরে ও বিমাতার অনাদরে কোনমতে সে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহার পর কৈশোরোন্মুখেই সামুরাই বংশীয় তাকেওর সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাকেও নৌ-বিভাগে কাজ করে। তাকেওর মত প্রেমিক স্বামীর হাতে নামির দিন সুখে কাটিতেছিল।

তাকেওর পিতা ছিল না; মাতা কেইয়ের মেজাজ বড় রুক্ষ; আধুনিক কালের শিক্ষা ও রুচির উপর তিনি হাড়ে চটা। বধূর সহিত তিনি রূঢ় আচরণ না করিলেও তাহার প্রতি তাঁহার মন বড় প্রসন্ন ছিল না, কারণ পুত্র তাকেও বধূকে বড় ভালবাসে। কিছু কাল সুখে কাটিবার পর নামির যক্ষ্মা রোগ হইল; এবং মাতৃস্বস্-পুত্র চিজিওয়ার চক্রান্তে নামিকে গৃহ হইতে বিদায় দেওয়া হইল; তাকেও তখন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে। নামি গিয়া পিতার গৃহে আশ্রয় পাইল—স্বামীর সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না। তবুও মন তাহার স্বামীর জন্য দিবারাত্রি অধীর-আকুল হইয়া রহিল। চীন-জাপানের যুদ্ধ-শেষে তাকেও যখন শ্বশুর-গৃহে ফিরিল, তখন নামি ইহজগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সকল দুঃখ যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। ইহাই গ্রন্থের মূল—ইহাকে অবলম্বন করিয়াই নানা চরিত্র অবতারিত হইয়াছে, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়াছে; এবং এই ঘাত-প্রতিঘাতে উপন্যাস-বর্ণিত বিবিধ চরিত্রগুলি স্বকীয় বিশেষত্বে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুরেশবাবু নিজে বহুকাল জাপানে ছিলেন,

জাপানী আচার-ব্যবহার তাঁহার বিশেষ পরিচিত—তাই তাঁহার এ গ্রন্থে—অনুবাদ হইলেও—জাপানের নিজস্ব বিশেষত্বটুকু কোথাও ঢাকা পড়ে নাই। তাহার উপর অনুবাদ এমন সুদক্ষ—সুন্দর হইয়াছে যে, উপন্যাসখানি পড়িবার সময় পাত্র-পাত্রীগুলিকে নিতান্তই ঘরের লোক বলিয়া মনে হয়! আমরা একাসনে বসিয়া উপন্যাসখানি পড়িয়া ফেলিয়াছি। অধুনা যে সকল মৌলিক উপন্যাস বিপুল ঢক্কা-নাদ করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে, তাহার মধ্যে দুই-চারিখানি ছাড়া অপর কোনখানিই 'নামিকো'র পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারে না, তাহাদের বহু ঊর্দ্ধে নামিকোর স্থান,—এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। ইহার ভাষা বেশ স্বচ্ছ, সরল,—ভাব যেন নদীর শান্ত স্রোতের মতই উথলিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কোথাও একটা ছোট-খাট বাধা অবধি আসিয়া পড়ে নাই। যে দুই-চারিটি দৃশ্য ছবিতে আঁকিবার মত হইয়াছে, তাহার একটির উল্লেখ করিতেছি। নামিকো যখন শ্বশুর-গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পিতার কাছে ছিল, সে সময় পিতা তাহাকে এক স্বাস্থ্যকর দেশে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন; ফিরিবার সময় তাহারা একখানি পূর্ব্ব-দিকগামী ট্রেনে চাপিল—প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাহারা তিনজন। নামি খোলা জানালার ধারে এবং পিতা দূরে বসিয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। ট্রেন একটা ষ্টেশনে থামিয়াছে—এমন সময় পূর্ব্ব দিক হইতে আর একখানি ট্রেন আসিয়া সেই ষ্টেশনে থামিল। নামির ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল—নামি পার্শ্বের ট্রেনখানির দিকে চাহিয়াছিল—ট্রেন যেমন অপর ট্রেনের একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার সম্মুখে আসিয়াছে—অমনি সে দেখিল, সে কামরায় একটি "যুবক হস্তে কপোল রাখিয়া বসিয়া আছে। মুহূর্ত্তের জন্ম তাহাদের চোখে চোখে সাক্ষাৎ হইল। নামি একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। যুবক 'নামি-সান' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে তাকেও।" তাহার পর ট্রেন চলিয়া গেল।

ছাড়াছাড়ির পর স্বামীর সহিত নামির এই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ! বড় করুণ, বড় সুন্দর দৃশ্য! এমন দৃশ্য এ গ্রন্থে আরও আছে। এই দীর্ঘ ১৯৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থখানির মধ্যে ভাষার কয়েকটি ত্রুটি চোখে পড়িল। ১১৮ পৃষ্ঠার একস্থলে আছে,—কেই তাকেওকে বলিতেছে, "আসবার সময় তুমি জুসিতে থেমেছিলে?" "থেমেছিলে" কথাটা বাঙ্গালায় এখানে প্রযুজ্য হইতে পারে না—হয়, বলিতে হইবে, "নেমেছিলে?" না হয়, বলিতে হইবে, "আসবার সময় তুমি জুসি হয়ে এলে?" বহিখানি ভিতরে-বাহিরে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে, তাই ত্রুটির কথা না তুলিয়া পারিলাম না। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে সারিয়া লওয়া হইবে। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধা প্রভৃতি নয়নাভিরাম হইয়াছে।

গোবরগণেশের গবেষণা। শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার প্রণীত। ৫৮।২ নং হ্যারিসন রোড, অন্নদা বুকষ্টল হইতে প্রকাশিত। বিজয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থে লেখক বেশ নির্ভীকভাবে আমাদের বহু দোষ ও দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে,—সব মতগুলির সহিত সকলের সহানুভূতি না থাকিলেও লেখকের নির্ভীক মতাভিব্যক্তিটুকু উপভোগ্য, এবং তাহ ভাবিয়া দেখিবার মত। লেখকের আলোচনা কৌতুক-রসে মণ্ডিত। সে রসে প্রাণ আছে—তাহা নির্জ্জীব বা অক্ষম ন্যাকামির রূপান্তর নহে; তবে স্থানে স্থানে এমন রসিকতাও আছে যাহাতে কোনো রস নাই, এবং মধ্যে মধ্যে কল্পনা অত্যন্ত কষ্টকল্পনা হইয়া পড়িয়াছে। রসিকতায় লেখক যে খুব পাকা এ কথা বলা যায় না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বর্ষা

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্—এলাহাবাদ।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২২ [৫ম সংখ্যা

নালক

যেখানে কাশী, সেখানে গঙ্গা একখানি ধারালো খাঁড়ার মত বেঁকে চলেছেন। আর ঋষি-পত্তনের নীচেই বরুণা নদীর পাড় পাহাড়ের মত শক্ত। তার গায়ে বড় বড় সব গুহা গর্ত্তে যত জটাধারী বক-বেড়ালি-ব্রহ্মচারী ধুনি জ্বালিয়ে ছাইভস্ম মেখে বসে রয়েছে। পাড়ের উপরেই সারনাথের মন্দির। মন্দিরের পরেই গাছে-গাছে-ছায়া-করা তপোবন। সেইখানে সত্যি যাঁরা ঋষি তপস্বী তাঁরা রয়েছেন। হরিণ তাঁদের দেখে ভয় খায় না, পাখী তাঁদের দেখে উড়ে পালায় না। তাঁরা কাউকে কষ্ট দেন্ না। কারু ঘুম ভাঙবার আগে তাঁরা একটিবার বন থেকে বেরিয়ে নদীতে স্নান করে যান্; দিনরাতের মধ্যে তপোবন ছেড়ে আর তাঁরা বার হ'ন্ না। দেবল ঋষি নালককে নিয়ে এই তপোবনে একটি বটগাছের তলায় আজ ক মাস ধরে রয়েছেন।

তখন আষাঢ় মাস। বেলা শেষ হ'য়েও যেন হয় না,—রোদ পড়েও যেন পড়তে চায় না! সারনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার শাঁখ ঘণ্টা বাজছে, কিন্তু তখনও আষাঢ়ান্ত বেলার সোনার রোদ গাছের মাথায় ঝক্ ঝক করছে, হরিণগুলি তখনও আস্তে আস্তে চলে বেড়াচ্ছে, ছোট ছোট সবুজ পাখীগুলি এখনও যেখানটিতে একটুখানি রোদ সেইখানটিতে কিচমিচ করে খেলে বেড়াচ্ছে। একলাটি বসে নালক বর্ষাকালের ভরা নদীর দিকে চুপ করে চেয়ে রয়েছে। একটা সাদা বক্ তরে চোখের সাম্‌নে দিয়ে কেবলি নদীর এপার ওপার আনাগোনা করছে;—সে যেন ঠিক করতে পারছেনা কোন্ পারে বাসা বাঁধবে।

বর্ষাকালের একটানা নদী আজ সারাদিন ধরে নালকের মনটিকে টান্‌ছে—সেই বর্দ্ধনের বনের ধারে—তাদের সেই গাঁয়ের দিকে! সেই তেঁতুলগাছে-ছায়া-করা মাটির ঘরে

তার মায়ের কাছে নালকের মন একবার ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আস্‌ছে। মন তার যেতে চাচ্চে মায়ের কাছে, কিন্তু ঋষিকে একলা রেখে আবার যেতেও মন সরছেনা। সে ওই বকটার মত কেবলি যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে!

দেবল ঋষি নালককে ছুটি দিয়েছেন তার মায়ের কাছে যেতে। এদিকে আবার ঋষির মুখে নালক শুনেছে বুদ্ধদেব আসছেন এই ঋষিপত্তনের দিকে! আজ সে কত বছর নালক ঘর ছেড়ে এসেছে; মাকে সে কতদিন দেখে নি! অথচ বুদ্ধদেবকে দেখবার সাধটুকু সে ছাড়তে পাচ্চে না। সে একলাটি নদীর ধারে বসে ভাবছে—যায় কি না যায়।

সকাল থেকে একটির পর একটি কত নৌকো কত লোককে যার যার দেশে নামিয়ে দিতে চলে গেল; কত মাঝি নালককে যাবেগো যাবেগো বলে ডেকে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর একখানি মাত্র ছোট নৌকো নালকের দিকে পাল তুলে আস্‌ছে—অনেক দূর থেকে। তার আলোটি দেখা যাচ্ছে নদীর জলে একটি যেন ছোট পিদিম ঝিকঝিক করে ভেসে চলেছে! এইখানি চলে গেলে এদিকে আর নৌকো আসুবে না—যাত্রী নিতে। নালক মনে মনে দেবল ঋষিকে প্রণাম করে বলছে - ঠাকুর, যেন বুদ্ধদেবের দর্শন পাই!

দেখতে দেখতে নৌকো এসে তপোবনের ঘাটে লাগল! —সেই ছোট নৌকোয় নালক আর মাকে দেখতে দেশের দিকে চলে গেল। আজ কত বছর সে তার মাকে দেখেনি! ঠিক সেই সময় বরুণার খেয়া-ঘাট পার হয়ে বুদ্ধদেব সারনাথের তপোবনে এসে নাম্‌লেন। আর একটি দিন যদি নালক সেখানে থেকে যেত!

কত দেশবিদেশ ঘুরে, কত নদীর চরে, খালের ধারে নিত্য সন্ধ্যেবেলায় ভিড়তে ভিড়তে নালকদের নৌকোখানি চলেছে—যে গাঁয়ের যে লোক তাকে সেই গাঁয়ে রেখে; পুরানো যাত্রী যেমন নিজের গাঁয়ে নেমে যাচ্ছে অমনি তার জায়গায় ঘাট থেকে নূতন যাত্রী এসে নৌকোয় উঠছে। এমনি করে নালকদের নৌকো চলেছে—কতদিন কতদুর!—কেবলি যাত্রী উঠিয়ে নিয়ে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে। নৌকো কখনো চলেছে সকালের বাতাসে পাল তুলে দিয়ে তীরের মত জল কেটে, কখনো বা চলেছে রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কালো জলে পিদিমের একটু আলোর দাগ টেনে;—এমন আস্তে যে মনেই হয় না যাচ্ছি।

দিনে দিনে বর্ষাকালের নদী জলে ভরে উঠছে। আগে কেবল নদীর উঁচু পাড়ই দেখা যাচ্ছিল, এখন উপরের ক্ষেতগুলো, তার ওধারে গাঁয়ের গাছগুলো ঘরগুলো, এমন কি অনেক দূরের মন্দিরটি পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জল উঁচু হয়ে উঠে বালির চরগুলো সব ডুবিয়ে দিয়েছে!

নৌকো যখন নালককে দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে তখন ভরা শ্রাবণ মাস; ঝুপ্‌ ঝুপ বিষ্টি পড়ছে, নদীর ধারে ধারে বাঁশ-ঝাড়ের গোড়া পর্য্যন্ত জল উঠেছে। থৈ থৈ করছে জল! খাল বিল খানা খন্দ ভরে গেছে, ঘাটের ধাপ সব ডুবে গেছে —স্রোতের জলে—বর্ষাকালের নূতন জলে।

নালক ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে কতদূর থেকে কার হাতের একটি ফুল ভাস্‌তে ভাস্‌তে এসে ঘাটের এক কোণে লেগেছে; নদীর ঢেউ সেটিকে একবার ডাঙার দিকে একবার জলের দিকে ফেলে দিচ্ছে আর টেনে নিচ্চে। নালক জল থেকে ফুলটিকে তুলে নিয়ে মনে মনে বুদ্ধদেবকে পূজো করে মাঝ-নদীতে আবার ভাসিয়ে দিলে। তারপর আস্তে আস্তে সেই ঘরের দিকে চলে গেল—বিষ্টির জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে। এই ফুলটির মত নালক—সে মনে পড়ে না কতদিন আগে—ঋষির সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাকে ফেলে, সংসারে বাইরে ভেসে গিয়েছিল। আজ এতকাল পরে সে আবার ওই ফুলটির মতই ভাস্‌তে ভাসতে তাদের দেশের ঘাটে, মায়ের কোলের কাছে ফিরে এসে আট্‌কা পড়ল। আবার সে দিন কবে আসবে যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা-পড়া ফুলটির মত তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝ-গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন!

নালক তাদের ঘরখানি দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছে ঘরের দাওয়ায় তার মা বসে রয়েছেন, আর উঠোনের মাঝে একটি ভিখারী দাঁড়িয়ে গাইছে—

"এরে ভিখারী সাজায়ে তুমি কি রঙ্গ করিলে!"

(সমাপ্ত)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবাব

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ব্যারণেস হেমারলিঙ্

হেমারলিঙ এণ্ড সন কোম্পানির অফিস-গৃহের একেবারে দক্ষিণ কোণে ত্রিতলের উপর ব্যারণেস হেমারলিঙের খাস-কামরা। সেই ঘরেই আজ খুব জমকালো রকমের পার্টির আয়োজন হইয়াছে। ঘর খানি সে জন্য কায়দা-মাফিক সাজানো হইয়াছে—দেওয়ালে লতা-পাতার বিচিত্র ঝালর দুলিতেছে—ঘর একেবারে ফুলের গন্ধে ভরপুর।

অতিথির মধ্যে জর্ম্মান, ইহুদি, ব্যাঙ্কার ও কমিশন-এজেন্টের সংখ্যাই অধিক। আফ্রিকা প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া ইহারা প্রচুর ধনৈশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছে—কাজেই হেমারলিঙের প্রাসাদ-ভবনে তাহাদিগের দ্বার অবারিত বলিলেও চলে।

ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর যতই থাকুক, ব্যারণেসের জীবনে কালির রেখা যথেষ্টই ছিল। পূর্ব্ব-জীবনে সে বাঁদী ছিল—এক দাস-বিক্রেতা আদ্রিয়ানাপ্‌লের বাজারে তাহাকে কিনিয়া মরক্কোর দরবারে বেচিয়াছিল; সম্রাটের মৃত্যুর পর তরুণ বে আহমদ আপনার হারেমের জন্য তাহাকে কিনিয়া

নয়। পরে হারেম ত্যাগ করিয়া আসিলে হেমারলিঙ তাহাকে বিবাহ করে। কিন্তু টিউনিসে ব্যারণেসকে লইয়া হেমারলিঙ বড় বিপদে পড়িল। সে দেশের কোন গৃহে—তুর্কি বা য়ুরোপীয় যে কোন জাতিই হোক না কেন—কোথাও ব্যারণেসের প্রবেশাধিকার ছিল না। একটা বাঁদীকে বন্ধুর সম্মান দিতে সকলেই নারাজ ছিল। পারিতে আসিয়াও হেমারলিঙের সে বিপদ কাটিল না। কাজেই ব্যারণেসকে প্রথম দুই-চারি বৎসর নির্জ্জনে বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ব্যারণেসের বুদ্ধি ছিল অসাধারণ তীক্ষ্ণ—সভ্য সমাজ বশ করিবার মন্ত্রও সে জানিত। সে মন দিয়া অল্প দিনের মধ্যেই ফরাসী ভাষা বেশ আয়ত্ত করিয়া লইল—সাজ-সজ্জা ফরাসী কেতায় গড়িল। বহু মূল্য রেশমি পোষাক পরিয়া সে যখন ঝকমকে বেরুসে চড়িয়া পারির পথে বেড়াইতে বাহির হইল, তখন তাহার ঐশ্বর্য্য ও রূপের ছটায় সহরের আপামর সাধারণের তাক লাগিয়া গেল। সকলে বলিল, হাঁ, একটা রূপসী বটে!

তারপর ব্যারণেস খুব সমারোহে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল; গির্জ্জায় ও আতুর সভায় অজস্র অর্থ দান করিয়া প্রচুর নাম কিনিল। এই সব ব্যাপারে তাহার প্রধান সহায় ছিল, লি-মার্কার। তাহারই উপদেশে ব্যারণেস বুঝিল, এখানকার সমাজকে হাত করিতে হইলে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা তাহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তার পর যাহা করিবার আপনা হইতেই ঘটিবে; আয়োজনের প্রয়োজন হইবে না। কারণ সমাজ বশ করিতে হইলে প্রধান যে দুইটি অস্ত্রের প্রয়োজন, ব্যারণেসের তাহা প্রচুর আছে—সে দুটি অস্ত্র, রূপ ও অর্থ!

লি-মার্কারের কথাই সত্য দাঁড়াইল। পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ দুই হাত বাড়াইয়া হেমারলিঙ-গৃহিণীকে বুকে তুলিয়া লইল। একজন শুধু ইহাতে সায় দিতে পারিল না—সে মাদাম জাঁমুলে। মাদাম টিউনিসের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা—পারির লোক যতই ব্যারণেসকে মাথায় তুলুক, মাদাম জাঁমুলে এই বাঁদীকে কিছুতেই বন্ধুর চক্ষে দেখিতে পারিল না। এ অপমান ব্যারণেসের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিল।

তাহার পর রাজ্যের কোন অধীশ্বরী যেমন করিয়া ধীরে ধীরে আপনার শক্তির প্রভাব বিপক্ষ পক্ষকে ভালো করিয়া জানাইয়া দেয়, ব্যারণেসও রূপ ও অর্থের সাহায্যে জাঁমুলে-পরিবারকে তেমনই ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ চলিল। সে যুদ্ধে মুখামুখি অস্ত্র চলে না—গোপন অন্তরালে বসিয়া ব্যারণেস শরক্ষেপ করে, আর সে শর গিয়া বেচারা নবাবকে বিঁধিয়া একেবারে জর্জ্জরিত করে! নবাব বিপন্ন, পরাজিত হইলেন। হেমারলিঙ ও তাহার পত্নী জয়ের গর্ব্বে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু তবুও ব্যারণেসের মনে একটা ক্ষোভ রহিয়া গেল। এ শর মাদাম জাঁমুলেকে কৈ এতটুকুও বিচলিত করিল না ত! ব্যারণেস ভাবিয়াছিল, এ শরের আঘাতের বেদনায় মাদাম জাঁমুলে আসিয়া তাহার দরবারে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইবে, তাহার ক্ষমা চাহিয়া তাহার সখীত্ব মাগিয়া সেই অতীত দিনের তীব্র অপমানের জ্বালা ...

ব্যারণেসকে মুক্তি দিবে! কিন্তু কোথায় মাদাম জাঁম্লে!

তাই সেদিন হেমারলিঙ আসিয়া যখন মেরিকে গোরস্থানের ব্যাপার খুলিয়া বলিল, তখন একটা জয়ের আনন্দে মেরির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মেরি ভাবিল, এবার পার্টি দেওয়া তবে তাহার সার্থক হইল। দর্পিতা নারীর উপর সে দর্পের শোধ কেমন করিয়া লইবে, তাহারই উপায় সে চিন্তা করিতে লাগিল।

পার্টির দিন ব্যারণেস একটি লোকের প্রতীক্ষায় অধীরভাবে বসিয়া রহিল—কখন্ সে আসে! যতই বিলম্ব হইতেছিল, অধীরতা ততই বাড়িয়া উঠিতেছিল। সকলের অভ্যর্থনার ভার অপরের হস্তে অর্পণ করিয়া ব্যারণেস নিজে এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বসিয়া রহিল। এই কক্ষের খোলা জানালা দিয়া বাড়ীর ফটক দেখা যায়! বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গেল; তবুও হায়, সে আকাঙ্ক্ষিত জন আসিল না! ব্যারণেসের মনটা ক্রুদ্ধ সর্পের মতই গর্জ্জিতে লাগিল।

পার্টি তখন শেষ হইয়া গিয়াছে—রাত্রি গভীর হইয়াছে। অতিথির দল যাইতে সুরু করিয়াছে, এমন সময় কালো একটা কোট গায়ে নবাব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একেলা, মুখ তাঁহার শুষ্ক, চোখে দারুণ উদ্বেগ ও বিরক্তি মাখানো রহিয়াছে। পাগলের মত মূর্ত্তি! মাদাম আসিতে রাজী হইল না—কিছুতেই না; নবাবের সহস্র কাতর অনুনয়েও নয়।

সেদিন ভোর হইতেই নবাব স্ত্রীকে তাড়া দিতেছিলেন, সাজ-সজ্জার আয়োজন কর। বৈকালে একটা নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতে হইবে। একে ত এই স্থূল দেহখানা লইয়া টানাটানি করিতে মাদাম জাঁম্লে সহজেই নারাজ, তাহার উপর যখন সে শুনিল, হেমারলিঙের গৃহে নিমন্ত্রণ এবং এ নিমন্ত্রণের মূলে সেই বাঁদী, তখন সে একেবারে কঠিন হইয়া বসিল, কিছুতেই সেখানে যাইবে না। ইহার জন্য পৃথিবী যদি রসাতলে যায়, তবুও না! এত বড় অপমান মাদাম জাঁম্লে একটা রাজ্যের বিনিময়েও মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। নবাব কত মিনতি করিলেন, কত সাধিলেন,—নহিলে সব যায়—এ অভিমান, এ গর্ব্ব লইয়া বসিয়া থাকিলে পথের ভিখারী হইতে হইবে। প্রাণে যোগ না-ই থাকিল, শুধু একবার হাজিরা দেওয়ায় দোষ কি! অন্তরে বিরক্তির মহাভার চাপিয়া রাখিয়া একবার হাসিমুখে দুইটা কথা বলিলেই বা! কিন্তু মাদামের ধনুর্ভঙ্গ-পণ, কিছুতেই নড়িবার নহে। প্রাণ যায় যাক্—সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, তাহাতেও মাদাম জাঁম্লে কাতর নহে—কিন্তু তাই বলিয়া একটা বাঁদীর পার্টিতে গিয়া ইজ্জৎ খোয়াইবে—অত-বড় আফ্‌সিন বংশে জন্মিয়া এক কলঙ্কিনী বাঁদীর সখীত্ব স্বীকার করিবে—তেমন পিতার কন্যাই সে নয়!

নবাব সাধিলেন, কাঁদিলেন, রাগিলেন, তবুও স্ত্রীর মন টলিল না। তখন অগত্যা তিনি একেলাই হেমারলিঙের গৃহের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হেমারলিঙের গৃহে পৌঁছিয়া সম্মুখেই হেমারলিঙ ও ব্যারণেসকে দেখিয়া নবাব

কম্পিত স্বরে কয়টা কথা উচ্চারণ করিলেন, "মাদাম জাঁসুলের শরীরটা বড় খারাপ—আসতে পারলেন না বলে তিনি ভারী দুঃখিত! আমারও সেজন্য আসতে দেরী হয়ে গেল—" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্যারণেস কহিল, "হাঁ, আমি জানি, জানি আমি—" নবাব স্পষ্টই বুঝিলেন, সে স্বরে ব্যারণেসের মনের সমস্ত ঝাঁজ ফুটিয়া বাহির হইল! ব্যারণেস সেখান হইতে ক্ষিপ্র পাদক্ষেপে চলিয়া গেল।

নবাব ও হেমারলিঙ উভয়েরই মুখে কিয়ৎক্ষণের জন্য কোন কথা ফুটিল না। পরে হেমারলিঙ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বড় দুঃখের বিষয় যে, তোমার স্ত্রী এলেন না!"

গভীর নৈরাশ্যে জাঁসুলের মস্তিষ্ক স্থির ছিল না। তিনি কোন মতে হেমারলিঙের কথারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিলেন, "বড় দুঃখের বিষয় বৈ কি!" তাহার পর হেমারলিঙের মুখের পানে চাহিয়া নবাব আবার বলিলেন, "কিন্তু শোন স্যাজেয়ার, আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে বনিবনাও নেই বলে আমাদেরও কেন বনিবনাও থাকবে না? আমাদের বন্ধুত্ব কত দিনের এ—"

হেমারলিঙ কহিল, "তা ত বটেই! দেখা যাক্—এখন তুমি একটু বসবে কি?"

নবাব কহিলেন, "না, থাক্। তুমি বোধ হয় ব্যস্ত আছ—!"

"হাঁ, ভালো কথা! তা হলে লি-মার্কারের সে ছবির ব্যাপারটা—কবে তোমার সুবিধা হতে পারে, বল দেখি।"

"তার আর সুবিধা-অসুবিধা কি! যেদিন হোক! ভাল কথা—আমি দিন স্থির করে পরে চিঠি লিখব'খন। দু'একদিনের মধ্যেই সেরে ফেলা যাবে—কি বল?

"তুমি ভুলে যাবে না? দেখো। বুঝছ ত, কত জরুরি কাজ এটা—"

"আরে না, না! ভুলব কি! দু'এক-দিনের মধ্যেই তুমি আমার চিঠি পাবে। তাহলে আজ এই অবধি—"

হেমারলিঙ সেখান হইতে চলিয়া গেলে নবাব বিদায় লইলেন।

ইহার দুই দিন পরে হেমারলিঙের নিকট হইতে নবাব এক পত্র পাইলেন। হেমার-লিঙ লিখিয়াছে,

"বন্ধুবরেষু

আমি নিজে তোমায় সঙ্গে করিয়া লি-মার্কারের ওখানে যাই, এমন অবসর ইতিমধ্যে চট্ করিয়া মিলিতেছে না! বড় কাজের ভিড় পড়িয়াছে; অথচ এটা খুব জরুরি ব্যাপার। যাই হোক, ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার একলা যাওয়াই ঠিক। নয় কি? কোন দ্বিধা করিয়ো না। লি-মার্কারকে বলা আছে। যে কোন দিন সকালে বেলা আটটা হইতে দশটার মধ্যে তুমি তাহার কাছে যাইতে পার।

তোমারই হেমারলিঙ।"

চিঠির তলায় 'পুনশ্চ' বলিয়া লেখা আছে, "ছবির কথা মনে রাখিয়ো।"

চিঠি পড়িয়া নবাব বিস্মিত হইলেন। চিঠিখানার অর্থ কি? সত্যই কি তাহার অবসর নাই, না, অসম্মতি জানাইবার এ একটা ভদ্র রকমের ছল, শুধু? যাহা হোক, এ-সব ভাবিয়া দেখিবার আর সময়

নাই। কাজেই একদিন সকালে জাঁমুলে লি-মার্কারের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

-র‍্যু ক্যাশেয় কাথলিক ক্লবের নিকট লি মার্কারের গৃহ। লি মার্কার ব্যারিষ্টার, লায়নের ডেপুটি, ফ্রান্সের যত ধর্ম্ম সভার এজেণ্ট। হেমারলিঙের সহিত পরিচয় হইবার পর হইতে তাহাকে আর ব্যারিষ্টারি করিতে হয় না—হেমারলিঙের ব্যাঙ্কে মোটা রকম পাওনা আছে। সপ্তাহে দুই-চারি দিন হেমারলিঙের অফিস তদারক করাই তাহার কাজ।

লি মার্কারের গৃহে তখন ভারী ভিড়। রাজ্যের লোক নানা কাজে দেখা করিতে আসিয়াছে। সকলে হল-ঘরে বসিয়াছিল—যখন যাহার ডাক পড়িবে, তখন সে গিয়া দেখা করিবে। নবাব আসিয়া সেই দলে মিশিয়া বসিলেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাঁহার ডাক পড়িল। নবাব উঠিয়া কম্পিত বক্ষে লি মার্কারের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরখানি বড়। প্রকাণ্ড একখানা গদিয়ান চেয়ারে লি মার্কার তাহার দীর্ঘ দেহ গুঁজিয়া বসিয়া আছে। ঘরের চারিধারে বড় বড় দ্বার—দ্বার-পথে মোটা পরদা ঝুলিতেছে। নবাব লি মার্কারকে অভিবাদন করিলেন—লি মার্কার চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন, পরে চোখ হইতে চশমাজোড়া নামাইয়া টেবিলে রাখিয়া লি মার্কার কহিলেন, "আপনার কি কথা, বলুন।"

"সেই কথাই আমি বলতে এসেছি, ম্যসিয়ো। আপনি হয়ত আশ্চর্য্য হচ্ছেন, যে এ কথা কমিটির কাছেই বললে চলত—কিন্তু ব্যাপারটা এত ঘরোয়া রকমের যে সাধারণের কাছে অত কথা প্রকাশ করে বলা ঠিক হবে না—বিষয়টা গোপনীয়। বিশেষ সে কথা নিয়ে সাধারণে নাড়াচাড়া করলে আমার একজন পরমাত্মীয়ের মনে অত্যন্ত বেদনা দেওয়া হবে। তাই আপনাকে কষ্ট দিতে আমার এখানে আসা।"

লি মার্কার গোঁফে দুই চারিটা পাক দিয়া বলিলেন, "বলুন।"

নবাব বলিলেন, "শুনুন তবে। আপনার রিপোর্ট যে সঠিক আর নিরপেক্ষ হবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে পথে-ঘাটে আমার নামে যে একটা অপবাদ সম্প্রতি রটে বেড়াচ্ছে, সেটা একেবারে মিথ্যা। আশা করি, সে মিথ্যা জনরব থেকে আপনি আমার সম্বন্ধে কোনরকম ভুল ধারণা করে বসেন নি! সেই অপবাদ সম্বন্ধেই দু-চারটে কথা আজ আমি বলতে এসেছি। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, সে সব কথা। আমি আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ অবধি আজ সঙ্গে এনেছি। সব দেখলে-শুনলে সহজেই আপনি বুঝবেন, ব্যাপারটা কতখানি গোপনীয়, আর কেনই বা সেটা সাধারণে প্রকাশ করা যায় না।"

তাহার পর নবাব লি-মার্কারকে একখানি সার্টিফিকেট দেখাইলেন। সেখানা টিউনিস মন্ত্রীসভার সার্টিফিকেট—তাহাতে লেখা আছে, দীর্ঘ বিশ বৎসর জাঁমুলে টিউনিসে ছিলেন—এবং এই দীর্ঘ কালের মধ্যে দুইবার মাত্র তিনি টিউনিস ত্যাগ করিয়াছিলেন—একবার মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার

পিতাকে দেখিতে—আর একবার বে'র সঙ্গে দেখা করিতে। তাহা ছাড়া এ বিশ বৎসরে নবাব কখনও এক দিনের জন্যও টিউনিস-ছাড়া হন নাই! নবাব কহিলেন, "আপনি এখন বলতে পারেন, এমন প্রমাণ আমার হাতে থাকতে কেন আমি এই সব মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করিনি? তারও কারণ আছে, ম্যাসিয়ো। আমার এক ভাই আছে—বেচারা ভাই—পারি সহরের বিলাস-পাপে পঙ্কিল, রুগ্ন ভাই! প্রথম বয়সে পারির বদ্ সঙ্গে পড়ে সে কলঙ্কের কালি মেখে ঘরে ফিরেছিল! কিন্তু সত্যই কি—এই যে অপবাদ-কলঙ্ক আমার নামে আজ রটে বেড়াচ্ছে, সে এতদূর মেখেছিল? তার সন্ধান নেবার সাহস আমার কখনও হয়নি—ভয়ে সে সন্ধান নিওইনি আমি। আমার বাপ এই ভাইয়ের উপর বড় আশা গড়ে তুলেছিলেন। সেই ভাইয়ের এই কীর্ত্তি দেখে তিনি বড় শোক পেয়ে মারা যান। মরবার সময় অতি দুঃখে আমায় তিনি বলেছিলেন, 'বার্ণার্ড, তোমার দাদাই আমায় মারলে! এত বড় লজ্জা, এতখানি কলঙ্ক গায়ে মেখে বাঁচা যায় না!' সে কথা আমি কখনও ভুলবো না।"

নবাব নিশ্বাস ফেলিলেন, পরে আবার কহিলেন, "বাবা গেছেন, কিন্তু আমার মা এখনও বেঁচে আছেন, ম্যাসিয়ো। আমার বেচারী, স্নেহময়ী মা! মা আমার এ-সব কিছুই জানেন না। তিনি জানেন, ছেলে তাঁর রোগে ভুগেই এমন হয়েছে। এ সব কথা শুনলে মা আমার পাগল হয়ে যাবেন। তাই আমি মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারিনা। না হলে 'মেসেঞ্জার' কাগজ প্রথম যেদিন আমায় গাল দিলে, সে দিন আমি তাকে অমনি ছেড়ে দি! নালিশ-মকদ্দমা করলে চারদিকে ঢাক বেজে যাবে—মার কানে সব কথা পৌঁছুবে—শুধু সেই ভয়ে আমি চুপ করে সে সব অপমান সহ্য করেছি। এখন বলুন, ম্যাসিয়ো, আমার অপরাধ কি, আপনার কাছে আমার মিনতি! এই ত প্রমাণ। আমি দেখালুম ত, এ অপবাদের মূলে আমার থাকা কতখানি অসম্ভব! আপনি সব শুনলেন, এখন আপনি আমার বিচার করুন।"

লি মার্কার স্থিরভাবে সব কথা শুনিল, কিছু বলিল না। তাহার পর নবাব সবিস্তারে আপনার জীবন-কাহিনী বলিয়া গেলেন। পিতার দরিদ্র অবস্থা,—তাহার মধ্যেও বড় ভাইকে মানুষ করিবার জন্য কি তাঁহার আগ্রহ! কত ব্যয়ে তাহাকে সহরে পাঠানো—সেই ভাই শেষে কি হইয়া দাঁড়াইল! তাহার পর ভাগ্যান্বেষণে কোন্ সে সহায়-হীন সুদূর দেশে নবাব যাত্রা করিলেন! সেখানে জ্বলন্ত রৌদ্রে মাথা পাতিয়া, বন্য অসভ্য লোকগুলার সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া একটি-একটি পয়সা উপার্জ্জন করিয়া এতখানি ঐশ্বর্য্য জমাইয়া তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। এখানে চারিধারে কি এ চক্রান্ত—নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র—আর নবাব একা সে সকলের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন! যিনি একমাত্র সহায় ছিলেন, তিনিও আজ পার্শ্বে নাই!

বলিতে বলিতে নবাবের প্রাণ কখনও মমতায় গলিয়া যাইতেছিল, কখনও ক্রোধে

তাতিয়া উঠিতেছিল ; লি মার্কার স্তব্ধভাবে বসিয়া সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া চলিয়াছিল। বর্ণনার উচ্ছ্বাসে নবাব শেষে বলিয়া ফেলিলেন, "ভাল কথা! আমার বন্ধু হেমারলিঙ বলছিল, আপনার ভারী ছবির সখ! অনেক ভাল ভাল ছবি আপনি চড়া দামে কিনেওছেন!"

লি মার্কার নম্র স্বরে কহিল, "কোথায় তেমন ছবি! ছবির দাম কি আজকালকার বাজারে—! ও-সব বড়মানুষেরই সাজে! ডিউক, নবাব—তাঁদেরই এ সখ পোষায়—নাহলে আমাদের মত গরীবদের—! হুঁ! ঐ ত ক'খানা ছবি শুধু, এই ঘরেই ঐ রয়েছে। ওরই দাম কি!"

নবাব দেওয়ালের পানে চাহিলেন। লি মার্কার খুব সতর্কভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। নবাব কহিলেন, "মাঝের দেওয়ালটা ফাঁক রয়ে গেছে যে! আমার কাছে ভার্জ্জিনের একখানা ছবি আছে—ছবিখানা ভাল, দামীও বটে! অনুমতি করেন ত সেখানা ঐ দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে যাই।"

নবাবের অলক্ষ্যে লি মার্কারের অধর-প্রান্তে হাসির একটা মৃদু বিদ্যুৎ-রেখা খেলিয়া গেল। লি মার্কার ইহাই চাহিতেছিল। এই কথাটুকুর জন্যই সে অতখানি ধৈর্য্য ধরিয়া নবাবের কাহিনী দিব্য শুনিয়া যাইতেছিল। এখন এই কথা শুনিয়া লি-মার্কার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র স্বরে সে কহিল, "আপনি বলতে চান, এই ছবিখানা ঘুষ নিয়ে রিপোর্টটা আগাগোড়া আবার বদলে লিখি—কেমন, এই ত চান আপন ? বলুন, সেই জন্যই আজ এসেছেন এখানে!" পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘণ্টা টিপিয়া লি-মার্কার আবার বলিল, "জীবনে অনেকের অনেক-রকম আস্পর্দ্ধা দেখেছি বটে, কিন্তু আপনার এ আস্পর্দ্ধার আর তুলনা নেই! আমার বাড়ীতে বসে আপনি আমায় এমনভাবে অপমান করতে সাহস পান—!"

"কিন্তু শুনুন, ম্যাসিয়ো, রিপোর্টের সম্বন্ধে কোন কথা—!"

ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া একটা ভৃত্য কক্ষে প্রবেশ করিল। লি মার্কার তাহাকে কহিল, "এঁকে বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দাও—"

লজ্জায় অপমানে জাঁসুলে যেন মরিয়া গেলেন। তিনি উঠিয়া যন্ত্র-চালিতের মত ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন শূন্যে ঝুলিতেছেন, পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গিয়াছে—! লি মার্কার কহিল, "আপনি শুধু আজ আমায় অপমান করেন নি, ফ্রান্সের সদস্য সভার অপমান, সমস্ত ফরাসী জাতির অপমান করেছেন, তা জানেন। এ কথা আজই আমি সকলকে বলব। মনে রাখবেন, নবাব বাহাদুর, এটা আফ্রিকা নয়, এ ফ্রান্স। এখানে পয়সা দিয়ে লোকের বিবেক কেনা-বেচা চলে না।"

নবাব পাগলের মত টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন। তিনি চলিয়া গেলে লি মার্কার পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া পরদা টানিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেমন, ব্যারণেস মেরি, আমার অভিনয়টা দেখলে কেমন, সুন্দরী!"

(ক্রমশঃ)

আধুনিক ভারত

ভারতের শাসনপদ্ধতি

ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা বিধান করিয়া, ইংলণ্ড যে বৃহৎ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সুসিদ্ধ করেন নাই, পরন্তু শুধু তাহার আয়োজন মাত্র করিয়াছিলেন। সেই বৃহৎ কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি এই—যথা :—ভারতকে জাতিভেদ হইতে, ব্রাহ্মণ্যিক উৎপীড়ন হইতে, সামন্ততন্ত্র হইতে মুক্তিদান করিয়া, স্বকীয় ক্রমবিকাশের পথ অবাধে অনুসরণ করিতে সমর্থ করা। নৈতিক ও ভৌতিক সভ্যতার পুষ্টিসাধন করিয়া, কেবল য়ুরোপীয় প্রভাবই এই রূপান্তর সংসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতের নৈতিক সভ্যতার উপর এই প্রভাব কিরূপ কাজ করিয়াছিল তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভারত সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী, সৈন্যমণ্ডলী, বিধিব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতির পর-পর অনুশীলন করিলে সুবিধা হইবে।

১৮৫৭ অব্দের ঘটনাবলী, প্রাচীন পদ্ধতিকে স-দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল। সুতরাং কতকগুলি নূতন প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা ভারতের জন্য আবশ্যক হইল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির যুগল প্রকৃতি :—বর্ত্তমানে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান অশান্তি-বিক্ষুব্ধ দেশে পুনর্ব্বার সুশৃঙ্খলা আনয়ন করিবে; কালক্রমে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিই উদার নৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। কারণ, বিদেশে উপনিবেশ-রাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে ইংলণ্ডের যে একটা বিশেষ পটুত্ব আছে, সেই পটুত্বের বশবর্ত্তী হইয়াই ইংলণ্ড বুঝিলেন, সিপাহী-বিদ্রোহ হইতে যে শিক্ষালাভ হইল তাহা প্রজা-পীড়নের শিক্ষা নহে, পরন্তু মুক্তিদানের শিক্ষা।

অতএব ভারতের শাসনপদ্ধতি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে উত্তরোত্তর কি-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল এক্ষণে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

*
* *

প্রথমে দুইটি সমস্যার সমাধান আবশ্যক হইল। প্রথম, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের কিরূপ সম্বন্ধ—এই এক সমস্যা। জাতি ও আচার ব্যবহারে ভারত ইংলণ্ড হইতে ভিন্ন; উহাদের স্বার্থ সব-সময়ে এক হইতে পারিবে না; অতএব ইহা স্বাভাবিক যে ভারত ইংলণ্ডের ঐকান্তিক প্রাধান্য হইতে আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করিবার জন্য সতত উন্মুখ হইবে। কিন্তু ভারত ইংরাজ সাম্রাজ্যের একটা অংশ; শান্তির সময়ে ও যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডকে সাহায্য করা ভারতের কর্ত্তব্য। তা ছাড়া, ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে, স্বকীয় উপনিবেশ-রাজ্যের তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করিতে ইংলণ্ডের রাজধানী বাধ্য হইয়াছিল, অধুনা ঐ তত্ত্বাবধান অনাবশ্যক; তথাপি এখনো সে সময় আসে নাই যে, অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার ন্যায় ভারত স্বরাষ্ট্রশাসনের অধিকার লাভ

করিতে পারিবে; ভারতের আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজ-সৈন্যমণ্ডলী আবশ্যক; পরস্পর-বৈরী বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির মধ্যে শান্তি রক্ষার্থ এবং যে প্রভূত অর্থের জন্য ভারত ইংলণ্ডের নিকট ঋণী, সেই ঋণ পরিশোধার্থ ইংরাজের শাসনকর্তৃত্ব আবশ্যক। এইরূপে, ভারত ইংলণ্ডের অধিপতি ও ইংরাজ পার্লামেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই পার্লামেণ্টের অধীনে, ভারতের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিবার জন্য, এবং আইন ও পরোয়ানা প্রভৃতি রাজার দ্বারা মঞ্জুর ও স্বাক্ষর করাইয়া লইবার জন্য, ভারত-রাষ্ট্র-সচিব-পদের সৃষ্টি হইল; এই ভারত-সচিব ইংলণ্ডের মন্ত্রি-পরিষদের অঙ্গীভূত; একজন স্থায়ী সহকারী সচিবও নিযুক্ত হইল এবং ১০ হইতে ১২ জন সভাসদ্ লইয়া একটি ভারত-মন্ত্রী-পরিষৎও গঠিত হইল। সচরাচর সময়ে, ভারতসচিব যে সকল কার্য্যোপায় অবলম্বন করেন ভারত-মন্ত্রি-পরিষদ্ তাহারই অনুমোদন করিয়া থাকেন। তবে কোন বিশেষ জরুরী কাজ উপস্থিত হইলে, ভারত-সচিব ভারত-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করিয়াই স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন করেন।

এই প্রকার পদ্ধতির একটু দোষ আছে। ইহা ভারতের স্বার্থকে, ইংলণ্ডের স্বার্থের, এমন কি পার্লামেণ্টে-অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি দলের স্বার্থের অধীন করিয়া রাখে। কিন্তু উক্ত দুই দেশের মধ্যে ঐক্যের যে বীজ মন্ত্রটি রহিয়াছে, উহা উহাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থা-অনুসারে, নিরন্তর অনন্যস্ম পরিবর্ত্তিত হইবে। গোড়ায়, কয়েক লক্ষ মনুষ্য লইয়া একটি জাতি, কোটি কোটি মনুষ্যের বাসভূমি এক মহাদেশকে বশীভূত করে। কিন্তু বিজেতাদিগের সভ্যতা বিজেতা-দিগকে এই শিক্ষা দিয়াছিল যে, স্বাধীনতার শিক্ষা দেওয়াতেও লাভ আছে; পক্ষান্তরে বিজেতাদের প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বিজিতে-রাও বুঝিয়াছিল যে, স্বাধীনতার অধিকার ও কর্ত্তব্য-সকল যারপরনাই বাঞ্ছনীয়।(১)

***

দ্বিতীয় সমস্যা—ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন

(১) বর্ত্তমান ১২ জন সভাসদ্ লইয়া "ভারত-পরিষৎ" (India Council) গঠিত। ১৮৫৮ অব্দের আইনের দ্বারা সভাসদের সংখ্যা ১৫ জন নির্দ্ধারিত হয়। তার পর, ১৮৯৩ অব্দের আইনের দ্বারা ঐ সংখ্যা কমাইয়া ১০ জন নির্দ্ধারিত হয়। ভারতসচিবের প্রস্তাব-অনুসারে ১০ বৎসরের জন্য এই সভাসদ্ সকল রাজাকর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকে। প্রায়ই, দশবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, আবার উহারা ৫ বৎসরের জন্য মনোনীত হয়। সমস্ত গুরুতর ব্যাপারে, ভারত-সচিব পরিষদের মন্ত্রণা গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি এই মন্ত্রণা উপেক্ষা করিতেও পারেন, এবং কোন বিশেষ জরুরি কাজ উপস্থিত হইলে, পরিষদ্‌কে আহ্বান না করিতেও পারেন। বিচার-বিভাগ, কোষ-বিভাগ, সমর-বিভাগ, রাজস্ব-বিভাগ, রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যের বিভাগ, পূর্ত্তকর্ম্মের বিভাগ—এই সকল বিভাগ অনুসারে, ভারত-পরিষৎ বিভিন্ন সমিতিতে বিভক্ত। এই সকল বিভাগের এক এক জন স্থায়ী সম্পাদক আছেন, তাঁহারা পরিষদের অঙ্গীভূত নহেন। ঐ সকল কার্য্যসম্পাদক বা প্রধান মুন্সী প্রায়ই ভারত-সরকারের অবসর-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

করা। অর্দ্ধশতাব্দীকাল হইতে, ভারত-সরকার 'কেন্দ্রীভূত' শাসন ও 'নিষ্কেন্দ্রীকৃত' শাসন—এই দুই প্রণালীর কার্য্যই সমাধা করিয়াছেন। কেন্দ্রীভূত শাসন এই জন্য—যেহেতু তিনটি বিভিন্ন প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য, কেবল ইংরাজকর্তৃক ভারতজয়ের সোপান-পরম্পরা স্মরণ করাইয়া দেয় মাত্র; তাই উত্তরোত্তর সমস্ত বড় বড় পদের কর্ম্ম, কলিকাতায় আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। নিষ্কেন্দ্রীকৃত শাসনের প্রয়োজন হইল এই জন্য যে, ১৮৫৮ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে প্রতিদিনই নূতন নূতন প্রদেশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইতে লাগিল;—সেই সকল প্রদেশের মধ্যে জাতিগত ভেদ, ঐতিহ্যভেদ, ভূমির প্রকৃতিভেদ, আব্‌হাওয়ার ভেদ। কাযেই তাহাদের বিশেষ বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা, বিশেষ প্রকারের বন্দোবস্ত আবশ্যক হইল। সম্ভবত এই সকল বিভিন্ন প্রদেশও, অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যান্যাডার ন্যায় অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্রশাসনের অধিকার লাভ করিবে। (২)

এই দুই সমস্যা সমাধানান্তে, এক্ষণে অনুসন্ধান করা যাক্, কি পরিমাণে ইংরাজি মতামত ও ভারতীয় মতামত ভারত-ব্রিট্রেনীয় রাষ্ট্রের সংগঠন-কার্য্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ভারতের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় মূল-ভাবটি ইংরাজি নহে, পরন্তু ভারতীয়; যেহেতু, মূলাংশে ভারতের শাসনতন্ত্র পিতৃশাসনতন্ত্র ও অসীম কর্তৃত্বসম্পন্ন। কিন্তু তাহার পরেই, শাসনতন্ত্রঘটিত ইংরাজি মূল-ভাব, ভারতীয় মূলভাবটির তীব্রতা একটু কমাইয়া দিল, একটু সংযত করিল। বর্ত্তমানে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অসীম কর্তৃত্বসম্পন্ন হইলেও, ভাইস্‌রয় অসীম কর্তৃত্বসম্পন্ন নহেন। ইংলণ্ডে, তিনি ভারত-সচিবের অধীন।

ভারতের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক মন্ত্রণা-সভা আছে; ইহা সম্পূর্ণ ইংরাজি ধরণে

---

(২) কেন্দ্রীকরণ চেষ্টার পথে, এখনো কতকগুলি সংস্কার সাধন করিতে বাকি আছে; যথা,—এখন যেমন ইংলণ্ডের ভারতসচিবকর্তৃক, ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিকদিগের মধ্য হইতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গভর্ণর মনোনীত হয়—তাহা না হইয়া, ভাইস্‌-রয় কর্তৃক ঐ দুই গভর্ণর মনোনীত হওয়াই উচিত। লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরদিগের ন্যায় উঁহাদিগের ভাইস-রয়ের অধীনে থাকাই উচিত—ইংলণ্ডীয় মন্ত্রীসভার সহিত সাক্ষাৎভাবে উঁহাদের পত্রব্যবহার থাকা উচিত নহে।

নিষ্কেন্দ্রীকরণ চেষ্টার পথে, যে সকল প্রধান-প্রধান সংস্কার সাধিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে—যথা;—প্রথমে লর্ড-মেয়ো প্রদেশগুলিকে কোষ-সম্বন্ধীয় কতকটা স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন; বঙ্গদেশের জন্য, (১৮৬১) উত্তর-পশ্চিমে প্রদেশগুলির জন্য (১৮৮৭) ব্রহ্মদেশ ও পঞ্জাবের জন্য, (১৮৯৭) ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি। শিক্ষা সম্বন্ধে, পূর্ত্তকর্ম্ম সম্বন্ধে, পুলিশ প্রভৃতির সম্বন্ধে, প্রদেশগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা উপভোগ করে। বোধ হয় আর কতকগুলি সংস্কার আবশ্যক হইবে। বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর, গভর্ণর উপাধি লাভ করিতে পারেন। মধ্য-ভারতের প্রদেশগুলি ও আসামের চীফ্‌-কমিশনার লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর উপাধি লাভ করিতে পারেন। সকলেরই এক একটা শাসনকার্য্যনির্ব্বাহক পরিষৎ (Executive Council) থাকা আবশ্যক; তাহারাই মন্ত্রীসভার স্থান অধিকার করিবে। এই সংস্কারটি বিশেষরূপে ব্রহ্মদেশ ও

গঠিত এবং ইহা মন্ত্রি-পরিষদের স্থলাভিষিক্ত। ভারত-সচিবকর্তৃক ৫জন সভাসদ মনোনীত হইয়া থাকে। এবং ভারতের প্রধান সেনাপতি এই পরিষদের একজন অতিরিক্ত সভাসদ্। ইহার ছয়টি বিভাগ আছে; এই ৬ বিভাগের অধ্যক্ষ ছয়টি সচিব। কোষাধ্যক্ষ সচিব, পূর্ত্তকর্ম্মাধ্যক্ষ সচিব, আভ্যন্তরিক ব্যাপারের সচিব, কৃষি ও রাজস্বের সচিব, স্থলযুদ্ধ ও নৌযুদ্ধের সচিব, বিধিব্যবস্থার সচিব, পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সচিব এবং সামন্তরাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সচিব।

একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে; ইহাও ইংরাজি ধরণে গঠিত। ইহার বিলম্বিত ক্রমবিকাশ, ব্রিটিশ-পার্লে-মেণ্টের ক্রমবিকাশকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রথমে ইহা ভাইস্‌রয়ের একটা সাদাসিধা পরামর্শ সভামাত্র ছিল, তাহার পর স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট ও স্বাধীন মতের অধিকারী হইল, এবং ১৮৯২ হইতে ভারতের ভাবী রাষ্ট্রীয়সভার প্রথম-আকার ধারণ করিল। ভাইস্-রয়, সেনাপতি, সচিববর্গ, বঙ্গের লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর সমেত, ১৭ হইতে ২৩ জন পর্য্যন্ত ইহার সভাসদ্ সংখ্যা।(৩) অন্যান্য সভাসদ, সরকারের কর্ম্মচারীমণ্ডলী হইতে, জজ্ ও কৌঁশুলির মধ্য হইতে, অথবা কোন কোন নির্ব্বাচন মূলক সভাসমিতি হইতে, ভাইস্-রয় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই সভা, আইন-জারি সম্বন্ধে মতামত প্রদান করে, বার্ষিক আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব পরীক্ষা করে; কিন্তু যেহেতু সরকারী কর্ম্মচারিদিগেরই সংখ্যাধিক্য, সুতরাং, যে বাদানুবাদ প্রকাশ্যরূপে হইয়া থাকে ও সংবাদপত্রাদিতে সমালোচিত হয়, সেই বাদানুবাদের কেবল একমাত্র লক্ষ্য—যতদূর সম্ভব সরকারকে সকল বিষয়ে ভাল করিয়া ওয়াকিব-হাল করা।

এই কেন্দ্রগত কর্তৃমণ্ডলীর নীচে, কতকগুলি বড় বড় শাসন-বিভাগ আছে। দুই প্রেসিডেন্সি:—বোম্বাই ও মাদ্রাজ। এই দুই বিভাগের গভর্ণর সাক্ষাৎভাবে ভারত-সচিব কর্তৃক মনোনীত হয়। ইহার পর আর সাতটি প্রদেশ:—বঙ্গদেশ, মিলিত-প্রদেশসমূহ (উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা), পাঞ্জাব, ও ব্রহ্মদেশ;—এই সকল প্রদেশ লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরের অধীন। মধ্যভারতের প্রদেশসমূহ ও আসাম, চীফ্ কমিশনরের অধীন; এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত-প্রদেশ (১৯০১ খৃষ্টাব্দে সৃষ্ট হয়) ভাইস্-রয়ের একজন প্রতিনিধি কর্ম্মকর্ত্তার অধীন।(৪) মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে; বঙ্গদেশ, ব্রহ্মদেশ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যুক্ত-প্রদেশসমূহ ও পঞ্জাব—ইহাদেরও এক একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে।

---

(৩) গ্রন্থকার যখন লিখিয়াছিলেন, তাহার পর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে।—অনুবাদক।

(৪) তা ছাড়া, কুর্গ, ব্রিটিস্ বেলুচিস্থান, আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জ—এই সকল স্থানেরও চীফ-কমিশনার আছে।

কিয়দংশ মনোনীত সদস্য লইয়া, কিয়দংশ নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া, কিন্তু অধিকাংশই মনোনীত সরকারী কর্ম্মচারী লইয়া এই সকল সভা গঠিত। এই সকল সভা, নিজ নিজ এলাকায় প্রযুয্য আইন প্রণয়নে মতামত প্রদান করিয়া থাকে।

ভারত ২৪৮ জেলায় বিভক্ত। গড়ে উহাদের অধিবাসী-সংখ্যা ৮৮০,০০০। এই সকল বিভাগ কালেক্টর মেজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক পরিশাসিত। এই বন্দোবস্তটা সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণের বন্দোবস্ত। কেননা, কালেক্টর (তহসিলদার) খাজনা আদায় করেন, বদমায়েশ্‌দিগকে শাসন করিবার চেষ্টা করেন, এবং তাহাদের প্রতি দুই বৎসর কাল মেয়াদের কারাদণ্ড ও হাজার টাকা পরিমাণ অর্থদণ্ড বিধান করিতে পারেন। তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একজন জয়েণ্ট-মেজিষ্ট্রেট-কালেক্টর, একজন এসিষ্টেণ্ট মেজিষ্ট্রেট-কলেক্টর এবং একজন ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহাদের হুকুম তালিম করিবার জন্য, সুপারিণ্টেডেণ্ট ও সহকারী সুপরিণ্টেডেণ্টের অধীনে পুলিস্‌ অবস্থিত। এই সকল বিভাগ আবার ১০৬১ উপবিভাগে বিভক্ত। উপবিভাগগুলি সব-ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক পরিশাসিত।

মাদ্রাজ ছাড়া, আর সকল প্রদেশেই ৫।৬টি জেলা মিলিয়া এক একটি উপরিতন শাসন-বিভাগ গঠিত হইয়াছে। এই বৃহৎ বিভাগের কর্ত্তা—একজন কমিশনার (৪৭টা কমিশনার পদ); বোম্বাই ছাড়া আর সকল প্রদেশেই এক একটা রাজস্ব-পরিষৎ আছে (Board of Revenue); তা ছাড়া সকলগুলিতেই এক একটা মুন্‌সি-দফ্‌তর আছে (Secretariate)—উহা একপ্রকার প্রাদেশিক সচিব-পরিষৎ।

বিচার-বিভাগের বন্দোবস্ত একেবারেই য়ুরোপীয় ধরণের। প্রদেশের প্রধান প্রধান স্থানে উচ্চ-আদালৎ বা প্রধান আদালৎ অবস্থিত। জেলা-বিভাগে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী জজ্‌, সবর্ডিনেট্‌ জজ্‌; উপরি-বিভাগগুলিতে মুন্‌সেফ্‌। ছোট আদালতের খুজ্‌রা মোকদ্দমা ছাড়া, কি দেওয়ানী, কি ফৌজদারী সকল মোকদ্দমারই আপীল চলে। স্থলবিশেষে, উকীলেরা ইংলণ্ডের প্রিভি-কৌন্‌সিলের নিকট পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে। (৫)

*
* *

---

(৫) যিনি জেলার জজ্‌ তিনি দেওয়ানী জজ্‌ ও ফৌজদারী জজ্‌ উভয়ই। অন্য দেওয়ানী জজ মুন্‌সিফ্‌ (১০০০ টাকা পরিমাণ পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের ক্ষমতা আছে), নির্ব্বাচিত মুন্‌সিফ, (২০০০ টাকা পর্য্যন্ত মেক্‌দারের মোকদ্দমা বিচারের ক্ষমতা আছে), সবর্ডিনেট জজ্‌ (সকল দেওয়ানী-মোকদ্দমারই বিচার করিবার অধিকার আছে; পক্ষান্তরে জেলা-জজের ১০,০০০ টাকার নীচের মোকদ্দমা বিচার করিবার অধিকার নাই)। মুন্‌সিফ্‌ ও সবর্ডিনেট জজের মোকদ্দমার আপীল জেলা-জজের নিকট আইসে।

ফৌজদারী মোকদ্দমায়, দেওরা-জজের বিচার অধিকারের নিম্নে, মেজিষ্ট্রেটের বিচার অধিকার। দেওরার জজ্‌কে সাহায্য করিয়া থাকে,—কতকগুলি আসেসার অথবা জুরী (৩ হইতে ৯ জন জুরী, প্রায়ই বিষম

এখন দেখা যাক, শাসন বিভাগের কার্য্যে দেশীয় লোকদের কতটা হাত আছে। নির্দ্দিষ্ট বিধি-অনুসারে, ইংরাজের সহিত উহাদের সমান অধিকার। কিন্তু কার্য্যত খুব অল্প ভারতবাসীই উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কখন কোন ভারতবাসীই শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহক পরিষদের সদস্য হয় নাই। (৬)

১৮৯২ অব্দের আইনে আছে—বড়লাট অথবা ছোটলাট কতকগুলি ভারতবাসীকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করিবেন এবং আর কতকগুলির নাম, নির্ব্বাচনমূলক কতকগুলি জনসভা, নির্ব্বাচনের জন্য উক্ত দুই লাটের নিকট সমর্পণ করিবেন। শাসন-বিভাগের প্রধান প্রধান পদ ভারতীয় সিভিল সর্ভিসের জন্য স্বতন্ত্র-ভাবে রক্ষিত। এই সিভিল সর্ভিসের অন্তর্ভুক্ত ১০০০ হইতে ১১০০ জন রাজ-পুরুষ সযত্নে সংগৃহীত হইয়া থাকে; এই সিভিল সর্ভিস এক শতাব্দী হইতে ভারতকে ভাল ভাল বুদ্ধিমান অর্থশুচি উদ্যমশীল কর্ম্মচারী যোগাইয়াছে। বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির প্রতিবাদীপক্ষও তাঁহাদের যোগ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতীয় সিভিল সর্ভিসের দ্বার ভারতবাসীদিগের জন্য উদ্-ঘাটিত আছে, কিন্তু ইংলণ্ডে উহার পরীক্ষা হয় বলিয়া এখনো পর্য্যন্ত অতি অল্প ভারত-বাসীই উহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। (৭)

অতএব উচ্চ-ধাপের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রায় এক মাত্র ইংরজের হস্তেই রহিয়াছে। এবং আরও দীর্ঘকাল উহা ইংরাজের হস্তেই থাকিবে। কেননা, ভারতের ধর্ম্মমত, শ্রেণীবিভাগ, জাতি প্রভৃতি এত অসংখ্য এবং এত মিশ্রিত যে, কোন এক প্রদেশ শাসন করিতে সমর্থ এরূপ দেশীয় কর্ম্মচারী পাওয়া দুর্ঘট। তাছাড়া, লোকেরা যেরূপ শিক্ষা পায় তাহাতে ভাল কর্ম্মচারী তৈয়ারী হইতে পারে না। প্রাচ্য দেশে, পদসম্ভ্রম রক্ষা করা আবশ্যক; কিন্তু এপর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দিগকে ও প্রাচীন সামন্ত-রাজবংশের উত্ত-রাধিকারীদিগকে এই শাসন বিভাগের কার্য্যে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

কিন্তু যদিও শাসনবিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ইংরাজ, তথাপি প্রায় সমস্ত সাধারণ কর্ম্মচারীই ভারতবাসী; অধিকাংশ ডেপুটি কলেক্টর (ভারতে জন্মিয়াছে এরূপ ইঙ্গ-ভারতীয়ও (ফিরিঙ্গি) ইহার অন্তর্ভুক্ত) সমস্ত সব-ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট্, প্রায় সমস্ত পুলিশ,—(কেবল সুপরিনটেণ্ডেণ্ট ও সহকারী বাদে)—ভারতবাসী।

---

(৬) একথা এখন আর বলা চলে না। অনুবাদক।

(৭) পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল—Covenanted Civil Service. Warren Hastings ও Lord Cornwallis নিজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এই নামটি তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহারা উচ্চ-হারে বেতন পাইত, এবং তাহার বদলে এই অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, উহারা বাণিজ্যে লিপ্ত হইবে না, এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিবে না।

অতএব কার্য্যত ভারতবাসীরাই ভারত শাসন করিয়া থাকে, কেবল তাহাদের উপরে, ৬।৭ শত উচ্চপদের ইংরাজ কর্ম্মচারী তত্ত্বাবধানের জন্য রহিয়াছে।

বিচার-বিভাগে, এই দুই উপাদানের মিশ্রণ কার্য্যটি আরো বেশী অগ্রসর হইয়াছে। সমস্ত বড় আদালতে ভারতবাসীরা বিচারাসনে বসিতে পারে, এবং সমস্ত নিম্নপদে ভারতবাসীরাই নিযুক্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, জেলা-জজের পদটা সচরাচর সিভিল সার্ভিসের লোককেই দেওয়া হয়। কোন কোন বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে (ডাক, টেলিগ্রাফ, পূর্ত্তকর্ম্ম, বিবরণ-সংগ্রহ, ইত্যাদি) কতকগুলিমাত্র যোগ্য ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অনুশীলনে অভিরুচি না থাকায়, ভারতবাসীরা এই সকল কর্ম্ম পাইবার জন্য চেষ্টাও করে না।

*
* *

যদিও যথেচ্ছশাসনতন্ত্রই ভারতের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি, যদিও রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য হইতে ভারতবাসী বঞ্চিত, তথাপি ভারতবাসীগণ পৌরজনের হিসাবে বিপুল স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে:—যথা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, গৃহের অলঙ্ঘনীয়তা, সম্মিলনের, আবেদনের ও সভাসমিতি স্থাপনের অধিকারলাভ এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। লর্ড রিপনের রাষ্ট্রসংস্কার, ভারতকে স্পেন, অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মানী অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে।

তাছাড়া দুইটি ইংরাজি প্রতিষ্ঠান ভারত ইংরাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি—ফৌজদারী মোকদ্দমায় জুরীর ব্যবস্থা। আর একটি—নগরাদিতে (মুনিসিপাল) পৌর-সভা ও জেলায় গ্রাম্য-সভা; এই সকল সভার উপর পুলিসের ভার, পূর্ত্তকর্ম্মের ভার; এবং উহাদের মতামত (vote) অনুসারে আবশ্যক টেক্‌স স্থাপিত হইয়া থাকে। সদস্য-সংখ্যায় একাংশ কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক এবং অপরাংশ অধিকতম-টেক্‌স-দাতা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। যদি সম্ভব হয় তবে নির্ব্বাচিত সদস্যসংখ্যা রাজকর্ম্মচারী-সদস্য সংখ্যা হইতে অধিক হওয়া চাই, ভারতবাসী-সদস্যের সংখ্যা ইংরাজ সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হওয়া চাই। লোকেরা নিজ অধিকার কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তেমন যত্নশীল ও আগ্রহান্বিত না হওয়ায়, নির্ব্বাচন-কর্ত্তারা অতিকষ্টে প্রতিনিধি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। অনেক নির্ব্বাচন-গণ্ডীর মধ্যে, নির্ব্বাচনের জন্য কোন উমেদারই উপস্থিত হয় না। অধিকাংশস্থলে সচরাচর এক শ্রেণীর লোককেই উপস্থিত হইতে দেখা যায়—হয় উকীল, নয় সংবাদ পত্রাদির লোক। কেবল বড় বড় সহরের পৌরকার্য্যনির্ব্বাহক সভাগুলি শ্রমশীলতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে।

ইংলণ্ড ভারতবাসীকে শুধু যে পৌরজনের স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহা নহে ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য স্থাপন করিয়াছেন।

ভারতে, ভারতবাসীরা বাধিত রাষ্ট্রীয় অধিকার উপভোগ করে, কিন্তু ইংরাজদিগের অধিকারও তদপেক্ষা বিস্তৃত নহে; ইংলণ্ডে

ভারতবাসীগণ নির্ব্বাচনের অধিকারী ও নির্ব্বাচনের পাত্র বলিয়া পরিগণিত; কতকগুলি ভারতবাসী ব্রিটিশ পার্লিমেণ্টে প্রবেশলাভ করিয়াছে (৮)। অবশ্য, ভারত-শাসন-বিভাগের উচ্চপদে ইংরাজেরা নিযুক্ত হয়। কিন্তু সকল দেশেই, গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা আছে এবং অনেকসময়েই, কোন এক রাষ্ট্রনৈতিকদল, প্রতিদ্বন্দী দলকে, সর্ব্বপ্রকার শাসন কার্য্য হইতে, ২০।৩০ বৎসর-কাল, বঞ্চিত করিয়া রাখে। বস্তুতঃ, আইন ইংরাজকে শুধু একটি বিশেষাধিকার দিয়াছে; ফৌজদারী নালিসে অভিযুক্ত হইলে, ইংরাজেরা বিচারার্থ হয় কতকগুলি ইংরাজ জজ পাইবে—নয়, উচ্চপদস্থ দেশীয় জজ পাইবে এবং তাহার জুরী হইবে—ইংরাজ অথবা আমেরিকান।

***

এই ভারত-ব্রিটিশ রাজ্যশাসনের ব্যাখ্যা হইতে কতকগুলি অবান্তর চিন্তা মনোমধ্যে সমুদিত হয়।

বাণিজ্য-বিস্তাররূপ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কোম্পানী ভারতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে; এবং রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইংলণ্ডাধিপতি কোম্পানীর আধিপত্যের স্থলে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। অবশ্য, কতকগুলি উদারচেতা লোক পার্লেমেণ্ট সভায় ভারতের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; অবশ্য ভারতের বড়-লাটেরা যোগ্যতা ও ধর্ম্মজ্ঞানের কতকটা পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু মূলত ভারতের স্বার্থ ব্রিটিশ সম্রাজ্যের স্বার্থের নিম্নে অধিষ্ঠিত এইরূপই বিবেচিত হইত। এবং যেহেতু রাষ্ট্রনৈতিক পুরুষেরা রাষ্ট্রনীতিজ্ঞও নহেন,

(৮) দাদাভাই নৌরোজিই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রথম ভারতীয় সদস্য। ইনি একজন পার্শী, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ৪টা সেপ্টেম্বরে, বোম্বাইনগরে জন্মগ্রহণ করেন। Elphinstone Institution-এ শিক্ষালাভ করেন। ঐ বিদ্যালয়েই তিনি গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে একটা বড় কালেজের অধ্যাপক হন। ভারতের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতিকল্পে যত সভাসমিতি ছিল, প্রত্যেকেরই তিনি শীর্ষস্থানে ছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে লণ্ডনে যে সদাগরী কুঠী স্থাপিত হয়, তিনি তাহার এক সদস্য ছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে তিনি East India Association স্থাপন করেন। ১৮৭৪ অব্দে তিনি বরদার দেওয়ান-পদে নিযুক্ত হন। বোম্বায়ের Municipal সভার সদস্য (১৮৭৪) তাহার পর (১৮৮৫) বোম্বাই প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভার দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনে (১৮৮৬) এবং নবম বর্ষের অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন (১৮৯৩)। Central Finsbury-র জন্য নির্ব্বাচিত পার্লেমেণ্টের সদস্য (১৮৯২)। London Indian Society-র সভাপতি। ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহারই প্ররোচনায় এক Royal Commission বসিয়াছিল (১৮৯৫)। ১৮৯৫ অব্দে তিনি পার্লেমেণ্টের সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হন নাই।

Sir Mancherjee Bhownaggree ইনিও একজন পার্শী। ১৮৫১ অব্দে ১৫ অগষ্টে বোম্বাইনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি Elphinstone College-এ শিক্ষালাভ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের fellow (১৮৮১), সংবাদপত্রের পরিচালক, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি বিশ্বহিতৈষী, ও রাষ্ট্রনৈতিক পুরুষ, ১৮৮৭ অব্দে ভবনগরের মহারাজার মন্ত্রী; ভবনগরের রাজ্যে তিনি নিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ অব্দে পার্লেমেণ্টের মেম্বর।

তত্ত্বজ্ঞানীও নহেন; এবং যেহেতু তাঁহাদের মতামত অতীব সংকীর্ণ, আবার, সেই মতামতের জন্য তাঁহারা গৌরব করিয়াও থাকেন, সুতরাং এই ব্রিটিশ সম্রাজ্যের স্বার্থই তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষ স্বার্থ। তথাপি ইংলণ্ডের উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির এরূপ প্রবল শক্তি (যে শক্তির প্রভাব গোড়ায় কেহই বুঝিতে পারে নাই) যে, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এমন কতকগুলি শ্রেষ্ঠ-ধরণের স্বাধীনতা ভারতবাসীকে প্রদান করা হইয়াছে, যাহা কোন প্রাচ্যদেশ ইতিপূর্ব্বে ভোগ করে নাই এবং যাহা কেবল য়ুরোপের অধিকাংশ দেশ ভোগ করিয়া থাকে।

এই সর্ব্বপ্রথম, জাতি-ধর্ম্ম-শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী কতকগুলি সমান অধিকার উপভোগ করিতেছে। এই সর্ব্বপ্রথম, সকলেই এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রীয় একতার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিকেরা ভারতকে নৈতিক একতাও প্রদান করিতে কৃতকার্য্য হইবে।

মোটকথা, যে দুই সভ্যতার মধ্যে ইতিপূর্ব্বে বৈর-ভাব ছিল ইংলণ্ড সেই দুই সভ্যতাকে একত্র মিশাইয়া দিবার ভার লইয়াছেন। এই কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে হইলে, প্রথমে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, য়ুরোপের কোন্ কোন্ রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠানাদি গ্রহণ করা ভারতের কর্ত্তব্য এবং ভারতীয় কোন্ কোন্ রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠানাদি ভারতের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ অনুসন্ধানে অনেকটা দ্বিধা হইতে পারে, অনেক ভুল হইতে পারে; কেন না, যুক্তিবিচারের দ্বারা উন্নতির সমস্ত ভাবী পরিণাম পূর্ব্ব হইতে কতকটা পরিলক্ষিত হইলেও, ক্রমবিকাশের কতটা দৌড় ও পাল্লা, একমাত্র কাল-ই তাহার পরিচয় দিতে পারে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ককারের অহঙ্কার

(বক্তা খোদ কর্ত্তা)

বকলমে স্বাক্ষরকারী:—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কি, কেন, কেমন করিয়া, প্রভৃতি প্রশ্ন-পরম্পরায় কৌতূহলোদ্রেকে এবং কার্য্যকারণ-সম্পর্কের আবিষ্কারে যখন বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও পরিণতি, তখন সে ক্ষেত্রেও আমার জয়জয়কার—কেমন কি না? প্রকৃতি ও শক্তি, উভয়ত্রই আমি। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিক আকর্ষণ (Capillarity), আকুঞ্চনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা, কেন্দ্রাতিগ

ও কেন্দ্রানুগ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, ইলেকট্রিক শক্তি, আলোক, কাচের পরকোলা, কিছুই আমাছাড়া নহে। আমিই ভূমিকম্প ঘটাই, কুজ্ঝটিকা উঠাই, মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা দেখাই, কোটালে বান ডাকাই, কম্পাসের কাঁটা চালাই। কোড্যাক ক্যামেরায়, বেকা রেকর্ডে, বায়োস্কোপে, ক্যালিডোস্কোপে, আমারই রকম রকম প্রচার। টেলিগ্রাফের টরেটক্কায় আমার আওয়াজ পাও না কি?

কিমিয়া-শাস্ত্র আমারই অধিকৃত। কেলভিন হাক্সলী ক্রুক্স্ রস্কো প্যাস্ক্যাল কেপলার্ ডেকার্ট সকলেই আমার অধীন। আরক, গন্ধক, সেঁকো, ফটকিরি, ক্ষার, দ্রাবক প্রভৃতি বাঙ্গলা নামই ধর আর এলকেলি, এলকহল, মার্করি, কার্ব্বন, ক্লোরিন, আর্সেনিক, অক্সিজেন, এসেটিক, অক্‌জ্যালিক প্রভৃতি ইংরাজী নামই ধর, আমি সকলেরই উপাদান। বাঙ্গালা করিয়া সেঁকো সৈকতকই বল আর ইংরাজী করিয়া আর্সেনিক সিলিকনই বল, আমাকে এড়াইতে পারিবে না। কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড আমারই কর্ম্ম, কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ আমারই কারখানা।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বেশীদূর যাইতে হইবে না, অঙ্কুর বা ট্যাঁকেই আমাকে দেখিবে। শরীরবিজ্ঞানে রক্তের সঙ্গে আমি মিশাইয়া আছি। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে আমিই কুস্তির ও পরিপাকের উপকারিতা শিখাই, নৃ-তত্ত্বে আমিই ককেশিয়ান জাতির শ্রেষ্ঠতা রটাই, ডার্বিন-তত্ত্বে আমিই উৎকর্ষ অপকর্ষ ক্রম-বিকাশ ঘটাই।

জ্যোতিষে পৃথিবীকে কদম্বকুসুমাকৃতিই বল আর কমলালেবুর মতই বল, আমার শরণ লইতে হইবে। কোপারনিকাসে আমি, রোমক-সিদ্ধান্তে আমি, ভাস্করাচার্য্যেও আমি। আমি উত্তরায়ণে নাই দক্ষিণায়নে আছি, রাহুতে নাই কেতুতে আছি, গ্রহ উপগ্রহে নাই নক্ষত্র ধূমকেতুতে আছি, অরুন্ধতীতে নাই কালপুরুষে আছি, ধ্রুবতারায় নাই শুকতারায় আছি। আমি অশ্বিনী-ভরণীতে নাই কৃত্তিকাতে সুদশুদ্ধ আদায় করিয়াছি, মেষ বৃষ মিথুনে নাই, কর্কট কন্যা বৃশ্চিক কুম্ভ মকরে প্রখরভাবে আছি। শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষে আমার কোন পক্ষপাত নাই। আহ্নিক বার্ষিক উভয়েই আমার গতি। রাশিচক্র, নক্ষত্রচক্র, কক্ষ্যা, অক্ষাংশ, ক্রান্তিপাত, সংক্রান্তি সর্ব্বত্র আমি।

ফলিত-জ্যোতিষে কালবেলা কুলিক বেলায়, কালরাত্রিতে, দিক্‌শূলে, ক্রূরগ্রহে, সপ্তশলাকায়, রাজযোটক মিলে, সুতহিবুক যোগে আমি আছি। জন্মকুণ্ডলীতে আমি কুণ্ডলী পাকাইয়া আছি। করকোষ্ঠী আমারই সৃষ্টি। শাকুনিক, গণক বা গণৎকার আমার বশ, এলমানাক, ক্যালেণ্ডার, পঞ্জিকায় আমার অধিকার, কার্ত্তিক মাসে শুক্রবারে আমার সঞ্চার। কালগণনায় কলাকাষ্ঠায় আমি, পলকক্ষণে আমি, শক-শাকে আমি, কল্পেও আমি। কল্যই বল, সকাল বিকালই বল, আমি কস্মিন্‌কালে তিলেকও কাহারও কাছছাড়া হই না।

অঙ্কশাস্ত্রে আঁক কাটায়, আঁক কষায়, চোকে, ইলেকে, একুনে, ঠিক দেওয়ায়, জমাখরচবাকীতে, কড়ি ও কাহনে, কাক-

কড়াক্রান্তি হিসাবে, তঙ্কায়, এক হইতে কুড়ীতে, কুড়ীধরণে ক্রয়-বিক্রয়ে, কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া বুড়কিয়া শতকিয়া প্রভৃতিতে, একক দশক হইতে লক্ষ কোটী সংখ্যায়, কাঠাকালী নৌকাকালী পুকুরকালীতে, কড়ি-কষা কাগজকষায়, কুড়ো কাঠা রেক কুন্‌কে কাঁচ্চা ছটাকে (পোয়াটেক সেরটেকেও), শুভঙ্করী মানসাঙ্কে আমারই কাণ্ড। আবার গুণনীয়ক-গুণিতকে, সঙ্কলনে, লঘুকরণে, কুসীদ ও চক্রবৃদ্ধিতে, বর্গমূল ঘনমূল নিষ্কাশনে, প্রকৃত অপ্রকৃত উভয় প্রকার ভগ্নাংশে, ত্রৈরাশিক বহুরাশিকে, দশমিক পৌনঃপুনিকে আমাকে পুনঃপুনঃ পাইবে। কোণে, কেন্দ্রে, শঙ্কুক্ষেত্রে আমার অধিকার। ত্রিকোণমিতিও আমার এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ক্যালকুলস্‌ কোয়াটারনিয়মের কথা কহিয়া আর আতঙ্কের উদ্রেক করিব না। গৌরীশঙ্কর, কে, পি, বসু ও কে, পি, চট্টোরাজের অঙ্কের কেতাবের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

ইতিহাসে, আমারই প্রসাদে অশোক কণিষ্ক বিক্রমাদিত্য শ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্ত্তী, চাণক্য বা কৌটিল্য শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, আলেকজ্যাণ্ডার বা আলিকসন্দর বা সেকন্দর দেশ অধিকারে অদ্বিতীয়, আকবর শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট্‌, মীরকাশিম বাঙ্গালার শেষ নবাব, ক্লাইভ আর্কটবিজয়ী কর্ম্মবীর। আমারই জন্য দারাসিকো সুপণ্ডিত, অশোক-পুত্র কুনাল সুশীল। স্কন্দগুপ্ত কুমারগুপ্ত, রাণা কুম্ভ, শক্তসিংহ, বক্তিয়ার কুতুবুদ্দিন সবক্তগিন আবুবকর কৈকোবাদ, অকল্যাণ্ড কর্ণওয়ালিস বেন্‌টিঙ্ক নর্থব্রুক, কেহই আমা ছাড়া নহেন। ক্লেমেন্সি ক্যানিংএ আমি, দুর্জ্জন কর্জ্জনে আমি, আবার কারমাইকেলেও আমি। শক্তাবৎকুলের শৌর্য্যবীর্য্যে আমি, আবার জাপানের হারাকিরিতেও আমি। ভিক্টোরিয়ায় বেকনস্‌ফীল্ডে আমি, কাইজার বিসমার্কে আমি, জার নিকোলাসে আমি, ফ্রেডরিক দি গ্রেটে আমি। বীরনারী কর্ম্মদেবী কর্ণবতী কমলাবতী ও কুমারী কৃষ্ণকুমারী আমার মানে মানিনী। অক্টারলোনি মনুমেণ্টে আমি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আমি, অন্ধকূপ বা ব্ল্যাকহোলে আমি, সেকেন্দ্রা কুতবমিনারে আমি, আবার কমলমীর ও চৈতককা চবুতারায় আমি। দিল্লীর তক্ত-তাউসে আমিই আসীন। কুরুক্ষেত্র মুদকী ফতেপুরশিক্রী কালঞ্জর-অবরোধ, ব্যানকবর্ণ কিলীক্র্যাঙ্কি ফ্যালকার্ক ম্যাল-প্লাকেট ব্যালাকলাভা প্রভৃতি বহু লড়াই আমার পরাক্রমে ফতে হইয়াছে।

আমারই প্রসাদে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার সভাকবি রায়গুণাকর ও তাঁহার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি। রসসাগরের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত ও নিবাস বাড়েবাঁকা আমারই অধিকারভুক্ত। ক্ষিতীশ-চন্দ্র ক্ষৌণীশচন্দ্রও আমার অনুগ্রহে বঞ্চিত নহেন। আধুনিক বাঙ্গালায় রামকৃষ্ণ বিজয়-কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন শিশিরকুমার, কৃষ্ণ বন্দ্যো কৃষ্ণদাস পাল, তারক পরামাণিক, তারকনাথ পালিত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, জানকীনাথ ঘোষাল প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ লোক আমার অনুগৃহীত!

কৃষ্ণপান্তি ও কান্তবাবু, রাজা নবকৃষ্ণ ও মহারাজ নন্দকুমার, দ্বারকানাথ ঠাকুর

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব কমলকৃষ্ণ দেব, কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ, জয়কৃষ্ণ মুখো জ্যোৎকুমার মুখো প্রভৃতি আমারই প্রসাদে ধনে মানে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, কান্তিচন্দ্র মুখো, কালিকাদাস দত্ত ও এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যো আমার কৃপায় ওরূপ উচ্চ পদ পাইয়াছিলেন।

খগোল-ভূগোলে যোজক, উপত্যকা, অধিত্যকায় আমাকে পাইবে। আমি সুমেরুতে নাই কুমেরুতে আছি, বিন্ধ্যাচলে নীলাচলে নাই কুলাচলে লোকলোকাচলে আছি, হিমালয়ে নাই মৈনাকে আছি, ধবলগিরিতে নাই কাঞ্চনজঙ্ঘা-গৌরীশঙ্করে আছি, রামগিরি খণ্ডগিরিতে নাই ত্রিকূট চিত্রকূটে আছি, পঞ্চবটীতে নাই দণ্ডকারণ্যে আছি, দধিদুগ্ধসমুদ্রে নাই ক্ষারোদক্ষীরোদে আছি, উত্তমাশায় নাই কুমারিকায় আছি, গঙ্গাযমুনা সরস্বতী গোমতী গোদাবরীতে নাই, কাবেরী করতোয়ায় আছি। নদীর কথা যদি উঠিল, তবে আরও বলি—কৃষ্ণনগরের কঙ্কণা, বর্দ্ধমানের বাঁকা, যশোরের কপোতাক্ষ এবং ময়ূরাক্ষী শীতললক্ষা দারুকেশ্বর কুমার কুশী কাঠযুড়ী কর্ণফুলী কর্ম্মনাশা কীর্ত্তিনাশা প্রভৃতি অনেক নদনদী কুলকুলরবে আমার কীর্ত্তিকথা কহিতেছে। কাশী কাঞ্চী কোশল কলিঙ্গ কেরল বাহ্লীক কর্ণাট কৌশাম্বী কাশ্মীর কাম্বোজ কাছ কান্যকুব্জ কর্ণসুবর্ণ অমরকোট মঙ্গলকোট তক্ষশিলা ব্যাকৃট্রীয়া কাবুল কান্দাহার—কোথায় আমি নাই? তুরস্ক বল্‌কান কনস্তান্তিনোপলে আমি, ডেনমার্ক কোপেনহেগেনে আমি, আবার কাফ্রীর দেশ আফ্রিকায়ও আমি। শুধু তাহা কেন, আমারই খাতিরে নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের নাম আমেরিকা। আমারই চক্রান্তে কোর্টেজ মেক্সিকো জয় করেন।

ক্যালিকাট ক্যানানোর কুম্ভকোণম্ কঞ্জিভেরম্ কোটা শিকাবতী বিকানীর কর্পূরতলা কুচবিহার কাছাড় কুমায়ুন, সব আমার এলাকাভুক্ত। আবার ভারতের বাহিরে কোচিন হংকং মলকাস কোরিয়া টোকিও ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত আমি হল্লা করি। মগের মুল্লুকে আমি, লঙ্কায় কলম্বোয় আমি, কামস্কটকায় আমি, কেপ কলোনিতে আমি। প্রাচীন গান্ধারকে কান্দাহারে পরিণত করা আমারই কারসাজি। আমি সাহেবলোকের স্বর্গ সিমলা দার্জ্জিলিঙ্গে নাই, কিন্তু স্বর্গের শিঁড়ি কালকা কর্সিয়ঙ্গে আছি। বাঁকীপুর কিউল কাটিহার মোকামা কানপুরে লক্ষ্ণৌ-এ আমি আড্ডা করিয়াছি। লুণ্ডিকোটাল কাটগুদাম কোডারমা কাটরাস লকসর তুমকা প্রভৃতি বেমক্কা নাম আমারই সৃষ্টি। আমি খাস বাঙ্গালার কৃষ্ণনগর বাঁকুড়া ঢাকাকুমিল্লায়, বিক্রমপুর বাকলায়, মুক্তাগাছা ভাগ্যকুলে আছি, কায়েথীর মুলুক বাঁকীপুরে আছি, আবার কাঁচা উড়ের দেশ উৎকলে ভদ্রক কটকে আছি। কুষ্টিয়া কুমারখালি কৃষ্ণগঞ্জ চাকদহ, অম্বিকাকালনা কাটোয়া, কোঁড়া ক্ষীরগ্রাম কাগ্রাম কোগ্রাম কুলীনগ্রাম কাঞ্চননগর, খানাকুলকৃষ্ণনগর, কেন্দুলী কুলিয়া কালিকাপুর, কোড়কদী কৈকালা কুচিয়াকোল কাওয়াকোলা করচমারিয়া কাড়াপাড়া কাঁদোয়া কড়কড়ে কুড়্‌লগাছি

কাঁচিকাঁটা কাজীরবাজার কালিয়াকর কাল-কেওট কুচকুচিয়া, কলসকাটী ও অন্যান্য কাটী এবং বকলমে স্বাক্ষরকারীর ক্ষুদ্র গ্রাম কাঁচকুলি প্রভৃতি নামের তালিকা দিয়া আর কাণ ঝালাপালা করিতে চাহি না।

কলিকাতায় আমি দুই পদে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাই ইহা সেরা সহর। কলিকাতার কাছাকাছি অনেক স্থানেও আমার অধিকার আছে। কালীঘাট ভূকৈলাস শালকিয়া রামকৃষ্ণপুর পদ্মপুকুর পাইকপাড়া কাশীপুর কুঠীঘাটা কড়েয়া কাঁকুড়গাছি কামারডাঙ্গা চড়কডাঙ্গা নার-কেলডাঙ্গা কোদালিয়া পোর্ট ক্যানিং কাঁকনাড়া কাঁচড়াপাড়া বারাকপুর দক্ষিণেশ্বর কোন্নগর—আর কত কহিব?

কলিকাতার ভিতরে ত আমার জয়-জয়কার। কম্বুলেটোলা কপালিটোলা কলু-টোলা কুমারটুলি কাঁটাপুকুর নেউগিপুকুর মুরারিপুকুর হোগলকুড়িয়া কাঁসারিপাড়া পালকীপাড়া মাণিকতলা কালীতলা, সর্ব্বত্র আমি। আমি চাঁপাতলায় পটোলডাঙ্গায় নাই—বৈঠকখানায় আছি, বৌবাজারে নাই—টিকটিকিবাজারে আছি, নেবুতলায় নাই—কেরাণীবাগানে আছি, নিমতলায় নাই কাশীমিত্রের ঘাটে আছি। পথেঘাটেও আমাকে পাইবে। কলেজষ্ট্রীট কর্ণওয়ালিস-ষ্ট্রীট কটনষ্ট্রীট ক্লাইভষ্ট্রীট ক্রসষ্ট্রীট করপোরে-শ্যানষ্ট্রীট কীডষ্ট্রীট ক্যামাকষ্ট্রীট পার্কষ্ট্রীট সার্কুলার রোড ক্রীক রো স্কটলেন কানাই ধরের লেন, সর্ব্বত্র আমার গতিবিধি। হাইকোর্টের ঘাটে কালপিনের ঘাটে কয়লা-ঘাটে তেলকলঘাটেও আমি। আমি ইডন-গার্ডেন বীডনগার্ডেনে নাই—কলেজস্কোয়ার কর্ণওয়ালিসস্কোয়ার ও কর্জ্জনপার্কে আছি, চাঁদনীতে নাই—কালীশীলের বাজারে আছি, হেমিলটনের বাড়ী নাই—কুক কেলভীর দোকানে আছি, স্মিথের বাথগেটের বাড়ী নাই—স্কট টমসন বা ক্রীষ্ট্যাল আইস কোম্পা-নীতে আছি, উইলসনের হোটেলে নাই—কেলনার কোম্পানীর কাছে আছি। থ্যাকারের পুস্তকালয়ে, ডোয়ারকিন্‌সনের ঘরে, ম্যাকেঞ্জি লায়ালের নীলামে, ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির বাড়ী আমার গতিবিধি আছে।

জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইলে আমাকে চাইই। কৃষিকার্য্যে ক্ষেত্রকর্ষণে কৃষক-কৃষাণে আমি, বণিকের ক্রয়-বিক্রয়ে, ট্রেড মার্কে, জাঁকোরে কেনায়, হকারের (haw-ker) ঝাঁকায় আমি; ঢেঁকিকুলো মাকুটেকো হইতে কল কারখানা দোকান কারবার কুঠি কন্‌সার্ণ ফ্যাক্টরী কোম্পানী পর্য্যন্ত সকলই আমার কীর্ত্তি। কলকাঠি কলকব্জা কপিকল মাপকাঠি আমিই গড়াই, কলের কুলী আমিই খাটাই, পাটকোষ্টা আমিই কাটাই, ঠিকাদার কন্‌ট্রাক্টর নক্সা আমিই যোটাই, পব্লিক্ ওয়ার্কস্ কষ্টমস্‌হাউস কুৎঘাট লোকো আফিস্ আমিই বসাই।

হাকিম উকীল মোক্তার কৌনসুলী, পেশকার কেরাণী শিক্ষানবীশ নকলনবীশ, সকলেই আমার এলাকাভুক্ত। হাইকোর্টে স্মলকজকোর্টে, কালেক্টারী কাছারীতে, চৌকী মহকুমায়, হাকিমের হুকুমে, মোকদ্দমা বা কেসে, একরার বা স্বীকারোক্তিতে, ডিক্ল্যারেশানে, ক্লেমে, ফোরক্লোজে, কবুল জবাবে, চুক্তি কনট্রাক্ট বা কড়ারে, কিস্তি-

বন্দীতে, বকলমে বা স্বকলমে স্বাক্ষরে, মুচলেকায়, সাক্ষীতে, কমিশনে সাক্ষ্যে, ডিক্রীজারীতে, ক্রোকে, বেকসুর খালাসে, কোতে, কাঠগড়ায়, চাবুকে, কঠিন পরিশ্রম সহ কারাদণ্ডে, ফাটকে আটকে, ফাঁসী কাঠে লটকানয়, আমাকে পাইবে। আমি উইলে নাই, কডিসিলে আছি, উত্তরাধিকারীতে নাই এক্জিকিউটরে আছি, রেগুলেশ্যানে নাই এক্টকোডে আছি, আইনে নাই কানুনে আছি, ধারায় নাই সেকশ্যানে আছি, জজ মেজেষ্টারে নাই করোনারে কমিশনরে আছি। হাইকোর্টে অনুকূল মুখো ও দ্বারকানাথ মিত্র বিচারকদ্বয় আমার মুখ রাখিয়াছেন, স্যার বার্ণেস্ পীকক হইতে সার লরেন্স জেঙ্কিন্স্ পর্য্যন্ত সাহেব প্রাড্ বিবাকগণও আমার ক্লেম পাকা করিয়া দিয়াছেন।

শান্তিরক্ষক পুলিশের কোতোয়ালীতে আমাকে পাইবে। সেকালের কোটাল, একালের ইন্স্পেক্টার কন্ষ্টেবল, আমার অধীন, চৌকীদারের ত কথাই নাই। ডাকাতে, অকুস্থানে, সেনাক্ত করায়ও আমি।

মহাজনের রোকা রোকড় মোকররর, কুর্চ্চিনামা, ক্ষতি বা লোকসান, কর্জ্জ, বন্ধকী, কস্ত খত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, সর্ব্বকর্ম্মে আমি।

জমিদারের পাইক বরকন্দাজ কারপরদাজ বকসী কারকুন আমিই নিযুক্ত করি, কোরফা প্রজার আমিই পত্তন করি, ধরপাকড়ে পলাতকা প্রজাও আমার কঠোরতায় ঘটে। থাকবন্দী, একন্দাজ, শিকস্তিপয়স্তি, কায়েমী স্বত্ব, কর্ণওয়ালিশের কীর্ত্তি, তালুকমুলুক সরিক, সর্ব্বত্রই আমি। কোটকোবালা কবুলিয়ত তমঃশুক মোকাবিলা কড়চা কবজ নাকচ বাকী বকেয়া নিকাশ প্রকাশ পথকর পব্লিক ওয়ার্কস্ সবই আমার কারসাজি।

লোক্যাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, মিউনিসিপাল করপোরেশন, সেক্রেটারী, সভ্যতার এসকল অঙ্গেই আমি বিরাজ করিতেছি। কন্গ্রেস কন্ফারেন্স কন্ভেন্শ্যান, কমিটি আমিই বসাই, বয়কট পিকেটিং করিতে আমিই শাসাই, কমিশন আমিই যোগাই, ক্যান্ভ্যাসার আমিই যোটাই, কন্ডোলেন্স কন্গ্রেচ্যুলেশান আমিই পাঠাই, প্রোক্ল্যামেশান ডিক্লারেশন আমিই রটাই, কন্ষ্টিটিউশ্যানাল এজিটেশ্যান আমিই ঘটাই। ক্যাপিটেলের ম্যাক্সে আমি, র‍্যামজে ম্যাকডোন্যাল্ডে আমি, তিলকেও আমি।

যুদ্ধের কাণ্ডেও আমি কম যাই না। কেল্লা বারিক ক্যাণ্টনমেণ্ট কমিসেরিয়াটে কুচকাওয়াজে পদাতিকে পতাকায় কন্দাবারে আমি আছি, ক্যাপ্টেন কর্ণেল এডিকং আমার হাতধরা, কিচনার ক্রীগ ক্রুজ্ঞি কমারফ বরনেকাফ মল্টকে জেলিকো ব্রেক্ ড্রেক্ ক্র্যাডক্ আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ। কামান বন্দুক ক্যাপ কার্ত্তুজে আমি, নালিকাস্ত্রে আমি, কিরিচ কুক্রীতে আমি, কোদণ্ডকার্ম্মুকরুপাণে আমি, কঞ্চুক কিরীট কুণ্ডল কটিবন্ধে আমি, ক্ষত্রিয়ের হুঙ্কারটঙ্কারেও আমি। কোম্যাগ্যাটামারুর নানা কথা আমিই রটাই, কোকাস্-কীলিংএর কাছে এম্ডেন আমিই ফাটাই।

আবার কেবল সংহারকার্য্য আমার ব্যবসায় নহে, জীবনরক্ষাকল্পে চিকিৎসা কার্য্যও আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত নহে। বৈদ্যক শাস্ত্রে চরক তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষী। আমারই কৃপায় উক্ত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তি কবিরাজ নামে পরিচিত। আমি বায়ুপিত্তে নাই, কিন্তু কফে আছি। আবার আমারই প্রকোপে বাতপিত্ত ক্রূর হয় এবং বিকার ও সান্নিপাতিক বটে। কুষ্ঠ, কোষ্ঠবদ্ধ আমরক্ত, রক্তপিত্ত প্রভৃতি কুৎসিত রোগ, বাধক, সূতিকা, ঠোন্‌কা প্রভৃতি স্ত্রীরোগ, তড়কা, ধনুষ্টঙ্কার, কৃমি যকৃৎ প্রভৃতি বালরোগ, যক্ষা, ক্ষয়কাস, ক্ষত, পক্ষাঘাত, কম্পজ্বর কালাজ্বর, আধকপালে, দাঁতকপাটি, কাঁওল, কুম্‌রী, ফিকবেদনা, বাতিক, চুলকানি প্রভৃতি রকমারী রোগ, সবই আমার কারসাজি। আমিই অশোক, বাসক, ঘৃতকুমারী, কণ্টিকারি, কুকসিমে, কালমিঘে, ওলটকম্বল প্রভৃতি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাই, বটিকা মোদক বা মোড়কে চূর্ণ ঔষধ দেওয়াই, কঠিন রোগে কস্তুরি মকরধ্বজ সূচিকাভরণ কুঁচলে বিষ খাওয়াই। পুটপাক আমারই গুণে ঔষধ প্রস্তুত করার প্রকৃষ্ট প্রণালী। আবার আমি ফাঁক পাইলে টোট্‌কা ঝাড়ফুক তুকতাকও চালাই।

কেবল কবিরাজ কেন, ডাক্তার কম্‌পাউণ্ডার হকিম অবধৌতিক চিকিৎসক সকলেই আমার কৃপাভিখারী। হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসায় আমিই শেষরক্ষা করি। অক্সিপ্যাথির পথেও আমি চলি। টনিক, মিক্‌শ্চার, এম্‌ব্রোকেশান, ক্যাপ্‌সুল, ব্যাক্ষর-কেক আমিই যোগাই। স্মলপক্‌স্‌-নিবারণে ভ্যাক্‌সিনেশন বা টিকা, কলেরায় ক্যাম্‌ফর, চুলকুনিতে কিউটিকিউরা বা কার্ব্বলিক সাবান, কাটাকাটির কাযে ক্লোরোফর্ম আমারই ব্যবস্থা। ব্রন্‌কাইটিস্‌, ক্রুপ, কলিক, কার্ব্বঙ্কল, কলেরা, স্মলপক্স, সবই আমার কার্য্য। আধুনিক রোগতত্ত্বে মশক, মূষিক, মক্ষিকা ও ধূলিকণার রোগসঞ্চার-ক্ষমতা আমারই আবিষ্কার। ক্ষেপা কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক নিবারণের জন্য ক্ষতস্থানে লোহাপোড়ার বদলে কষ্টিক লাগান ও সাবেক গোদলপাড়ার পরিবর্ত্তে কশৌলি পাঠান আমারই কর্ত্তৃক। এপিডেমিক এন্‌ডেমিক স্পোরেডিক তিন রকম রোগ সঞ্চার, এসেপ্‌টিক এন্টিসেপ্টিক উভয় প্রকার চিকিৎসা, ষ্টেথোস্কোপ দিয়া বুকপরীক্ষা, ক্লিনিক্যাল থার্ম্মোমিটার দিয়া তাপপরীক্ষা, ফার্ম্মাকোপিয়া ও মেটিরিয়া মেডিকা অনুসারে প্রেস্‌ক্রিপশ্যান, পকেটকেসে অস্ত্রসংগ্রহ, সবই আমার যোগসাযোগে। সিন্‌কোনা কুইনিন ক্যাস্‌ক্যারা কাষ্টর অয়েলের গুণ গাহিবার সময় আমার কথা কহিও। এলোপ্যাথিক—লাইকার, হাইড্রোস্যানিক হাইড্রোক্লোরিকে, ষ্ট্রীকনিয়া ক্যান্থারাইডিস ক্লোরোডাইন ক্যাজিপুটি অয়েলে, হোমিওপ্যাথিক— একোনাইট ইপিকাক ক্যামোমিলা মারকিউরিয়াস্‌ করোসিভাসে আমি অজস্র পরিমাণে আছি। কাহিল লোকের পথ্য ক্যাসাভা ট্যাপিওকা (কে সি বসু) বিস্কুট বল্‌কা দুধের ভিতরেও আমি।

হোমরাচোমরা ডাক্তার সকলেই আমার হাতধরা। তা' ম্যাকনামারা ম্যাকোনেল ম্যাকৃলাউড কোট্‌স্‌ ক্রম্বি লুকিস ক্যালভার্টই

বল, আর কে ডি ঘোষ কে পি গুপ্ত, ডাক্তার সরকার বা ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী, গুডীব সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী বা সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, এস কে মল্লিক কেদার দাস কালী বাগচি প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য অক্ষয় দত্ত চন্দ্রশেখর কালীই বল।

যাক্, আর অধিক বিদ্যা না চট্কাইয়া আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে শিক্ষার কোন দিকেই আমি কোণঠেসা নহি। তাই মূর্খের চূড়ান্ত গালি 'ক' অক্ষর গোমাংস! ক খ শেখায়, কাকের ছা বকের ছা লেখায়, কোদালে ক বা আঁকুরে ক, কাঁকে কলসী ঋ, ইত্যাদি অক্ষর-পরিচয়ে, কঞ্চ করাত ইত্যাদি সঙ্কেতে আমারই শরণ লইতে হয়। কলাপাতায় লেখা, মক্স করা, কলমের কচ কাটা, কসি টানায় আমি, আবার কাগজে লেখা (ক্রীমলেড ফুলস্‌ক্যাপ হইলে ত কথাই নাই), কপিবুকের অনুকরণে লেখা, কার্ব্বন কাগজে নকল বা কাপি করা, কমা কোলন সেমিকোলন কোটেশন মার্ক লাগান, বুককীপিং, ডকেটিং, সবই আমার কল্যাণে। কেরাণীর কাণে কলম আমার কৃপায়। কালী কলম কাগজ—আমি না হইলে কোনটিই পাও না। প্রাথমিক শিক্ষায়, শিশুশিক্ষায় ও শিশুবোধকে, দাতা-কর্ণ গুরুদক্ষিণা কলঙ্কভঞ্জন ও চাণক্যশ্লোকে আমি, আধুনিক কিণ্ডারগার্টেনেও আমি। মুসলমানের মুক্তাবে আমি, নোক্তায় আমি। স্কুল কামাই করিলেও আমাকে এড়াইতে পারিবে না। ঠেকে শেখাতেও আমাকে চোখে ঠেকিবে।

শিক্ষক, পরীক্ষক, পরিদর্শক, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, পাঠক (Reader!), কেহই আমার কাছে নিমকহারামি করেন না। শিক্ষা ও পরীক্ষায় আমি, প্র্যাক্‌টিক্যালে ও মৌখিকে আমি, ক্লাস সেক্‌শ্যান কম্‌বিনেশ্যানে আমি, কারিকিউলামে কোর্সে আমি, ক্যালেণ্ডারে আমি, কী ক্র্যাম ক্রীব (Crib) ও 'কোশ্চেনে' আমি, নোট টোকা কণ্ঠস্থ করায় আমি। স্কুল কলেজ একাডেমিতে আমি, ক্লাব কমন-রুমে আমি, ঋষিকুল গুরুকুলে আমি। ভেকেশ্যানেও আমি, কন্‌ভোকেশ্যানেও আমি। সিণ্ডিকেট ফ্যাকল্টীতে আমি, স্কলারশিপ পারিতোষিক পুরস্কার পদক কেয়ূরে আমিই। আমিই শেক্‌স্পীয়র, বার্ক বেকন কূপর কোলরিজ স্কট কীট্‌স্ ডিকেন্‌স্ লবক কোর্স করিয়াছি, কিছু কাল অপেক্ষা করিলে মেরি করেলি কোনান ডয়েল ভিক্টোরিয়া ক্রস এলা উইলকক্সও কোর্স করিব দেখিতে পাইবে। আমিই এন্‌ট্র্যান্সকে ম্যাট্রিকুলেশান বলাইয়াছি, কিণ্ডারগার্টেন আবিষ্কার করিয়াছি, কৃষি-কলেজ কমার্শ্যাল কলেজ কারিগরি ও কলাশিক্ষার স্কুল খুলিয়াছি, বাঁকিপুরে খোদাবক্স পুস্তকালয় বসাইয়াছি, কাশীম-বাজারের কৃষ্ণনাথের কীর্ত্তিরক্ষাকল্পে কলেজের নাম বদলাইয়াছি, সেকালে থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীকে এবং একালে ক্যাম্বে কোম্পানীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তকের কায়েমী প্রকাশক করিয়াছি। এস্ কে লাহিড়ী, ম্যাক্‌মিল্যান কোম্পানী ও ব্ল্যাকি এণ্ড সনকেও আমি নেকনজরে দেখি।

স্কুল-কলেজের মধ্যে আমি বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায়, সংস্কৃত কলেজে, কটক

কলেজ কটন কলেজে, কৃষ্ণনগর কলেজ কৃষ্ণনাথ কলেজে, ঢাকা কলেজ কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে, ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ স্কটিশ চার্চ্চেস্‌ কলেজে, কেশব একাডেমি টি কে ঘোষের একাডেমিতে টিকিয়া আছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভুক্ত কায়স্থ পাঠশালা ও ক্যানিং কলেজেও আমি উকিঝুকি মারিতেছি। আবার মেডিক্যাল কলেজে ক্যাম্বেল স্কুলে আর জি করের স্কুলেও আমি। তক্ষশিলায় আমি ছিলাম, অক্সফোর্ড কেমব্রিজে কেয়স্‌ কলেজ ক্লেয়ার কলেজে, কর্পস্‌ ক্রিষ্টিতে, ক্ল্যারেণ্ডন প্রেসে, ক্রেভ্‌ন্‌ ক্ল্যাসিক্যাল স্কলারশিপে, কলেজ ক্যাপে আমি। আর কলিকাতায় ত আমি দুঘোড় হইয়া বসিয়াছি। বকেয়া ভাইস্‌চ্যান্সেলার ব্রাহ্মণ আশুতোষ স্বয়ং সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি হইয়াও 'ক' অক্ষরের নাগাল পান নাই, কুলীন কায়স্থ সর্ব্বাধিকারী কিন্তু অক্লেশে আমাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্‌!

অশোকের কথা

বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। গানে গন্ধে রঙে পৃথিবী ভরপুর! কিন্তু আজ এ আনন্দের দিনে সে কোথায়? যাহার কোমল রক্তিম চরণ দুটির চঞ্চল গতিতে সমস্ত আকাশ বাতাস সাড়া দিয়া উঠিত সেই আনন্দময়ী আজ কোথায়? ওগো; তোমরা কেহ আমার গৌরীকে ডাকিয়া দাও! আমি একবার তাহাকে দেখি!

আমি অশোক। বসন্তের আগমনে যখন চারিদিকে নবজীবনের সাড়া পড়িয়া যায়, দক্ষিণা বাতাস বহিতে থাকে, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তবর্ণ কুসুমসজ্জায় ভরিয়া ওঠে। আমি অশোক! লোকে বলে, কোনো বিশেষ দিনে আমার ফুল খাইলে নিত্যশোকসমাকুল সংসারে শোক থাকে না! তাই আমার ফুল, পুরাঙ্গনাদের নিকট পরম আদরের বস্তু। সংসারে যে শোক অবশ্যম্ভাবী সেই সর্ব্বজয়ী শোককেও আমি জয় করিয়াছি, তাই আমি অশোক! এতদিন আমি নিজের গৌরবে নিজেই বিভোর ছিলাম,—আজ আমার সে গর্ব্ব চূর্ণ করিল কে!

যেদিন তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সেও এমনি এক ফাল্গুনের অপরাহ্ণ। সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। মৃদুল বাতাসে আমার আশপাশের ছোট ছোট গাছগুলি আমোদে মাতিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। যদিও আমি তখন খুব বড় হই নাই, তবুও আমার কাছে যারা ছিল, তাদের চেয়ে আমি বয়সে অনেক বড়। তাই আমি তাদের সঙ্গে বড়-একটা মিশিতাম না। তারা যখন নেহাৎ ছেলেমানুষের মত বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে হাসিয়া লুটোপুটি খাইত, তখন আমি গম্ভীর ভাবে তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতাম। কখনো কখনো সঙ্গীর অভাবে আমার জীবন বড় দুর্ব্বহ বোধ হইত; কাহাকেও ভালবাসিবার জন্য, কাহারও

স্নেহ পাইবার জন্য সময়ে সময়ে আমার অন্তর তৃষ্ণাতুর হইয়া উঠিত। মানুষের মত বৃক্ষজীবনের ভিতরও যে ভালবাসিবার প্রবৃত্তি উন্মুখ হইয়া থাকে, তোমরা মানুষ —এ কথা বিশ্বাস করিবে কি?

কি বলিতেছিলাম? হাঁ! সেদিনের কথা! সেদিন অপরাহ্নে আমি মাথা উঁচু করিয়া আমার চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে একবার দেখিয়া লইতেছিলাম। দিনের আলো তখন নিভিয়া আসিতেছিল। রাখাল-বালকের উদাস বাঁশির তান কতদূর হইতে উতলা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

কিছুদূরেই চাটুয্যেদের পুকুর। তার চারিধারে সার-বাঁধা তাল ও সুপারি গাছের ছায়া ধীর বাতাসে জলের উপর পড়িয়া কত বিচিত্র চিত্র লিখিয়া দিতেছিল। ঘাটে রমণীগণের হাসির উচ্ছ্বাস, গল্পের গুঞ্জন-ধ্বনি মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল। আমি অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ কে যেন উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিয়া উঠিল—বাবা! বাবা! দেখ! এ গাছটির আগাগোড়া লাল ফুলে ফুলে একবারে ভরে গেছে! এটা কি ফুলের গাছ বাবা?

কি মধুর স্বর তার! আমি মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, কৈলাস চাটুয্যে তার ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া বাগানে বেড়াইতেছে। আমি অবাক্ হইয়া সেই টুকটুকে মেয়েটির মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। কি সুন্দর তার সেই হাসিভরা মুখখানি! এক লাফে বাপের হাত ছাড়াইয়া সে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল! তার সেই কচি কচি হাত দুখানি দিয়া আমার নীচেকার ডাল নোয়াইয়া সে ফুল ছিঁড়িতে লাগিল। সেই কোমল স্পর্শে আমার সারা অঙ্গ একটা চঞ্চল বিহ্বলতায় শিরশির্ করিয়া উঠিল।

তখন হইতেই আমরা দুজনে প্রগাঢ় একটা মায়ার বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেলাম। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বেই গৌরী আমার কাছে ছুটিয়া আসিত। তাহার সঙ্গিনী কতকগুলি বালিকাকে লইয়া আমার ছায়ায় সে খেলাঘর পাতিয়া খেলা করিত। তাহাদের কচিগলায় কলরবে, ছোট পায়ের ছুটাছুটিতে, তরল হাসির তরঙ্গে বাগান মাতিয়া উঠিত। এই আনন্দের হিল্লোল আমার গায়ে আসিয়া লাগিত;—আমার সমস্ত দেহ যেন মুদিয়া আসিত। দুপুর বেলা তার মা তাহাকে কাছে লইয়া শুইতেন, তিনি একটু চোখ বুজিলেই গৌরী চুপি চুপি আমার কাছে পলাইয়া আসিত। কোনো কারণে বাড়ীতে কেহ কিছু বলিলে সে অভি-মানের বেদনায় ছুটিয়া আসিয়া আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত। আমি যখন আমার কচি শাখাগুলি তাহার কপোলে বুলাইয়া দিতাম, তখন তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সব ব্যথা আমার সেই নির্ব্বাক স্নেহস্পর্শে জুড়াইয়া যাইত। সুখে দুঃখে সকল সময়েই আমার গৌরী আমার কাছেই ছুটিয়া আসিত। দিনের কাজ শেষ করিয়া দিনমণি যখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িতেন, আমি তৃষিত নেত্রে পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম,—কখন্ আমার হাস্যময়ী গৌরী তাহার কলহাস্যের লহরী তুলিয়া

বাগানে বেড়াইতে আসে। তোমাদের আর কত বলিব?—তাহাকে পাইয়া আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সকল অভাব পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এমনি করিয়া আমি অতি সুখে দিন কাটাইতেছিলাম।

২

গৌরীর বাপের নাম কৈলাস চাটুয্যে। কৈলাসের সংসারে—পত্নী সাবিত্রী, পুত্র অমরনাথ ও কন্যা গৌরী ব্যতীত আর কেহই নাই। অবস্থা সামান্য; অল্প জমীজমার উপসত্ব হইতে সংসার চলে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নীর সুশৃঙ্খলার গুণে দরিদ্র সংসারেও বিশেষ কোনো অভাব নাই। অমরনাথ গ্রামে জেলাস্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লইয়া কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছে।

সেদিন প্রভাতে কৈলাসচন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। পূর্ব্ব-রাত্রে ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথ ঘাট এখনও কর্দ্দমসিক্ত। বর্ষণস্নিগ্ধ গাছপালার শ্যামল পত্রপল্লবে বড় বড় জলের ফোঁটায় রোদ পড়িয়া ঝকঝক করিতেছে। সাবিত্রী ঘর-দুয়ার ঝাঁট দিয়া বাসিপাট সারিতেছেন। গৌরী একটা সাদা বিড়ালছানা লইয়া এতক্ষণ খেলা করিতেছিল, হঠাৎ কি মনে হইতে বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল। তাহার একটি গুণ ছিল সে মুখ বুজিয়া একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারিত না। আসিয়াই বলিল—দেখ বাবা, কাল যখন ঝড় উঠল, আমি তখন মার সঙ্গে আম-কুড়োতে বাগানে গিয়েছিলুম। অনেক আম হয়েছিল। আমি আমগুলো

আনতে দিলে না। মা আমাকে কোনো কাজ করতে দেয় না কেন বাবা?

কৈলাসচন্দ্র তাহার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিলেন—তুমি যে এখন এত-টুকু ছেলেমানুষ মা! তুমি কি এখন কাজ করতে পার? আগে বড় হও, তখন তুমিও আবার কত কাজ করবে।

এ কথাটা গৌরীর তেমন ভাল লাগিল না। সে ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—হ্যাঁ! আমি ছোট বই কি! কেন ওই ক্ষেন্তী বামী ওরা ত আমার চেয়ে আরো কত ছোট, তারা তবে কি করে কাজ করে?

কৈলাসচন্দ্র এ কথার কোনো সদুত্তর না পাইয়া গভীরভাবে তামাকে মনোনিবেশ করিলেন। গৌরীও সেজন্য ব্যস্ত না হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিল—কাল আমি কি পেয়েছি তা বুঝি এখনও তোমায় বলিনি বাবা? দেখ, ঝড়ে একটা ছোট শালিকের ছানা তার বাসা থেকে গাছ-তলায় পড়ে গিয়েছিল, আমি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটাকে—

—বাবাজি! কি হচ্ছে তোমাদের? বলিতে বলিতে পাড়ার হরিনাথ মুখুয্যে ওরফে হরি খুড়ো আসিয়া উপস্থিত। সময় কাটাইবার মত এমন উত্তম সঙ্গী পাইয়া কৈলাসচন্দ্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, সাগ্রহে বলিলেন—এস, এস, খুড়ো! তোমার যে আর দেখাই পাই না। কোথায় ছিলে এতদিন?

শালিক-ছানার ইতিহাস শোনাইবার পথে বাধা পড়ায় গৌরী আর সেখানে দাঁড়াইল

হাত হইতে হুঁকাটি টানিয়া লইলেন, পরে অর্দ্ধমুদিত নেত্রে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—আমার কি একতিল সময় আছে বাবাজি! জান ত এ গ্রামটিতে—মনে কর গে—আমি না হলে ত কারুর কিছু হবার যো নেই। যখন যার কোনো দায় উপস্থিত অমনি ডাক খুড়োকে! তা এই—মনে কর—আমারও ঐ যে কেমন একটা চক্ষুলজ্জা আছে এই মুখের ওপর—মনে কর—কারুকে 'না' কথাটি বলতে পারি নি। বলি যাক বাপু! না হয় আমারই একটু কষ্টের উপর দিয়ে গেল। তবুত—মনে কর—পরের একটা উপকার হয়। কি বল বাবাজি?

কৈলাসচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—তা ত বটেই খুড়ো! তুমি আছ বলেই যার আমরা এখনও পাহাড়ের আড়ালে রয়েছি। জানি, যাই হোক না কেন, ভাবনা নেই,—খুড়ো যখন রয়েছেন!

খুড়ো তখন উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—বল ত বাবা! বল ত! এই নিয়ে তোমার খুড়ী—মনে কর—রোজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। বলে, তোমার এ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাওয়া কেন? আমি বলি—মনে কর—আমি তখন বলি—আরে তুই মূখ্যু স্ত্রীলোক—তুই এ সবের মর্ম্ম কি বুঝিস্? এই—ধর না কেন—শাস্ত্রে আছে—

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন—তা যাক্ গে সে কথা! এখন—তুমি আজ সকালে কি মনে করে বল দেখি? তোমরা হলে কাজের লোক, বিনা কাজে ত কোথাও এক পা চল না।

খুড়ো তখন হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ! হ্যাঁ! বাবা! ঠিক বলেছ! দরকার একটু আছে বই কি। এই মনে কর—ও পাড়ার মতি রায় আমায় কাল ডেকে পাঠিয়েছিল, তা আমায় ত জান—পরের উপকার হবে—তাতে ত—মনে কর—না বলতে পারি নি। তা গেলুম। মতি রায় বলে—খুড়ো! গৌরীর সঙ্গে আমার রমেশের সম্বন্ধ করতে হবে। মেয়েটি তোমার—মনে কর—দিব্বি ছবির মত কি না—তাই ওদের বড় পছন্দ হয়েছে। তা বাবাজি, মতি রায় লোক ভাল—আমায় খুব খাতির যত্ন করে;—বলে খুড়ো! গৌরীকে তোমায় আমার বউ করে দিতেই হবে। আমি বললুম—তা কৈলাস বাবাজি ত আমার অবাধ্য নয়, বিশেষ—মনে কর—তার মেয়েটিও ত বড় হয়েছে। তা হবে না কেন?

কৈলাসচন্দ্র এ কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন—আমি এখন গৌরীর বিয়ে দেব না মনে করেছি খুড়ো! সে এখন নেহাৎ ছেলেমানুষ। তার মায়েরও ইচ্ছা যে আরও দিন কতক যাক।

খুড়ো এ কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার আফিঙের মহিমায় ঢুলু ঢুলু চক্ষু ছুটি সহসা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—সে কি বাবাজি, গৌরীর বয়স ত এগারো পার হয়েছে। এ বয়সে—মনে কর—মেয়েদের ছু বছর বিয়ে হয়ে যায়। তার এখনো বিয়ের বয়স হয় নি, বল কি?

কৈলাস বলিলেন—বিশেষ আমি ত

জানি রমেশ অনেক দিন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে; যত সব বদ ছোকরাদের সঙ্গে বখামী করে বেড়ায়। তার সঙ্গে কি করে গৌরীর বিয়ে দেব?

খুড়ো বলিলেন—রাধামাধব! কে তোমাকে এ সব কথা বলে বল ত? রমেশ অতি সৎ ছেলে—তবে একটু আধটু যা দোষ—তা মনে কর—কিছুই নয়—ও বয়স-কালে অমন সকলেরই হয়ে থাকে। বিয়ে হলে, ঘরকন্না হলে ও সব কিছুই থাকবে না।

কৈলাস নীরব রহিলেন।

খুড়ো বলিলেন—আরও দেখ! মতি রায় নির্ধন লোক নয়! তার ঘরে—মনে কর—তোমার মেয়ের কোনো কষ্ট হবে না। আর তোমার কাছে সে কিছু চায়ও না। তা—যদি তুমি শুধু মেয়েটি দাও তাতেও সে না বলবে না। তোমার অবস্থা ত জানি—ভাল করে মনে বিবেচনা করে দেখ। তোমার ভালর জন্যই আমার এত করে বলা।

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন—খুড়ো! তুমি যে আমার ভালর জন্যই বলছ তা কি আমি বুঝছি না? তবে কথা এই—তুমি ত জান, গৌরী আমার কত স্নেহের ধন। আমি তাকে মূর্খ অমানুষের হাতে দিতে পারব না। আমি বড়-ঘর চাই না, তবে ছেলেটি একটু মানুষের মত দেখে দিতে হবে ত? আমি এ সম্বন্ধে রাজী হতে পারলুম না। কিছু মনে কোরো না খুড়ো!

ব্যর্থমনোরথ হইয়া খুড়ো একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—আমি বুঝেছি, আজকাল তোমার সাহেবী মত হয়েছে। ছেলেকে কালেজে পড়তে দিয়েছ, বারো বছরের মেয়েকে বল ছেলেমানুষ—আমি বলছি কিন্তু—মনে কর—এতটা দর্প ভাল নয়। এক পয়সা লাগতনা, এমন ঘরটা ছেড়ে দিলে, এর পরে—মনে কর—এর জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে।

খুড়ো চলিয়া গেলেন। কৈলাসচন্দ্র অন্য-মনা হইয়া ভাবিতে ভাবিতে অনেকখানি কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন।

৩

এ ঘটনার অনেক দিন পরে একদিন বৈকালে গৌরী আমার কাছে বসিয়া কোঁচড়ে এক রাশ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে-ছিল। আমি একমনে তাহার দিকে চাহিয়া-ছিলাম। কেহ কোথায় ছিল না। হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলাম, দুটি যুবক আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। একটু অগ্রসর হইয়া একজন ডাকিল—গৌরি! কি হচ্ছে এখানে বসে?

গৌরী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল। তার পরেই এক লাফে ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল।—ওমা! দাদা যে! তুমি কখন এলে দাদা?

কোঁচড়ের ফুলগুলা সব ছড়াইয়া পড়িল।

অমরনাথ বলিল—এই ত আসছি। তুই ভাল আছিস ত? দেখ দেখি আমার সঙ্গে ইনি কে, চিনতে পারিস?

গৌরী অনেকক্ষণ আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিল—আমি ত এঁকে কখনও দেখিনি।

অমরনাথ হাসিয়া বলিল—ইনি আমার একজন বন্ধু। আমার মত ইনিও তোর দাদা হন, বুঝেছিস ত?

গৌরী হাঁ বলিয়াই দাদার হাত ছাড়িয়া

—ও মা! দাদা এসেছেন—বলিতে বলিতে বাড়ীর ভিতর ছুটিল।

শুনিলাম অমরের সঙ্গে বিমলের বড় বন্ধুত্ব। দুজনে কলেজে একসঙ্গে পড়ে। বিমল কলিকাতার কোন্ এক ধনী উকিলের ছেলে। পাশ দিয়া ছুটির সময় অমরের সঙ্গে কিছু দিনের জন্য পল্লীগ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছে।

দুই বন্ধুকে সর্ব্বদাই একসঙ্গে বাগানে বেড়াইতে দেখিতাম। কখনও বা দুজনে পুকুর-ঘাটে বসিয়া মাছ ধরিতেছে দেখিতে পাইতাম। আর গৌরী? তাহার কথা আর কি বলিব? সে এখন আর আমার কাছে বড়-একটা আসে না। দুই দিনের মধ্যেই বিমলের সঙ্গে তার ভাব হইয়া গিয়াছে। নূতন বন্ধুকে পাইয়া সে আমাকে এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। হায়! মানুষের মন কি চঞ্চল!

গৌরী এখন আর নিজের খেলাতেও মন দিতে সময় পায় না। দাদাদের লইয়াই সে ব্যস্ত। প্রথম পরিচয়ের পরেই সে বিমলকে তাহার খেলাঘর, তাহার পুতুল, তাহার পাখী বিড়ালছানা সব দেখাইয়াছে। সে যতগুলি রূপকথা জানিত সে সবগুলি শোনানো হইয়া গিয়াছে। এখন সর্ব্বপ্রকারে নিঃসম্বল হইয়া সে তাহাদের সকল প্রকার ফরমাস খাটিবার ও ছিপ, চার ইত্যাদি বহিবার ভার লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত।

সেদিন অমরনাথ বাড়ী ছিল না, কোথায় গিয়াছিল। বিমল তাহার প্রতীক্ষায় স্নানে না গিয়া ঘরে একলা একখানি বই লইয়া শুইয়াছিল। ক্রমে বেলা বেশী হইতেছে দেখিয়া সাবিত্রী আসিয়া বলিলেন—বাবা! অমর ত এখনও এলনা, তুমি আর কতক্ষণ বসে থাকবে? স্নান করে এসে ভাত খেয়ে নাও।

বিমল বই রাখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—আর একটু তার জন্য দেখি মা! সে এলে একসঙ্গে দুজনে নাইতে যাব অখন। বোধ হয় তার আর বেশী দেরী হবে না।

সাবিত্রী বলিলেন—না বাছা! তুমি আর দেরী কোরো না। তার এসব অনিয়ম সহা অভ্যাস আছে। তোমরা সহরে বাঁধা নিয়মে থাক—তবু এখানে এসে তোমার কত অনিয়ম হচ্ছে, কত কষ্ট হচ্ছে।

এমন সময়ে গৌরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বিমলের হাত ধরিয়া টানা-টানি বাধাইয়া দিল—ও বিমল দাদা! পুকুরের মাঝে দুটো পদ্ম ফুল ফুটেছে দেখে এলুম। আমাকে এনে দেবে এস না!

সাবিত্রী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—ছি গৌরি! ওঁকে অমন করে বিরক্ত কোরো না। উনি কি মাঝ-পুকুরে অত জলে গিয়ে পদ্ম তুলতে পারেন?

—"না পারেন না বই কি! দাদা পারে আর উনি পারেন না! উনি যেন এখনও কচি খোকা—বড় হন নি! সে হবে না! তুমি এস একবার দাদা!"

সাবিত্রী বিমলকে বলিলেন—শোন বাবা! একবার পাগলের কথা শোন! ওকে নিয়ে আমার এক এক সময়ে এত ভাবনা হয় যে কি আর বলব? অত বড় মেয়ে হল, এখনও ওর ছেলেমানুষী গেল না।

কাকে কি বলতে হয় সে জ্ঞান নেই। পরের ঘরে গিয়ে যে ওর কি দুর্দ্দশা হবে আমি তাই দিনরাত ভাবি।

বিমল হাসিয়া সস্নেহে গৌরীর মুখের দিকে চাহিল, বলিল—আমি ত সাঁতার জানি না গৌরি! অত জলে কি করে যাব?

—সাঁতার জান না? গৌরী অবাক হইয়া গেল!—তুমি এত বড় হয়েছ, সাঁতার শেখনি?

কি করে শিখব গৌরি? আমাদের দেশে ত পুকুর নেই।

এবার গৌরী একেবার বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল! পুকুর নেই সে আবার কেমন দেশ! মাগো! সেখানে তবে লোকে থাকে কেমন করে?

বাড়ী ফিরিয়া যাইবার আগের দিন বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে বিমল বলিল—গৌরি! কাল আমি বাড়ী যাব। শুনেছ ত? বাবা চিঠি লিখেছেন।

গৌরী বলিল—হ্যাঁ! শুনেছি। তুমি না গেলে তাঁরা খুব রাগ করবেন, না দাদা?

বিমল বলিল—না রাগ করবেন না, তবে অনেকদিন এসেছি এইবার যেতে ত হবে?

গৌরী বলিল—তবে আর কিছুদিন থাক না দাদা! তুমি চলে গেলে আমাদের বড় মন-কেমন করবে। মা ত সেদিন তোমার যাবার কথা শুনে কেঁদে ফেল্‌লেন।

বিমল খানিক চুপ করিয়া বলিল—আচ্ছা গৌরি! তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে থাকতে পার?

গৌরী চুপ করিয়া রহিল।

বিমল বলিল—আমি যদি তোমায় নিয়ে যাই তা হলে আমার সঙ্গে যেতে তোমার ভয় করবে?

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—না, ভয় করবে না। কিন্তু আমি ত মা আর বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। তাঁরা যখন যাবেন, আমি তখন যাব।

সেদিন রাত্রে আহারের পর কৈলাসচন্দ্র বিমলকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—বিমল! অমরের কাছে যে কথা শুনলুম তা কি সত্যি?

বিমল নতমুখে বলিল—হাঁ!

৪

শীঘ্রই রাষ্ট্র হইয়া গেল কলিকাতার এক বিখ্যাত ধনী উকীলের ছেলের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ। গ্রামের লোকে প্রথমত কথাটা বিশ্বাস করিল না, উড়াইয়া দিল। অবশেষে যখন সমস্ত পাকাপাকি হইয়া সব স্থির হইয়া গেল, বরপক্ষ হইতে গৌরীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল, তখন সকলে একবারে অবাক হইয়া গেল। কৈলাস চাটুয্যের মত দরিদ্রের, তিনটা পাশ করা রূপে গুণে ধনে মানে এমন জামাই? ব্যাপারটা কিসে কি হইল কেহ ঠাওরাইতে পারিল না, চারিদিকে এই বিবাহের কথা লইয়া নানারূপ কল্পনা জল্পনা চলিতে লাগিত।

পাড়ার হিতৈষিণীর দল আসিয়া সাবিত্রীকে বলিতে লাগিল—তা যাই বল ভাই! যে যেমন লোক, তার তেমনি দরের লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে হয়। হাজার হোক,

তারা হল সহুরে বড়লোক—তাদের যুগ্যি আদর যত্ন তত্ত্বতাপাস করা—এসব কি আর তোমরা পেরে উঠবে? একটু ত্রুটি হলেই তখন দেখবে উঠতে বসতে খোঁটা খেতে খেতে মেয়ে তোমার সারা হয়ে যাবে। গঞ্জনার জ্বালায় মেয়ে মাকের জলে চোখের জলে হবে।

সাবিত্রী অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির, বেশী কথা বলিতে জানেন না। তিনি বলিলেন—আজকের দিনে দিদি, আর ও সব কথায় কাজ নেই। তাঁরা যখন আমার অবস্থা দেখেই দয়া করে গরীবের মেয়ে ঘরে নিচ্ছেন তখন আমাদের আর কি বলবার আছে? এখন তোমরা সকলে আমার গৌরীকে মন-খুলে আশীর্ব্বাদ কর—আমার কাঙ্গালের ধন সে—বেঁচে থাক সুখী হোক্!—বলিতে বলিতে তাঁহার স্নেহমাখা স্নিগ্ধ চোখদুটি জলে ভরিয়া গেল।

বিমলের পিতা নবীনবাবু, ছেলের একান্ত জেদ দেখিয়া গৌরীর সহিত তাহার বিবাহ দিতে মুখে সম্মতি দিয়াছিলেন বটে কিন্তু ছেলের এই অবাধ্যতায় মনে মনে তিনি রুদ্ধ অভিমান ও রাগে জ্বলিতেছিলেন। তিনি বিমলকে নানারূপে বোঝাইতে ত্রুটি করেন নাই। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া একটা নেহাৎ নগণ্য লোকের মেয়েকে ঘরে আনা যে বিষম নির্ব্বুদ্ধিতা,—এ কথা তিনি তাহাকে অনেক বোঝাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। বরঞ্চ সে জেদ করিয়া বসিল যদি ও মেয়ের সঙ্গে বিবাহ

বিবাহ করিবে না। নবীনবাবু ছেলের প্রকৃতি জানিতেন; একবার যে কাজে সে না বলে তাহাকে আর কিছুতেই হাঁ বলানো যায় না। কাজেই তিনি সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথ ধরিলেন। সহজ কথায় যেখানে কাজ বাগানো যায় না—চাতুরী খেলিয়া সে কাজ কেমন করিয়া উদ্ধার করিতে হয় এতদিনের ওকালতিতে সে অভিজ্ঞতায় তিনি পাকা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—আচ্ছা, এ বিবাহে আমার মত আছে।

(৫)

গৌরীর গায়েহলুদ হইয়া গিয়াছে। আর চার দিন পরে বিবাহ। কৈলাসচন্দ্র একমাত্র কন্যার বিবাহে অবস্থার অতিরিক্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার বাড়ী আত্মীয়কুটুম্বে পরিপূর্ণ। সকলেই প্রফুল্লমুখে শুভকার্য্যে ব্যস্ত। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভাল ভাল কাপড় পরিয়া চারিদিকে কলরব করিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই আনন্দিত; কেবল বাহিরের বাগানে সকাল বেলাকার নহবতের করুণ-রাগিণী যেন আমারই মনের বেদনাকে সুর দিয়া ফুকারিয়া উঠিতেছিল। আমার মনটা প্রতিক্ষণে দারুণ বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। আমার গৌরী—এই এতদিনের স্নেহ ভালবাসার বন্ধন সব ছিন্ন করিয়া আর দুই দিন পরে কোথায় চলিয়া যাইবে!

গায়-হলুদের পরদিন সকালবেলা নবীন বাবুর বাড়ীর সরকার কৈলাসচন্দ্রকে একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রে নবীন বাবু লিখিতেছেন,—যদিও বিমলের ও আমার একান্ত

ইচ্ছা ছিল যে মহাশয়ের কন্যার সহিতই এ শুভকার্য্য হয়, কিন্তু গৃহিণী প্রথম হইতেই এ সম্বন্ধে অসম্মত ছিলেন। আমরা বহুকষ্টে তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া একরকম মত করাইয়াছিলাম। কিন্তু কাল বৈকালে কমলকুঠীর জমীদার শ্রীযুক্ত কামিখ্যা বাবু ঘটকী দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে তিনি নগদ পাঁচ হাজার টাকা, কন্যার তিন হাজার টাকার গহনা, এবং দানসামগ্রী বরাভরণ বাবদে দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া বিমলের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে রাজী আছেন। এই সম্বন্ধ পাইয়া আমার গৃহিণী একবারে বাঁকিয়া বসিয়াছেন। তিনি কাহারও কথা শুনিবেন না;—এইখানেই ছেলের বিবাহ দিবেন। আমি অনেক বুঝাইলাম—ভদ্রলোকের এক কথা—বিশেষ যখন গায়ে হলুদ হইয়া গিয়াছে—তা তিনি কোনো কথাই শুনিতে চান না। আমার পীড়াপীড়িতে অনেক কষ্টে এইটুকু হইয়াছে যে যদি আপনি বিবাহের রাত্রে অন্তত চারি হাজার টাকার জোগাড় রাখিতে পারেন তবেই কার্য্য সমাধা হয়—নতুবা বাধ্য হইয়া ঐ দিনে কামিখ্যা বাবুর বাড়ী বর পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে। এ কথা আপনাকে লিখিতে আমি যথেষ্ট লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইতেছি, কিন্তু উপায় কি? আপনিও ভাবিয়া দেখিবেন, আপনার যেরূপ জামাতা হইতেছে তাহার তুলনায় টাকার পরিমাণ কিছুই নয়। যেরূপ স্থির হয় সংবাদ দিবেন, সেইমত ব্যবস্থা হইবে।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া কৈলাসচন্দ্র বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। অমরনাথ তুলিয়া লইল। পরক্ষণেই ঘৃণায় ও ক্রোধে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে পত্রটা মোচড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—বাবা! আমি এখনি বিমলের কাছে যাই। তাকে জিজ্ঞাসা করব—এ সব ব্যাপার কি? বলিয়া পাগলের মত সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল!

মুহূর্ত্তের মধ্যে এ কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। বাহির-বাড়িতে নহবতের একটা দীর্ঘ তান আকাশের দিকে উঠিতেছিল, হঠাৎ যেন তাহা ছিঁড়িয়া গেল। যে যেখানে যে কাজ করিতেছিল তাহা অমনি পড়িয়া রহিল। সকলেই স্তব্ধ। বাড়ীর সব উৎসব আনন্দ নিভিয়া গিয়া একটা আশঙ্কার কালো ছায়া গভীরভাবে ঘনাইয়া আসিল। সাবিত্রী ভাঁড়ার ঘরে ভাঁড়ার গোছাইতে গোছাইতে শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেলে সুবচনীর পূজা মানসিক করিতেছিলেন, সেখানে এ সংবাদ পৌছিলে তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে কৈলাসচন্দ্রের বাহিরের ঘরে গ্রামের লোক একবারে ভাঙিয়া পড়িল। যাহারা এ বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া অবধি মনের মধ্যে স্বস্তিবোধ করিতেছিল না, আজ তাহাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? মহা আস্ফালন করিয়া তাহারা বলিতে লাগিল—আমরা ত তখনই জানতাম যে এ বিবাহে এ রকম একটা কাণ্ড ঘটবেই! যার যেমন অবস্থা তার তেম্নি থাকাই ভাল। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাওয়াই বা কেন?

হরিনাথ খুড়ো বলিলেন—এ আর তোমরা

আমি ত আর-বছর কৈলাস বাবাজিকে বলেই দিয়েছিলাম যে কাজটি ভাল হল না। মনে কর—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে, এর ফল ভুগতে হবে না? রমেশের মত এমন জামাই—মনে কর -লোকে ভাগ্য বলে মানে, ওঁর কি না তা পছন্দই হল না।

মতি রায়ও উপস্থিত ছিল, সে চোখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—এ যে তোমার অন্যায় কথা খুড়ো! কৈলাস ভায়া দেখে শুনে ভাল জামাই আনবেন, আমার রমেশকে ওঁর কি পছন্দ হতে পারে? ও কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছিল। তা যাক্, এটা যদি নেহাৎ হাত-ছাড়াই হয় তাতে ক্ষতি কি? অমরনাথের আরও কত বন্ধুবান্ধব আছে। গৌরীর বিয়ের ভাবনা কি?

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ন্যয়লাম্বরের জন্য দশ বছরের মেয়েকে একটি পঞ্চাশ বছরের পাত্রের হাতে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহের বছর পাঁচেক পরেই মেয়েটির শ্বশুর বাড়ীর সব বালাই ঘুচিয়া গিয়াছে। এখন সে সিঁথার সিঁদুর মুছিয়া থান পরিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাপের ঘরে দুবেলা ভাত রাঁধিতেছে। মতি রায়ের কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য অবাক হইয়া গালে হাত দিলেন, বলিলেন—বল কি মতি ভায়া! রমেশকে ওঁর মনে ধরে না? মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে, শাস্ত্রের শাসন অমান্য করবার যো নেই! তার পরে কার কি হবে না হবে সে ভাবনায় আমাদের দরকার কি? অদৃষ্টে যদি সুখ থাকে ত যার হাতেই দাও, মেয়ে সুখী হবেই! এ যে কৈলাসের অতি দর্পের কথা শুনতে পাই!

কৈলাসচন্দ্র নীরব নিস্তব্ধ। প্রতিবেশীদের টিটকারী তাঁহার বুকে তীক্ষ্ণ শেলের মত বাজিতেছিল। কিন্তু তিনি কাহারও কথার কোনো উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। তিনি হতাশ হইয়া মনে মনে কেবলই তোলাপাড়া করিতেছিলেন—এ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি উপায়? চার হাজার টাকা! সে যে তাঁর স্বপ্নেরও অতীত! এত টাকার জোগাড় করা কিছুতে তাঁহার ক্ষমতায় কুলাইবে না। সামান্য বাড়ীখানি ও জমীজমা বন্ধক রাখিয়া না হয় হাজার টাকা কষ্টেসৃষ্টে সংগ্রহ করিতে পারেন। আর তিন হাজার টাকা? কে ধার দিবে? তাঁহার এমন কি আছে যে লোকে বিশ্বাস করিয়া এত টাকা দিতে পারে? এদিকে টাকা না সংগ্রহ হইলে বিবাহের দিনে কামিখ্যা বাবুর বাড়ীতে বর যাইবে। ১২।১৩ বৎসরের এত বড় মেয়ে—গায়ে হলুদ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, কি উপায় হইবে! জাতি কুল যায়, মান সম্ভ্রম যায়,—টাকা চাই-ই! কিন্তু কোথা হইতে এ টাকার জোগাড় হইবে?

বেলা দ্বিপ্রহরের পর স্নানাহারের অনুরোধে কৈলাসচন্দ্রের হিতৈষী বন্ধুগণ কিছুকালের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। কৈলাস তখনও একলা সেই ঘরে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে কেহ স্নান আহার করিতে ডাকে নাই, তাঁহার নিজেরও সে কথা মনে ছিল না।

বেলা ক্রমশ বাড়িয়া চলিল। নিস্পন্দ কৈলাসচন্দ্র যখন কোনোদিকেই ভাবনার কূল কিনারা পাইতেছিলেন না, সেই সময় হঠাৎ গৌরী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। মোটা বেলফুলের

মত শুভ্র সুন্দর মুখখানি তাঁহার মুখের উপর রাখিয়া আবদার করিয়া বলিল—বাবা! বেলা হয়েছে! নাইতে চল না! বাবা! মা কাঁদছে কেন? কি হয়েছে তোমাদের বাবা?

কৈলাস রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া একবার তাহার দিকে চাহিলেন। দুঃখে অভিমানে তাঁহার অন্তর ফুলিয়া উঠিতেছিল। আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া গৌরীকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন—দূর হয়ে যা সর্ব্বনাশি—আমার সামনে থেকে! হয় তুই মর, আর না হয় ত আমার মরণ হোক!

গৌরী অবাক হইয়া গেল। বাড়ীতে কি হইয়াছে? মা কাঁদিতেছেন, কাজ কর্ম্ম সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কাহারও মুখে কথা নাই, জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ তাহাকে কিছু বলে না, সকলেই নীরব স্তম্ভিত। এই ত সকালে সে বাগানে খেলা করিতে গিয়াছিল, তখন ত কিছুই হয় নাই।

বেলা হইলে কেহ খাইতে না ডাকায় ক্ষুধায় কাতর হইয়া গৌরী মায়ের কাছে গিয়াছিল। মা তখন ভাঁড়ার ঘরে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া মা আদর করিয়া ডাকিলেন না, খাবার দিলেন না,—কেবল অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরী কত জিজ্ঞাসা করিল, কত কথা বলিল, মা কিছুই বলিলেন না। মায়ের কান্না দেখিয়া তাহারও কান্না আসিতেছিল কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হইল বাবাকে ধরিয়া আনিতে পারিলেই সব সমস্যা কাটিয়া যাইবে, তাই সে বাবার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যখন কৈলাসচন্দ্র তাহাকে গালি দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন তখন সে একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পিতার নিকট এমন অনাদর সে কখনো পায় নাই। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু যেন ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল —আমি কি দোষ করিয়াছি! কেন আমার উপর সকলের এত রাগ! অভিমানে দুঃখে তাহার হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে কোথাও স্থান না পাইয়া সেই আগেকার মত আবার আমার কাছে আসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমার গৌরী! আজ কয় দিন বিবাহের গোলমালে, বহু লোকসমাগমে ব্যস্ত থাকায় সে আমার কাছে আসে নাই। সুখের সময় সে আমায় ভুলিয়াছিল, আজ যখন দুঃখের দিনে বাড়ীতে কোথাও স্নেহাশ্রয় মিলিল না; তখন সে সেই ছোটবেলার মত আমারই বুকে ফিরিয়া আসিয়া বেদনার অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

তাহার পরে—তাহার পরের কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়—সমস্ত দিন সে শুষ্ক মুখে শূন্য মনে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সে মুখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বাড়ীর বাহিরে, পথে ঘাটে, স্থানে স্থানে স্ত্রীপুরুষেরা তাহার বিবাহের কথা লইয়া জটলা পাকাইতেছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে সেই সব কথা নানা লোকের মুখে নানা প্রকারে শুনিয়া শুনিয়া সে মোটামুটি ব্যাপারটা একরকম বুঝিতে পারিল। তখন মায়ের সেই নীরব রোদন, বাপের সেই হতাশায় ক্ষিপ্তপ্রায় মুখ তাহার মনের মধ্যে কেবলই প্রবলভাবে ঘা দিতে লাগিল।

তাহার জন্যই ত আজ মা বাপের এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা,—পাড়ায় সকলে আজ তাঁহাদিগকে কত কথা বলিতেছে, কত টিটকারী দিতেছে। সে কি করিবে? কি করিলে তাঁহাদের সব বেদনা দূর হইবে? ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে কেবলই কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যার সময় যখন সে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে আপনার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল তখন প্রবল জ্বরে তাহার আর চৈতন্য রহিল না।

কৈলাসচন্দ্র সেই-যে হঠাৎ মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গৌরীর সহিত কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা দিনের মধ্যে কেবলই তাঁহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। গৌরীর সেই স্তম্ভিত কাতর মুখ মনে হইয়া তিনি কোথাও স্থির হইতে পারিতে ছিলেন না। একবার তাহাকে বুকে লইয়া আদর করিবার জন্য তাঁহার স্নেহকাতর চিত্ত আকুল হইয়া উঠিতেছিল। নিজের মাথার উপরে যে গুরুভার বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে সে কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি চারিদিকে গৌরীকে খুঁজিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ঘরে ফিরিয়া দেখিলেন, প্রখর রৌদ্রতাপিত যূথিকার মত সোনার গৌরী বিছানায় লুটাইতেছে।

গভীর রাত্রে গৌরী একবার চোখ খুলিল। মাকে ডাকিল—মা!

—কি মা।

—"এই যে আমি মা আমার!" কৈলাস তাহার মাথাটি কোলে তুলিয়া লইয়া গভীর স্নেহে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বাপের আদরে গৌরীর উচ্ছ্বসিত রোদন আর বাধা মানিল না। সে কাঁদিয়া বলিল—বাবা! আমার জন্যই তোমাদের এত কষ্ট, আমি যদি এখনি মরে যাই তাহলে আর তোমার কোনও দুঃখ থাকবে না!

মর্ম্মাহত কৈলাসচন্দ্র এই অভিমানপূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। বুক ফাটিয়া দুই ফোঁটা গরম রক্ত অশ্রুরূপে গড়াইয়া পড়িল। তাঁহার আহত চিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল—মা! আমি কিছু চাই না! আমার মান সম্ভ্রম যাক্, সর্ব্বস্ব যাক্! তুই ফিরে আয় মা! ফিরে আয়!

* * *

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে অমরনাথ বিমলকে লইয়া অতিশয় ব্যস্তভাবে বাড়ী আসিল। সমস্ত বাড়ীখানি নিস্তব্ধ—বারান্দায় কৈলাসচন্দ্র একা বসিয়াছিলেন। দুই দিন পূর্ব্বে যে গৃহ আনন্দ-উৎসবে, লোকের কলরবে, সানাইয়ের মধুর আলাপে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল, আজ সেই আনন্দময় গৃহ শূন্য—শ্মশানের মত বোধ হইতেছে। বাড়ীতে পা দিয়া কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় অমরনাথের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া বলিল—বাবা! বাড়ীর সব খবর কি? মা কোথায়? গৌরী কই?

বিমল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—অমরের কাছে যা শুনলুম তাতে আপনার কাছে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করছে। আমায় বিশ্বাস করুন—আমি শপথ করে বলছি—আমি এ বিষয়ের কিছুই জানতাম না। এ আমার বাবার চাতুরি! আপনার কোনো চিন্তা নেই—বিবাহে কোনো প্রতিবন্ধক হবে না।

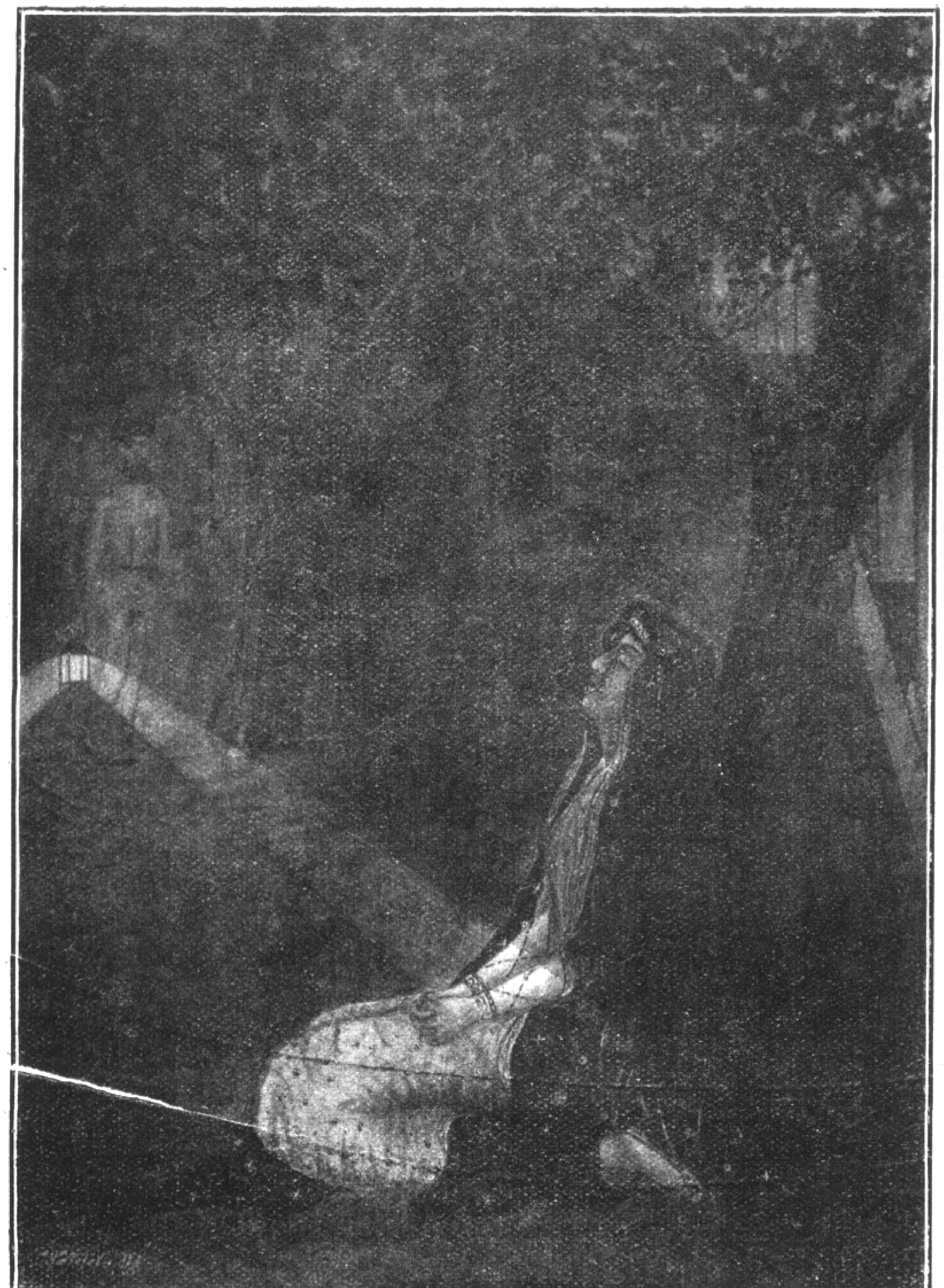
কৈলাসচন্দ্র উদাসভাবে অর্থহীন দৃষ্টিতে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অমরনাথ তাঁহার ভাব দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিল। উভয়ে ঘরে গিয়া দেখিল, দিনশেষে ঝরা-ফুলের মত গৌরী বিছানার উপর পড়িয়া আছে; তাহার পাশে সংজ্ঞা-হীনা সাবিত্রীর দেহ মাটিতে লুটাইতেছে। "বোনটি আমার!"—বলিয়া অমরনাথ বিছানায় আছড়াইয়া পড়িল। বিমল বজ্রা-হতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর আর কি বলিব? চাটুয্যের সোনার সংসার শ্মশান হইয়া গিয়াছে। গৌরীর শোকে অল্পদিনের মধ্যেই সাবিত্রীও তাহার অনুগমন করিয়াছেন। অমরনাথ উদ্‌ভ্রান্ত পিতাকে লইয়া কলি-কাতায় গিয়াছে। বাড়ীঘর ভাঙিয়া পড়িতেছে;—যেখানে গৌরী বিকালে বাপের হাত ধরিয়া বেড়াইতে আসিত সেই সাধের ফুলবাগান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। চারিদিক শূন্য—নীরব নিস্তব্ধ! এই অসীম শূন্যতার মাঝে বিজন বনে আমি এখনও দগ্ধ হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আছি।

বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। নিরাভরণ তরুলতাকে নবীন পত্রপুষ্পে সাজাইয়া বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে বেল জুঁই চাঁপার মধুর গন্ধ—নবমুঞ্জরিত আম্রমুকুলের স্নিগ্ধ সৌরভ, ফাল্গুনের আগমন ঘোষণা করিতেছে। সহকার-শাখার অন্তরাল হইতে বসন্ত-সখা কোকিলের কুহুরব অবিরাম শোনা যাইতেছে। সমস্ত বনস্থলী আজ প্রমোদে পূর্ণ—কিন্তু এ আনন্দের দিনে আজ সে কোথায়? যাহার কোমল রক্তিম চরণ দুটির চঞ্চল গতিতে সমস্ত বনস্থলী মুখরিত হইয়া উঠিত, সেই আনন্দময়ী আজ কোথায়? ওগো! তোমরা কেহ আমার গৌরীকে ডাকিয়া দাও! আমি একবার তাহাকে দেখি! বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, সে কি আর ফিরিবে না?

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।



কারাপ্রাঙ্গণে শক্তি

—যেন নিজেই একটি মহান্ধকার রাত্রি !

(শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "ফুলের মালা")

বঙ্গে বিবাহ-বৈচিত্র্য

(আদম সুমারী)

বিবাহের পূর্ব্বে মিলন

কতকগুলি আদিম জাতির মধ্যে এখনও বিবাহের পূর্ব্বে যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়; বার্ষিক উৎসবের সময় স্বৈরচারিতা প্রভূত পরিমাণেই পরিলক্ষিত হয়। খারিয়া জাতির মধ্যে বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবের সময় গ্রামস্থ যুবক যুবতীরা নির্ব্বিবাদে পরস্পরের সহিত মিশিয়া থাকে। ওরাওঁ জাতির মধ্যে অবিবাহিত যুবকেরা পিতামাতার নিকট হইতে স্বতন্ত্রভাবে 'ধুমকুড়িয়া'য় রাত্রি যাপন করে এবং অবিবাহিতা যুবতীরা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের বাটীতে, নামমাত্র তাহার তত্ত্বাবধানে, রাত্রিবাস করে। যদি কোন বালিকা রাত্রে বালকদিগের ঘরে চুপি চুপি পলাইয়া যায়, বৃদ্ধা তাহা চোখে দেখিয়াও দেখে না। আবার কোন কোন গ্রামে ওরাওঁ বালক বালিকারা একই স্থানে রাত্রে শয়ন করে। যদি কোন যুবকের সহিত মিলনে কোন যুবতীর গর্ভ হয়, তাহা হইলে সেই যুবতীকে বিবাহ করিতে সে বাধ্য, নতুবা পঞ্চায়তের বিচারে তাহার দণ্ড হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের মধ্যে যদি কোন যুবক কোন যুবতীর গর্ভ-সঞ্চারের পর স্ববংশীয়া বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে পয়সা কড়ি দিয়া একটি স্বামীর জোগাড় করিয়া দিতে হয়; সাঁওতালেরা এইরূপ জামাইকে "কিরিং জামাই" (ক্রীত জামাই) বলে।

পূর্ণিয়া জেলায় রাজ-বংশীদিগের মধ্যে বিবাহে অত্যধিক ব্যয়ের নিমিত্ত বিবাহের পূর্ব্বেই স্ত্রী-পুরুষের মত একত্র বাসের প্রথা দেখা যায়। স্বজাতীয়গণকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করা তাহাদের বিবাহের একটি অনুষ্ঠান। তাহাদিগকে ভোজন না করাইলে বিবাহ নামঞ্জুর হইয়া যায়। অর্থাভাবে যদি কেহ জ্ঞাতিদের ভোজ দিতে না পারে, তাহা হইলে কোন স্ত্রীলোকের অঙ্গে জল ছিটাইয়া তাহাকে লইয়া সে ঘর করিতে পারে। কিন্তু যত দিন ভোজ দিতে না পারে, সন্তান জন্মিলেও ততদিন তাহার বিবাহ বাতিল থাকে; ভোজ দিতে পারিলেই বিবাহ মঞ্জুর হইয়া যায়।

স্ত্রী-হরণ

ছোটনাগপুরের কতকগুলি আদিম জাতির মধ্যে স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিবার প্রথা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উড়িষ্যায় ভুঁইয়াদিগের মধ্যে যদি কোন যুবক কোন যুবতীর প্রতি আসক্ত হয়, এবং তাহার পিতামাতা সে বিবাহে সম্মতি দান না করে, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক যুবতীকে যুবা হরণ করিয়া লয়, এমনও দেখা যায়। হো-জাতির মধ্যে নৃত্যের স্থান কিংবা বাজার হইতে যুবকগণ যুবতী হরণ করে। এখনও অনেক নিম্ন জাতির "বরাত" প্রথায় স্ত্রীহরণ ও তজ্জন্য সংগ্রামের লক্ষণাদিও দেখিতে পাওয়া যায়।

সেবা ও বিবাহ

সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, রাজবংশী ও হাড়িদিগের মধ্যে বর কিয়ৎকাল কন্যার পিতা-মাতার গৃহে থাকিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা কন্যার পিতা-মাতার মনস্তুষ্টি করিয়া, কন্যার পাণিগ্রহণ করে, এ প্রথাও দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতালদিগের মধ্যে কন্যা, কুৎসিত কিংবা বিকলাঙ্গী হইলে অথবা কন্যার ভাই না থাকিলে উক্ত প্রথায় তাহার বিবাহ হইতে দেখা যায়। এই "আহারাদি জামাই" সাধারণতঃ দরিদ্র, পণ দিয়া কন্য-গ্রহণে অসমর্থ, ভাবী শ্বশুরের আশ্রয়ে পণের পরিবর্ত্তে পাঁচ বৎসর বিনা মজুরিতে অকাতর পরিশ্রম করিয়া কন্যার পাণিলাভ করে; বিবাহের পর শ্বশুরের নিকট হইতে দুইটি মহিষ, কিঞ্চিৎ ধান্য ও কতকগুলি চাষ করিবার যন্ত্রপাতি লইয়া স্ত্রীর সহিত সে স্বতন্ত্র বাস করিতে যায়। যদি শ্যালক না থাকে, তাহা হইলে জামাতা শ্বশুর-গৃহেই রহিয়া যায়, শ্বশুরের কাজকর্ম্ম দেখা-শুনা করে এবং শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ লাভ করে। সেই সকল "ঘর জামাইয়ের" পুত্রেরা মাতামহের নাম গ্রহণ করে। মুণ্ডাদিগের মধ্যে "ঘর-জামাই" তিন বৎসর কাল শ্বশুর-গৃহে বাস করে, তৎপরে কন্যার পাণিগ্রহণের পর স্বগৃহে ফিরিয়া থাকে। তৎকালে সে কতক জমি, বারো মণ চাউল ও দুইটি মহিষ যৌতুক-স্বরূপ লাভ করে। ওরাওঁদিগের মধ্যে তিন প্রকার "ঘর-জামাই" দেখিতে পাওয়া যায়—এক প্রকার—ভৃত্যের মত, যতদিন কাজ করে, ততদিন ভাত, কাপড় ও মজুরি পায়; দ্বিতীয় প্রকার—ভাত, কাপড়, মজুরি ও স্ত্রী-সঙ্গ পাইয়া থাকে এবং তদ্ব্যতীত চলিয়া যাইবার সময় দুইটি মহিষ, একটি লাঙ্গল, কতকগুলি কৃষি-যন্ত্র ও কিছু-কিছু তৈজস পত্রও লাভ করে; তৃতীয় প্রকার জামাতা চিরকাল অপুত্রক শ্বশুরের আলয়ে বাস করে, শ্বশুরের সেবা করে এবং তাহার কাজকর্ম্ম দেখে।

পণ-বিবাহ

বর্ত্তমান কালে পণ-বিবাহ অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত—হয় বর না হয় কন্যাকে অর্থ দিতে হয়; উচ্চ জাতির মধ্যে বরকে দিতে হয় এবং নিম্ন জাতির মধ্যে কন্যাকে দিতে হয়। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উপর পণের হার নির্ভর করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিই আজকালকার বিবাহের বাজারে বরের দর নির্দ্ধারণ করে। বাঙ্গলা দেশে এণ্ট্রান্স, এফ্‌ এ, ও বি এ উপাধিধারী যুবকগণকে বিবাহের বাজারে ৫০০৲ হইতে ৩০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে সাধারণতঃ বিক্রয় হইতে দেখা যায়; সময় সময় অনেক কন্যার পিতা ১০,০০০ টাকাও অম্লান বদনে বরকে দিয়া থাকেন। বাঁকুড়া জেলায় সদ্‌গোপদিগের মধ্যে কন্যাকে পণ দিয়া বিবাহের প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু বর যদি পাশ করা হয়, তাহা হইলে বরের অর্থদণ্ড না ঘটিয়া অর্থলাভ ঘটে। বর ও কন্যার বয়সের উপর দরের হার কতকটা নির্ভর করে। যেখানে কন্যা ক্রয় করা হয়, সেখানে অল্পবয়স্কা

বালিকার দর বেশী ; যেখানে বর বিক্রয় হয়, সেখানে বয়স্থা বালিকার বিবাহ দিতে অধিক ব্যয় হয়। নিম্নলিখিত তালিকায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বর ও কন্যার মোটা মুটি একটা বাজার-দর দেওয়া গেল—

দর

জাতি	কন্যা	বর
আগুরি	—	২০০—৫০০০৲
বাগ্‌দি	৭—৬৪৲	—
বৈদ্য	—	৫০০—৩০০০৲
বাওরি	৪—১০৲	—
ব্রাহ্মণ	—	৫০০—৫০০০৲
গন্ধবণিক	—	৫০—৩০০৲
গোয়ালা	১০০—৪০০৲	—
কাহার	৫০—১০০৲	—
কৈবর্ত্ত	২৫—১০০৲	—
কাওরা	১৫—৫০৲	—
কায়স্থ	—	২০০—৫০০০৲
কৈরি	৫০—১০০৲	—
কুর্ম্মি	২—১০০৲	—
মুণ্ডা	৫—৮০৲	—
নমঃশূদ্র	২০—১০০৲	—
ওরাওঁ	১০৲	—
পোদ্‌	১৫—৫০৲	—
রাজবংশী	৮০—১০০৲	—
সদ্‌গোপ	৩০—৫০০৲	—
সাঁওতাল	১৩৲	—
সুবর্ণবণিক	—	৫০০—৩০০০৲
তেওর	১৫—৫০৲	—

সম্প্রতি বর ও কন্যার দর বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কুচবিহারে রাজবংশী কন্যার ৪০।৫০ টাকা দর ছিল, কিন্তু এখন তাহা বাড়িয়া ৮০।১০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। যেমন চাল, ডাল, মাছ, তরকারির দর বাড়িয়াছে, সেইরূপ বর ও কন্যার দরও বাড়িয়া গিয়াছে। আবার রেল বিস্তার হওয়ায় বিবাহের ক্ষেত্র অত্যধিক বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। লাহোরের পাত্রীর সহিত কলিকাতার পাত্রের বিবাহ এবং চট্টগ্রামের পাত্রীর সহিত এলাহাবাদের পাত্রের বিবাহ নিত্যই এখন ঘটিতেছে।

বিবাহ ও বয়স

যৌবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত। নিম্নজাতির মধ্যে ৮ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে ; কিন্তু উচ্চ জাতির মধ্যে বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতেছে। বালিকাদিগের বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইবার একটি কারণ, উচ্চ-জাতিসমূহের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার। বিবাহে বাজারে বরের অত্যধিক দরও অপর একটি কারণ। কন্যাদায় ক্রমশঃ অত্যন্ত কঠিন দায় হইয়া উঠিতেছে। পিতা অনেক সময় অর্থাভাবে উপযুক্ত সময়ে কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না।

সাধারণতঃ নেপালী, সাঁওতালী ও অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যে যুবক ও যুবতীর মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে ; তাহাদিগের মধ্যে অল্পবয়স্কা বালিকার সহিত অল্পবয়স্ক বালক কিংবা যুবকের বিবাহ হয় না

বাল্য-বিবাহ

নিম্নজাতিগুলির মধ্যে এখনও বাল্যবিবাহ দেখা যায়; বিহারে বিশেষতঃ গোয়ালা-দিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ অত্যধিক প্রচলিত।

বিবাহ-পদ্ধতি

"সিন্দূর-দান" বিবাহের প্রধান অঙ্গ। কয়েকটি জাতির মধ্যে ব্যবস্থা আছে যে যদি কোন প্রেমিক কোন প্রেমিকার কপালে সিন্দূর দান করে, তাহা হইলে তাহাদিগের বিবাহ হইয়া যায়। এমন কি পূর্ণিয়া জেলায় মুসলমানদিগের মধ্যেও যদি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের কপালে সিন্দূর পরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোকের সহিতই তাহার বিবাহ হইয়া যায়। সিন্দূর-দানেই সাঁওতালদিগের বিবাহ সিদ্ধ; কিন্তু যদি কোন সাঁওতাল যুবক সিন্দূর-দানের সময় ধরা পড়ে, তাহা হইলে সে যথেষ্ট প্রহার লাভ করে; যদি হাতে হাতে ধরা না পড়ে, তাহা হইলে কন্যার আত্মীয় স্বজনেরা যুবকের বাটীতে যাইয়া তাহাকে বাঁধিয়া প্রহার করে ও তাহার গরু কিংবা মহিষ কাড়িয়া আনে এবং পঞ্চায়তের বিচারে কন্যার পিতাকে অর্থদণ্ড দিবার পর সেই গরু বা মহিষ বর ও কন্যার সম্পর্কীয়েরা মিলিয়া ভোজন করে। সিন্দূর-দানের পদ্ধতি, বোধ হয়, পুরাকালে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে রক্ত-বিনিময়-প্রথার নিদর্শন-স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে।

রক্ত-বিনিময়-প্রথা এখনও বাঙ্গলাদেশে কোন কোন জাতির মধ্যে দেখা যায়। হাড়িরা বরের অঙ্গুলিতে একটী কাঁটা বিঁধিয়া সেই ক্ষত হইতে রক্ত তুলিয়া কন্যার অঙ্গে এবং সেই ভাবেই কন্যার রক্ত তুলিয়া বরের অঙ্গে মিশাইয়া থাকে। মুঙ্গের জিলায় ধাড়ি ও দোসাদ জাতিরা নাপিত ডাকাইয়া নরুন দিয়া বরের অঙ্গুলি কাটাইয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই রক্তে একটি লাল তুলা ভিজাইয়া লয়; পরে সেই তুলা একটি পানের মধ্যে পুরিয়া কন্যাকে এবং কন্যার রক্তে মাখানো তুলা আর একটি পানের মধ্যে পুরিয়া তাহা বরকে খাইতে দেয়। গুলগুলিয়া জাতির মধ্যে বরের রক্তে মাখানো তুলা দিয়া কন্যার পায়ে আল্‌তা পরানো হয় এবং কন্যার রক্ত মাখানো তুলায় বরের পা রঞ্জিত করিয়া দেয়। উচ্চজাতীয় বাঙ্গালীর মধ্যে এখনও নববধূকে "দুধে আলতায়" দাঁড় করাইয়া অভিভাষণের ব্যবস্থা ঘরে ঘরে প্রচলিত। এই "দুধে আল্‌তার" ব্যবস্থা বোধ হয় পূর্ব্বকালের রক্ত-ব্যবহার প্রথারই নিদর্শন-স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে।

বিধবা-বিবাহ

উচ্চ জাতিরা বিধবা-বিবাহের অনুমোদন করেন না; এখনও নিম্নজাতিদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ সমধিক প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু নিম্নজাতির মধ্যেও যাহারা পদ ও মর্য্যাদার অভিলাষী, তাহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নহে এবং তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ-প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। কতক-জাতির মধ্যে বিধবার বিবাহ হইলেও তাহার স্থান কুমারী অপেক্ষা অনেক নীচে এবং কয়েক স্থলে আবার উপ-পত্নীর ন্যায় ঘৃণ্য। সাঁওতালেরা বিধবা-বিবাহ ঘৃণার চক্ষে

দেখিয়া থাকে ; বিবাহের সময় বিধবার কপালে সিন্দূর না দিয়া বর একটি ফুলে সিন্দূর মাখাইয়া বাম হাতে করিয়া বিধবার মাথায় তাহা ফেলিয়া দেয়। মানভূম জেলার কুর্ম্মিরা বিধবা-বিবাহে হাতে করিয়া না দিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া বিধবার কপালে সিন্দূর পরাইয়া থাকে। রাজবংশীদিগের মধ্যে যাহারা বিধবা বিবাহ করে, তাহাদিগকে "ডেঙ্গুয়া" বলে ; ডেঙ্গুয়া অত্যন্ত ঘৃণিত জীব ; যদি ডেঙ্গুয়া কোন মরা গরু স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঘৃণায়, শকুনিরাও তাহাকে পরিত্যাগ করে।

ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধি (১৮৭২ সালের ৩ আইন) অনুসারে ১৯০১ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৩৩৫টী বিবাহ হইয়াছে ; ইহার মধ্যে কেবল মাত্র ৩৪টি বিধবা বিবাহ। ইহাতে বোধ হয় অন্ততঃ বিধবা বিবাহের জন্যও ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধির প্রয়োগ খুবই অল্প হইয়াছে।

দেবর বিবাহ

ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় নিম্ন জাতীয় হিন্দু এবং আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এক প্রকার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে—ইহাকে দেবর-বিবাহ বলা যাইতে পারে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিয়া থাকে—পরকে বিলাইয়া দেয় না ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন পণ দিয়া বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, তখন সে যৌথ পরিবারের সম্পত্তি, তাহাকে পরের হাতে না দিয়া ঘরে রাখাই কর্ত্তব্য। সাঁওদিগের মধ্যে যখন কোন দেবর তাহার বিধবা ভাজকে বিবাহ করে, তখন আর তাহাকে পণ দিতে হয় না বা বিবাহের কোন আচারও পালন করিতে হয় না। হো এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে দেবর বা ভাজ যদি বিবাহে অসম্মত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বিধবাকে বিবাহ করে, তাহাকে বিধবার প্রথম বিবাহে লব্ধ পণ প্রথম স্বামীর স্বজনকে ফিরাইয়া দিতে হয়। গণ্ড জাতির মধ্যে বিধবার দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর পণের টাকা দিতে না পারিলে সমাজচ্যুত হয়। দেবরের সহিত ভাজের বিবাহে কোনরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই ; দেবর বা ভাজের ইচ্ছার উপরই তাহা নির্ভর করে। উড়িষ্যায় এখনও স্বামী যদি দুই বা তিন বৎসরের জন্য কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে বাস করে, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীকে দেবর বা অপর কোন পুরুষ কখনও কখনও বিবাহ করিয়া থাকে, এমন দেখা যায়।

কৃত্রিম বিবাহ

বাগ্দীদিগের মধ্যে প্রকৃত বিবাহের পূর্ব্বে মহুয়া গাছের সঙ্গে একরূপ কৃত্রিম বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। খাড়োয়া জাতির মধ্যে আম্র বৃক্ষ কিংবা সেই বৃক্ষের শাখার সহিত কৃত্রিম বিবাহ হইয়া থাকে। ছোট নাগপুরের কুর্ম্মীদের মধ্যে বিবিধ বৃক্ষের সহিত কৃত্রিম বিবাহের পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায় ;—বরের সহিত আম গাছের এবং কন্যার সহিত মহুয়া গাছের বিবাহ হইয়া থাকে। নেপালে নেওয়ার বালিকাদের বেল ফলের সহিত কৃত্রিম বিবাহ এবং বড় হইলে স্বামীর সহিত পুনরায় বিবাহ হইয়া থাকে। এই সকল

গাছের সহিত কৃত্রিম বিবাহ-প্রথা দেখিয়া মনে হয়, ইহা আদিম সমাজেরই বিবাহ-পদ্ধতির নিদর্শন—ইহার দ্বারা বোধ হয় ভ্রান্ত আদিম মানব বিবাহিত জীবনের দুঃখ বৃক্ষকে অর্পণ করিত।

আর এক প্রকার কৃত্রিম বিবাহ দেখা যায়—ইহার উদ্দেশ্য স্ত্রীজাতির বিবাহ না হওয়ার কলঙ্ক মোচন করা। কোন জাতির মধ্যে অসির সহিত, কোন জাতির মধ্যে ফুল বা বৃক্ষের সহিত কিংবা তীরের সহিত কৃত্রিম বিবাহ হইয়া থাকে। আই-বুড়া নাম ঘুচানোই এইরূপ বিবাহের উদ্দেশ্য।

যদি কোন কুমার কোন বিধবাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে গাছ বা ফুলের সহিত তাহাকে কৃত্রিম বিবাহ করিতে দেখা যায়।

বাঙ্গলা দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির মধ্যে দুইবার স্ত্রীবিয়োগের পর তৃতীয় বার যদি পুরুষের বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই বিবাহের পূর্ব্বে কোন বৃক্ষের গায়ে বা কুকুরের গলায় তাহাকে মালা পরাইয়া দিতে হয়। ইহার অর্থ—যদি আবার কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে, ত তাহা ঐ গাছ বা কুকুরের উপর দিয়াই খণ্ডিয়া যাক্! চতুর্থ বার বিবাহ করিতে হইলে এ ব্যবস্থা নাই; পঞ্চমবারে কিন্তু তৃতীয়বারের ব্যবস্থাই বাহাল থাকে!

বেশ্যাদের বিবাহ

যদিও বেশ্যাদের জীবন বিবাহের জ্বলন্ত প্রতিবাদ, তথাপি বেশ্যাদের মধ্যে একপ্রকার কৃত্রিম বিবাহের ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গলা দেশে বেশ্যাকন্যাদের যৌবন উপস্থিত হইলে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কোন গাছ, তরবারি, ছোরা, অথবা কোন ভাড়াটিয়া বৈষ্ণব, বেশ্যা-পুত্র বা বোকা হাবা লোকের সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। নীচ জাতীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া বিবাহ দেয়; কিন্তু ভাড়াটিয়া স্বামীর স্ত্রীর উপর কোন দাবী-দাওয়া জন্মে না; বিবাহের পর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। মুসলমানী বেশ্যাদের কৃত্রিম বিবাহে মোল্লা আসিয়া বিবাহ দিয়া থাকে। হিন্দু বেশ্যাদের প্রায় গাছের সহিত এবং মুসলমানী বেশ্যাদের ছোরা বা তরবারির সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। জুঁই, মল্লিকা, গোলাপ গাছই হউক, আর কদলী বৃক্ষই হউক, কিম্বা ছুরি, ছোরা বা তরবারিই হউক, বেশ্যাদের বিবাহে আচার-অনুষ্ঠানের কোনরূপ ত্রুটি থাকে না। বেশ্যারা এই কৃত্রিম বিবাহের মাত্রা অনেক দূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। ইহারা অতি যত্নে সেই বৃক্ষে জলসেচন করে এবং সিন্দুকের মধ্যে সেই তরবারি তুলিয়া রাখে; যত দিন গাছ বাঁচিয়া থাকে বা তরবারি না হারায়, ততদিন বেশ্যাকন্যা আপনাকে সধবা মনে করে; পরে গাছ মরিয়া গেলে কিংবা তরবারি হারাইলে বিধবার মতই সে হাতের লোহা খুলিয়া ও কপালের সিন্দুর মুছিয়া ফেলে। মনে হয়, এই সকল কৃত্রিম বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু আইবুড়া নাম ঘুচানো।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা বা

দুরারোগ্য রোগগ্রস্তা হইলে তাহার সহিত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে স্ত্রী হাতের লোহা ভাঙ্গিয়া ফেলে কিংবা কোন গাছের পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে। কতক জাতির মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের পূর্ব্বে পঞ্চায়তের অনুমতি লওয়া প্রয়োজন; সম্বলপুরে গণ্ডা জাতির মধ্যে "শেঠিয়ার" (বা গ্রামের প্রধানের) অনুমতি ব্যতীত বিচ্ছেদ হইতে পারে না। স্ত্রীলোক-দিগের সাধারণতঃ বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু নেপালে নেয়ার জাতীয় স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মাত্রেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। স্ত্রী দুইটী সুপারি বিছানায় রাখিয়া প্রস্থান করিলে বুঝিতে হইবে যে, সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। পূর্ণিয়া জেলায় মুসলমানী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিবাহ বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। যদি কোন মুসলমানী স্বামীর সহিত ঘর করিতে নারাজ হয়, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে সে হাটে গিয়া মনের মত দ্বিতীয় স্বামী খুঁজিয়া লইতে পারে—তাহাকে কেবলমাত্র তাহার সেই নির্ব্বাচিত স্বামীর অঙ্গে কতকগুলি মুড়কি ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে পূর্ব্ব বিবাহের বন্ধন ছিন্ন এবং নুতন বিবাহ সিদ্ধ হইয়া যায়। কোন সাঁওতালী যদি স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে সে স্ত্রী ইচ্ছা করিলে স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার দাবী করিতে পারে।

বহু ভর্ত্তা

দুই প্রকার বহুভর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—একপ্রকারে স্ত্রীলোকের বহু স্বামীদের মধ্যে পরস্পরের কোন সম্পর্ক নাই; অন্য প্রকারে, স্ত্রীলোকের বহু স্বামী মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক। ভুটিয়া সাঁওতালদিগের মধ্যে বহু ভ্রাতায় একটী স্ত্রীকে বিবাহ করে। সাঁওদিগের মধ্যে অবিবাহিত দেবরের ভাজকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের অধিকার আছে।

বহু-বিবাহ

যদিও বহু-বিবাহে কোনরূপ শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক নাই, তথাপি উচ্চজাতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে বহু-বিবাহ অত্যন্ত বিরল। স্ত্রী বন্ধ্যা কিংবা দুরারোগ্য রোগে প্রপীড়িতা হইলে, কোন কোন স্বামীকে কচিৎ একাধিক বিবাহ করিতে দেখা যায়। এক স্ত্রীকেই ভাত দিতে অনেকে অক্ষম, তাহার উপর বহু স্ত্রী হইলে এই অনাটনের দিনে সতীনের কলহের মধ্যে সংসার চালানো যে কি সুখের তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। সাঁওতাল পরগণার সাওড়িয়া পাহাড়িয়া বা মালের জাতীয়েরা পাঁচ বা ছয়টি ভগ্নীকে এক সঙ্গে বিবাহ করে; প্রথমে বড়, তাহার পর ছোট এবং তৎপরে তাহার ছোট ভগ্নীর সহিত বিবাহ হয়। বড় ভগ্নীর বিনা অনুমতিতে ছোট ভগ্নীর সহিত বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহের পর ভগ্নীরা এক বাটীতে এক সঙ্গে বাস করে, রাত্রে স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করে। বড় ভগ্নীর আদেশ-ব্যতিরেকে ছোট ভগ্নীর সহিত সহবাস করিলে পঞ্চায়তের বিচারে স্বামী দণ্ডনীয় হয়। সাঁওদিগের মধ্যে শ্যালীর সহিত সম্বন্ধ বড় শিথিল; যদি কাহারও দ্বারা তাহার শ্যালিকার

গর্ভসঞ্চার হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই শ্যালীকে বিবাহ করিতেই হইবে।

পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল; এখন শিক্ষা-বিস্তারের সহিত উহা প্রায় লোপ পাইয়াছে।

কতকগুলি বিচিত্র প্রথা

সাধারণতঃ কন্যার বাটীতে বিবাহের সময় বর আসে; কিন্তু রাজবংশীদিগের মধ্যে কন্যা বরের বাটীতে যায়—পূর্ব্বে ভগ্নীপতির পিঠে চড়িয়া যাইত। যশোহরে বেদেদের মধ্যে বিবাহের পর নববধূ শ্বশুরালয়ে যায় না; নব-দম্পতীকে একটী "টঙ্" তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে তাহারা বাস করে। সম্বলপুরে বিবাহের পূর্ব্বরাত্রে বরের সম্পর্কীয়া কতকগুলি বিবাহিতা স্ত্রীলোক কোন নদী বা পুষ্করিণী হইতে লোটা ভরিয়া জল আনে এবং সেই জল আবার অপর সাতটি বাটীতে লইয়া যাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য জল লইয়া আসে এবং শেষোক্ত জল দিয়া বরকে স্নান করাইয়া তাহার কৌমার্য্য ধৌত করিয়া দেয়। আবার কন্যা-পক্ষেও ঠিক এইরূপ আচার পরিলক্ষিত হয়। মুণ্ডা জাতির মধ্যে বরযাত্রীরা কন্যার বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে, কন্যাযাত্রীরা তাহাদের নিকটে যায় এবং উভয় দল একত্র মিলিত হইলে বর ও কন্যার মা, খুড়ী বা জেঠাই প্রভৃতি জলপূর্ণ কলস হস্তে অগ্রসর হইয়া পরস্পরে পরস্পরের গায় আম পাতা দিয়া জল ছিটাইয়া আলিঙ্গন করে।

বিবাহিত জীবনের অবস্থা

এদেশে প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই একবার বিবাহ হয়; কেহ চিরকাল আইবুড়া থাকে না। পুরুষদিগের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যাও অতি অল্প। হিন্দুরা প্রায় সকলেই বিবাহ করে। ইংলণ্ডের সহিত বাঙ্গলা দেশের বিবাহের তালিকা মিলাইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইংলণ্ডে শতকরা ৬০ জনের উপর পুরুষ এবং ৫৮ স্ত্রীলোক, বিবাহ যে কি বস্তু, তাহা জানেও না; বাঙ্গলা দেশে শতকরা ৫১ জন পুরুষ ও ৩৪ জন স্ত্রীলোক অবিবাহিতা থাকে এবং শতকরা ৪৫ জন পুরুষ ও ৪৬ স্ত্রীলোক বিবাহিত। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক বিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক; ৩০ বৎসর বয়সের পর বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। সকল বয়সেই অবিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম; কিন্তু বিপত্নীক অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা বেশী।

বাঙ্গলা দেশে যদি ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের তালিকা লওয়া হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, শতকরা ২½ জন বালিকা এবং ২২ জন বালক অবিবাহিত। ২০ বৎসর বয়সের পর বাঙ্গলায় ৮৩ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন অবিবাহিতা থাকে। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে ও আদিম নিবাসীদের মধ্যে প্রকৃত কুমারী দেখিতে পাওয়া যায়। মূক, বধির, অন্ধ, খঞ্জ বা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের অধিকাংশ স্থলে অবিবাহিত থাকিয়াই জীবন যাপন করিতে হয়। বেশ্যা-কন্যারা অবিবাহিতা থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রায় সকল স্ত্রীলোকই বিবাহিত।

পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ ও ছোটনাগপুর ব্যতীত বাঙ্গলার সর্ব্বত্র মুসলমান অপেক্ষা

হিন্দুর মধ্যে বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা অধিক। কিন্তু বাঙ্গলার সর্ব্বস্থানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে বিবাহিত হিন্দু পুরুষের সংখ্যা বিবাহিত মুসলমান পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক; কিন্তু ৪০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে হিন্দুর সংখ্যা কম। ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কা হিন্দু বালিকাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ৮ জনের মধ্যে প্রতি ১ জনের বিবাহ হইয়াছে এবং ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কা বালিকাদের ⅔ অংশের বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ৫ হইতে ১০ বৎসরের মুসলমান বালিকাদের শতকরা ৯ জনের এবং ১০ হইতে ১৫ বৎসরের বালিকাদের শতকরা ৫৬ জনের বিবাহ হয়।

বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র প্রায় বিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা একপ্রকার; সর্ব্বত্রই প্রায় সমান; কম-বেশী নাই।

শিশু-বিবাহ বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত বিরল। বিহারে ১ হইতে ৫ বৎসরের শিশুর বিবাহ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। গত আদম সুমারিতে বাঙ্গলায় ২০,৩৩১ বিবাহিত ও ১৯৭৮ বিধবা শিশুর সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিহারে ১২৭,৯৮৪ বিবাহিত ও ৮০৬৪ বিধবা শিশু দেখা গিয়াছিল। বাঙ্গলায় শিশু বিবাহ বিরল হইলেও বাল্য-বিবাহ যথেষ্ট পরিমাণেই প্রচলিত। হিন্দুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বালিকাদের বিবাহ দিয়া থাকেন, কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে বালিকা সাবালিকা হইলে বিবাহ দেওয়া যদিও প্রশস্ত, তথাপি হিন্দুর অনুকরণে তাহাদের বাল্য-বিবাহই ঘটিয়া থাকে।

বাল্য-বিবাহ যে উচ্চ জাতি অপেক্ষা নিম্নজাতির মধ্যে অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত, তাহা নিম্ন তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে—

প্রতি ১০০০ বিবাহিতা বালিকার মধ্যে

জাতি	বয়স ০-৫	বয়স ৫-১২
ব্রাহ্মণ	৩	১৫৪
বৈদ্য	২	৪৮
কায়স্থ	২	৮৩
বাগদি	৯	২৪৪
ডোম	১৩	২৬৭
চামার	৭	২০৯

পার্ব্বত্য ও আদিম জাতিদিগের মধ্যে বাল্য-বিবাহ অতি বিরল। অহিন্দু অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহ অধিক।

শিক্ষা-বিস্তার, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অধিকতর ব্যয় এবং বর ও কন্যার পণের হার বৃদ্ধির সহিত বাল্য-বিবাহের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে বিধবা-বিবাহ অধিকতর প্রচলিত। লেপছা, ভোটিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে বিধবার সংখ্যা কম। অ-হিন্দু অপেক্ষা হিন্দুত্বাভিমানী আদিম-নিবাসীদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অধিক। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ-জাতির মধ্যে বিধবার সংখ্যা বেশী। ডোম, চামার, মুচি প্রভৃতি নিম্ন জাতীয়দিগের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অল্প। গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, সদ্গোপ, ছুতার, তেলি ও তিলিদের

মধ্যে বিধবার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; উচ্চজাতীয় হিন্দুদের অনুকরণে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়াই এই সকল জাতির মধ্যে বিধবার সংখ্যা এত অধিক।

বিপত্নীক অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা অধিক। মুসলমানদের মধ্যে যদিও বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে বিপত্নীক অপেক্ষা বিধবাই বেশী। তবে বিধবার সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ কিয়ৎ পরিমাণে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, কিয়ৎ পরিমাণে বিধবা বিবাহের অধিকতর প্রচলন। উচ্চ জাতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে বাল-বিধবাদের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। যে সকল জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু যে সকল জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ সত্ত্বেও বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা নাই, তাহাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

স্রোতের ফুল

৩৪

যখন মালতী ও বিপিনকে বুকে করিয়া পাল্কি উজান ভাসিল তখন মালতীর মন ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—সংসার ছাড়িয়া এ কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রা! মালতী পাল্কিতে বসিয়া দেখিতে লাগিল গ্রামবধূরা রাত্রের মতন জলসঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য কলসী লইয়া ঘাটে আসিয়াছে, কেহ কাপড় কাচিতে জলে নামিয়াছে; কেহ জল হইতে উঠিয়া ভিজা কাপড়ে ঘড়া কাঁখে করিয়া সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে মুখ ফিরাইয়া ঘোমটার আড়াল হইতে চলন্ত পাল্কিখানির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাদিগের সকলেরই ঘর আছে, কাজ আছে, আপনার বলিয়া যত্ন করিবার লোক আছে, মালতীর কিছু নাই, কেহ নাই, নাই নাই!

শ্বেতপাথরের ঘাটের কাছে আসিয়া ভিড়িতেছিল, তখন সূর্য্য ডুবুডুবু। নদীর জল সোনার আলোয় হাসিমাখা চোখের মতো তরল উজ্জ্বল। ওপারের নদীর কোলে কোলে কাজল-রেখার মতো অন্ধকার, তটের উপর তরুরাজি ভুরুর মতো একটানা কালো, তাহার উপর নটকনারঙা আকাশের মাঝে রাঙা রবি যেন সুন্দর নিটোল ললাটে একখানি সোনার ডাগর টিকলির মতো বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আশ্রমের শাশিগুলি অস্তরবির লাল আগুনে ঝিলিক হানিতেছিল;—শ্বেতপাথরের ঘাটের কোলে তরল জলে সোনার আলো চলকিয়া উঠিতেছিল, যেন রূপসী তরুণীর পানখাওয়া ঠোঁটে হাসির ঝলক।

একখানা ষ্টিমলঞ্চ পিছনে কতকগুলা গাধাবোট বাঁধিয়া হুস হুস করিয়া তরল

চলিয়া গেল। গাধাবোটগুলা স্রোতের মুখে গা ভাসান দিয়া নিশ্চিন্তভাবে স্থির হইয়া ছিল, যেন কত গম্ভীর বনিয়াদি চাল, যাইবার কিছুমাত্র ত্বরা নাই; কিন্তু যাহারা নিজেরা নড়েনা, তাহাদিগকে সংসার নাকে দড়ি বাঁধিয়া নড়ায়, গাধাবোটগুলাকে পশ্চাতে বাঁধিয়া ষ্টিমলঞ্চখানা ইহাই যেন বলিয়া দিয়া গেল।

আপিস-বাবুদের পান্সিগুলি দাঁড়ের টানে, ঝিঁকের জোরে হনহন করিয়া চলিয়াছে, বাবুদের কেহ তামাক খাইতেছে, কেহ সিগারেট ফুঁকিতেছে; একজন সৌখীন বাবু মাথায় কোঁচানো চাদর বাঁধিয়া গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছে—

"প্রাণের অধিক যারে ভালো বাসি।
আমি তারে চোখের-দেখা দেখে আসি।"

মালতীকে পান্সিতে দেখিয়াই তাহার গানের সুর সপ্তমে চড়িল। আর-একজন বাবু চীৎকার করিয়া বিপিনের উদ্দেশে ডাকিতে লাগিল—ও তিনকড়ি, ও হরেকেষ্ট, নরেন্দ্র, পঞ্চানন, হারাধন,……কে যাচ্ছ বাবা, সাড়া দাও।—তারপর সে উঠিয়া গানের তালে বর্ব্বর ভঙ্গিতে নাচিতে আরম্ভ করিল।

মালতী পান্সির জানালায় মুখ দিয়া এই-সব দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, পুরুষ-গুলা সব জানোয়ার নাকি? সে যে নারী, এজন্য সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল।

বিপিনের এসব কিছুরই দিকে লক্ষ্য ছিল না। একখানা খালি পান্সি তাহাদেরই পান্সির পিছে পিছে আসিতেছিল, তাহারই মাঝি বাউলের সুরে গান করিতেছিল—

ওরে ডুবছে নাও ডুবাইয়া যাও
ওরে রসিক নাইয়া।
ওরে ভাঙ্গা নাও যে বাইতে পারে
তারে বলি নাইয়া।
ওরে হাল ছেড়না ভয় করনা
পারবারে যাইতে বাইয়া,
ও তোর ভাঙ্গা নাও লোণা পানি—
ছাইড়া দিছে খাইয়া।
ওরে পথের মাঝে ফাঁদ পেতেছে
বাজীকরের মাইয়া।

বিপিনের মন এই গানের মিষ্ট সুরের অন্তরালের রহস্যময় অর্থের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে সহস্র ভাবসঙ্ঘাত গঙ্গাতরঙ্গে পান্সিখানার মতো তাহার চিত্তকে দোলা দিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন এই গান তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া গাওয়া হইতেছে।

বিপিনের পান্সি আসিয়া শ্বেতপাথরের ঘাটের উপর জল চলকাইয়া যখন ভিড়িল তখন বিপিনের চৈতন্য হইল। বিপিন ও মালতী নৌকার ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল তারক ঘাটের রানায় বসিয়া আছে। তারকও তাহাদিগকে দেখিল। তারককে দেখিয়া বিপিন ও মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; তারকও অপ্রতিভ হইল। কিন্তু লজ্জার ভাব সামলাইয়া লইয়া তারক দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হেঁ হেঁ হেঁ…… বিপিন যে! একেবারে জোড়ে! এটা সন্ন্যাসীর আশ্রম, কেলিকুঞ্জ নয়!

তারক দাঁত বাহির করিয়া রহিল এবং তাহার কুকুরের দাঁতের মতো বড় বড় শাদা দাঁতের উপর সূর্য্যের আলো পড়িয়া চিকচিক করিতে লাগিল। তাহার সেই ব্যঙ্গমিশ্র

অসভ্য ভাব দেখিয়া মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া মালতী মুখ নত করিল। বিপিনের ইচ্ছা হইল বাঁদরটাকে ধরিয়া গঙ্গার জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল—ভয় নেই হে ধর্ম্মধ্বজ! আমরা দুজনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে এসেছি!

তারক তেমনি ভাবেই দাঁত বাহির করিয়া বলিল—ও! সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ!

মালতীকে লইয়া এই ব্যঙ্গ মালতীর যে শ্রুতিসুখকর হইতেছিল না তাহা বিপিন বুঝিতেছিল, কিন্তু সে সন্ন্যাসী, তাহার ত ক্রোধ করিতে নাই, সে ক্রোধ দমন করিয়া এবার একটু গম্ভীরভাবে বলিল—না না, আমরা বিয়ে করিনি, করব না।......তুমি বলেছিলে আমি সন্ন্যাসী হলে তুমি তার দায়ী।...এস তবে তুমিও, তোমাকেও সন্ন্যাসী হতে হবে।

তারক মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—তোমার ভাগ্য ভালো, তাই এত সহজে গুরুর কৃপা লাভ করে সংসারের মায়া কাটিয়ে উঠতে পেরেছ। আমাদের আর এজন্মে কিছু হল না।......আমি তোমার নৌকোতেই ফিরে যাই, আমার ছোট ছেলেটার আবার ঠাণ্ডা লেগে ব্রনকাইটিস হয়েছে! উহুহু! কি শীতই পড়েছে এবার।... যাও যাও তোমরা দেরি কোরো না, গুরুজী আবার আরতিতে বসবেন।......ওরে মাঝি আমায় নিয়ে যাবি?...

বিপিন তারককে আর লক্ষ্য না করিয়া মালতীকে লইয়া আশ্রমের ভিতর চলিয়া গেল। তারক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, সে ভাবিতে লাগিল—বিপিনটা সত্যি সত্যি সন্ন্যাসী হবে নাকি? ওর অদৃষ্ট ভালো দেখছি, আমি এতদিন গুরুদেবের চরণ সেবা করেও তাঁর করুণা পেলাম না, আর বিপনেটা দুদিনেই তাঁর কৃপায় তরে গেল......যাই, আবার রাত হয়ে যাবে, ঠাণ্ডা লাগবে। এই মাঝি......

প্রেমানন্দ সম্মুখে দুইটা শামাদান জ্বালিয়া একাকী বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। বিপিন ও মালতী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। প্রেমানন্দ মুখ তুলিয়া চাহিতেই মালতীর সহিত তাঁহার চখোচোখি হইল। মালতী দেখিল গুরুজীর চোখদুটি অন্তরের একটি উত্তাপময় জ্যোতিতে উজ্জ্বল! তাঁহার দেহ দীর্ঘ কৃশ একগাছি দৃঢ় লাঠির মতো, যেন একটি সতেজ চারাগাছ সূর্য্যে মাথা ঠেকাইবার জন্য পরম উৎসাহে ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, একটি আনন্দের দীপ্তি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঢলঢলায়মান। গুরুজী দেখিতে আশ্চর্য্য তরুণ ও সুকুমার! যুবা বয়সেও শৈশবের অম্লান লাবণ্য তাঁহার মুখশ্রীকে ত্যাগ করে নাই। অথচ তাঁহার চতুর্দ্দিকে একটি গাম্ভীর্য্য প্রদীপের পার্শ্বে রশ্মিচ্ছটার ন্যায় বিকীর্ণ হইতেছিল।...এই প্রেমানন্দ! ইনি গুরু!

আর প্রেমানন্দ দেখিলেন জোড়া বাতির আলো মালতীর মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে একখানি প্রতিমার মতো দেখাইতেছে। এ কী অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তি! এ যে কল্পনার মতো সুন্দর, মূর্চ্ছার

মতো মনোহর, দীপশিখার মতো উজ্জ্বল, বাসন্তী মঞ্জরীর মতো সুকুমার, প্রজাপতির মতো আনন্দ-চঞ্চল, সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর চন্দ্রকান্ত-মণির অমল মন্দির! ইহাকে কল্পনা করিয়াই বুঝি বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন—

"বিজুরি বাটিয়া কেবা গা-খানি মাজিল গো
চাঁদে মাখিল মুখখানি।
লাবণি বাটিয়া কেবা রস নিঙারিল গো
অপরূপ রূপের বলনি!"

প্রেমানন্দের এই মুগ্ধ দৃষ্টিতে মালতী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; তাহার কেমন মনে হইতেছিল এ দৃষ্টি যেন শুধু সৌন্দর্য্যমুগ্ধের প্রশংসার দৃষ্টি নয়। মালার মধ্যে কাঁটার মতো এ দৃষ্টি মালতীকে পীড়া দিতে লাগিল।

মালতীর সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত ভাবে চেতনা লাভ করিয়া প্রেমানন্দ বিপিনের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনিই মালতী? ...সাক্ষাৎ রাধারাণীর মূর্ত্তি! তোমাদের শিষ্যরূপে পেয়ে আমি ধন্য হব; তোমাদের প্রেমের স্ফুলিঙ্গ যেন আমার প্রাণের বিশ্ব-প্রেমকে জ্বালিয়ে দ্যায়!...এখন চল আরতির সময় হয়েছে। আরতির পরে তোমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে। আজ থেকে বিপিন তোমার নাম হল স্বরূপানন্দ, আর মালতীর নাম হল রাধারাণী।...

তারপর প্রেমানন্দ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—শান্তি! যোগানন্দ!

একটি সন্ন্যাসিনী ও একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রেমানন্দ বলিলেন—শান্তি, ইনি রাধারাণী; তোমাদের নূতন ভগিনী; এঁকে নিয়ে যাও। লাইব্রেরীর পাশের ঘরটিতে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দাওগে।—আর যোগানন্দ, ইনি ত তোমাদের পরিচিতই; কিন্তু আজ আর ইনি বিপিনবাবু নন; আজ থেকে ইনিও তোমাদের গুরুভাই, স্বরূপানন্দ!...যাও তোমরা হাতমুখ ধুয়ে শুচি হয়ে ঠাকুরদর্শন করবে এস।

৩৫

মালতী শান্তির সহিত নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া দেখিল, ঘরটি গঙ্গার দিকে, ঘরে বসিয়াই গঙ্গা দেখা যায়। তখনও সেই ঘরে অস্তসূর্য্যের লালিমা মার্ব্বেল পাথরের স্বচ্ছ মেঝের উপর দুধে-আলতার মতো টলটল করিতেছিল। তাহার উপরে পা দিতেই মালতীর ভারি হাসি পাইতে লাগিল,—এই তার বিবাহ! সন্ন্যাসী প্রেমানন্দ তাহার পুরোহিত! বিধবা সন্ন্যাসিনী শান্তি তাহার এয়ো! আর মরণ-রাগিণীতে অস্তসূর্য্য গেরুয়া রঙের চাদর টাঙাইয়া তাহাদের শুভদৃষ্টির আয়োজন করিতেছে! যমের মহিষের মাথার চেয়েও কালো কালো কাকের দল যেন তাহার বাসরঘরের তোরণমাল্য রচনা করিয়া উড়িয়া যাইতেছে! বড় বড় ষ্টিমারগুলি ভারিক্কি গিন্নির ন্যায় ও ষ্টিমলঞ্চ-গুলি চটুল কিশোরীর মতো এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া শাঁখ বাজাইয়া বিয়েবাড়ী মাতাইয়া তুলিতেছে! পরক্ষণে তাহার মনে হইল ইহা তাহার সকল সাধের গঙ্গা-যাত্রার ঘর—এইখানে তাহাদিগকে তীরস্থ করা হইয়াছে!

তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া শান্তি দুঃখাবসন্ন

ধীর কণ্ঠে বলিল—আপনি বসুন, আমি আলো এনে দি।

মালতী বলিল—আলোর কি দরকার দিদি, এখনি ত ঠাকুরদর্শন করতে যেতে হবে।...আমি কি এ ঘরে একলাই থাকব?

মালতী দেখিল শান্তির বয়স পঁয়ত্রিশ, মাঝারি আকারের চেহারাটি; তাহার মধ্যে কোথাও কোনো চঞ্চলতা নাই; মুখখানি কি এক গভীর বেদনায় ম্লান, কণ্ঠ বিষণ্ণ ধীর। শান্তি বলিল—এখানে একলা থাকাই নিয়ম।

—আপনি কোন্ ঘরে থাকেন?

—আমি আপনার পাশের ঘরেই থাকি।

—আর কজন সন্ন্যাসিনী আছেন?

—সম্প্রতি আমরা চারজন ছিলাম, আপনি আসাতে পাঁচজন হলাম। কথনো কথানো সংখ্যা বাড়ে কমে; যেখানে সেবার দরকার হয় আমাদের যেতে হয়।

—আপনি এখানে কতদিন আছেন?

—প্রায় ছবৎসর হবে।

—কিছু মনে না করেন ত আর-একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।...আপনি এই পথ কেন গ্রহণ করেছেন?

শান্তির চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে বলিল—আমি বড় দুঃখিনী; ঝড়ে নৌকোডুবি হয়ে একদিনে স্বামী পুত্র সর্ব্বস্ব হারিয়েছি; অভাগিনীকে গুরুদেব জলথেকে তুলে চরণে ঠাঁই দিয়েছেন; এখন রাধাকান্তই আমার স্বামীপুত্র সব। গুরুজী বলেছেন যেদিন আমি মেথরের ছেলেকেও বুকে তুলে নিতে পারব, মনে একটুও ঘেন্না হবে না, সেদিন আমি আমার হারানো ছেলে ফিরে পাব। তা কি আমি পারব বোন!

মালতী চোখ মুছিয়া বলিল—দিদি, আমি আপনার ছোট বোন, না জেনে কষ্ট দিলাম। আমিও বড় দুঃখী। আমাকে ত আপনি জিজ্ঞাসা করলেন না, আমি কি দুঃখে এসেছি।

শান্তিও চোখ মুছিয়া বলিল—আমাদের জিজ্ঞাসা করতে নেই। সন্ন্যাসিনীর আবার কৌতূহল কি। জানি তোমারও দুঃখ আছে, আর সে দুঃখ গভীর দুঃখ। দুঃখ না পেলে ত কেউ বোন ভগবানের দিকে মুখ ফেরাতে চায় না। সব দিয়ে তবে তাঁকে পেতে হয়, সে যে অমূল্য ধন, তাকে কি যে-সে মূল্যে কেনা যায়?

মালতী শান্তির কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিল—আপনি কি মনে করেন যে সন্ন্যাসী না হলে ভগবানকে পাবার জো নেই!

—না, সন্ন্যাসী না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সে সন্ন্যাসী শুধু গেরুয়া কাপড় পরলেই হয় না, সংসার ছাড়লেও হয় না, সংসারে নির্লিপ্ত মনকে বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে রঙিয়ে যে তুল্‌তে পারে সেই সন্ন্যাসী! গীতায় ভগবান সন্ন্যাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করে বলেছেন—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

শান্তির মুখে বিশুদ্ধ স্পষ্ট সংস্কৃত শুনিয়া

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া মালতী জিজ্ঞাসা করিল—গুরুজীর মতও কি এই ?

—আমরা মূর্খ মেয়েমানুষ, আমরা স্বতন্ত্র মতামত কোথায় পাব। আমরা গুরুজীরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

—তবে গুরুজী সংসার ছেড়ে বাইরে এসেছেন কেন ?

—যেমন চোখের অতি কাছে জিনিস রেখে দেখা যায় না, খানিক দূরে ধরে দেখতে হয়, তেমনি সংসারকে বুঝতে হলে, ভালো বাসতে হলে নির্লিপ্ত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়। গুরুজী বলেন তিনি ঘোর সংসারী; বাস্তবিক তাঁর বিশ্বজোড়া প্রকাণ্ড সংসার। সংসারী লোক নিজের গুটিকতক ছেলেমেয়ে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে, আর গুরুজী সমস্ত বিশ্বের জন্যে চিন্তিত। যেখানে পীড়িত ক্ষুধিত বিপন্ন সেখানে গুরুজীর ব্যথিত চিত্ত বুক দিয়ে গিয়ে পড়ে।

—সে-সব সেবা ত আপনারা করেন, গুরুজীর তাতে বাহাদুরী কি ?

—সমস্ত বাহাদুরীই তাঁর। হাতপা-গুলো কাজ করে আর অদৃশ্য মস্তিষ্ক নিশ্চিন্ত থাকে একথা বলাও যা, আর গুরুজী নিশ্চেষ্ট, আমরাই কাজ করি, একথা বলাও তাই।

—আপনাদের কি কি করতে হয় ?

—পালা করে ঠাকুরের সেবা, পশুসেবা, আশ্রমের সেবা, দুঃখীদের সেবা করতে হয়; গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে অক্ষম গৃহস্থ-দের ছেলেমেয়েদের বৌঝিদের পড়াতে হয়...সকাল সন্ধ্যায় আমাদেরও লেখাপড়া করতে হয়।

—আপনারা নিজেরাই পড়েন, না কেউ পড়ান ?

—নিজেরাও পড়ি, কখনো কখনো গুরুজীও পড়ান, কোনো বিদ্বান শিষ্য উপস্থিত থাকলে তিনিও পড়ান।

—কি বই পড়েন ?

—সব বই, কোনো বাছবিচার নেই। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস; বাংলা ইংরিজি সংস্কৃত ফার্সী; যার যা খুসি আর যে যা পারে, সে তাই পড়তে পারে।

ইহা শুনিয়া মালতী সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কি অনেক বই আছে ?

—অনেক। এই পাশের ঘরেই পাঠাগার।

—এখানে পুরুষ কতজন আছেন।

—এখন মাত্র তিনজন আছেন। সকলে প্রচার ও সেবা করতে বেরিয়েছেন।

—আর-একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে করবেন না।......স্ত্রী-পুরুষে একত্র একবাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা, এটা......

শান্তি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তেমনি শান্তভাবে বলিল—বিপদের আশঙ্কা যে নেই তা নয়, কিন্তু কখনো কিছু অন্যায় ত ঘটেনি। সকলেই খুব গভীর একটা বেদনা নিয়েই এখানে আসে, তার-পর গুরুজীর উপদেশ মেনে আর নিয়মে থেকে সকলেই বেশ সংযত হয়ে যায়।

মালতী কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—কিন্তু স্বভাব কি একেবারে অতিক্রম করা যায় ?

শান্তি বলিল—জানিনা যায় কিনা। কিন্তু গুরুজী বলেন যায়। যোগের দ্বারা আত্মশাসন সহজ হয়।

যোগের দোহাই-এর পর আর কথা চলিল না। একটা সন্দেহকে আর-একটা না-জানা বিষয় দিয়া চাপা দেওয়া বড় সহজ। মালতী নিরুত্তর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। শান্তি বলিল—চলুন, আরতির সময় হয়েছে।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া শুচি হইয়া মালতী যখন ঠাকুরঘরে গেল তখনই আরতি সমাপ্ত হইল। গুরু তখন কীর্ত্তন গান আরম্ভ করিলেন,

বদনচান্দ কোন্ কুন্দারে কুন্দিল গো,
কে না কুন্দিলে দুই আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেইসে পরাণ তার সাখি॥

* * *

রতন কড়িয়া কেবা যতন করিয়া গো
কে না গড়াইয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণ গো
যোগী হইল ওহারি ধেয়ানে॥

* * *

করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মঢ়িত তার আগে।
যৌবন-বনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে॥"

মালতীর এ গান গুরুজীর মুখে ভালো লাগিল না। তাহার মনে কেবলি প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—এ কি ধর্ম্মসঙ্গীত?

৩৬

গান সমাপ্ত করিয়া প্রেমানন্দ আপনার কক্ষে আসিয়া বসিলেন; সমস্ত শিষ্য শিষ্যারাও আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। প্রেমানন্দ মালতীকে বলিলেন—কেমন রাধারাণী, তোমার এই নূতন জীবনের আরম্ভ কেমন লাগছে? সাধন করতে করতে দেখবে যে ত্যাগে নির্ম্মল শান্তি, ভোগে উল্লাস মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যই মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম; সেই ধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত পালন করতে পারলে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হয়; সেই যে বিবাহ, তার আনন্দের সীমা নাই। জীবাত্মা পত্নী, পরমাত্মা স্বামী; তিনি শ্রীকৃষ্ণ, আমরা গোপী; এই পরমভাব অন্তরে পরিস্ফুট হলেই মানুষের সকল দুর্গতি দূর হয়। এই পথ নিতান্ত দুর্গম বা আনন্দ-হীনও নয়; একটু চেষ্টা করে একবার অন্তরকে অনন্তের সুরে মিলিয়ে যদি দিতে পার তাহলে দেখতে পাবে যে এ জীবন তানলয়যুক্ত একটি সঙ্গীত,—একদিকে যেমন নিজে স্বতন্ত্র আর-একদিকে বিশ্বের একতান সঙ্গীতের সঙ্গে মিল গেঁথে চলেছে। যদি তুমি শুধু তোমার নিজের সুরটিই বাজাও তবে তাতে করে একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত হবে না; তোমাদের প্রাণের মধ্যে যে ভালোবাসার সুর বেজেছে, তাকে রাগিণীতে বাজিয়ে তুলতে হলে বিশ্বের অপর সুরের সঙ্গে অনুকূলভাবে মিলিয়ে তুলতে হবে। কেমন? কথাটা ঠিক বুঝতে পারছ ত?

মালতী আঘাতের পর আঘাত পাইয়া পাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সবশেষে যখন তাহার সৌভাগ্যতরণী সাতঘাটের জল খাইয়া, ঝড় তুফান কাটাইয়া বন্দরে ভিড়িতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় এই একটা কোথাকার কে সন্ন্যাসী গুপ্ত শৈলশৃঙ্গের

মতো, চোরা বালির মতো, অকস্মাৎ কুহক বিস্তার করিয়া তাহা বানচাল করিয়া দিয়াছে, হয়ত বা ঘাটে আসিয়া ভরাডুবি হইবে; এজন্য মালতীর মন প্রেমানন্দের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। সে প্রেমানন্দের প্রশ্নের উত্তরে নিতান্ত মুখরার মতো বলিল —আমি আপনার শিষ্যা হবার যোগ্যা নই, ওসব কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করবেন। আমার মনে হয় যে বিশ্ব-প্রেমের একতান সঙ্গীতে যোগ দেবার আগে নিজের হৃদয়-যন্ত্রকে ভালো করে ঠিক সুরে বেঁধে নিতে হবে; তা যদি না হয়, তবে ত বেসুরো যোগ দিয়ে সমস্ত সঙ্গীতকেই নষ্ট পণ্ড করে ফেলা হবে। আমরা কোনো জিনিষকে ত ভালো বলেই ভালো বলিনে, ভালো বাসি বলেই ভালো বলি; মানুষকে যদি আগে ভালোবাসি তবেই সে আমার চোখে সুন্দর হয়ে দেখা দেবে, তার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করা প্রেমেই সহজ হয়ে উঠবে।

প্রেমানন্দ মালতীর নিঃসঙ্কোচ কথা শুনিয়া খুসী হইয়া বলিলেন—তাই ত। সেই কথাই ত আমিও বলছি। সংযমসাধনার দ্বারা আপনার হৃদয়যন্ত্রকে বেঁধে তুলতে পারলেই বিশ্বসঙ্গীতে সে হৃদয় আর বেসুরো বাজবে না; তখন সকলকেই বেশ ভালো লাগবে।

মালতী বলিল—সেই ভালো লাগা কি সন্ন্যাস ছাড়া হয় না? মানুষ যখন এক-জনকে ভালোবাসতে শেখে তখনই যে তার কাছে সমস্ত জগৎ মধুময় হয়ে ওঠে।

প্রেমানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—রাধারাণী, তুমি সম্ভোগ আর প্রেমকে এক করে ভুল করছ। আমি ত তোমাদের মিলনকে বাধা দিচ্ছি না, তোমাদের সম্ভোগের লালসাকে দমন করে আধ্যাত্মিক মিলনে যোগযুক্ত হতে বলছি।

—ভগবানকে ভালোবেসে মানুষকে ভালোবাসা সহজ, না, মানুষকে ভালোবেসে ভগবানকে ভালোবাসা সহজ?

—দুইই সমান। এক অপরের নামান্তর। যত্র জীব তত্র শিব। কিন্তু তাই বলে একটিকে বুকের কাছে আঁকড়ে বসে থাকা মোহ মাত্র, তাতে করে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

—তা হলে কি সংসারধর্ম্ম পালন করা অপকর্ম্ম? সংসারে থেকে তাহলে ভগবানকে পাওয়া যায় না?

—যায় না, এমন কথা বলা যায় না; তবে পাওয়া বড় কঠিন, যাঁরা নিস্পৃহ উদাসীন অথচ ভগবদর্পিতপ্রাণ সংসারী, তাঁরা পেতে পারেন। কিন্তু সে রকম ব্যক্তি দুর্ল্লভ। জলে ডুবব অথচ গায়ে জল লাগবে না, এমন কৌশল সকলে অবলম্বন করতে পারে না; তেমন লোক কোটিকে গুটিক মেলে।

—তা হলে আপনি কি বলতে চান যে ভগবান লোকগুলোকে ভোগাবার জন্যেই ভবসংসারে পাঠিয়ে আপনি এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছেন? সংসার ত্যাগ না করলে তাঁকে পাবার জো নেই বলছেন। তাঁকে পাওয়াই যখন মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য তখন সকলেরই সংসার ত্যাগ করে বনে যাওয়া উচিত। সংসার নষ্ট করবার জন্যেই কি তবে ভগবানের সংসার সৃষ্টি?

প্রেমানন্দ হাসিয়া বলিলেন—"সংসার" যদি জীবের পরিণতির অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির Stage of Development হয় তা হলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হলে সংসার ত নষ্ট হবেই। সে হিসাবে সংসার নষ্ট করার জন্যই সংসারের সৃষ্টি বলতে পার। তা ছাড়া জীবনের উন্নততম আদর্শ মাত্রেই সংসার নষ্ট করার অনুকূল। বুদ্ধ খ্রীষ্ট প্রভৃতির আদর্শ ত অনুকরণীয়, কিন্তু সকলেই যদি সে আদর্শে চলে তবে সংসার নষ্ট হতে একটি দিনও লাগে না। কিন্তু সে ভয় তোমার করতে হবে না, সবাই বনে গেলে বনই আবার সংসার হয়ে উঠবে। সংসার ঠিক চলবে, সংসার যে মানুষের কর্ম্মফল-ভোগের ক্ষেত্র! আমরা সংসার ছেড়ে এসেছি বলেই যে সংসারকে এড়িয়ে যাব তার ত জো নেই, কর্ম্ম ত আমাদের করতে হবে, এবং সেই কর্ম্মই আমাদের অনেককে সংসারে টেনে নিয়ে যাবে। সংসারে বৈরাগ্য ত আর পূর্ণ সৌভাগ্য নয়, আংশিক; ভগবানকে যতক্ষণ না পাব ততক্ষণ ত আর পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। সেই অংশকেই পূর্ণ করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান যখন তোমাদের ডেকে নিতে চাচ্ছেন, তখন কি তোমাদের উচিত হবে বিমুখ হয়ে বেঁকে বসে থাকা।

মালতী তর্ক হইতে নিরস্ত হইল। তখন প্রেমানন্দ সাংখ্য মীমাংসা বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মত আলোচনা করিয়া এমন একটা প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের খিচুড়ি তৈরি করিলেন যে তাহা মালতীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুপাক। বিপিনও চিরকাল কাব্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, দর্শনের দর্শন তার ভাগ্যে ঘটে নাই, এবং দর্শন তাহার কাছে সুদর্শন চক্রের ন্যায় নামে চমৎকার হইলেও বাস্তবিক বড় ভীষণ বোধ হইত। সে গুরুজীকে পাণ্ডিত্যের ভেল্কি খেলাইয়া মালতীর বাক্ রোধ করিতে সক্ষম দেখিয়া মনে মনে ভারি সন্তুষ্ট হইল। গুরুজীর প্রতি ভক্তি তাহার বিস্ফারিত চোখ দিয়া ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল।

গুরুজীর বাক্য তাহার নিকট যতই দুর্ব্বোধ ঠেকিতেছিল, তাহার ততই মনে হইতেছিল এসব যুক্তি একেবারে অকাট্য। মালতী নিশ্চয় গুরুজীর পাণ্ডিত্যের কাছে পরাজিত হইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

গুরুজী বক্তৃতা করিয়া মালতীর মুখ বন্ধ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত এমন করিয়া কেহ কখনো তর্ক করে নাই; যে কেহ তাঁহার নিকটস্থ হইয়াছে সেই তাঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া বিনীত শিষ্যের দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু মালতী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের লোক। প্রেমানন্দের মনের কাছে মালতী খুব বড় স্পষ্ট হইয়া রহিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

চয়ন

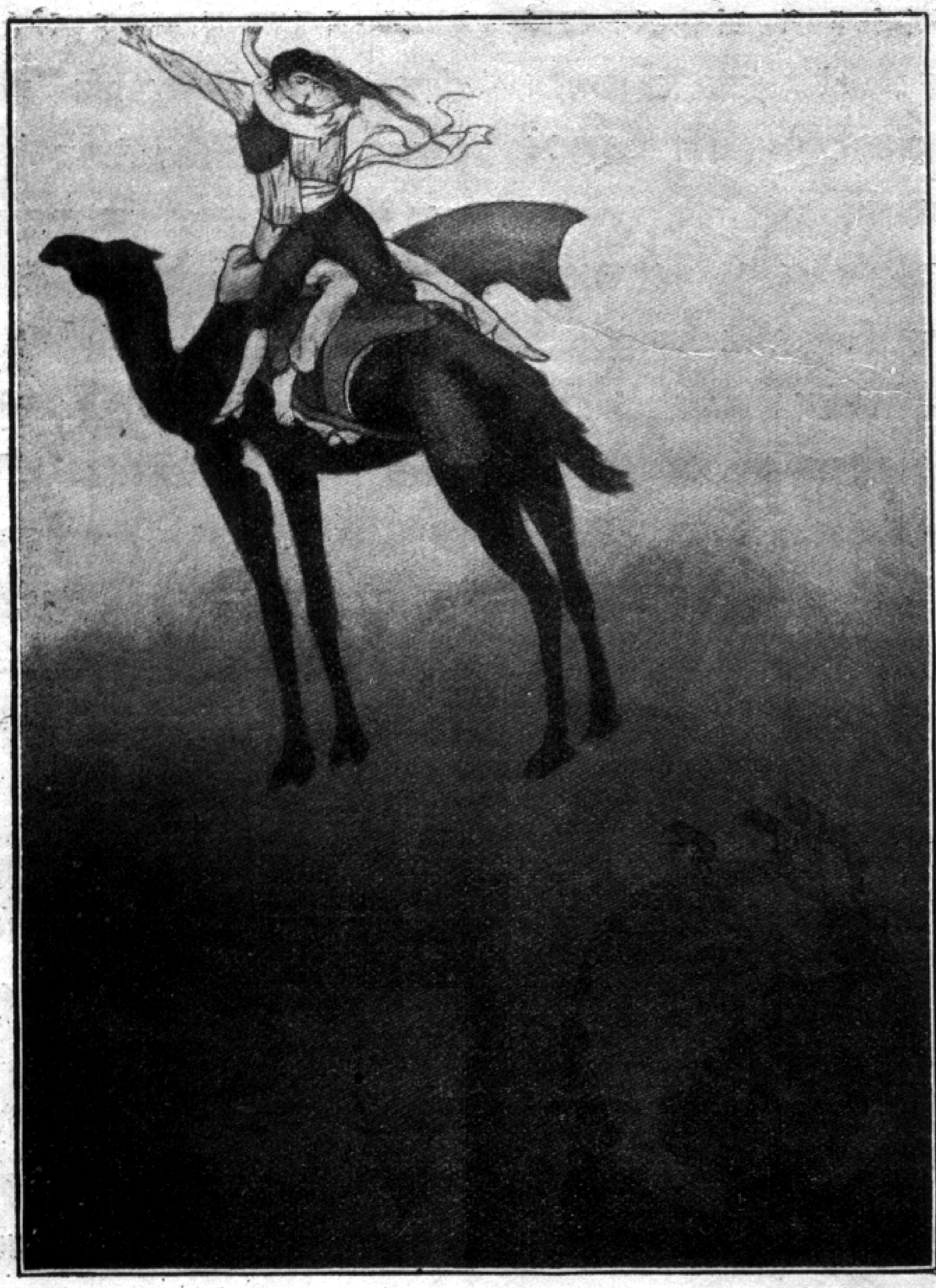
ছোটগল্প

একালের সাময়িক পত্রগুলি যেন ছোট গল্পের কল্পতরু। এটা হচ্ছে ছোটগল্পের যুগ,—যদিও এ-যুগের ছোটগল্পগুলি গুণ্‌তিতে যেমন, গুণে তেমন নয়।

এ বছরে যতগুলি ভাল গল্প বাহির হইয়াছে, একজন বিখ্যাত লেখক তাহার একটা হিসাব দিয়াছেন। এই হিসাবে একুশটি গল্প নির্ব্বাচিত হইয়াছে। গল্প-গুলির অধিকাংশই চরিত্রের গল্প। নির্ব্বাচক বলেন, ঘটনার গল্প অপেক্ষা চরিত্রের গল্পই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

"কথাসাহিত্যে চরিত্র-চিত্রণ বড় ? না, ঘটনা-সংস্থান বড় ?" একজন লেখক এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, "ছোটগল্পে মনোবিজ্ঞান বা চরিত্রচিত্র যতটা মোহন ও নিখুঁতরূপেই ফুটিয়া উঠুক না কেন,—গুপ্তরহস্য, অনিশ্চয়তা ও ঘটনা-বিচিত্র কাহিনীই পাঠককে বেশী আকর্ষণ করে। বাঁধা-গৎ ধরিয়া ছোটগল্প লেখা চাই। একজন স্থপতি কোন-একটা বাড়ী তৈয়ারি করিবার আগে, যেমন নক্সা প্রস্তুত করেন, একজন পটুয়া যেমন ছবি তৈরি করিবার আগে মূল বিষয়টি আঁকিয়া নেন, ছোটগল্প লিখিবার আগেও লেখককে তেমনি আখ্যানবস্তুর একটা মুসাবিদা করিয়া লইতে হয়। আগাগোড়া না ভাবিয়া-চিন্তিয়া লিখিতে বসা মারাত্মক ব্যাপার। দৈনন্দিন জীবনে যে-রকম স্বাভাবিক ঘটনা ঘটে, গল্প-বর্ণিত ঘটনাও ঠিক তেমনি হওয়া চাই। কল্পিত ঘটনা ছোটগল্পে একেবারেই অচল। গল্পলেখকের আখ্যানবস্তু কল্পিত হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু ঘটনাগুলি স্বাভাবিক হওয়া দরকার। তুমি নিজের ব্যক্তিগত খেয়ালমত যেমন খুসী তেমনি আদর্শের বাড়ী তৈয়ারি করিতে পার বটে, কিন্তু তৈয়ারী করিবার মালমশলাগুলি সত্যিকার হওয়া চাই। তোমাকে পাহাড় হইতে পাথর আনিতে হইবে, মাঠ হইতে মাটি আনিতে হইবে, বন হইতে কাঠ আনিতে হইবে।

আখ্যান-বস্তু আপনাতে-আপনি সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ;—এটি একটি প্রধান কথা। কোন ঘটনার জন্য যেন ব্যাখ্যার দরকার না হয়, আপনাদের উদ্দেশ্য তাহারা যেন আপনারাই বুঝাইয়া দিতে পারে। কল টিপিয়া দিলেই সে যেমন আপনার কাজ আপনি সারিয়া যায়, আখ্যান-বস্তুকেও ঠিক তেমনি করিয়া গড়িতে হইবে। ভাল প্লট তাহাকেই বলা যায়, যাহার ভিতরে একটিমাত্র সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ মূলঘটনা আছে। এই মূল ঘটনাটিই কতকগুলি স্বাভাবিক ও নিয়মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সুন্দর সমাহারে ক্রমে ক্রমে পুরন্ত হইয়া উঠিবে। প্রতি ঘটনাটির সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার একটানা শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া



অনন্তের পথে

উপসংহারকালে আকস্মিকভাবে মীমাংসাটি আনিয়া দিতে হইবে। এই মীমাংসা যথাসঙ্গত সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই; কারণ গল্পের কথা শেষ হইয়া গেলে পর, পাঠকের মন তার ব্যাখ্যানের জন্য আর অপেক্ষা করিবে না। আখ্যানবস্তুর জটিলতা অল্প দু'চার কথায় পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে।"

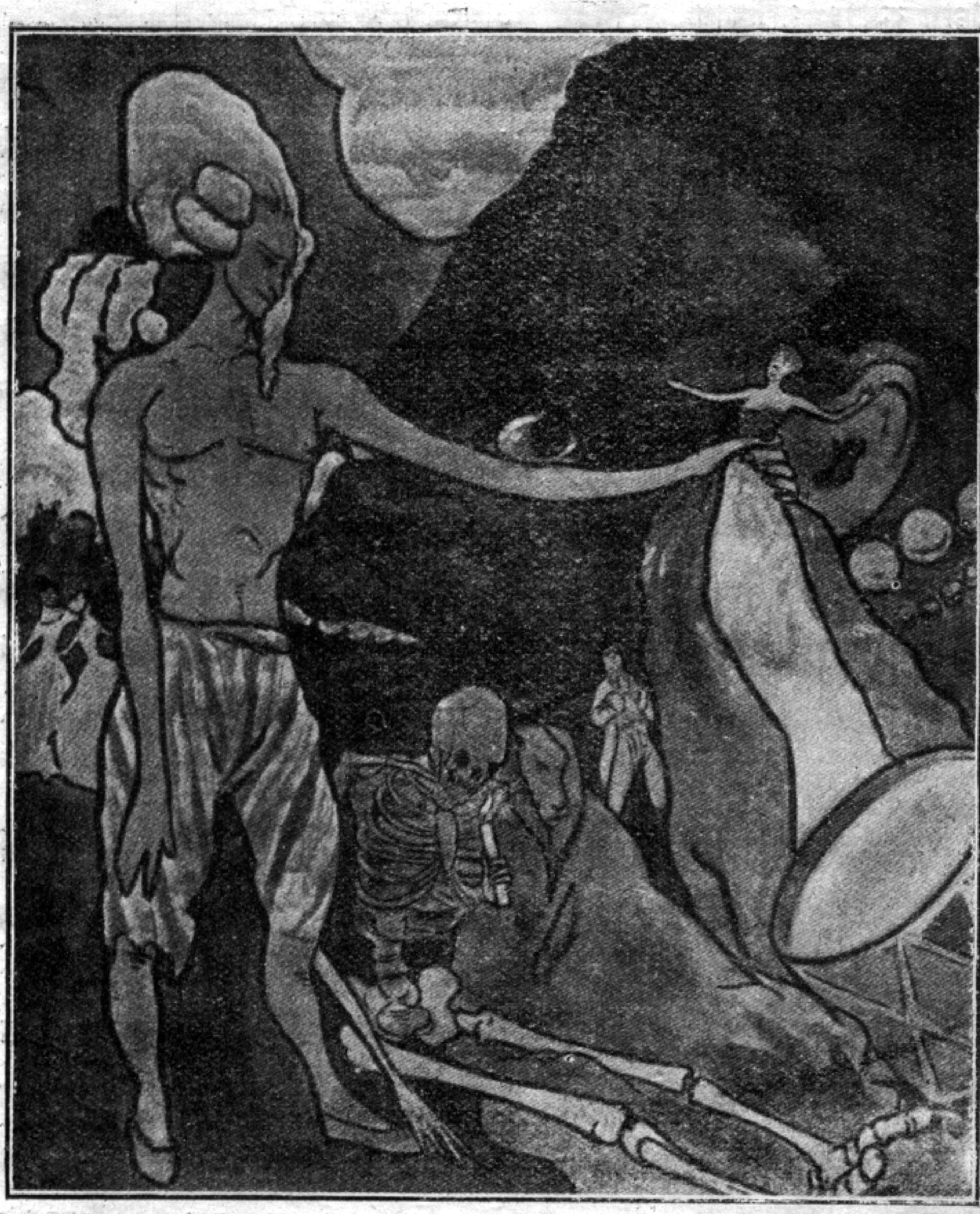
আর একজন লেখক বলিতেছেন:—"যতটুকু ঘটনা-সমাবেশে গল্প একঘেয়ে হইতে পারে না, ততটুকু ঘটনা-সমাবেশই ভাল—তার বেশী নয়; ঘটনার পর ঘটনায় পাঠকের নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ছোটগল্পে ঘটনা সমাবেশ করা হয় না। আখ্যানবস্তু, পরিণামের অনিশ্চয়তা ও গুপ্তরহস্য আমি ততটুকু চাই, যতটুকুতে গল্পের পাত্রপাত্রীগণের অদৃষ্টসম্বন্ধে পাঠকদের উদ্বেগ ধীরে ধীরে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে পারিবে। আসল কথা, গল্পে নায়ক-নায়িকারা কি করিতেছে বা কি করিবে আমি তাহা জানিতে চাহি না; আমি জানিতে চাহি নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রের স্ফূর্ত্তি।"

উপরে যে দুটি মত দেওয়া গেল, তাহা পড়িলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, একজনের মতে ছোটগল্প ঘটনাবহুল হওয়া দরকার—যেহেতু আখ্যানবস্তু চিত্তাকর্ষক না হইলে ছোটগল্প পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। আর একজনের মতে ঘটনাবহুলতা ছেলে ভুলাইবার জন্য। অতএব, কার্য্যদ্বারা চরিত্র বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া, চরিত্রের আসল রূপ ফুটাইয়া চরিত্র বিকশিত করাই শক্তিধরের কার্য্য।

—The Book News Monthly হইতে।

নব কলাবিদ্

বর্ত্তমান যুগে, পৃথিবীর সকল বিষয়ের সকল বিভাগেই পুরানো বাঁধা-গৎকে পায়ে দলিয়া অগ্রাহ্য করা হইতেছে। পুরাতনের আকার, পুরাতনের কল্পনা এবং পুরাতনের রীতি পদ্ধতিগুলি, আরও উজ্জ্বল আরও মানবীয় ও আরও সতেজ আকার, মহৎ কল্পনা ও সূক্ষ্ম রীতি-পদ্ধতির কাছে আমোল না পাইয়া আপনা-আপনিই সরিয়া পড়িতেছে। ললিত কলাতে আজকাল তাই চারিদিকেই প্রাচীনের পতন এবং নবীনের উত্থান দেখিতে পাইতেছি। অনুকরণের একঘেয়ে সৌন্দর্য্যকে ছাড়িয়া মানুষের চিত্ত এখন বৃহত্তর জীবনের বিশাল পরিধিকে এবং সর্ব্ববিষয়ের মূলীভূত কারণকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে চাহে। এযুগে যাঁহাদের নূতন ভাব ও কল্পনা আছে বিজয়মাল্য তাঁহাদেরই কণ্ঠে পড়িবে। এই নূতনত্বের মোহে পড়িয়া অনেকে অনেক অকেজো এবং উদ্ভট কল্পনাকে আকার দিয়াছেন;—যেমন, এক ক্ষ্যাপা শিল্পী প্রকৃতির সব জিনিষকে "ঘনক্ষেত্রে"র (cube) আকারে দেখিতে ও দেখাইতে চান!



ক্রৌড়ক

কিন্তু, এ-সব ক্ষ্যাপামির কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, জগতে এমন সকল ওস্তাদ-শিল্পী আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, যাঁহাদিগকে লইয়া বিদ্রোহী নবীনের দল যথার্থ গর্ব্বপ্রকাশ করিতে পারেন।

কিছুদিন আগে মিস্ ফিলিস ভিঃার ক্যাম্পবেল নামে এক মহিলা-শিল্পীর আঁকা কয়েকখানি ছবি বিলাতের স্থানবিশেষে প্রদর্শিত হয়। ফলে, প্রদর্শনীর প্রথম দিবসেই চিত্রকারিণীর নাম বিলাতের শিল্প-সমাজে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।

চিত্রার্পিত এই সকল 'ট্রাজেডী'র দিকে চাহিয়া দেখিলে মহাকবি দান্তেকে মনে পড়িয়া যায়। জীবন ও মরণের গভীর অজানা বিশাল রহস্য লইয়া এই শক্তি-শালিনী মহিলা, তাঁহার কল্পনাকে যেরূপ অবলীলাক্রমে লীলায়িত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের প্রাণ-বীণার তন্ত্রীগুলি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে না; নিট্‌শে, ইব্‌সেন ও পো প্রভৃতির মত প্রতিভার অধিকারী না হইলে মানুষের চিত্তবৃত্তিকে এমনভাবে অভিভূত করা বড় শক্ত কথা।

ক্যাম্পবেলের চিত্রগুলি চিহ্নাত্মক। অথচ, শিল্পীর কল্পনা-লীলার ভিতরে কিছু-মাত্র জটিলতা নাই—তিনি যাহা বলিতে চান, পরিষ্কার দিনের আলোর মত সবাই তাহা বুঝিতে পারে। যাঁহারা বৈঠকখানার দেয়াল সাজাইবার জন্য বাজারে তস্‌বির কিনিতে বাহির হন, তাঁহারা অবশ্য এই ছবিগুলিকে একেবারেই অপছন্দ করিবেন; কিন্তু যাঁহারা পট বলিতে রঙচঙে খেল্‌নামাত্র বুঝেন না, তাঁহারা এই নক্‌সাগুলির ভিতরে তুলির টানে টানে একএকটি নূতন ও গভীর অর্থের সন্ধান পাইবেন।

প্রথম ছবিখানির নাম, "অনন্তের পথে।" —জীবন হইতে পরলোকের দুর্জ্জেয়তার মধ্যে যুগল আত্মা নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে। উষ্ট্র তাহাদের বাহন; তাহা সত্যের চিহ্ন-জ্ঞাপক। সীমার নাগপাশ ছাড়াইয়া এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকা অসীম-অনন্তের ভিতরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। দৃশ্যমান বিশাল শূন্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহারা সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বংসের সম্মুখে পড়িলেও প্রেম যে আত্মমহিমায় আপনি অটল থাকে, এই ছবিখানি তাহাই প্রকাশ করিতেছে।

দ্বিতীয় চিত্র—"ক্রীড়ক।"—জীবন একটা মিছা জাঁকজমক ও খেলো খেলনা মাত্র; পর্ব্বতপ্রমাণ কাক্রির মস্তক জীবনের মূর্খতা ও অজ্ঞানতাকে দেখাইতেছে। খেলোয়াড় তাহার পুতুলটিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছে, তাহার কোথাও কোন খুঁৎ আছে কিনা! অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যে প্রদীপহস্তে বসিয়া মৃত্যু তাহার শূন্য করোটির ভিতরে লুপ্ত দৃষ্টিকে অন্বেষণ করিতেছে। আমরা যাহাকে অস্তিত্ব বলি, "ক্রীড়কে" তাহাই সূচিত।

তৃতীয় চিত্র,—"যাদুকর"।—চীনা যাদুকরটি মন্ত্র পড়িয়া স্বেচ্ছায় এমন এক দানবের সৃষ্টি করিয়াছে, জন্মিয়াই যে তাহার জন্মদাতাকেই ফলার করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমরা সাধিয়া আপন অমঙ্গলকে আপনি ডাকিয়া আনিয়া আত্মাহুতি দি,—এই চিত্রে তাহাই সূচিত হইতেছে।



যাদুকর

সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা

গুণের যতই কদর থাক্,—মানুষের কাছে রূপের কদর অন্তরের গুণকেও মলিন করিয়া দেয়। সৌন্দর্য্যচর্চ্চা সকল দেশে সকল সমাজেই আছে। তবে, জীবন-সংগ্রামের ধাকাটা পুরুষদিগকে বেশীমাত্রায় সামলাইতে হয় বলিয়া, রূপের দিকে তাহাদের নজর ততটা নাই, পুরুষের সবল বাহুর ছায়াশ্রিত রমণীদের যতটা আছে।

য়ুরোপের অভিনেত্রী-সমাজে আবার এই রূপচর্চ্চা চরম সীমায় গিয়া উঠিয়াছে। সুরূপ নট যত শীঘ্র দর্শকের মনকে মন্ত্র-পড়া সাপের মত বশ করিতে পারে, কুরূপ তেমন পারে না। রূপানুশীলনের দিকে নটসমাজের দৃষ্টি তাই এত সতর্ক।

য়ুরোপে এই রূপের অনুশীলন বহুযুগের অভিজ্ঞতায় এমন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে



অভিনয়-সজ্জায় সারা বার্ণাড

যে, যৌবন-বসন্তের মধুপুষ্প বার্দ্ধক্যের কঠোর শীতেও তমুলতা হইতে সহজে খসিয়া পড়িতে পারে না। প্রাচ্যের বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন, "জোয়ারের পানী নারীর যৌবন—!" প্রতীচ্য এ কথায় কিছুতেই কাণ পাতিবে না।

ইতিহাসে যে-সকল রমণীর রূপ, উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছে, সৌন্দর্য্যচর্চ্চার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি যে যথেষ্ট প্রখর ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ক্লিওপেট্রা, লুক্রেশিয়া বোর্গিয়া, রোসামন্দ, ও মেরী, কুইন-অফ-স্কট্স প্রভৃতি রমণীরা কতযুগ আগে মানুষের মনের উপরে রূপের যে রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, কালের নির্ম্মম কর আজিও তাহা মুছিয়া দিতে পারে নাই। রত্নখচিত কাচ-পাত্রে ক্লিওপেট্রা নানাবিধ সুগন্ধ তৈল ও প্রলেপাদি রাখিয়া দিতেন। লুক্রেশিয়া নানা ফলের নির্য্যাস ব্যবহার করিতেন। একজন ইতালীয় ডাক্তারের পরামর্শে মেরী ষ্টুয়ার্ট বিবিধ দ্রব্যের সারাংশ লইয়া আপন রূপের প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেন।

সভ্যদেশের মধ্যে একালে ফ্রান্সে যতটা রূপচর্চ্চা হয়, ততটা আর কোথাও নয়। জরার কবল হইতে দেহলাবণ্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে ফরাসীরা সকল জাতির চেয়ে বেশী ওস্তাদ। ফ্রান্সে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও চর্ম্মবিজ্ঞানের (Dermatology) বিশেষজ্ঞগণ স্বজাতির দেহে চপল রূপকে বন্দী করিবার জন্য নানারূপ ফাঁদ পাতিবার ফন্দী করিতেছেন।

দেশভেদে রূপ-রক্ষার উপায়ও বিবিধ। ইংরাজ রমণীরা প্রধানত মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিয়া বেশী ফল পান। সুইডেনের রমণীরা প্রধানত মাংসপেশী মর্দ্দন ও জিমনাষ্টিক করিয়া দেহকে স্বাস্থ্য-সবল রাখেন। কিন্তু সুগন্ধ তৈল ও বিবিধ দ্রব্যগুণের উপরেই ফরাসী মহিলাদের বিশ্বাস ও ঝোঁক বেশী। তবে, রূপকে স্থায়ী করিতে হইতে হইলে সকলকেই নিয়মিত স্নান, ব্যায়াম ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়।

রূপচর্চ্চার জীবন্ত নিদর্শন চির-যৌবনা সারা বার্ণহার্ডট্। সারার বিখ্যাত পারিবারিক ডাক্তার কাইস্মারেটো বলেন, প্রতিদিন নিয়মমত সৌন্দর্য্যচর্চ্চা ও কর্ম্মময় জীবন-যাপন করিয়াছেন বলিয়াই সারা বার্ণহার্ডটের কাছ হইতে যৌবন-রূপ আজিও বিদায় মাগিতে পারে নাই।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবারে পৃথিবীর এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী জন্মগ্রহণ করেন। সারার বয়স এখন একাত্তর বৎসর। কিন্তু এই বয়সেও তাঁহার মুখ, চোখ, দেহ ও গতি যুবতীর মত সবল ও সতেজ। তাঁহার মাথার চুল পাকিয়া গেলেও দেহের কোথাও বার্দ্ধক্যের কুঞ্চন-রেখা পড়ে নাই। তাঁহার স্বর এখনও কিছুমাত্র ক্ষীণ ও বিকৃত হইয়া যায় নাই। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের বাহু ও চরণের ভঙ্গিমা এমন মধুর যে, তাহা অনায়াসেই যে-কোন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের প্রতিমার আদর্শ হইতে পারে। সারা প্রতিদিন যে পরিশ্রম করেন, অনেক যুবকও তাহা পারেন না। সংপ্রতি ফ্রান্স হইতে খবর আসিয়াছে,

সারার একখানি পা, কোন অসুখের জন্য চিকিৎসকেরা একেবারে কাটিয়া দেহ হইতে আলাদা করিয়া দিয়াছেন। অস্ত্রচিকিৎসার আগে সকলেরই আশঙ্কা ছিল, এত বয়সে এরূপ গুরুতর ব্যাপার সারার পক্ষে হয়ত সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু সারা আপনার স্বাস্থ্যের সবলতা জানিতেন। তাই তিনি নিজেই জোর করিয়া চিকিৎসকগণকে অস্ত্রচালনায় বাধ্য করেন।

রূপরক্ষার জন্য ফরাসী মহিলারা "সৌন্দর্য্য-স্নান" (beauty baths) করেন। সারা বার্ণহার্ডট্ এই সৌন্দর্য্য-স্নানের অত্যন্ত পক্ষপাতী। এই প্রসিদ্ধ সৌন্দর্য্য-স্নানকালেই সারা, তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন নূতন নাটকের ভূমিকাপাঠ শ্রবণ করিতেন। লিনা ক্যাভেলিয়ারি আপনার কান্তিকে কোমল রাখিবার জন্য দুগ্ধধারায় স্নান করেন। (বাঙ্গলা দেশের রমণী-সমাজেও দুধের সর



অভিনয়-সজ্জায় সারা বার্ণাড

গায়ে মাথার রীতি আছে) জেন হেডিং নামক বিখ্যাত রূপবতী মহিলা, ষ্ট্রবেরি ফলের ফেনিল রস গায়ে মাখিতেন। লেন্থেল্মি নামে আর একজন অভিনেত্রী স্যাম্পেন-মদের ধারায় সৌন্দর্য্য-স্নান করিতেন!

—Nash's Magazine হইতে।

শিশু-শিক্ষা

আমেরিকায় এখন শিশু-শিক্ষা লইয়া একটা নূতন আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, শিশু-শিক্ষার বর্ত্তমান পদ্ধতি ঠিক নয়। পৃথিবীর যে-সকল ব্যাপার যে-সময়ে জানা দরকার, শিশুরা ঠিক সেই সময়টিতে সে-সব ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ-লাভ করে না। শিশুরা এখন আট বৎসর বয়সে যতটা জ্ঞানলাভ করে, আরও অল্প বয়সে তাহাদিগকে ঠিক ততটা পরিমাণেই জ্ঞানবান হইতে হইবে। অনেকে শিশুদের জন্য নব আদর্শের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এখানে আগে নানা বিষয় শিখিয়া, শিশুরা উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। উচ্চতর বিদ্যালয়-গুলির কার্য্যকালও সংক্ষিপ্ততর করিবার কথা উঠিয়াছে। এই কথা কার্য্যে পরিণত হইলে, ছাত্রেরা এখনকার চাইতে অল্পবয়সে কলেজে প্রবেশ করিতে পারিবে।

এখনকার প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে অনেক অকারণ বাহুল্য আছে। সেই বাহুল্যকে পরিহার করিয়া শিশুদের প্রথম শিক্ষাকালটা আসল কাজে খাটাইয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।—এইটি

সংপ্রতি উইনিফ্রেড স্যাক্ভিল ষ্টোনারের "Natural Education" নামে যে নূতন ও বিখ্যাত বইখানি বাহির হইয়াছে, তাহাতে নব শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি ও তাহার আশ্চর্য্য ফললাভ সম্বন্ধে চিত্তগ্রাহী আলোচনা আছে। লেখিকা বলেন, "শিশু-জীবনের প্রথম পাঁচ ছয় বছর বাজে কাজে লাগাইয়া, আমরা সময়ের অত্যন্ত অপব্যবহার করি। নিয়মিত শিক্ষা দিতে পারিলে ঐ সময়টাতেই অন্য সময়ের চেয়ে ঢের বেশী ফল পাওয়া যায়। তাহাতে পরজীবনের ছয়,—এমন-কি দশ বৎসরব্যাপী অকারণ শিক্ষার পেষণ-যন্ত্র হইতে ছাত্রগণ পরিত্রাণ পাইতে পারে! আমাদের মনে একটা বিশ্বাস আছে যে, পাঁচ ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের জোর করিয়া লেখাপড়া শেখানো উচিত নয়। তারা একটু-আধটু যাহা শিখে, তাই ভাল; কারণ, তাদের হাল্কা মস্তিষ্ক গুরুতর শিক্ষার গুরুভার সহিতেপারে না। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা, —এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।"

শ্রীমতী ষ্টোনার কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়া কোন কথা বলেন নাই; তিনি তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতিকে হাতে-নাতে কাজে

উইনিফ্রেড। তাহার বয়স বারো বৎসর। এই বয়সে সে এত বিষয় শিখিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরিণতবয়স্ক গ্রাজুয়েটের কাছ হইতেও ততটা আশা করা যায় না।

উইনিফ্রেড, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান ও ইংরাজী ভাষায় লিখিতে, পড়িতে ও কথা কহিতে পারে। স্পেনীয় ও ইতালীয় ভাষাতেও তাহার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। এস্পারেণ্টোতে সে দুই-তিনখানি ছোট-ছোট বই লিখিয়াছে। বই না দেখিয়া ভার্জিল ও সিসেরোর রচনা হইতে সে দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ আবৃত্তি এবং তার ভাব ব্যাখ্যা করিতে পারে। নামজাদা অধ্যাপকেরা তাহাকে নানারূপে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কোনমতেই কেহ তাহাকে ঠকাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব ভাল ছাত্রও যে তাহার চাইতে ভাল প্রশ্নোত্তর দিতে পারে না, ইহাও সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

শুধু লেখাপড়াতে নয়, উইনিফ্রেড নানা ললিত-কলাতেও সিদ্ধব্রত। পিয়ানো ও বেহালায় তার হাত ভারি মিষ্টি। নাচেও তাহার পটুতা বড় কম নয়। নাচে ও বাজনায় সে এতটা দক্ষ যে, ভবিষ্যতে ইচ্ছা করিলে সে রঙ্গমঞ্চে নাচিয়া-বাজাইয়া অনায়াসে নাম ও পয়সা করিতে পারে। চিত্র-অঙ্কনেও সে যথেষ্ট নিপুণা!

পিটস্‌বার্গে যত দাবাবোড়ে-খেলোয়াড় আসিয়াছে, উইনিফ্রেড তাহাদের সবাইকে হারাইয়া দিয়া নাম কিনিয়াছে। অনেক ওস্তাদ দাবাবোড়ে-খেলোয়াড়কেও তাহার ক্রীড়াদক্ষতায় হার মানিতে হইয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীতত্ত্বের উপরে সে যে কয়খানি নোটবই লিখিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া কোন অধ্যাপক বলিয়াছেন, অনেক ভাল কলেজেও ঐ নোটবইগুলি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে।

অনেকে এখানে ভাবিতে পারেন, এত অল্পবয়সে এমনভাবে মস্তিষ্কচালনা করাতে উইনিফ্রেডের শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু তা নয়। চব্বিশ বৎসর বয়সে যে-রকম ক্ষমতা স্বাভাবিক, বারো বৎসর বয়সে সে ঠিক সেইরকমই শক্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে,—ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে তাহার সমবয়স্ক আর কোন বালিকার গায়ে এত বেশী জোর নাই। উইনিফ্রেডের গড়নও খুব বাড়ন্ত, দেখিতে তাহাকে ষোল, সতেরো বছর বয়সের যুবতীর মত। তরবারি-খেলায়, দৌড়ানোতে, মুষ্টিযুদ্ধে অনেক পুরুষও তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।

উইনিফ্রেড এই বয়সেই নানা বিষয় লইয়া দশ-এগারোখানি ছোট ছোট বই লিখিয়া ফেলিয়াছে। গতবৎসরে কলমের জোরে সে দেড় হাজার টাকারও বেশী রোজগার করিয়াছে। তাহাকে অনেক বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, নহিলে সে আরও ঢের বেশী টাকা রোজগার করিতে পারিত। তুমি ফরমাস দিলে সে যে-কোন বিষয় লইয়া কবিতা-রচনা করিতে পারে। প্রফেসর ও-সিয়া, একবার কোন ছাত্ররচিত একটি প্রবন্ধ উইনিফ্রেডের হাতে দিয়া বলেন, "এই গল্পটাকে পদ্যে পরিণত কর দেখি।"

টাইপরাইটারের সুমুখে বসিয়া উইনিফ্রেড সেই গন্থ-প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া বারো মিনিটের ভিতরে একটি চুয়াল্লিশ পংক্তির কবিতা লিখিয়া ফেলিল। আমরা এই গন্থ ও পন্থ হইতে প্রথম অংশ তুলিয়া দিলাম।

গন্থ :—Bones is the framework of the body. If I had no bones in me I should not have so much shape as I have now. If I had no bones, my brain, heart, lungs, and larger blood-vessels would be lying round in me, and might get hurt."—ইত্যাদি।

উইনিফ্রেডের পন্থ :—

"The framework of the body is
  The bones—so teachers say ;
And if we didn't have'em
  Our shape it wouldn't stay.
Besides, some bones my liver
  And brain and even heart
Would get some awful hurtin's
  And maybe come apart."

—ইত্যাদি।

শেষ দুই-তিন বৎসর ছাড়া, উইনিফ্রেড বরাবর তার মায়ের কাছ থেকেই লেখাপড়া শিখিয়াছে। শ্রীমতী ষ্টোনার বলেন, "স্বাভাবিক শিক্ষা-পদ্ধতি"র প্রথম কথা কি? একরকম জন্মের সঙ্গেসঙ্গেই শিশু-শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। উইনিফ্রেড যখন একরত্তি কচি মেয়ে, শ্রীমতী ষ্টোনার তখন তাহাকে দোলায় শুয়াইয়া ভার্জিলের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ঘুম পাড়াইতেন। কবিতার সুরে শিশু কান্না ভুলিয়া ঠাণ্ডা হইয়া থাকিত। উইনিফ্রেডের বয়স যখন একবৎসরও পূর্ণ হয় নাই, তখনি সে আধো-আধো স্বরে ভার্জিলের *Æneid* হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিত। শ্রীমতী ষ্টোনার একটি বল লইয়া মেয়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিতেন, "Arma"! উইনিফ্রেড আবার বলটি মায়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিত, "Virumque।"

(ভার্জিলের একটি কবিতায় আছে :—
"*Arma virumque cano*
Troiae qui primas ab oris")

মিসেস ষ্টোনার মেয়ের সঙ্গে বল খেলিতে খেলিতে যখন দেখিতেন, কবিতার প্রথম কথাটি তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, তখন আবার তাহার পরের কথাদুটি—"cano" ও "Troiae"—মেয়েকে খেলিতে-খেলিতে মুখস্থ করাইতেন। এইরূপে, খেলাধূলার সঙ্গেসঙ্গে উইনিফ্রেড ভার্জিলের কবিতার পর কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়াছিল।

মিসেস ষ্টোনার বলেন, শিশুদের অজ্ঞাতসারে এইরূপ খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের শৈশবশিক্ষা ক্রমেই অগ্রসর করিতে হয়। দেশের ভাষাই হউক, আর বিদেশের ভাষাই হউক,—সমস্তই এই উপায়ে শিশুদিগকে শিখাইতে হইবে। অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল, বানান প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিশুদের দক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য মিসেস ষ্টোনার এক-এক বিষয়ের উপযোগী এক-একরূপ ক্রীড়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেণ্টদের কথা

জানাইবার জন্য মিসেস ষ্টোনার প্রেসিডেণ্টদের লইয়া একখানি নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন। তারপর উইনিফ্রেডের সামনে উক্ত নাটিকার অভিনয় হয়। ফলে, সে প্রেসিডেণ্টদের নাম ও কার্য্যাবলী সমস্ত ঠিকঠাক জানিয়াও সন্দেহ করিতে পারে নাই যে, তাহাকে কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে!

মিসেস ষ্টোনার আর এক উপায়ে মেয়েকে শিক্ষা দিতেন। তিনি নানারূপ জ্ঞানের কথা গল্পাকারে মেয়েকে শুনাইতেন —এমন-কি অঙ্কশাস্ত্রের নীরস কথাগুলিও! তাঁহার গল্পের পাত্রপাত্রীরূপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রভৃতি দৈত্যনামে বিরাজ করিত এবং এই অদ্ভুত দৈত্যগুলির কার্য্যকলাপ দেখিয়া উইনিফ্রেড তাহাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি মোটামুটি এক-রকম জানিতে পারিত। মিসেস ষ্টোনারের মতে, যাহার ভিতরে গল্প আছে, তাহার প্রতি শিশুদের টান্ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

অনেকে মনে করিতে পারেন, উইনিফ্রেডের মত অপূর্ব্ব বিদুষী বালিকা জগতে একটি কি দুটির বেশী জন্মিতে পারে না। কিন্তু মিসেস ষ্টোনার এ কথা মানেন না। তিনি বলেন, "আমার মেয়ের চরিত্রে সাধারণ বালিকা-চরিত্র অপেক্ষা বিশেষ কোন বিশেষত্ব নাই। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমি আমার কন্যাকে শিক্ষাদান করিয়াছি, সেই পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইলে জগতের সকল শিশুই উইনিফ্রেডের মত বিদ্বান হইতে পারিবে।"

মিসেস ষ্টোনারের শিশুশিক্ষাপদ্ধতি যাঁহারা ভাল করিয়া জানিতে চান, তাঁহারা তাঁহার "Natural Education" নামে নবপ্রকাশিত পুস্তক পড়িয়া দেখিতে পারেন।

—McClure's Magazine হইতে।

য়ুরোপের রাজনৈতিক গুপ্তচর

ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান-যুদ্ধের পর হইতেই, জার্ম্মাণ রাজ-সরকার ফরাসীদেশে গোয়েন্দার পর গোয়েন্দা পাঠাইতে সুরু করেন। এই গোয়েন্দার দল দোকানদার, জহুরী, স্বর্ণকার ও বিশেষ করিয়া হোটেলওয়ালার বেশে সারা ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

প্রথম-প্রথম জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট ফ্রান্সের গোয়েন্দাদলের কাছে পুরুষ-প্রতিনিধি পাঠাইয়া সমস্ত খবর জানিয়া লইতেন। ব্যাপারটা ধরিয়া ফেলেন। তখন, পুরুষ প্রতিনিধির বদলে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য স্ত্রী-প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল। এই স্ত্রীলোকগুলি আধাবয়সী ও ভদ্রবংশীয়া ছিল।

এই রমণী-চরেরা রেলপথে ফ্রান্সের নানান জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। মাঝে মাঝে কোন নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে থামিয়া, তাহারা ফ্রান্সের গোয়েন্দাদের সঙ্গে দেখা করিত।

আগেই তাহারা যে-যার আপন-আপন বক্তব্য চিঠি-পত্রের দ্বারা পরস্পরকে জানাইয়া যাইত।

গত দশবৎসর ফরাসীদের গুপ্তকার্য্য-বিভাগ জার্ম্মাণ গোয়েন্দাদলকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে। পঙ্গপালের মত সমস্ত ফ্রান্সটা আছন্ন করিয়া শত্রু-পক্ষের গোয়েন্দারা যে কিরূপ গুপ্তচক্রান্তে নিযুক্ত হইয়া আছে, ফরাসী গবর্মেণ্ট তাহার সব কথা জানিতে না পারিলেও কতক কতক আন্দাজ করিতে পারিলেন। দেশের গুপ্তকথা যাহাতে চিঠিপত্রের ভিতর দিয়া শত্রুরাজ্যে গিয়া পৌঁছিতে না পারে, ফরাসী গবর্মেণ্ট সেইজন্য ডাকবিভাগের কর্ত্তাদের নিকটে এক হুকুমনামা পাঠাইলেন।

কিন্তু হুকুমনামা শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাদের কাছে গোপন রহিল না। জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট বুঝিলেন ডাকে এখন কোনরকম সঙ্কেতলিপি বা সন্দেহজনক পত্র পাঠানো বিবেচনার কাজ নহে। অতএব তাঁহারা চিঠিপত্র লিখিবার এক নূতন কায়দা বাহির করিলেন। চিঠিগুলির ধরণ-ধারণ প্রায় এমনিধারাই হইত :—

"প্রিয় জর্জ্জ,

তুমি আমাকে যে টাকা ধার দিয়াছিলে, আমি তাহার সুদ পাঠাইলাম।

তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, আমরা তাহা ভুলিব না।

এখানকার খবর বড় মন্দ নয়, আগামী বৎসরে লাভের অংশ থেকে তুমি বোধ হয় কিছু বেশী টাকা পাইবে।

আমরা এ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, সর্ব্বদাই পত্র লিখিবে; তোমার সমস্ত খবর আমরা জানিতে চাই।

চার্লস খুড়াকে মিছাই তুমি অবিশ্বাস করিয়াছ, তিনি খুব ভাল লোক। তাঁর উপরে তুমি অনায়াসে নির্ভর করিতে পার।

আমার স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসা নাও। চার্লস, চার্লটী ও ফ্রেডারিকের আলিঙ্গনও গ্রহণ করিবে।"

চিঠিখানির আসল মানে :—

"আমি তোমাকে তোমার গেলমাসের মাহিনা পাঠাইলাম। তোমার দেওয়া খবর সন্তোষজনক। তুমি যদি এইভাবে বরাবর কাজ চালাইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আগামী বৎসরে তোমার মাহিনা বাড়াইয়া দিব। সংবাদ আরও বিশদভাবে ও তাড়াতাড়ি দেওয়া চাই। চার্লসকে অবিশ্বাস করিও না,—সে আমাদেরই লোক। চার্লস, চার্লটী ও ফ্রেডারিক নামে আমাদের যে তিনজন সংবাদদাতা আছে, তুমি তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিও।"

সাধারণত, গোয়েন্দাদের মাহিনা দিবার সময়েই জার্ম্মাণ গুপ্তকার্য্য-বিভাগের কর্ত্তারা ডাকমারফতে পত্রব্যবহার করেন। নহিলে, বিশেষ কোন দরকারি কথা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত রমণী-গোয়েন্দাদের দ্বারাই কাজ চালাইয়া নেওয়া হয়। কারণ, তাহাই অধিক নিরাপদ।

ফ্রান্সে যত জার্ম্মাণ গোয়েন্দা আছে, তাহাদিগের জন্য জার্ম্মাণ গুপ্তকার্য্য-বিভাগকে বৎসরে প্রায় চল্লিশ লক্ষ ডলার (এক ডলার প্রায় তিন টাকা দুআনা) খরচ

আগেই বলা হইয়াছে, গোয়েন্দারা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে থাকে। সময়ে সময়ে ফরাসী ডিটেকটিভেরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। ব্যবসায়ে গোয়েন্দাদের যে আয় হয়, ফরাসী-কর্তৃপক্ষ সেই আয়ের সঙ্গে গোয়েন্দার খরচের তুলনা করেন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী দেখিলেই ধৃত গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই অতিরিক্ত ব্যয় সংকুলানের জন্য সে কোথা হইতে টাকা পাইল? সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিলে ধৃত গোয়েন্দা বিপদে পড়ে। কিন্তু সে প্রায়ই পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রের মত চিঠি দেখাইয়া প্রমাণিত করে যে, অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য তাহার দেশ হইতে টাকা আসিয়াছে।

জার্ম্মাণদের মত ফরাসীরাও গোয়েন্দা পোষণ করে; কিন্তু জার্ম্মাণ গোয়েন্দাদের চাতুরীর কাছে তাহাদিগকে অনেকবার হার মানিতে হইয়াছে। ফরাসীরা যখনই জার্ম্মাণীতে গোয়েন্দা পাঠাইয়াছে, তখনই জার্ম্মাণ গুপ্তকার্য্যবিভাগে সে সংবাদ আগে থাকিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে! একবার ফরাসীদের নৌবিভাগ হইতে জার্ম্মাণীর হেলিগোল্যাণ্ড ও কিয়েল খাল প্রভৃতি জায়গার মানচিত্র আনিবার জন্য দুজন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীকে চর নিযুক্ত করা হয়। এই গুপ্তসংবাদ গুপ্ত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। সৈনিক কর্ম্মচারীরা অসামরিক পোষাক পরিয়া একখানি পান্সী ভাড়া করিলেন—সচরাচর লোকে যেমনভাবে জলবিহারে বাহির হয়, তাঁহারাও যেন তেমনি ভাবেই সমুদ্রে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। যথেষ্ট সাবধানে থাকিয়াও তাঁহারা কিয়েল খালের কাছে যাইবামাত্র বন্দী হইয়া, বিচারার্থ লিপযিকে প্রেরিত হইলেন। বিচারকালে ফরাসী কর্ম্মচারীরা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, জার্ম্মাণরা শুধু যে তাঁহাদিগকে গোয়েন্দা বলিয়া জানে, তাহা নহে; পরন্তু, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও অতি গোপনীয় কথাগুলিও আগে থাকিতেই শত্রুপক্ষের কর্ণগোচর হইয়াছে! তাঁহাদের মধ্যে একজন যে বহু বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি কেল্লার নক্সা লইবার জন্য জার্ম্মাণীতে আসিয়াছিলেন, এ খবরটাও লুকানো নাই!

আর একজন ফরাসী কাপ্তেন গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য ছদ্মবেশে বার্লিনে গিয়া হাজির হন। তাঁহার উপরে যাহাতে সন্দেহ হইতে না পারে, সেজন্য তিনি অত্যন্ত সাবধানে ছিলেন। বার্লিনের এক বিখ্যাত হোটেলে আহারাদি করিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একটি পরমা সুন্দরী মহিলা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছেন। ভিড়ের ভিতরে তিনি তাঁহার সঙ্গের লোককে হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং পথ না জানার দরুণ বাড়ী যাইতে না পারিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। মহিলাটিকে দেখিলেই বুঝা যায়, তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয়া।

ফরাসী কাপ্তেন এরূপ অবস্থায় ভদ্রলোকের যাহা করা কর্ত্তব্য—তাহাই করিলেন। তিনি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মহিলাটিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া, তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া আসিলেন।

হোটেলে ফিরিয়া আসিবামাত্র তিনি দেখিলেন, একজন ভদ্রলোক তাঁহার জন্য

অপেক্ষা করিতেছেন। কাপ্তেনকে দেখিয়া সেই ভদ্রলোক আপনার পরিচয় দিয়া বলিলেন, —"আমি এখানকার পুলিশ কমিশনার।"

কাপ্তেন আপনার "পাসপোর্ট" বাহির করিয়া দেখাইলেন।

পুলিশ কমিশনার ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, "আমাকে বোকা বনাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এই 'পাসপোর্টে' আপনার ছবি থাক্‌লেও এখানি যে আপনার ভাইয়ের, আমরা তা জানি।"—তারপর, তিনি বিস্মিত ও হতভম্ব ফরাসী কাপ্তেনকে একে একে জানাইয়া দিলেন যে, ফ্রান্সের কোন্ কোন্ রেজিমেণ্টে, কোথায় তিনি কাজ করেন, কবে, কোন্ তারিখে তিনি যুদ্ধ-বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ সময়ে সৈন্যদলে তিনি কোন্ কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং কোন্ তারিখে কোন্ জায়গায় তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল—এককথায় তাঁহার সমস্ত জীবনচরিতটি পুলিশ কমিশনার একনিশ্বাসে বলিয়া গেলেন,—এমন কি কাপ্তেন ঠিক কোন্ সময়ে বার্লিনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেটি পর্য্যন্ত!

জীবনচরিত সমাপ্ত করিয়া পুলিশ কমিশনার আপনার পকেট হইতে একখানা রুমাল বাহির করিলেন, তাহার উপরে কাপ্তেনের নাম ইত্যাদি লেখা ছিল। সেখানি কাপ্তেনকে দেখাইয়া পুলিশ কমিশনার আবার বলিলেন:—"আপনি যখন দয়া করে আমাদেরই এক স্ত্রী-গোয়েন্দাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে আমরা মহাশয়ের ঘরে ঢুকে আপনার পোর্টম্যাণ্টো'র কৃত্রিম তক্তা সরিয়ে এই প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। আসুন মশাই, ফ্রান্সে যাবার ট্রেণ শীঘ্রই ছাড়বে,—আমি আপনাকে সসম্মানে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দেব। বেশী ভাব্‌বেন না, আমরা আপনার জন্যে প্রথম শ্রেণীর কামরাই ভাড়া করেছি!"

—The Saturday Evening Post হইতে।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

তুকানিয়া ফকির

(পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীচিত্র)

তাহার নাম ছিল তুকানিয়া। সে তখন আমাদের বাড়ী কৃষাণের কাজ করিত। দৈনিক দুবেলা আহার এবং পূজার সময় একখানা নূতন কাপড় ও একজোড়া নারিকেল বাদে তাহার বার্ষিক বেতন পঁচিশ টাকার বেশী ছিল না। গরু চরাইতে, লাঙ্গল টানাইতে, জমী নিড়াইতে, ধান কাটিতে, হাঠঘাঠ করিতে ত তাহাকে হইতই, তাহাছাড়া, অন্য কোন পরিশ্রমের কাজ পড়িলে বিনা আপত্তিতে তাহাও সে তৎক্ষণাৎ করিয়া দিত। তখন হিন্দু-মুসলমানে বড় সদ্ভাব ছিল। একের সাহায্য

ভিন্ন অন্যের উপায় নাই জানিয়া উভয়েই উভয়কে প্রীতির চক্ষে দেখিত। হিন্দুরা তখন বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলমানগণকে "চাচা", "মামু", "নানা" এবং মুসলমানেরাও বয়োজ্যেষ্ঠ হিন্দুদিগকে "দাদা", "জ্যাঠা" "কাকা" প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে আহ্বান করিত। হিন্দুর কালীবাড়ীতে মুসলমানের মানত পাঁঠা-বলি হইত, হিন্দুরাও মুসলমানের দরগায় চিনি-বাতাসার শির্ণি দিত।

সেকালে সমস্ত জিনিসই অত্যন্ত সুলভ থাকায় তুকানিয়া এই সামান্য বেতনেও নির্ব্বিঘ্নে সংসার চালাইতে পারিত। তাহার সংসারটিও নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না, বৃদ্ধা মাতা, নিকা-করা স্ত্রী,একটি অল্প-বয়স্কা কন্যা, একটি ছয়মাসের পুত্র ও দুইটি তরুণবয়স্ক কনিষ্ঠ সহোদরের ভরণ-পোষণের ভার তুকানিয়ার উপর ছিল। আয়ের মধ্যে তাহার বেতনের কয়টি টাকা এবং পৈত্রিক দুই-তিন বিঘা জমীর উৎপন্ন সামগ্রীই সম্বল। ইহা ভিন্ন তাহার মধ্যম সহোদর বোঁচা ক্বচিৎ কখনও কোন গৃহস্থের বাড়ীতে রাখালের কাজ করিয়া দুই এক টাকা আনিয়া দিত। বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার দিনে অনেকে ধারণাই করিতে পারিবেন না, কি করিয়া এই সামান্য আয়ে তুকানিয়া অতগুলি লোককে প্রতিপালন করিত।

শীতকালে একদিন হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, তুকানিয়া "ফকিরী" লইয়াছে!—আর সে চাকুরী করিবে না! তাহার বাড়ী আমাদের বাড়ী হইতে বড় বেশী দূরে ছিল না, কিন্তু মুরগীর বাতাস গায়ে লাগিবার ভয়ে আমরা সেখানে বড় একটা যাইতাম না। তুকানিয়া "ফকিরী" লইয়াছে শুনিয়া আমার শিশু-হৃদয়ে সহসা একটা বিপুল বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। যে তুকানিয়া সাধারণ মানুষের মতই আমাদের বাড়ীতে কৃষাণের কাজ করিত,—যাহার কাঁধে চড়িয়া কত বেড়াইয়াছি, রাগের সময় যাহাকে কীল-চড় মারিতেও দ্বিধা করি নাই, সেই তুকানিয়া আজ কেমন করিয়া যে হঠাৎ একেবারে "ফকিরীর" উচ্চসম্মান লাভ করিল, আমি ত তাহা কোনমতেই ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একদিন স্নানের পূর্ব্বে ব্যাপার কি দেখিবার জন্য উহাদের বাড়ীতে গেলাম। দেখিলাম, তুকানিয়ার বৃদ্ধা মাতা উঠানের একপার্শ্বে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া সম্মুখে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে, আর তাহার চারিদিকে গ্রামের আরও দশবারো জন মুসলমান গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। উহাদের অসম্ভব গম্ভীর ভাব দর্শনে কোন প্রশ্ন করিতে আমার ভরসা হইল না। কাজেই মনের কৌতূহল মনে চাপিয়া ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলাম।

এমন সময় দেখি, তুকানিয়ার বাহির-বাড়ীতে কুলগাছের তলায় ঈশান ঘোষ দাঁড়াইয়া আছে। ঈশান আমার চেয়ে এক বৎসরের বড়;—গ্রাম-সম্পর্কে সে আমার খুড়া হয়। তাহার সঙ্গে আমার বড় বনিবনাও ছিল না; কারণ, সে এই বয়সে দুইতিন বার তাহার মামার বাড়ী টাঙ্গাইল অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়া নিজেকে একজন মাতব্বর ও

বহুদর্শী লোক বলিয়া মনে করিত, এবং আমরা গ্রাম ছাড়িয়া কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যাই নাই বলিয়া—কূপমণ্ডুক ভাবিয়া আমাদিগকে নিতান্তই করুণা ও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। যাহা হউক, আর কারো কাছে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ না থাকায় বাধ্য হইয়া আমাকে ঈশানেরই মুখাপেক্ষী হইতে হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ ঈশান, (সম্পর্কে খুড়া হইলেও, প্রায় সমবয়স্ক বলিয়া আমরা ঈশানকে নাম ধরিয়াই ডাকিতাম, তাহাকে খুড়া বলিয়া ডাকিতে গেলে নিজেকে যে ছোট করিতে হয় তাহাতে আমরা নারাজ ছিলাম),—তুকানিয়া নাকি "ফকির" হয়েছে? সে কেমন করে "ফকির" হল? সে কই? তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না!" ঈশান কহিল, "তোমরা পাড়া-গেঁয়ে ভূত,—জানইবা কি, আর বুঝই-বা কি? কোনদিন ত মায়ের আঁচল ছে'ড়ে কোন জায়গা গেলে না,—এসব ব্যাপার দেখ্‌বে কোথায় বল? আমি মামাদের ওখানে যে'তে আস্‌তে এমন কত "ফকির" দেখেছি। এসব আমার আর জান্‌তে বাকী নেই। তুকানিয়াকে কি আর এখন দেখ্‌বার উপায় আছে, সে ত মাটীর নীচে "কবর" নিয়েছে। দেখ্‌ছ না, তুকানিয়ার মা আর পাড়ার সকলে কবরের উপর পাহারা দিচ্ছে?

সত্যই তখন চাহিয়া দেখি, তুকানিয়ার মা ও পাড়ার অন্যান্য মুসলমানগণ যেখানে বসিয়া আছে, তাহার নিকটস্থ ভূমি ঢিবির মত উঁচু করিয়া তোলা হইয়াছে। সত্যই কি তুকানিয়া উহার নীচে আছে! কি সর্ব্বনাশ! মুসলমান মরিলেইত কবর দেয় শুনিয়াছি, তবে তুকানিয়াকে জীয়ন্ত কবর দিল কেন? সে মাটীর নীচে কি খায়? কোথায় শোয়? কেমন করিয়া তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসেরই বা কাজ চলে?—কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না। ঈশানকে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—"তবেই হয়েছে, তবেই সব বুঝেছ!" বলিয়া সে বাড়ী চলিয়া গেল। আমিও নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে, আমার চেয়ে ঈশান কত বেশী জানে ও বুঝে, ভাবিতে ভাবিতে তাই বাড়ীর পিছনে "বৈরাগী"দের পুকুরে স্নান করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ মা, তুকানিয়া নাকি "কবর" নিয়েছে? তা সে কি খায়? কবরের নীচে সে কেমন করে বেঁচে আছে?" মা চারিদিকে সশঙ্ক ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "চুপ, চুপ, ওসব কথা বলতে নেই! ওসব কথা মুখে আনিস্ না! জানিস্ না, তুকানিয়াকে "মাদারে" ভর করেছে? সে জাম্বুরা (বাতাবি লেবু) গাছতলায় এক কলসী টাকা পেয়েছে, সে টাকা মাদারের। একমাস কবরের তলে থেকে যে দিন সে উপরে উঠবে, সেইদিনই মাদারের পূজা আরম্ভ করতে হবে।" আমি মার সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও এটুকু বুঝিলাম যে, হিন্দুদের শিব, দুর্গা, গণেশের মত "মাদার" মুসলমানদের এক দেবতা,

তুকানিয়া সেই মাদারের অনুগ্রহে অনেক টাকা পাইয়াছে, কাজেই সমারোহের সহিত মাদারের পূজা করিবে।

তুকানিয়ার বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গোহালের পার্শ্বস্থিত জঙ্গলে সত্যসত্যই একটা জাম্বুরা গাছ ছিল,—মার কথায় বুঝিলাম, তুকানিয়া সেই গাছতলাতেই টাকা পাইয়াছে। একবার সেখানে গিয়া অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবার জন্য প্রাণে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিল,—কিন্তু একে গভীর জঙ্গল, তাহার উপর আবার মাদারের আশ্রয়স্থান, কাজেই সেখানে যাওয়াটা বড় সহজ মনে হইল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার ছোট ভাইয়ের নিকট কথাটা প্রকাশ করিলাম। সে আমার চেয়ে প্রায় আড়াই বছরের ছোট, কিন্তু শারীরিক শক্তি এবং মনের সাহসে আমার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ! আমাদের বড় খুড়ামহাশয় ভিন্ন তুনিয়ার সকলকেই সে তৃণবৎ গণ্য করিত। আমি জাম্বুরা গাছতলায় যাইতেছি শুনিয়া সেও আমার সঙ্গে যাইতে রাজি হইল। অবশ্য, এসব কথা মাকে বলা হইল না। তুজনে চুপি চুপি সকলের অগোচরে সেই জাম্বুরা গাছতলায় উপস্থিত হইলাম। ভয়ে আমার গা ছমছম করিতে লাগিল, কিন্তু আমার ছোটভাইটির বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না। জাম্বুরা গাছতলায় দেখিলাম, সত্যসত্যই একস্থানে মাটী খুঁড়িয়া প্রায় তুই হাত গভীর ও দেড় হাত চওড়া গর্ত্ত করা হইয়াছে। আমি বলিলাম, "দেখেছিস্, এইখানে তুকানিয়া টাকার কলসী পেয়েছে।" আমার ছোট ভাই "হো হো" করিয়া হাসিয়া বলিল, "টাকা না ঘণ্টা!—দেখছ না, কে বুনো আলু তু'লে নিয়ে গেছে!" বাস্তবিকই ঐ জায়গায় একটা বুনো আলুর ছিন্ন লতা এবং তুই এক টুকরা বুনো আলু মাটীর ডেলার সঙ্গে পড়িয়া আছে দেখিলাম। সত্যই কেহ আলু তুলিয়াছে, না তুকানিয়া টাকা তুলিবার সময় আলু আপনি বাহির হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই জাম্বুরা গাছের নিকটেই একটা বহুকালের পুরাতন পুকুর এবং একটা উঁচু প্রকাণ্ড বাস্তুভিটার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকে বলে, এইস্থানে প্রাচীন কালে একদল ডাকাইতের আড্ডা ছিল, তাহারা মানুষ খুন করিয়া এই পুকুরে ডুবাইয়া দিত এবং টাকা মোহর সব জঙ্গলে পুঁতিয়া রাখিত। এই প্রবাদের মূলে কতটুকু সত্য আছে, এখন আর তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই; কিন্তু তুকানিয়ার টাকা পাওয়ার জনরব সত্য হইলে এই প্রবাদকে নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

মাঘমাসের মাঝামাঝি শুনিলাম, তুকানিয়া কবর হইতে বাহির হইয়া বারোয়ারী-তলায় বটগাছের নীচে আশ্রয় লইয়াছে। দিনরাত সেইখানেই সে থাকে; মাদারের পূজা না দেওয়া পর্য্যন্ত আর সে বাড়ী ফিরিতে পারিবে না। মার অনুমতি লইয়া একদিন বৈকালে বটতলায় গিয়া দেখি, তুকানিয়া মাটীর উপর পশ্চিম শিয়রে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, আর মোটা গলায় "মন রে অবোধ, বুঝে দেখ রে ভাই,—দেহের মধ্যে যত দরবেশ খুঁজলে তাহা পাই!" বলিয়া গান করিতেছে। তাহাকে দেখিলে এখন হঠাৎ চেনা যায় না। দেখিলাম তাহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা

অনেক ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে,—মাথার বাবরী চুল ও মুখের ঘন দাড়ী অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া গিয়াছে, চোখে-মুখে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গম্ভীর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পরিধানে পূর্ব্বেকার সেই ময়লা ধুতির বদলে, চিত্র-বিচিত্র এক লুঙ্গী, মাথায় লাল বনাতের টুপী, গলায় লাল কালো সাদা ও সবুজ রঙ্গের বেলোয়ারী মালা এবং হাতে একখানা ক্ষুদ্র কঞ্চি। দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তুকানিয়ার এমন বিচিত্র-মূর্ত্তি ও অদ্ভুত বেশভূষা পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই;—তাহাকে আগে আর কখনও গান গাহিতে শুনি নাই।—একমাসের মধ্যে সে কেমন করিয়া গান করিতে শিখিল, এই সব মালা, লুঙ্গী এবং বনাতের টুপীই বা কোথা হইতে সংগ্রহ করিল, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আরও একটা গুরুতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই—কি হিন্দু, কি মুসলমান, ওখানে যে আসিতেছে, সেই তুকানিয়াকে ভক্তিভরে সেলাম করিতেছে! তুকানিয়াও নিতান্ত নির্লিপ্ত এবং উদাসীন ভাবে সেইসব সেলাম গ্রহণ করিতেছিল,—যেন এইসব সেলামে তাহার চিরন্তন অধিকার,—এবং সে যেন ইহাতে চির-অভ্যস্ত! যে তুকানিয়া আমাদের বাড়ীর একজন নগণ্য কৃষাণ ছিল, যে তুকানিয়া ঘরে ঢুকিলে হিন্দুরা হুঁকার জল অবধি ফেলিয়া দিতেন, যে তুকানিয়ার আনা বাজার মা না ধুইয়া ঘরে লইতেন না, আজ কোন্ মন্ত্রবলে সেই তুকানিয়ার এত মান, এত সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি হইল? বটতলায় দেখিলাম, একস্থানে প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ড; তাহাতে দুই তিনটা বড় গুঁড়ি কাঠ ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে, কত লোক তাহার চারিদিকে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে,—কেহ দাঁড়াইয়া ফিস্-ফাস্ করিতেছে, কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কিন্তু সকলেরই সসম্ভ্রম দৃষ্টি তুকানিয়ার প্রতি!

কয়দিন পরেই দেখিলাম, এ অঞ্চলের পাঁচ ছয়খানি গ্রাম হইতে মুসলমানেরা দলে দলে তুকানিয়ার আস্তানা সেই বটতলায় আসিয়া সমবেত হইতেছে। তাহাদের প্রায় সকলের হাতেই এক-একটি সুদীর্ঘ সুমার্জ্জিত বংশদণ্ড,—কেহ তাহাতে রং মাখাইয়াছে,—কেহ চাঁচিয়া-ছুলিয়া তৈল মাখাইয়া উহা চকচকে মসৃণ করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ লাল নীল বা সাদা কাপড়ের বেষ্টনী দিয়া বাঁশের আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কাহারও বাঁশের আগায় লাল ও সবুজবর্ণের নিশান উড়িতেছে। সকলেরই মুখ উৎসাহে উদ্দীপ্ত,—সকলেই যথাসাধ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় সাজিয়া আসিয়াছে। যাহাদের মাথায় বাব্‌রী চুল, তাহারা সেই বাব্‌রী তেল-কুচ্‌কুচে করিয়া এবং তাহাতে লম্বা শিঁথী টানিয়া আসিতেও বিস্মৃত হয় নহি। কুমারডাঙার কয়েকজন বাদ্যকর ঢোল সানাই এবং কাঁসি বাজাইয়া দেখিতে দেখিতে গ্রামখানিকে উৎসবানন্দে তোলপাড় করিয়া তুলিল। সমাগত মুসলমানগণ "চলো ভাই ইমামকা লস্কর!" বলিয়া ঘন ঘন চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের অনুপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দকে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিল। বট-

গাছের উত্তর দিকে ফকির জাহানালি মীর পাঁচ ছয়টা খাসী ও বক্‌রী এবং কুড়ি দুই-তিন মুরগী একে একে জবাই করিয়া স্তূপাকার করিতেছিল,—হিন্দু-মুসলমান, বালক বৃদ্ধ ও যুবা অনেকেই অদূরে দাঁড়াইয়া সেই সব মুমূর্ষু পশু-পক্ষীর মৃত্যুযন্ত্রণা অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া দেখিতেছিল। জাহানালি মীর একটা খুব তেজীয়ান মোরগের গলায় ছুরি বসাইয়া তাহার সম্পূর্ণ কণ্ঠচ্ছেদ করিবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ উহা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া উড়িতে উড়িতে আসিয়া আমার সেই পূর্ব্ববর্ণিত খুড়া ঈশান ঘোষের গায়ের উপর পড়িল। রক্তে ঈশানের চোখমুখ, কাপড়চোপড় সব রাঙ্গা হইয়া গেল। ঈশান ত দৌড়িয়া গিয়া সেই এঁদোপুকুরের পচা জলে লাফাইয়া পড়িল,—আমরাও অন্যদিকে গ্রামের ভিতর ছুটিয়া গিয়া "ঈশানের জাত গিয়েছে,—তার মুখে মুরগীর রক্ত পড়েছে" বলিয়া চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়া দিলাম। ঈশান কিন্তু সে কথা বেমালুম উড়াইয়া দিল। তাহার চোখ-মুখ-ঘুরানিতে এবং উচ্চ কণ্ঠ-ধ্বনির তোড়ে আমাদের সকল কথাই মিথ্যা সাব্যস্ত হইয়া গেল।

বৈকালে গিয়া দেখি, বটগাছের চারি-দিক্ কোদাল দিয়া পরিষ্কার করিয়া গোময় ও মৃত্তিকার লেপ দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রায় চারি পাঁচশত মুসলমান নানা পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতেছে। উহারা যেরূপ আগ্রহের সহিত আহার করিতেছিল, তাহাতে আহার্য্য দ্রব্যের উপাদেয়তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না।

সারারাত্রি লোকের কোলাহল ও বাদ্যের বিরাম হইল না। পরদিন সকালে গিয়া দেখি, বটগাছের নীচে এক লাল চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে, সেই চাঁদোয়ার নীচে একটা বেদীর মত স্থানে এক অর্দ্ধ-চন্দ্র (Crescent)। সেই অর্দ্ধচন্দ্রের নিকট সকলের সম্মুখে সফরআলি ফকির, জাহা-নালি মীর এবং তুকানিয়া এক শ্রেণীতে, এবং উহাদের পশ্চাতে প্রায় দশ বারো শ্রেণীতে অপর সকলে নমাজ করিতেছে।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা নমাজ চলিল। তারপর সকলে একসঙ্গে বাদ্য বাজাইয়া বংশ-দণ্ডাদিসহ অদূরবর্ত্তী আয়মা নদীতে স্নানার্থ যাত্রা করিল। বলাবাহুল্য যে আমরাও তাহাদের অনুগামী হইলাম। পরম উল্লাসে আয়মায় স্নান ও বংশদণ্ডগুলি ধৌত করিয়া একে একে সকলে কূলে আসিয়া রৌদ্রে সমবেত হইল এবং সফরআলি ফকির ও জাহানালি মীরের আদেশক্রমে এক এক বংশদণ্ডে এক এক বর্ণের বেষ্টনী যোজনা করিতে লাগিল। তারপর উহাদের মধ্যে এক একজনে এক একটি বাঁশ তুলিয়া লইল। একটি বড় অদ্ভুত বংশদণ্ড দেখিলাম, এরূপ বাঁশ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। এই বাঁশের মূল কাণ্ডটি প্রায় চারি হাত ঊর্দ্ধে দুই সমভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি সমানাকার শাখার সৃষ্টি করিয়াছে। শুনিলাম, ইহাই নাকি মাদারের বাঁশ। যাহার বাগানে এইরূপ বাঁশ জন্মিবে, সে ধনী হউক, আর দরিদ্র হউক, মাদারের পূজা তাহাকে করিতেই হইবে। এই বাঁশটি নাকি তুকানিয়ার স্বহস্তে রোপিত

বাঁশের ঝাড়ে জন্মিয়াছে, এবং সেইজন্যই তুকানিয়াকে এইভাবে মাদারের পূজা দিতে হইতেছে। এই বাঁশটি অতি যত্নে চাঁচিয়া ছুলিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। তুকানিয়া আপন হাতে এই বাঁশের দুইটি আগায় দুইটী শ্বেতবর্ণের বেষ্টনী পরাইয়া দিল,—মাদারের চিহ্নই নাকি শ্বেত। সকলেই বাঁশটি স্পর্শ করিয়া আপন আপন কপালে হাত ছোঁয়াইতে লাগিল। ব্যবস্থা মত এই বাঁশ তুকানিয়াকেই বহন করিতে হয়, কিন্তু সে মাসাধিক কাল "কবরে" থাকায় নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে এই যোড়া বাঁশ বহা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা, এজন্য এই বাঁশটি তুকানিয়ার ভাগ্‌নে-জামাই জাবারিয়া সেখকে তুকানিয়ার প্রতিনিধিস্বরূপ বহন করিতে দেওয়া হইল। জাবারিয়া যখন এই বিশাল বংশদণ্ড হাতে করিয়া তাহার বাব্‌রী চুল দোলাইয়া "গাজীমিঞা সা মাদার দোম্, দম্‌চি মিঞা সা মাদার দোম্!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন তাহাকে যমদূতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তুকানিয়ার মামা জুমাসেখ দুইটি শ্বেতবর্ণের চামর আনিয়া এই যোড়া বাঁশের এক এক মাথায় এক একটি আঁটিয়া বাঁধিয়া দিল। দেখাদেখি আরও অনেকে তাহাদের বাঁশের আগায় সাদা ও কালো চামর বাঁধিয়া লইল। বাজনার তালে তালে জাবারিয়া যখন নাচিতে লাগিল, তখন উর্দ্ধে দুইটী শ্বেত চামর এবং নিম্নে জাবারিয়ার কালো বাব্‌রী চুল দুলিয়া দুলিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। জাবারিয়ার সঙ্গে "গাজীমিঞা সা মাদার—"ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—সে শব্দ এক ক্রোশ দূরের লোকেও শুনিতে পাইয়াছিল।

এই সব শেষ হইলে, সকলে ভিজা কাপড়ে বাঁশ কাঁধে ফেলিয়া বাজনার তালে তালে উদ্দামভাবে নৃত্য করিতে করিতে পার্শ্ববর্ত্তী তিন-চারিখানা গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া তুকানিয়ার আস্তানায় ফিরিয়া আসিল। পথে কি হিন্দু কি মুসলমান, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দুইহাত যুড়িয়া মাদারের উদ্দেশে সেলাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ মাদারের নামে চিনি-বাতাসার শির্ণি, কেহ-বা বড় বড় আকাঙ্ক্ষা লইয়া পায়রা, মুরগী পাখী বকরী ইত্যাদি মানত করিতে লাগিল।

সকলে যখন বটতলায় ফিরিয়া আসিল, বেলা তখন দ্বিপ্রহরের বেশী হইয়া গিয়াছে, লোকসংখ্যাও বোধ হয় এক সহস্রের উপরে উঠিয়াছে। আমাদের অঞ্চলে মুসলমান-গৃহে এইরূপ সমারোহের ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই কেহ ভক্তি, কেহ বিস্ময়, কেহবা কৌতূহলে অভিভূত হইয়া এই ব্যাপার দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছিল। তুকানিয়া, তাহার মামা, ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে সমাগত সকল মুসলমানকেই বিশেষ যত্ন ও পরিতোষসহকারে পানভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার বাঁশ হাতে সেইরূপ প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হইল। নাচিতে নাচিতে কেহ কেহ পাগলের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দশা

যেমন দশাপ্রাপ্ত হইয়া মাটীতে পড়িতে লাগিল, অমনি নৃত্য ও বাদ্য বন্ধ করিয়া অপর সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। দশাপ্রাপ্ত লোকের উপর মাদার "ভর" করিয়াছেন বলিয়া কতজনে তাহার নিকট কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কেহ পুত্র-কামনায়, কেহ বিত্ত-কামনায়, কেহ শত্রু-দমনার্থ, কেহ রোগনিবারণ প্রত্যাশায়, দশাপ্রাপ্ত লোকের নিকট নিজ নিজ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। মাদার দেবতাও অমনি সেই দশাপ্রাপ্ত লোকের মুখ দিয়া কাহারও উপর ছাগল, কাহারও উপর ভেড়া, কাহারও উপর দুগ্ধ, কাহারও উপর চিনি, কাহারও উপর উপবাস প্রভৃতি দাবী করিয়া—সেই দাবী পূর্ণ করলেই—তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে এইরূপ ভরসা দিতে লাগিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী যেরূপ একাগ্রতা ও তন্ময়তার সহিত দশাপ্রাপ্ত লোকদের প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিতেছিল, তাহাতে ঐসব আদেশে কাহারও মনে যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা, অনাস্থা বা অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছিল, তেমন বোধ হইল না। জাবারিয়াই সকলের চেয়ে ঘন ঘন দশাপ্রাপ্ত হইতেছিল। সে এক একবার যেরূপ ভাবে হাতের বাঁশ ছুড়িয়া ফেলিয়া বিষম শব্দে মাটীতে সবেগে উলট-পালট খাইতেছিল, তাহাতে তাহাকে দেবতা কি অপদেবতা ভর করিয়াছে তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর হইতেছিল। তাহার মুখ হইতে বহু পরিবারের বহু গুপ্তকাহিনী এবং কত জঙ্গলে কত পোঁতা টাকার সংবাদ শুনিয়া উপস্থিত সকলে ভয়ে বিস্ময়ে উল্লাসে উদ্বেগে বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল। বার বার এই ভাবে দশাপ্রাপ্ত হওয়াতে জাবারিয়ার শরীর ভগ্ন হইয়া যাইবার ভয়ে, অবশেষে মাদারের বাঁশ তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া অনু সেখের হাতে দেওয়া হইল। জাবারিয়াকে আর নাচিতে দেওয়া হইল না। অনুও তুকানিয়ার মত আমাদের বাড়ীতে কৃষাণের কাজ করিত। মাদারের বাঁশ হাতে লইবার পর সেও দুই তিনবার দশাপ্রাপ্ত হওয়ায় আমরা বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। অনু ও তুকানিয়া দুইজন কৃষাণই যদি কাজ বন্ধ করে, তবে আমাদের অসুবিধার সীমা থাকিবে না। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় নমাজের সময় উপস্থিত হওয়াতে সে দিনের মত নৃত্যগীত বন্ধ হইয়া গেল, কাজেই অনু অল্পে অল্পেই নিষ্কৃতি পাইল। তিন দিন এইভাবে নৃত্য, গীত ও পানভোজনের পর সে বৎসরের মত মাদারের পূজা শেষ হইল।

ক্রমাগত তিনবৎসর এই ভাবে তুকানিয়ার বাড়ীতে মাদারের পূজা চলিয়াছিল। প্রত্যেক বৎসরই উহারা কোথা হইতে এক একটি দো-ডালা বাঁশ সংগ্রহ করিয়া আনিত। এক বৎসরের বাঁশ পরবৎসরের উৎসবে ব্যবহার করা হইত না।

দেখিতে দেখিতে তুকানিয়ার নাম চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে তুকানিয়ার "ক"-অক্ষর হারাম ছিল; সেই তুকানিয়া এখন কথায় কথায় কোরাণের বয়ান বলিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্দু ও হিন্দীতে যাহা-ইচ্ছা-তাহাই আওড়াইতে লাগিল। লোকের জ্বরে, প্লীহায়, ওলাউঠায় বসন্তে,

সে কত জলপড়া, তেলপড়া এবং টোট্‌কা টাট্‌কি ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কত বন্ধ্যানারীকে সন্তান লাভের জন্য সে মাদুলী দিয়া আশান্বিত করিল, কত ভূত-গ্রস্তাকে ঝাড়ফুঁক দিয়া ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করিতে লাগিল,—কত সর্পদষ্ট কত শৃগালকুক্কুরদষ্ট ব্যক্তিকে মন্ত্রপ্রভাবে নির্ব্বিষ করিল। মামলামোকদ্দমায় লোকে তাহার পরামর্শ লইতে লাগিল। বিদেশস্থ আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলামঙ্গল, অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা সে মাটীতে দাগ দিয়া গণিয়া বলিতে লাগিল। কত জনের কত হারাণো গরু তাহার কেরামতে বাহির হইয়া পড়িল। এককথায় বলিতে গেলে ও অঞ্চলে সে একজন "কেষ্ট বিষ্ণু" হইয়া দাঁড়াইল। চারিপাশের পাঁচ ছয়খানা গ্রামে কোন বৃহৎ কার্য্যই তাহার পরামর্শ ব্যতীত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। যদি তাহার ঝাড়ফুঁকের বলে কেহ আরাম হইত, তবে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত, যদি কেহ মারা যাইত, তাহা হইলে তাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে বলিয়া সকলে মনকে প্রবোধ দিত ;—"তুকানিয়ার হাতে পড়িয়াও যখন বাঁচিল না, তখন আর কেহই উহাকে বাঁচাইতে পারিত না, পরমায়ু না থাকিলে ত তুকানিয়া কাহারও পরমায়ু বাড়াইয়া দিতে পারিবে না—" এই বলিয়া লোকে তাহার ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইত। তাহার গণনা সত্য হইয়া দাঁড়াইলে লোকে অবাক্ হইয়া যাইত, কিন্তু যদি কোন স্থলে তাহার ভবিষ্যৎ-বাণী সার্থক না হইত, তাহা হইলে লোকে সে দোষ নিজেদেরই কোনো ত্রুটির জন্য ঘটিয়াছে বলিয়া মানিয়া লইয়া তুকানিয়াকে নিষ্কৃতি দিত।

যশের সঙ্গে সঙ্গে ধনাগমও তুকানিয়ার মন্দ হইল না। ফকিরী লওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কতকগুলি চেলা জুটিয়াছিল, তাহারা দিবারাত্রি তুকানিয়ার আস্তানায় পড়িয়া থাকিত, এবং কোন লোক তুকানিয়ার নিকট ঔষধ, মাদুলী বা ঝাড়ফুঁকের জন্য আসিলে নানা প্রকার বাক্যবিন্যাসে তাহার নিকট যত পারিত টাকা পয়সা আদায়ের চেষ্টা করিত। তুকানিয়া নিজে কখনও ঝুলি কাঁধে লইয়া ভিক্ষা করে নাই বটে, কিন্তু কেহ কোন কাজে তাহার নিকট আসিলেই সে বলিত—"দেখিতেছ ত, আমি "ফকির," আমার কোন "ফিকির" নাই,—ভিক্ষাই আমার সম্বল,—তোমরা সকলে মেহেরবানি করিয়া কিছু কিছু না দিলে আমার কেমন করিয়া চলে ?" তাহার এই বিনয়ে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যথাসাধ্য দান খয়রাৎ করিত। ইহাতে তাহার যে বেশ ভালরকমেই দুই পয়সা আয় হইতেছিল, অল্প দিনেই তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। ফকিরী লওয়ার অল্প দিন পরেই সে পূর্ব্ববাসস্থান ছাড়িয়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে এক পুরাতন সম্ভ্রান্ত বংশের পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা বাগান পুষ্করিণী সমুদায় ক্রয় করিয়া তথায় কয়েক খানা উৎকৃষ্ট টিনের চৌচালা ও দুচালা ঘর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিল। এতৎব্যতীত গ্রামের কয়েকজন নিঃস্ব লোকের জমীজমা কতক ক্রয় করিয়া, কতক বন্ধক রাখিয়া অল্পদিনের মধ্যেই

সে একজন মস্ত মাতব্বর ব্যক্তি হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে তিন চারিখানা লাঙ্গলের উপযুক্ত বলদ এবং চারিপাঁচটি দুগ্ধবতী গাভীতে তাহার গো-শালার শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী এবং কন্যার অঙ্গে কয়েকখানা সোনারূপার গহনাও স্থান পাইল।

অকস্মাৎ দুইটি ঘটনায় তুকানিয়ার এই অশেষ সম্মান এবং বিমল যশঃপ্রভা মলিন হইয়া গেল।

আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল। গত পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা, বসন্ত ম্যালেরিয়া বা অন্য কোন সংক্রামক রোগ কখনও আমাদের গ্রামে দেখা দেয় নাই। দুইদিকে দুইটি বিস্তীর্ণ মাঠ, তাহার মধ্যস্থলে এই ক্ষুদ্র গ্রাম। পরিষ্কার বাতাস ও রৌদ্র সর্ব্বদাই গ্রামময় খেলিয়া বেড়ায়। তুকানিয়া দর্প করিয়া বলিত, কেবল তাহারই প্রতাপে কোন আধি-ব্যাধি এই গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না। লোকেও সেই কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিত। গত ১৯০৭ সালের কার্ত্তিক মাসে পাটপচা জল খাইয়াই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, আমাদের গ্রামের পাশে হঠাৎ ওলাউঠা দেখা দিল। প্রতিদিন সেখানে বহুলোক মরিতে লাগিল। লোকে প্রাণের ভয়ে শ্মশানকালীপূজা, হরিসঙ্কীর্ত্তন, শান্তি স্বস্ত্যয়ন-প্রভৃতি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল বটে, কিন্তু দুরন্ত ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। আমাদের গ্রামে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তুকানিয়া দিবারাত্রি আমাদের গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়া কোরাণের এমন সব বয়ান চেঁচাইতে লাগিল যাহার অর্থগ্রহ করা স্বয়ং কোরাণকারেরও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সকালে সন্ধ্যায় তাহার "আজানের" শব্দ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখনও আমাদের গ্রাম ওলাউঠার প্রকোপ হইতে মুক্ত ছিল। তুকানিয়া এমনি ভাব দেখাইতে লাগিল যেন তাহারই কেরামতে এইরূপ হইয়াছে।

২৩শে কার্ত্তিক সকালবেলায় তুকানিয়া গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া প্রচার করিতে লাগিল যে গতরাত্রে ওলাউঠা-রাক্ষসী পালকী চড়িয়া কুলবধুর বেশে যখন আমাদের গ্রামে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছিল, তখন তুকানিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, এবং ওলাউঠা-রাক্ষসীকে এই গ্রামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। ওলাউঠা তাহাতে নিরস্ত না হইয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তুকানিয়ার সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বহু কষ্টে তুকানিয়া ওলাউঠা-রাক্ষসীকে পরাজিত করিয়া তাহার গলায় পা দিয়া চাপিতে থাকে, এবং আমাদের গ্রামে কদাচ প্রবেশ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই ভাবেই তাহাকে দলন করিতে থাকে। ওলাউঠা তখন কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কুতুবপুরের দিকে চলিয়া যায়। সুতরাং এই গ্রামে আর কাহারও ভয়ের কোন কারণ নাই,—তবে কুতুবপুরের ভাগ্যে কি আছে, তাহা বলা যায় না।

তুকানিয়ার এই আশ্বাস-বাণীতে সকলেই

আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু সেই আশ্বাস অধিকক্ষণ উপভোগ করা অদৃষ্টে সহিল না। তুকানিয়া নন্দীদের বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া পুনরায় যখন গত রজনীর সমর-কাহিনী নানাছন্দে বর্ণনা করিতেছিল সেই সময় দেখা গেল তুকানিয়ার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান (ছেরমান) হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইদিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া সকলের মুখেই একটা প্রবল উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিল। ছেরমান তুকানিয়াকে অবিলম্বে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিল, কারণ তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা (তুকানিয়ার প্রথম পুত্র) কুরমানের ঘন ঘন দাস্ত ও বমি হইতেছে। তুকানিয়ার মুখখানায় কে যেন এক রাশ কালি ঢালিয়া দিল, চক্ষু যেন কপালে উঠিল। তাহার এত দর্প যে ভগবান এত শীঘ্র এমন ভাবে চূর্ণ করিবেন, একথা স্বপ্নেও সে মনে করে নাই। তাহার আরব্ধ সংগ্রামবর্ণনা আর শেষ হইল না,—সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী চলিয়া গেল। তাহার শ্রোতৃবৃন্দও পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে করিতে যে যাহার ঘরে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শুনা গেল তুকানিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র কুরমান এবং একটী দৌহিত্র ওলাউঠার প্রবল আক্রমণে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। আর একটী কন্যাও মৃত প্রায়! তাহার প্রতিবেশীদের মধ্যেও দুই-তিন বাড়ীতে কয়েকজন এই রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। তুকানিয়া এই আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া গেল।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি শীত বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ওলাউঠার প্রকোপ হ্রাস পাইল, কিন্তু তুকানিয়ার নষ্টগৌরবের আর পুনরুদ্ধার হইল না। এখন আর কেহই তাহার ভড়ংয়ে বিশ্বাস করে না,—কেহই আর তাহাকে ঝাড়ফুঁক বা টোট্‌কাটাট্‌কি ঔষধের ব্যবস্থার জন্য ডাকে না। সাধিয়া কাহারো বাড়ী গেলেও আর কেহ তেমন আদর যত্ন করে না। কাজেই তাহার আয়ও অনেকটা কমিয়া গেল। ফকিরী করিয়া এখন সে আর কিছুই পাইত না, তদুপরি উপযুক্ত পুত্র এবং দৌহিত্রটি মারা যাওয়ায় চাষবাসের কাজেও আর পূর্ব্ববৎ সুব্যবস্থা রহিল না। বয়স অধিক হওয়ায় এবং শোকভারগ্রস্ত হইয়া পড়ায় সে নিজেও আর তেমন পরিশ্রম করিতে পারিত না। তুকানিয়া উল্লাসিয়া (হুলাসিয়া) সেখের বিধবা ভগ্নীকে নিকা করিয়াছিল। মুসলমানশাস্ত্রমতে না কি কুমারী কন্যা বিবাহ না করা পর্য্যন্ত পুরুষের প্রকৃত বিবাহ হয় না। তুকানিয়া এই শাস্ত্রবচনের ধুয়া ধরিয়া জীবনের এই অপরাহ্ন কালে অকস্মাৎ এক কুমারীর পাণিপীড়ন করায় তাহার প্রথমা পত্নী অভিমানে নিজ পুত্রদ্বয়কে লইয়া পৃথক্‌ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে তুকানিয়ার আয় এবং প্রতিপত্তি আরও কমিয়া গেল।

অবশিষ্ট যেটুকু মানমর্য্যাদা ছিল, একটি দলিল রেজেষ্ট্রী করিতে গিয়া তাহারও শেষ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুকানিয়া লেখা পড়া কিছুই জানিত না, কিন্তু ফকিরী

লইবার পর সে মাদুলী দিবার সময় কাগজে কোরাণের বয়ান বলিয়া যা-তা আঁচড় কাটিয়া মাদুলীতে পুরিয়া দিত। গ্রামে চেক দলিল প্রভৃতি লেখা হইলে, সাক্ষীস্বরূপ তাহাতে সে কতকগুলি দাগ কাটিয়া স্বাক্ষর করার ভাণ করিত। তাহার এই সব লেখা কোন্ ভাষার বর্ণমালায় লিখিত,—সে ভাষাটা কোথায় কাহার নিকট কবে সে শিক্ষা করিল, তাহা কেহ জানিত না, জানিবার চেষ্টাও করিত না। যেন ফকিরী লইবার সঙ্গে সঙ্গেই তুকানিয়া এই বিচিত্র বিদ্যাটিও দৈববলেই লাভ করিয়াছে, সকলে এইরূপ মনে করিত। কাজেই সে বিষয়ে কেহ তাহাকে কখন কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করে নাই।

একে রোজগার নাই, তাহার উপরে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অজন্মা হওয়াতে তুকানিয়া কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তদুপলক্ষ্যে তাহাকে কতক জমী রেহান দিতে হয়। সেই রেহানীখত রেজেষ্ট্রী করিবার সময় তুকানিয়া সবরেজিষ্ট্রারের সম্মুখে দলীলের পৃষ্ঠে নিজ নাম স্বাক্ষর করিলে, সবরেজিষ্ট্রার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন্ ভাষা? তুকানিয়া এত বড় সাংঘাতিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলনা, কাজেই একটু থতমত খাইয়া বলিল—"উহা ফকিরানাগরী!" সবরেজিষ্ট্রার বাবু তুকানিয়ার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইহাতে নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে; সেজন্য তুকানিয়া ঐ ভাষা কোথায় কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছে, তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন। তুকানিয়া বলিল, সে ঐ ভাষা তাহার পীর ফকির মহম্মদ সার নিকট শিখিয়াছে। এই পীর মহম্মদ সাকে দর্শন করা দূরে থাকুক, আমাদের দেশে কেহ তাহার নামও কখন শ্রবণ করে নাই। সবরেজিষ্ট্রার বাবু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া বোধ হইল না। তিনি তিনখানা সাদা কাগজের টুকরায় স্বতন্ত্রভাবে তুকানিয়ার এক একটী স্বাক্ষর গ্রহণ করিলেন। তারপর দলিলের পৃষ্ঠের স্বাক্ষর এবং এই তিনটি স্বাক্ষর পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেন, কোনটির সহিত কোনটির মিল হয় না! তখনই তুকানিয়াকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা হইবে বলিয়া সবরেজিষ্ট্রার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাহার সঙ্গীগণ সবরেজিষ্ট্রারের হাতে পায়ে ধরিয়া দলীল পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া তুকানিয়াকে সে যাত্রা উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু এই দিন হইতে তাহার সকল সম্ভ্রম, সকল মর্য্যাদা, সকল গৌরব জন্মের মত অতলে তলাইয়া গেল।

এখনও তুকানিয়া গলায় সেই কাঁচের মালা এবং মাথায় সেই চিরপুরাতন বনাতের টুপী পরে বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে সে আর বড় বাহির হয় না। পুনরায় সে যে চাষা সেই চাষাই সাজিয়াছে। তবে এখন সে আর পরের বাড়ী চাকুরী করে না, নিজেই কোনমতে একখানা লাঙ্গল চালাইয়া কায়ক্লেশে সংসার চালায়।

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

কাজ্‌রী-পঞ্চাশৎ

(এল) শ্রাবণ ফিরে ভুবন পরে
এল মিলন্-ধাম,
সেই পাপিয়ার পিয়াস-হরণ
সেই যে ঘনশ্যাম !
বিধুর ধরার বন্ধু এল
(আজ) পূরবে মনস্কাম—
(দেখ) দিগ্বিদিকে চিক দিয়েছে
ঝুরন্ অবিশ্রাম !

(২)

(মেঘ) ভ্রমর হয়ে উড়ল ঝাঁকে
কী কালো ছায়া !
খুল্‌লে এখন ঘোম্‌টা কে বল্
বল্‌বে বেহায়া ?
(ও সে) দিনকে করে মিলন রাতি
এম্‌নি তার মায়া !
(তার) মনটি ভালো আলোয় ভরা
কালো তার কায়া !

(৩)

(আমরা) ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দেবো
বাদল-হাওয়াতে,
পাখীর সুখের জান্‌ব সোয়াদ
পিয়াল্ ছাওয়াতে !
গাইব পাখীর চাইতে মধুর
(ভুবন) ভরব গাওয়াতে,
খেল্‌বে মেঘে বিজুলী এই
চোখের চাওয়াতে !

(৪)

(আহা) লুকিয়ে ছিল ওই বিজুলী
কোন্ কাজল চোখে !
কালো মেঘের ডাক শুনে কি
উঠ্‌ল সে চম্‌কে !
কদম-ফুলে ভাব লাগে রে
(সেই) আলোর পুলকে
কার পানে কে চায় লুকিয়ে
জান্‌বে কি লোকে ?

(৫)

(ও কার) মিলিয়ে গেল নীলাম্বরী
নিবিড় বাদলে !
শ্যামল বনে সঘন সাঁঝে
মেঘের কাজলে !
(ওগো) কোন্ তমালে ঝুল্‌নো তোমার ?
(বল) কোন্ মালা গলে ?
(তোমায়) সৌরভে আজ চিন্‌ব গহন
রসের অতলে !

(৬)

(ওগো) কোন্ বনে আজ বাঁধ্‌লে দোলা
গহন আঁধারে !
তোমার গলার মালা কোথায়
গন্ধ বিথারে !
(শুধু) গন্ধে তোমায় পাই যে নাগাল
(নীরব) ঝুলন্-সাঁতারে
(তোমার) রূপ-বিজুলি ডুব দিয়েছে
বাদল-পাথারে !

(৭)

(তুমি) আস্‌ছ পথে ভুঁই-চাঁপাতে
ভুবন সাজায়ে!
বাদল-ধারায় তাল মিলায়ে
(মৃদু) নূপুর বাজায়ে!
হাস্‌ছ তুমি জুঁই চামেলির
পরাণ বাঁচায়ে!
আস্‌ছ তুমি পেখম-খোলা
ময়ূর নাচায়ে!

(৮)

(সখী) যখন কেবল শ্রবণ চলে
নয়ন না চলে—
সেই শ্রাবণের আমল এখন
এ রঙ্‌-মহলে।
(আজ) শোন্ গো কেবল দাদুর কী কয়
(আর) ঝিল্লী কি বলে,
একলা পাখী কী গায়—বাদল-
ধারার বিরলে!

(৯)

(আজ) কুঞ্জ-পথে সবুজ কানাৎ
নতুন কে দিলে!
মেঘ্-ডম্বরী রঙের তাঁবু
(ধারা-) জলের ঝিল্‌মিলে!
আজ বেরুবার নেই মানা আর
সব সখী মিলে,
বাঁশীর সুরে সুর বাঁধা আজ
বাসর নিখিলে।

(১০)

(আজ) নূতন শাখে বাঁধ্ তোরা সই
নূতন হিন্দোলা,
আজ্‌কে হাওয়ার নূতন দুয়ার
[illegible] কে খোলা!
(নব) নীপের দীপে কেয়ার ধূপে
আজ ভুবন ভোলা,
নূতন বঁধুর নূতন মধুর
কাজ্‌রী উতলা!

(১১)

(ওলো) ঘোম্‌টা খোলা সরম ভোলা
আজ বিধির লেখা,
(প্রথম) ভয়-ভাঙার পুলকে প্রাণে
ধ্বনিছে কেকা!
কূল ভেঙেছে যমুনা আজ
(তার) নাই সীমা-রেখা,
(শুধু) ঘনঘটার ঘোম্‌টা রেখে
চল্ পথে একা!

(১২)

(ওগো) এমন দিনে উদাস মনে
কে ঘরের কোণে?
(এস) আপনাকে আজ লোফালুফি
করব পবনে!
বুক দিয়ে আজ বিঁধব বাতাস
(আকাশ) ঠেক্‌বে চরণে
কিশোর তনুর সকল অণু
ভরবে শ্রাবণে!

(১৩)

(আজ) যে দোলাতে দুজন ঝুলায়
সেই দোলা বাঁধিস্,
বন্ধু বিনে, নইলে যে হায়,—
ঠেক্‌বে সবই বিষ!
মিশ্ কালো ওই মেঘে মিশে
(আজ) ঝুলন্ অহর্নিশ
বিজুলী ডোর ধরবে দোলার,
উথ্‌লাবে হরিষ!

(১৪)

(আজ) বাদল রাতির কাজল পাঁতি
এল কার তরে!
পৌঁছে দিল পূবের বাতাস
কাহার অন্তরে!
সজল আঁধার কী বোল্ বলে
(আজ) বিভোল্ অম্বরে!
(হায়) বাঁশীর পাগল বেরিয়ে প'ল
বাজ মাথায় ক'রে!

(১৫)

(আজ) গগন 'পরে থর দিয়ে কে
গড়লে এ মৌচাক!
কে খোঁচালে হঠাৎ!—ক্ষেপে
ছুটল কিসের ঝাঁক!
ছুটল রাগে বুঁদ হয়ে সব
(চাকের) দুয়ার রেখে ফাঁক!
ঝুঁঝিয়ে ঝরে রসের ধারা
অবাক গো অবাক!

(১৬)

(ওই) মেঘের দেশে রাত হ'ল, ত্বাথ্
হাওয়ায় লাগে চুল!
গুগ্‌গুলু উগারে তরল
অপ্‌রাজিতার ফুল!
নীল কমলে ঢাকল ডানায়
কালো ভ্রমরকুল
(যেন) সাপের শেষে গা ঢেলে কে
এলিয়ে দিল চুল!

(১৭)

(ও কে) দোল্ দিল মোর মনে, ওগো!
তাই দোলে ভুবন!
শ্রাবণ দোলে পবন দোলে

হৃদয়-দোলায় চল্‌ছে গো কার
আনন্দ-ঝুলন!
ঝুলন-মাতাল রাগ-রাগিণী
কাজ্‌রী-নিমগন!

(১৮)

(এবার) ফুটল কিনা কদম বনে
খবর রাখি নে,
শ্রাবণী ফুল ফুটেছে মোর
মনের বিপিনে!
(বঁধু!) আমরা হলাম পুলক-কদম
(তোমার) সোহাগ-সুদিনে,
(মোদের) পরাগ-ভরা এই অনুরাগ
নাও তুমি জিনে!

(১৯)

(গেছে) ঝুল্‌নো বেঁধে রাখাল-ছেলে
সকাল বেলায় আজ,
সেই দোলাতে তুল্‌তে হবে
তোমায় রাখাল-রাজ!
(মোদের) রাই-রাজা পরাবে তোমায়
(আপন) মাথার ফুলের তাজ,
(আজ) হিন্দোলে হিল্লোলে কেবল
টল্‌বে সকাল সাঁঝ।

(২০)

(মোদের) দুপুর বেলাই ঝুলন্ খেলা
আইন্ মানিনে,
(আজ) ঘনঘটাই ঘোম্‌টা যে, তাই
ঘোম্‌টা টানিনে।
কে বিদেশী যায় যে পথে
আমরা জনিনে,
যে খুসী সে হাসুক হাসি

(২১)

(ওকি !) দোলন্‌-চাঁপা দুল্‌ছে হাওয়ায়
দোলন্‌-চাঁপার ফুল !
(তার) দোলন্‌ দেখে ঝুম্‌কো জবা
দুল্‌ছে গো দোদুল্‌ !
তপ্ত দুধের মাখন তনু
(তারে) দেখ্‌লে যে হয় ভুল !
মুখটি কচি কাঁচা-দুধের
ননীর সমতুল।

(২২)

(আমরা) ভালবাসার রূপ দেখিনি
(শুধু) নাম শুনি গো তার।
শুন্‌তে যে পাই আওয়াজ বাদল-
ধারায় অনিবার।
চোখ্‌ বুজে তার ডাক শোনা যায়
সাত সাগরের পার,
(তার) পরশ পেলে প্রাণ নাকি হয়
গুলাবে গুলজার !

(২৩)

(আজ) তোমার তরে এনেছি এই
সন্ধ্যামণি ফুল,
এই দোপাটি হবে তোমার
দুটি কানের দুল ;
চরণ-পীঁড়ি হবে রাধা-
পদ্ম এ রাতুল,
রায়-বেলে সই সাজাব আজ
তোমার কালো চুল।

(২৪)

(আজ) ঝুলন-দিনে ফুল গহনা,
সোনা নামঞ্জুর !
কঠিন সোনা আজ্‌কে মানা
ফুলের কাঁকণ ফুলের মুকুট
(আর) ফুলের রতনচুড়,
ফুলের নূপুর বাজবে নীরব
ভরবে হৃদয়পুর।

(২৫)

(ওগো) তোমরা চোখে কাজল দিয়ো
হরিণ-লোচনা !
ওই কাজলে আমরা করি
কাজ্‌রী রচনা।
ওই কাজলে হয় গো সজল
বাদল-জোছনা,
ওই কাজলে উজল হিয়া
লুকায় শোচনা।

(২৬)

(আজ) অন্ধকারে গন্ধফুলের
হোলি খেলার ধুম !
মাদল বাজে বাদল-মেঘে
নাইক চোখে ঘুম।
পিচকারী সব ভরছে কেয়া
(আর) কদম সে কুঙ্কুম,
গন্ধে রঙীন্‌ অঙ্গে হাওয়া
[illegible]রে নিঝুম !

(২৭)

(তোমরা) দুলিয়ে বেণী ঝুলিয়ে দিলে
রেশ্‌মী হিন্দোলা !
ঝুম্‌রো বটের ঝুরি মোদের
ঝুলনের ঝোলা !
রাজার মেয়ে তোমরা সবাই,
(মোরা) রাখাল মন্‌-ভোলা !
অ-বোলা কে কয় ?   তোমাদের

(২৮)

(আজ) ঝামর হাওয়ায় তরল মোতি
ফিরতেছে লীলায়!
তাই বুঝি গো মুক্তোঝুরি
তোমার তনু ছায়।
কি দিয়ে কিশোরী! গোরী!
(বল) মুছাই, হায়, তোমায়?
(শুধু) আঁখির পাতা বুলাই, সখী!
তোমার গোরা গায়।

(২৯)

(আহা) এম্‌নি ভিজে আস্‌তে কি হয়
ও বাঁশীর পাগল!
(তোমার) সোনার গায়ে মুক্তোখুঁটি
খুঁটিয়ে পড়ে জল।
ভয় কি গো নেই দেয়ার ডাকে?
(এই) বিষম ঝড় বাদল!
(ওগো) ভালবাসার এম্‌নি অভয়—
এম্‌নি কি তার বল!

(৩০)

(ওগো) তোমার দোলা কদম-শাখে,
আমার তমালে;
কাছে-কাছেই চল্‌ছে দোলন্‌
(তবু) নাইক নাগালে!
ওই আঁচলের আভাস লাগে
এ মোর কপালে!
(তোমার) চুলের রাশি নিশাস ফেলে
নিশির আড়ালে!

(৩১)

(আজ) তোমার আমার মন মিলেছে
মনের মাল্‌ঞ্চে!
কে জানে আজ তুনিয়া সমাজ

অঞ্চলে বেঁধেছি মোরা
(আজ) সাত রাজার ধন যে!
কাঞ্চনে নাই রুচি, চরণ
মাণিকের মঞ্চে!
(আজ) তোমার আমার ফুল ফুটেছে
মনের মালঞ্চে।

(৩২)

(দোলা) তুল্‌লে এবার বাদল হাওয়ায়
হারিয়ে দিগ্বিদিক!
তুল্‌বে কে, আর কে দোলাবে
(তার) নাই কিছুরই ঠিক!
ভয়-ভোলা মন ভুল্‌ছে ভরম
আজ সরমে ধিক্;
(আজ) যে পারে সে দিক ছড়িয়ে,
যে পায় লুফে নিক্।

(৩৩)

(আজ) ডুব-সাঁতারে যায় কে চুপে
হারা পূর্ণিমায়!
গহন মেঘের ওপার দিয়ে
স্বপন-সীমানায়!
চাঁদ! যেয়োনা অমন করে
(তুমি) পালিয়ো না গো, হায়,
(আজ) আনন্দেরি গন্ধরাজে
পূজ্‌ব যে তোমায়।

(৩৪)

(আজ) কাজল-লতার পাতার 'পরে
ভ্রমর বুলেছে!
কাজল আঁখির জল্‌সাতে মোর
কাজ্‌রী খুলেছে!
চন্দনী পরশে হাওয়ার
(আজ) ভুবন ভুলেছে,
হিন্দোলে আনন্দ ঘন

(৩৫)

(ওগো) আজ কোথাকার ঢেউ লেগেছে
সারা গগনময় !
সাগর চুরি করেছে রে,
পুকুর চুরি নয়।
চল্‌ছে যখন এমন চুরি
(ওগো) তখন কিসের ভয় ?
(আজ) চোরা চোখে চাইলে, ধরা
পড়বে না নিশ্চয়।

(৩৬)

(বল) শ্রাবণ! তুমি শিখবে কবে
নয়ন বাঁকানো ?
ভুল্‌তে তুমি বসেছ চোখ
মেলে তাকানো !
হিম যে তোমার নাকের নিশাস
(তোমায়) যায় না জাগানো,
পান্তা বাতাস নেবু-ফুলের
গন্ধ মাখানো !

(৩৭)

(আমার) কাজ্‌রী গাথার কাজল-লতা
দিব কার করে !
কার দু'আঁখির আপ্‌নি-কাজল
আঁখির ঘুম হরে !
(কার) পায়ের পাতা ছন্দ রচে
(বাদল) মেঘের ডম্বরে !
কার পুলকে নীপ-মুকুলের
অঙ্গ শিহরে !

(৩৮)

(আমায়) সকল ভুবন দোল্‌ দিলরে
জনম জনমে !
দোল দিল আনন্দ-বিষাদ
[illegible]
দোল্‌ দিল কামিনী-কুঁড়ি
(মোর) গোপন মরমে !
সূর্য্য-তারার নাগর-দোলার
ছন্দেরি সমে !

(৩৯)

(ওগো) বাদল-মেলার শাঙন-বেলার
আর কত বাকী !
(আমায়) দোল্‌ দিয়ে গিয়েছে সে তাই
দুল্‌ছি একাকী !
দুল্‌ছে দোলা, ভুল্‌ছে না মন,
মিছাই মুখ ঢাকি,
(হ'ল) আঁখির লোরে ঝামর হাওয়া
মেল্‌ব কী আঁখি !

(৪০)

(ও তোর) মানের দোলা দুল্‌ছে সে কই ?
দুল্‌ছে মন্থরে !
ডুরি যে তার গেছে কেটে
অলথ্‌ মন্তরে !
(তোর) একলা-গরব আঁখির জলে
(হায়) আজ্‌ যে সন্তরে।
যে কেঁদে যায় কাঁদিয়ে সে, হায়,
যায় জনম তরে।

(৪১)

(ও সে) স্বপ্নে আমার এসেছিল
কুঞ্জে স্বজনী !
ছিল সে মোর কুসুম-শেযে
সকল রজনী।
ছিনিয়ে হঠাৎ কে নিল তায়
(হায়) কিছুই না জানি !
(শুধু) শুন্‌ছি জেগে দেয়ার হা হা
আর গরজনি।

(৪২)

(মরি) আজ্‌কে কারে দেব্‌তা ডাকে
ডাকে গো দেয়া !
দিনের আলোয় ছায় যে উঁকি
আকাশ-আলেয়া !
আজ যমুনার জমাট নীলে
(ও কে) জমায় শেষ খেয়া !
গায় কাঁটা ছায়, শিওরে ওঠে
কদম আর কেয়া !

(৪৩)

(আজ) জীবন মরণ ঝুলন খ্যালে
দোল দিয়েছে কে !
সুধা-সুরা-সোম-ধুতুরার
ঢেউ পিয়েছে কে !
(আজ) বাদল ধারায় জ্যোৎস্না জড়ায়
(হায়) সে রঙ্গ দেখে !
ঝুলন ঝোলে ঝাণ্ডা তালের
ঝঞ্ঝাতে বেঁকে !

(৪৪)

(হায়) অশ্রুজলের শ্রাবণ দেখে
বন্ধু ! কোথা যাও ?
দাঁড়াও আবার ঝুল্‌নো বাঁধি
রথ রাখ, দাঁড়াও !
মাধব ! ঐ মাধবী লতার
কুঞ্জ পানে চাও !
(বারেক) গাও বাঁশীতে পাগল গানের
শেষ কলিটি গাও ।

(৪৫)

(তুই) উজান বয়ে চল্‌ যমুনা !
চল্‌ অনুরাগে,
চল্‌ নিয়ে ফের তুইরে মোদের
বঁধুর সোহাগে ।
চোখের কাজল কানের সোনা
(তোরে) দিব যা' লাগে,
কাজল-গাথা আঁধার রাতে
গাইব তোর আগে ।

(৪৬)

(এবার) হিন্দোলা হায় বন্ধ আমার,
বন্ধু মথুরায় ;—
বাদল-নিশির আঁধারে মোর
নাইরে প্রদীপ, হায় !
(তবু) বাতাস আমায় দোল্‌ দিতে চায়,
(ফুল) সৌরভে ভোলায়,
কাজ্‌রী সুরে নয়ন ঝুরে
পরাণ লহরায় ।

(৪৭)

(এবার) কুটিলা ! তোর ঝুলন হবে,
(আর) করিস্‌নে তুই রোষ ;
কুব্জা হ'ল দোলার বিবি,
তোর হ'তে কি দোষ ?
রাই-কমলের দিন গিয়েছে,
(তার) শুকায় হৃদয়-কোষ ;
(এখন) কুবুজা-কুটিলার আমল,
আর কিসের আফ্‌শোষ ।

(৪৮)

(আমার) নয়ন-জলের শ্রাবণ এল,
বন্ধু এল না !
ঝুলন-দোলায় রইল পরাণ
(সুখে) দুল্‌তে পেল না !
হায় ! মথুরা এতই কি দূর
খবর গেল না !
যমুনা কি সাগর হ'ল
[illegible]

(৪৯)

(তুমি) মোহন বাঁশীর মধুর ডাকে
ডাক্‌লেনা, হায়, আজ ;
ডাক দিয়েছে বন্ধু! তোমার
বাজের পাখোয়াজ !
(আমার) ভাব-কদমের ফুটল কি ফুল !
(মোর) টুট্‌ল গো ভয় লাজ !
(তোমার) আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এলাম
(তুমি) কই গো হৃদয়-রাজ !

(৫০)

(হায়) ঝুম্‌কো-ফুলের ঝালর-গাঁথা
ঝুলন অবসান,
কোথায় প্রেমী ? কোথায় প্যারী ?—
ভুবন ব্যবধান !
শূন্য দোলা দুল্‌ছে তবু,
চল্‌ছে তবু গান !
(তবু) বাঁধছে গোকুল-গোলোক সেতু
কাজ্‌রী অফুরান্‌ !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসের প্রমাণ

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগ। ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যা, সুতরাং ব্রাহ্মণভাগ যে মন্ত্রের পরই প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্রাহ্মণভাগে উত্তরকুরু সম্বন্ধে কোন কথা থাকিলে তাহা অবশ্যই বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা সেইরূপ একটী প্রমাণেরই আলোচনা করিব।

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণের" একস্থলে উত্তরকুরু সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

"তস্মাদেতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কেচ পরেণ হিমবন্তং জনপদাঃ উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি বৈরাজ্যায় তেঽভিষিচ্যন্তে। বিরাড়িত্যেতান্ অভিষিক্তান্ আচক্ষতে॥"
—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৮।১৪)

"হিমবানের অপরপারে উত্তরদিকে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র নামক জনপদ, তথাকার লোকেরা বৈরাজ্যে অভিষেক করে। এইরূপে যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাড বলে।"

উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে উত্তরকুরু ও উত্তর-মদ্রের রাজগণের যে বিশেষ উপাধি 'বিরাট্' ছিল তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে "মনু" নামধেয় প্রথম সমাজ ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা অধিরাজগণই বিরাট্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা—

"গতেষু তেষু সৃষ্ট্যর্থং প্রণামাবনতামিমাম্।
উপযেমে স বিশ্বাত্মা শতরূপামনিন্দিতাম্॥
সম্বভুব তয়া সার্দ্ধমতিকামাতুরো বিভুঃ।
সলজ্জাং চমকে দেবঃ কমলোদর মন্দিরে॥
যাবদব্দশতং দিব্যং যথান্যঃ প্রাকৃতোজনঃ।
ততঃ কালেন মহতা ততঃ পুত্রোঽভবন্মনুঃ॥
স্বায়ম্ভুব ইতি খ্যাতঃ স বিরাড়িতি নঃ শ্রুতম্।
তদ্রূপগুণসামান্যাদধিপুরুষ উচ্যতে॥
বৈরাজ্য যত্রতে জাতা বহবঃ শংসিতব্রতাঃ।
স্বায়ম্ভুবা মহাভাগাঃ সপ্ত সপ্ত তথা পরে॥
স্বারোচিষাদ্যাঃ সর্ব্বেতে ব্রহ্মতুল্যা স্বরূপিণঃ।
ঔত্তমি প্রমুখাস্তদ্বদ্ যেষাং ত্বং সপ্তমোঽধুনা॥"

ইতি মাৎস্যে ৩য় অধ্যায়ঃ

"তাঁহারা সৃষ্টিকার্য্যার্থ প্রস্থান করিলে বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা সেই প্রণামাবনতা অনিন্দিতা শতরূপার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত অতীব কামাতুর হইয়া তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি প্রাকৃত-জনের ন্যায় সেই লজ্জিতা ললনার সহিত শতবর্ষ যাবৎ কমলগর্ভে থাকিয়া রমণ করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। এই পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু নামে অভিহিত। আমরা শুনিয়াছি ঐ মনুই বিরাট্ পুরুষ এবং তদনুরূপ গুণসমূহযোগে ইনি অধিপুরুষ নামেও নির্দ্দিষ্ট। অপর যে সপ্ত সপ্ত ব্রতপরায়ণ মহাভাগ্যশালী বহু মনু ব্রহ্মা হইতে জাত হইয়াছেন তাঁহারাও তথায় বিরাড্ পদবী লাভ করিয়াছেন। স্বারোচিষাদি ও উত্তমি প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্ম স্বরূপ। অধুনা তুমি তাহাদের সপ্তম মনু।"

এই "পুরাণ" বর্ণনার সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত 'ব্রাহ্মণ' বর্ণনার তুলনা করিলে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রের "বিরাট্" আখ্যা যে মনুগণই প্রথম প্রাপ্ত হন তৎসম্বন্ধে অল্প সন্দেহই থাকে। উল্লিখিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অপর একস্থলে উত্তরকুরু "দেবক্ষেত্র" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"ঐ দেশ (উত্তরকুরু) দেবক্ষেত্র, মর্ত্ত্য (মনুষ্য) উহা জয় করিবার অযোগ্য।" অষ্টম পঞ্চিকা, ৯ম খণ্ড ৪০শত অধ্যায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ—৬৬৪ পৃষ্ঠা।

মনুসংহিতায় আমরা প্রথম আর্য্যাধিষ্ঠানকে "দেবনির্ম্মিত দেশ" রূপেই নির্দ্দেশিত দেখিতে পাই যথা—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"

"সরস্বতী দৃষদ্বতী এই দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া বলা হইয়া থাকে।"

এই প্রকারে "দেবস্থান" রূপে ব্রহ্মাবর্ত্ত উত্তরকুরুরই সহিত অভিন্ন হইতেছে।

অগ্নিরূপী ব্রহ্মা এইদেশে প্রথম উপাসিত হইতেন বলিয়াই তদনুসারে ইহার "ব্রহ্মাবর্ত্ত" নাম হইয়াছিল। আমরা প্রথম বিরাড্ যে মনুর নাম পুরাণে প্রাপ্ত হইয়াছি তিনিও ব্রহ্মার পুত্র। সেইজন্য ব্রহ্মার "স্বয়ম্ভু" নাম হইতে তাঁহার নাম "স্বায়ম্ভুব মনু" হইয়াছে। ইহা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু যে ব্রহ্মাবর্ত্ত বা উত্তরকুরুতেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রথম 'বৈরাজ্য' পদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

স্বায়ম্ভুব মনু যে আর্য্যদিগের কেবল আদি রাজা ছিলেন তাহা নহে; পরন্তু তিনি তাঁহাদিগের আদি পিতাও ছিলেন। তাহাতেই মনুর সন্তান বলিয়াই সমগ্র মানবজাতিই 'মনু,' 'মনুষ্য,' 'মানুষ,' 'মনুজ' 'মানব' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় ভাষায় এই সম্বন্ধের ইতিহাস যেরূপ সুস্পষ্টাক্ষরে সংরক্ষিত হইয়াছে এরূপ আর অন্য কোন দেশের ভাষায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে মনুর সহিত ভারতীয় আর্য্যদিগেরই সবিশেষ ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রকারে মনু ভারতীয় আর্য্যদিগের আদি পিতা ও উত্তরকুরুর আদি রাজা বলিয়া যখন প্রতিপন্ন হইতেছেন তখন তৎসঙ্গে সঙ্গেই যে ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুতে আদিবাসও প্রতিপাদিত হইতেছে তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন করে না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বর্ষা-নিশায়

আজিকে মেঘেতে ঢাকা নিশীথ নির্জ্জন,
বায়ু কোথা দূর দূরে যায় নিশ্বসিয়া—
যূথিকার মৃদু গন্ধ করি আহরণ ;
অন্ধকারে বনভূমি ওঠে মর্ম্মরিয়া।

তারাহীন দীপ্তিহীন আঁধার নিশায়,
নিদ্রার কোলেতে মগ্ন নিখিল নিশ্চল ;
রহি রহি গরজিয়া মর্ম্মবেদনায়
ঢালিছে নীরদ রাশি ঘন অবিরল।

আজ তুমি কত দূরে ? উঠিছে ভাসিয়া
দুর্লভ মুরতি তব হৃদি-দরপণে !
সুদূর দূরের পানে চাহিয়া চাহিয়া—
ঝরে যায় অশ্রু শুধু এই নিরজনে।

দু'জনের মাঝে আজি অসীম অপার—
ফেনিল সাগর করে উন্মাদ নর্ত্তন !
শুনিনা তোমার বার্ত্তা—পশে না গো আর
এ পারে ;—কেবলি শুনি সিন্ধু-গরজন !

নয়নের সুখ-আলো হরণ করিয়া,
হৃদয়ের মাঝে সৃজি অপার দূরতা—
গিয়াছ চলিয়া তুমি ! তবুও ধরিয়া
রাখিবারে চাহি আমি ; এ কি এ মূঢ়তা !

যাও তবে, ওগো চিরবসন্ত জীবন,
যথা ফুটে প্রীতি-ফুল্ল পুষ্প রাশি রাশি,
যথা বহে ফুলগন্ধী মলয় পবন,
যথা আছে চির সুখ, চির মধু হাসি।

তুমি যাও সুখ যথা ; আমি থাকি তবে
আমারি আঁধার-ভরা হৃদয়ের তলে
চির-সুপ্ত ;—দীপসম স্মৃতি জেগে রবে
আঁধার শিয়রে মোর ! যাও তবে চ'লে !

সমালোচনা

আকাশ-প্রদীপ। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় এম, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, নির্ম্মল কুটীর, ঢাকা। ঢাকা, ইষ্টবেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। লেখকের বক্তব্য কি, ঠিক বুঝা গেল না—দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। আমাদের নিতান্তই হেঁয়ালির মতই ঠেকিল। গ্রন্থ খানি নাটকীয় ধরণে লিখিত। মাঝে মাঝে কবিত্ব আছে, তবে তাহার উপর চকিতে আবার লেখক হেঁয়ালির জাল চাপা দিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই ভাল।

আহতের সদ্য সেবা। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়, এল, এম, এস, এম-আর-স্যান্-আই,এম-আর-আই-পি-এচ্ প্রণীত The Indian Manual of First Aid নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এই মূল গ্রন্থখানির অনুবাদ বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল—কেবল বঙ্গভাষায় ইহার কোন অনুবাদ ছিল না। গ্রন্থখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, প্রত্যেক গৃহে পঞ্জিকার মতই স্থানলাভের যোগ্য। লেখক ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। সহসা শারীরিক কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে ডাক্তার ডাকিবার পূর্ব্বে বাড়ীর লোক আহতকে কতখানি সাহায্য করিতে পারেন, এ গ্রন্থে তাহারই বিশদ আলোচনা আছে। তবে সেই সঙ্গে একটা বিষয়ে সকলকেই সতর্ক করা হইয়াছে, যেন কেহ চিকিৎসার চেষ্টা না করেন—কারণ তাহা কেবল শিক্ষিত ডাক্তারেরই অধিকারভুক্ত। গ্রন্থখানি এদেশের উপযোগী করিয়া বেশ ঘরোয়া ধরণে লিখিত। তবে বঙ্গানুবাদে ভাষার দোষ বড় বেশী রহিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে স্থানে স্থানে লেখকের বক্তব্য পরিস্ফুট হয় নাই। লেখক কোন পাকা লেখকের সাহায্য লইয়া ইহার ভাষা শুধরাইয়া লইলে ভাল করিতেন। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে এই মজ্জাগত দোষ নিবারিত হইবে। এত-বড় প্রয়োজনীয় গ্রন্থে ভাষার সরলতা থাকা নিতান্ত দরকার। বহিখানির আকার ক্ষুদ্র, অনায়াসে পকেটে রাখা চলে।

তাই তাই—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত কার্ত্তিকবাবুর "সাবিত্রী" যেমন আদর লাভ করিয়াছে আমাদের বিশ্বাস এই গ্রন্থও তেমনি আদর লাভ করিবে। এখানি শিশুদের জন্য লিখিত ছড়ার বই। এ ছড়া প্রাচীন ছড়া নয়, কার্ত্তিকবাবুর তৈরি নতুন ছড়া। মাত্র দুই চার দশ লাইনের মধ্যে আবদ্ধ বিশুদ্ধ ছন্দে গাঁথা এই কবিতার টুকরাগুলি শিশুচিত্তের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে এবং তাহাদের কল্পনারাজ্যে যে সমস্ত ছবি আবছায়ার মত দিবারাত্র ঘুরিতেছে, ইহারই সাহায্যে সেগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিবে, এবং শিশুরা নূতন কল্পনারও সন্ধান পাইবে। বইখানির পাতায় পাতায় রঙ্গিন—বহুবর্ণে রঞ্জিত ছবি আছে। ছাপা কাগজ খুব চমৎকার।

ফুলঝুরি—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। এখানি "তাই তাই"য়ের জুড়ি। ইহা শিশুজীবনের কবিতা এবং তাহারই রঙ্গিন ছবিতে ভরপূর। গঠন পরিপাট্যে এই দুইখানি বইই ইংরাজি শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সঙ্গে একাসনে স্থান পাইতে পারে। পূজার বাজারে কার্ত্তিকবাবুর বই দুইখানি শিশুদের প্রলুব্ধ করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



সুজাতা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

জীবন মরণ

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে
মোর কানে কানে
রজনী ক'বে না তার রহস্যবারতা,
শেষ করে' যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এমন একান্ত করে' চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালো ফুল

সে কোন্ পাহাড় তা আমি জানিনা; কিন্তু এটা আমার মনে পড়ে দেবদারু-বনের ফাঁক দিয়ে একটা বরফের পাহাড় দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে সেই পাহাড়ের দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আমার গায়ে এসে লাগ্‌ছে—আর ছোট একটি চীনের গাম্‌লায় আমাকে নিয়ে একটা পাহাড়ী-মেয়ে বাজারে বেচ্‌তে এসেছে।

সেখানটায় সেদিন ফুলের বাজার বসেছিল;—লাল নীল হল্‌দে সাদা সে কত ফুলগাছ! সাহেব বিবিরা সেই সব ফুলগাছ কিনে নিয়ে ঘরে ফিরছিল; কেবল কেসাংফু—কালোফুলের গাছ—আমাকে কেউ নিতে চাইলে না।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; পাহাড়ের গা বেয়ে সাদা কুয়াশা থেকে জোরে এক পস্‌লা বৃষ্টি নেমেছে; দু-আনায় এক বাঙালীর ঘরে আমাকে বেচে পাহাড়ী মেয়েটা ভিজতে ভিজতে চলে গেল।

আমার কালো ফুল তখনো ফোটেনি।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে। কল্‌কাতার একটা অন্ধকার গলির ছোট বাড়ির ছাদের আল্‌সেয় তারা আমাকে এনে রেখেছে। কারো আদর পাইনে, কারো যত্ন পাইনে; কেবল বাবুদের ছোট মেয়ে রাণী আমাকে নিয়ে খেলা করে, প্রত্যহ জল দিয়ে আমার গা ভিজিয়ে দেয় আর তার বড় বড় দুটি কালো চোখ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে চেয়ে থাকে! সে কি ভাবে তা সেই জানে, কিন্তু তার

কালো চোখের আলোতে আমার সমস্ত প্রাণটা যে একটা কালো ফুল হয়ে ফুটে ওঠবার জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি করছে সেটা আমি বেশ বুঝতে পারি।

হঠাৎ একদিন প্রকাণ্ড একটা অপূর্ব্ব কালো ফুল হয়ে দেখা দেবার উৎকট লালসা আমাকে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনে বাড়িয়ে তুলেছে। মানুষের এমন হয় কি? জানিনে কেন, এবছরে সমস্ত বসন্ত কালটা ধরে গুটির ভিতরে গুটি-পোকার মত আপনার ভিতরে আপনি আমি একবারে অসাড় হয়ে পড়ে আছি! চারিদিকে আমার যখন হাওয়া বইছে, পাখী গাইছে, আমার আশপাশের ছাদের টবে সব গাছগুলো অজস্র নূতন নূতন পাতা খুলছে, ফুল ফোটাচ্ছে তখন আমি কেবল এ সকলের সঙ্গে আড়ি দিয়ে রয়েছি—সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট।

লোকে আমায় দেখে আজকাল বলছে রাণীর গাছের মরণদশা উপস্থিত! কিন্তু আমি জানি আমি কালোফুল; বেল চাঁপা কুন্দ করবীর মত জীবনের ঐশ্বর্য্য নানা-বর্ণে নানা ছন্দে নিত্য ফুটিয়ে তোলা আমার কাজ নয়, জীবনের শেষদিনটিই হচ্ছে আমার ফোটবার দিন—যেদিন আমার সকল প্রাণ তার সমস্ত শোভা সমস্ত রং এক-করে-নিয়ে দেখা দেবে—কালো-ডানা প্রকাণ্ড একটি প্রজাপতির মত—ভোরের অন্ধকারে চুপি চুপি।

কোন্ সুদিনে যে রাণীর বিয়ের ফুল ফুটলো, কবে বাঁশী বাজলো, বর এলো ফুটন্ত গোলাপের মত রাণীকে তারা এখান থেকে সেখানে তুলে নিয়ে গেল তা আমি জানিনে। আমার বর তখন আমার দিকে আস্‌ছিল বহু দূর থেকে, আমি তার আসার পথে সমস্ত মন পেতে দিয়ে শুনছিলেম—বুকের মাঝে তারই বরযাত্রার বিপুল আয়োজনের ঝম্‌ঝম্ ঝিম্‌ঝিম্ ধ্বনিটিমাত্র!

* * * *

শেষে শীতের হাওয়ায় যেদিন আমার প্রেমের পাল ভরে উঠেছে, সারারাতের অবিশ্রান্ত শিলাবৃষ্টি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে—আমাকে বেঁধে রেখেছিল যে চিত্রবিচিত্র চীনেব টব্ সেটি—সেই দিন অকালের বাদলে আর ঝঞ্জাবাতের শঙ্খধ্বনির মাঝে আমার ফুল ফুটলো! বাসা-বাড়ির আল্‌সে ছেড়ে ফিরে এলেম আমি আমার মায়ের ঘরে পথের পরে—বিয়ের কনে এলো-খোঁপা কালো ফুলে সাজিয়ে। রথের চাকায় আমার বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে দেখা দিলেন আমার বর—পথের শেষে দুর্দ্দিনের সে কালো ফুলের কালো ভ্রমর।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবিমারক

অবিমারক নামক নবাবিষ্কৃত ভাসের নাটকখানি নায়কের নামানুসারে নাম-প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটক নাটিকা নায়িকা বা নায়ক-নায়িকার যুগল-নামে খ্যাত হয়। রত্নাবলী মালতীমাধব প্রভৃতি নামগুলি ইহার প্রমাণ। "চণ্ডকৌশিক" "প্রসন্নরাঘব" প্রভৃতি নামকরণে নাটকের নায়ক বা অপর কোনও প্রধান পুরুষ চরিত্রের নাম গ্রথিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কেবল নায়কের নামে নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। ভাসের "অবিমারক" ও "চারুদত্ত" নাটকদ্বয় নায়কের নামে আখ্যাত হইয়াছে।

অবিমারকের জন্ম-কাহিনী এইরূপ :—সুদর্শনা ও সুচেতনা দুই সহোদরা। সুদর্শনার সহিত কাশীরাজের ও সুচেতনার সহিত সৌবীররাজের বিবাহ হয়। অগ্নি হইতে সুদর্শনার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুদর্শনা সেই পুত্র সুচেতনাকে প্রদান করেন। প্রসব-সময়েই সুচেতনার এক পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুদর্শনার পুত্র লইয়া মৃতপুত্রের স্থানে স্থাপন করাতে জনসাধারণ সুদর্শনার পুত্রকে সুচেতনার পুত্র বলিয়াই জানিত। সৌবীররাজ পুত্রের নাম রাখিলেন বিষ্ণুসেন। বিষ্ণুসেন যখন বালক, তখন ধূমকেতু নামক এক অসুর সৌবীররাজ্যে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। বালক বিষ্ণুসেন সমবয়স্ক বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বিস্রস্তকেশে ধূলিধূসরিত কলেবরে এই রাক্ষসের নিকট গিয়া পড়েন। রাজরক্ষীগণ সুরাপানমত্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য অবহেলা করাতেই বিষ্ণুসেন এই অসুরের নিকট গিয়া পড়িয়াছিলেন। অসুর বিষ্ণুসেনকে সুন্দর আহার মনে করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে নিরস্ত্র বিষ্ণুসেন এক আঘাতে এই অসুরকে বিনাশ করেন। এই ধূমকেতু "অবি" নামেও পরিচিত ছিল। "অবি"কে বধ করায় বিষ্ণুসেন "অবিমারক" নামে বিখ্যাত হইলেন।

অবিমারক যৌবন প্রাপ্ত হইলে একদিন সৌবীররাজ মৃগয়া করিতে অরণ্যে গমন করেন। চণ্ডভার্গব নামক এক ঋষি কাশ্যপ নামক শিষ্য সমভিব্যাহারে সৌবীররাজ্যে আগমন করিতেছিলেন। যে অরণ্যে সৌবীররাজ শিকারার্থ গমন করেন, সেই অরণ্যেই কাশ্যপ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অকালে নিহত হয়। মৃগয়া-বিহারী রাজাকে সম্মুখে পাইয়া চণ্ডভার্গব রোষে তিরস্কার করিতে থাকিলে, সৌবীররাজ বলেন, "তুমি ক্রোধের দাস। তুমি কি মুনি? তুমি চণ্ডাল।" এই কথা শুনিয়া চণ্ডভার্গব অতি ক্রোধে শাপ দিলেন—"আমি চণ্ডাল? তুই স্ত্রীপুত্রসহ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবি।" সৌবীররাজ তখন অনুতপ্ত হইয়া শাপ-মোচনের জন্য চণ্ডভার্গবের বহু আরাধনা করিলে ঋষি বলিলেন, "এক বৎসর চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছদ্মবেশে কাল যাপন কর। পরে নিজ-

প্রকৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।” এই শাপ বশে সৌবীররাজ, তাঁহার স্ত্রী সুচেতনা ও পুত্র অবিমারক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছদ্ম-বেশে কুন্তিভোজের রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন কুন্তিভোজের কন্যা কুরঙ্গী সখীগণসহ উদ্যান বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় অঞ্জনগিরি নামক রাজহস্তী মদমত্ত হইয়া সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল। বীর রক্ষীগণ হস্তীকর্ত্তৃক নিহত হইল। কুরঙ্গীর সখীগণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। হস্তী কুরঙ্গীর শিবিকার নিকট উপস্থিত, এমন সময় চণ্ডালত্ব-প্রাপ্ত অবিমারক সেইখানে উপস্থিত হইয়া রাজহস্তীকে বাধা দিলেন। তাঁহার তাড়নায় হস্তী রাজকুমারীর শিবিকার প্রতি লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া অবি-মারককে আক্রমণ করিল। কিন্তু অবিমারক অপূর্ব্ব কৌশলে সেই মদমত্ত হস্তীকে শীঘ্রই বশ করিলেন। কুরঙ্গীও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

এই প্রথম দর্শনেই অবিমারক ও কুরঙ্গীর প্রণয়সঞ্চার। কুরঙ্গী বিরহ-কাতরা হইয়া ধাত্রীকে অবিমারকের নিকট পাঠাইল। অবিমারকও কুরঙ্গীর দর্শনে উৎকণ্ঠিত। স্থির হইল, নিশীথে গোপনে অবিমারক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন। রাজবাড়ীর সংস্থান জানিয়া লইয়া সেই রাত্রেই অবিমারক চোরের বেশে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় কুরঙ্গীর সহিত তাঁহার মিলন হইল। অবিমারক অন্তঃপুরেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সুখের দিন অধিককাল স্থায়ী হইল না। কুন্তিভোজ সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন। কিন্তু সতর্ক প্রহরী বসিবার পূর্ব্বেই অবিমারক অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিলেন।

পলায়ন করিলেন বটে কিন্তু সতর্ক প্রহরী অন্তঃপুরে তাঁহার পুনঃ-প্রবেশের উপায় রাখিল না। তখন অবিমারক আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। প্রথমে তিনি অগ্নি-প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি অগ্নিরই পুত্র। সেই জন্য অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না। শেষে তিনি পর্ব্বতশিখর হইতে লম্ফ দিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন।

এই সময় আকাশ-যানে মেঘনাদ নামক বিদ্যাধর সৌদামনী নামক পত্নীর সহিত সেই পর্ব্বতে অবতরণ করিল। অবিমারকের অবস্থা দেখিয়া কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া বিদ্যাধর কুরঙ্গীর সহিত গোপন-মিলনের উপায়-স্বরূপ এক অঙ্গুরীয় অবিমারককে দান করিল। এই অঙ্গুরীয় দক্ষিণ হস্তে যে ধারণ করে সে অদৃশ্য হয়। তাহাকে যে স্পর্শ করিয়া থাকে, সেও অদৃশ্য হয়। আবার অঙ্গুরীটি বাম হস্তে ধারণ করিলে সে সকলের দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। এই অঙ্গুরীয় পাইয়া অবিমারক নিজ মিত্র বিদূষকসহ অদৃশ্য-ভাবে পুনরায় কুন্তিভোজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে কুরঙ্গী তখন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যতা। সহসা অবিমারকের আবির্ভাবে ও বাধাদানে তাঁহার সে সঙ্কল্প দূর হইল এবং উভয়ের পুনর্মিলন হইল।

এদিকে কুন্তিভোজ কুরঙ্গীর সহিত বিবাহ দিবার জন্য কাশীরাজের পুত্র জয়-

বর্ম্মাকে আবাহন করিয়াছিলেন—জয়বর্ম্মার সঙ্গে তাঁহার মাতা সুদর্শনাও আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই সুদর্শনাই অবিমারকের জননী। সুদর্শনা সৌবীররাজপত্নী সুচেতনাকে পুত্র দান করাতেই সুচেতনাই অবিমারকের মাতা বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। নারদ আসিয়া সকলের সম্মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন। তখন কুরঙ্গীর সহিত অবিমারকের এবং কুরঙ্গীর কনিষ্ঠা ভগিনী সুমিত্রার সহিত জয়বর্ম্মার বিবাহ হইল।

অবিমারক নাটকের মূল ঘটনা এইরূপ। আমরা অবিমারক সম্বন্ধে যে যে বিষয় আলোচনা করিব, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে নাটকের ঘটনাটি মোটামুটি জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। তাই সর্ব্বাগ্রে সংক্ষেপে নাটকের আখ্যান-বস্তুর পরিচয় প্রদত্ত হইল।

অবিমারকের আখ্যানবস্তু ভাসের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এমন কি অনেকে এরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংস্কৃত মালতীমাধব প্রভৃতি নাটকের ঘটনার অনুকরণে অবিমারকের ঘটনা-সৃষ্টি হইয়াছে। কোনও সমালোচক ভাসকে বহু-পরবর্ত্তী কবি বলিয়া এমন মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে ভাস শূদ্রক ভবভূতি প্রভৃতি নাট্যকারের আখ্যান-বস্তু অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখাইব যে অবিমারকের কাহিনী বহু প্রাচীন ও কোন কবি-বিশেষের নাটকানুকরণে রচিত নহে।

প্রাচীন ভারতে বহু কিম্বদন্তী ও গল্পের প্রচার ছিল। এই সকল গল্প রূপান্তরিত হইয়া বিদেশীয় ভাষাতেও স্থান পাইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর সহিত বিদেশীয় গল্পসমূহের অদ্ভুত সাদৃশ্য ইহার জলন্ত প্রমাণ। পুরাতন কাহিনী বা কিম্বদন্তী পূর্ব্বে জনসাধারণের মুখে-মুখেই চলিয়া আসিত; পরে স্থায়ীভাবে সাহিত্যে স্থানলাভ করে। এই সকল কাহিনীর মূলে কোনও সত্য ঘটনা নিহিত আছে কি না, থাকিলে সে সত্য কতটুকু, ও সেই ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া কতটা মিথ্যা সংযোজিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে এই সকল সুপ্রাচীন কাহিনী-অবলম্বনে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, অন্যান্য স্বকপোলকল্পিত নাটকের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য দেখা গেলে প্রথমোক্ত নাটকগুলি যে শেষের অনুকরণ, তাহা বলা যাইতে পারে না। বরং শেষোক্ত নাটকগুলিই প্রথমোক্ত নাটক-সকল বা ঐ সকল নাটকের মূল কিম্বদন্তী অনুকরণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা লইয়াই ভাসের অধিকাংশ নাটক রচিত। "পঞ্চরাত্র" "দূতঘটোৎকচ", "ঊরুভঙ্গ" "কর্ণভার", প্রভৃতি নাটক ইহার প্রমাণ। আর কতকগুলি নাটক প্রাচীন কিম্বদন্তীমূলক। উদয়ন ও বাসবদত্তার কাহিনী অতি প্রাচীন ও সুপরিচিত। এই কিম্বদন্তী স্থায়ী আকারে "বৃহৎ-কথা", "কথা-সরিৎসাগর" প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এই চিরন্তন কাহিনীর উপর ভাসের "স্বপ্ন-

বাসবদত্তা" ও "প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ" নাটকের প্রতিষ্ঠা। শ্রীহর্ষের "রত্নাবলী" প্রভৃতি নাটকও এই উদয়নের কাহিনী অবলম্বন করিয়াছে।

এইরূপ এক প্রাচীন কাহিনীর উপরই অবিমারকের ভিত্তি। কেবল অনুমান সাহায্যে আমরা এ কথা বলিতেছি না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রদর্শন করিব।

বাৎস্যায়ন-প্রণীত "কামসূত্র" একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী ইহার রচনা কাল। ইন্দ্রপাদ উপাধিধারী যশোধর এই গ্রন্থের জয়মঙ্গল নামক একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন।

কামসূত্রের পঞ্চম প্রকরণের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে :—"অহল্যাবিমারকশাকুন্তলাদীন্যন্যান্যপি লৌকিকানি চ কথয়েৎ।" অর্থাৎ "অহল্যা, অবিমারক, শকুন্তলা প্রভৃতি ও অন্যান্য লৌকিক কাহিনী বলিবে।" দূতীকে কিরূপ ভাবের কথার অবতারণা করিতে হইবে, তাহার প্রসঙ্গে এই পংক্তি লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "অবিমারকের" কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। ব্যাৎস্যায়নকৃত পূর্ব্বোদ্ধৃত মূল সূত্রাংশে অবিমারকের কাহিনীর কোনও বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় না বটে কিন্তু উক্ত সূত্রের "জয়মঙ্গল" নামক টীকায় অবিমারকের আখ্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে : ——"অগ্নিহোত্রকেণাগ্নিপরিচরণে বধূর্নিযুক্তা। সা চ কুণ্ডাদুত্থিতেন মূর্ত্তিমতা অগ্নিনা কামিতা। জাতগর্ভাঞ্চ তাং শ্বশুরঃ কুলদোষভয়াদটব্যাং তত্যাজ। প্রসূতাঞ্চ সহ সুতেন শবর-সেনাপতিরপত্যবুদ্ধ্যা সংবর্দ্ধিতবান্। তৎপুত্রশ্চ আজাবিকসমূহেন বালবয়স্যাৎ ক্রীড়মানঃ পরিভ্রমন্ তৎক্ষীরপানান্মহাবলোঽভূদ্ যেন শিশুরেব হস্তগ্রহণাদজাবিকং জঘান, সেনা-পতির প্যন্বর্থমস্য নাম চক্রে 'অবিমারক' ইতি। ততঃ প্রবৃদ্ধযৌবনঃ কদাচিদ্রাজ্ঞোঽটব্যাং সমাবাসিতস্য দুহিতরং হস্তিনা ব্যাপাদ্যমানাং তং হত্বা ররক্ষ। ততো জাতোৎকণ্ঠা সা স্বয়মেব পাণিং গ্রাহিতবতী।"

ইহার মর্ম্ম এই :—এক বধূ অগ্নিহোত্র অনল রক্ষার ভার প্রাপ্ত হয়। অগ্নি-পরিচরণে নিযুক্তা সেই বধূ অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত মূর্ত্তিমান্ অগ্নিকর্ত্তৃক ভুক্তা হন। তাহাকে সগর্ভা দেখিয়া তাহার শ্বশুর কুল-কলঙ্কের ভয়ে তাহাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করেন। সেইখানে বধূ পুত্রসন্তান প্রসব করেন। শবর সেনাপতি বধূকে ও তাহার পুত্রকে নিজ পুত্রসম করিয়া প্রতিপালন করেন। সেই পুত্র ছাগপালদিগের সহিত বাল্যে ক্রীড়া করিতে করিতে দুগ্ধপানে মহাবলসম্পন্ন হইয়া উঠে এবং শিশু কালেই স্বহস্তে ছাগপালকে বধ করে। শবর-সেনাপতি তখন ইহার সার্থক নাম দেন, 'অবিমারক।' ক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে অবিমারক এক সময়ে বনে হস্তী-কর্ত্তৃক বধ্যমানা রাজার দুহিতাকে হস্তী নিধন করিয়া রক্ষা করেন; তাহার পর জাতানুরাগা সেই রাজপুত্রী নিজেই উদ্যোগ করিয়া অবিমারককে বিবাহ করেন।

এই কাহিনীর সহিত অবিমারক নাটকের ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। নাটকে অবিমারক অগ্নির পুত্র ইহামাত্র উল্লিখিত

আছে; কিন্তু কিরূপে অগ্নির ঔরসে তাহার জন্ম হয় এমন কোনও পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। বাৎস্যায়নের জয়মঙ্গল টীকায় সে কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। অবিমারকের মাতা অরণ্যে পরিত্যক্তা হন, সেখানে অবিমারক শবর দ্বারা প্রতিপালিত হন প্রভৃতি কাহিনী নাটকে স্বীকৃত হয় নাই। কারণ ভাস নিজ নায়ককে রাজপুত্র করিয়া অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কিম্বদন্তীতে অবিমারক রাজপুত্র কি না তাহার উল্লেখ নাই। বরং রাজপুত্র না হওয়াই সম্ভব। নিজের অসীম শক্তিতে সে ছাগপালকে বধ করিয়াছিল। হস্তীকে বধ করিয়া রাজকুমারীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, এইজন্য রাজকন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসুকচিত্তা হইয়াছিলেন। এক অগ্নি হইতে জন্ম ভিন্ন প্রাচীন কাহিনীতে অলৌকিক কিছুই নাই। আর অগ্নি হইতে জন্মের বিবরণটাও যে অবিমারকের অতুল শক্তি কোথা হইতে আসিল তাহাই বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। হয়ত সত্যই কোনও বধূ অরণ্যে পরিত্যক্তা হইয়া মহাবলসম্পন্ন সন্তান প্রসব করে। সে পরে নিজ শৌর্য্যে রাজকুমারীকে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে বিবাহ করে। এই সাধারণ ঘটনাটিই কিম্বদন্তীর আকারে প্রচলিত ছিল। এইরূপ এক যথার্থ ঘটনা ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। ছাগপাল বধ করিয়া অবিমারক নাম-প্রাপ্তিও কিছুমাত্র অলৌকিক নহে।

কিন্তু অলঙ্কার-শাস্ত্রানুযায়ী সংস্কৃত নাটকের নায়ক হীন পাত্র হইতে পারে রূপে খাড়া করিলেন। প্রাচীন কাহিনীতে ছিল, রাজকন্যা নীচজাতীয় যুবক অবিমারকের প্রতি অনুরক্তা হন। ইহা কথঞ্চিৎ বজায় রাখিতে ভাস করিলেন অবিমারক যথার্থ রাজপুত্র বটে কিন্তু ঋষির শাপে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। ঋষির শাপের অলৌকিক কাহিনী এইরূপে অবতারিত হইল। ছাগপালবধ ততটা বিস্ময়কর নহে—ভাস তাই অসুর-বধের কাহিনী সৃষ্টি করিলেন।

অবিমারক নাটকখানিতে প্রাচীন কালের সমাজের চিত্র কিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা এইবার প্রদর্শন করিব। কুরঙ্গীর প্রতি অনুরক্ত অবিমারকের গোপনভাবে রাজান্তঃপুর-প্রবেশ প্রশংসনীয় কার্য্য নহে। প্রাচীন কাহিনীতে যেরূপ ছিল, হীন অবস্থার যুবক রাজকুমারীর প্রেমে বরং এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিলেও করিতে পারিত। অন্তঃপুরে প্রবেশ বারিত হইলে আত্মহত্যার সংকল্পও তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। কিন্তু নাটকের নায়ক অবিমারক যুবরাজ। তাঁহার সহিত কুরঙ্গীর বিবাহের প্রস্তাবও হইয়াছিল। অল্প দিন পরেই তাঁহার চণ্ডালত্ব দূর হইত। নিজ পরিচয় দিয়া কুরঙ্গীর পাণিপ্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা সফল হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কাজেই নাটকের অবিমারকের আত্মহত্যার চেষ্টা ততটা সম্ভবপর মনে হয় না। কুরঙ্গীর আত্মহত্যার চেষ্টাও প্রাচীন কাহিনীর নায়ক থাকিলে বড় সুন্দর মানাইত। হীন যুবককে আত্মদান করিয়া তাহার অভাবে, লজ্জায়, হতাশে

কিন্তু সংস্কৃত নাটকের নায়ক "প্রখ্যাত-বংশ" রাজা হওয়াই চাই। ভাস তাই অবিমারককে রাজপুত্র করিয়াছেন;—নাটকের অবিমারক ও কুরঙ্গীর আচরণ গুলি অতিরিক্ত ভাবাতিশয্যের দ্যোতক (Sentimental) বোধ হইলেও "কামস্য বামা গতিঃ" এই বচন-অনুসারে তাহার কথঞ্চিৎ সমর্থন করা যায়।

প্রাচীন ভারতে রাজ-অন্তঃপুরে বহু রমণীর সদ্ভাব হেতু সময় সময় তাহাদের কাহারও কাহারও চরিত্রভ্রংশের সম্ভাবনা ঘটিত। বাৎস্যায়নের কাম-সূত্রে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অন্তঃপুর সতর্কভাবে রক্ষিত হইলেও বাহির হইতে পুরুষগণ নানা কৌশলে তথায় প্রবেশ করিত। কামসূত্রে আছে, অন্তঃপুরচারিণীগণ ধাত্রীদ্বারা বাহিরের পুরুষগণকে মনোভাব জানাইয়া থাকেন। এই ধাত্রীগণ পুরুষদের বলে, "রাজপুরীতে প্রবেশ করা সহজেই হয়। বাহির হইবারও সহজ উপায় আছে। অতিবিস্তৃত অন্তঃপুর, কোথায় কে আছে, কি করিতেছে তাহার সংবাদ কেহ রাখে না।(১) অন্তঃপুরের রক্ষীগণও অসাবধান। রাজ-পরিজনসমূহও সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকে না।" এই সকল কথাদ্বারা বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ধাত্রীগণ পুরুষদের লইয়া যায়। বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন, পুরুষেরাও অন্তঃপুরের সংস্থান অবগত হইয়া কোথায় কি আছে, কোন সময়ে কি বেশে কিরূপভাবে প্রবেশ করিতে হইবে তাহা জানিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। ("কক্ষাপ্রবেশং চ দৃষ্ট্বা তাভিরেব বিহিতোপয়াঃ প্রবিশেৎ।" কামাসূত্র ৫।৬।১)

রাজান্তঃপুরের এই দুর্নীতিমূলক আচরণ ঠিক বাৎস্যায়ন যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন সেই ভাবের ঘটনা প্রাচীন কাব্যাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। দশকুমারচরিত তৃতীয় উচ্ছ্বাসে উপহারবর্ম্মা গোপনে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভ্রষ্টচরিত্রা রাজমহিষীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এইরূপ কাহিনী আছে। সেখানেও দূতী—ধাত্রী ও রাজমহিষীর পরিচারিকা। উপহার-বর্ম্মা অন্তঃপুরের সংস্থান, রক্ষীগণের বাস-স্থান, উদ্যান প্রভৃতি কোথায় কিরূপ আছে তাহা জানিয়া লন।(২) পরে অন্ধকার রাত্রে নীলবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া খড়্গ হস্তে রাজান্তঃপুর-প্রবেশে উদ্যত হন। বংশদণ্ড দ্বারা পরিখা পার হইয়া তাহারই সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।(৩)

(১) "তেষামুপাবর্ত্তনে ধাত্রেয়িকাশ্চাভ্যন্তর-সংসৃষ্টা, আয়তিং দর্শয়ন্ত্যঃ প্রযতেরন্। সুখপ্রবেশিতা-মপসারভূমিং বিশালতাং বেশ্মনঃ, প্রমাদং রক্ষিণামনিত্যতাং পরিজনস্য বর্ণয়েয়ুঃ।"

কামসূত্র, ৫ম অধিকরণ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(২) "ততস্তস্যা এব সকাশাদন্তঃপুরনিবেশমন্তর্বংশিকপুরুষস্থান্ প্রমদবনপ্রদেশানপি বিভাগেনাবগম্য......"

দশকুমারচরিত, ৩য় উচ্ছ্বাস।

(৩) "কার্দ্দমিকনিবসনশ্চ......খড়্গপাণিরুপহৃতপ্রকৃতোপস্করঃ .....বেণুযষ্টিমাদায় [তয়া শায়িতয়া] চ পরিখাম্, স্থাপিতয়া চ প্রাকারভিত্তিমলঙ্ঘয়ম্।"

দশকুমার-চরিত ৩য় উচ্ছ্বাস

"অবিমারকে"ও দেখি, ধাত্রী অবিমারককে বলিতেছে, "রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করাই সুকঠিন। কোনক্রমে প্রবেশ করিতে পারিলে অনেকদিন থাকিতে পারা যায়।" (দ্বিতীয় অঙ্ক) অবিমারক বলিলেন,"রাজান্তঃপুরের কোথায় কি আছে আমায় বুঝাইয়া দাও।" (দ্বিতীয় অঙ্ক) ধাত্রী তাহাই করিল। তৃতীয় অঙ্কে দেখি, রজ্জু ও তরবারি লইয়া অবিমারক রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে। রজ্জুর অগ্রভাগে সংলগ্ন আঁকড়া প্রাচীরের উপর আটকাইয়া অবিমারক রজ্জু ধরিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া পড়িলেন এবং প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িলেন।

এই প্রকার ঘটনা প্রাচীন ভারতে ঘটিতে পারিত। রাজধানীর পথে গভীর রজনীর ঘোরান্ধকারে চোরের সঞ্চরণ, রক্ষী দেখিয়া শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ—এসকল প্রাচীনকালের চিত্র। অঙ্গুরীয়কের অদ্ভুত শক্তিতে বিশ্বাসও প্রাচীনকালের নাট্যাভিনয়-দর্শকেরই থাকা সম্ভব। মণি, মন্ত্র, মহৌষধির অত্যাশ্চর্য্য শক্তি প্রদর্শন সংস্কৃত নাটকের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। রত্নাবলী নাটিকায় অকালে বৃক্ষের কুসুমোদ্‌গম মালবিকাগ্নিমিত্রে সর্প-বিষ-হর মণি প্রভৃতি ইহার প্রমাণ। অবিমারক নাটকের প্রথম অঙ্কে যেরূপ উন্মত্ত হস্তী-দমনের বর্ণনা আছে, মৃচ্ছকটিকেও দ্বিতীয় অঙ্কে কর্ণপূরক বসন্তসেনার নিকট এইরূপ এক হস্তী দলনের বর্ণনা করিতেছে। অবিমারকে নায়ক যেরূপ হস্তীর আক্রমণ হইতে নায়িকাকে রক্ষা করিল, মালতীমাধবের তৃতীয় অঙ্কে মকরন্দ সেইরূপ মদয়ন্তিকাকে ব্যাঘ্র কবল হইতে রক্ষা করিল। অবিমারকের চোরবেশে সঞ্চরণের সহিত মৃচ্ছকটিকে চোরবেশী শর্ব্বিলকের আচরণের তুলনা করা যাইতে পারে।

অবিমারকের প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ, ইহার প্রধান ঘটনা, নায়কের মাতুলকন্যা-বিবাহ। কুরঙ্গী অবিমারকের মাতুল-কন্যা। এই প্রকার বিবাহ অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত থাকিলেও পরবর্ত্তী যুগে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ-কর্তৃক ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অবিমারক নাটকখানিতে অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের অনুরূপ ঘটনা ও চরিত্রের অভাব নাই। নির্ব্বোধ ভোজন-লোলুপ বিদূষক নায়কের সখা, অন্তঃপুর-পরিচারিকার হস্তে বিদূষকের নিগ্রহ, নায়ক-নায়িকার মামুলী বিরহ-বর্ণনা, আত্মহত্যার উদ্যোগ, অলৌকিকচরিত্র বিদ্যাধর, নারদ প্রভৃতির সৃষ্টি অনেক নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদূষকের মুখে "অবিমারকে" একস্থলে "বৌদ্ধ শ্রমণে"র উল্লেখ আছে। রাজকন্যা বর্ষার বৃষ্টিধারায় স্নান করিতে যাইতেছেন। নায়ক সন্ধ্যার সময় স্নান ও আহ্নিক করিতেছেন। রাজান্তঃপুরের সেই চিরন্তন ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা—উপবনের অনুপম মাধুরী—প্রাসাদের অলৌকিক সুষমা। ময়ূররা বিচরণ করিতেছে, শুক-সারিকা আলাপন-রত। চন্দ্রালোকে হর্ম্ম্যশিখরে রাজকন্যা মহার্ঘ্য আস্তরণে শয়ন করিয়া আছেন।

অপর দিকে নিশীথে রাজমার্গে ঘোর

অন্ধকার। রক্ষীগণের দৃষ্টি এড়াইয়া চোর ও কামুক বিচরণ করিতেছে। মাঝে মাঝে রাজপথ-পার্শ্বের অট্টালিকার গবাক্ষ দিয়া দীপালোক পথের উপর পড়িয়াছে। কোন গৃহাভ্যন্তর হইতে রমণী-কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রুত হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ বীণা বাজাইতেছে।

ভাসের নিপুণ হস্তে সরল অথচ সুন্দর ভাষায় এই সকল চরিত্র ও চিত্র নিখুঁত-ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভাস উপমার উপর উপমা পুঞ্জীভূত করিয়াছেন। এক এক স্থলে এমন এক একটি উক্তি বিদ্যমান যে তাহা সর্ব্বযুগে প্রযুজ্য। প্রথম অঙ্কে কন্যার বিবাহে পিতার কর্ত্তব্যের উল্লেখ, এই শ্রেণীর উক্তি। এরূপ আরও আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা ও দিবসের বিভিন্ন সময়ের বর্ণনাতেও ভাস তুল্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগীর নিকট এই নাটকখানি উপেক্ষার সামগ্রী নয়। কেবলমাত্র ইহার বর্ণনাগুলি পাঠ করিলেই পাঠক ভাসের কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

চাষার বাড়ী

(গল্প)

(মোপার্সাঁর ফরাসী হইতে)

একটা ছোট পাহাড়ের তল-দেশে দুটি কুটীর পাশাপাশি অবস্থিত। তাহার নিকটেই একটি ক্ষুদ্র নগর। স্বাস্থ্যের জন্য লোকে এই নগরে স্নান করিতে আসে। এই দুই কুটীরের মালিক দুজন চাষা। শিশু-সন্তানের ভরণপোষণার্থ এই অনুর্ব্বর ভূমিতে ফসল উঠাইবার জন্য উহাদের খুবই খাটিতে হয়। প্রত্যেকের ঘরে চারিটি করিয়া সন্তান। এই দুই পাশাপাশি কুটীরের দুই দ্বারের সম্মুখে, মাটির উপর গড়াগড়ি দিয়া ছেলেগুলা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ধুলাখেলা করে। প্রত্যেক ঘরের বড় ছেলে দুটির বয়স ৬ বৎসর, আর ছোট ছেলে দুটির বয়স ১৪ মাস। এই দুই ঘরে বিবাহ ও জন্ম প্রায় এক সময়েই ঘটিয়াছিল।

দুই মা ঐ শিশুর গাদার মধ্যে বড় একটা তফাৎ বুঝিতে পারিত না। আর দুই বাপ উহাদিগকে একেবারেই এক-সামিল করিয়া ফেলিয়াছিল। ৮টা নাম উহাদের মাথায় সর্ব্বদাই ভাসিয়া বেড়াইত, ক্রমাগত একত্র মিশিয়া যাইত। এবং যখন একজনকে ডাকা আবশ্যক হইত, উহারা তিনজনের নাম ধরিয়া ডাকিত। শেষে আসল নামটিতে আসিয়া পৌঁছিত। প্রথম বাড়ীতে থাকিত "তুবাস্" নামক একজন চাষা।

তাহার তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে। দ্বিতীয় বাড়ীতে থাকিত "ভাল্যাঁ"। তাহার একটি মেয়ে, তিনটি ছেলে।

উহারা অতি কষ্টে জীবনধারণ করিত। উহাদের আহার ছিল একটু সুরুয়া, কিছু আলু, আর আকাশের মুক্ত বায়ু। প্রাতে সাতটার সময়, তার পর দুক্ষুরবেলা, তার পর অপরাহ্ণ ৬ টার সময়, তার পর সায়াহ্নে, দুই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের একত্র করিয়া উহারা তাহাদিগকে এক-একটু মাংসর ঘণ্ট খাইতে দিত। হংস-পালক হাঁসের বাচ্চাদের যে রকম খাওয়াইয়া থাকে সেই রকম। একটা কাঠের টেবিল, ৫০ বৎসরের অবিরাম ব্যবহারে ভার্নিসের মত চক্‌চকে হইয়া উঠিয়াছে। এই টেবিলের চারিধারে ছেলে মেয়েগুলা বয়স অনুসারে সারি-সারি খাইতে বসিয়াছে। সব-ছোটটির মুখ ও টেবিলের ধারটা প্রায় সমভূমিতে স্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের সম্মুখে এক-একটা খোঁদল-করা প্লেট। প্লেট্ গরম জলে ডোবান পাউরুটির টুকরায় পূর্ণ। সেই জলে কতকগুলা আলু, আধখানা কপি ও তিনটে পেয়াঁজ রাঁধা হইয়াছিল। ছেলেমেয়েগুলা খুব ক্ষুধার সহিত উহা গ্রাস করিতেছিল। মা নিজে কেবল সব-ছোটটিকে উহা গিলাইয়া দিতেছিল। আগুনের পাকে সিদ্ধ করা একটু মাংস—ইহাই সকলের রবিবারের ভোজ। ঐ দিন বাবা একটু বিলম্ব করিয়া আহার করিতেন। আর পুনঃপুনঃ বলিতেন, এমন ভোজ ত রোজ হয় না। আজ ধীরে

একদিন অগষ্ট মাসের অপরাহ্ণে, একটা হাল্‌কা-ধরণের গাড়ী হঠাৎ ঐ দুই কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন তরুণী নিজে গাড়ী হাঁকাইতেছিলেন; তিনি তাঁর পাশের পুরুষটিকে বলিলেন :—

"ওগো, চেয়ে দেখ,—এক-গাদা ছেলে! অমন সুন্দর ছেলেগুলি কি না ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্চে!" পুরুষটি কোন উত্তর করিল না। এরূপ প্রশংসা তার শোনা অভ্যাস ছিল। তার পক্ষে এই প্রশংসা একটা কষ্টের বিষয়—কতকটা তিরস্কারের মতো।

তরুণী আবার আরম্ভ করিল :—

"আমার বড় চুমো খেতে ইচ্ছে করচে! আহা, ঐটি যদি আমি পাই—ঐ সবার ছোটটি!"

তাহার পর, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, তরুণী শিশুদিগের নিকট ছুটিয়া গেল। তুবাসের একটি ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া তার নোংরা গালে চুমা খাইতে লাগিল, মাটি-মাখানো কোঁকড়া কোঁকড়া কটা চুলের উপর চুমা খাইতে লাগিল, ছোট হাত দুটিতে চুমা খাইতে লাগিল। ছেলেটি তার সেই ছোট হাত দুটি নাড়িয়া তরুণীর বিরক্তিজনক আদর হইতে আপনাকে আগ্‌লাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

তাহার পর, সেই তরুণী আবার গাড়ীতে উঠিয়া, দ্রুত কদমে ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পর-সপ্তাহে আবার সে আসিল, মাটির উপর আসিয়া বসিল; আবার সেই ছেলেটিকে কোলে লইয়া,

লাগিল; অন্য ছেলেমেয়েদের শুধু কতকগুলা বাতাসা দিল। এবং তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদের সহিত খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। এদিকে তাহার স্বামী সেই ভঙ্গুর গাড়ীতে বসিয়া খুব ধৈর্য্যের সহিত তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

সেই তরুণী আবার একদিন আসিল; আসিয়া বাপ-মার সহিত আলাপ পরিচয় করিল। তারপর, মিষ্টান্ন ও পয়সায় পাকেট ভরিয়া প্রতিদিন আসিতে লাগিল।

একদিন প্রাতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তাহার সহিত তাহার স্বামীও গাড়ী হইতে নামিল। তরুণী ছেলেদের কাছে না থামিয়া একেবারে তাদের বাপ-মায়ের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তারা ঘরে ছিল। রন্ধনের জন্য কাঠ চিরিতেছিল। বিস্মিত হইয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। বসিবার জন্য সসম্ভ্রমে চৌকি এগাইয়া দিল। তখন সেই তরুণী বাধ-বাধ স্বরে থামিয়া থামিয়া আরম্ভ করিল :—

"ওগো বাছা, আমি তোমার কাছে এসেছি—কেন জান? আমার ইচ্ছে হয়েছে ...আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে···তোমার ঐ ছেলেটিকে...আমার সঙ্গে···নিয়ে যাই..."

চাষারা হতভম্বা হইয়া রহিল, সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না।

একটু দম লইয়া তরুণী আবার আরম্ভ করিল :—

"আমাদের ছেলেপিলে নেই। আমরা শুধু দুটি প্রাণী—আমি ও আমার স্বামী।"

চাষাণী, কথাটা যেন একটু বুঝিতে আরম্ভ

—"তুমি আমাদের শার্লোকে নিয়ে যেতে চাও? ওমা তা কি কখন হয়। তা হতেই পারে না।"

তখন তরুণীর স্বামী এই কথাবার্ত্তায় যোগ দিলেন :—

—"আমার স্ত্রী তোমাদের ভাল করে' বোঝাতে পারেন নি। আমরা ওটিকে "পুষ্যি" নিতে চাই। ছেলেটি আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। যদি ছেলেটি ভাল-রকম ওৎরায়, তাহলে ও-ই আমাদের উত্তরাধিকারী হবে। যদি দৈবযোগে আমাদের কখন ছেলেপিলে হয়, তাহলে, তোমার ছেলেটি তাদের সঙ্গে বিষয়ের সমান ভাগ পাবে। কিন্তু খুব আদর যত্ন করেও যদি ছেলেটির মন আমরা না পাই, তাহলে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, তাকে ২০ হাজার টাকা আমরা দেব; আর ঐ টাকা তখনই তার নামে উকীলের ঘরে গচ্ছিত রাখা যাবে। আর তোমাকেও তোমার মৃত্যু পর্য্যন্ত মাসে মাসে ১০০৲ টাকা করে মাসোহারা দেওয়া যাবে। এখন সব ভাল করে' বুঝ্‌লে ত?"

চাষাণী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। —"তুমি চাও আমি আমার শার্লোকে তোমার কাছে বিক্রী করি? না, তা কখনই হবে না। মা-কে না কি একথা কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে! মিন্‌সেটা বলে কি! ওমা! কি ঘেন্নার কথা।"

চাষা কোন কথাই কহিল না; গম্ভীর হইয়া ভাবিতে লাগিল। কিন্তু সে ক্রমাগত ঘাড় নাড়িয়া-নাড়িয়া তার স্ত্রীর কথায়

তরুণী হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং স্বামীর দিকে ফিরিয়া, ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে—আদুরে মেয়ের মত আধ আধ স্বরে বলিতে লাগিলেন:—

"ওগো ওরা যে দেবেনা বল্‌চে, ওরা যে দিতে চাচ্চে না।"

তখন তরুণীর স্বামী আর একবার শেষ-চেষ্টা করিয়া দেখিলেন!

—"কিন্তু বাপু, তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ-টার দিকে একবার তাকিও—তার সুখের দিকে, তার...

চাষানী, আর সহিতে না পারিয়া তার কথা শেষ করিতে দিল না:—

—"ওগো সব শুনেছি, সব দেখেছি, সব বুঝেছি—আর বেশী বোঝাতে হবে না··· এখান থেকে দূর হও, যদি আবার এখানে এসো ত ভাল হবে না বল্‌ছি। এই রকম করে ছেলে না কি কেউ কাউকে দেয়। মরণ আর কি!"

তখন তরুণী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আর দুইটি ছেলেকে দেখিতে পাইলেন। এবং নারীসুলভ নছোড়-বন্দা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সাশ্রুনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু এছেলেটি ত তোমার নয়।"

চাষা তুবাস উত্তর করিল:—

"ও ছেলেটি পাশের ঘরের; যদি ইচ্ছে হয় ত ওখানে যেতে পার।"

এই বলিয়া চাষা তুবাস আবার ঘরে ঢুকিল; তখনও তাহার স্ত্রীর কুপিত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

আহারে বসিয়াছিল। খান কয়েক রুটির চাক্‌লা, ছুরীর আগা দিয়া কার্পণ্যসহকারে তাহাতে একটু মাখন মাখানো হইয়াছে; ইহাই সে ধীরে ধীরে খাইতেছিল।

সেই তরুণীর স্বামী আবার সেই প্রস্তাব আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এবার খুব ঠারে-ঠোরে, এবং সতর্ক ও চতুর বাক্‌-বিন্যাস-সহকারে। কৃষক ও কৃষক-গৃহিণী অস্বীকার-সূচক ঘাড় নাড়িলেন। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল, তাহারা ১০০৲ টাকা মাসোহারা পাইবে, তাহারা চোখ্‌ ঠারিয়া পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল—সাত-পাঁচ বিবেচনা করিতে লাগিল। মনে হইল, তাহারা যেন একটু টলিয়াছে।

উহারা অনেকক্ষণ চুপ্‌ করিয়া রহিল, ভাবিত হইয়া পড়িল, ইতস্তত করিতে লাগিল। অবশেষে কৃষক-পত্নী কৃষককে জিজ্ঞাসা করিল:—

—"ওগো মিন্‌সেটা তোমায় বলে কি?"

তরুণীর স্বামী উত্তর করিল:—

"আমি ভাল কথাই তোমাদের বল্‌চি।"

তরুণী ভয়ে ভয়ে ছিল, এও যদি একেবারে অস্বীকৃত হয়। এখন একটু আশ্বস্ত হইয়া, ছেলেটির ভাবী সুখের কথা, পরে ছেলেটি যে টাকা পাইবে তাহার কথা একে একে সমস্ত বলিল।

কৃষক জিজ্ঞাসা করিল:—

"বৎসরে ১২শ টাকা পাবে, আর সে কথা উকীলের সাম্‌নে করার করা হবে?"

তরুণীর স্বামী উত্তর করিলেন:—

"তা নয় ত কি,—কাল থেকেই এই

এতক্ষণ কৃষকপত্নী ভাবিতেছিল;—সে এখন উত্তর করিল:—

—"মাসে মাসে ১০০৲ টাকা? এত কম টাকায় আমরা কি ছেলে দিতে পারি বাপু? আর কয়েক বৎসর পরে আমার ছেলে ত নিজেই রোজকার করবে। না, ১২৫-এর কমে হবে না। ১২৫ টাকা চাই।

তরুণী বড়ই অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিলেন,—এই প্রস্তাবে তখনই স্বীকৃত হইলেন। ছেলেকে এখনই লইয়া যাইবেন স্থির করিয়া কৃষকপত্নীকে আগাম ১০০৲ টাকা দিলেন। ততক্ষণ কৃষক একটা চুক্তিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতেছিল। সেই পল্লীর একজন সরকারী কর্ম্মচারী ও একজন প্রতিবেশী সাক্ষী হইল।

তখন তরুণী আহ্লাদে আটখানা হইয়া—দোকানে কোন একটা সখের জিনিস কিনিবার মত,—ছেলেটিকে লইয়া একেবারে ছুটিয়া চলিলেন। অপর কৃষক তুবাস্ নির্ব্বাক ও কঠোরভাবে নিজ কুটীরের দ্বারে বসিয়াছিল,—উহাদিগকে এক্ষণে যাইতে দেখিল। এখন বোধ হয়, কেন অস্বীকার করিল বলিয়া মনে মনে সে অনুতাপ করিতেছিল।

কৃষক ভাল্যাঁর কথা আর তাহাকে কিছু বলিতে শোনা যাইত না। কৃষক ও কৃষকপত্নী প্রতি মাসে উকীলের বাড়ী গিয়া ১২৫৲ টাকা লইয়া আসিত। ইহারা তাহাদের প্রতিবেশীদের ব্যবহারে চটিয়াছিল, কেন না, অপর কৃষক তুবাসের পত্নী, কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদের বড়ই কষ্ট দিত; ঘরে-ঘরে কেবল বলিয়া বেড়াইত,—তুবাস্‌রা কি অর্থপিশাচ, অর্থের জন্য আপনার পেটের ছেলেকে বিক্রয় করিয়াছে। কি নোংরা কাজ, কি জঘন্য ব্যাপার।

কখন কখন তুবাস্-পত্নী নিজের ছোট ছেলে শার্লোকে কোলে লইয়া খুব ভড়ং করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিত:—যেন সে তার কথা কতই বুঝিতেছে!—

—"আমি তোকে বিক্রী করিনি যাদু, আমি তোকে বিক্রী করিনি। আমার ধন দৌলত নেই, তবু আমি আমার ছেলে বিক্রী করি নে।"

কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন এইরূপ চলিত; প্রতিদিন নিজ কুটীর-দ্বারের সম্মুখে, ভাল্যাঁর উদ্দেশে কত কথাই চীৎকার করিয়া এইরূপ বলা হইত। এমন করিয়া বলা হইত যাতে পাশের গৃহে কথাগুলি পৌঁছায়। তুবাস্-পত্নীর মনে মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তার শার্লোকে বিক্রয় করে নাই বলিয়া সে দেশের মধ্যে সব-চেয়ে সেরা।

অন্য লোকেও তুবাস্-পত্নীর নাম করিয়া এইরূপ প্রশংসা করিত।

—"তুবাস্-পত্নী বড় ভাল—ও ঠিক্ মায়ের মতই কাজ করেছে।"

সকলেই তুবাস্-পত্নীর দৃষ্টান্ত দেখাইত। শার্লোর এখন বয়স দশ বৎসর;—এই কথা ক্রমাগত শুনিয়া শুনিয়া তাহারও বিশ্বাস জন্মিল, তার সঙ্গীদের মধ্যে সেই সব চেয়ে সেরা; কেন না, কেহ তাহাকে বিক্রয় করে নাই।

সেই মাসোহারার কল্যাণে ভ্যাল্যাঁ সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তুবাস্‌দের দ্বেষ ততই বাড়িতে লাগিল;

উহার স্বচ্ছল অবস্থা দেখিয়া উহারা বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

তুবাস্‌দের বড় ছেলেটি, চাকুরীর জন্ম বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় ছেলেটি মারা গিয়াছিল। একমাত্র শার্লো কেবল তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে থাকিত। তার জননী ও দুই ভগ্নীকে দেখিবার জন্য সে ভিন্ন আর কেহই ছিল না।

ক্রমে সে ২১ বৎসরে পড়িল। এক-দিন প্রাতে একটা জঁাকাল গাড়ী ঐ দুই কৃষক-কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া-ইল। সোণার ঘড়ীর চেনে ভূষিত একটি যুবক গাড়ী হইতে নামিয়া, একটি পলিত-কেশা বৃদ্ধাকে বাহু-অবলম্বন দিবার জন্ম হাত বাড়াইয়া দিল। বৃদ্ধা তাহাকে বলিল :—

"বাছা, ঐ—ঐ দ্বিতীয় কুটীরটা।"

তখন যুবক নিজ পিতা ভাল্যাঁর গৃহে প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধা জননী কাপড় কাচিতেছিল; জরাগ্রস্ত অক্ষম পিতা উনানের নিকট বসিয়া ঢুলিতেছিল।

দুজনেই মাথা তুলিল এবং যুবক এইরূপ বলিল :—

"প্রণাম হই বাবা, প্রণাম হই মা।"

উহারা বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে খাড়া হইয়া উঠিল।

কৃষকপত্নী মনের আবেগে সাবানটা জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গদগদস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিল :—

—"বাছা তুই এসেছিস্? তুই এসে-ছিস যাদু?"

যুবককে বুকে চাপিয়া ধরিয়া—"প্রণাম হই মা, প্রণাম হই মা" এই কথাটি পুনঃ পুনঃ মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে—তাহার ললাট চুম্বন করিল।

এদিকে তার পিতা বৃদ্ধ কৃষক, তার সেই চির-অভ্যস্ত প্রশান্ত স্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল যেন এই এক মাস পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছে :—"আবার তুই ফিরে এসেছিস্?"

যখন পরস্পরের সহিত দেখাশুনা হইয়া গেল, পিতামাতার বড় ইচ্ছা হইল, তখনই তাহাকে পল্লীর সবাইকে দেখাইয়া আনে।

তাহাকে গ্রামের প্রধান সরকারী কর্ম্ম-চারীর নিকট, সহকারী প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট, পাদ্রির নিকট, প্রধান শিক্ষকের নিকট লইয়া গেল।

প্রতিবেশী প্রথম-কৃষকের পুত্র শার্লো তাহার কুটীরের দ্বারদেশে ছিল, সে কৃষক ভাল্যাঁর পুত্রকে যাইতে দেখিল।

অপরাহ্নে আহারের সময় তার বুড়া বাপ মাকে সে এই কথা বলিল :—

দেখ দিকি তোমরা কি বোকা,—দেখ দেখি, ভাল্যাঁ কেমন তার ছেলেকে বিক্রী করলে।"

মা বলিল :

"আমরা ছেলে বিক্রী করতে চাই না।"

বাপ কিছুই বলিল না। পুত্র আবার বলিল :—

"তোমাদের মন্দভাগ্য বল্‌তে হবে—অমন দাঁও ছেড়ে দিতে আছে?"

তখন কৃষক তুবাস্‌ একটু ক্রোধের স্বরে বলিল :—

"তোকে আমরা ছাড়িনি বলে তুই আমাদের তিরস্কার করচিস্?"

যুবক নির্দয়ভাবে বলিল :—

"হাঁ আমি তোমাদের তিরস্কার করচি,—তোমরা নেহাৎ বোকা! তোমাদের মত বাপ-মাই ছেলের অনিষ্ট করে। অমন বাপ-মাকে ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল।"

স্নেহময়ী কৃষকপত্নী কাঁদিতে লাগিল। চামচ দিয়া সুরুয়া খাইতেছিল—অর্দ্ধেক সুরুয়া মুখ হইতে পড়িয়া গেল।

"তোকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করেছি বলে',—তোকে মানুষ করেছি বলে' তুই কি আমাদের এখন মার্‌তে চাস্?"

যুবক কঠোরভাবে উত্তর করিল :—

"এরকম অবস্থায় থাক্‌বার চেয়ে আমার পক্ষে না জন্মানই ভাল ছিল। আমি যখন ওদের ছেলেকে দেখ্‌লাম, তখন আমার শরীরের রক্ত মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত চন্‌চন্ করে' উঠ্‌ল। আমি মনে মনে ভাবলাম—আমি ত ওরই মত হতে পারতাম।"

যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল।

"দেখ আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। কেন না আমি যদি এখানে থাকি, রাতদিনই আমি তোমাদের খোঁটা দেব, তোমরা জ্বালাতন হবে। তোমরা যে কাজ করেছ তার জন্য কখনই তোমাদের আমি ক্ষমা করব না।"

বুড়াবুড়ী চুপ করিয়া রহিল। জলে চোখ্ ভরিয়া আসিল। তারা যেন বজ্রাহত হইল।

যুবক আবার বলিতে লাগিল :—

"না আমি এখানে আর থাক্‌তে পারব না। আর কোথাও গিয়ে আমার উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।"

যুবক দ্বার খুলিল। কতকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর দম্‌কা-বাতাসের মত ঘরে প্রবেশ করিল।

ভ্যালাঁ ও ভ্যালাঁ-পত্নী খুব আনন্দ করিতে করিতে পুত্রকে লইয়া সেই সময় গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিল। তখন চালো মাটিতে পদাঘাত করিয়া তাহার বাপমায়ের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং এই কথা বলিয়া উঠিল :—

"মা, বাবা, আমি চল্লাম!"

এই বলিয়া রাত্রির অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালো জুড়ি

[সম্পাদকীয় মন্তব্য :—এই রচনাটি গল্প কি প্রবন্ধ তাই লইয়া গোল বাধিতে পারে। সেইজন্য জানাইয়া রাখা ভালো যে, লেখকের নিকট হইতে সন্ধান পাইয়াছি ইহা একটি গল্প।

গল্প বলিয়া এই রচনাটিকে পাঠক অবজ্ঞা করিবেন না। ইহা আজকালকার বাজারে চল্‌তি বাজে চুট্‌কি গল্প নহে। ইহা গল্পরাজ্যে যুগান্তর আনিয়াছে। নানা আলোচনায় পরিপুষ্ট হইয়া এমন সারালো ও ধারালো গল্প আমি তো কোথাও পড়ি নাই—এবং আমার বিশ্বাস কেহই পড়েন নাই। গল্পের ভাণ করিয়া লেখক এমন অনেক গুরুতর সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন যাহা সার্ব্বজনীন এবং সর্ব্বদেশে। গল্প বলিলে স্বকপোলকল্পিত বোঝায়;—ইহা মোটেই সে ধরণের নহে, ইহাতে কল্পনার ছায়ামাত্র নাই, আগাগোড়া বাস্তব। লেখক ত্রিতল কক্ষে বসিয়া চুরটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সমস্ত ধোঁয়াকার করিয়া তোলেন নাই;—ইনি আস্তাবলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণপাত করিয়া অশ্বসমাজের একেবারে প্রাণের কথাটি লিখিয়াছেন;—সেইজন্য ইহার রস ধনীর উজ্জ্বল প্রাসাদ-শিখরে যেমন উপভোগ্য, কৃষকের বিষণ্ণ কুটীরেও তেমনি উপভোগ্য। লেখক যে বাবুয়ানির মায়া কাটাইয়া ইতর জীবজন্তুর সুখ-দুঃখ, তাহাদের জীবনের সমস্যা লইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন সেজন্য তিনি আমাদের নমস্য।]

(১)

হাড়কাটার পাঁচু মিঞার টিনের ছাদ-ওয়ালা আস্তাবলে সেই কালো ঘোড়া দুটির ছিল আস্তানা। একখানি সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়াটিয়া গাড়ি তারা টানিত। এই গাড়িখানির সঙ্গে তাদের কবে যে মিলন-সূত্র বাঁধা হইয়াছিল সে কথা ঠিক তাদের মনে পড়ে না—তখন তারা নিতান্ত ছেলে-ঘোড়া।

গাড়িখানির বয়স তাদের চেয়ে ঢের বেশী। তাই বলিয়া তাকে জীবনের সঙ্গিনী করিতে ঘোড়া দুটি আপত্তি করে নাই;—কারণ জীবনসঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিবার কোনো অধিকার সনাতন কাল হইতে ঘোড়াসমাজে প্রচলিত নাই। যাহার অদৃষ্টে যেমন জোটাইয়া দেওয়া হয় সে তাহাই গ্রহণ করে—মনের মতো হউক আর নাই হউক, বিচার করে না, যাহাকে পায় তাহাকে লইয়া চোককান বুজিয়া কোনো-রকমে চিরজীবন তাহাকে বহন করে।

ইহার বিরুদ্ধে একালের একদল অর্ব্বাচীন ঘোড়া মধ্যে একবার ভয়ঙ্কর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন ঘোড়ার দল এতবড় অনাচার কিছুতেই ঘটিতে দিবে না বলিয়া পণ করিয়া বসিয়াছে। একালের ঘোড়াদের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রাচীন দলকে অগ্রাহ্য করিয়া মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া উঠিতেছে;—সেইজন্য পথে-ঘাটে দেখা যায় এক একটা ছোঁড়া ঘোড়া পিছনের পা দিয়া তার গাড়িখানাকে লাথাইয়া

লাথাইয়া থেঁৎলাইয়া ফেলিতেছে। পিঠে অনেক চাবুক পড়িলেও এই দলের ঘোড়া কিছুতেই সায়েস্তা হয় না;—সেইজন্য ঘোড়া ও গাড়োয়ান-সমাজে একটা দুর্ভাবনার ঢেউ চলিতেছে। এই দলের বিদ্রোহ যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে সেজন্য অতি সাবধানে উহাদের রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—উহাদের ছোঁয়া যাহাতে আর-কারো না লাগে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি আছে;—উহাদিগকে জাতিচ্যুত করা হইয়াছে এবং বৃদ্ধ-বয়সে পিঁজরাপোলে স্থান দেওয়া হইবে না বলিয়া শাসানো হইয়াছে।

এদিকে অশ্বকোবিদ্‌গণ অভিমত দিয়াছেন যে উহা একপ্রকার সংক্রামক রোগ;—আজ-কাল ইথরের মধ্য দিয়া ঐ রোগের বীজানু ইউরোপ হইতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে;—এ রোগ জাতিবিচার করে না, মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকলকেই পাইয়া বসে। যাহার অন্তর-স্বাস্থ্য দুর্ব্বল—অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে সনাতনী মহাশক্তি শুদ্ধাচারের অভাবে লোপ পাইয়াছে—এই রোগ তাহাদিগকেই পাইয়া বসে। খবর পাওয়া গিয়াছে, ঐ রোগের বীজানু ধ্বংস করিবার জন্য ভেটারিনারি কালেজে গভীর আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে রোগবীজ ধ্বংস করিবার প্রণালীর উপর অনেকের আস্থা নাই—তাঁহারা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীঅশ্ব-ঘোষের মানসিক মানিয়াছেন।

সে যাহা হোক, আমরা যে কালো জুড়ির কথা বলিতেছি, তাদের এসব বালাই ছিল না,—তাদের সহিত তাদের জীবনসঙ্গিনীর বেশ মনের মিল ছিল। সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িখানি বৃদ্ধা হইলে কি হয়—সাজে সজ্জায় চাকচিক্যে এমনি চমৎকার যে মনে হয় যেন পূর্ণ যুবতী। পাঁচু মিঞা ভাড়ায় গাড়ি খাটায় বটে কিন্তু গাড়ির সখ তার আছে। সেইজন্য তার আস্তাবলের গাড়ির বয়স ধরে কার সাধ্য! কালো জুড়ি তাদের জীবন-সঙ্গিনীর বয়স টের পাইয়াছিল কিনা জানিনা কিন্তু এ কথা বলিতে পারি গাড়ি নিজে সে কথা উহাদের কাছে ফাঁস করে নাই।

(২)

কালো জুড়ির জীবন বেশ সুখেরই ছিল;—পাঁচু মিঞার আদর-যত্নের অভাব ছিল না, আহার মনের মতো মিলিত এবং পরিশ্রম যাহা করিতে হইত কাঁচা বয়স বলিয়া গায়ে লাগিত না। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ ইহজগতে মেলেনা। সেইজন্যই কালো জুড়ির অদৃষ্টে মধ্যে মধ্যে দুঃখভোগ থাকিত;—সে দুঃখ বিরহ-যন্ত্রণা। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ গাড়িখানি কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। দুই চারিদিন পরে আবার ফিরিয়া আসিত। কালো জুড়ি জিজ্ঞাসা করিলে গাড়ি বলিত—"আমি বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম।"

জীবনসঙ্গিনীকে দেখিয়া তখন কালো জুড়ির বিরহ-যন্ত্রণা যেন আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাইত—এমন চমৎকার রূপ লইয়া সে ফিরিত যে তার দিক হইতে চোখ ফেরানো যাইত না;—সে কী লাবণ্য, সে কী চাকচিক্য! দিবারাত্র হাড়ভাঙা খাটিয়া খাটিয়া তার কঠা যখন বাহির হইয়া পড়িত, ধুলায় কাদায় সে

যখন বিশ্রী হইয়া উঠিত তখনই তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইত। সেখানে সেবাশুশ্রূষা পাইয়া সে আলো-করা রূপ লইয়া কালো জুড়ির কাছে ফিরিয়া আসিত! কালো জুড়ি আস্তাবলে পড়িয়া পড়িয়া যখন বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিত,—তাদের অলস দিনগুলি যখন আর কাটিতে চাহিত না, সঙ্গিনী অভাবে জীবন যখন মরুময় হইয়া উঠিত তখন কল্পনায় ঐ রূপের মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়া তাদের বিরস চিত্তকে সরস করিয়া তুলিত;—সেই রূপসুধা পান করিয়াই তাহারা বিরহী জীবন বাঁচাইয়া রাখিত।

আমি তখন পাঁচু মিঞার আস্তাবলের কাছেই থাকিতাম। যখন শুনিতাম গাড়িখানি কালো জুড়িকে বলিতেছে—"আমি বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম"—তখন আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিত। রমণী হইয়া এ কী জঘন্য চাতুরী! সে গিয়াছিল কারখানায় আর বলে কি না বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম! রমণী জাতির কতদূর অধঃপতন হইতে পারে ভাবিয়া আমি শিহরিয়া উঠিতাম। রমণীর মুখে মিথ্যা, প্রবচঞ্চনা—এ কি সহ্য করা যায়? আমি দেখিলাম, উহা সংশোধন করিবার জন্য পাঁচু মিঞাকে না বলিলে আমার কর্ত্তব্যের হানি হয়। আমি পাঁচু মিঞাকে একদিন বলিলাম। সে আমার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। বলিল,—"যেখানে যার জন্ম, সেই তো তার বাপের বাড়ী!" আমি বলিলাম—"তা বটে!" কিন্তু মন হইতে এখনো সন্দেহ ঘোচে নাই। মনে হয় ঐ কথাটার মধ্যে কোথায় একটা ফাঁকি আছে। সেইজন্য আমার মতে—বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম—না বলিয়া—বোধ হয় বাপের বাড়ি গিয়াছিলাম—বলিলে—বোধ হয় ঠিক হয়।

মিথ্যা প্রবঞ্চনা ইত্যাদির কথা বলিতে গিয়া আমি আর-একটি গুরুতর অবিচারের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। যদি রসভঙ্গ হয় পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

আমাদের বাড়ীর পাশে একজন ধনী মহাজনের একখানি টম্‌টম আছে—সেই টম্‌টম্ এক লাল ঘোড়ায় টানে। ইহা ছাড়া সহরে মফস্বলে টম্‌টম্ আমি ঢের দেখিয়াছি। কিন্তু ঐ টম্‌টম্ দেখিলেই আমার চিত্ত জ্বলিয়া ওঠে। এ কী অবিচার!—চারি পা-ওয়ালা ঘোড়ার সঙ্গে দুই-চাকার গাড়ি! সাম্য-মন্ত্রের এত বড় অপমান? কি আশ্চর্য্য, এটা কাহারো চোখেই পড়ে না! বিজ্ঞান এত অসাধ্য সাধন করিয়াছে, দুই-পেয়ে ঘোড়া দিয়া টম্‌টম্ চালানো কি তার পক্ষে এতই অসাধ্য? এদিকে বৈজ্ঞানিক-দের দৃষ্টি পড়িতেছেনা বড়ই ক্ষোভের বিষয়! বড় বড় প্রশ্নের সমাধান ছাড়িয়া দিয়া এই সব ছোটো-খাটো বিষয়ে মন দেওয়াই তো চাই! এই ছোটোকে অবলম্বন করিয়াই তো বড় হইতে হয়। নয় ত আকাশে উড়িয়া, গাছপালাকে গান শেখাইয়া তো আর পেট ভরিবে না! আমি অনেকবার এ সম্বন্ধে চীৎকার করিয়াছি—কিন্তু সে আমার অরণ্যে রোদন হইয়াছে।

ক্ষুদে জাপানী এত বড় হইয়াছে কেন জান? তোমরা অনেকে অনেক কথা বল, আমি সে সব মানিনা। আমি

বলি, জাপানীরা দুচাকার গাড়ি রিক্স দু-পেয়ে জানোয়ার দিয়া টানায় বলিয়া তাহারা উন্নতির এই উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এসব কথা তুলিয়া লাভ কি? যাহা বলিতেছিলাম বলি।

দিন বেশ চলিতেছিল, এবং চিরজীবন বেশ চলিতে পারিত কিন্তু হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তনে সব গোলমাল হইয়া গেল। এই পরিবর্ত্তনই তো সর্ব্বনেশে! যেমন চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে তেমনি বরাবর চলিলে কোনো হাঙ্গাম থাকে না,—চোখ বুজিয়া বাঁধা-পথ ধরিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাও—ব্যস্। কিন্তু তা নয়। সুখে থাকিতে ভূতে কিলাইবার জন্য, কতকগুলা নির্ব্বোধ জীব আছে, তারা একেবারে অস্থির! তারা কেবলই বলে—"পরিবর্ত্তন কর, পরিবর্ত্তন কর!" আরে বাপু, পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তের মধ্যে ঘূরপাক খাইয়া খাইয়া মরিবার জন্য এত ছট্‌ফটানি কেন? মরিবার কি আর পথ পাওনা?

ঘোড়ার ট্রাম উঠিয়া গিয়া সহরে যে দিন ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম চলা আরম্ভ হইল, ঘোড়া-সমাজ সেই দিন মনে মনে বিপদ গণিল। ট্রামের ঘোড়াদের কাজ গেল। তাহাদের কেহ বলিল—"হায়! আমাদের আদর যাইতে বসিল।" কেহ বলিল—"হায়, আমাদের মূল্য কমিয়া গেল।" কেহ বলিল—"কলিযুগে দিন দিন হইতে চলিল কি! আমাদের এতদিনের অধিকার—যাহা পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিল? এখনও চন্দ্রসূর্য্য উঠিতেছে—ধর্ম্ম কি এত বড় অন্যায় সহিবেন?" আর একজন অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে বলিল—"মানুষই যদি না বহিতে পাইলাম, বোঝা যদি পিঠে না করিলাম তবে এ ঘোড়া-জীবনের প্রয়োজন কি? অমনি একজন সুর করিয়া উচ্চস্বরে গাহিয়া উঠিল—"জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ, দ্বিগুণ—পরাণ সঁপিবে অশ্বিনীকুল!"

(৩)

যতটা ভয় হইয়াছিল আসলে দেখা গেল ততটা ভয়ের কারণ নাই। ট্রামের বরখাস্ত ঘোড়ার অন্যত্র কাজ জুটিয়া গেল। ভাড়া গাড়ির ভাড়াটিয়া কিছু-কিছু কমিল বটে কিন্তু কাজ একেবারে অচল হইল না। হইবার মধ্যে এইটুকু হইল যে, বছর-বছর সহরে যে ঘোড়ার আমদানি হইত তাহার মাত্রা অনেক কমিয়া গেল। সে একরূপ ভালোই হইল। ছত্রিশ-জাতের ঘোড়ায় সহর ভরিয়া যাইতেছিল—তাহাদের সহিত জাতিধর্ম্ম বাঁচাইয়া লোকলৌকিকতা করা শক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এখন সে ভাবনা অনেকটা ঘুচিল।

এই তো গেল সাধারণ ভাবের কথা। খুটিনাটি করিয়া দেখিতে গেলে অনেকের অনেক রকম অসুবিধা ঘটিতেছিল। পাঁচু মিঞার উপার্জ্জন কমিয়াছিল। সেইজন্য সে সর্ব্বদাই মুখ ভার করিয়া থাকিত;—তাহা দেখিয়া আমাদের কালো জুড়ির মনে বড়ই দুঃখ হইত। পাঁচু মিঞার মেজাজও আগের চেয়ে অনেক খারাপ হইয়া উঠিয়াছে—সেই জন্য কালো জুড়ির পিঠে যখন-তখন চাবুক পড়ে;—সেও এক দুঃখ। লাভ কমিয়া

গেছে বলিয়া তাদের আহারের মাপও কমানো হইয়াছিল।

এ সব দুঃখ একরকম করিয়া সহা যাইত কিন্তু ঐ যে জীবন-সঙ্গিনীর সহিত মিলনের অবসর কম ঘটিতেছে সেজন্য মনটা দিন দিন বড়ই খারাপ হইয়া উঠিতেছিল। ভাড়া তেমন জোটে না বলিয়া আজকাল আর গাড়ি সব সময়ে জোতা হয় না—অনেক সময় বেকার পড়িয়া থাকে।

কথায় বলে, দুর্দ্দিন একা আসেনা। হঠাৎ পাঁচু মিঞার অসুখ হইয়া পড়িল। যে কটা দিন সে বিছানায় পড়িয়া ছিল, সে কটা দিন কালো জুড়ির যে কি কষ্টে গিয়াছে বলা যায় না। জীবনসঙ্গিনী আস্তাবলের এক ধারে কাৎ হইয়া পড়িয়া আছেন—আর এক ধারে দড়ি-বাঁধা কালো জুড়ি। দু দলের মিলন নাই!—এ যেন সেই নদীর এপারে চখা, ওপারে চখী! হায়, হায়! সে অবস্থায় কালো জুড়ির পায়ের কাছে কাগজ কলম ছিল না; যদি থাকিত তাহা হইলে অমি জোর করিয়া বলিতে পারি তারা নিশ্চয় কতকগুলা কবিতা লিখিয়া ফেলিত। কে বলিতে পারে সে কবিতা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিত না! এমনি করিয়া কত ভালো ভালো জিনিষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে!—ইহার একটা উপায় করা উচিত।

পাঁচু মিঞার সারিতে যতই দেরি হইতে লাগিল, কালো জুড়ি দুঃখে ভাবনায় ততই সারা হইতে লাগিল। গাড়ির এ কী অবস্থা! এ কি চোখে দেখা যায়? মুখের উপর কালি পড়িয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গে ধুলা কাদা! তাহার সে অপরূপ শ্রী আজ কোথায়! কালো জুড়ির বুক ফাটিয়া দুঃখ উথলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হায়, উপায় নাই—হাত পা বাঁধা! গাড়ি একবার গড়াইয়া কালো জুড়ির কাছে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু নিজের জোরে চলিতে সে কখনো শেখে নাই—কেমন করিয়া পারিবে? চাকা কিছুতেই গড়াইল না। তার এই নিস্ফল উদ্যম দেখিয়া পাশ হইতে ল্যাজ-ছাঁটা একটা ফচকে টিটকারি দিয়া বলিয়া উঠিল—"কেমন? বলি নাই—তোমাদের জীবনসঙ্গিনীদের নিজের পায়ে চলিবার অধিকার দাও?—এখন টের পাইতেছে ত!"

কালো জুড়ি সেই ছোকরার বেয়াদবীতে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সজোরে একবার চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করিয়া উঠিল। পা খোলা থাকিলে নিশ্চয় একটা লাথি কসাইয়া দিত।

(৪)

বর্ষা চিরদিন থাকে না—আবার রোদ ওঠে, হাসি ফোটে। পাঁচু মিঞা সারিয়া উঠিল। আগের মতো আবার দিন চলিতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল কোথা হইতে মোটর গাড়ি উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। ঘোড়াকুল এইবার মাথায় খুর দিয়া বসিয়া পড়িল।

খবরের কাগজে পড়া গেল—লণ্ডনে মোটর গাড়ির আধিক্য দিন দিন এতই প্রবল হইয়া উঠিতেছ যে ঘোড়ার গাড়ি প্রায় নির্ম্মূল। তবে উপায়? এখানেও তো সেই অবস্থা হইবে। সহরের অধিকাংশ

ঘোড়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেবল কয়েকটা ফচ্‌কে যাহারা ইঁচড়ে পাকিয়াছে তাহারা ফ‍ূর্ত্তির সহিত বলাবলি করিতে লাগিল—"ভালই হইয়াছে! এইবার আমরা লাগাম-মুক্ত হইলাম।"

একজন ঘোড়া-সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী সে কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! লাগাম-মুক্ত! তাহা হইলে যে সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতার রসাতলে ডুবিয়া মরিবে!"

একজন তার্কিক ছোকরা যুক্তি দেখাইয়া বলিল—"এমন ঘোড়া তো ঢের আছে যাদের মুখে এখনো লাগাম পড়ে নাই—তারা তো দিব্য বাঁচিয়া আছে।"

হিতৈষী মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"তাদের কথা ছাড়িয়া দাও—তারা বর্ব্বর বুনো ঘোড়া!"

ফচ্‌কে ছোকরা মাটিতে খুর ঠুকিয়া বলিল—"আমরাও না হয় সেই বুনো ঘোড়া হইলাম!"

এই কথায় এক পণ্ডিত ঘোড়া রোষ-কষায়িত লোচনে বলিয়া উঠিলেন—"তোরা উচ্ছন্ন যা! উচ্ছন্ন যা! যা-খুসি করিয়া তোরাই তো আমাদের মজাইতে বসিয়াছিস। তোদের পাপেই তো আমাদের এই দুর্দ্দশা!"

এক বুদ্ধিমান ঘোড়া ক্রুদ্ধ বক্তার পিঠে ল্যাজ বুলাইয়া বলিলেন—"রাগ করিতে নাই বাপু, রাগ চণ্ডাল। ঐ চণ্ডালের স্পর্শে দেহ মন অশুচি হয়।"

তারপর ঐ ফচ্‌কেগুলোকে ডাকিয়া তিনি সৎপরামর্শ দিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বোঝো বাপু, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন আমাদেরও তাই করা উচিত নয় কি? তাঁরা তো আর বোকা ছিলেন না। আমাদের ধর্ম্মই হইতেছে—বোঝা বওয়া। বোঝা যদি আমরা না বই তাহা হইলে যে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব;—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।" এই কথার উত্তরে ফচকেগুলো এমন জোরে হাসিয়া উঠিল যে বক্তার আর বাক্যস্ফ‍ূর্ত্তি হইল না।

(৫)

মোটর গাড়ির অধিষ্ঠান লইয়া ঘোড়া মহলে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। সে সব কথা লিখিয়া লেখার ভার বৃদ্ধি করিতে চাই না। কিন্তু তার মধ্যেকার একটি মূল্যবান কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একজন বক্তাকে একবার বলিতে শুনিয়াছিলাম—"প্রতিদিন আমরা কি শিক্ষালাভ করিয়াছি? আমাদের আস্তাবলে চোখের সম্মুখে মিঞাসাহেবের মুরগির ডিমগুলো যে প্রতিদিন নিজের আবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সে কিসের জন্য?—সে কি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া মিঞাসাহেবের রসনাকে পরিতৃপ্তি দিবার জন্য নহে? দ্বিজরাজ কি গায়ত্রীমন্ত্র আমাদের কানে কানে দিনরাত শোনাইয়াছেন? সে কি পরার্থে জীবন বিসর্জ্জন নয়? সেই মহৎ শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়াই আমরা মানুষের জন্য—আমাদের ধর্ম্মের জন্য এমন করিয়া প্রাণপাত করিতে পারি। যতক্ষণ প্রাণ থাকে আমরা মানুষকে বিনা আপত্তিতে স্বচ্ছন্দচিত্তে বহন করি; তার পর লাগামসুদ্ধ মুখ-থুবড়াইয়া পড়িয়া মরণের দ্বারা জীবনকে সার্থক করিয়া তুলি। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের জীবনের এই ধর্ম্ম, এই মহত্ত্ব যেন না ভুলি!"

ঘোড়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেবল কয়েকটা ফচ্‌কে যাহারা ইঁচড়ে পাকিয়াছে তাহারা স্ফূর্ত্তির সহিত বলাবলি করিতে লাগিল—"ভালই হইয়াছে! এইবার আমরা লাগাম-মুক্ত হইলাম।"

একজন ঘোড়া-সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী সে কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! লাগাম-মুক্ত! তাহা হইলে যে সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতার রসাতলে ডুবিয়া মরিবে!"

একজন তার্কিক ছোকরা যুক্তি দেখাইয়া বলিল—"এমন ঘোড়া তো ঢের আছে যাদের মুখে এখনো লাগাম পড়ে নাই—তারা তো দিব্য বাঁচিয়া আছে।"

হিতৈষী মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"তাদের কথা ছাড়িয়া দাও—তারা বর্ব্বর বুনো ঘোড়া!"

ফচ্‌কে ছোকরা মাটিতে খুর ঠুকিয়া বলিল—"আমরাও না হয় সেই বুনো ঘোড়া হইলাম!"

এই কথায় এক পণ্ডিত ঘোড়া রোষ-কষায়িত লোচনে বলিয়া উঠিলেন—"তোরা উচ্ছন্ন যা! উচ্ছন্ন যা! যা-খুসি করিয়া তোরাই তো আমাদের মজাইতে বসিয়াছিস। তোদের পাপেই তো আমাদের এই দুর্দ্দশা!"

এক বুদ্ধিমান ঘোড়া ক্রুদ্ধ বক্তার পিঠে ল্যাজ বুলাইয়া বলিলেন—"রাগ করিতে নাই বাপু, রাগ চণ্ডাল। ঐ চণ্ডালের স্পর্শে দেহ মন অশুচি হয়।"

তারপর ঐ ফচ্‌কেগুলোকে ডাকিয়া তিনি সৎপরামর্শ দিতে লাগিলেন। বলিলেন--"বোঝো বাপু, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন আমাদেরও তাই করা উচিত নয় কি? তাঁরা তো আর বোকা ছিলেন না। আমাদের ধর্ম্মই হইতেছে—বোঝা বওয়া। বোঝা যদি আমরা না বই তাহা হইলে যে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব;—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।" এই কথার উত্তরে ফচকেগুলো এমন জোরে হাসিয়া উঠিল যে বক্তার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

(৫)

মোটর গাড়ির অধিষ্ঠান লইয়া ঘোড়া মহলে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। সে সব কথা লিখিয়া লেখার ভার বৃদ্ধি করিতে চাই না। কিন্তু তার মধ্যেকার একটি মুল্যবান কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একজন বক্তাকে একবার বলিতে শুনিয়াছিলাম—"প্রতিদিন আমরা কি শিক্ষালাভ করিয়াছি? আমাদের আস্তাবলে চোখের সম্মুখে মিঞাসাহেবের মুরগির ডিমগুলো যে প্রতিদিন নিজের আবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সে কিসের জন্য?—সে কি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া মিঞাসাহেবের রসনাকে পরিতৃপ্তি দিবার জন্য নহে? দ্বিজরাজ কি গায়ত্রীমন্ত্র আমাদের কানে কানে দিনরাত শোনাইয়াছেন? সে কি পরার্থে জীবন বিসর্জ্জন নয়? সেই মহৎ শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়াই আমরা মানুষের জন্য—আমাদের ধর্ম্মের জন্য এমন করিয়া প্রাণপাত করিতে পারি। যতক্ষণ প্রাণ থাকে আমরা মানুষকে বিনা আপত্তিতে স্বচ্ছন্দচিত্তে বহন করি; তার পর লাগামশুদ্ধ মুখ-থুবড়াইয়া পড়িয়া মরণের দ্বারা জীবনকে সার্থক করিয়া তুলি। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের জীবনের এই ধর্ম্ম, এই মহত্ত্ব যেন না ভুলি!"

এই সব ব্যাপারে কালো জুড়ি কি মনে করিয়াছিল তাহা আমরা ঠিক জানিনা, কিন্তু এটা জানি যে তাহারা ভাবিতেছিল —কাজ যদি মারা যায় তাহা হইলে জীবন-সঙ্গিনীর সহিত যে অত্যন্ত বিচ্ছেদ হইবে! সেই ভাবনায় তাহারা দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। এবং মনে মনে মোটর গাড়ির নিপাত কামনা করিতে লাগিল।

ঘোড়ার দল কি করিবে স্থির করিতে করিতে—তর্ক বিতর্ক, বিচার বিবেচনা, আলোচনা আবেদন ঠিক করিতে করিতে এদিকে সহর মোটর গাড়িতে ছাইয়া গেল। তখন দুর্ভাবনা হইল মোটরকুল সংখ্যায় এত বেশী এবং ওজনে এত ভারি হইয়া উঠিতেছে যে বক্তৃতার ফুঁয়ে আর তাহাদের হটানো যাইবে না। এমনি করিয়া দিন দিন প্রশ্ন জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই জটিলতার মীমাংসা করিতে গিয়া ব্যাপার আরো জট পাকাইয়া যাইতে লাগিল। এবং ধীর চিত্তে সব দিক দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া সে জট খুলিবার চেষ্টায় যে সময় গেল তার মধ্যে তার চতুর্গুণ জট অন্যত্র পাকাইয়া গেল। এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। শেষে ভাড়াটিয়া মোটরও দেখা দিল। তখন ঘোড়ারা একেবারে হতাশ!

* * *

কালো জুড়ি সেদিন বৈকালে বাহির হইয়া চৌরঙ্গীর গাড়ির আড্ডায় দাঁড়াইয়াছে। পাঁচু মিঞা কোচ-বাক্সে আছে। সমস্ত দিনের মধ্যে সে কিছুই রোজগার করিতে পারে নাই। সেইজন্য মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আছে। পাঁচু বসিয়া বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতেছিল।

ভাড়াটিয়া নাই। প্রায় পঁচিশখানা গাড়ি দাঁড়াইয়া—কাহারো একটা ডাক নাই। এমনই দুর্দিন! অনেকক্ষণ পরে এক সাহেব খানিকদূর হইতে হাতনাড়া দিয়া ইসারা করিল। অমনি যে যেখানে ছিল গাড়ী লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। এমনি হুটোপাটি যে এ ওর ঘাড়ে গিয়া পড়ে! এমন সময় পাশের গলি হইতে ঝড়ের মতো এক মোটর হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল;—পড়বি তো পড় একেবারে কালো জুড়ির ঘাড়ের উপরে! কালো জুড়ি চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল—পাঁচু মিঞা গাড়ির উপর হইতে ছিটকাইয়া পড়িল। বিপদ দেখিয়া অন্য গাড়োয়ানেরা যে যেখানে পাইল ছুট দিল—পাছে পুলিশে সাক্ষী দিতে হয়। রাস্তা পরিষ্কার হইয়া গেলে দেখা গেল—কালো জুড়ি রক্তাক্ত—গাড়ি অর্দ্ধ-ভগ্ন, কেবল পাঁচু মিঞা অক্ষত।

এই ব্যাপার লইয়া ঘোড়া মহলে খুব একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। সকলেই মোটর গাড়ির দাম্ভিকতায় ক্ষেপিয়া উঠিল। একজন বিচক্ষণ ঘোড়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"বুঝিলে কি? ব্যাপারটার গূঢ় অর্থ বুঝিলে কি? মোটর গাড়ি যে অশ্বকুল নির্ম্মূল করিবে তাহা ভগবান প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলেন।" এই কথা শুনিয়া ঘোড়ারা চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া সে রাত্রি সমস্তক্ষণ আস্তাবলে পড়িয়া মনের ক্ষোভে কেবল চিঁ হিঁ হিঁ চিঁ হিঁ হিঁ করিতে লাগিল।

তারপর? তার পর আর কি? অনেক চিকিৎসা করিয়া দেখা গেল কালো জুড়ি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেছে। তাহাদের পিঁজরাপোলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। চারি চক্ষু দরদর-ধারায় বিগলিত করিয়া মুমূর্ষু জীবন-সঙ্গিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া তারা পিঁজরাপোলে চলিয়া গেল। যাইবার সময় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বলিয়া গেল—"হে মানববৃন্দ! জীবনে বড় দুঃখ রহিয়া গেল—শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের সেবায় প্রাণপাত করিতে পারিলাম না। হে প্রভু, তোমরা ক্ষমা করিয়ো—কত অপরাধ করিয়াছি! মোহান্ধ হইয়া হয় ত কত সময় নিজের গোঁভরে চলিতে গিয়া তোমাদের অসুবিধা ঘটাইয়াছি। যেখানে তোমাদের দ্রুত যাওয়া প্রয়োজন, সেখানে হয় ত অবহেলা করিয়াছি—ছি, ছি! হয় ত অচল হইয়াছি। আজ জীবনের শেষদশায় তার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত। তোমরা ক্ষমা করিয়ো। হে দেব, যতই চেষ্টা করি না কেন তবু আমরা তোমাদের হাতের কল একেবারে বনিয়া যাইতে পারি নাই—অনেক সময় নিজের দৌর্ব্বল্যবশত স্বেচ্ছাচার করিয়াছি—এ অক্ষমতার জন্য লজ্জিত। কিন্তু এখন এ আশা লইয়া মরিতে পারিব—আমাদিগের স্থান যাহারা অধিকার করিবে তাহারা তোমাদের হাতে তেমনই নাচিবে যেমন তোমরা নাচাইবে; আমরা যাহা পারি নাই আমাদের চেয়ে উন্নত যাহারা তাহা পারিবে।"

শুনিয়াছি পিঁজরাপোলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কালো জুড়ি আবেদন করিয়াছে তাহাদের সহিত তাহাদের অকর্ম্মণ্য জীবনসঙ্গিনীকেও পিঁজরাপোলে রাখা হউক। কিন্তু পিঁজরাপোলে গাড়ি রাখিবার ব্যবস্থা নাই বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা সে আবেদন নামঞ্জুর করিয়াছেন।*

শত্রু

(ইংরাজী নাটিকা অবলম্বনে)

পাত্র ও পাত্রী

পূরণ সিংহ...জনৈক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি; সম্ভ্রান্ত বংশের হীনাবস্থ বংশধর।

মীঠীবাঈ...পূরণ সিংহের যুবতী স্ত্রী।

একজন চিকিৎসক।

একটি পুরাতন ভৃত্য।

ছায়ামূর্ত্তি।

প্রথম দৃশ্য

[কাশ্মীরের একটি পুরাতন কেল্লার কাম্‌রা; কাম্‌রাটি একরকম আস্‌বাবহীন; দেওয়ালে ছবি নাই, কিন্তু ফ্রেমের দাগ আছে; মর্ম্মর প্রতিমাগুলি বিকাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার শূন্য বেদীগুলি দাঁড়াইয়া আছে। থাকিবার মধ্যে পূরণ সিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের

---

* এইখানে শেষ না করিয়া লেখক যদি আরো অগ্রসর হইতেন আমার মনে হয় ভালো হইত। কারণ ইহা একটু আধুনিক গল্পের মতো হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি এই ত্রুটিটুকু সংশোধন করিয়া যথাসময়ে অর্থাৎ কালো জুড়ি ইহলোক ত্যাগ করিলে তাহাদের পারলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া এই গল্পটি শেষ করিবেন।—সম্পাদক।

কতকগুলি বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ মানুষের আকারে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া খাড়া হইয়া আছে। সময়—মধ্য রাত্রি। আঙার-ধানীতে আগুন জ্বলিতেছে। পূরণ সিংহ ও মীঠীবাঈ আসীন।]

পূরণ সিংহ।

হায় প্রিয়া! বড় ব্যথা পাই আমি প্রাণে
যখনি পৈতৃক এই গেহ পানে চাই;
হৃতসজ্জা কক্ষ সব, আভরণহীন
ঝঞ্ঝাহত নিষ্পত্র এ বনস্থলী হায়!
যুগযুগান্তের যত সঞ্চিত সম্পদ,—
মূর্ত্তি, চিত্র, গিয়েছে বিকায়ে একে একে,
অতীত জয়ের যত স্মৃতি-নিদর্শন
শত্রু-রক্ত-রেখাঙ্কিত খড়্গ তলোয়ার
সব গেছে নষ্ট হয়ে। পৈতৃক বৈভব
কিছু নাই; নিবে গেছে বংশের গরিমা।
কষ্টের উপরে কষ্ট হায় প্রিয়তমে!
তোমারে মলিন দেখি, আরামের নীড়ে
সুখে ছিলে হে কিশোরী! ঐশ্বর্য্যের কোলে;
না করিতে পদার্পণ আনন্দ যৌবনে
বন্দীসম বদ্ধ মোর নিরানন্দ গেহে।

[বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক পায়চারি করিতে লাগিলেন। মীঠীবাঈ আঙার-ধানীর আগুনের দিকে আরো ঘেঁষিয়া বসিলেন।]

কে দায়ী? কে দোষী ইথে? এই দুর্দ্দশার
দায় দোষ—সে কি মোর? মিতব্যয়ী আমি
চিরদিন, আশক্তি নাহিক দ্যূতে কভু,
মদ্যে মোর নাহি রুচি; তবু, নিত্য নব
দুর্নিয়তি হায় মোরে দুখ, দলে মোরে
দুই পায়ে, ধূলিতলে করে অবনত,
রন্ধ্রগত শনি সম নিয়ত ফিরিছে
অলক্ষ্যে নিষ্ঠুর শত্রু মোর পিছে পিছে।

মীঠী বাঈ।

শত্রু?...অতীত জীবনে, কখনো কি হায়
করেছ অহিত কারো? দেখ দেখি ভেবে,
সে বুঝিবা এতদিনে লয় প্রতিশোধ!
কিম্বা এ পৈতৃক শত্রু?—প্রাণে জাগে যার
শত্রুশোণিতের তৃষ্ণা—অতৃপ্ত দুর্ব্বার!

পূরণ সিংহ।

জেনেশুনে কভু কারো করিনি অহিত।

মীঠী বাঈ।

অজানিতে হয় তো করেছ; ভেবে দেখ।

পূরণ সিংহ।

পৈতৃক শত্রুর কথা...তাও শুনি নাই
পিতৃমুখে কোনোদিন; বংশগত রোষ
আমাদের বংশে নাই। এই শুধু জানি
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র যত, যত মোর গ্রাম—
একে একে গ্রাসিয়াছে শত্রু নামহীন,
মুখস পরিয়া মুখে পিছনে সম্মুখে
অহর্নিশি ফিরিছে সে গুপ্ত ছোরা হাতে
লক্ষ্যিয়া এ বক্ষ মোর পিতৃধনহারী।
মিছে তারে খুঁজে মরি ধরিতে না পারি।

[ঘরে ভোরের আলো ঢুকিতেই মীঠীবাঈ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

মীঠি বাঈ।

উঠেছে ভোরের হাওয়া, দেখিগে খোকারে।

(প্রস্থান)

পূরণ সিংহ।

(বর্ম্মময় মূর্ত্তিগুলির দিকে ফিরিয়া)
ওগো বর্ম্মপরিহিত পিতৃপিতামহ!
অতীতের দেশমুখ ওগো বীরগণ!

আছে কি এ বংশে কোনো অন্যায়ের কালি ?
এ রক্ত কি অতীতের দুষ্কৃতি পঙ্কিল ?
কোন্ অন্ধ যুগে হায় করেছ কি পাপ
ফলভোগ করি যার আমি এতদিনে ?
তুমি খুল্লপিতামহ ! তুমি হে হম্মীল্!
দুষ্কৃতিতে দুঃশাসন ছিলে তুমি শুনি,—
দেবদ্বেষী, রমণীর অপমানকারী,
পরের পীড়ক চির,—তোমারে কি কেহ
দিয়েছিল অভিশাপ অমোঘ দারুণ
যার দাহে আমি আজ দহি অহর্নিশি ?
তুমি করে গেছ পাপ, এতদিনে তার
প্রায়শ্চিত্ত হবে কি গো মোরে দিয়া ? বল,
বল, বল, বল, কথা কও একজন
ভোরের আলোকে পরিস্নাত কথা কও।

[এই সময় বর্ম্মময় মুর্ত্তিগুলির উপর অল্পে অল্পে ভোরের আলো আসিয়া পড়িল।]

সবাই নির্ব্বাক ! সব স্থির ! স্পন্দহীন !
তবু সাধি পুনর্ব্বার, মৃতেরে জাগাই
প্রশ্নের উত্তর লাগি। বল, কে আমায়
করিল এমন রিক্ত সর্ব্ব বিত্তহীন ?
কে করিল নগ্ন মোরে জগতের আগে ?

ছায়ামুর্ত্তি।

(অভ্র-ফলকে ঢাকা জানালার পিছন হইতে)

আমি !

পূরণ সিংহ।

(আতঙ্কের স্বরে)

তুই !…কে তুই ? জীবন্ত জীব কি রে ?
কিম্বা মোর চিন্তা-তপ্ত মস্তিষ্কের মায়া ?
মুখসে আবৃত মুখ…কথা ক'…কে তুই !

[পূরণ সিংহ স্বপ্নাবিষ্টের মত ছায়ামুর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইতে না হইতে মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল।]

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্ব্বোক্ত কাম্‌রা; সময়—মধ্য-রাত্রি; পট উঠিবার সময় দূরে পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজিল। পূর্ব্ব দৃশ্যে যেখানে ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গিয়াছিল ঠিক সেইখানে পূরণ সিংহ দণ্ডায়মান।]

পূরণ সিংহ।

সেই তবে শত্রু মোর—মুখেতে মুখস্,—
সহসা দেখিনু যারে ভোরের আলোয়
আব্‌ছায়ে, সেই মোর দুর্দ্দশার হেতু
নিজমুখে করেছে স্বীকার; তবু ঠিক
পাইনি জবাব; বাহির করিতে তবু
সবিশেষ পারিনিক হায়, কোনো কথা।
নিকটে যেতে না যেতে হল অন্তর্ধান
নিঃসাড়ে, যেমন এসেছিল নিঃশবদে।

[গর্ভ-গৃহের দিকে চাহিয়া]

শিশু মোর ঘুমাইছে, কিন্তু কোথা গেল
প্রসূতি তাহার ? এ রাতে কোথা সে নারী ?

(পত্র হস্তে ম্লানবেশী বৃদ্ধ ভৃত্য প্রবেশ করিল।)

ভৃত্য।

প্রভু ! ঠাকুরাণী মোর দিলেন এ চিঠি,
হুজুরের হাতে দিতে হুকুম তাঁহার
দুপুর বাজিয়া গেলে রাতের ঘড়িতে।

(পূরণ সিংহ সাগ্রহে ভৃত্যের হাত হইতে চিঠি লইলেন।)

পূরণ সিংহ।

(চিঠি খুলিয়া পাঠ)

"স্বামিন্! আমি বাড়ী ছাড়িলাম, আর ফিরিব না। বাড়ী ছাড়িলাম বটে, কিন্তু ইহা স্থির জানিবেন আমি নিষ্কলঙ্ক। আমি

তোমার কুলে কালি দিই নাই, অন্য কোনো লোকের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। থাকিতে পারিলাম না, তাই চলিলাম। আমাকে ক্ষমা করিয়ো, আর খোকা বড় হইলে তাহাকে আমায় ক্ষমা করিতে শিখাইয়ো। ইতি মীঠী বাঈ।”

[পূরণ সিংহ ভৃত্যকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।]

পূরণ সিংহ।

চলে গেল, সেও ছেড়ে চলে গেল মোরে,
লক্ষ্মীশূন্য গেহ মোর শ্মশান করিয়া
চলে গেল।...হে বিধাতা! আর কিবা বাকী?
ছেড়ে গেল অকারণে? পারিল সে যেতে?...
দুশ্চিন্তার অবিশ্রান্ত দংশনের ব্যথা,—
নিত্য নব চিত্তের উদ্বেগ, দৈন্য জ্বালা,
অতিষ্ঠ বা করিল নারীরে! তাই বুঝি
ছেড়ে চলে গেল; সম্পদে লালিত সে যে
বিপদের দিনে শেষ দাগা দিয়ে গেল
বুকে।

(সহসা গর্ভগৃহের দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া রহিলেন।)

শিশু হোথা অঘোরে ঘুমায় একা!
জীবনের রক্তরাগ জাগে মুখে তাই,—
নহিলে ও ঘুম মনে হ'ত শেষ ঘুম
বলে; হায়, এরেও ছাড়িয়া গেল নারী!
বনের যে হিংস্র পশু—সেও নাহি ছাড়ে
আপনার শাবকেরে মরণের মুখে।
সে তবে কিসের লোভে ছেড়ে চলে গেল
অসহায় এ শিশুরে? লিখেছে চিঠিতে
“স্থির জেনো, নিষ্কলঙ্ক আমি।” তবে হায়,
কিসে তারে করিল এমন গৃহত্যাগী?

ছায়ামূর্ত্তি।

আমি!

পূরণ সিংহ।

তুই! ফের তুই! মুখসের আড়ে
নিজমুখে আপনারে করিস্ ঘোষণা
আমার দুঃখের হেতু বলি, যে দুঃখের
অধঃপাতে নাই রোধ, অবলম্ব্য নাই,—
তার হেতু তুই! তুই!...মোর কাছে আর
ঢাকিতে নারিবি তুই নাম আপনার,
বল্ নাম বল্; কি করেছি অপরাধ
তোর কাছে আমি? কী সে মহা অপরাধ
যার লাগি রিক্ত, শূন্য, উদাস, হতাশ
আমারে করিলি তুই এমন করিয়া?

(উত্তরের প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া রহিলেন।)

দিবি না উত্তর? তুই কি রে রক্ত মাংস?
কিম্বা উঠে এসেছিস্ প্রেতস্থান হতে
প্রতিহিংসাপূরিত অন্তরে, মোর পরে
নিতে প্রতিশোধ? মরণে কি ঢাকে নাই
বিস্মৃতি-অঙ্গারে অতীতের অগ্নিকণা?
কোন্ জনমের কোন্ অপমান স্মরি
ওরে প্রেত! মোর পিছে ফিরিস্ নিয়ত?
অমোঘ এ চির ঘৃণা তোর নিদারুণ,
মর্ত্ত্য মানুষের মত নহে এ ক্ষণিক।
কে তুই?...না জেনে আমি ছাড়িব না আজ।

(ছায়ামূর্ত্তির দিকে বেগে ধাবিত হইবা মাত্র মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পটক্ষেপণ হইল।)

তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্ব্বোক্ত কাম্‌রা; সময়—গভীর রাত্রি; পূরণ সিংহ উৎকণ্ঠিতভাবে নেপথ্যের দিকে

চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা দরজা খুলিয়া একজন পক্ককেশ চিকিৎসক কাম্‌রায় আসিলেন।]

পূরণ সিংহ।

খোকা ?...জীবনের আশা আছে ?

(চিকিৎষক বিষণ্ণভাবে ঘাড় হেঁট করিলেন।)

হ'য়ে গেছে ?

(চিকিৎসক নীরবে তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূরণ সিংহ একটা মলিন চৌকীর উপর বসিয়া পড়িলেন।)

পূরণ সিংহ।

বৈদ্য ও গো! ও গো বৃদ্ধ! বল, তুমি বল,
দুঃখের উপরে দুঃখ জড় হ'য়ে হ'য়ে—
মতিভ্রম ঘটিছে কি মোর ? বল, বল ;
প্রতি দুর্ঘটন কালে, মনে হয় মোর
কারে যেন দেখি আমি জানালার পাশে
ওই খানে, সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকা তার,
মুখসে আবৃত মুখ। যখনি কাতরে
বিধিরে সুধাই নিজ দুরদৃষ্ট-হেতু,—
ওই মূর্ত্তি কাছে এসে বলে শুধু "আমি"!
বাহির করিতে নারি আর কোনো কথা
তার মুখ হ'তে, হায়! কাছে যদি যাই
অমনি সে হয় অন্তর্ধান। বল মোরে
বিজ্ঞ তুমি, সুস্থ মন, স্বচ্ছন্দ শরীর,
বল, বল, এ কি হায় মনের বিকার ?
অধিক দুশ্চিন্তাভরে মস্তিষ্ক আমার
সদা তপ্ত,— এ কি তারি বিকৃত কল্পনা ?
কিম্বা কেহ পিছে ফেরে প্রতিহিংসা লাগি' ?
থাক তুমি এইখানে সতর্ক সজাগ,—
তোমার নাড়ীতে নাই চঞ্চলতা লেশ,—
দেখ তুমি কী এ ছায়া ; বস মোর কাছে ;
উত্তপ্ত মস্তিষ্কে মনে দাও হে আশ্বাস।

চিকিৎসক।

বিপদে বিক্ষিপ্ত মন, বিক্ষত হৃদয়,—
জাগিয়া স্বপন দেখে, বিচিত্র এ নয়।
প্রভাতের আগে আমি পাঠাব ঔষধ,
পান করি' ঘুমাইবে, ভয় কিছু নাই।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান।)

পূরণ সিংহ।

স্বর্গাসীন ভগবান! সর্ব্বশক্তিমান্!
জানি আমি দণ্ড তব ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত,
তোমারে সুধাই প্রভু কী অন্যায় আমি
করেছি জীবনে, যার লাগি এই শাস্তি ?—
যার লাগি শ্রীহীন এ বাস্তভিটা মোর ?—
যার লাগি অকারণে চলে গেল নারী ?—
যার লাগি মৃত্যু নিল সন্তানেরে হরি ?—
অভিশপ্ত আমি হায়, কী সে অভিশাপ ?

(ছায়ামূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া।)

আমি!

পূরণ সিংহ।

ফের্ তুই এসেছিস্ হেথা ? ফের্ ?
বার বার তিনবার! তবে ছায়া ন'স ?
স্পষ্ট আমি দেখি তোরে চোখের সম্মুখে,
শত্রু বলে জেনেছি তোমায়, আপনি তা
করেছ স্বীকার বারে বারে মোর কাছে,
বলেছিস্—আমার দুঃখের হেতু তুই।
আজ হ'তে সঙ্গ নেব, পিছে পিছে তোর
ফিরিব দিবস নিশি সাগরে প্রান্তরে ;
অরণ্য হয়নি আজো তেমন নিবিড়

যেথা তুই লুকাইবি আমারে এড়ায়ে,
দুর্গ আজো হয় নাই তেমন দুর্গম
আরাম করিবি যেথা মোরে ফাঁকি দিয়ে,
ওরে মূঢ়!—হেন দৃঢ় হয়নি কবাট।
যেমন ফিরেছ তুমি আমার পিছনে
তেমনি ফিরিব তোর পিছে পিছে আমি
আজ হতে, শিকারের পিছে ব্যাধ সম,
শেষ দেখে তবে সে ছাড়িব। একা আমি
শোকার্ত্ত, নির্ধন, নিঃসংসার—আজ হতে
এই কাজে শুধু সঁপিব জীবন মন;
রিক্ত এ পৈত্রিক মোর ভিটার শপথ
সদ্যমৃত পুত্রের আতপ্ত দেহ আগে
দিব্য করি কহি আমি,—নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়
নিঃশেষে বর্জ্জন করি আজ হতে শুধু
তোর পিছে ছুটিব নিয়ত; যতদিন
বোঝাপড়া না হয় নিকাশ হিসাবের
ততদিন নিস্তার নাহিক মোর হাতে।

(ছায়ামূর্ত্তিকে ধরিতে যাইবামাত্র উহা অদৃশ্য হইল। পটক্ষেপণ।)

চতুর্থ দৃশ্য

(একটা অত্যন্ত সরু মোদা গলি; মেঘচ্ছিন্ন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। ছায়ামূর্ত্তি গলির মোদা মুখের দিকে লম্বা পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। সহসা পূরণ সিংহ ধূলিধূসর বেশে দৌড়িতে দৌড়িতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিলেন।)

পূরণ সিংহ।

এইবার পেয়েছি নাগালে! আর কোথা?
আর কোথা পালাবি এখন? মোদা গলি,—
পালাবার নাই পথ, আত্ম-প্রকাশের
তোর এসেছে সময়; দাঁড়া, ঘুরে দাঁড়া,
খোল্ ও মুখস্, নহিলে ফেলিব ফেড়ে
এই খড়্গাঘাতে।

(তলোয়ার খাপ হইতে নিমেষে বাহির করিয়া)

ঘুরে দাঁড়া হ'স যদি
রক্ত মাংসে গঠিত মানুষ, ঘুরে দাঁড়া;
এইবার দিতে মোরে হবে পরিচয়,—
এইবার বোঝাপড়া হিসাবনিকাশ;—
প্রত্যাখ্যান করিবার রাখি নাই পথ;
ঘুরে দাঁড়া, পিছে হ'তে মারিব না আমি।

(ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং আস্তে আস্তে মুখের মুখস এবং গায়ের আবরণ খুলিয়া ফেলিল; ইহার মুখ চোখ, সাজসজ্জা সমস্তই হুবহু পূরণ সিংহের অনুরূপ।)

ছায়ামূর্ত্তি।

পূর্ণ সিংহ! পূর্ণ হ'ল সাধ?

পূরণ সিংহ।

(বিকট চীৎকার করিয়া)

এ কি! আমি!

[বিকটচক্ষু মরণাহত পূরণ সিংহের কাষ্ঠবৎ দেহ জড়পদার্থের মত ছায়ামূর্ত্তির পায়ের গোড়ায় পড়িয়া গেল। ছায়ামূর্ত্তি পূরণ সিংহের বুকের উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর ধীরে ধীরে শূন্যে মিলাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িল।]

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর

১। পূর্ব্ব ও পশ্চিম

ইয়াঙ্কি স্থানের 'মধ্য পশ্চিম' এবং 'আরও পশ্চিম' জনপদসমূহ এক্ষণে আমাদের পূর্ব্ব দিকে। কলম্বাস-আবিষ্কৃত ভূখণ্ডের মহাপশ্চিম প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। বস্তুতঃ ইহা সমগ্র জগতেরই পশ্চিমতম অংশ।

প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমতম অথবা পূর্ব্বতম বলিয়া কোনো শব্দ ব্যবহৃত হইতেই পারে না। প্রকৃতি দেবীর জ্ঞানে পূর্ব্ব বা পশ্চিম নামে কতকগুলি চিহ্নিত স্থান নাই। রামের বাড়ীর যে ঘর পশ্চিম ভিটায় অবস্থিত, সেই ঘর যদুর বাড়ীর হিসাবে পূর্ব্ব ভিটায় অবস্থিত। ইয়াঙ্কিদের পশ্চিমতম প্রদেশ ক্যালিফর্ণিয়া—কিন্তু ক্যালিফর্ণিয়া-বাসী প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে সূর্য্যাস্ত দেশ দেখে না কি? কাজেই স্যান্‌ফ্রানসিস্কোর লোকেরা জাপানের টোকিওকে পাশ্চাত্য দেশীয় নগর বিবেচনা করিতে বাধ্য। ভারতবাসীর হিসাবে আফগানিস্থান হইতে ইংলিশস্থান পর্য্যন্ত সকল দেশই পাশ্চাত্য, সেইরূপ কালিফর্ণিয়া বাসীর হিসাবে জাপান হইতে হিন্দুস্থান পারস্য তুরস্ক পর্য্যন্ত সবই পশ্চিম দেশ। কাজেই স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোকে দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর বলিলে ভৌগোলিক জ্ঞানের অল্পতা সপ্রমাণ হয়। অথচ বিশ্ববাসী সকলেই এই ভুল বিশ্বাস ও ধারণা সংশোধন করিতেছে না কেন? আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত জগতের সকল লোকই পৃথিবীর কতকগুলি দেশকে Near East বা সমীপবর্ত্তী প্রাচ্য, কতকগুলি দেশকে Farther East অথবা Middle East—দূরবর্ত্তী বা মধ্যবর্ত্তী প্রাচ্য এবং কতকগুলি দেশকে Farthest East—দূরতমবর্ত্তী প্রাচ্য বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কতকগুলি দেশকে আমরা বিনা বাক্য-ব্যয়ে পশ্চিম ও মহাপশ্চিম বিবেচনা করিয়া থাকি। প্রাকৃতিক হিসাবে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর লোকেরা টোকিও নগরকে পাশ্চাত্যদেশীয় বিবেচনা করিতে বাধ্য। অথচ দেখিতেছি এখানকার মহাপণ্ডিতেরাও জাপানীগণকে প্রাচ্যতম দেশের লোক বিবেচনা করে। দুনিয়ার পশ্চিমতম দেশের পশ্চিমে পূর্ব্বতম দেশ অবস্থিত হইল কি করিয়া? আবার জাপানীরা প্রাকৃতিক হিসাবে আমেরিকাকে সূর্য্যোদয়ের দেশ অর্থাৎ প্রাচ্য বিবেচনা করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহারাও ইয়াঙ্কি সমাজকে পাশ্চাত্য বিবেচনা করিতেছে। দুনিয়ার লোকেরা কি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম নির্ণয় করিতে জানে না?

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শব্দ দুইটা পারিভাষিক শব্দস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাকৃতিক ভূগোলের হিসাবে এই দুই শব্দে যাহা বুঝায় পারিভাষিক হিসাবে তাহা বুঝায় না। ভৌগোলিকের বিবেচনায় কোনো দেশ সর্ব্বদা

প্রাচ্য, এবং কোনো দেশ সর্ব্বদা পাশ্চাত্য থাকিতে পারে না। একই জনপদ কোন দেশের পক্ষে পূর্ব্বে অবস্থিত কিন্তু অন্য দেশের পক্ষে তাহা পশ্চিমে অবস্থিত। অথচ পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করিলে প্রাচ্য শব্দে সর্ব্বদা সকল দেশের লোকই কতকগুলি জনপদ বুঝিয়া আসিতেছে। আফগানিস্থান হইতে তুরস্ক পর্য্যন্ত সকল দেশই ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্য—এবং চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম ও জাপান প্রাচ্য। কিন্তু পারিভাষিক ভাবে আমরা সমগ্র এসিয়াকেই প্রাচ্য বলিতেছি—জাপান হইতে তুরস্ক পর্য্যন্ত সকল দেশকেই ভারতবাসীরা প্রাচ্য বিবেচনা করে। তুরস্কের পশ্চিম হইতে ইয়োরোপের আরম্ভ বিচার করা হয়—আমেরিকাকে ইয়োরোপেরই বিস্তৃত অংশ ধরা যায়। এই দুই ভূখণ্ডকে এক সঙ্গে "ইয়োরামেরিকা" বলা যাইতে পারে। সমগ্র এশিয়বাসীর চিন্তায় এই দুই ভূখণ্ডের যে-কোনো অংশ পাশ্চাত্য নামে পরিচিত।

এইরূপ কৃত্রিম অর্থযুক্ত পারিভাষিক শব্দের উৎপত্তি কেন হইল? প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই ধরণের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইত না;—দুনিয়ার বড় বড় মহাদেশগুলিকে এইরূপে বিভক্ত করা হইত না। তখন ক্ষুদ্র গ্রীসের রাষ্ট্রপুঞ্জ তাহাদের বহির্ভূত সমাজকে মোটের উপর Barbarian বা বর্ব্বর বলিয়া জানিত। ইংরাজেরা বিদেশীয় লোকজনকে Welsh বলিত, হিন্দুরা বিধর্ম্মীদিগকে ম্লেচ্ছ বা দস্যু বলিত, মুসলমানেরা অপর ধর্ম্মাশ্রয়ী

প্রাচ্য পাশ্চাত্য ইত্যাদি শব্দ তখন সৃষ্ট হয় নাই। এই শব্দগুলি বর্ত্তমান যুগের ইয়োরামেরিকানেরা আবিষ্কার করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীটা বিশেষভাবে এই জাতীয় মানবেরই বিশ্ব-বাণিজ্য ও বিশ্ব-সাম্রাজ্যের যুগ। ইহারা নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশের নামকরণ করিয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্র ইয়োরামেরিকা—এই বিবেচনা করিয়া ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। এই বিস্তৃত ভূভাগের জনগণ যেন এক অখণ্ড সভ্যতা ও সমাজের অন্তর্গত—সুতরাং ইহার এক অঞ্চলের পক্ষে যাহা প্রাচ্য, সকল অঞ্চলের পক্ষেও তাহাই প্রাচ্য এইরূপ বিবেচিত হইতেছে। বিলাতী কবি কিপ্‌লিঙের

"East is East, and West is West.
The twain will never meet"

ইত্যাদি সুপরিচিত দোঁহাতে East এবং West এই পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। ইয়াঙ্কি নগরের নৈশ দৃশ্য

স্যানফ্র্যান্‌সিস্কোয় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে রাত্রিকালে ষ্টীমারে ক্ষুদ্র উপসাগর পার হইতে হইয়াছিল। ষ্টীমারে বসিয়াই দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর ও বন্দরের নৈশ শোভা দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইয়াঙ্কিস্থানের প্রত্যেক নগরই রাত্রিকালে নন্দনপুরীতে পরিণত হয়। দেওয়ালীর উৎসব এই দেশে প্রতি রজনীতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলা যাইতে পারে। তড়িতের

বাগানে,—নগরবাসীদিগের নয়ন ঝলসিয়া দেয়। বাতীগুলি একমাত্র আলোকদানের জন্যই তৈয়ারী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাস্তার সৌন্দর্য্য, উদ্যানের শোভা, হোটেল ও দোকানের আকর্ষণীশক্তি ইত্যাদি নানা উপায়ে বাড়াইয়া তুলিবার জন্যই বাতীগুলি বিশেষভাবে সাজানো হইয়া থাকে। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার সময়ে এঞ্জিনীয়ারেরা আলোক-বিকীরণের প্রণালী বিশেষ দক্ষতার সহিত আলোচনা করেন। বাতী সাজাইবার বিদ্যাটা এদেশে একটা স্বতন্ত্র সাধনার সামগ্রী। কাজেই নিউইয়র্ক হইতে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক নগরেই আলোকমালা একটা দেখিবার জিনিষ। রাত্রিকালে নগর পর্য্যটন একটা কার্য্যবিশেষ। একমাত্র দিবাভাগে নগরাদি দেখিলে এদেশের অর্দ্ধাংশ দেখা হয় মাত্র।

দোকান-গৃহের মালিকেরা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য আলোকমালার অশেষবিধ বৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়া থাকেন। তড়িতের শক্তি ব্যবহার করিয়া আজকাল লোকেরা আলোকের ইচ্ছানুরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন, আকৃতি পরিবর্ত্তন, স্থান পরিবর্ত্তন ইত্যাদি সাধন করিতে পারে। ইয়াঙ্কিরা পাকা ব্যবসায়ী—বিজ্ঞাপন প্রচার ইহাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ। তড়িতের সাহায্যে আলোকমালার শোভা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে ইহারা যার-পর-নাই যত্নবান্। এক্ষণে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোয় বিশ্ববাসীর সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ক্যালিফর্ণিয়া রাষ্ট্র দুনিয়ার লোককে আহ্বান করিয়াছেন। কাজেই বিজ্ঞাপনের ছটা এখানে আজকাল চূড়ান্ত দেখিবারই কথা। কার্য্যেও তাহাই দেখিতেছি।

ষ্টীমার হইতে দেখিলাম—যে-ঘাটে নামিব তাহার মাথায় তড়িতের বাতী দ্বারা লেখা রহিয়াছে—"California invites the World—Panama-Pacific Exposition, 1915" প্যানামা যোজকে খাল কাটা সম্পূর্ণ হইয়াছে—এক্ষণে প্রশান্ত মহাসাগর আট্‌লান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘটনা স্মরণীয় রাখিবার জন্য যুক্তরাজ্যের ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশ এক বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে জগতের সকল জাতিই তাঁহাদের নিজ নিজ উৎকর্ষ-বিজ্ঞাপক বস্তু প্রদর্শনীক্ষেত্রে পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ১৯১৫ সালের সারাবৎসর এই প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

ষ্টীমার হইতেই সুবিস্তৃত প্রদর্শনীক্ষেত্রের সৌধসমূহের আলোকমালা দেখিতে পাইলাম। অট্টালিকাবলীর শিরোভাগ বিভিন্ন ধরণের—কোনটা গম্বুজের মত, কোনটা মন্দিরশীর্ষের মত, কোনটা গির্জ্জার মত ইত্যাদি। এই সকল আকৃতিবিশিষ্ট সৌধের "রোশনাই" সাগরবক্ষ হইতে যেন কোন্ একটা আলোক-লোকের আভাস দিতেছে। বাতীর রংগুলি এবং অগণিত Search light-এর রেখাপাত সমগ্র নভোমণ্ডলকে অদ্ভুত রাগে রঞ্জিত করিয়াছে। মহানগরের উপরে মেঘশূন্য নীল আকাশ, তাহাতে শুক্লপক্ষের চাঁদ—কিন্তু

"স্থলভাগের দীপাবলী" চন্দ্র-কিরণকে নিতান্তই মলিন করিয়া তুলিয়াছে।

নগরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর নগর-শাসকেরা এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক রোশনাই সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্। কোন কোন রাস্তায় বাতীর ফটক প্রস্তুত হইয়াছে।

৩। বিশ্ব-মেলা

এই বৎসর দুনিয়ার সকল জাতি স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো নগরে সম্মিলিত হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটা বিশ্ব-সম্মিলন ইয়াঙ্কিস্থানের আর-এক নগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৪ সালের সেই মেলা সেণ্ট লুই নগরে আহূত হয়। এই নগর মিসিসিপি ও মিসৌরি নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। শিকাগোর ন্যায় ইহা মধ্যপশ্চিম জনপদের প্রধান নগর। এই দুই নগরকে কেন্দ্র করিয়াই ইয়াঙ্কিরা ক্রমশঃ মহাপশ্চিম প্রদেশে বাণিজ্য বিস্তার এবং বসতিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়। সেণ্ট-লুইয়ের পূর্ব্বে শিকাগো নগরে বিশ্ব মেলা বসিয়াছিল—সে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। সেই সম্মিলন উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ ইয়াঙ্কি-স্থানে বেদান্ত প্রচারের সুযোগ পান। প্রতি দশ বৎসরের মধ্যে জগতে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা ইত্যাদির উন্নতি অল্প সাধিত হয় না। মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বুঝিবার জন্যই এইরূপ আন্ত-র্জ্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়া থাকে। ইয়াঙ্কিরা বিশ বৎসরের ভিতর তিনবার এইরূপ বিশ্ব মেলা আহ্বান করিল।

ইয়াঙ্কিরা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সর্ব্ব-প্রথম প্রদর্শনী খুলিয়াছিল। সেই মেলা স্বাধীনতাপুরী ফিলাডেল্‌ফিয়ায় বসে। ইংরাজ হইতে স্বাধীনতা লাভের শতবর্ষ স্মরণীয় রাখিবার জন্য তাহারা এই আয়োজন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইয়াঙ্কিরা প্রথমে প্রাচ্য জনপদে, পরে মধ্য জনপদে সর্ব্বশেষে পশ্চিম জনপদে তাহাদের সম্মিলনক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছে। তাহাদের ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্রমবিকাশের ধারাও এইরূপই;—তাহারা পূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছে।

ফিলাডেল্‌ফিয়ায় সম্মিলনের ফলে প্রাচ্য জনপদের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে পারিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে Civil war বাধে;—সেই গৃহবিবাদ ও দ্বন্দ্বের জের মিটাইয়া দিবার পক্ষে এই মেলা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। মধ্য প্রদেশের মেলাদ্বয়ের প্রভাবে ইয়াঙ্কিস্থানের লোকেরা স্বদেশের বিস্তৃত জনপদসমূহের যথার্থ পরিচয় পাইল। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পর্য্যটন আরব্ধ হইল। মধ্য প্রদেশের সুযোগ সুবিধাগুলি প্রাচ্য জনপদের লোকেরা জানিতে পারিল। ইয়াঙ্কিস্থান সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা জন্মিবার পক্ষে নানা উপায় সৃষ্ট হইল। বর্ত্তমান বিশ্ব-মেলার ফলে ইয়াঙ্কিরা তাহাদের স্বদেশকে সত্য ভাবে চিনিতে পারিবে। তাহাদের মহাপশ্চিম জনপদ যে কত বড়, ইহার অভ্যন্তরে যে কত প্রকার ধাতু রত্ন শস্য পশু লুকায়িত আছে তাহা এইবার ইহারা যথার্থরূপে জানিবে

পারিবে। পূর্ব্ব ও মধ্য প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী এই বিশাল মহাদেশে পর্য্যটন করিতে আসিবে। এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল জনপদের নামমাত্র জানা ছিল, সেই সকল জনপদ এখন হইতে জীবন্ত সত্যরূপে ইয়াঙ্কিদের চিত্তে স্থান পাইবে। রেলকোম্পানিরা পর্য্যটকগণকে স্যানফ্রান্‌সিস্কোয় আকৃষ্ট করিবার জন্য নানা প্রলোভন দেখাইতেছেন। তাঁহারা এক ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা দিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে অসংখ্য যাত্রী এই দিকে ঝুঁকিতেছে। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো দেখার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যটকেরা মধ্যবর্ত্তী পল্লী নগরাদিতেও ভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইতেছেন।

ভারতবর্ষের নগরে নগরে কংগ্রেস আহূত হয়। তাহার ফলে ভারতবর্ষ বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, মারাঠী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি সকল প্রদেশবাসীর মধ্যে পরস্পরের ন্যূনাধিক পরিচয় সঙ্ঘটিত হইতে পারিয়াছে। শিল্প-সম্মিলন, সাহিত্যসম্মিলন, ধর্ম্মসম্মিলন, শিক্ষা সম্মিলন ইত্যাদির সাহায্যেও এইরূপে দেশের পরিচয় সকলেই পাইয়া আসিতেছে। এই সকল অনুষ্ঠানের সাহায্যে আর কোন সুফল না ফলিলেও অন্ততঃ দেশভ্রমণের সুযোগ ও প্রবৃত্তি সৃষ্ট হয়। দেশবাসীরা পরস্পর দেখাশুনা মেলামেশা ও ভাববিনিময় এবং কর্ম্মবিনিময় করিতে পারে। তাহা ছাড়া তুলনাসাধন, আত্মসংশোধন এবং আত্মোন্নতির উপায়ও সহজেই উদ্ভাবিত হয়। নিজের মামুলি কর্ম্মপ্রণালীকেই আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিবার কুসংস্কার চলিয়া যায়।

৪। প্রদর্শনী-ক্ষেত্র

উপসাগরের ধারে সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর প্রদর্শনী-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। প্রায় আড়াই মাইল দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত স্থানে একটি নাতি ক্ষুদ্র সুরম্য নগর দেখিতে পাইতেছি। এই নগরের ভিতর রাজপথ, উদ্যান, ফোয়ারা, প্রাসাদ, সৌধ, আলোক-স্তম্ভ, নাচগৃহ, প্রমোদালয়, রেলওয়ে ইত্যাদি সবই আছে। সমগ্র প্রদর্শনী-নগর নির্ম্মাণ করিতে বহুকোটি টাকা খরচ হইয়াছে—কিন্তু মেলা শেষ হইয়া গেলে নগর ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে। মেলার সকলপ্রকার খরচের জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা ১৫০,০০০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

দেড় টাকার টিকিট কিনিয়া প্রদর্শনী-নগরে প্রবেশ করিলাম। ফটক হইতে প্রাঙ্গণে পড়িয়াই মনে হইল যেন দিল্লীদরবারে উপস্থিত হইয়াছি। মহাভারত-বর্ণিত রাজসূয়-যজ্ঞের বিরাট আয়োজন চোখে পড়িতেছে। চারিদিকে মহোৎসবের লক্ষণ। পার্শ্বস্থিত কতকগুলি গৃহে নাচ, গান, বাজনা চলিতেছে—এদিকে ওদিকে সর্ব্বত্র লোকের ভিড়—অপূর্ব্ব নরনারীর সমাবেশ। সৌধ-সমূহ নানাবর্ণে বিভূষিত, আলোকস্তম্ভগুলির আকৃতি এবং বর্ণ নয়নরঞ্জক। বিচিত্র পতাকা, মূর্ত্তি, ফোয়ারা ইত্যাদির প্রভাবে সমস্ত প্রাঙ্গণ ও পথগুলি এক রমণীয় দৃশ্যের আধার হইয়াছে। কোনো কোনো স্থানে আমাদের দেশের বিবাহোৎসবের উল্লাস উচ্ছ্বাস বা 'যজ্ঞিবাড়ি'র মহাসমারোহ দেখা যাইতেছে। মোটের উপর মনে হইতে



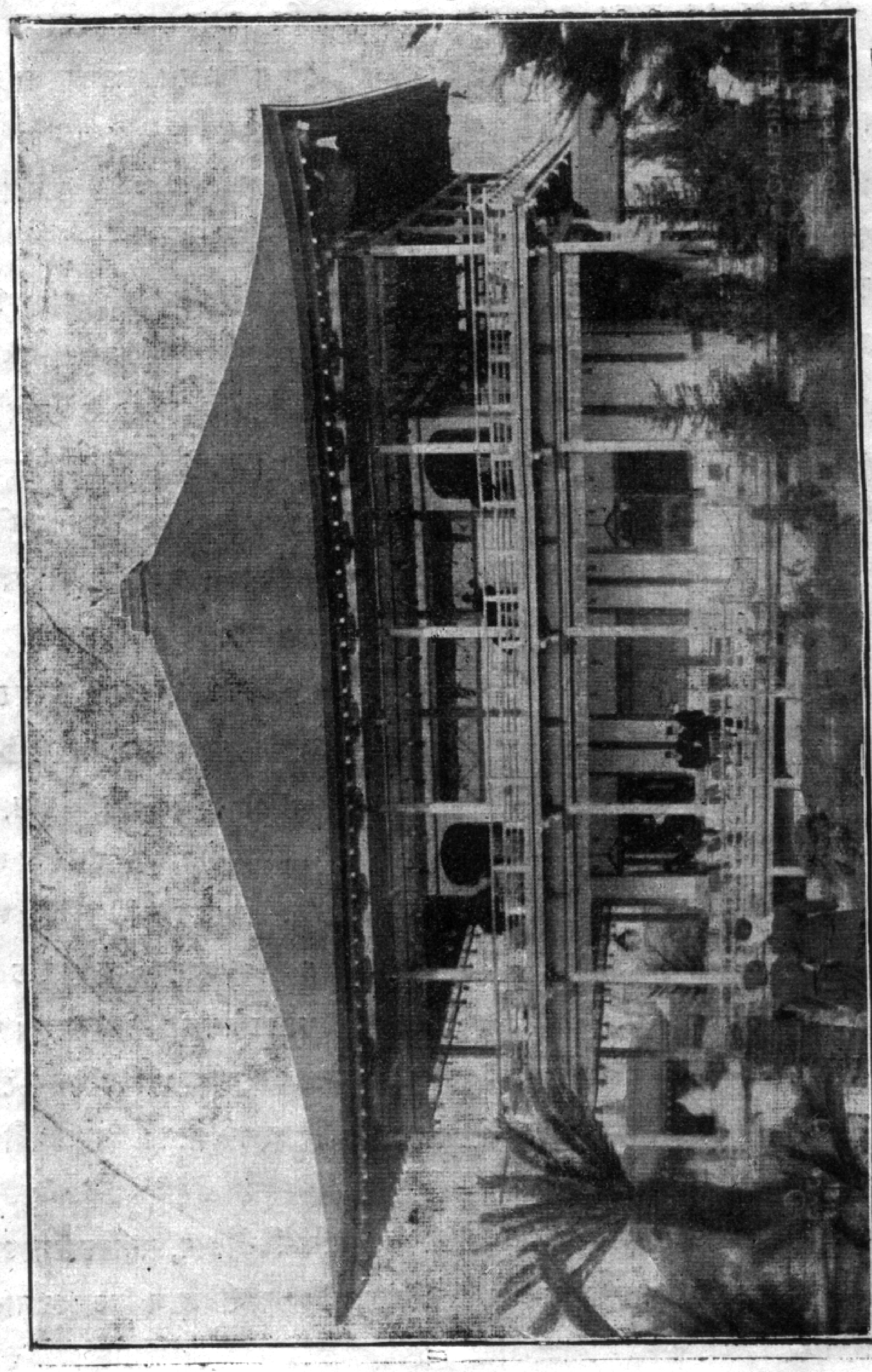
প্রদর্শনী-নগরের নৈশ দৃশ্য



বিশ্বমেলার প্রদর্শনী ক্ষেত্র

লাগিল যে, দুনিয়ার নানাস্থান হইতে আনীত বস্তুগুলি না দেখিয়া কেবল প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের সৌধ, সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, উদ্যান, ফোয়ারা, আলোক-স্তম্ভ ইত্যাদি দেখিয়া গেলেও এই বিরাট বিশ্বসম্মিলনে আসা সার্থক হইবে। প্রদর্শনীর বাহিরে ইয়াঙ্কিরা অত্যুচ্চশ্রেণীর সুকুমার শিল্প, কলাজ্ঞান, সৌন্দর্য্যবোধ, বিজ্ঞানশক্তি এবং সুশৃঙ্খলার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিশ্ব-মেলার বাহ্য অঙ্গগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিরই সর্ব্বপ্রথম দর্শন-যোগ্য।

কি দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে, একটি গৃহ সকলেরই চোখে পড়ে। তাহার নাম "রত্ন-মন্দির" বা Tower of Jewels।



মেলাক্ষেত্রে জাপানী সৌধ

দেখিতে ইহা হিন্দু-মন্দিরের মত—মন্দিরের "শিখর" ইহার বিশেষত্ব। জগন্নাথদেবের মন্দির অথবা রথের ন্যায় এই প্রাসাদটি কয়েক স্তরে বিভক্ত। সমস্ত প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের শোভা বৃদ্ধির জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ভিতরে প্রদর্শনযোগ্য কোন পদার্থ রক্ষিত হয় নাই। চুনী, মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, হীরা এবং অন্যান্য রত্নের বর্ণবিশিষ্ট কাচ-প্রিজ্‌ম্ এই মন্দিরের গাত্রে খচিত দেখিতে পাইলাম। দিনে সূর্য্যের কিরণে মণিমালায় বিভূষিত এই সৌধ দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রায় ১২০০০ ক্ষুদ্র বৃহৎ রত্নসদৃশ উজ্জ্বল বস্তু এই সৌধ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাত্রিকালে ইহার গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া ওঠে। কারণ প্রায় দুই শত নানা রঙের আলোক নানা স্থান হইতে এই মন্দিরের উপর নিক্ষিপ্ত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। শুনিতে পাই উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সূর্য্যের কিরণ সপ্তবর্ণে বিভক্ত রামধনুর ন্যায় দেখায়। তাহাকে ইংরাজিতে বলে Aurora Borealis। সেই রামধনুসদৃশ আলোক-সন্নিপাতের আয়োজন প্রদর্শনীর কর্ত্তারা উদ্ভাবন করিয়াছেন। এইখানে রাত্রিকালের Aurora Borealis-এর অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের সৌধগুলির রচনা-রীতি নানা রকমের। এক এক ভবনের জন্য এক এক প্রকার নির্ম্মাণ-কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক কায়দা, মধ্যযুগের বাস্তু-পদ্ধতি, মুসলমানী রীতি, রেণাসাঁস্-প্রণালী ইত্যাদি নানাপ্রকার গৃহনির্ম্মাণরীতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্যের ফলে চোখের আনন্দ বেশ জন্মে—গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে দৃশ্য পরিবর্ত্তন ও স্থান পরিবর্ত্তনে মন ক্লান্ত হইয়া পড়িবার অবসর পায় না। একঘেয়ে গৃহসজ্জা অথবা পথ-সমাবেশ দেখিতে হয় ত বিশেষ কষ্টকর হইত। প্রদর্শনী-নগরের এক স্থানে ফরাসী-রীতি, অপর এক স্থানে জাপানী-রীতি, কোন অংশে ওলন্দাজ বাস্তুবিদ্যার নিদর্শন—অন্যত্র হয়ত স্পেনের মুসলমানী কায়দা। এই বিশ্বমেলায় দুনিয়ার বিভিন্ন কারিগরী একত্র দেখিবার সুবিধা পাইলাম। দশ লক্ষ হইতে পনর লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত এক-একটা সৌধ-নির্ম্মাণে খরচ করা হইয়াছে।

কেবল গৃহনির্ম্মাণ-রীতি দেখিয়াই মুগ্ধ হইতেছি তাহা নহে। এখানে চিত্রকরগণের কারুকার্য্যও কম দেখিতেছি না। সৌধসমূহের সাজসজ্জায় চিত্রবিদ্যার প্রয়োগ বহুল পরিমাণে দেখিতেছি। স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয়ও প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের যে কোন অংশেই দেখিতে পাই। প্রত্যেক ভবনের প্রাচীর, কার্ণিশ, স্তম্ভ, ফটক ইত্যাদিতে নরনারীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ক্ষেত্রের ভিতরকার প্রত্যেক উদ্যানে ও প্রাঙ্গণে বহু উচ্চ শ্রেণীর ভাস্কর্য্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে জলের ফোয়ারা অবস্থিত—সেইগুলির প্রত্যেকটাই স্থপতিগণের কারিগরীর অপূর্ব্ব নিদর্শন।

আলোক-বিকীরণে, বর্ণবিন্যাসে ও ফোয়ারা নির্ম্মাণে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিদ্যার চরম প্রয়োগ দেখিতেছি। গৃহনির্ম্মাণে



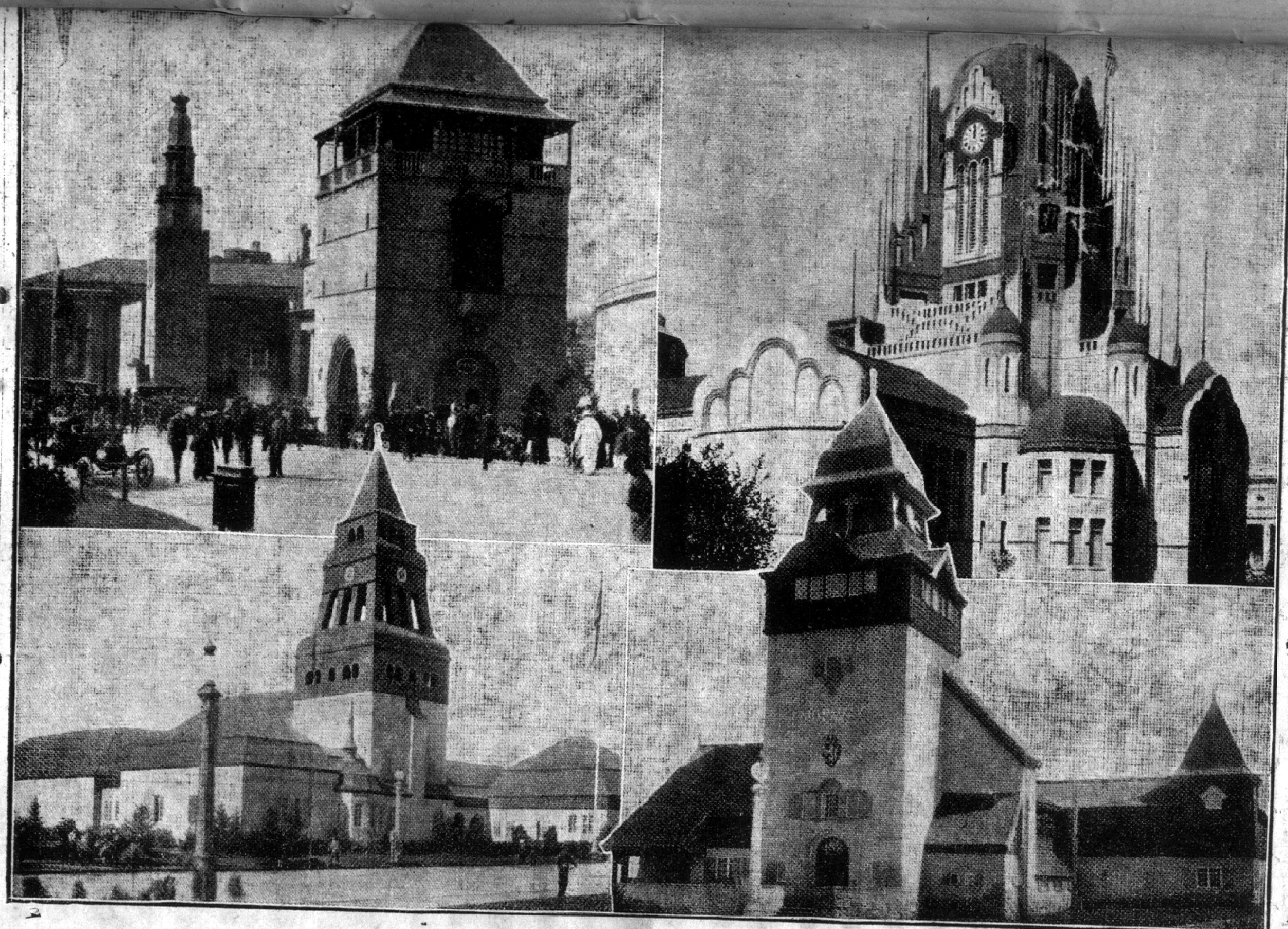
প্রদর্শনী-নগরের সৌধাবলী

এঞ্জিনীয়ারিংয়ের পরাকাষ্ঠা পাইতেছি। সুকুমার শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য, উদ্যান-রচনা ইত্যাদিও এই প্রদর্শনী-নগরে বিশেষরূপই দেখিবার জিনিষ। এই সমুদয়ের সাজান-গুছান কার্য্যেও উচ্চ অঙ্গের সৌন্দর্য্যজ্ঞান পরিস্ফুট রহিয়াছে। রাত্রিকালে কোন কোন দিন Fire-works বা আতসবাজীর খেলা দেখান হয়। হাওয়াই, তুবড়ী ইত্যাদির শেষ পরিণতি যেন তখন চোখের সম্মুখে প্রকটিত হয়। মনে হয়, বিজ্ঞান ও শিল্প উভয়ই যেন এক্ষেত্রে অবতাররূপে একত্র আবির্ভূত হইয়া প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে এই নগর-রচনায় পরিচালিত করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় মহাকুরুক্ষেত্রেও এই দুই অবতারের রাক্ষসী লীলা দেখিতে পাই। সেই অবতারদ্বয়েরই অপর লীলা—শান্ত-মূর্ত্তি স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর এই মেলা-ক্ষেত্রে দেখিয়া লইলাম। সৌধসমূহের অভ্যন্তরে সংগৃহীত দ্রব্যনিচয় না দেখিলেও মনে দুঃখ থাকিবে না। বহির্ভাগেই সমগ্র বর্ত্তমান জগতের কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ধনশক্তি পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে।

প্রদর্শনী-নগরের সাধারণ সৌধসমূহের সংখ্যা বেশী নয়—কিন্তু তাহাদের আকৃতি সুবৃহৎ এবং রচনা-রীতি সৌন্দর্য্যের পরি-পোষক। এই সৌধসমূহ ব্যতীত বহুসংখ্যক আমোদ-প্রমোদ-ভবন রহিয়াছে। এইগুলিতে চীনা, জাপানী, মিশরীয়, লোহিতাঙ্গ, মেক্সিকান, মেওরি ইত্যাদি নানাজাতীয় জনগণের পল্লীজীবন বুঝাইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সমুদয়ের নির্ম্মাণে ভিন্ন এগুলির ভিতর প্রবেশ করিলে বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর শিল্প, চিত্রকলা, দোকান হাট, নাচগান, ক্রীড়াকৌতুক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিতে পয়সা লাগে। যাইয়া অনেকক্ষণ সময় কাটান গেল। সহজে বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি আদব-কায়দা হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে ইহা বেশ ভাল উপায়।

এই সমুদয় কৌতুকগৃহ ব্যতীত আরও কতকগুলি অট্টালিকায় প্রদর্শনী-ক্ষেত্র পরি-পূর্ণ। তাহাদের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধশত। এইগুলির অর্দ্ধেক যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশের সকলপ্রকার প্রদর্শনযোগ্য বস্তু এইরূপ এক ভবনে সংগৃহীত রহি-য়াছে। কালিফর্ণিয়া-রাষ্ট্রের প্রাসাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাপান, চীন, হলাণ্ড, তুরস্ক, আর্জেন্টিনা, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রও ২০।২২টা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই প্রাদেশিক ও বিদেশীয় রাষ্ট্রভবনগুলির কোন কোনটা বিশেষ-ভাবে দর্শনযোগ্য। অবশ্য এই সমুদয় দেশের প্রদর্শিত দ্রব্যনিচয় সাধারণ সৌধ-সমূহেই রক্ষিত হইয়াছে।

চীনাগৃহ-নির্ম্মাণের জন্য চীন হইতে কারিগর ও মিস্ত্রী আমদানী করা হইয়া-ছিল। এমন কি বহু উপকরণ, তৈজসপত্র, উদ্যানরচনার সামগ্রীও চীন হইতে আনা হইয়াছে। জাপানী গৃহও এইরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্যামদেশীয় ভবন পুরাপুরি শ্যাম রাজ্যেই প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পরে



প্রদর্শনী-নগরের সৌধাবলী

স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোয় পাঠান হইয়াছে। এইখানে শ্যামদেশীয় মিস্ত্রীরাই গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

এশিয়ার সকল দেশের পরিচয়ই এই বিশ্ব-মেলায় প্রচুর পরিমাণে পাইলাম। স্বতন্ত্র জাপানী ও স্বতন্ত্র চীনা ভবন ব্যতীত সাধারণ সৌধ-সমূহের প্রত্যেকটাতেই জাপান ও চীনের প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু ভারতবর্ষের চিহ্ন কোথাও দেখিলাম না। একজন পার্সী দোকানদার নিজ ব্যবসায়ের স্বার্থে কতকগুলি জিনিষ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন;—ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রতিনিধি নাই। খাদ্যদ্রব্য-বিভাগে, সাধারণ সৌধের ভিতর দেখিলাম, বিলাতী, ইয়াঙ্কি ফরাসী, জার্ম্মাণ, তুরকী, চীনা, জাপানী, নিগ্রো, মেক্সিকান্‌ ইত্যাদি নানাজাতীয় রন্ধনপ্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। এই গৃহে পর্য্যটকেরা বিনা পয়সায় নানাবিধ খাদ্য খাইতে পায়। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম ময়দা রুটি বিস্কুটের এক ইয়াঙ্কি মহাজন প্রকাণ্ড মিঠাইয়ের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। তাহার এক প্রকোষ্ঠে একজন পাগড়ী-ধারী ভারতবাসী খাদ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধান করিতেছে। লুচি পকৌড়ি ইত্যাদি ভাজিয়া দর্শকগণকে উপহার দেওয়া ইহার কার্য্য। বিরাট বিশ্ব-মেলায় ভারতবর্ষের স্থান এইটুকু।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

শরৎ

রৌদ্র-গরদ ঝলমল বাসে
রামধনু ধরি করে
কে ওই আসিছে বরষা-বিকল
বিশ্বরাণীর ঘরে!
চলিতে চরণে ফোটে থরে থরে
কমল কুমুদ কত,
মঞ্জীর মধু বাজে নদী-নীরে
কল্লোলে অবিরত!

পরশে তাহার কাশের ক্ষেতেতে
দুধের লহর ওঠে,
সৌরভময়ী শেফালিকা আর
বন আলো করি ফোটে;
কীচক-কুঞ্জে বাজে বীণা বেণু
বাতাসে শিশির লেখা,
নীরনিমজ্জ ধান্যের শীষ
উঁকি দেয়—যায় দেখা।

বারিধি বরণ আকাশ আজিকে
মুক্ত মেঘের মায়া,
আলোর জোয়ারে পূর্ণ পৃথিবী
ম্লানিমার নাহি ছায়া;
সিক্ত চিত্ত উঠিছে ভরিয়া
চখার মধুর গানে,
চলচঞ্চল সকল ধরণী
পুণ্য পুলক বানে,

স্বাগত শরত ভুবনমোহিনী
ঋতুকুল অধিরাণী,
মানস সরসে দাও দেবী তব
সরস পরশখানি;
ফুটিয়া উঠুক কল্পনা-কলি
মেলিয়া হাজার দল
ভাব-সৌরভে করি মধুময়
মলিন মর্ম্মতল।

শ্রীনলিনীনাথ দে।

(৩৭)

পরদিন বিপিন ও মালতীকে প্রেমানন্দ স্বামী সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে প্রেমযোগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাক্য-মনের সংযমের জন্য তাহাদের প্রতি প্রত্যহ লক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করিবার আদেশ হইল; সে জপ একদিন মালাতে এবং একদিন কাগজে লিখিয়া করিতে হইবে।

গুরুজী প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে শিষ্যদের কাছে শাস্ত্রপাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন; ব্যাখ্যার পর কীর্ত্তন করেন। এই অবসরে প্রত্যহ তিনি দেখিতে লাগিলেন যে বিপিন ও মালতীর ব্যাকুল দৃষ্টি ঘন ঘন অভিসার করে এবং চকিতে মধ্যপথে মিলিত হইয়া লজ্জাভরে ফিরিয়া আসে। তাহারা কৃষ্ণনাম লিখিতে লিখিতে অনেক সময় ভুলিয়া নিজেদের প্রেমাস্পদের নাম লিখিয়া ফেলে এবং গুরুজীর কাছে ধরা পড়িয়া এমন একটি সলজ্জ আনন্দের ভাবে পরস্পরের দিকে চুরি করিয়া তাকায় যে তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এই দুটি ব্যাকুল প্রাণের শান্ত নীরব প্রণয়লীলা গুরুজীর মনে প্রথম প্রথম একটি অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার করিতে লাগিল এবং সেই জন্যই তিনি বিপিন ও মালতীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে লাগিলেন।

তাহাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে গিয়া গুরুজী দেখিলেন যে এই দুটি লোকের কাছে তাঁহার আসন অন্তত একজনের নীচে। এমন ঘটনা গুরুর অভিজ্ঞতায় এই নূতন; তাঁহার আশ্রমে আসিয়াছে, অথচ তাঁহার চেয়ে অন্য লোকের প্রতি বেশি আকর্ষণ, এমন লোক তিনি এই প্রথম দেখিলেন। তাঁহার সকল ভক্ত শিষ্য তাঁহাকেই ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল; আজ বিপিন ও মালতীর কাছে তিনি সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তি নহেন; ইহাতে তাঁহার অহঙ্কার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দেখিতে দেখিতে ক্রূর হইয়া উঠিল। সংযম সাধনের জন্য বিপিন ও মালতীর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় না হয় গুরুজী এমন ব্যবস্থা করিলেন।

গুরুজী নিজের অজ্ঞাতসারে মনের সমস্ত অহঙ্কার ও লালসা চুয়াইয়া নিজের প্রাণপ্রদীপ ভরিয়া রাখিয়াছিলেন, অপেক্ষা ছিল একটি জোরালো প্রতপ্ত স্ফুলিঙ্গের। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে বিপিন ও মালতী চকমকি ও ইস্পাতের মতো নিজেদের প্রণয়সংঘর্ষণে যে দীপ্ত অগ্নিকণা বিকীর্ণ করিতেছিল তাহা গুরুজীর প্রাণপ্রদীপখানি জ্বালাইয়া দিল। গুরুজী এই নূতন আলোকে ছন্নদৃষ্টি হইয়া বিপিন ও মালতীর দৃষ্টি আবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গুরুজী বিপিনকে বুঝাইয়া দিলেন যে সাধনের প্রথম অবস্থায় মালতীর সহিত সাক্ষাৎ তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। অতএব তাহাদের এক্ষণে পরস্পরকে দেখা দেওয়া উচিত নয়। মন স্থির হইয়া গেলে তাহারা স্বচ্ছন্দেই পর-

শ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। বিপিন গুরুজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মালতীকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু মালতী বিপিনকে এড়াইবার জন্য বিশেষ কিছু ব্যস্ত হইল না; তাহার যে আধ্যাত্মিক পথে দ্রুত অগ্রসর হইবার কিছুমাত্র ত্বরা আছে এমন লক্ষণ সে একেবারেই দেখাইল না।

কিন্তু চেষ্টা করিয়াও মালতী আর এখন বিপিনকে দেখিতে পায় না। গুরুজী এখন স্ত্রী ও পুরুষ শিষ্যদিগকে পৃথক ভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যে আধ্যাত্মিক বিঘ্নকর ইহা এখন তিনি মুক্তকণ্ঠে যখন-তখন প্রকাশ করেন।

মালতী বিপিনকে অন্তত দেখিতে পাইবার লোভেই এই সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিয়াছিল; সে আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় লুব্ধ হইয়া আসে নাই। এখন সেই একমাত্র অবশিষ্ট সুখটুকু হইতেও বঞ্চিত হইয়া এই আশ্রমবাস তাহার নিকট কষ্টকর কারাবাস হইয়া উঠিল। সে সুযোগ খুঁজিয়া যদি বা কখনো বিপিনের কাছাকাছি হইত, বিপিন গুরুজীর ও আধ্যাত্মিক বিঘ্ন হইবার ভয়ে তাহাকে দেখা দিত না। সে অকস্মাৎ কখনো বিপিনের গৈরিক উত্তরীয়ের চঞ্চল আভাস দেখিয়া চমকিয়া উঠিত, বিপিনের দূরাগত কথা আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহার বুকে বাজিত। বিপিন তাহার কত কাছে অথচ কী সুদূর। তাহার সেই আর্ত্ত জীবনের সহিত কী নিদারুণ ভাবে বিচ্ছিন্ন! মালতীর দিনগুলি একটার পর একটা বোঝার মতো নামিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সময় যেন প্রকাণ্ড একটা অরূপ সূতার গুলি এবং দিনগুলি যেন লম্বা ধূসর বর্ণের সূতা, সেই গুলি হইতে ক্রমাগতই খুলিয়া খুলিয়া আসিতেছে, তাহার অন্ত নাই, অবসান নাই, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই ধূসর ক্লান্ত দিনগুলি এমনি উদাস-বিষণ্ণ ভাবেই আসিবে ও যাইবে এবং আমরণ তাহাকে এই আশ্রমে গুরুজীর শুষ্ক কঠোর উপদেশামৃত হজম করিবার দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

মালতীর মনে তাহার পূর্ব্ব অবস্থার যে-সব আনন্দমধুর ভাবরস সঞ্চিত হইয়া ছিল সেই-সব ভাবস্মৃতি আজ তাহাকে একাকিনী পাইয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে গুঞ্জন করিতে লাগিল; তাহার কেহ সঙ্গিনী ছিল না যে দুদণ্ড তাহার সহিত কথা কহিবে বা তাহার কাছে নিজের বেদনা উজাড় করিয়া হৃদয় লঘু করিবে; তাহার যত কিছু সুখদুঃখ চিন্তাভাবনা সবখানিই তার নিজের একলার; সেই-সব অতীত ও অনাগত ভাব ও আশা আলো-আঁধারের জাল বুনিয়া তাহার চারিদিক ঘিরিয়া দিতে লাগিল। সে জালের ত অন্ত নাই, ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাহার দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া তুলিল, আলোয় আঁধারে গলাগলি হইয়া তাহার যেন শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল। কখনো কখনো তাহার চিন্তা যেন অকূল অপার সাগরের মতো দিক্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িত; ভীষণ গর্জ্জনে কালো কালো ঢেউ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিত; তখন সে চোখ বুজিয়া মনে

করিত নিজেকে ছিন্ন করিয়া লইয়া এখান হইতে কোথাও পলায়ন করিবে,—দূরে—দূরে—সে বহুদূরে,—তাহার মাসিমা যেমন সংসার অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও অনেক দূরে—সে পলায়ন করিবে, সে পলায়ন চিরজন্মের পলায়ন, তাহার পশ্চাতে প্রত্যাবর্ত্তন থাকিবে না, এই ধূসর দিনের মধ্যে এই দুঃসহ দুর্ব্বোধ অবস্থায় আর সে কখনো ফিরিয়া ধরা দিবে না।

যখন মালতীর নিজের এই নিঃসঙ্গ দারুণ অবস্থা দুবহ বোধ হইত তখন সে মাঝে মাঝে পড়িতে চেষ্টা করিত। পড়িতে পড়িতে মনে হইত সে যেন আর এই সন্ন্যাসীর আশ্রমের লোক নয়, সে যেন কোন্ আনন্দ-লোকের অধিবাসী; কিন্তু বই বন্ধ করিলেই মনে হইত সে যেন আনন্দের মন্দিরচূড়া হইতে একেবারে দুঃখের তিমির গহ্বরে পতিত হইয়াছে। তখন সে প্রায়ই ভগবানের উপাসনা করিতে বসিত এবং উপাসনান্তে মনে হইত যেন তুষার-শীতল চন্দনবাসিত তাঁহার চরণামৃতে হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা ধুইয়া মুছিয়া জুড়াইয়া গেছে।

ওদিকে বিপিনের গুরুজীর প্রতি অচলা ভক্তি এবং সংযম অভ্যাসের প্রতি অসাধারণ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাহার অবস্থা ক্রমশ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। বিপিন সংসারের অবস্থা-পরম্পরার আঘাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কোথাও একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল; এখানে আসিয়া বিপিন নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইয়াছে, এবং সেই জন্যই এখন তাহার মন মালতীর অভাব বিশেষ করিয়াই অনুভব করিতে পারিতেছে। আধ্যাত্মিক মিলন প্রভৃতি বড় বড় কথা শুনিতে যেমন চমৎকার, জীবনক্ষেত্রে বিপিনের তাহা তেমন লোভনীয় বোধ হইতেছিল না। জীবনের বিরুদ্ধ ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল হইয়া বিপিন নিজের প্রণয়ের প্রতি তাকাইয়া দেখিবার অবসর পায় নাই; এখন তাহাকে নিশ্চিন্ত দেখিয়া মালতীর প্রতি তাহার প্রেম আকার ধারণ করিয়া, জীবন গ্রহণ করিয়া, জাগ্রত হইয়া, মোহন রূপে একেবারে চোখের সামনে উপস্থিত হইল। বিপিন কাব্যসাহিত্যে প্রেমের কথা যত কিছু পড়িয়াছিল সমস্তই সে দেখিল তাহারই হৃদয়ের তুচ্ছ প্রতিধ্বনি। মালতী যখন আশ্রমে আসিতে চাহিয়াছিল, তখন বিপিনের অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এখন সে দেখিতেছে মালতীর এখানে আসা না-আসা সমান। মালতী উপরের ঘরে থাকে, সে থাকে ঠিক তাহারই নীচের ঘরে—একখানি ছাদ মাত্র ব্যবধান, কিন্তু সে-ই কত দূর! মালতী উত্তর-মেরুতে থাকাও যা, এখানে অদর্শনীয় হইয়া থাকাও তাই। মাথার উপর ঘরের মেঝেয় কাহার পদশব্দ, জিনিষ রাখার খুটখাট শব্দ হয়,—হয়ত সে-সব মালতীরই অস্তিত্বের পরিচয়, কিন্তু সে-সব যেন হৃদয়ের মাঝে স্মৃতির স্পন্দন, দেখিবার নয়, শুধু অনুভবে বুঝিবার। মালতীকে তাহার যতই দুর্লভ মনে হইতে লাগিল, ততই তাহার আবেগময় চিত্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে হইত সম্মুখে

সমস্ত জীবনই ত পড়িয়া আছে—তাহার অতৃপ্ত উপবাসী জীবন; তাহা কি সে এমনই দুশ্ছেদ্য সঙ্কটজালে জড়াইয়াই রাখিবে, না, একদিন সবলে দুই হাত দিয়া সকল জাল জঞ্জাল দূর করিয়া দিয়া নিজের ক্ষুধা মিটাইবে। এখন মালতীকে একেবারে হারাইতে বসিয়া কৃপণের মতো মালতীর পায়ের ধ্বনিটুকু, কাশির শব্দটুকু, চাবি বা চুড়ির টুনটুনিটি, আবছায়া মূর্ত্তির চকিত দৃষ্টিটি কুড়াইয়া বেড়ানোই বিপিনের কাজ হইয়া উঠিল। মালতীর অস্তিত্বের পরিচয় পাইবার জন্য বিপিনের সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকিত, আর যখনই সে মালতীর অস্তিত্বের এতটুকু চিহ্ন ধরিতে পারিত, তখনই সে আনন্দে গদ্গদ হইয়া উঠিত। এই নিভৃত গঙ্গাতীরের মনোরম উদ্যানে বিশ্বসঙ্গীতের মাঝখানে সে আপনার আরাধ্যা দেবীর ধ্যানমূর্ত্তির নিকটে আপনার হৃদয়কে ধূপের মতো দগ্ধ করিতে লাগিল। একদিকে পাহারা দিতে গিয়া বিপিন আর সব দিকে অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হইয়া উঠিতেছিল; সে নাম জপ করিতে করিতে উদাসভাবে বসিয়া থাকিত, একটু শব্দ শুনিলেই চমকিয়া উঠিত।

মালতীরও অবস্থা বিপিনেরই অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। মালতী নিশ্চিন্ত হইয়া শয্যায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিত না; রাত্রে সকলের সুপ্তির স্তব্ধতার মাঝখানে সে একা বারান্দায় উঠিয়া গিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত—জীবনটা ত এমনি একটানা মধুস্রোতের মতো ভাসিয়া যাইতে পারিত! বিপিনকে সে কত ভালো বাসিয়াছিল; কিন্তু আজ এমন অবস্থা আসিয়াছে যে বিপিনের জন্য বেদনা বোধ করা তাহার পক্ষে লজ্জাকর। অথচ সে বিপিনকে বিচার করিয়া অপরাধী করিতেও চায় না। কেন সে দুদিনের জন্য একটা দৈব দুর্বিপাকের মতো চৌধুরী-পরিবারে গিয়া পড়িয়াছিল, সে ঘূর্ণী উড়াইয়া তাহার আজন্মের স্নেহনীড় হইতে বিপিনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে কিন্তু নিজের সঙ্গেও ত মিলাইতে সে পারিল না; এর চেয়ে তাহার বাপের ভিটায় পড়িয়া থাকিয়া মরা যে শতগুণে ছিল ভালো। যাহার স্বাদ সে জীবনে কখনো জানে নাই, জানা যাহা উচিত ছিল না, সেই প্রণয়ের স্বাদ জানিল যদি তবে জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিল না কেন? সে যে বিপিনের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে ইহার লজ্জা সে কিছুতেই ঢাকিতে পারিতেছিল না। এ লজ্জা ঢাকে বিপিন যদি তাহাকে এখনও গ্রহণ করে। সুতরাং সে নিজের কাছে স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও তাহার অন্তরের অন্তরালে একটি মিলনচেষ্টা আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। এইরূপে তাহাদের প্রণয় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বাঁধরুদ্ধ নদীস্রোতের মতো ফাঁপিয়া ফুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। এক একবার সকল বাঁধ ভাঙিয়া মিলিত হইবার বিদ্রোহভাবও তাহাদের মনে আসিতে আরম্ভ করে নাই এমন নয়।

কিন্তু নূতন শিষ্যদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অতিমাত্র সতর্ক ও উৎকণ্ঠিত গুরু সর্ব্বদাই তাহাদিগকে পাহারা দিয়া ফিরিতেন বলিয়া শিষ্যদের এতটুকু চাঞ্চল্য

ঈষৎ মিলন-চেষ্টা গুরুর দৃষ্টি এড়াইত না। গুরু তখন বিপিন ও মালতীকে নূতন নূতন নিয়ম সংযম অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহিতেন। তাহাদিগকে বুঝাইতেন যে এই-সব চাঞ্চল্য ধর্ম্মপথে চিরকালই অন্তরায়-রূপে উপস্থিত হয়; ইহাকেই খৃষ্টানে ও মুসলমানে বলে সয়তান, বুদ্ধ বলিয়াছেন মার। মহাদেবের মতো মদন ভস্ম না করিলে গৌরীকে পাওয়া যাইবে না; শঙ্করকে পাইতে হইলে গৌরীরও তপস্যা করিতে হইবে।

বিপিন গুরুজীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আবার আপনাকে দমন করিতে চেষ্টা করিত। মালতী কিন্তু তেমন আগ্রহ সহকারে গুরুজীর উপদেশ ও বিবিধ অনুষ্ঠান পালন করিত না। এই বিদ্রোহী নারীটিকে লইয়া গুরুদেব বিব্রত হইয়া উঠিলেন; তাহাকে শাসন করিতে গেলে সে তর্ক করে, শাস্ত্রের দোহাই সে মানে না, ব্যবস্থিত অনুষ্ঠান সে পালন করে না। এই-সব কারণে গুরুর বাধ্য হইয়া এই অবাধ্য শিষ্যাটিকে অত্যন্ত অধিক মনোযোগের সহিত আগলাইবার দরকার হইতে লাগিল।

গুরু যতই নিবিষ্ট মনে মালতীর আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ততই তিনি সেই তেজস্বিনী বুদ্ধিপ্রখরা সুন্দরী তরুণীর বিপিনের প্রতি অনুরাগ ও প্রণয়ব্যাকুলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রেমানন্দের মনে ঈষৎ ঈর্ষা দেখা দিল,—

"কুশের অঙ্কুর সম
ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর তবু তীক্ষ্ণতম!"

গুরুর কেবলি মনে হইতে লাগিল তাঁহার জন্য কাহারো হৃদয় ত এমন করিয়া ব্যাকুল বেদনায় স্পন্দিত হয় না। এতকাল নিরবচ্ছিন্ন সম্মান সম্ভ্রম পাইয়া পাইয়া তাঁহার অহঙ্কার পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; আজ মালতী সেই চিরাভ্যস্ত জীবনপ্রবাহের মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটাইয়া প্রেমানন্দের মনে এমন একটি নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়া দিল যাহাতে তিনি কিছুতেই নিজেকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল মালতীর অখণ্ড মনোযোগ তাঁহারই প্রাপ্য, বিপিন তাহা ফাঁকি দিয়া নিজে আত্মসাৎ করিতেছে।

তখন, মালতীর মন বিপিনের দিক হইতে একেবারে বিমুখ করিয়া দিয়া নিজের দিকেই নিতান্ত নিবিষ্ট করাইবার জন্য গুরু বিপিনের প্রতি কঠিনতর নিয়মের ব্যবস্থা করিলেন এবং আপনি মালতীকে পাহারা দিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়া নিজের কাছেই নিজেকে তাঁহার ছোট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন তিনি নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন যে তিনি কিছুমাত্র অন্যায় করিতেছেন না, কর্ত্তব্যই তিনি করিতেছেন, শিষ্যের ইহপারত্রিক কল্যাণের জন্য গুরুর ত এমনি সতর্ক প্রহরী হওয়াই চাই,—গুরু হওয়া কি অমনি মুখের কথা, শিষ্যের পাপের অংশীদার যে গুরু!

নিজের কাছে যখন কাজটা বেশ সঙ্গত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া গেল তখন গুরু

বেশ হৃষ্টভাবেই মালতীর পাহারায় উৎসাহিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

(৩৮)

গুরু যখন মালতীকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মালতীও তখন নিজেকে লইয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম প্রথম এই আশ্রমে আসিয়া তাহার বেশ ভালোই বোধ হইতেছিল; গঙ্গার ধারে এমন একটি চমৎকার উদ্যানে বিচিত্র রকমের ফুল, অপূর্ব্ব ধরণের কেয়ারি, কত জানা অজানা গাছের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য, রকম রকম পাখীর গান, ময়ূর হরিণের নাচ, গঙ্গার বুকে প্রতিদিন জোয়ার-ভাঁটার আসা-যাওয়া, বিচিত্র রকমের নৌকা ষ্টিমারের গতিভঙ্গী, সকালে সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে আলোছায়ার খেলা, মাঝির গান, বাতাস চিরিয়া ষ্টিমারের বাঁশির চীৎকার দেখিয়া ও শুনিয়া তাহার দিন উহারই মধ্যে বেশ একরকম আনন্দেই কাটিতেছিল। মালতী মথুরাপুরে বিপিনের বাড়ীতে সকলের ছুতের ভয়ে আড়ষ্ট নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে থাকিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; এখানে আসিয়া রান্না করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়া সে অনেকটা নিজেকে লঘু মনে করিতেছিল। কিন্তু গুরুর কৃপায় তাহার সেই-সব কাজ হইতে অব্যাহতি মিলিয়াছে, তাহাকে নড়িয়া বসিতে হয় না, একগাছি কুটা ভাঙিয়া ছুটুকরা করিতে হয় না, উপর হইতে নীচে নামিবারও তাহার হুকুম নাই। কিন্তু মালতী এমন অদ্ভুত রকমের লোক যে ভূতের মতন খাটুনি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার এতবড় সৌভাগ্য সে গুরুর প্রতি প্রসন্নকৃতজ্ঞতায় হাসিমুখে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে নিজের ঘরটিতে বসিয়া বসিয়া সমস্ত দিন গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকে; ওপারের গাছের ঝাপসা ঝোপের মাঝে মাঝে আবছায়া বাড়ীগুলি ছবির মতন চিরদিনই নিশ্চল, কোনো বাড়ীতে একটু প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না, যেন সবাই মালতীর মতোই নিষ্কর্ম্মা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। অকস্মাৎ যদি কোনো দিন মালতী দেখে কোনো বাড়ীর ছাদে কোনো বধূ কাপড় শুকাইতে দিতেছে, কি কোনো চিলের ছাদের উপরে একখানা রঙচঙা ঘুড়ি কোনো অদৃশ্য বালকের মোহনস্পর্শের পুলকে স্পন্দিত হইতেছে, অমনি তাহার সমস্ত শরীর মন যেন সজীব জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই প্রাণের পরিচয় শীঘ্রই মিলাইয়া যায়; তখন মালতী দেখে নদীর বুকে জলের স্রোত চলিয়াছে, অফুরন্ত সূতার মতন, দ্রৌপদীর শাড়ীর মতন, অন্ত নাই, বিরাম নাই, কাহারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন বিশ্বের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, কাহারো ধার সে ধারে না, কাহারো সুখদুঃখে তাহার কিছু আসিয়া যায় না। স্রোতের উপর নৌকা-গুলি কালো কালো পাখীর মতো শাদা পালের ডানা মেলিয়া নীরবে ভাসিয়া যায়, ষ্টিমারগুলি প্রকাণ্ড রাজহাঁসের মতো তীক্ষ্ণ চীৎকার করিয়া জল কাঁপাইয়া পাখা ঝটপট করিয়া ছুটিয়া চলে, ব্যস্তসমস্ত পান্সির বুকে বসিয়া আপিসের বাবুরা তামাক খায়, গান গাহে,—কিন্তু সবই

যেন নিত্যকর্ম্মের আবৃত্তি মাত্র, কোথাও যেন একটি সচেতন চেষ্টা জাগ্রত হইয়া নাই, সমস্তই যেন যন্ত্রবদ্ধ একঘেয়ে বোধ হয়। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসে। পাখীর দল ম্লানায়মান সূর্য্যাস্তদীপ্তির স্বর্ণশোণিত-প্লাবনের মধ্য দিয়া নদীর উপর দিয়া তোরণদ্বারে পুষ্পপল্লবের মঙ্গল-মাল্যের মতো উড়িয়া যায়, মালতী দেখিয়া দেখিয়া কত কি ভাবে। লম্বা লম্বা তাল জাতীয় গাছগুলির ছায়া তাহার চোখের সামনেই পশ্চিম হইতে আসিয়া পূর্ব্ব দিকে ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, ওপারের কালো কালো গাছগুলির উপর কালো অন্ধকার ঘন হইয়া উঠে, সমস্ত ক্রমশ একাকার সঙ্কুচিত হইয়া যায়, দূরে আর দৃষ্টি চলে না, তখন মালতীকে ঘরের কোণে একলা আপনাকে লইয়া চুপটি করিয়া কাটাইতে হয়। পরিণামবিরস শীতের দিনগুলি যেন কিছুতেই কাটিতে চাহে না।

যখন তাহার আর কিছু ভালো লাগে না, তখন মালতী বই খুলিয়া বসে; অনেক সময় বই তাহার কোলের উপর চোখের সামনে খোলাই পড়িয়া থাকে, মন তাহার ঘুরিয়া বেড়ায় বিপিনের স্মৃতিটির চারি-দিকে—বদ্ধকমল বেষ্টন করিয়া ভ্রমরের মতো, ফানুসঢাকা দীপের পাশে পতঙ্গের ন্যায়। কখনো কখনো বা সে নিজের মনোবেদনাকে কবিতার আকার দিতে চেষ্টা করে, কখনো নিজের অজ্ঞাতসারে বিপিনের নাম লিখিতে থাকে। সেই নামের শব্দটি ও রূপটিও যেন তাহার হৃদয়ের উপর সুমধুর স্পর্শ বুলাইয়া দ্যায়, যেন অপরি-মেয় করুণা-রসার্দ্র দুইটি তরল চোখের দৃষ্টি তাহার গভীর বেদনার উপর সান্ত্বনা বিকীর্ণ করিয়া দ্যায়। তেশিরা কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে বাহিরটা যেমন বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, অতীতের স্মৃতির ভিতর দিয়া দেখিয়া মালতী তেমনি নিজের এই দুর্বহ জীবনকে রঙিন করিয়া দেখিতে চাহিত।

মালতী যাহা করে গুরু তাহা দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া দেখেন। শিকারী বিড়ালের মতো গুরু নিঃশব্দে পা টিপিয়া আসিয়া খিলশূন্য কপাট ফাঁক করিয়া মালতীর প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করেন। মালতী অনেক সময় প্রেমানন্দের এই চুরি টের পায়, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করে না। প্রেমানন্দ যখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে মালতী তাঁহার গোয়েন্দাগিরি টের পাইয়াও অগ্রাহ্য করিতেছে, তখন তাঁহারও সাহস ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিল।

একদিন মালতী বুকে বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া কবিতা রচনা করিতেছে, গঙ্গার খোলা হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া খোলা বইয়ের পাতাগুলি লইয়া ফরফর করিয়া নাচাইতেছে, মালতীর অলকগুচ্ছ চোখের উপর আনিয়া দুলাইতেছে—এমন সময় প্রেমানন্দ নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া একেবারে মালতীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের হাত দুখানা পশ্চাতে শৃঙ্খলিত করিয়া শরীরের উপরার্দ্ধ ঝুঁকাইয়া মালতীর কাঁধের ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলেন মালতী কবিতা লিখিতেছে। তারপর আস্তে আস্তে নত হইয়া হাত

বাড়াইয়া ছোঁ মারিয়া কবিতার কাগজখানা টানিয়া লইলেন।

মালতী কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কিছুই টের পায় নাই, চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল প্রেমানন্দ! সে সর্পভীত বা তাড়িৎ-স্পৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ঝটিতি উঠিয়া আপনার কেশবাস সংযত করিয়া যখন প্রেমানন্দের দিকে চাহিল তখন তাহার চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে।

প্রেমানন্দ তাহা লক্ষ্য না করিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—সন্ন্যাসিনীর ব্রত পালন চমৎকার হচ্ছে, রাধারাণী! সন্ন্যাসিনী লেখেন প্রণয়-কবিতা! নাম জপ করেন পরপুরুষের!

মালতী গুরুর এই শ্লেষবাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া নিজের ক্রোধে নিজেকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচিত।

মালতী চোখ পাকাইয়া বলিল—আপনি গুরু, না চোর?

প্রেমানন্দ হাসিয়া বলিল—আমি গুরু! শিষ্য যখন চুরি করিয়া চুরি করিতে আরম্ভ করে, তখন গুরুকেও বাধ্য হইয়া চুরি করিয়া চুরি ধরিতে হয়। তুমি কি সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম পালন করছ?

মালতী আর থাকিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া বলিল—আমি সন্ন্যাসিনী নই! আমি চীৎকার করে বলছি, হাজার বার বলছি, আমি সন্ন্যাসিনী নই! আপনি আমাকে দূর করে দিন আপনার আশ্রম থেকে। আমাকে এমন করে অপমান করবেন না।

মালতী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রেমানন্দ একটু

রাধারাণী, কাঁদ! অশ্রুজলে সমস্ত গ্লানি ধুয়ে ফেল। ধর্ম্মের পথ বড় দুর্গম, মনের সকল ভার পশ্চাতে ফেলে দিয়ে লঘু হয়েই যেতে হবে, নইলে লক্ষ্য স্থানে পৌঁছানো দুর্ঘট হবে। প্রাণ যখন ব্যাকুল হবে ভাগবত পোড়ো, ধর্ম্মগ্রন্থ পোড়ো, কবিতা লিখতে ইচ্ছা হয় ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন কোরো—নিজেকে স্রোতের মুখে এমন করে' ছেড়ে দিয়ো না।

মালতী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া এই মাঘ মাসের দারুণ শীতে দরদর করিয়া ঘামিতেছিল। গুরু যে অধঃপাতের পূতি গহ্বরে কতখানি নামিয়া গিয়াছেন ইহা মনে করিতেও মালতীর দুঃসহ লজ্জা বোধ হইতেছিল।

মালতী যখন মুখ ফিরাইল তখন তাহার মুখ সিঁদুরে আমের মতো হইয়া উঠিয়াছে। সে দৃপ্তস্বরে বলিল—আপনি আমার ঘর থেকে এক্ষণি বেরিয়ে যান, নইলে আমি চেঁচিয়ে হাট বাধিয়ে দেবো।

প্রেমানন্দ কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, তোমার মন এখন চড়া-বাঁধা সেতারের মতো বাতাসের স্পর্শে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে, তুমি ঠাণ্ডা হও। আমি অন্য সময় এসে তোমায় বুঝিয়ে দেবো, এটা তোমার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

প্রেমানন্দ এক পা দু পা করিয়া হটিতে হটিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মালতী বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া উপুড় হইয়া পড়িল, এবং বালিসে মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।



ভরা সাঁঝ

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

পূর্ণ

রবিবারের সকালবেলাকার তাসের আড্ডা ভাঙিয়া বাড়ি ফিরিতেছি, পথে একজন ছোকরা আমায় ধরিল।—খালি পা, চুল উস্কখুস্ক, শুকনো মুখ, অত্যন্ত ময়লা কোঁচার টিপ গায়ে। সে মাটির দিকে মুখ নীচু করিয়া বিড়বিড় করিয়া কি আমায় বলিল, ভালো শুনিতে পাইলাম না। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইলাম। সদ্য রোগ-শয্যা ছাড়িয়া উঠিলে মানুষের যেমন চেহারা হয় তার শরীরের অবস্থা ঠিক তেমনি। চোখ কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, গাল দুটা তুব্‌ড়িয়া চুপ্‌সিয়া গেছে—একটা দুর্ব্বলতা তার শরীরের কল-কব্জাকে দুমড়াইয়া যেন তাকে মাটির দিকে টানিতেছে।

আমি বলিলাম—"কি চাও?"

সে মুখ না তুলিয়াই বলিল—"মশায় বল্‌তে বড় লজ্জা—।" কথাটা সে শেষ করিল না।"

আমি বলিলাম—"কি বলই না!"

—"বড় বিপদ!—"

আমি বলিলাম—কি, শুনি!"

সে বলিল—"ভদ্রসন্তান হয়ে ভিক্ষা চাইতে মাথা কাটা যায়!"

আমি দেখিলাম, লোকটা ভিখিরী, কেবল কথার ভড়ং বাড়াইতেছে। ভিখারীর দৌরাত্ম্যে পথ চলা দায়; তাড়াইয়া দিলে নড়ে না—নাছোড়বান্দা; দাঁড়াইয়া তার কথা শুনিলে কি আর রক্ষা আছে? একেবারে পাইয়া বসিবে। আমি তার দিকে আর দৃকপাত না করিয়া বাড়ির দিকে চলিতে লাগিলাম।

লোকটা ছাড়িল না, আমার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল, একটু কাছাকাছি হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—"মশায়, ভদ্র-লোকের ছেলে, বড় দায়ে পড়েই প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি পথের ভিখিরী নই!"

সে যে ভদ্রলোকের ছেলে তার ছাপ এখনও কিছু কিছু তার দেহের উপরে আছে। তার কথা আমি একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। তার কণ্ঠের কাতরতা আমার মনের উপর একটু ঘা দিল। আমি বলিলাম—"কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে বল।"

সে বলিল—"আজ সকালে আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে, এমন সংস্থান নেই যে তাঁর সৎকার করি। আমরা বড় গরীব। ঘটি-বাটি বেচে বাপের চিকিৎসা হয়েছে;—তাঁর যে আয় ছিল তাতে কায়ক্লেশে সংসার চলত, তিনি ব্যামোয় পড়ে অবধি একটি পয়সা উপার্জ্জন নেই—অনেক দেনা হয়েছে, আর কেউ ধার দিতে চায় না। আপনি যদি পাঁচটি টাকা দেন তাহ'লে তাঁর সৎকার হয়। আপনি আমার মা-বাপ—আমায় রক্ষা করুন।"

আমার পকেটে টাকা ছিল না, আমি বলিলাম—"আচ্ছা বাড়ি চল, টাকা দিচ্ছি।"

বাড়ির সাম্‌নে আসিয়া বলিলাম—"দরজার কাছে দাঁড়াও, আমি টাকা আনছি।"

টাকা হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি লোকটা বাহিরের রকে শুইয়া পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি টাকা দিতে গেলাম। সে কাপড়ের ভিতর হইতে হাতখানা বাহির করিল।

হঠাৎ আমার কেমন ধাঁদা লাগিল। লোকটার ডান হাতে ছটা আঙুল। এই ছয় আঙুলের একটা অস্পষ্ট স্মৃতি আবছায়ার মতো আমার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। আমি টাকা কয়টা মুঠোর মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিলাম। একটা সন্দেহ আমার মনটাকে দোলা দিতে লাগিল। অন্বেষী দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আমার সেই সন্দেহ যেন দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার ভাব-গতিক দেখিয়া সে অবাক!

আমি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলাম—জোচ্চোর! তুমি না সেদিন আমার কাছ থেকে ক টাকা ধার চেয়েছিলে?"

সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল—"কবে মশায়?"

আমি বলিলাম—"তারিখটা ঠিক মনে নেই। কিন্তু সেবার তোমার পিতৃবিয়োগ নয়; সেবার তোমার গাঁঠকাটা,—রেলের টিকিটখানি পর্য্যন্ত গিয়েছিল! ভারি বিপদ! বিদেশী লোক, কোথায় যাবে, কি করবে, কিছু জানতে না। সেবার তোমার ফন্দি ছিল টিকিটের দাম আদায় করা!"

সে বিস্মিত হইয়া গেল, বলিল—"বলেন কি মশায়! ভদ্রসন্তান হয়ে এমন কাজ করতে পারি।"

আমি রাগিয়া উঠিয়া বলিলাম—"রেখে দাও তোমার ভদ্রসন্তান!"

সে বলিল—"বিশ্বাস করছেন না মশায়! চলুন আমার বাড়িতে চলুন—স্বচক্ষে দেখবেন আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে কি না।"

আমি বলিলাম—"এ রকম জুয়াচুরি ঢের জানা আছে! সেবারেও তুমি এমনিধারা সব অকাট্য প্রমাণ দিতে চেয়েছিল। পকেটে তোমার কাঁচি-কাটার চিহ্ন ছিল। দেশে ফিরে গিয়েই অবিলম্বে তুমি যে আমার টাকা মানি-অর্ডারে পরিশোধ করবে —ভদ্রতার এই আশ্বাস দিয়ে আমার নাম ঠিকানাটি পর্য্যন্ত লিখে নিয়েছিলে; মনে পড়েছে?"

সে প্রতিবাদের স্বরে বলিল—"আপনি ভুল করছেন মশায়! সে আমি নই!"

আমি বলিলাম—"নিশ্চয় তুমি! তোমার সঙ্গে যত কথা কচ্ছি ততই আমার সে বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠছে! কথাবার্ত্তা সব এক ছাঁচে ঢালা!"

সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর হতাশ হইয়া বলিল—"বিশ্বাস করবেন না, কি করব বলুন!" বলিয়া সে রকটার উপর বসিয়া পড়িল। কথার উত্তেজনায় সে হাঁফাইতেছিল।

তাহার সে অবস্থা দেখিয়া আমার কেমন মায়া করিতে লাগিল। কিন্তু একটা লোক যে ঠকাইয়া টাকা লইয়া যাইবে ইহা

আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলাম না।

আমি বলিলাম—"কবুল কর।"

সে কোনো উত্তর করিল না;—চোখ বুজিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"তুমি যদি কবুল না কর, তাহ'লে তোমায় পুলিশে দেব।"

সে কথা সে যে গ্রাহ্যে আনিল এমন বোধ হইল না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে যেন আপনার মনেই বলিতে লাগিল—"কবুল না করে করি কি! এতে আর দিন চলে না। কেউ আর বিশ্বাসও করে না—কথায় ভোলেও না।"

আমি বলিলাম—"ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে জুয়াচুরি বৃত্তি কর?"

সে গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"কি করব?"

—"কেন চাকরী করতে পার না?"

—"চাকরী কে দেবে?"

—"লেখাপড়া জান?"

—"সে না-জানারই সামিল!"

—"বেশ! লেখাপড়ার কাজ করতে না পার, অন্য কাজ কর!"

—"কি কাজ বলুন?"

—"মোট বইতে পার!"

—"আজ্ঞে ভদ্রলোকের ছেলে কি মোট বইতে পারে?"

—"কেন পারবে না? তুমি বুড়ো নও, হাবড়া নও!"

সে একটা অবজ্ঞার সঙ্গে বলিল—"হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে ত! পারব কেন?"

—"না পার, কোনো বাবুর বাড়ি চাকর-নফরের কাজ নাও।"

—"আজ্ঞে, ছোটো-লোকের কাজ!"—বলিয়া সে মুখটা বিকৃত করিল।

লোকটা কুড়ের সর্দ্দার! যত রকম কাজের কথা তুলিলাম সব তাতেই সে মাথা নাড়িতে লাগিল। আমি বলিলাম—"তুমি যে দেখছি একেবারে নবাব খাঞ্জা খাঁ! কোনো কাজই তোমার মনের মতো নয়।"

সে আমার কথার কোনো উত্তর করিল না, বলিল—"মশায় দয়া করে আমায় কিছু খেতে দিন;—আজ দুদিন জলস্পর্শ হয়নি!"

আমি বলিলাম—"তোমার মতো লোককে আমি দয়া করতে পারব না। নিজের উপার্জ্জনে খেতে পার তো খাও—নয় তো মর!"

সে বলিল—"কোথায় কাজ পাব বলুন।"

আমি বলিলাম—"আমি তোমায় কাজ দিচ্ছি।"

—"কি কাজ?"

—"বাসন মাজা।"

—"বাসন মাজা!"—সে চোখ দুটা কপালে তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল—"আমি তো কখনো বাসন মাজিনি—আমি তো পারব না।"

আমি বলিলাম—"না পার তো দূর হও!"

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; তার পর কি ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা রাজি আছি। কিন্তু আগে দুটি খেতে দিন, নইলে শরীর বইবে না!"

আমি দেখিলাম সে কথা মিথ্যা নয়।

তার জন্যে কিছু জলপানের বন্দোবস্ত করিয়া আমি ঝিকে ডাকিয়া বলিলাম—"ঝি, একে আমাদের বাসনগুলো মাজতে দিস।"

ঝি লোকটার মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিল, তার পর বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

আমি স্নান-আহার সারিয়া বাহির-বাড়িতে আসিতেছি, দেখিলাম, কলতলায় একরাশ বাসন সমুখে রাখিয়া লোকটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে,—তখনও কাজে হাত দেয় নাই। ভাবিলাম, লোকটা দেখিতেছি বাদশাহী কুড়ে! দেখি কি হয়—মনে মনে বলিয়া বৈঠকখানা ঘরে চলিয়া গেলাম। তামাক টানিতে টানিতে শুনিলাম ঝি গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে—"কেমন মানুষ গো! ঠুঁটো নাকি! বাসন কোলে করে সেই অবধি বসে রয়েছে!"

রবিবারের দুপুরবেলাটা বৃথা নষ্ট করা উচিত নয় মনে করিয়া তামাকের ধোঁয়ায় তন্দ্রাদেবীর আরতি করিতেছিলাম, তারপর তিনি যে কখন ভক্তের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া সশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা ঠিক মনে নাই। যখন নিদ্রামন্দির ছাড়িয়া উঠিলাম তখন বৈকাল হইয়াছে। লোকটা আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম —"কাজ শেষ হয়েছে?"

সে বলিল—"আজ্ঞে হাঁ।"

আমি তার হাতে দুই-আনার পয়সা দিয়া বলিলাম—"এই নাও তোমার পারিশ্রমিক। কালও যদি বাসন মাজতে এস তাহলে একবেলার খাবার আর এই রকম দু-আনা পয়সা পাবে।"

সে দো-আনিটি আমার হাত হইতে লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পর দিন ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির। আমি দেখিলাম লোকটার ভাবগতিক আজ একটু কেমন-এক রকম;—গা হইতে একটা দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। আমি ব্যাপারটা বুঝিলাম কিন্তু কিছু বলিলাম না;—দেখি কি হয়। ঝিকে বলিতে হইল না, লোকটাকে দেখিয়াই সে আপনা হইতে বাসন আনিয়া হাজির করিল। কাজ শেষ করিয়া বৈকালে দু আনা লইয়া সে চলিয়া গেল; শুনিলাম সেদিন আর সে আমার বাড়ির ভাত খায় নাই—শরীর না কি ভালো ছিল না।

একমাস আমাদের বাড়ি সে নিয়মিত কাজ করিল;—প্রথম প্রথম তার গায়ে তাড়ির গন্ধ পাইতাম বটে কিন্তু শেষাশেষি খুব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াও নেশার কোনো চিহ্ন দেখিতাম না। বাস্তবিকই লোকটার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইতেছিল। তার শরীরের অবস্থা দিন দিন ভালো হইয়া ত উঠিতেই ছিল, তা ছাড়া তার মনের মধ্যেও যে একটা সুবাতাস বহিতেছে এমন পরিচয়েরও অভাব ছিল না।

আত্মগৌরবে আমার মনটা ভরিয়া উঠিতেছিল। একটা লোককে বিনাশের পথ হইতে উদ্ধার করিবার আনন্দ যে কী তাহা এই কাজের কাজী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। নিজের হাতে গড়া জিনিষের উপর মানুষের যেমন মায়া হয় তেমনি একটা মায়া ঐ লোকটার উপর জমিয়া উঠিতেছিল। নিজের হাতের জিনিষ

অসম্পূর্ণ রাখিয়া যেমন তৃপ্তি হয় না—তেমনি লোকটা সম্বন্ধে একটা অতৃপ্তি আমার মনের মধ্যে জাগিতেছিল। কি করিলে লোকটার উন্নতি হইবে এই ভাবনা তখন আমার সব চেয়ে বড় ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি লেখাপড়া কিছু জান?"

সে বলিল—"সামান্য লিখতে পড়তে পারি।"

আমার মাথায় একটা কল্পনা ছিল। আমার এক বন্ধুর প্রকাণ্ড এক ছাপাখানা আছে। তাহাকে অনুরোধ করিয়া একখানা চিঠি লিখিতে বসিলাম।

এতদিন আমি লোকটার নাম জিজ্ঞাসা করি নাই;—চিঠিতে নামের উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিল—"আমার নাম পূর্ণচন্দ্র বসু।"

চিঠি শেষ করিয়া আমি বলিলাম—"পূর্ণ! এই চিঠি নিয়ে যাও;—ছাপাখানার কাজ শিখলে তোমার উন্নতি হবে।"

পূর্ণ চিঠিখানা হাতে করিয়া কেমন একটু ইতস্তত করিল; কোনো উৎসাহ দেখাইল না। আমি ভাবিলাম, লোকটার মজ্জাগত কুড়েমি বোধ হয় এখনো যায় নাই। আমি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম। সে চুপ করিয়া সব শুনিল; তার পর আমার বাড়ির কলতলাটার দিকে কেমন একটা করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি মনে মনে হাসিয়া উঠিলাম—আমাদের কলতলাটার উপর পূর্ণর মায়া পড়িয়া গেল না কি।

আমার বন্ধুর ছাপাখানায় পূর্ণ বেশ মনোযোগ দিয়া কাজ করিতেছে—মধ্যে মধ্যে খবর পাইতাম। অল্প অল্প করিয়া তার মাহিনাও বাড়িতেছিল। প্রথম প্রথম প্রায়ই আমি পূর্ণর খবর লইতাম, কিন্তু যখন দেখিলাম সে সত্যকার মানুষের মতো হইয়া উঠিয়াছে—আর কোনো ভয় নাই, তখন আমার একটু ঢিল পড়িয়া গেল। শেষে নানা কাজের হেঙ্গামে আর খবর লওয়া হইয়া উঠিত না।

অনেক দিন পরে একদিন আমার এক আত্মীয়কে দার্জ্জিলিং মেলে উঠাইয়া দিয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইতেছি এমন সময় পূর্ণর সঙ্গে আমার দেখা। সেই প্রথম দিনের পূর্ণর চেহারা আমার মনে পড়িল; তার সঙ্গে আজ কত তফাৎ। সে-পূর্ণকে এ-পূর্ণ বলিয়া চেনাই যায় না। সুস্থ সবল চেহারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—রীতিমত ভদ্রলোক! পূর্ণকে দেখিয়া সত্যই একটা আনন্দ বোধ করিলাম। আমার ভিতর হইতে যে একটা আত্মগৌরবের গর্ব্ব উছলিয়া উঠিতেছিল তাহা বোধ হয় পূর্ণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবে; সে বলিল—"আপনার অনুগ্রহে—"

আমি কথাটা চাপা দিয়া বলিলাম—"কি হে, কেমন আছ?"

সে বলিল—"আজ্ঞে ভালো আছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন মাহিনা পাও কত?"

সে বলিল—"আজ্ঞে ত্রিশ টাকা।"

আমি বলিলাম—"বেশ! বেশ!"

আমার দ্বারাই যে পূর্ণর ভালো হইল এ কথাটা প্রচার করার চেয়ে গোপন

রাখাতেই যে মহত্ত্ব তাহা আমি জানি, তবুও আমার ভিতর হইতে বোধ হয় ঐ কথাটা বার বার ঠেলা দিতেছিল, তাই আমি বলিয়া ফেলিলাম—"ভেবে দেখ দিকিন্ পূর্ণ! তুমি যদি সেই সর্ব্বনাশের পথ থেকে না ফিরতে তাহলে আজ কোথায় থাকৃতে!"

পূর্ণ কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—"তা আর বল্‌তে মশাই! আপনার অনুগ্রহ না পেলে আমার যে কী দশা হত, বলতে পারিনি—আপনি আমার জীবন—জীবন কেন—জীবনের বাড়া মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, আপনার এ ঋণ আমি—"

এই কথাগুলার জন্যই বোধ হয় আমার ক্ষুধিত অন্তর অপেক্ষা করিতেছিল। মানুষ যেমন তার উপাদেয় সামগ্রী অল্পে অল্পে স্বাদ লইয়া খায়, আমার প্রশংসাটাকে তেমনি করিয়া গ্রহণ না করিয়া আমার পরিতৃপ্তি হইতেছিল না, সেইজন্যই সম্ভবত আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"থাক্, থাক্—সে সব কথা! এখন যাওয়া হচ্ছে কোথা?"

সে বলিল—"একটু কাজে—ব্যারাকপুরে।"

আমি বলিলাম—"ট্রেণ ফেল হবে না ত?"

—"আজ্ঞে না, এখনো দেরী আছে।"

পূর্ণ কথাটা শেষ না করিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। সে বলিতে লাগিল—"একটা কথা আপনাকে জানাতে না পারলে আমার শান্তি নেই। আপনি আমার এত উপকার করেছেন কিন্তু আমি আপনাকে ফাঁকি দিয়েছিলুম।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"ফাঁকি!"

সে বলিল—"আজ্ঞে হাঁ! আপনি যে আমায় বাসন মাজতে দিয়েছিলেন তার একখানাও আমি মাজিনি।"

—"মাজনি?"

—"আজ্ঞে না। বাসন মাজবার জন্যে আমি কিছুতেই হাত তুলতে পারতুম না;—আমি চুপ করে বসে থাকতুম—আপনার সেই দাসীটি আমার সমস্ত বাসন মেজে দিত।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম।

পূর্ণ বলিতে লাগিল—"আমার পানে শুধু একটিবার চেয়ে, কোনো কথা না বলে, সে যখন আগ্রহ করে বাসনগুলি মেজে দিলে তখন আমার মনে যে কী হ'ল তা আমি ইহজন্মে ভুলতে পারব না। আমার মনে হল, আমার সমস্ত পাপ তার ঐ চোখ দুটি দিয়ে যেন সে মুছে নিলে। সেই মুহূর্ত্তে আমি যেন নতুন মানুষ হয়ে গেলুম। আমার দুঃখের বোঝা এমন আদর করে কেউ তো কখনো বুকের ওপর টেনে নেয় নি—"

বলিতে বলিতে ঢং ঢং করিয়া গাড়িছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল;—পূর্ণ ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ির দিকে ছুট দিল।

আমি ভাবিতেছিলাম—পূর্ণকে শুধরাইল কে?

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সঙ্কল্প

তেমন-ই কি আসে উষা ভূষি অঙ্গ সুষমায়,
উদ্ভাসিয়া শ্যাম তনু শরতের ?
শুনি যবে পাখীদের মধু-গীতি-ঘোষণায়
ধীরে ভাঙ্গে নীরবতা জগতের ?
প্রভাতের বায়ু যবে বহে যায়,—কহে যায়
কাণে কাণে কাননের কাহিনী,
সপ্তবর্ণ-আঁকা পর্ণে তেমনি কি রহে যায়
স্মিত-শোভা চারুপ্রভাবাহিনী ?
বসন্তে নিদাঘে মোর গাও পিক পাপিয়া!
স্মরিব মানসে ঋতু-মাধুরী।
শ্রাবণপ্লাবনে নিশা উৎসবে যাপিয়া,
জাগ সবে ঝিল্লী ও দাদুরি।
কেমনে জানিবে কবে কোন্ শুভ লগনে
সাধের শরৎ মোর আসিবে ?
সরসী-সলিলে আর গাঢ় নীল গগনে,
স্বপনে জড়ানো আলো ভাসিবে ?
পুলক-ললিত হাসি, পুষ্পরাশি আননের,
ফুটলে না পারি আর লখিতে।
জগতে অতুল্য সে যে ফুল্লশোভা মানবের ;
নির্ব্বাপিত কোথা গো সে চকিতে ?
প্রভাত সায়াহ্ন সন্ধ্যা ! অস্ত যাও আঁধারে ;
নিশা ! কেঁদে মরে যাও নীরবে।
তমিস্রার পরপার পাড়ি দিয়া সাঁতারে,
লভিব নবীন জ্যোতি বিভবে।
এস স্পর্শ গন্ধ গান ! ভূষি প্রাণ সুষমায় ;
বিরচিব নবঋতু জগতের।
জাগ প্রীতি ! বিশ্বে আজি নব গীতি-ঘোষণায়
উদ্বোধিব দেব-লীলা জগতের।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আর্য্যদিগের আদি জন্মভূমি

আর্য্যদিগের প্রথম সূতিকাগার কোথায় ছিল এবং তথায় তাঁহারা কিরূপ সভ্যতার বিকাশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি পুরাতত্ত্বের সহিত তাঁহাদের সমগ্র ইতিহাসেরই অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং আর্য্যজাতির লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদিগকে ইহার মূলোদ্ধারেরই চেষ্টা করিতে হইবে।

'পুরাণ' কল্পনামাত্র এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে পুরাণের প্রমাণ গ্রাহ্য করিতে একেবারেই প্রস্তুত নহেন। কিন্তু পুরাণে ইতিহাসের যে সমস্ত মূল্যবান্ উপাদান নিহিত রহিয়াছে—সে সমস্তের দ্বারাই ভারতের প্রাগৈতিহাসিক কালের পুরাবৃত্তের বহু অধ্যায় বিরচিত হইতে পারে। আমাদের উপস্থিত আলোচনা প্রসঙ্গে এই সত্যটিই পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

মৎস্যপুরাণে ইলাবৃতবর্ষ দেবতাদিগের জন্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায় যথা—

"ইলাবৃতমিতিখ্যাতং তদ্বর্ষং বিস্তৃতায়তম্।
যত্র যজ্ঞোবলের্বৃত্তো বলির্যত্রচ সংযতঃ ॥ ২
দেবানাং জন্মভূমির্যা ত্রিযুলোকেষু বিশ্রুতা ॥" ৩

মৎস্য পুরাণ ১৩৫ অধ্যায়।

"যেখানে বলি যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং বদ্ধ হইয়াছিলেন—সেই বিস্তৃত আয়তন স্থানই ইলাবৃতবর্ষ—ইহা দেবতাদিগের জন্মভূমি বলিয়া ত্রিলোকেই খ্যাত আছে।"

রহিয়াছে বলিয়া পুরাণে ইহার অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা পাঠ করিলেও ইহাকে মেরুস্থান বলিয়া জানিতে পারা যায়—

"নতত্র সূর্য্যস্তপতি নতেজীর্য্যন্তি মানবাঃ।
চন্দ্রসূর্য্যৌ নক্ষত্রং ন প্রকাশমিলাবৃতে ॥"

ইতি লিঙ্গ পুরাণম্।

"ইলাবৃতে সূর্য্য তাপ প্রদান করে না—চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র তাহাতে প্রকাশ পায় না। ইহাতে লোক সকল জরাপ্রাপ্ত হয় না॥"

ইলাবৃত মেরুস্থল বলিয়া সূর্য্য তথায় উদিত হইলেও ইহার তাপ অনুভূত হয় না এবং কখনও সূর্য্য সম্পূর্ণ অপ্রকাশ থাকে এবং ক্রমাগত যখন ছয় মাস দিবা থাকে তখন চন্দ্র তারকাদি একবারেই দৃশ্যমান হয় না ইত্যাদি প্রাকৃতিক অবস্থাই উদ্ধৃত বিবরণের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে।

ইলাবৃতের লোক সকলের বিবরণ নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"পদ্মপ্রভাবাঃ পদ্মমুখাঃ পদ্মপত্র নিভেক্ষণাঃ।
পদ্মপত্র সুগন্ধাশ্চ জায়ন্তে ভবভাবিতাঃ ॥
জম্বুফলরসাহারা অনিস্পন্দাঃ সুগন্ধিনঃ।
দেবলোকগতাস্তত্র জায়ন্তে হ্যজরামরাঃ ॥
ত্রয়োদশ সহস্রাণি বর্ষাণাস্তে নরোত্তমাঃ।
আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি বর্ষেদিব্যেত্বিলাবৃতে ॥"

ইতি লিঙ্গ পুরাণম্।

প্রথমেই লিঙ্গপুরাণের বর্ণনায় যে ইলাবৃতে "নতেজীর্য্যন্তি মানবাঃ" মনুষ্য সকল জরাগ্রস্ত হয় না বলিয়া উল্লেখ আমরা পাইয়াছি—

প্রত্যুত মর্ত্ত্যস্থান তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ইলাবৃত শীতপ্রধান স্থান বলিয়া তথাকার লোক সকল চিরযৌবন ভোগ করিত ও চিরজীবী হইত বলিয়াই যে দেবতার ন্যায় 'অজর' 'অমর' রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। ইহা হইতে দেবতুল্য লোকদিগের বাসহেতুই যে ইলাবৃত "দিব্য" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, তাহা আমাদের নিকট সুগম বলিয়াই বোধ হয়।

ইলাবৃতের অব্যবহিত দক্ষিণে শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতই উত্তরকুরুর সীমা ছিল। এই শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উপরেই উত্তরকুরু অবস্থিত ছিল। ইহার অবস্থান সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"উত্তরে চাস্য শৃঙ্গস্য সমুদ্রান্তেচ দক্ষিণে।
কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধ নিষেবিতম্ ॥"

মৎস্য পুরাণ ১১৩ অধ্যায়।

"এই শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তরাবধি দক্ষিণভাগান্তে উত্তরকুরুভূমি—ইহা সমুদ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং পুণ্য সিদ্ধজন নিষেবিত।"

এই উত্তরকুরুর লোক সকল ইলাবৃত রূপ দিব্যলোক হইতেই যে তথায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা লিঙ্গ পুরাণে উল্লিখিত দেখা যায় :—

"কুরুবর্ষেতু কুরব স্বর্গলোকাৎ পরিচ্যুতাঃ।

৫২ অধ্যায়।

ইলাবৃতবর্ষ যে দেবলোক বা স্বর্গলোক বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল তাহাতে ইহাকে সকল আর্য্যজাতির সাধারণ পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি জন্মস্থান বলিয়াই বোধ হয়। এবং মৎস্য পুরাণের দেবতাদিগের জন্মভূমিরূপে ইহার নির্দ্দেশ হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

কালে ভ্রাতৃবিরোধ সঙ্ঘটিত হইলেই আর্য্যসন্তানগণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেহ কেহ উত্তরকুরুতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহারা "স্বর্গলোক পরিচ্যুত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

আমরা যে বিরোধের কথা অনুমান করিয়াছি, 'অসুর' নামের অভিধান আলোচনা করিলে আমরা তাহার যথেষ্ট সমর্থনই পাইতে পারি। 'অসুর' নামের অভিধেয়* সম্বন্ধে অমরকোষে এইরূপ নির্দ্দেশ পাওয়া যায় :—

"অসুরা দৈত্য-দৈতেয়-দনুজেন্দ্রারি-দানবাঃ।
শুক্রশিষ্যা দিতিসুতা পূর্ব্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ॥"

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি আর্য্যগণ পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়াই 'সুর' ও 'অসুর' এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাতেই অসুরগণ সুরদ্বেষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এইরূপে বিভক্ত হইলেও পূর্ব্বে যে তাঁহারা এক দেবতা জাতির অন্তর্ভূত ছিলেন তাহা তাহাদের 'পূর্ব্বদেব' নামের দ্বারাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

পূর্ব্বে দেবতাসকল দেব ও অসুর উভয় নামেই পূজিত হইতেন। বিরোধের পর কিন্তু একদল দেব নামেই পূজা করিতে লাগিলেন—অপর দল দেব নাম ছাড়িয়া কেবল অসুর নামেই পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে দেবোপাসকেরা 'দেব' নামেই আখ্যাত হইলেন এবং অসুরোপাসকেরা

'অসুর' নামে আখ্যাত হইলেন। 'অসুর' শব্দের অর্থ পূর্ব্বে 'অসু' অর্থাৎ প্রাণ বা বলযুক্ত ছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিপক্ষতা হইতেই ইহা "সুরদ্বেষী" অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইন্দ্র-পূজা লইয়াই প্রথম বিরোধের উৎপত্তি হয়। একদল ইন্দ্রকে প্রাধান্য প্রদান করেন—কিন্তু অপর দল তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। তাহাতেই অসুরগণ বিশেষভাবে 'ইন্দ্রারি' নামে পরিচিত হইয়াছিল।

উপরি উল্লিখিত দেবপূজক আর্য্যেরাই যে ভারতীয় আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ তাহা না বলিলেও চলে। এই দেবপূজক আর্য্যেরাই আর্য্যদিগের আদি জন্মভূমি ইলাবৃত হইতে আসিয়া উত্তরকুরুতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতিপক্ষ অসুরেরা তাঁহাদেরই পার্শ্বে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন—লিঙ্গ পুরাণের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় তাহার স্পষ্ট আভাসই পাওয়া যায়:—

"দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতঃ পর্ব্বত উচ্যতে।
শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতশ্চৈব পিতৃণাং নিলয়ঃ সদা॥"

৫২ অধ্যায়।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে "শ্বেত পর্ব্বত যেমন দৈত্য দানবদিগের স্থান ছিল, শৃঙ্গবান্ও তদ্রূপ পিতৃপুরুষদিগের স্থান ছিল।"

আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি যে স্বর্গলোক-পরিভ্রষ্ট দেবগণই শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতাবস্থিত উত্তরকুরুতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতৃপুরুষ যে ভারতীয় আর্য্যদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ তাহা আর বলিতে হয় না। কারণ পুরাণকার পিতৃগণের দ্বারা যে আপনার পূর্ব্বপুরুষের কথাই বলিতেছেন—তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ উত্তরকুরুতে বহুকাল বাস্তব্য করিয়াছিলেন—তাহাতেই "পিতৃণাং নিলয়ঃ সদা"—এইরূপ বর্ণনা দ্বারা ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত পিতৃভূমিরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পুরাণে যেরূপ নিয়ত পিতৃভূমিরূপে উত্তরকুরুর উল্লেখ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি তাহাতে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিলেও যে উত্তরকুরুর সহিত তাঁহাদের পিতৃভূমি-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল তাহাই সপ্রমাণ হয়।

আর্য্যগণ ইলাবৃত বা দেবলোক হইতে উত্তরকুরুতে উপনিবিষ্ট হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের লোকোত্তর দিব্য প্রভাব ও বিক্রমের এইরূপই পরিচয় দিয়াছিলেন যে এই উত্তরকুরুও দেবদেশ রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণই আমরা প্রাপ্ত হই:—

"সেই বাশিষ্ঠ সাত্যহব্য (অত্যরাজিক) বলিয়াছিলেন, তুমি [বিদ্যাবলে] সর্ব্ব দিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়াছ, আমাকে অত্যরাজি জানন্তপি বলিলেন, "ওহে ব্রাহ্মণ, আমি যখন উত্তরকুরু জয় করিব, তুমি তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে, আমি তোমার সেনাপতি হইব।"

বাশিষ্ঠ সাত্যহব্য বলিলেন,—

"ঐ দেশ (উত্তরকুরু) দেবক্ষেত্র, মর্ত্ত্য (মনুষ্য) উহা জয় করিবার অযোগ্য; * তুমি আমায় দ্রোহ

* "দেবক্ষেত্রং বৈতন্ন বৈতন্মর্ত্ত্যোজেতুমর্হতি॥"

(প্রতারণা) করিলে, তোমার এই (বীর্য্য) আমি অপহরণ করিব।" অষ্টম পঞ্জিকা ৯ম খণ্ড ৪০শ অধ্যায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ ৬৬৪ পৃঃ।

উত্তরকুরু যেমন এই প্রকারে দেবোপাসকদিগের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়া দেবস্থান রূপে আখ্যাত হইল;—অসুরোপাসকদিগের উপনিবেশও তদ্রূপ অসুর-দেশ বা আসিরিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইল।

যে বলি ইলাবৃতে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া, মৎস্য পুরাণের বর্ণনা হইতে, আমরা জানিতে পারিয়াছি—তিনি অসুর বা দৈত্যদিগেরই রাজা ছিলেন। বেদে 'বল' নামক অসুরকে আমরা ইন্দ্রের শত্রুরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই; যথা :—

"ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলম্।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ॥" ৫

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১১শ সূক্ত।

"হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গাভী-হননকারী বল নামক অসুরের গহ্বর উদ্ঘাটিত করিয়াছিলে। তখন বলাসুর নিপীড়িত দেবতাগণ ভয়শূন্য হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

এস্থলে রমেশবাবু লিখিয়াছেন—

"ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিরীয় ইতিহাসের বাবিলনাধিপতি বলদিগের সহিত বৈদিক বলের ঐক্যসাধন করিতে সমুৎসুক।" বস্তুত আসিরীয় সুপ্রসিদ্ধ রাজা বেলাস (Belus) দৈত্যরাজ বলির সহিত অভিন্ন বলিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের দ্বারা বিবেচিত হইয়াছেন। এই প্রকারে বল বা বলির বংশের সহিত ইন্দ্রের শত্রুতা হইতেই যে অসুরগণ "ইন্দ্রারি" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম।

ইলাবৃতে যেমন প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছিল, তেমনই বিবাহ ও জাতকর্ম্মাদি সংস্কারেরও যে উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা আমরা মৎস্য পুরাণের বর্ণনা হইতেই জানিতে পারি যথা—

"বিবাহাঃ ক্রতবশ্চৈব জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ৩
দেবানাং যত্রবৃত্তানি কন্যাদানানি যানিচ॥" ৪

১৩৫ অধ্যায়।

"দেবতাদিগের যাগ, যজ্ঞ, বিবাহ ও জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ এবং কন্যাদানাদি যাবতীয় কার্য্য ঐ স্থানেই সম্পন্ন হয়॥"

ইলাবৃতের দক্ষিণায়নের ছয় মাস রাত্রি বশতঃ বিবাহাদি কার্য্য সম্পাদিত হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিত বলিয়া উত্তরায়ণের ছয় মাস দিবাতে ঐ সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। ইলাবৃতের এই প্রথা আর্য্যদিগের মধ্যে এইরূপই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ছয়মাস রাত্রির দেশ ছাড়িয়া আসিলেও সেই পূর্ব্ব-সংস্কার তাঁহারা ছাড়িতে পারেন নাই। তাহাতেই তাঁহাদের চূড়া, উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কারে সেই আদি পুরুষদিগের উত্তরায়ণের বিধিই পূর্ব্ববৎ বলবৎ রহিয়াছে যথা—

"উদগয়নে আপূর্য্যমাণে পক্ষে কল্যাণে নক্ষত্রে চৌড়
কর্ম্মোপনয়ন গোদান বিবাহাঃ॥" ইতি আশ্বলায়নঃ

বলা বাহুল্য যে "উদগয়ন" উত্তরায়ণকেই বুঝাইতেছে।

এই প্রকারে, আমাদের জাতীয় জীবনের বিলুপ্ত আদি ইতিবৃত্তের ছিন্নসূত্র চির সংস্কারের বিষয়ীভূত হইয়া থাকিবার জন্যই যেন প্রত্যেকের জীবনের দশবিধ সংস্কারের মধ্যেই আশ্চর্য্যরূপে অনুস্যূত রহিয়াছে—আমাদের উপরি-উক্ত পর্য্যালোচনা হইতে তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অপূর্ব কৌটা

হের এই ক্ষুদ্র কৌটা হাতে মোর! কোন্ রাজবালা
চাহে রাখিবারে ইথে সোহাগের কনকের হার?
কোন্ এয়ো, সুরভিয়া ঘনঘোর কেশের সম্ভার,
রাখিবারে চাহে ইথে লালে-লাল সিন্দুর উজালা?
রাজবালা রাগি কহে—"এ কি কৌটা! ছি ছি এ কি জ্বালা!"
রোষ-কষায়িত আঁখি এয়ো কহে—"শোভার আধার
আমার গৃহের কৌটা শতগুণে! এ কি ব্যবহার
কবি তব! সৃষ্টিছাড়া অনুরোধ! কানে ধরে তালা।"

অনাদৃত, উপেক্ষিত রে আমার কৌটা কবিতার,
থাক্ তবে, থাক্ তুই অতি গুপ্ত হৃদয়-মন্দিরে—
আমার সে নীলকান্তমণিধনে নয়নের নীরে
পূজি যথা,—নিত্য যথা নৃত্য, গীত, আনন্দ অপার!
থাকুক্ লো তোরি মাঝে সুধামাখা হরিনাম-মালা,
জিনি কোটী কণ্ঠহার কান্তি যার অপূর্ব্ব উজালা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

নবাব

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাচন

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খর-করজালের মধ্য দিয়া একখানা গাড়ী আসিয়া নবাবের প্রাসাদের সম্মুখে থামিল। ভাড়াটিয়া গাড়ী; মাথায় প্রকাণ্ড এক চামড়ার পোর্টম্যাণ্ট ও দুই-চারিটা ছোট বাক্স।

গাড়ী থামিলে এক বৃদ্ধা নারী গাড়ীর মধ্য হইতে নামিলেন।

প্রাসাদের দ্বারে এক ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ী জাঁসুলের?"

ভৃত্য অবাক্ হইয়া গেল। এই নিতান্ত সাধারণ-গোছ-দেখিতে বৃদ্ধা নবাবের প্রতি সম্মান-সূচক একটা উপাধি না দিয়া সটান তাঁহার নাম ধরিয়া বলিল, জাঁসুলে! ভৃত্য কহিল, "তাঁরই বাড়ী। তবে তিনি এখন বেরিয়েছেন।"

"তাতে কিছু আসে-যায় না" বলিয়া বৃদ্ধা ভৃত্যকে গাড়ীর মাথা হইতে মোট-ঘাট নামাইতে আদেশ দিল; তাহার পর গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া ভৃত্যকে বলিল, "জিনিষ-পত্তর সব জাঁহুলের ঘরে রাখবি, বুঝলি?"

বৃদ্ধা উপরের ঘরে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় নবাবের খাস-ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা কহিল, "তোমাদের মনিব বাড়ীতে নেই?"

খাস-ভৃত্য উত্তর দিল, "না।"

"ছেলেরা?"

"তারা মাষ্টারের কাছে পড়ছে। এখন ত দেখা হবে না। হুকুম নেই।"

"আর গিন্নী?"

"তিনি ঘুমোচ্ছেন। বেলা তিনটের আগে তাঁর ঘুম ভাঙ্গবে না। সে ঘরে কারও যাবারও জো নেই।"

শুনিয়া বৃদ্ধার হাড় জ্বলিয়া গেল। এই দিনে দুপুরে বিছানায় পড়িয়া গড়ানোর মত অপরাধ মানুষের আর কিছু হইতেই পারে না—বিশেষ বাড়ীর গৃহিণী সে, বয়সেও বুড়া নহে। শিক্ষাহীনতার এমন ফল ফলিবে না-ই বা কেন? বৃদ্ধা তখন গেরির সন্ধান লইল; ভৃত্য কহিল, তিনি বিদেশে গিয়াছেন!

"বম্পেন?"

"তিনি হুজুরের সঙ্গে চেম্বারে গিয়েছেন।"

বৃদ্ধা তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "যাক, ভাবনা নেই, তোমরা যাও। আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না—" খাস ভৃত্য তখনও সরিল না—চোখে সবিস্ময় দৃষ্টি ভরিয়া বৃদ্ধার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধা তাহার বিস্ময়ের কারণ বুঝিল, তাই মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমি কোন কুটুম-অতিথ্ আসিনি, বাছা—আমি তোমার মনিবের মা। বুঝলে?"

ভৃত্য তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রম অভিবাদন করিল। এবং এ সংবাদটা নিমেষেই ভৃত্য-মহলে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকৌতূহলে প্রায় সকলেই আসিয়া বৃদ্ধাকে অভিবাদন করিল। সেক্রেটারি ব্যারো কহিল, "আপনাকে আমি আগে দেখেছি, একবার।"

বৃদ্ধা তাহাকে চিনিল।..বে'র অভ্যর্থনা-সমারোহের উদ্যোগে লোকটা প্রাণ দিয়া খাটিয়াছিল, বটে! আজ আবার ইহাকে দেখিয়া সে অপমানের কথা নূতন করিয়া মনে পড়ায় বৃদ্ধার প্রাণে ঈষৎ বেদনা-বোধ হইল। বৃদ্ধা কহিল, "হুঁ, তুমি ক'দিন ছিলে না, ওখানে!"

সেক্রেটারিকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করায় বৃদ্ধার প্রতি ভৃত্যবর্গের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম অনেকখানি বাড়িয়া গেল।

কিন্তু প্রাসাদের এই ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরে বৃদ্ধার কিছুমাত্র তাক্ লাগিল না। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বৃদ্ধা লক্ষ্য করিল, মেঝের উপর আগাগোড়া কার্পেট মোড়া থাকিলে কি হইবে, সেই কার্পেটের প্রান্তে বিস্তর ধূলা জমিয়া রহিয়াছে—আলোর বৃহৎ ঝাড়েও ধূলার অভাব নাই। এত দাস-দাসী লোক-জন-সত্ত্বেও এ অপরিচ্ছন্নতা দেখিয়া বৃদ্ধার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধা দেখিল, এত-সব মূল্যবান আস্‌বাব—তবুও যেন ঘরের একটা

শ্রী নাই! বৃদ্ধা নিজের হাতে চিরদিনই গৃহমার্জ্জনা করিয়া আসিয়াছে—এখন পুত্রের ঐশ্বর্য্য হইয়াছে—মার সেবার জন্য পুত্র কোথাও কোন ত্রুটি রাখে নাই, তথাপি বৃদ্ধা এখনও নিজের হাতে কাজ-কর্ম্ম করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। তাই দুই-এক কথার পর সেক্রেটারির নিকট ভৃত্যদের এই সকল অবহেলা-ত্রুটির সম্বন্ধে অনুযোগ করিতে বৃদ্ধা ভুলিল না। সকলেই বুঝিল, বৃদ্ধা বেশ পাকা রকমের গৃহিণী বটে!

এমন সময় নবাবের পুরাতন ভৃত্য কাবাসু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধাকে সসম্মান অভিবাদন জানাইল। বৃদ্ধা প্রসন্ন স্বরে কহিল, "এই যে কাবাসু—ভাল আছ ত বাবা?"

এক-গাল হাসিয়া কাবাসু উত্তর দিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই আছি!"

"ছেলেরা কোথায় সব? কি করছে? সব ভাল আছে ত?"

"পড়ছেন। এখনই ছুটি হবে'খন। সবাই ভাল আছেন।"

"বার্ণার্ডের শরীর ভাল ত? কাজ-কর্ম্ম চলছে বেশ?"

"কৈ আর তেমন চলছে! তবে মোটা-মুটি খবর সব মন্দ নয়। থাক, আমি এখন আপনার খাবার যোগাড় করিয়ে দি—" কথাটা বলিয়া কাবাসু চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। বৃদ্ধা তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল, "থাক্ কাবাসু, কিছু ব্যস্ত হতে হবে না। আমার খাওয়া হয়েছে।"

ছেলেদের খপর দিই গে—বলিগে ঠাকুরমা এসেছেন।"

"না, না, তাদের পড়াশোনার ব্যাঘাত করে কাজ নেই! তোমার মা-ঠাকরুণ বুঝি ঘুমোচ্ছে?"

কাবাসু সে কথার উত্তর দিল না। একটু কান পাতিয়া সে কহিল, "ঐ যে ছেলেদের পড়া হয়েছে। তারা আসছে; তাদের পায়ের শব্দ পাচ্ছি। তারা এই দিকেই আসছে, বটে!"

সত্যই তাহারা আসিয়া পৌছিল। তিনটি সুস্থ সবল বালক—গায়ে গরম পোষাক, মাথায় নরম টুপি, পায়ে লাল মোজা—হাতে একটি করিয়া চামড়ার ব্যাগ। ছেলেরা আসিয়া এই নূতন আগন্তুকের পানে সবিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কাবাসু কহিল, "এঁকে চেন না,—ঠাকুরমা হন্ যে! তোমাদের দেখতে এসেছেন।"

ছেলেরা অবাক হইয়া বৃদ্ধাকে দেখিতে লাগিল। সাদাসিধা পোষাক, গ্রাম্য সরলতা-ভরা মুখ—ছেলেরা বৃদ্ধার পানে চাহিয়া আপনা হইতেই বুঝিতে পারিল, এই অপরিচিতা বৃদ্ধার হৃদয়ে স্নেহের নির্ঝর উৎসারিত রহিয়াছে—সে স্নেহ তাহারা ইচ্ছা করিলেই আকণ্ঠ পান করিতে পাইবে! কেমন এক বরাভয় নিশ্চিন্ত আশ্বাসে সে চোখের দৃষ্টি পরিপূর্ণ!

সেক্রেটারি আবার কথা কহিল, সে বলিল, "মাদাম্, আজ নবাবের এক মহা-দিন। মস্ত মিটিং। ডেপুটি হবার মিটিং। আজ এই সভায় নবাব তাঁর সমস্ত শত্রুকে

বৃদ্ধা সেক্রেটারির পানে ফিরিয়া চাহিল। সেক্রেটারি আবার কহিল, "শত্রুদের সংখ্যা কম নয়, আর ক্ষমতাও তাদের অনেকখানি। কিন্তু ভগবান নবাবের সহায়! আমাদেরই জয় হবে।"

এমন সময় এক কাফ্রী বালক আসিয়া সংবাদ দিল, ছেলেদের খাবার দেওয়া হইয়াছে। ছেলেরা বৃদ্ধাকে অভিবাদন করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল। অপর লোকজন চলিয়া গেলে ঘরে যখন শুধু বৃদ্ধা ও কাবাস্থ রহিল, তখন বৃদ্ধা কাবাস্থকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ যে মিটিংয়ের কথা সবাই বলছে—এ কি, কাবাস্থ? কেন?"

কাবাস্থ কহিল, "আজকে ভারী জাঁকালো সভা বসেছে—এই সভায় আজই স্থির হবে যে নবাব বাহাদুর কর্সিকার ডেপুটি হবেন কি না!"

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, কহিল, "এঁ্যা,—এখনও ডেপুটি হয়নি! সে কি! আর আমি যে সকলকে বলে আসছি, সে ডেপুটি হয়েছে—তবে গে, আজ মাসখানেক হল আমি সাঁতে রোমানের পথে বাঁধা রোশনাইয়ের বন্দোবস্ত করেছিলুম। তাহলে সকলকে আমি মিথ্যা কথা বলেছি এতদিন—?"

কাবাস্থ তখন অনেক কথা কহিয়া বৃদ্ধাকে বুঝাইল যে একমাস পূর্ব্বে নবাবের নাম শুধু ডেপুটি পদপ্রার্থীর তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, আজ পার্লামেণ্ট মহাসভায় সকলের মত সংগ্রহ করিয়া তবে ডেপুটি নির্ব্বাচনের পালা সারা হইবে।

শুনিয়া বৃদ্ধা কহিল, "তাহলে আমার বার্ণার্ড এখন কোথায়? সেই সভায়?"

কাবাস্থ কহিল, "হাঁ, মাদাম।"

"মেয়েরা সেখানে যেতে পারে? তাদের বসবার বন্দোবস্ত আছে, সেখানে? তোমার মাঠাকরুণ তবে সেখানে যায়নি যে! তার স্বামীর এত বড় একটা ব্যাপার আর বৌমা সেখানে যায়নি? এদিনে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে কাছে পাবার জন্য তার যে বড় ইচ্ছে হবে। আয় কাবাস্থ, তুই আমায় সেখানে নিয়ে চল্। আমি এখনই সেখানে যেতে চাই। সে কতদূর?"

"এই কাছেই। এতক্ষণে সভা বসে গেছে, বোধ হয়। তবে আমার যাওয়া হবে না। এখনি বৌমা ঘুম থেকে উঠবেন! তা ছাড়া আপনার ত সেখানে যাবার টিকিট নেই।"

"নাই থাকল! আমি বলব, আমি জাঁনুলের মা! এ শুনলে আমায় ঢুকতে দেবে না? আমি সেখানে গিয়ে সব শুনতে চাই, দেখতে চাই।"

হায়, বেচারী মা—! সে জানে না, সেখানে গিয়া সে কি দেখিবে, কি শুনিবে!

কাবাস্থ কহিল, "তাহলে একটু অপেক্ষা করুন—আমি এখনই সঙ্গে লোক দিচ্ছি।"

"কাকেও সঙ্গে দিতে হবে না—তুমি খালি বলে দাও, বাড়ীটা কোন্ দিকে। আমি এখনই ঠিক যাব'খন।"

কাবাস্থ কহিল, "কিন্তু তাঁর শত্রুরা সেখানে তাঁর নামে ঢের কলঙ্ক, ঢের অপবাদ রটাবে!"

"রটাক। তাতে কিছু এসে যাবে না। আমার ছেলে কি মানুষ, সে আমি যেমন জানি তেমন ত আর কেউ জানে না। যার যা খুসি বলুক আমি তাকে একটুকু

হঠব না! তবে আমি চল্লুম, কাবাস্থ।” মাথায় টুপি তুলিয়া বৃদ্ধা বাহির হইল।

খানিকটা পথ গিয়া বৃদ্ধা দেখিল, এক প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে লোকজন ও গাড়ীঘোড়ার ভারী ভিড়! সকলেই ব্যস্ত ভাবে চলাফেরা করিতেছে। মুখে বিকট গাম্ভীর্য্য—লোকগুলা যেন কি এক বিপুল সম্ভাবনায় উদ্‌গ্রীব চঞ্চল হইয়া নড়িতেছে, ফিরিতেছে! বৃদ্ধা সেই বাড়ীর ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল—তারপর দ্বারীকে আপনার পরিচয় দিলে সে একটু সরিয়া বৃদ্ধাকে পথ ছাড়িয়া দিল।

ভিতরে বিস্তীর্ণ হল—সজ্জিত, লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য চেয়ার জুড়িয়া সারা পারির লোক বসিয়া গিয়াছে। সকলেরই মুখে একটা কৌতূহলের অধীর আগ্রহ। বৃদ্ধা আসিয়া দ্বিতলে একটা চেয়ারে স্থান সংগ্রহ করিয়া বসিল। আশে-পাশে দুই-চারিজন লোক নবাবের নাম লইয়া রঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছিল। বৃদ্ধার সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। নীচেকার সেই উত্তাল জনতরঙ্গ ভেদ করিয়া পরিচিত একখানা মধুর মুখের সন্ধানে সে তখন ব্যস্ত ছিল। ঐ যে ঐ একধারে চেয়ারে বসিয়া জাঁস্থলে। হর্ষের এক চঞ্চল স্রোতে বৃদ্ধার বুক আলোড়িত হইল। জাঁস্থলে অত কি গভীর চিন্তায় মগ্ন? আজ এ বিপুল সমারোহ তাহারই উদ্দেশ্যে—এমন উৎসব-প্রাচুর্য্যের মধ্যে বার্ণার্ডের এত কি ভাবনা মাথায় আসিল? তবে কি ভাবনার কোন কারণ আছে!

লোক ঠেসাঠেসি ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া আছে, আর নবাবের পার্শ্বে কেহ বসে নাই কেন? তাহার পার্শ্বে চারি-পাঁচখানা চেয়ার একেবারেই শূন্য। যেন অস্পৃশ্য কুষ্ঠ-রোগীর ন্যায়ই সকলে জাঁস্থলেকে দূরে রাখিয়া বসিয়াছে। কেন এ সতর্কতা?

নীচে তখন কি কতকগুলা বক্তৃতা হইতেছিল। বৃদ্ধা সেগুলা ঠিক বুঝিতে পারিল না। কতকগুলা হিসাব-নিকাশের কথা—টাকাপয়সার প্রসঙ্গ। বৃদ্ধা সুগভীর স্নেহদৃষ্টিতে পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল। আহা, মার এ প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে তোর সকল বাধা সকল বিঘ্ন মুছিয়া যাক, বাছা!

সহসা বক্তা থামিয়া বসিয়া পড়িল। ঘণ্টা বাজিল। আর একজন লোক বক্তৃতা করিতে উঠিল। সে ভীষণ জনতা মুহূর্ত্তে স্থির হইয়া বসিল। একটু পূর্ব্বে কোলাহলের এই যে একটা মিশ্র গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছিল, নিমেষে তাহা থামিয়া গেল। বৃদ্ধাও কি এক সম্ভাবনার আশায় বক্তার পানে কৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিল।

তাই ত—লোকটা ও কি বলে! বার্ণার্ডের নাম করিল, না! বৃদ্ধা জীর্ণ মনের সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল। লি মার্কার প্রকাণ্ড খাতা খুলিয়া রিপোর্ট পড়িতেছিল। বৃদ্ধার চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে কখনও পুত্রের কখনও বা বক্তার পানে ঘড়ির কাঁটার মতই ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। বক্তা নানা জটিল রহস্যের বিবরণী দিতেছিল, তারপর বলিল, আইনের প্রতি এতটুকু সম্ভ্রম নাই—প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র, অত্যাচারের

দৃষ্টান্তেরও অভাব ছিল না! ভাড়া-করা গুণ্ডার মত এখন দেশের বুকে চাপিয়া বসিয়া লোকের রক্ত শুষিয়া খাইতে চাহে! বক্তা উচ্ছ্বাসের আবেগে কহিল, "হাঁ, ভদ্র-মহোদয়গণ, দেশের লোকের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে।"

কথাগুলা যেন বাজের মতই শুনাইল। বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, বিস্ফারিত নেত্রে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ কাহার কথা বলিতেছে! কে গুণ্ডা—দেশের রক্ত কে শুষিয়া খাইতে চায়?

লি মার্কার বলিল, "এখন আমার একটি প্রশ্ন আছে—আপনারা বুঝিয়া সে প্রশ্নের মীমাংসা করুন। চিরদিন দস্যু-তস্করের দলে যে মিশিয়া বেড়াইয়াছে, দেশের নাড়ীর সহিত যাহার কিছুমাত্র যোগ নাই, তেমন একটা লোক আজ দেশের বুকে বসিয়া দেশের দণ্ডমুণ্ডের একজন কর্ত্তা হইতে যায়! থাকিবার মধ্যে আছে তাহার টাকা! টাকায় সে সকলের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে, স্বীকার করি। কিন্তু সে টাকা কোথা হইতে কেমন করিয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে, আপনারা তাহার কোনো সন্ধান রাখিয়াছেন কি? সে টাকা যত মূর্খ নির্ব্বোধকে ঠকাইয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে। এ টাকা সে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে, চুরি করিয়া আনিয়াছে—হাঁ, ভদ্র-মহোদয়গণ, এ টাকা চোরের টাকা—বাটপাড়ের টাকা! আপনারা আজ তাহার টাকার জমক দেখিয়া দেশের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য ভুলিবেন না। তাহার উপর যখন দেখিতেছেন ...

তাহার প্রবঞ্চনা-বৃত্তি শোধরায় নাই। নির্লজ্জের মত এখানে বসিয়াও দিব্য সে লোক ঠকাইবার ব্যবসায় সুরু করিয়াছে। আপনারা বোধ হয় বুঝিয়াছেন, আমি কোন্ ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছি। যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে স্পষ্টই খুলিয়া বলি।

"আপনারা কি ঐ কর্সিকার নূতন কোম্পানির সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিয়াছেন? শূন্য খনি আর আগাছার জঙ্গলের অবস্থাটা স্বচক্ষে কেহ দেখিয়া আসিয়াছেন কি? এই সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এমন কি কেহ নাই, যিনি ঐ কোম্পানির শেয়ার কিনিয়াছেন? তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইতে কয়টা টাকা ঘরে ফিরিয়া পাইয়াছেন? সে কোম্পানির কার্য্যই বা কতদূর অগ্রসর হইল? বিজ্ঞাপনের চমক লাগাইয়া এই যে ব্যক্তি দেশের লোককে ঠকাইতেছে, সেই আজ কর্সিকার ডেপুটি-পদের প্রার্থী; সুখের বিষয়, এ কারবার-সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট হইতে তদন্তের আদেশ হইয়াছে। তখনই সকল সংবাদ আপনারা ওজন করিয়া বুঝিয়া পাইবেন! কিন্তু এইখানেই ইহার শেষ নহে! আরও একটা কথা আছে—

"এই লোকটি ভাবে, টাকায় সব পাওয়া যায়। দেশ-নায়কের বিবেক অবধি ক্রয় করিতেও সে পশ্চাৎপদ নহে, এতখানি তাহার ধৃষ্টতা! তাহার উপর সে একজন জেল-ফেরত আসামী—দাগী লোক! সে আজ বহু বৎসরের কথা—এই জাঁসুলে জেলে গিয়াছিল। তাহার প্রমাণও আমি

লি মার্কার তখন বার্ণার্ডের রুগ্ন ভ্রাতার সমস্ত কলঙ্ক ভাল করিয়াই তাহার গায়ে লেপিয়া লেপিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে ধরিতে লাগিল। বিপুল জনতা রুদ্ধ নিশ্বাসে সব কথা শুনিয়া যাইতেছিল—সহসা তাহার মধ্য হইতে এক রমণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "সাবাস! সাবাস!" সে নারী ব্যারণেস হেমারলিঙ।

শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধার আপাদ-মস্তক এক বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। আর জাঁস্বলে? এতক্ষণ নতমুখে সে বসিয়াছিল—শেষের এই অপবাদগুলা শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দুইটা বাঘের চোখের মতই তখন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

লি মার্কারের বক্তৃতা তখনও শেষ হয় নাই। সে বলিতেছিল, "এখন আপনারা বলুন, এমন লোককে আপনারা কৌন্সিলে বসিতে দেখিলে কি সুখী হইবেন? গর্ব্বে আপনাদের বুক ভরিয়া যাইবে? দেশে কি আর দ্বিতীয় যোগ্য ব্যক্তি নাই? যদি না থাকে, তবে কর্সিকাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সাগর-গর্ভে ডুবাইয়া দিন, কোন ক্ষোভ থাকিবে না।"

লি মার্কার উপবেশন করিল। জন-তরঙ্গে তখন সমালোচনার একটা অস্ফুট কাকলী উঠিয়াছে! নানা তর্কের মৃদু সঙ্কেত! স্পষ্ট কিছু বুঝা যায় না। সেই অস্ফুট কাকলীর মধ্যে নবাব তাঁহার বিপুল দেহ লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন—ললাট ঘর্ম্মাক্ত। নবাব গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ—"

নবাবের পানে চাহিয়া দেখিল। একজন উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "নবাবের জবাবটা এখন শোনা যাক্—কি বলে!" বৃদ্ধা বিস্ফারিত নেত্রে পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

রুমালে ললাটের ঘাম মুছিয়া একবার কাশিয়া নবাব কহিলেন, "আমি আমার নির্ব্বাচন সমর্থন করিবার জন্য কিছু বলিতে চাহি না। আপনাদের ইচ্ছা না হয়, আমায় নির্ব্বাচিত করিবেন না, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইব না। কিন্তু ঐ শেষের অপবাদ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। আমাকে জেলফেরত আসামী, দাগী বলা হইয়াছে এবং লি মার্কার তাহার প্রমাণ অবধি আপনাদের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। এই অপবাদ-সম্বন্ধেই শুধু একটি কথা আমি বলিতে চাই। কেন না, আমার নিজের নাম, বংশ ও সন্তানদের মঙ্গলের জন্যও সকল কথা প্রকাশ করা সঙ্গত এবং তাহা আমার কর্ত্তব্য।

"ভদ্রমহোদয়গণ, চুরি বাটপাড়ি করিয়া এ টাকা, এ ঐশ্বর্য্য আমি সংগ্রহ করি নাই। যে যাহা বলে বলুক—কিন্তু আমার মত যদি কেহ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া আপনার সাধের জন্মভূমি হইতে বহুদূর দেশে গিয়া শরীর খাটাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে তিনিই বুঝিবেন, আমার সে কষ্ট, সে পরিশ্রমের মূল্য কি! কিন্তু সে কথার প্রয়োজন নাই—সে কথা আমি এখানে তুলিতেও চাহি না।

করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। এ অপবাদ একেবারে মিথ্যা। আপনারা একটু কষ্ট করিয়া যদি সন্ধান লন তবে সহজেই দেখিতে পাইবেন, যে, যে সময় পারিতে জাঁস্লে নামে এক ব্যক্তির জেল হয়, সে সময় আমি বিদেশে ছিলাম। আরও দেখিবেন, আমার নাম বার্ণার্ড জাঁস্লে—কিন্তু জেলফেরত জাঁস্লের নাম লুই।"

সহসা নবাবের কণ্ঠরোধ হইল। কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইবার সময় চকিতের জন্য দ্বিতলের একটা আসনের উপর নবাবের দৃষ্টি পড়িল—তাঁহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল। ও যে মা! নবাব থপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—আর একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

চকিতে তাঁহার মনের মধ্যে ঝড় বহিয়া গেল। বলার আর বাকী কি রহিল। এমনই স্বার্থপর কুপুত্র সে, যে কথা মা জানিতেন না—যে কথা জানিবার তাঁহার সম্ভাবনাও ছিল না, সেই কথা হঠাৎ কি এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে জাঁস্লে বলিয়া ফেলিলেন! হায়, তুচ্ছ পদ গর্ব্বের লোভে মার মনে আজ তিনি কতখানি আঘাত দিলেন! শত চেষ্টা করিয়া আবার তিনি উঠিলেন, কহিলেন, "আমায় ক্ষমা করিবেন। ইহার অধিক আর আমি বলিতে পারিব না। বলিবার শক্তি বা অধিকারও আমার নাই। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ও অপবাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—ও কলঙ্ক হইতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।"

জন-সঙ্ঘ সহসা নিষ্ঠুর বাধা পাইয়া বিষম বিচলিত হইয়া উঠিল। নবাবের করুণ উক্তিতে যাহাদের একটু সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইতেছিল, তাহারাও বিরক্ত হইল। এমনই কোলাহল-বিড়ম্বনার মধ্যে বজ্রের মত সভাপতির বাণী ধ্বনিয়া উঠিল, "বার্ণার্ড জাঁস্লের নির্ব্বাচন নামঞ্জুর।"

একটি মাত্র কথা! কিন্তু একটা লোকের জীবন যেন সে কথার ধারে কাটিয়া ছিঁড়িয়া গেল।

উপরে বসিয়া জাঁস্লের মাতা অবাক হইয়া গেলেন—এ কি—! লোকজন চলিয়া যাইতেছে যে! চারিদিকে ছত্রভঙ্গ ব্যাপার! দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ণ হল খালি হইয়া গেল। বার্ণার্ডও উঠিয়া যায় যে! ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া বৃদ্ধা পার্শ্ববর্ত্তিনী এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হল কি? সব উঠে যাচ্ছে যে?"

"নবাব হেরে গেল—ডেপুটি হল না।"

"হল না!" বৃদ্ধার বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল। তাহার মুখ পাণ্ডু হইয়া গেল। কোনমতে সম্মুখের রেলিঙে ভর দিয়া বৃদ্ধা আপনাকে পতন হইতে রক্ষা করিল;—তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, পা কাঁপিতেছিল। তার পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বৃদ্ধা সব বুঝিয়া লইল। পুত্র কি কথা বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিল না? বলিতেছিল, কিন্তু তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র থামিয়া গেল। পুত্র শুধু মাতার জন্য এতখানি স্বার্থত্যাগ করিল! আপনার ভবিষ্যৎ—আপনার সকল সাধ সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বচ্ছন্দে এত বড় কলঙ্কের কালি মুখে মাখিয়াই সে বসিয়া রহিল! বৃদ্ধা মুহূর্ত্তে বুঝিল, হতভাগা লুই শুধু নিজের সর্ব্বনাশ

করিয়াই ক্ষান্ত হয় নই—তাহার অমন ভাইয়েরও সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইল! বৃদ্ধার মনে হইল, এই এতগুলা লোককে দাঁড় করাইয়া নিজে সে একবার সব রহস্য সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া বলে! একজন ছেলে খারাপ বলিয়া সে অপমান প্রকাশ হইবার ভয়ে আর একজনের উপর অবিচার করিবে, এমন প্রাণ তাহার নহে। ইহা সে চাহেও না—কোথায় বার্ণার্ড? আসুক সে—মমতার কোন প্রয়োজন নাই! সত্য কথা খুলিয়া সে বলুক—এ মিথ্যা অপবাদ তাহার মাথায় বহিবার কোন প্রয়োজন নাই! মাতার প্রাণে আঘাত বাজিবে, বাজুক! এ ত্যাগ মা হইয়া পুত্রকে সে কখনই মাথায় তুলিতে দিবে না!

বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া আসিয়া একজনকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল, বার্ণার্ড? নবাব,—আমার ছেলে?"

লোকটা কহিল, "এই যে, আপনিই তাঁর মা? তিনি আমায় পাঠালেন, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি গাড়ীতে আছেন। আসুন।"

বৃদ্ধা তাহার সহিত নীচে নামিয়া আসিল। বাহিরের দালানে তখনও বহু লোক দাঁড়াইয়া গল্প-গুজব করিতেছিল—নবাবের নামে হাসি-ঠাট্টাও বেশ চলিতেছিল। একজন বলিল, "কিন্তু বলতে বলতে অমন হঠাৎ থেমে গেল কেন?"

আর একজন হাসিয়া কহিল, "বুঝলে না? একটা কথা বলা সহজ—তারপর ঐ প্রমাণ-পত্র যে লি মার্কারের হাতে—তাই আর কি চেপে গেল।"

বৃদ্ধার মাথা চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। সে তীব্র স্বরে কহিল, "না, তা নয়। শুনুন আপনারা তবে, আমি বলছি—আমি তার মা—বার্ণার্ডের মা—আমি সব কথা খুলে বলছি। আমার দুই ছেলে,—বার্ণার্ড ছোট, বড়র নাম লুই।" বৃদ্ধা সহসা দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া লি মার্কার। সে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই যে—আপনিই ত অত কথা বলছিলেন—বার্ণার্ডকে অত দোষ দিচ্ছিলেন। শুনুন, আমি তার মা—আমার দুই ছেলে,—বার্ণার্ড আর লুই। এই লুই প্রথম বয়সে—"

লোকগুলা বিদ্রূপের একটা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধা কাতরভাবে কহিল, "ওগো তোমরা একটু দাঁড়িয়ে শুনে যাও। একটু শোন, না হয় তাকে ডেপুটি নাই করলে! তা বলে একজন নিরীহ নির্দ্দোষ লোকের উপর অন্যায় অবিচার করো না—"

কিন্তু হায়, এ যে অরণ্যে রোদন! এ যেন ঘোড়দৌড় প্রভৃতির ন্যায়ই ভিতরে এতক্ষণ একটা খেলা চলিতেছিল—খেলা ভঙ্গে তেমনই লঘু চিত্তে শিষ দিতে দিতে সকলে ঘরে ফিরিতেছে! অথচ নিষ্ঠুর সব, জানে না যে, এই খেলায় তাহার প্রিয়তম তাহার অমন গুণের পুত্র বার্ণার্ডের কি দারুণ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে—তাহার বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! বৃদ্ধার মনে হইল, ভগবান কি নাই—এ পাপের শাস্তি কি তিনি দিবেন না?

এমন সময় নবাব আসিয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা, এসো বাড়ী এসো।"

বৃদ্ধা ঝাঁপাইয়া পুত্রের বুকে মুখ লুকাইল—ফুঁপাইয়া কোনমতে বলিল, "কেন তুমি সব কথা খুলে বললে না, বাবা? কেন এ কলঙ্ক মেখে বসে রইলে? সব খোয়ালে যে।"

নবাব ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কিছু খোয়াই নি মা। কিছু চাই না মা—আমি। কলঙ্ক? দিক্ কলঙ্ক ওরা—আমার মার কোল আছে—সেখানে আমার প্রচুর শান্তি জমা রয়েছে। আমার কি সর্ব্বনাশ হবে? কিছু না! তুমি বাড়ী এসো।"

নবাব মাকে টানিয়া লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। মাকে মুখে সান্ত্বনা দিলে কি হইবে, বুক তাঁহার ফাটিয়া যাইতেছিল। গাড়ী চলিলে মার বুকে মাথা রাখিয়া ছোট শিশুর মতই মৃদু কণ্ঠে নবাব ডাকিলেন, "মা, মা আমার—" সে স্বরে বুক-ভাঙ্গা বেদনা যেন উছলিয়া উঠিতেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাতিদান

(রুস গল্পলেখক আন্তন শেখভ্ হইতে)

সাসা স্মারনভ, তার মায়ের 'সবে-ধন-নীলমণি!' খবরের কাগজে কি-একটি জিনিষ মুড়িয়া বগলদাবা করিয়া সে নামজাদা ডাক্তার কোসেল্কফের রোগী-দেখিবার-ঘরে গিয়া ঢুকিল।

ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে ছোক্‌রা, খবর কি? আজ সকালে তুমি কেমন আছ?"

সাসা'র চোখ মিট্-মিট্ করিয়া উঠিল। বুকের উপরে একহাত রাখিয়া, বাধো-বাধো গলায় সে বলিল, "আপনি আমাদের যে উপকারটা করেচেন সেজন্যে মা আপনার কাছে বড়ই ঋণী আছেন। মায়ের আমি একছেলে। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন!"

ডাক্তার খুসী হইয়া সদয় স্বরে বলিলেন, "আহা, থাক্—থাক্! ও-সব কথা আর তুল্‌তে হবে না! আমার জায়গায় অন্য কেউ এলে যা কর্‌ত আমি শুধু তাই করেচি বৈ ত নয়!"

সাসা বলিল, "মায়ের আমি একছেলে। আমরা ভারি গরিব ডাক্তার সায়েব! আপনার 'ভিজিটে'র টাকা ঠিক দিতে পারিনি বলে আমরা বড়ই লজ্জিত। তবে,——মা আপনাকে একটি জিনিষ ভেট্ পাঠিয়েছেন। এটি হচ্চে অষ্টধাতুর পুতুলঅলা বাতিদান, বাজারে এখন আর এ কিন্‌তে মেলে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "না, না—তোমাদের ভেট্-'টেট্' আর কিছু দিতে হবে না।"

সাসা মোড়কটি খুলিতে-খুলিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “সে কি হয় ডাক্তার-সায়েব! তাহলে আমরা বড় দুঃখিত হব। আমার বাবার সেকালকার জিনিষ-পত্তর কেনার বাতিক ছিল কিনা! তাই এটিকেও তিনি কিনেছিলেন। এ-বড় দুর্লভ রত্ন ডাক্তার-সায়েব, বড় দুর্লভ রত্ন!”

সাসা মোড়ক খুলিয়া জিনিষটি গর্ব্বিত ভাবে টেবিলের উপরে রাখিল। ডাক্তার দেখিলেন, সেটি একটি সুন্দর বাতিদান—চমৎকার কারিগরী! দুটি নগ্ন রমণীর মূর্ত্তি বাতিদানটি কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মূর্ত্তিদুটির চোখে-মুখে দুষ্টামিভরা হাসি। তাদের ভাবগতিক দেখিলে মনে হয়, বাতির ভার বহিতে তারা যেন নেহাৎ নারাজ;—এমন-কি, তারা দুটিতে যেন, যে-কোন-মূহুর্ত্তে মাথার উপর হইতে বাতিদানটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, এমন এক বিষম অভদ্র নাচ সুরু করিয়া দিতে পারে, যার কথা ভাবিতে গেলেও লজ্জায় মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠে!

পুতুলদুটির দিকে অনেকক্ষণ কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, ডাক্তার আস্তে-আস্তে দু-চারবার কাশিয়া ও কান চুল্‌কাইয়া বলিলেন, “হুঁ, পুতুলদুটিতে যে খুব ভাল কারিগরী আছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু—কিন্তু—বুঝ্‌চ হে ছোক্‌রা—কিন্তু—”

সাসা কহিল, “আপনি কি বল্‌চেন?”

ডাক্তার বলিলেন, “বল্‌চি কি জান? সয়তানও বোধহয় এমন বিদ্‌কুটে পুতুল গড়্‌তে পারে না। এ বাতিদানটা কি করে আমি টেবিলে সাজিয়ে রাখি?”

সাসা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, “বলেন কি ডাক্তার-সায়েব! আপনার সঙ্কোচ কিসের? এ যে আর্ট! দেখুন না এতে কি সৌন্দর্য্য! একেবারে পৃথিবীকে ভুলে যেতে হয়! এর মাপ্‌জোক কেমন নিখুঁত, খোদ্‌কারীর হাত কি সাফ্‌, পুতুলদুটির চেহারাই বা কি জলজ্যান্ত!—”

ডাক্তার বলিলেন, “হুঁ, হুঁ, সে সব আমিও বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌চি। তবে কি-জান বাপু, আমি বিবাহিত পুরুষ, আমার ঘরে ভদ্রমহিলারা আর ছেলেপুলেরা হামেসাই আসা-যাওয়া করে থাকে।”

সাসা বলিল, “হ্যাঁ, আপনি যে চোখে দেখ্‌চেন, সে চোখে দেখলে এ-রকম উঁচুদরের আর্টেও খারাপ ভাব পাওয়া যায় বটে! কিন্তু, ডাক্তার-সায়েব, আপনার মত শিক্ষিত লোক অসভ্য চাষা-ভুষোর মত হলে চল্‌বে কেন? বুঝ্‌চেন ত, আপনি যদি আমাদের এ সাধের উপহারটি ফিরিয়ে দেন, তাহলে মায়ের আর দুঃখ রাখবার ঠাঁই থাক্‌বে না। মায়ের আমি একছেলে,—আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।”

ডাক্তার বলিলেন, “আচ্ছা, আচ্ছা,—আমি এ উপহার নিলুম। তোমার মাকে আমার ধন্যবাদ জানিও।”

সাসা খোস্‌-মেজাজে ডাক্তারকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার একলা-একলা বসিয়া বাতিদানটার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দু-চারবার কান চুল্‌কাইলেন। খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন।

“হুঁ, এটা নিশ্চয়ই খুব উঁচুদরের আর্ট।

একে ফেলে দেওয়াও বোকামির কাজ, অথচ এখানে রাখাও বেজায় মুস্কিল! আচ্ছা, এটাকে অন্য কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে হয় না?"

হঠাৎ প্রাণের বন্ধু উকিল ঔকফের কথা ডাক্তারের মনে উদয় হইল। সে তাঁর কাজ করে, অথচ টাকা দিতে গেলে নেয় না।

"ঠিক! সে বিয়ে করেনি, সুতরাং এমন উপহার পেলে নিশ্চয়ই সে কোন আপত্তি-'টাপত্তি' করবে না!"

ডাক্তার আর একটুও সময় নষ্ট করিলেন না। ভাল করিয়া বাতিদানটা কাগজে মুড়িয়া তিনি সোজা তাঁর বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলেন।

"সুপ্রভাত, বন্ধু! আজ তোমার জন্যে একটি উপহার এনেছি। আমার কাজে তুমি যখন টাকা-কড়ি কিছু নাও না, তখন এ উপহারটি না নিলে তোমায় কিছুতেই ছাড়্‌চি না!"

বাতিদানটা দেখিয়া ঔকফ একেবার অবাক ও মোহিত হইয়া গেলেন।

"কি ভয়ানক কল্পনা! অথচ কি সুন্দর! বাঃ বাঃ! কোত্থেকে এটা পেলে হে?"

"তোমাকে দিলুম।"

অসোয়াস্তির সঙ্গে দরজার দিকে চাহিয়া একটা ঢোক্ গিলিয়া, ঔকফ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "মাপ কর ভায়া, আমি তোমার উপহার নিতে পার্‌লাম না! এটাকে শীগ্‌গির এখান থেকে সরিয়ে ফেল।"

ডাক্তার যেন আকাশ থেকে পড়িয়া

"কি-জান? আমার মা এখানে আসেন, মক্কেলেরা আসে, চাকর-বাকরেরা আসে, ওটা কি এখানে সবার সুমুখে ফেলে রাখা যায়? সরিয়ে ফেল, জল্‌দি সরিয়ে ফেল!"

একসঙ্গে হাতনাড়া ও মাথানাড়া দিয়া ডাক্তার বলিলেন, "না ভাই, না! এটা ফিরিয়ে দিলে আমি ভারি দুঃখিত হব। তোমার লজ্জা কিসের?—এ তো আর্ট! এর প্রতি তুমি অবিচার কোর না।"

"সব ত বুঝ্‌চি। কিন্তু পুতুলদুটোতে যদি কাপড়-পরানো থাক্‌ত, তাহলেও বরং—"

কিন্তু ঔকফের কথা শেষ হইবার আগেই ডাক্তার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন। এই বিষম আর্টের বোঝা ঘাড় হইতে নামাইয়া, ডাক্তার যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

ঔকফও ডাক্তারের মত একলাটি বসিয়া অনেকক্ষণ বাতিদানটার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দু-চারবার সেটাকে আষ্টে-পিষ্টে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করা উচিত!

"খুব উঁচুদরের আর্ট বটে! একে ফেলে দেওয়াও যায় না, রাখাও চলে না। আচ্ছা, এটা কারুকে গছিয়ে দিতে পার্‌লে ত বেশ হয়! ঠিক্! স্মাস্‌কাইন থিয়েটার করে, আজ তার সাহায্য-রজনী—বিশেষ, এরকম জিনিষ সে খুব ভালবাসে!"

ঔকফ আর দেরি করিলেন না। বাতিদানটা কাগজে মুড়িয়া লইয়া, কোনদিকে না চাহিয়া তিনি একেবারে স্মাস্‌কাইনের

উপহার দেখিয়া স্ভাস্‌কাইন ভারি খুসি! সেদিন তাঁহার ঘরে যত বন্ধুবান্ধব আসিলেন, সবাই মিলিয়া বাতিদানের কি তারিফটাই যে করিলেন! কিন্তু এই হাসি-ঠাট্টা-হট্টগোলের মাঝখানে যখন একজন অভিনেত্রী আসিয়া হঠাৎ দরজায় ঘা মারিলেন, স্ভাস্‌কাইন তখন চমকিয়া তড়াক্‌ করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখ শুকাইয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

দরজার পিছন হইতে মহিলাটিকে উদ্দেশ করিয়া ব্যস্তভাবে তিনি বলিলেন, "এখন ভেতরে এসনা গো, এসনা! আমি কাপড় পর্‌চি।"

সে রাতে, অভিনয়ের পর বাড়ীতে ফিরিয়া স্ভাস্‌কাইন উপহারটির দিকে তাকাইয়া, ঘন ঘন মাথা চুল্‌কাইতে সুরু করিলেন।

"তাইত, কি মুস্কিল! এখানে যখন-তখন অভিনেত্রীরা এসে থাকেন, অতবড় জিনিষটাকে টপ্‌ করে যে টানায় পুরে ফেল্‌ব তারও যো নেই। এটাকে ফেলে দিলেও লোকে আমাকে বদ্‌রসিক ঠাওরাবে,—এ যে আর্ট!"

তাঁহার জামা খুলিয়া দিতে-দিতে চাকর পরামর্শ দিল, "আচ্ছা, তার চেয়ে এটা বিক্রী করে ফেলুন না! বাজারে একটা বুড়ো স্ত্রীলোক আছে, সে এ-রকম জিনিষ কেনে-বেচে,—তার দোকানে এটা পাঠালে হয় না?"

তাহাই হইল। স্ভাস্‌কাইন তখন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

দুদিন কাটিয়াছে। ডাক্তার কোসেল্‌কফ আরাম-কেদারায় বসিয়া-বসিয়া আপনমনে এটা-সেটা ভাবিতেছেন।

হঠাৎ দরজাটা দুম্‌ করিয়া খুলিয়া গেল! সাসা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল,—তার ঠোঁটের পাশ দিয়া হাসি যেন উপ্‌ছাইয়া পড়িতেছে!

খবরের কাগজে মোড়া একটা জিনিষ টেবিলের উপরে যত্নভরে রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ডাক্তার-সায়েব! বড় সুখবর! আমাদের আর ছিল না বলে, আপনাকে একটা বাতিদানই দিয়েছিলাম। আজ বাজারের এক স্ত্রীলোকের দোকান থেকে ঠিক অমনিধারা আর একটা বাতিদান কিনে এনেছি। এইবারে আপনার যোড়া মিল্‌ল ডাক্তার-সায়েব! মায়ের আমি এক ছেলে,—আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন!"

কি আপদ! হতভম্ব ডাক্তার হাঁ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। তিনি কথা কহিতে গেলেন,—পারিলেন না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

অন্ধকারের কথা

হে সূর্য্য! ইদানীং কিছুদিন হইতে আলোর গৌরবে তোমার আর মাটিতে পা পড়িতেছেনা, আলোর সহিত চারিদিকে দারুণ দাম্ভিকতা বিকীরণ করিতেছ এবং গুটিকতক মূঢ় লোকে অবাক হইয়া ভক্তিভরে সেই আলোকের বিকাশলীলা দেখিতেছে। কিন্তু আমাদের সনাতনী সান্দ্রতামসী সভার প্রতিনিধিস্বরূপ আমি তোমারই আলোকে দাঁড়াইয়া তোমাকে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে জানাইতেছি যে, আমরা তোমাকে মানিনা; —তোমাকে স্বীকার করিনা। তোমার ভক্তেরা বলিতেছে—"দশদিক কি আলোর পদ্মের মত বিকশিত হইয়া উঠিতেছেনা?—বনরাজী কি সঙ্গীতে মুখরিত হয় নাই?—সদ্যবিকশিত অযুত ফুলের ঘনসৌরভ-ভারে বাতাস কি মন্থরতা লাভ করে নাই?" মূঢ় তোমরা! তাই প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতেছ! আলো ও প্রাণের অজস্র লীলা থাক্ বা না থাক্ তাহাতে কারো আসে যায় না—এ বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ আপ্তবাক্য। আমাদের সভার দীর্ঘতমা ঋষির স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট দেখাইতে পার কি যে তুমি সূর্য্য? তাহা না পারিলে তোমাকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করিব না। তোমার সঙ্গে আলো, প্রাণ ও গানের লীলা কতকটা জড়িত হইয়া আছে তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু আমরা বলি তাহা কেবলমাত্র অভিনয়—-ইন্দ্রজাল—-ম্যাজিক—-হিপ্নটিসম্ অথবা আর কিছু। আজ যদি পৃথিবীতে সত্যযুগ বিদ্যমান থাকিত কিম্বা তুমি ও আমরা যদি তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিতাম তাহা হইলে এই আলোবিকীরণের অপরাধের জন্য তোমার নিমিত্ত যে অভিনব দণ্ডের ব্যবস্থা করিতাম তাহার তুলনায় Bruno প্রভৃতির দণ্ড ছেলেখেলা মাত্র। কিন্তু ঘোর কলি কাজেই—!

তোমার আলো হয়তো কোনও রূপে ক্ষমা করিতে পারিতাম, হয়তো জবা-কুসুমসঙ্কাশং বলিয়া দু একটি বচনও তোমার সম্বন্ধে আওড়াইতে পারিতাম কিন্তু তোমার বুদ্ধির দোষে সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলে। সমুদ্রপারে ম্লেচ্ছদের দেশ—যেখানে যাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের নিষেধ এবং যেখানকার অধিবাসীদিগের প্রতি নির্জ্জলা বিদ্বেষ আমাদের নব্যশাস্ত্রের বিধি—সেখানে আলো ছড়াইতে কে তোমাকে সাধিয়াছিল? ইহাতে যে তোমার আলোর জাতি গিয়াছে সে সংবাদ রাখ কি? আমাদের দলের সূচীভেদ্য orderএর বড় বড় Knightরা এ সম্বন্ধে বৈঠক করিয়া প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন—তোমাকে একঘরে করা হইবে। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের খেয়াল হইল তাহাতে কোনও ফল হইবে না;—তোমাকে একঘরে করার নির্ম্মল আনন্দ হইতে স্বয়ং ভগবানই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন;—তোমাকে এমন দারুণ একঘরে করিয়া

সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহা ভাবিতে গেলে আমাদেরই কষ্ট হয়। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে কাহারও সহিত কাঁধে কাঁধে মিলিবেনা— এ কি কম শাস্তি? এ সংসারে গাধা, গোরু, গ্রন্থকার—এমন কি বাঙলা কাগজের সম্পাদক পর্য্যন্ত সকলেরই তুল্য-মূল্য লোক আছে—পাল আছে, তোমারই নাই। তোমাকে এমনই হেয় করিয়াই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন—এমনি নিঃসঙ্গ, এমনি একাকী। সে যাহা হউক, তোমার ভক্তেরা যে তোমার আলোকের এত গৌরব করিয়া থাকে তাহা তাহাদের অর্ব্বাচীনতা মাত্র।

আলোকের কি কোনও মূল্য আছে? উহা চঞ্চল, হাল্‌কা—একেবারে বস্তুশূন্য। তোমার সমস্ত সৌরজগতের সমস্ত জ্যোতিষ্কের সকল আলো কুড়াইয়া ওজন করিলে এক ছটাকও হয় কি না সন্দেহ! আমাদের দলের ক্ষুদ্রতম অর্ভকের মস্তিষ্ক কোটরে যেটুকু অন্ধকার আছে তাহার ভারেই পৃথিবী টল্‌মল্‌ করিয়া উঠে। তাহা ছাড়া আলোকটা নিতান্তই হঠাৎ নবাব —upstart; আমাদের অন্ধকারের মত সনাতন বনেদী নহে। আর এটুকুও তোমার জানিয়া রাখা উচিত—তোমার আলো যতই শুভ্র হোক তাহা একেবারে পবিত্র নহে। কোনও রূপে গোময় লিপ্ত করিয়া একটু শুদ্ধ করিয়া লইলে তাহা হিন্দুর ব্যবহারে লাগিলেও লাগিতে পারিত। এ সম্বন্ধে একবার আমাদের বৈঠক বসিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল আমাদের দলপতিদিগের মধ্যে যাহার মাথায় গোময় ও অন্ধকারের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাকে কোনও রূপে ঊর্দ্ধে স্থাপন করিতে পারিলে গোময় ও অন্ধকার বর্ষণ হইয়া তোমার আলোকের দোষ অনেকটা কাটিতে পারে। নানারূপ যন্ত্র-সহকারে তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবার জন্য রীতিমত চেষ্টাও করা হইয়াছিল কিন্তু এমনই গুরুভার যে কিছুতেই মাটি হইতে বেশী ঊর্দ্ধে তুলিতে পারা গেল না—সমস্ত গোময় ও অন্ধকার কেবল আমাদেরই মাথার উপরে পড়িতে লাগিল;—আলোকের লীলা যেমন চলিতেছিল, চলিতে থাকিল। যাহা হউক, আমরা একেবারে নিরাশ হই নাই; —আমাদের জ্যোতিষী-মহোদয় বিশেষ যন্ত্র-সহকারে গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারের অন্তে স্বরোচিষ মনুর অধিকার, তদন্তে তামস মনুর আবির্ভাব—তাহার পরমায়ু পঞ্চ পরার্দ্ধ যুগ; —তাহার পর কৃষ্ণ-গোকল্প প্রবর্ত্তন হইলে ভূলোকের একেবারে গোলোক-প্রাপ্তি ঘটিবে। ততদিন পর্য্যন্ত আলোকের অধিকার ও তোমার প্রভাব থাকিবে—তার পর আর নয় সময় কিছু দীর্ঘ বটে কিন্তু আশায় আশায় চোখ-কান বুজিয়া এক রকমে কাটিয়া যাইবে। এস ভাইসকল, আমরা সেই শুভদিনের আগমনের জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হই এবং যথাসাধ্য ভূলোকের গোলোক-প্রাপ্তিসম্বন্ধে সাহায্য করি! বাঢ়ম্‌।

শ্রীতোতারাম শর্ম্মা শাস্ত্রী এম, এ।

চয়ন

জার্ম্মানীর তিন মহারথ

জার্ম্মানীর আধুনিক সাহিত্যের এই তিনজন প্রতিভাবান লেখকের নাম এখন সাহিত্য-সমাজের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছে,—সুডারম্যান, ভন্ ওম্পটেডা ও গাংঘোফার। তিনজনেই শক্তিধর ও প্রথম শ্রেণীর লেখক এবং তিনজনের রচনার ভিতরেই এতটা স্বাতন্ত্র্য আছে যে, তাঁহাদিগকে কিছুতেই একজাতীয় লেখক বলিয়া মনে হয় না।

এই তিনজনের মধ্যে সুডারম্যানই সমধিক ক্ষমতাবান, সমধিক নির্দ্দোষ ও সমধিক বাস্তববাদী। তাঁহার রচনাপাঠে পাঠকগণের প্রাণমন একেবারে মোহিত হইয়া যায়। ভন্ ওম্পটেডার রচনা বিশ্লেষণ-প্রধান এবং মনোবিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ। তিনি আমাদিগকে ধাপে-ধাপে আগাইয়া লইয়া যান এবং পরিণামে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির কার্য্যকারণ-প্রণালী আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। তাঁহার প্রতি গল্পের আখ্যান-বস্তু ও চরিত্র-চিত্রণ নূতন—লিখন-ভঙ্গী ও রচনা-পদ্ধতির সাদৃশ্য ছাড়া উহাদের ভিতরে আর কোন সাদৃশ্য নাই।—এই বৈচিত্র্য-সৃষ্টিতেও ওম্পটেডার নিপুণ মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লিখন-ভঙ্গী পরিষ্কার ও সংযত এবং স্থানে স্থানে তাহা স্বপ্নের মত মিহি কবিত্বের আভাস প্রদান করে—সুডারম্যান বা গাংঘোফারের সঙ্গে এদিকেও তাঁহার কিছুমাত্র মিল নাই। গাংঘোফার 'রোম্যান্স'-সৃজনে সিদ্ধহস্ত এবং তিনজনের মধ্যে প্রকৃতি-বর্ণনায় তিনি সমধিক কৌশলী ও ওস্তাদের শিরোমণি। সুডারম্যানেও কবিত্ব আছে—কিন্তু সে অন্য রকমের।

সুডারম্যানের এক-একটি গল্প এতটা বিয়োগান্ত ও বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ যে, দ্বিতীয়বার তাহা পাঠ করিতে মন সরে না। আবার, করুণ ও বিয়োগান্ত হইলেও তাঁহার কোন কোন গল্পের এমন মোহিনী শক্তি আছে যে, বারংবার পাঠ করিয়াও আমাদের চিত্ত-ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয় না।

তাঁহার "Dame Care" গল্পটিতে কেবলই জীবন-সংগ্রামের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত। উপন্যাসের চেয়ে সত্য যে আশ্চর্য্য, সুডারম্যানের এই গল্পটিতে তাহা জাজ্জ্বল্যমান। লেখকের আত্মপরিবারের জীবন-সংগ্রামের সত্য কাহিনীই Dame Care-এর আখ্যান-বস্তু।

It was নামে উপন্যাসখানির রচনা-প্রণালী এতদূর সুন্দর এবং তাহা এমন খণ্ড-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ যে, তাহার যে-কোন একটি পরিচ্ছেদ মাঝখান হইতে খুলিয়া পড়িতে বসিলেও উপভোগের এতটুকু ব্যাঘাত হয় না। পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার সম্ভ্রান্ত-বংশীয় গ্রাম্য ব্যক্তিবর্গের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা এবং সেখানকার সহজ মানুষের সরল হৃদয়গুলি এই উপন্যাসে নিখুঁত-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার চরিত্র-

গুলিও অত্যন্ত চিত্তরঞ্জক। তরুণী Herthaর চরিত্র-চিত্রণ একেবারে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ এবং পড়িতে পড়িতে ইহাই মনে করিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, রমণীর দুর্জ্জ্ঞেয় মনটিকে পুরুষেও এমনভাবে বুঝিতে পারে! এ বিষয়ে সুডারম্যানের প্রতিভা গেথের সমকক্ষ।

তের বৎসর আগে সুডারম্যানের John the Baptist নামক বিয়োগান্ত উপন্যাসখানি, প্রুসিয়ার সর্ব্বত্র, সর্ব্বসাধারণের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ভাষার উপরে কাব্যের যে ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব! সুডারম্যান এই পুস্তকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, মতের সংকীর্ণতা ও বিবেকের কঠোরতা অপেক্ষা দুর্নীতিমূলক প্রেমও অনেক উচ্চ, অনেক শ্রেষ্ঠ।

সুডারম্যানের রচনা ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনুবাদে মূলের রস ও ভাষার মাধুর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ভন্ ওম্পটেডা, তাঁহার একখানি উপন্যাসে দেখাইয়াছেন, একজন হতভাগ্য ভাস্কর নৈরাশ্য ও অভাবের হাহাকারে কেমন করিয়া অবশেষে চোর ও হত্যাকারীতে পরিণত হইয়াছিল। এই উপন্যাসের সমগ্র সৌন্দর্য্য ভাস্করের পত্নীর চরিত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ভাস্কর, আপন সহধর্ম্মিণীকে আদর্শ করিয়া একটি প্রতিমা গড়িতেছিল। কিন্তু পাষাণী প্রতিমাকে প্রাণময়ী করিয়া তুলিবার জন্য তাহার সকল সাধনা ব্যর্থ

একরাত্রে ভাস্কর, পত্নীর কাছে আপনার হত্যাপরাধের কাহিনী খুলিয়া বলিল। হত্যার কারণ বুঝিয়া সাধ্বী পত্নী অনায়াসে স্বামীকে ক্ষমা করিয়া বসিল। অনুতাপী ভাস্করের দৃষ্টি তখন খুলিয়া গেল, সে দেখিল তাহার পত্নীর হৃদয় তো পাষাণের নয়, প্রেমের মাধুর্য্যে তাহা কি কোমল, কি উদার!

সারারাত ধরিয়া ভাস্কর সকল ভুলিয়া প্রতিমা গড়িতে লাগিল। ভোরবেলায় সে বিচারকের হাতে আত্মসমর্পণ করিল।

কিন্তু সাধনার মুকুল আজ পুষ্পিত। প্রতিমার পাষাণ-নেত্রে আজ জীবন ফুটিয়াছে, পাষাণময়ী প্রতিমা আজ প্রাণময়ী! এতদিন ভাস্কর শুধু পত্নীর রক্ত-মাংসের রূপ দেখিতেছিল, তাই সে জীবনের সাড়া পাইতেছিল না; কিন্তু আজ সে আদর্শের মধ্যে হৃদয়-সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে।

যাঁহারা উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার বিচিত্র লীলা দেখিতে ভালবাসেন, গাংঘোফারের রচনা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবে। তাঁহার উপন্যাসের অনেক ঘটনা চিত্তোত্তেজক ও একটু অস্বাভাবিক।

তাঁহার কোন কোন উপন্যাস একবার পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না এবং একেবারে শেষ লাইনে গিয়া হাজির না হওয়া পর্য্যন্ত নায়ক-নায়িকার অদৃষ্ট যে কোন্ পথে ফিরিবে, তাহাও আন্দাজ করিতে পারা যায় না। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি সাধারণত সাধুপ্রকৃতির। এমন কি, তাঁহার উপন্যাসের যে চরিত্রগুলি অত্যন্ত অসৎ ও হীন, তাহাদের ভিতরেও

গাংঘোফারের রচনায় আমরা রৌদ্রোজ্জল আল্পস-পাহাড়ের বার্ত্তা পাইয়া থাকি। সেখানকার কৃষকদের স্বভাবসরল জীবন, আকাশের প্রদীপ্ত নীলিমা, স্বর্ণশ্রী রৌদ্রে ঝলসিত অনন্ত তুষার-প্রান্তর, সবুজ পত্রের অবিরাম মর্ম্মর-গান, গভীর বনানীর অতুল রহস্য শ্রী, স্বাধীন পাখীর নির্ভয় কাকলি, মাতাল বাতাসের এলমেলো হা-হা হাসি, অস্তসূর্য্যের জ্বলন্ত চিতা, সাগরের উপর প্রভাতের প্রথম আবির্ভাব,—প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব শব্দগন্ধস্পর্শের মধ্যে আসিয়া আমরা কাব্যলোকের এক মায়াময় স্বপ্নদৃশ্যের ভিতরে ডুবিয়া—আরও ডুবিয়া যাই!

গাংঘোফার, জীবনের অধিকাংশ কাল গিরিশ্রেণীর ছায়ায় ছায়ায় এবং স্তব্ধ অরণ্যের নির্জ্জনতার মধ্যে সাধনা-সমাহিত থাকিয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য, প্রকৃতির সকল বৈচিত্র্য এবং স্বভাবের দুলাল কৃষকদের সরল জীবন তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। বসন্ত ও শরৎকালটা এই বিজনতার ভিতরে তিনি একাকী থাকিতেন; কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাঁহার নির্জ্জন ভবন অতিথিদের সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তখন তিনি স্ত্রী-পুত্র ও বন্ধুবান্ধব লইয়া আনন্দ-হাস্যে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিতেন। রাত্রিই তাঁহার রচনার নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। দিনের বেলাটা অতিথিদের মনোরঞ্জনে, গল্পস্বল্পে, শীকারে ও বংশীবাদনে পরমসুখে কাটিয়া যাইত।

আমরা এখানে জার্ম্মানীর তিন সাহিত্য-রথীর রচনার মূল কথাগুলির ইঙ্গিত দিলাম মাত্র; যাঁহারা তাঁহাদের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চান, এই সামান্য ইঙ্গিত তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে।

The Simmons Magazine হইতে।

জাপানী বালুকা-চিত্র

সমুদ্রের ধারে ছেলেমেয়েরা বালির খেলাঘর গড়ে আর ভাঙ্গে; ভাঙ্গে আর গড়ে। বয়স্ক লোকেরা এ-সব ছেলে-খেলা পছন্দ করেন না। আর, বালি ছড়াইয়া যে 'আর্ট' ফলানো যায়, এ কথা তাঁহারা জানেনও না।

কিন্তু, জাপানীরা এই বালুকা-স্তূপকে কাজে খাটাইয়াছে। সেখানে Bon-seki বা Bon-kei নামে একরকম আর্ট আছে, তাহাতে বালির পটে আঁচড় কাটিয়া

জাপানী-শিল্পীরা সমুদ্র-তটে গিয়া ছবি আঁকিতে বসিয়া যান না। কালো বার্ণিশ-করা একখানি থালার উপরে জাপানী শিল্পী বালী আর নানান্ আকারের ছোট পাথরের টুক্‌রা ছড়াইয়া দেন। তারপর একটি পালক বা কাটি লইয়া, থালার বালুকণা ও পাথর-কুচিগুলি সুকৌশলে নাড়িয়া-চাড়িয়া সাজাইয়া দেন,—আর অমনি থালার উপরে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক

কুয়াশার খেলা বা এমনি আর-কিছু ভোজবাজীর মত ফুটিয়া ওঠে!

জাপানীদের এই অদ্ভুত চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি নূতন নহে,—আজ প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া তাহারা এইরূপ চিত্রাঙ্কণ করিয়া আসিতেছে। মুরাতা সুকো নামে একজন জাপানী বৌদ্ধ-পুরোহিত সর্ব্বপ্রথমে এই Bon-seki-র আর্ট আবিষ্কার করেন। Bon মানে বারকোস্ ও seki মানে পাথর। মুরাতা সুকোর সময়ে বারকোসে পাথর বিকীর্ণ করিয়াই ছবি আঁকা হইত। তাঁহার শতবৎসর পরে জাপানের একজন সম্ভ্রান্ত লোক পাথরের টুকরার সঙ্গে বালির কণাও ব্যবহার করিতেন। সেই সময় হইতেই পাথর-কুচির সঙ্গে বালুকণার ব্যবহারও চলিয়া গেল।



"অশান্ত সাগরের উপরে শান্ত শশী"

আমরা এখানে একখানি ছবির নমুনা দিলাম। ইহার নাম,—"অশান্ত সাগরের উপরে শান্ত শশী।"—অবশ্য, এই নমুনায় আসলের কোন রূপই ফুটে নাই,—কেবল তাহার আভাস আছে মাত্র।

The Strand Magazine হইতে

প্রাচীন মিশর

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্থির করিয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সভ্যতার মুখ দেখিয়াছে—মিশর। গত কুড়িবৎসর ধরিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের দিবারাত্র পরিশ্রমের ফলে, প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে যে-সকল খবর বাহির হইয়াছে, তাহা উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক।

মিশরের অতীত সভ্যতাকে দেখিবার জন্য কল্পনাকে যদি সারথী কর, তাহা হইলে সে তোমাকে ছয় হাজার বৎসর

আগেকার এক উন্নত প্রাচীনতার মধ্যে লইয়া যাইবে!

৪২৪১ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে, প্রাচীন মিশরের জ্যোতিষীগণ সর্ব্বপ্রথমে বৎসরকে তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই ৪২৩১ খৃঃ পূঃ শতাব্দীটি কেবল যে মিশরের প্রথম তারিখ তাহা নহে;—ইহার আগে পৃথিবীতে যে কাল-নিরুপণের জন্য আর কোন সাল-তারিখ ছিল, আজ পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহা প্রথম ঐতিহাসিক বৎসর।

ঐ বৎসরের আগে ক্রমোন্নত সভ্যতার কি বিচিত্র ইতিহাস লুকানো আছে! সেকালের অলিখিত কাহিনী আর কখনও জানা যাইবে কিনা,—কে জানে?

নেপোলিয়ান যখন ইজিপ্ট আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার একজন সেনাপতি, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রোসেটা নামক স্থানে খোদাই-করা বিখ্যাত কৃষ্ণ প্রস্তরের ফলক আবিষ্কার করেন। লিপি তিন ভাষায় লেখা হইত। এই আবিষ্কারের পর হইতেই মিশরের ইতিহাসের দিকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি ভাল করিয়া আকৃষ্ট হয়।

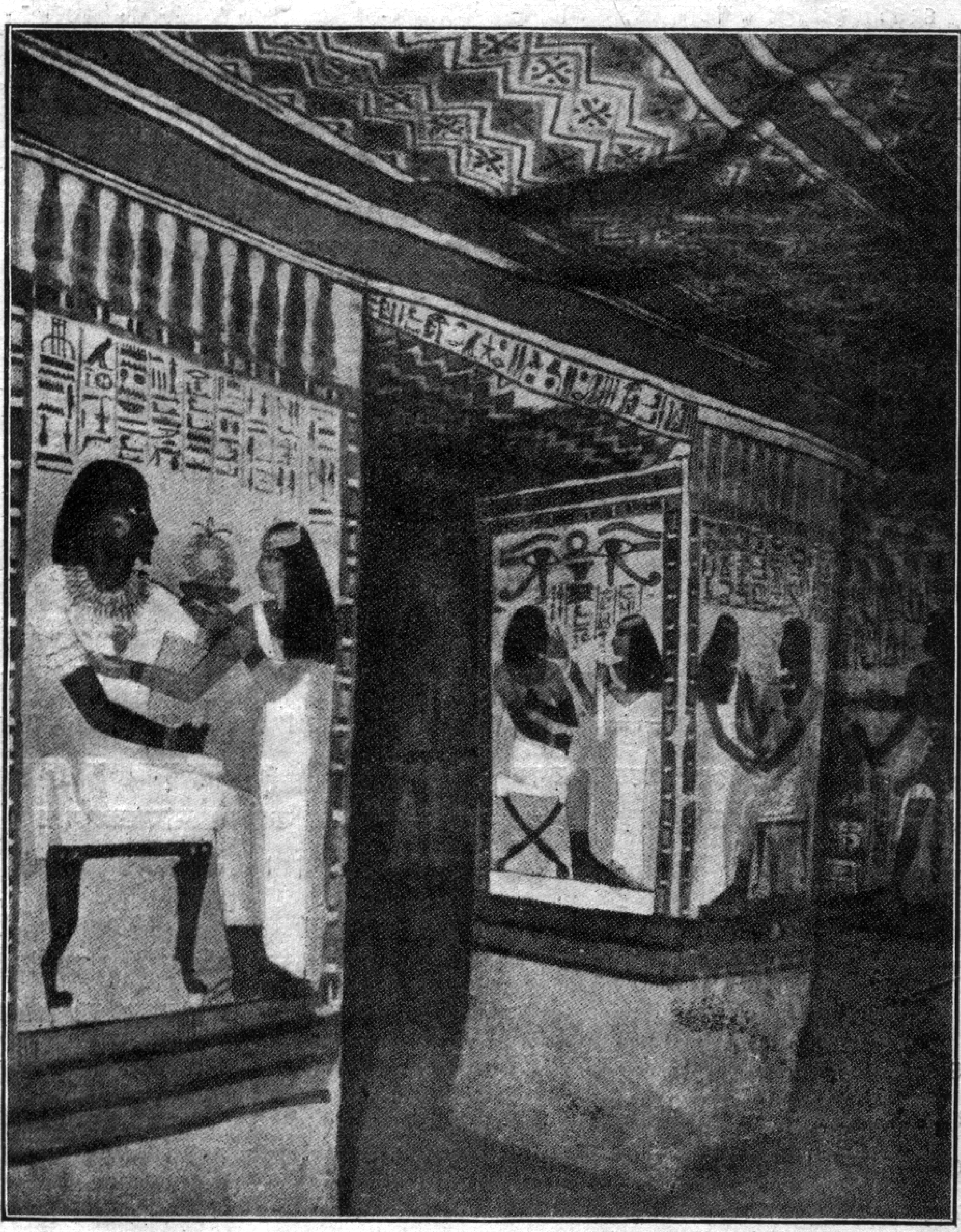
বাড়ী তৈয়ারি করিবার জন্য খিলান ও থামের আবিষ্কার মিশরেই সর্ব্বপ্রথমে হয়। গ্রীকরা যখন সভ্যতার আলোক দেখে নাই, মিশরবাসীরা তখন হইতেই ভাস্কর-কার্য্যে সুদক্ষ। মিশরেই প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মিত হয়। মানব-জাতির মধ্যে গভর্মেণ্ট, আইন-কানুন ও বিচার-পদ্ধতির ব্যবস্থা মিশরবাসীরাই করেন। মিশর হইতে য়ুরোপ ভাষার বর্ণমালা, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, মিশর-বাসীদের হৃদয়েই সকলের আগে ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হয়। জগতের সর্ব্বপ্রথম কাব্য ও কথা-সাহিত্য প্রাচীন মিশরেই রচিত হইয়াছে।* রমণী যে পুরুষের চেয়ে হীন নন, পুরুষের সহিত রমণীর যে সমান অধিকার,—মিশরই সর্ব্বপ্রথমে এই বাণী উচ্চারণ করেন।

প্রাচীন মিশরবাসীর উৎপত্তি কোথায়? এ বিষয় লইয়া এখনও বিচার-বিতর্কের অবসান হয় নাই। কপ্ট্ নামক জাতির যে হাজার-সাতেক লোক এখনও উত্তর ইজিপ্টে দেখা যায়, পণ্ডিতগণের মতে তাহারাই মিশরের আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। প্রাচীন মিশরবাসীর যে-সকল প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মুখাকৃতি ও দৈহিক গড়নের সঙ্গে আধুনিক কপ্ট্-জাতীয় ব্যক্তিগণের আকারের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। ঐ সাদৃশ্য হইতেই এই সিদ্ধান্ত।

মিশরবাসীরা মরুভূমির অসভ্যগণের সহিত আপনাদের পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য আপনাদিগকে "মানুষ" বলিতেন।

প্রাচীন মিশরের নাম ছিল 'কেম' বা 'কেমি'—অর্থাৎ 'কৃষ্ণদেশ'। আগে সমগ্র দেশটি দুভাগে বিভক্ত ছিল,—উত্তর ও দক্ষিণ ইজিপ্ট। পঞ্চাশ শতাব্দী পূর্ব্বে ইজিপ্টের আদিম বাসিন্দারা যত টাকার 'টেক্স' দিতেন, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে

* এই প্রসঙ্গে এই সংখ্যার ৬০৯ পৃঃ মুদ্রিত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মিশরী কবিতার অনুবাদ দ্রষ্টব্য।



প্রাচীন মিশরের এক সমাধিভবনের দেওয়ালে অঙ্কিত ছবি

ইংরাজ-শাসনে আসিয়াও এখানকার বর্ত্তমান অধিবাসীরা ঠিক তত টাকাই রাজকর দেন!

মেনিথো নামে এক পুরোহিত খৃঃ পূঃ ২৬১ অব্দে মিশরের প্রথম রাজবংশাবলী রচনা করেন। এই বংশাবলীর ইতিহাস সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক না হইলেও এখন পর্য্যন্ত প্রধানত এই ইতিহাসের সাহায্যেই পণ্ডিতগণের আলোচনা চলিতেছে। এই রাজ-বংশাবলী হইতে রাজাদিগের একটি ঠিক শ্রেণীবদ্ধ শৃঙ্খলা বা তাঁহাদের কার্য্যাবলীর বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না,—অনেক রাজা কেবল নামমাত্র সার হইয়াই আছেন।

আমরা এখানে প্রাচীন মিশরের এক-খানি ছবির নমুনা দিলাম। ইহার অঙ্কন-কাল খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ। রাজকুমার সেনোফারের শিলারচিত সমাধিভবনের দেয়ালে এই ছবিগুলি আঁকা আছে। ছবিগুলির প্রধান মূর্ত্তিদুটির একটি রাজকুমার সেনোফার এবং অন্যটি তাঁহার ভগিনী মেরিত্।

Munsey's Magazine হইতে

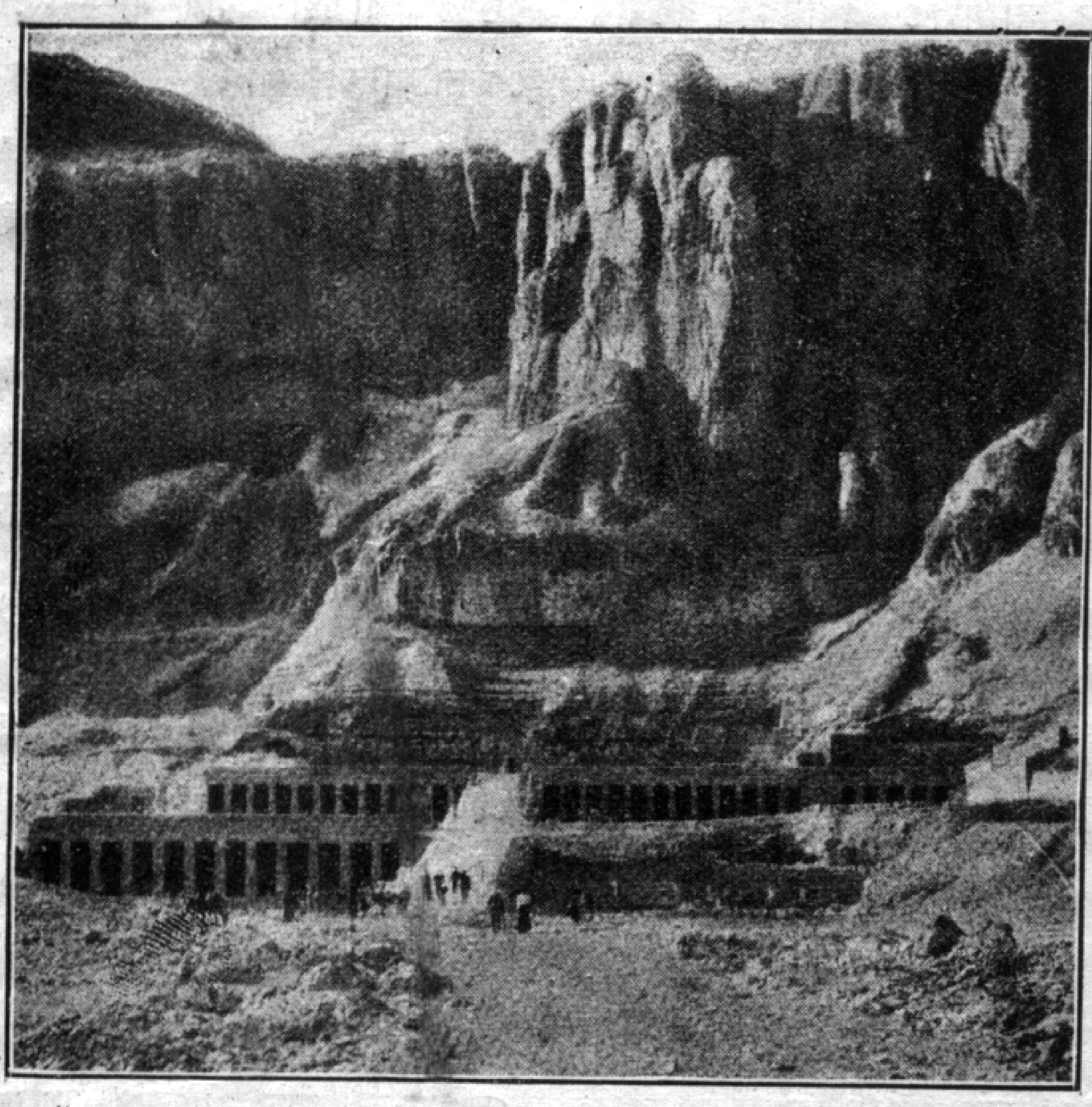
'মমি'র মাথা

ইজিপ্টের লুক্সর নামে সহরের কাছে সুপ্রসিদ্ধ থিব্‌সের প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের আগেকার শ্রী-ছাঁদ এখন আর কিছু নাই। আরবেরা সমাধি হইতে মমিগুলাকে বাহির করিয়া বালির উপরে টানিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে এবং মমির সঙ্গে যা-কিছু দামী জিনিষ-পত্র ছিল, সে-সমস্ত লুটিয়া লইয়াছে। মন্দিরেরও এখন ভগ্নদশা।

মিঃ জর্জ্জ এলফাউণ্ডার নামে এক ভদ্রলোক একদিন উটে চাপিয়া সস্ত্রীক এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মিঃ এলফাউণ্ডারের উট হঠাৎ হোঁচট্ খাইয়া তাঁহাকে পিঠের উপর হইতে ফেলিয়া দিল। ভূমিতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি দেখিলেন, উটের পায়ের কাছে কি-একটা কালো জিনিষ বালির ভিতরে আধঢাকা হইয়া রহিয়াছে। বালি সরাইয়া তিনি দেখিলেন, সেটা একটা মানুষের মমি। সমস্ত দেহটাকে বাড়ীতে লইয়া যাওয়া অসম্ভব দেখিয়া, এলফাউণ্ডার মমির মাথাটা ছুরি দিয়া কাটিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

বিলাতে ফিরিয়া আসিবার পর, মিঃ এলফাউণ্ডার নানারূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িতে লাগিলেন। তিনি যে কাজে, যে ব্যবসায়ে হাত দেন, তাহাতেই বিষম লোকসান্ হইতে লাগিল। তাঁহার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল, কিন্তু এখন তাঁহার দেহ হঠাৎ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মমির মাথাটা তখন তাঁহার সঙ্গেই ছিল। কিন্তু তাহার অস্তিত্বের কথা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় প্রেততত্ত্ব চর্চ্চা করিবার বাতিক ঢুকিল। কিছুদিন



থিব্‌সের মন্দির

খোঁজখবরের পর তিনি মিঃ ব্রেলি নামে একজন 'মিডিয়াম'কে পাইলেন।

একদিন চক্রে বসিয়া মিডিয়াম অচেতন অবস্থায় মিঃ এলফাউণ্ডারকে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে একজন আত্মা দেখা করতে চান। আমার দিকে একটি মূর্ত্তি আস্‌চে,—তার চারিদিকে ধূলার মেঘ! ওকি! মূর্ত্তির যে মাথা নেই—সে যেন কি বল্‌তে চাইচে।"

মিঃ এলফাউণ্ডার মিডিয়ামের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেদিন এই পর্য্যন্ত।

আরও কিছুদিন পরে শ্রীমতী গ্রেক্ নামে অন্য একজন মিডিয়াম লইয়া চক্রে বসিলেন। এলফাউণ্ডার বিস্মিত হইয়া শুনিলেন, গ্রেক্‌ও ঠিক আগেকার মিডিয়ামের মতই মুণ্ডহীন এক দেহের বর্ণনা করিতেছেন! মূর্ত্তিটি কোথায়? সে কথা জিজ্ঞাসা করায় মিডিয়াম বলিলেন, "উঁচু পাহাড়—নীচে বাড়ীঘর আর বালি।"

এ বর্ণনা ঠিক থিব্‌সের মন্দিরের মত!

এলফাউণ্ডার তাঁহার স্ত্রীর কাছে এই ব্যাপারের কথা বলিলেন।

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "কি মুস্কিল! তুমি যে মমির মাথাটা সঙ্গে করে এনেচ, এর সঙ্গে নিশ্চয়ই তার সম্পর্ক আছে!"

মিঃ এলফাউণ্ডার বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ কথাটা আমার মাথায় ত একেবারেই আসেনি! নাঃ—এ মমির মাথা আর কাছে রাখা নয়—যেখানকার

জিনিষ, সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হোক্।”

এলফাউণ্ডার, মমির মাথাটা তাঁহার এক ইজিপ্‌সিয়ান্ বন্ধুর কাছে পাঠাইয়া লিখিলেন যে, থিব্‌সের মন্দিরে একে যেন আবার কবর দেওয়া হয়।

কিন্তু, দৈবগতিকে মমির মাথা কবরস্থ না হইয়া ডাঃ 'এক্স' নামে একজন বিখ্যাত মিশরতত্ত্ববিদের হস্তগত হইল। ডাঃ 'এক্স' তাহার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন ঃ—

“এটি একটি যুবকের দাড়ি-গোঁফ-কামানো সুন্দর মুখ,—মাথায় ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল আছে, তাহা দেখিলে বোঝা যায়, এ মাথা যাহার, সে টলেমিদের রাজত্বকালের লোক। দাঁতগুলি এখনও সব ঠিক্‌ঠাক্ আছে। আকৃতিতে একে ইজিপ্‌সিয়ান্ বলিয়া মনে হয় না।” পরীক্ষার পর মাথাটি কবরস্থ করা হয়।

আর একজন কৌতূহলী লোক এলফাউণ্ডারের কথা শুনিয়া মিঃ ব্রেলিকে লইয়া আবার চক্রে বসিয়াছিলেন। মিড়িয়ামের মুখ দিয়া সেই সময়ে এই কথাগুলি পাওয়া গিয়াছিল ঃ—“আপনারা যে আমার মাথাকে কবর দিয়েছেন, এজন্যে আমি বড়ই সুখী। কিন্তু মাথাটিকে মন্দিরের ভিতরে কবর দেওয়া হয়নি—বাইরে দেওয়া হয়েছে। যিনি আমার মাথাটিকে মন্দিরের ভিতরে সমাধি দিতে পার্‌বেন, পৃথিবীতে তিনি যতকাল থাক্‌বেন, আমি তাঁকে সাহায্য কর্ব্ব। এককালে আমি থিব্‌সের মন্দিরের পুরোহিত ছিলাম। একবার অত্যন্ত নির্য্যাতন হওয়াতে আমি মন্দির ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হই; কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন আগে আবার মন্দিরে ফিরে আসি। আমার পিতা গ্রীক্ ও মা পারস্যের বাসিন্দা ছিলেন। আমি আবার আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি—মনে রাখ্‌বেন, ইজিপ্‌সিয়ানরা উপকার ভোলে না।” পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, মমিটি খৃঃ পূঃ ২,০০০ অব্দের।

এই ঘটনাটি যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণের বিশ্বাসের জন্য তিনি অনেক সন্তোষজনক প্রমাণ দিয়াছেন। আমরা সে প্রমাণগুলির আর তর্জ্জমা করিয়া দিলাম না।

The Wide World Magazine হইতে

সূর্য্য-ঘড়ী

সময়-নিরূপণের জন্য যত রকমের কল আজ পর্য্যন্ত তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার ভিতরে সূর্য্য-ঘড়ী সকলের চেয়ে পুরাতন। কিন্তু আজকাল সাধারণের মধ্যে ইহার চলন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। শুধু য়ুরোপে ধনীদের বাগানে, এখনও মাঝে মাঝে সূর্য্য-ঘড়ীর দেখা পাওয়া যায়।

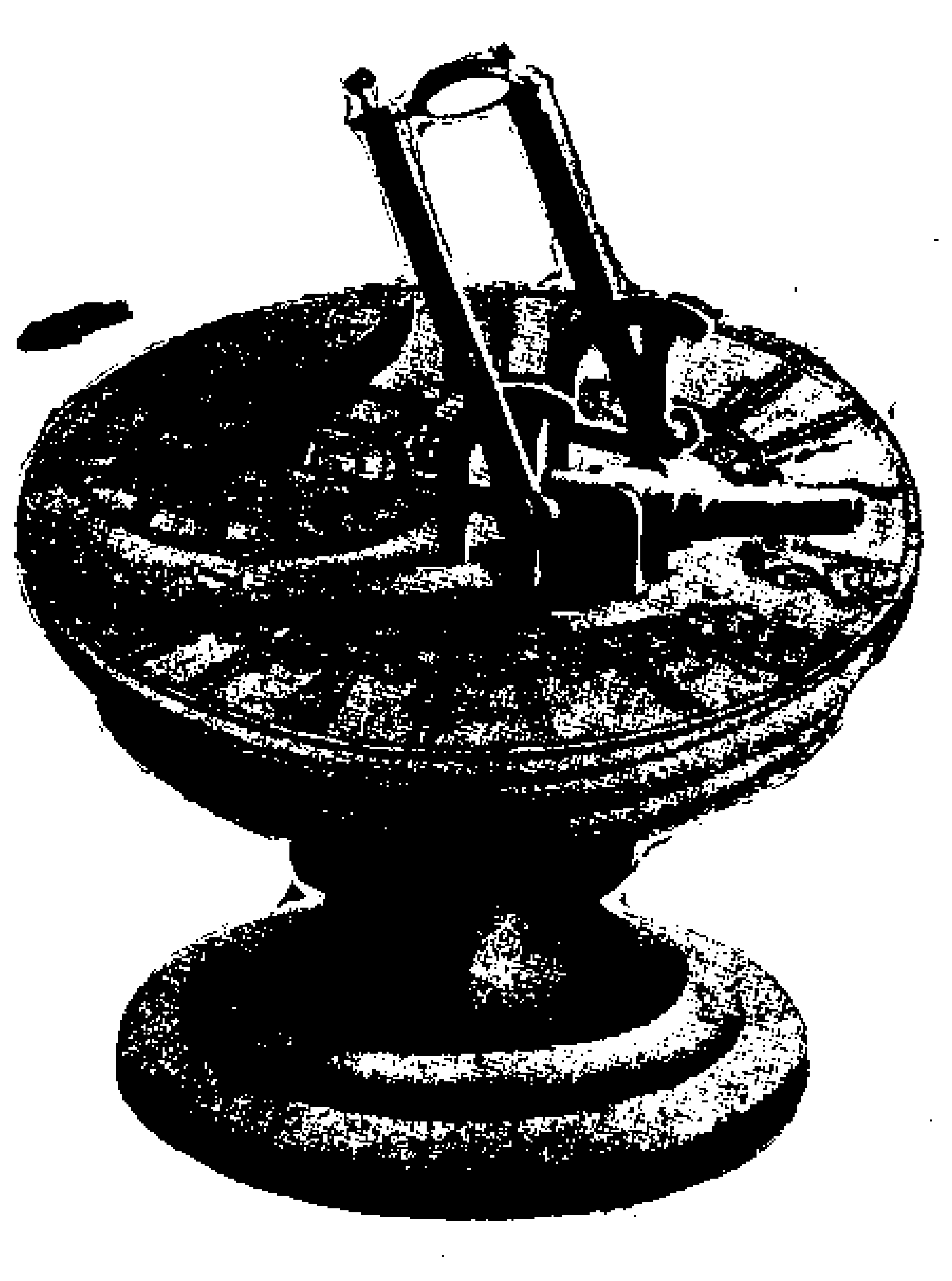
একথা ঠিক যে, আমরা এখন যেভাবে সময়-হিসাব করিয়া থাকি, সূর্য্য-ঘড়ীতে তাহা হয় না। জ্যোতিষীরা সূর্য্য-ঘড়ীর

নিরূপিত সময়কেই ঠিক বলিয়া ধরিয়া নেন, কিন্তু আমরা গ্রীণউইচ-সময় ধরিয়াই কাজকর্ম্ম করিয়া থাকি। গ্রীণউইচ-সময়ের সঙ্গে বৎসরের ভিতরে কেবল চারিদিনমাত্র সূর্য্য-ঘড়ী ঠিক সমান-সমান যায়। আর সকল দিনই সূর্য্য-ঘড়ী ও গ্রীণউইচ-সময়ের ভিতরে কয়েক সেকেণ্ড হইতে ষোল মিনিট পর্য্যন্ত এদিক-ওদিক হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা যদি সামান্য রকম অভ্যাস করি, তাহা হইলে এই পার্থক্যের জন্য আমাদের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না; এমন কি, তখন আমরা অনায়াসেই সূর্য্য-ঘড়ী দেখিয়াই, ঘণ্টার প্রতি সেকেণ্ডটি পর্য্যন্ত ঠিকঠাক বলিয়া দিতে পারিব। সংপ্রতি, বিলাতে মিঃ জি, জে, গিব্‌স্ নামে একজন জ্যোতিষী, "হেলিওক্রণোমেটার" নামক একরূপ নূতন সূর্য্য-ঘড়ী তৈয়ারি করিয়াছেন—যাহা বিংশ শতাব্দীর ব্যস্ততা-প্রধান জীবনেও, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও বোধগম্য।

ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম সূর্য্য-ঘড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়, খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে। জুডার রাজা Ahaz উক্ত সূর্য্য-ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র-প্রিয় চ্যাল্ডিয়ানবাই যে সে-যুগে সূর্য্য-ঘড়ী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পর হইতে গ্রীক্ ও রোম্যানরা যেরূপ সূর্য্য-ঘড়ী ব্যবহার করিতেন, তাহার নমুনা এখনও আছে। ৬৭০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত একটি সূর্য্য-ঘড়ী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, স্যাক্সনরাও এই যন্ত্র ব্যবহারে অনভিজ্ঞ ছিল না।

পিরাণিস্ পাহাড়ের চাষারা এখনও সূর্য্য-ঘড়ী দেখিয়া সময় নিরূপণ করে। কোন কৃষককে এই ব্যাপার লইয়া 'সেকেলে' বলিয়া ঠাট্টাতামাসা করাতে, একজন আমেরিকানকে সে বলিয়াছিল, "কোন মানুষের এমন সাধ্য নেই যে, সূর্য্য ও দিনের ঠিক সময়টি বলিয়া দিতে পারে; কারণ, সূর্য্য যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে সময় বলিয়াও কোন ব্যাপার থাকিত না। আমরা তাই সময়-নিরূপণের সময়ে সূর্য্যকে দেখিয়াই ঘড়ীর কাজ সারিয়া থাকি।" সভ্য আমেরিকান এই সামান্য কৃষকের উত্তর শুনিয়া একেবারে নিরুত্তর হইয়া গিয়াছিলেন।

কিছুদিন আগে, মরক্কোর সুলতানের ফরমাজে, বিলাতের এক ব্যবসাদার একটি চমৎকার ও নূতন আকারের সূর্য্য-ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এটি হচ্ছে কামানের ঘড়ী!



মরক্কোর সুলতানের সূর্য্য-ঘড়ী

এই পিতলে তৈয়ারি ঘড়ীটি ঠিক সময় রাখিতে পারে। ঘড়ীর উপরে একখানি আতসী কাঁচ এমনভাবে সাজানো থাকে যে, প্রতিদিন ঠিক দুপুরবেলা সূর্য্য-রশ্মি সেই কাঁচের ভিতরে কেন্দ্রীকৃত হইয়া বারুদভরা কামানের ছিদ্রে আগুন ধরাইয়া দেয়! অগ্নিসংযোগ হইবামাত্র কামানটিও গর্জ্জিয়া উঠিয়া মধ্যাহ্নকালের বার্ত্তা ঘোষণা করে। কিন্তু পুরাণো ইংরাজী বাগানের সূর্য্য-ঘড়ীগুলি আপনাদের শ্রী-ছাঁদে আর সব দেশকে হারাইয়া দিয়াছে। সেকালের এই ঘড়ীগুলির গায়ে যে-সকল বচন খোদিত থাকিত, তাহাদের সৌন্দর্য্যও বড় অল্প নয়। আমরা দু-চারিটির নমুনা দিলাম :—

১। অন্য সবাই ঝড়ঝাপ্টা আর বৃষ্টি-বাদলের কথাই বলুক্; আমরা শুধু তোমার রবিকরোজ্জ্বল ঘণ্টাগুলিকে গুণে গুণে যাব।

২। এই ঘড়ী কি বল্‌চে জানো?—

জীবন শুধু একটা ছায়া, মানুষ শুধু ধূলিমুষ্টি—আমরা মর্‌ব, সবাই মর্‌ব!

৩। আলো ও ছায়ায় গড়া এই জীবন! তবু—সূর্য্য কি মহান্ আর ছায়া কত ক্ষুদ্র!

৪। সময় চলে যায় আর ফুল ঝরে পড়ে। নতুন দিন, নতুন জীবন থাকে না—থাকে খালি প্রেম।

৫। এই ছায়া—এই আলো; তবু সদাই ভালবেস!

৬। কি বল্‌ছ—সময় যায়? হায়, সময় থাকে, যাই কেবল আমরা।

৭। জাগো, ওগো, জাগো—ওগো অলস, জাগো! চেয়ে দেখ 'বর্ত্তমান' যে 'অতীত' হয়ে গেছে!

৮। রজনী এল গো, রজনী এল!

Pearson's Magazine হইতে

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

আফ্‌তাব্

(এই কবিতাটি খৃষ্ট-জন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরে রচিত)

নয়নাভিরাম নভোতলে প্রভু! তোমার আবির্ভাব,
হে সঞ্জীবন! সংজ্ঞাসাধন! আত্মন্! আফ্‌তাব্!
তুমি জীবন্ত জীবনের আদি, তুমি আদি-অনুভব,
তোমার-অভাবে আঁধার ভুবন, শবের মতন সব;
ঘরে ঘরে হায় লুটায় মানব বসনে আবৃত দেহ,
আঁখি-তারা থির বিবশ শরীর কারেও পুছে না কেহ!
তোমার নয়ন মুদিত যখন সেইক্ষণে জাগে পাপ,
সিংহ সে আসে হিংসা করিতে দংশিতে ওঠে সাপ।

তোমার আভাসে হাসে দশদিক্ হরষিত বসুমাতা,
ক্ষুধিত ধেনু সে হেরে তৃণভূমি সঞ্চরে লতাপাতা;
হংস সারস প্রণতি জানায় উঁচু ডানা দুটি জুড়ে,
পা আছে যাহার ওঠে সে লাফায়ে, পাখা আছে যার ওড়ে।
ডিম্বের মাঝে পক্ষীর ভ্রূণ সহসা লভিয়া প্রাণ
আবরণ টুটি, বাহিরায় ছুটি গাহি' মৃদু কলগান;
তব জাগরণে জগতে হর্ষ-কোলাহল যায় শোনা,
চঞ্চল করি' নীলজল জাগে নৌকার আনাগোনা।
তোমার উদয় হৃদয়ে আমার আছ তুমি মোর মাঝ,
অক্ষাত্মন বরপুত্র সে তোমারি হে রাজরাজ!
তোমার শকতি তোমার বিধান জানায়েছ মোরে তুমি,
তোমার উদয়ে জেগেছে হৃদয় জেগেছে বিশ্বভূমি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ফেল-জামিন

(গল্প)

আমি ক্যাম্বেলের পাশ নেটিভ ডাক্তার। সাত ঘাটের জল খাইয়া সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি জেলে বদলি হইয়া আসিয়াছি।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। বাসার সম্মুখে একটু খোলা জায়গা ছিল; সেইখানে ইজিচেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, এমন সময় একটা ওয়ার্ডার ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, জেলে একটা অ্যাকৃসিডেণ্ট কেশ হইয়াছে। উমেশ কয়েদী পাথর-ভাঙ্গা মুগুর নিজের মাথায় মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। এখনই আমাকে যাইতে হইবে। ডাক্তার সাহেবের কাছেও লোক ছুটিয়াছে।

তাড়াতাড়ি জেলে ছুটিলাম। আমার বাসা হইতে জেল দশ মিনিটের পথ।

জেলে গিয়া দেখি, লোকটা বেহুঁস হইয়া রহিয়াছে। কপাল ছেঁচিয়া গিয়াছে—রক্তারক্তি ব্যাপার! একটু আশ্বস্ত হইলাম—মাথাটা একেবারে ভাঙ্গে নাই। তখনই প্রয়োজনমত ঔষধ-ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিলাম। নাড়ী টিপিলাম, ঠিক আছে! ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেবও আসিয়া পড়িলেন। ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া রিপোর্ট লিখিতে বলিয়া তিনি ক্লাবে চলিয়া গেলেন।

ইহার চার-পাঁচ দিন পরে—ঠিক তখন ভোর হইয়াছে,—সারারাত্রি ধরিয়া চীৎকার করিয়া জ্বালাইয়া ছোট ছেলেটা সবেমাত্র

ঘুমাইয়া ঘুমাইবারও একটু অবকাশ দিয়াছে—আমিও ঘড়ির পানে চাহিয়া চক্ষু মুদিবার কল্পনা করিতেছি, এমন সময় ওয়ার্ডার আসিয়া বহির্দ্বারে উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল, "বাবু—"

ভাল উৎপাত! বিরক্ত চিত্তে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। ওয়ার্ডার সেলাম করিয়া জানাইল, সেই উমেশ কয়েদী শেষরাত্রি হইতে বিষম বায়না ধরিয়াছে, ডাক্তার বাবুকে একবার ডাকিয়া দাও। কিছুতেই তাহাকে থামানো যাইতেছে না। বকিয়া বুঝাইয়া সকলে হার মানিয়া গিয়াছে! তাই শেষে—

লোকটার সবে জ্বর ছাড়িয়াছে। কাল রাত্রেও তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি, অনেকটা ভালই আছে! আবার পাছে কোন উৎপাত বাধাইয়া তুলে,—কাজেই জামাটা গায়ে দিয়া জেলে চলিলাম।

উমেশের বিছানার পাশে আসিয়া দেখি, বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া আছে। তাহার গায়ে হাত দিলাম, জ্বর নাই। উমেশ ফিরিয়া চাহিল, চোখ দুইটা তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে, বুঝিলাম, সে খুব কাঁদিয়াছে। আমি কহিলাম, "কি হয়েছে উমেশ; ডাকছিলে কেন?"

উমেশের চোখে জল দেখা দিল। ফুঁপাইয়া সে কহিল, "বাবু, কেন আমায় বাঁচালেন? আজ ক'দিন এ মনের মধ্যে কি যে আগুন জ্বলছে, তা যদি বুঝতেন!"

ভাবিলাম, লোকটার অনুতাপ হইয়াছে। সে কহিল, "মরণ ত কিছুতেই দেখা দেয় সব আমি তাই শেষ করে দিতে গেছলুম, কিন্তু ধরে বেঁধে আবার আমায় টেনে তোলেন, কেন? মাথা জোড়া দিয়ে কি করবেন? মনটা আমার ঠিক করে দিতে পারবেন না ত!"

তাহাকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে দুই-চারিটা হিতকথা পাড়িলাম। কিন্তু উমেশ কহিল, ও সবে কোন ফল নাই! যে গাছের শিকড় কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে জল-সিঞ্চন আর কেন?

আমি তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। উমেশ কহিল, "এ সহরে আমার পানে কেউ ফিরে চায়নি, শুধু আপনি চেয়েছেন। আপনার প্রাণে একটু মায়া আছে দেখলুম, তাই আপনাকে সব কথা খুলে বলছি, শুনুন। শুনে বলুন, এত কাণ্ডের পর কেউ যদি মরতে চায় ত তাতে বাধা দিতে আছে কি না!" সে তখন আপনার জীবনের কাহিনী বলিতে সুরু করিল।

২

উমেশ বলিল, "সে আজ তিন বৎসরের কথা। রাণীগঞ্জের হাটে গিয়াছিলাম, গরু কিনিতে। আমার বাড়ী জিয়ালিতে। দামোদরের উপরেই জিয়ালি,—ক্ষুদ্র গ্রাম।

গরু কিনিয়া ফিরিবার পথে এক মুদির দোকানে বিশ্রাম করিতেছিলাম। সেখানে এক লোকের মুখে শুনিলাম, দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান ভাসিয়া গিয়াছে—এমন জল সে তল্লাটে বহুকাল কেহ চক্ষে দেখে নাই। লোকের ঘর-বাড়ী, গরু-বাছুর, সে

শুনিয়া বুক আমার কাঁপিয়া উঠিল। আমার জিয়ালি? লোকটা কহিল, জিয়ালির কোন চিহ্নই নাই! বহুক্রোশ ব্যাপিয়া সে এক সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে! কাটা ছাগলের মতই প্রাণটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল! জিয়ালি গিয়াছে? তাহার অর্থ, —আমার সব গিয়াছে! ঘরে রুগ্না স্ত্রী, আদরের মেয়ে দুলালী, ক্ষেত-খামার, গরু-বাছুর,—সব—সব গিয়াছে! কিছুই আর নাই!

দোকানীর ঘরে গরু ফেলিয়া ছুটিয়া পথে বাহির হইলাম। উদরে কয়দিন অন্ন ছিল না, ক্ষুধায় নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইতেছিল —তবুও সাত-আট ঘণ্টা পূরা দমে চলিয়া বর্দ্ধমানের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম! তাহার পরই মেঠো পথ জলের তলায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! যে ধারে চাই, কেবলই জল! বড় মাঠ বিলের আকার ধারণ করিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা বড় বড় গাছ স্তব্ধ প্রহরীর মত মাথা তুলিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। সূর্য্য তখন অস্ত যাইতেছিল,—তাহার সে লাল আলো জলে যেন সিঁদুর গুলিয়া দিতেছিল।

আমার চোখের সম্মুখে সে লাল জল রক্তনদীর মতই টকটক্ করিতেছিল। পথ নাই, পথ নাই—চারিদিকে কেবলই জল! উপায় কি! মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল। সাঁতরাইয়া গৃহে ফিরিব ভাবিয়া জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ফাঁড়ির এক চৌকিদার আমায় চাপিয়া ধরিয়া ফেলিল। আমি কাঁদিয়া মিনতি করিলাম, ছাড়িয়া দাও, আমার সব যায়।

সে কহিল, তাহার ছাড়িবার হুকুম নাই। পাছে কেহ জলে নামে, তাই রোধ করিবার জন্য সেখানে সে মোতায়েন আছে। আমায় ছাড়িয়া গাফিলির দণ্ড স্বরূপ দশটাকার চাকরিটি সে খোয়াইতে পারিবে না। সেই চাকরির উপরই তাহার জান-বাচ্ছার নির্ভর। বেশী জিদ ধরিলে সে আমায় থানার জিম্মা করিয়া দিবে, এমন ভয়ও দেখাইতে ছাড়িল না। আমি কেমন হতভম্বের মত বসিয়া পড়িলাম। চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী আঁধারে ভরিয়া গেল।"

৩

উমেশ বলিতে লাগিল, "কতক্ষণ সেই ভাবে বসিয়াছিলাম, জানি না—মাথার উপর দিয়া আঁধার রাত্রি পোহাইয়া গেল— আবার সূর্য্য উঠিল। সূর্য্যের তাপ গায়ে লাগায় আমার হুঁস হইল। তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমি অন্য পথে চলিলাম। চৌকিদার বাধা দিল না।

তারপর কোনমতে কোনখানে হাঁটু-ভোর জল ভাঙ্গিয়া, কোনখানে বা সাঁতরাইয়া গ্রামে ফিরিলাম। কিন্তু কোথায় ঘর! কোথায় গ্রাম! কোথায় স্ত্রী! কোথাই বা মেয়ে! দামোদর এক নিশ্বাসে সমস্তই গ্রাস করিয়াছে! মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। আমি শুইয়া পড়িলাম! ঘুমে চোখ ছাইয়া গেল।

যখন চোখ মেলিলাম, তখন দেখি, এক কানাতের ঘরে আমি শুইয়া আছি। পাশে একটি বাবু বসিয়া আছেন। প্রথমটা কিছু খেয়াল হইল না। কিন্তু পাশ

ফিরিতেই একটা নিশ্বাস পড়িল। অমনিই মেঘের মত বিপদের কালো স্মৃতি মনের উপর ঘনাইয়া আসিল। চোখে জল ঝরিল।

বাবুদের চেষ্টায় মেয়ে মিলিল—স্ত্রীকে পাওয়া গেল না। মেয়ে আসিয়া আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, কাঁদিয়া কহিল, "বাবা, আমার মা?"

তেরো বছরের মেয়ে—তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বুঝাইবই বা কি করিয়া—! তাহাকে বুকে চাপিতে চোখের জলে বুক ভরিয়া গেল। সাজানো ঘর, সাজানো সংসার দেখিয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম —ফিরিয়া দেখি, ভোজবাজির মতই সব কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! জীবনে দুঃস্বপ্ন মানুষ অনেক দেখে,—কিন্তু এ সত্য যে সে স্বপ্নেরও অগোচর!

ভাবিলাম, স্ত্রী যে পথে গিয়াছে, দুলালীকে বুকে করিয়া সেই পথেরই পথিক হইব! সব যদি গেল ত এ গুঁড়াটুকুকে লইয়াই বা কোথায় রহিব! চোখের একটি পলক-পাতমাত্র—এ গুঁড়াটুকু উবিতে কতক্ষণ!

বাবুরা বুঝি মনটাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন! তাঁহারা কহিলেন, মেয়ের মুখ চাহিয়া আবার আমায় গা ঝাড়িয়া উঠিতে হইবে! গলা টিপিয়া ত ইহাকে মারিতে পারি না। মেয়ের পানে চাহিলাম, তাহার চোখের কোণে জলের দাগ তখনও মিলাইয়া যায় নাই! সেই ঝাপসা জল-ভরা দৃষ্টিতে কি যে মমতা মাখানো ছিল! মরা হইল না —তাহাকে হাতে করিয়া মারা—না, সে আরও অসম্ভব!

কিন্তু কি দিয়া বাঁচাইব? ঘর নাই, অন্ন নাই—ধু-ধু প্রান্তরে কি দিয়া আবার ঘর বাঁধিব? কি খাইয়া বাঁচিব! এ বয়সে নূতন করিয়া সংগ্রহেরও সামর্থ্য নাই! তাহার উপর ডাগর মেয়ে, এখনই বিবাহ দিতে হইবে! পাহাড়ের মত দুর্ভাবনার ভারী বোঝা মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আমি পাগল হইয়া উঠিলাম।

বাবুর দল কহিলেন, সহরে যাও। কলিকাতার পথে পয়সা ছড়ানো আছে। অতীতের সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া মেয়ের পানে চাহিয়া নূতন করিয়া আবার সব গড়িয়া তোল!

তাঁহাদের মুখের উপর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। তাঁহারা গাঁটের পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন; সঙ্গে খরচও কিছু গুঁজিয়া দিতে ভুলিলেন না। চোখের জল মুছিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া সহর কলিকাতায় আসিলাম।

৪

অসংখ্য গাড়ীঘোড়া, লোকজন—সকলেই ব্যস্ত, অধীর—এ এক সমারোহ ব্যাপার! এ ভিড়ের চাপে পড়িয়া পিষিয়া ধুলা হইয়া যাইতে হয়! যেদিকে লোক চলিয়াছে, সেই দিকে তাহাদেরই পিছনে চলিতে আরম্ভ করিলাম। গঙ্গার প্রকাণ্ড পুল পার হইলাম! ভিড়ের আর বিরাম নাই! কোলাহলও

অবিরাম! কোন্ পথে যাই? কোথায় গিয়া একটু আশ্রয় পাই?

হাঁটিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। দুলালী আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা, আর যে চল্‌তে পারছি না! কোথাও একটু বসবে, চল!"

কোথায় বসি! বড় বড় বাড়ী—সব ছাদ গিয়া যেন আকাশে ঠেকিয়াছে—লোকের কোলাহলে চারিধার গম-গম করিতেছে! কোন বাড়ীর সম্মুখে ছোট একটু রোয়াক। সেখানেও বসিবার ঠাঁই নাই। রঙ-বেরঙের সামগ্রী লইয়া লোকেরা বেচা-কেনা করিতেছে। নিরুপায় হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িলাম—জনস্রোতের প্রবল ঘায় কোথায় ছিটকাইয়া সরিয়া গেলাম—দাঁড়াইবার সাধ্য কি! মেয়েটাকে ধরিয়া টানিয়া কোনমতে একটা খাবারের দোকানের সম্মুখে আসিলাম। দুলালীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিছু খাবি, মা?"

উদ্‌গ্রীব নয়নে দুলালী আমার পানে চাহিল। দোকানে ঢুকিয়া তাহাকে কিছু খাবার কিনিয়া দিলাম। নিজে ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা জল খাইলাম। একটু সুস্থ হইলে দোকানীর সহিত আলাপ সুরু করিলাম।

বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছি শুনিয়া দোকানী মহা-উৎসাহেই আলাপে যোগ দিল। কেমন জল, কাহার কি রহিল-গেল,—তাহারই বিস্তৃত বিবরণ খুঁটিয়া খুটিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ক্রমে শ্রোতাও বিস্তর জুটিল। সকলেরই শুনিবার সে কি আগ্রহ। কি কৌতূহল। মনে মনে ভাবিলাম, আঃ, ভগবান খুব আশ্রয় মিলাইয়া দিয়াছেন! মেয়েটাকে লইয়া জুড়াইতে পাইলাম!

কিন্তু কিছু পরেই ভুল ভাঙ্গিল। শুনিবার সব কথা শেষ হইয়া গেলে দোকানী কহিল, "তাহলে এখন এসো, কর্ত্তা। আমার দোকানে লোকজন আসছে—ঠাঁই জুড়ে চোপর দিন বসে থাকলে ত আমার চলবে না। পাশ দাও।"

দুলালী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বড় শ্রান্তির পর বড় আরামের ঘুম! সে ঘুম ভাঙ্গাইতে মমতা হইল। কিন্তু দোকানী পর, সে শুনিবে কেন? তাহার অনুরোধের সুর ক্রমে চড়া হইয়া উঠিল—একটা ভর্ৎসনাও মিলিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া দুলালীকে উঠাইয়া আবার পথে বাহির হইলাম। ঘুমে সে ঢুলিয়া পড়িতেছিল—পা ভাল সরিতেছিল না—টানিয়া তাহাকে লইয়া ফুটপাথে এক গাছতলায় বসিয়া পড়িলাম। দুলালী আমার গায়ে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিল। কিন্তু বরাত মন্দ—শান্তি মিলিবে কেন? এক পাহারা-ওয়ালা আসিয়া কহিল, রাস্তা বন্ধ করিয়া বসিলে চলিবে না! চোখ রাঙাইয়া সে উঠাইয়া দিল। আবার রাস্তায় দাঁড়াইলাম।

সেই রৌদ্রতপ্ত পথে কষ্টের আর সীমা ছিল না! বড় বাড়ী দেখিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি,—এমন দাতা কি কেহ নাই, যে শুধু একটু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই দেয়? বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে গেলে গালপাট্টাওয়ালা মোটা দরোয়ানের দল হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া তাড়া করে। দুই দিন দুই রাত্রি

ধরিয়া কত ঘুরিলাম, কোথাও আশ্রয় মিলিল না।

তৃতীয় দিনে এক গলির মধ্য দিয়া চলিয়া একটা বাড়ীর রোয়াকে আসিয়া বসিলাম। পথে দুই-চারি পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনিয়াছিলাম, মেয়ের মুখে দিলাম—নিজেও কিছু খাইয়া লইলাম। রাস্তার কলের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। তার পর একবার দেবতার নাম স্মরণ করিয়া এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিলাম, "বাবু—"

সম্মুখেই ঘরে বসিয়া এক বাবু গড়গড়ার নল টানিতে ছিলেন। নিকটে বিছানার উপর বাঁয়া-তবলা প্রভৃতি বাদ্যের সরঞ্জাম পড়িয়া ছিল। তিনি চোখ তুলিয়া কহিলেন, "কি চাস ?" একটা লোক ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাড়ীতে ব্যামো, ভিক্ষে মিলবে না—পথ দ্যাখ্।"

দুলালী জড়সড়ভাবে আমার বুকে মুখ লুকাইল। আমি কাতর স্বরে কহিলাম, "ভিক্ষে আমি চাই না, বাবা, চাকরি চাই।"

বাবুটি কট্মট্ করিয়া চাহিলেন—মেয়ের পানেও একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না। বাবু বলিলেন, "তোর জামিন কেউ আছে ?"

জামিন! কথাটা কানে নূতন ঠেকিল। অর্থ বুঝিলাম না। বাবুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। বাবু বলিলেন, "তুই চোর কি ছ্যাঁচোড়—তার পরিচয় কে দেবে ?"

আমি কহিলাম, আমি চোর বা ছ্যাঁচোড় নহি। নিজের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিলাম। বাবু মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "ও সব লোককে চাকরি দেওয়া যায় না, বাপু। তোমায় জানে-শোনে এমন লোক আনতে পার ত একটা মিলতে পারে—আমার জামাইয়ের বাড়ী লোকের দরকার ছিল বটে! তা তোমার আবার সঙ্গে দেখ্‌চি, একটা মেয়ে! বয়সটাও ত তার বড় সুবিধের নয়!"

কাঁদিয়া বাবুর পায়ে ধরিলাম—গৃহ-হীন আশ্রয়হীন, নিতান্ত অসহায় আমি! বাবুর কিন্তু সেই এক কথা, অজানা অচেনা লোককে চাকরী দিয়া তিনি দায়ে ঠেকিতে পারেন না। তাহার উপর ঘাড়ে এক ধাড়ি মেয়ে!

মুখ চুণ করিয়া আবার পথে বাহির হইলাম। বাড়ী-বাড়ী ঘুরিলাম—সব জায়গায় সেই একই কথা। অজানা অচেনা লোকের জন্য এ মুলুকে ঠাঁই নাই। তবে আমি যাই কোথা ? খাই কি ? এ কি ভীষণ শাস্তি, ভগবান!

ক্রমে গাঁটের পয়সা ফুরাইয়া আসিল। যেদিন শেষ পয়সাটি বাহির হইয়া আমায় একেবারে সম্বলহীন রিক্ত করিয়া দিল, সেদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মাথার মধ্যে আগুন ছুটিল। দুলালী কাঁদিতেছিল। ক্ষুধায় তাহার আর চলিবার শক্তি ছিল না। সারাদিন এক গলির মোড়ে বসিয়া রহিলাম—দুলালী আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। আমি তাহার মুখে চোখে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইলাম। খাইবার যাহার কিছু জুটে না—নিদ্রা তাহার প্রতি বড় সদয়। নিমেষেই দুলালী ঘুমাইয়া পড়িল। আমি তাহার কপালের উপর হইতে কেশের গুচ্ছ সরাইতে সরাইতে কত কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমি গরীব

চাষা—কিন্তু দেশে আমার দ্বার হইতে কোন ভিখারী-অতিথ্ অতৃপ্ত বুকে কোনদিন ফিরিয়া যায় নাই! সেই আমি,—আজ পথের কাঙা-লেরও অধম! শেষে স্থির করিলাম, ভিক্ষাই করিব! দেখি, সহরে ভিক্ষা মিলে কি না! সহরের উপর দারুণ অভিমান জন্মিয়াছিল। এই এত বড় বিরাট শরীর লইয়া সজ্জিত সহর পড়িয়া আছে—গলির মোড়ে সারাদিন বিষণ্ণ মুখে আমি বসিয়া—আমায় দেখিয়া লোকের দয়া না হোক—এই কচি মেয়ের শুষ্ক ম্লান মুখ দেখিয়াও কি কাহারও দয়া হয় না! সারাদিন আমারই সম্মুখ দিয়া এত লোক আসিল-গেল, কৈ কেহ ত একবার ফিরিয়া চাহিল না! জিজ্ঞাসাও করিল না—কেন আমরা এখানে বসিয়া আছি! কি চাই—কি আমাদের দুঃখ! আশ্চর্য্য! এ কি আমার সেই ছোট গ্রামে—সেই দরিদ্রের পুরীতে সম্ভব হইত! পঞ্চাশ জন লোক আসিয়া গায়ে পড়িয়া সাহায্য করিত! আর এত বড় সহর—পাষাণ—পাষাণ সহর! লোকের এখানে প্রাণ নাই, মন নাই, ভিতরে পাষাণ পুরিয়া নিজেদের লইয়াই সব ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে!

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছিল! সম্মুখে এক বাবু চুরুট টানিতে টানিতে পথে চলিয়াছিলেন—গলায় তাঁহার ফুলের মালা, ফিট্‌ফাট্ পোষাক! গলির মোড়ে আর কোন লোক ছিল না। তাঁহারই কাছে ভিক্ষার জন্য প্রথম হাত পাতিব স্থির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিলাম, "বাবু—"

বাবু ফিরিয়া চাহিলেন। আমার জিভ কেমন জড়াইয়া গেল—কি বলিব? কখনও ভিক্ষা চাহি নাই—ভিক্ষা চাহিতে বাধ-বাধ ঠেকিল। তবু কথা যখন আরম্ভ করিয়াছি, তখন তাহা শেষ করিতেই হইবে! কোনমতে বল সংগ্রহ করিলাম, কহিলাম, "আজ দুদিন কিছু খাইনি বাবা, এই মেয়েটি—এর মুখের দিকে চেয়েও না হয়—"

বাবু মেয়ের পানে চাহিলেন। রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ যেমন দৃষ্টিতে ফিরিয়া চায়, বাবুর দৃষ্টিও ঠিক তেমনি! আমি সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিলাম। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে বাকী রহিল না। আমার ইচ্ছা হইল, এখনই ইহার টুঁটি টিপিয়া চোখ দুইটাকে টানিয়া বাহির করিয়া দিই!

বাবু বলিলেন, "তাই ত, মেয়েটি ত দেখচি দিব্যি! তা এক কাজ কর্ না—পয়সার দুঃখ থাকবে না! আমার সঙ্গে আয়, মেয়েকে নিয়ে। আমি থাকবার ঠাঁই দেখিয়ে দেব।"

কথাগুলা যেন বাজের মতই শুনাইল! কলিকাতার অনেক কীর্ত্তির কথা গ্রামে বসিয়া শুনিয়া ছিলাম। আমি বাবুর পানে কট্‌মট্ করিয়া চাহিলাম। বাবু কেমন ভড়কাইয়া সরিয়া গেল। আপদ চুকিল! আমিও নিশ্বাস ফেলিলাম।

আমার মাথায় তখন একটা মৎলব দেখা দিল। চমৎকার! ঠিক! দুলালীকে উঠাইলাম। পথে মৈ ঘাড়ে করিয়া একটা লোক আলো জ্বালিতে ছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গার তীরে যাইবার পথ কোন্ দিকে! সে বলিল, বাঁয়ে ঘুরিয়া সোজা পশ্চিমে গেলে গঙ্গাতীরে পৌছিব। দুলালীকে কোনমতে টানিয়া গঙ্গার তীরে আসিলাম।

৫

স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে সব জ্বালা জুড়াইয়া গেল। চারিধারে আঁধার নামিতেছিল। মাঝ-গঙ্গায় দুই-চারিখানা নৌকা হইতে আলোর রশ্মি আসিয়া জলে পড়িয়াছিল। তীরের কাছে কতক-গুলা বোট বাঁধা ছিল—সেখানে মাঝিরা রান্না-বান্নার আয়োজন করিতেছিল। দূরে এক জেটির উপর বসিয়া কে গান গাহিতেছিল—বড় করুণ সুর! আমার তপ্ত প্রাণ সে সুরে মাতিয়া উঠিল! চারিধার শান্ত, কি এক আবেশে ভরা! ঘাটে তখন দুই-চারিটা কুলি স্নান করিতেছিল। আমি ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির উপর বসিয়া রহিলাম।

এই শান্ত নীরবতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। ঘরে ঘরে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে—সকলে দিনের শেষে শান্তির কোলে মাথা গুঁজিয়া বিরাম পাইয়াছে। অতীতের কথা মনে পড়িল। সারাদিন ক্ষেত-খামার দেখাশুনার পর গৃহে ফিরিতাম—প্রদীপের আলোয় আলো-করা ছোট সুন্দর ঘরখানি,—স্ত্রীর আদরে, মেয়ের আব্দারে সে ঘর উজ্জ্বল! সে ঘরে ঢুকিয়া দিনের সব ক্লান্তি নিমেষে ভুলিয়া যাইতাম। সে কি সুখ—কি আরাম! কোন্ পাপে আমার সে ঘর—সে আশ্রয় কর্পূরের মত আজ উবিয়া গেল! গেল যদি ত এ মেয়েটা কেন আটকাইয়া রহিল? এ যে শিকলের মত আমায় আঁটিয়া বাঁধিয়া উঠিল। না, এ শিকল কাটিতেই হইবে—এ শিকল কাটিবই। না কাটিতে পারি ত, এই শিকল গলায় বাঁধিয়াই সব শেষ করিয়া দিব!

কুলিরা চলিয়া গিয়াছিল—রাত্রিও তখন গভীর। বোটের উপর জীবনের কোলাহলটুকুও নিঃসাড় হইয়া পড়িয়াছে। দুলালীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলাম। শান্ত সুরে মৃদু ঢেউ তটের কোলে আছড়াইয়া পড়িতেছিল—সে যেন মুমূর্ষুর কাতর বিলাপের মতই করুণ, বেদনাময়! সে সুর আমাকেই আহ্বান করিতেছিল। প্রাণ আমার নাচিয়া উঠিল। কোমর-ভোর জল ছাড়িয়া আরও একটু অগ্রসর হইলাম। দুলালী ডাকিল, "বাবা—"

আমি কহিলাম, "চুপ কর্। ডুব দে—সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।"

দুলালী ডুব দিল না—কাঁদিয়া আবার ডাকিল, "বাবা—"

আবার অমন করিয়া ডাকে! আমার রাগ ধরিল। তাহার ঘাড়টা টিপিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিলাম—বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। একটা পৈশাচিক বাসনা মনের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল—সে গর্জ্জন আমি যেন স্পষ্ট কানে শুনিতেছিলাম। আমার মাথায় খুন চাপিয়া ছিল।

দুলালীও প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছিল। তাহার মরিবার ইচ্ছা নাই,—সে মরিবে না! নিতান্তই অবুঝ হতভাগা মেয়ে! এত দুঃখেও তাহার বাঁচিবার সাধ হয়! শেষে তাহারই জয় হইল। বোধ হয়, বাপের

হইয়া পড়িয়াছিল! সে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। আমি হারিলাম—তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। জল খাইয়া উঠিয়া কাশিয়া সে ডাকিল, "ও বাবা—আমি মরে যাব যে।"

আমি ভৎর্সনা করিয়া কহিলাম, "এত কষ্টেও তোর বাঁচবার সাধ হয়?"

"আমি মরতে পারব না, বাবা—" দুলালী ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে কান্নায় আমার রাক্ষসের প্রাণ নিমেষের জন্ম গলিয়া গেল—কিন্তু তখনই ভাবিলাম, না, এ মায়া ভাল নয়! দুলালীকে মরিতেই হইবে—মরা ছাড়া উপায় নাই! সারা পৃথিবীর উপর রাগ ধরিয়া ছিল! মাথায় উপর অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—আমি তীব্র দৃষ্টিতে সে নক্ষত্রগুলার পানে চাহিলাম—! মনে হইল, মেয়েকে মারিয়া, নিজে মরিয়া দুনিয়ার এই এত-বড় হৃদয়হীনতার চূড়ান্ত শোধ গ্রহণ করি—ইহারা তাহার সাক্ষ্য থাকুক। অনেক চেষ্টা করিয়াও দুলালীকে ডুবাইতে পারিলাম না। প্রাণপণ শক্তিতে সে জীবনের জন্য সংগ্রাম করিতেছে! মনে হইল, তাহাকে তুলিয়া ঐ শানের সিঁড়িতে আছড়াইয়া ফেলি! দুলালীকে কোলে তুলিলাম। সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া "মাগো—"বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ও কি! এ কাহাকে ডাকে? আমার হাত-পা থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তাহাকে আছাড় দিতে হাত আর উঠিল না। দুলালী আবার ডাকিল, "ও বাবা, আমায় মেরে ফেলো না। আমি মরতে পারব না—"

সে কি অধীর আগ্রহে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আমাকে সে চাপিয়া ধরিল। আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। তাহার মুখে অজস্র চুমা দিয়া আমি কহিলাম, "না মা, মরতে হবে না। আয়, তবে দুজনেই বেঁচে থাকি—যে-টুকু কষ্ট বাকী আছে, নিঃশেষে আয়, ভোগ করি।"

দুলালীকে লইয়া ঘাটে উঠিলাম। মরা হইল না! সে ক্ষণ কেন হারাইলাম! একটি ক্ষণ শুধু—না হারাইলে এ মনস্তাপ আজ সহিতে হইত না! জেলে বাস ঘটিত না।"

উমেশ চুপ করিল। আমি কহিলাম, "চুপ কর, উমেশ—আর আমি শুনতে চাই না।"

উমেশ কহিল, "না বাবু, আর একটু শুনুন—দয়া করে শুনুন—প্রাণ আমার জ্বলে যাচ্ছে!" আমি কহিলাম, "আচ্ছা, বল।"

৬

উমেশ বলিতে লাগিল, "সে রাত্রি ঘাটের চাতালেই পড়িয়া রহিলাম। পরদিন উঠিয়া দেখি, দুলালীর চোখ দুইটা জবা-ফুলের মতই লাল হইয়া উঠিয়াছে—গা আগুনের মত গরম। তাহার প্রবল জ্বর।

সেদিন বুঝি কি একটা যোগ ছিল। ভোর হইতে না হইতেই ঘাটে খুব জন-সমাগম দেখা গেল। ঘোমটায় মুখ-ঢাকা কচি বৌ-ঝী হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কেহই আর ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিল না—সকলেই স্নান সারিয়া গল্প করিয়া হাসিয়া হাসাইয়া আসিল, চলিয়া গেল। দুই-চারিজন চালটা 'আলটা বিতরণ

করিতেও কার্পণ্য করিল না। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্পই। আমার ভাগ্যেও কিছু চাল তরকারী মিলিল। কিন্তু ইহা লইয়া কি করিব? কাঁচা চাউল মানুষ কত চিবাইবে? কাঁচা আনাজ-তরকারীও খাওয়া যায় না।

মাথায় একটা বুদ্ধি জোগাইল! বেলা তখন আবার পড়িয়া আসিয়াছে, এক বোটের মাঝির কাছে গিয়া চাউলগুলা তাহাকে ঢালিয়া দিলাম—বলিলাম, "ভাই, চালগুলো নাও, নিয়ে এই আলু ক'টা আমায় পুড়িয়ে দাও! আজ দুদিন আহার জোটে নি।"

মাঝি বাবু নহে, ভদ্র নহে—তাই সে অত জামিন-জানার সন্ধান করিল না—হিতোপদেশ দিল না—তাহার দয়া হইল। সে বলিল, "চালগুলো সিদ্ধ করে দেব কি? কিন্তু জেতে আমি মুসলমান—"

ক্ষুধার বেগে জাতি-বিচারের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু না, আমার দুলালী জ্বরের ঘোরে পড়িয়া আছে—দুই দিন অন্ন তাহার জুটে নাই। আর আমি ভাত গিলিব কোন্ মুখে! বলিলাম, "না, ভাত চাই না, শুধু আলু ক'টা পুড়িয়ে দাও।"

সেই পোড়া আলু আনিয়া দুলালীকে ডাকিলাম, "মা—"

দুলালী অতিকষ্টে চোখ মেলিল। আমি কহিলাম, "এই নে মা, খা,—

দুলালী আলু পোড়া খাইল—আমায় বলিল, "তুমি একটা খাও, বাবা—

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পোড়া আলু মুখে দিলাম। সে যেন অমৃত!

সন্ধ্যার দিকে দুলালীর জ্বর ছাড়িল। সে কথাবার্ত্তা কহিল—আমার প্রাণ একটু শান্ত হইল। দুলালী বলিল, "বাবা, চল, বাড়ী যাই। এখানে এমন করে ঘুরে কি করে বাঁচবো, বাবা?"

সে কথা আমারও মনে হইয়াছিল। কিন্তু বাড়ী কোথায় যে, ফিরিব! জলে ধুইয়া বাড়ীর চিহ্ন অবধি যে লোপ পাইয়াছে! আর ফিরিব কি করিয়া? রেলের ভাড়া চাই—বিনা পয়সায় রেলে কেহ যাইতে দিবে না। সকল পথই যে আজ আমার বন্ধ! এই সহরের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। না পারি ত ঐ পাষাণের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরা ভিন্ন মুক্তিরও আজ আর কোন উপায় নাই!

আবার রাত্রি আসিল। মাথার উপর আকাশে একরাশ নক্ষত্র আসর জমাইয়া বসিল। তাহারা নীরব নেত্রে যেন আমা-দেরই পানে চাহিয়া ছিল! মানুষ কত দুঃখ সহিতে পারে—সহিয়া বাঁচিয়া থাকে, বিদ্রূপ-ভরা চোখে বুঝি তাহারা তাহাই দেখিতেছিল।

তখন বোধ হয় মাঝরাত্রি—একটু ঘুম আসিয়াছিল—সহসা একটা দুপ্‌দাপ্ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া উঠিয়া দেখি, দুলালী আমার পার্শ্বে নাই! দাঁড়াইয়া গঙ্গার পানে চাহিলাম—স্থির জল, মৃদু তরঙ্গ-ভঙ্গে গান গাহিতেছে। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। ঘাটের উপর যে চাতাল ছিল, সেখানে আসিলাম—দেখি, ঘাটের উপর একখানা ঘোড়ার গাড়ী। তিন-চারিটা

লোক ব্যস্ত হইয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া কহিল, "যাও—" স্তব্ধ আকাশে বাজ্ যেমন হাঁকিয়া যায়—তেমনই শব্দ করিয়া গাড়ী ছুটিল! আমার আবার মনে হইল—যেন কে 'বাবা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়াই সে নীরব হইল। এ না আমার দুলালীর স্বর! দুলালীকে চোরে চুরি করিয়াছে? আমি পাগলের মত গাড়ী লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম! কিছু হইল না—দুর্ব্বল পা, কি তাহার শক্তি যে সে গাড়ীর সঙ্গে সমানে ছুটিবে! হাঁফাইয়া শেষে একটা মোড়ের উপর বসিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, আর কেন এ মায়া! শিকল যদি এমন করিয়াই ছিঁড়িল ত সে ছিঁড়ুক! আর সে শিকলের পিছনে ছুটিয়া কি ফল! যাক্—যে ছোট সম্বলটুকু অবশিষ্ট ছিল—সে ত বহুপূর্ব্বেই যাইবার কথা—উহাকে ত ফিরিয়া পাইবার কথা নয়! গেল যদি ত যাক্! আমার সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে! আঃ, এ কি মুক্তি—কি আরাম! এখন ঐ গঙ্গার কোলে পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে গিয়া আশ্রয় লইতে পারিব। প্রাণে অত্যন্ত উল্লাস হইল—হা হা করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম! সে হাসির শব্দে চারিধার যেন দুলিয়া উঠিল। আমিও সে স্বরে কাঁপিয়া উঠিলাম! তারপর এক বার প্রাণ ভরিয়া বিশ্রাম করিয়া লইব ভাবিয়া সেই রাস্তার একধারে শুইয়া চোখ বুজিলাম।

৭

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন আছি, দুলালী আসিয়া ঠেলা দিয়া ডাকিতেছে, "বাবা—" ধড়মড়িয়া উঠিলাম। একটা মানুষ সত্যই আমায় ঠেলা দিয়া ডাকিতেছে,—"এই—"। চোখ মুছিয়া চাহিলাম, সে দুলালী নয়, লাল পাগড়ী মাথায় এক পাহারওয়ালা! সে আমায় ঠেলা দিয়া দাঁড় করাইল—হাতটা আঁটিয়া ধরিয়া গালি দিল, কহিল, আমি পাকা চোর—আমায় থানায় যাইতে হইবে!

কোন কথা বলিলাম না—তাহার ইঙ্গিতে চলিতে লাগিলাম। একটা বাড়ীর মধ্যে সে আমায় লইয়া আসিল। ছোট ঘর—টেবিল-চেয়ারে সাজানো! একধারে একটা বেঞ্চের উপর গাদা-করা বাঁধানো খাতা! টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে, আর তাহারই সম্মুখে বেঞ্চে বসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া একটা লোক ঘুমাইতেছে। পাহারওয়ালা আমায় দাঁড় করাইয়া তাহাকে ডাকিল, "বাবু—"

সে চোখ মেলিয়া চাহিল, পাহারওয়ালা সটান বলিয়া গেল, আমি পথে ঘুরিতেছিলাম। তাহাকে দেখিয়া পলাইবার উদ্যোগ করি। সুবা হওয়ায় দৌড়িয়া গিয়া সে আমায় ধরিয়া ফেলে! 'কাজ-কাম' আমার কিছুই নাই!

বাবু খিঁচাইয়া আমায় গালি দিল, আমাদের জ্বালায় একদণ্ডও তাঁহার চোখ বুজিবার অবসর মিলিবে না! প্রকাণ্ড খাতা টানিয়া কি-সব লিখিয়া আমায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ঘর-বাড়ী কোথায়! কাজ-কর্ম্ম কিছু করি কি না!

আসিয়াছিলাম—তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, সবই খুলিয়া বলিলাম। বাবুটি পাহারওয়ালাকে কহিল, "থাটে নিয়ে যা একে। সব তদন্ত করে আয়।"

পাহারওয়ালা বিরক্ত চিত্তে আমায় লইয়া বাহিরে আসিল—কোথা হইতে দড়ি আনিয়া আমার কোমরে জড়াইল; এবং সেই দড়ির প্রান্ত ধরিয়া পশুর মত আমায় পথে খানিকটা ঘুরাইয়া আবার থানায় ফিরিল, ঘাটে গেল না।

তারপর আদালতে যথাসময়ে আমায় চালান দেওয়া হইল। সেখানে পাহারাওয়ালা উঠিয়া সাক্ষ্য দিল, যে, আমার কাজ-কর্ম্ম কিছুই নাই। অনেক রাত্রে পথে ঘুরিতেছিলাম—তাহাকে দেখিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিলে সে আমায় ধরিয়া ফেলে! তাহার পর আমারই কথামত দুই-চারি জায়গায় ঘুরিয়া সে তত্ত্ব লয়—সকলেই বলে, আমায় কেহ চিনে না!

হাকিম জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে—তোর কাজ-কর্ম্ম কিছু আছে?" ভাবিয়াছিলাম, কথা কহিব না—কিন্তু কহিতে হইল। এতক্ষণ হাজতে বসিয়া চোর ডাকাতের মুখে শুনিতেছিলাম, আমার জেল হইবে! আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম—কি দোষ করিয়াছি যে, জেলে যাইব? খাইতে পাই না—ঘর নাই, আশ্রয় নাই, ভগবান নিষ্ঠুর বাজ ফেলিয়া সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছেন—তাই মেয়েকে লইয়া পয়সা-উপার্জ্জনের আশায় সহরে আসিয়াছিলাম—সে পয়সাও গতর খাটাইয়া একদিন জিজ্ঞাসা করে নাই, কোথা হইতে আসিলাম—কি চাই! চাকরির সন্ধানে যাইয়া কেবলই কটু কথা ও হিতোপদেশ শুনিয়া আসিয়াছি—অপরাধ আমি কি করিলাম যে, জেলে যাইব! হাকিমকে কহিলাম, "চাকরি নেই, হুজুর—তারই চেষ্টায় সহরে এসেছি! এসে কিছুই মেলে নি, একমুঠো অন্ন অবধি না! মেয়েটাকে শেষে চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে!"

হাকিমের মুখের ভাবে বোধ হইল, কথাটা তিনি বিশ্বাস করেন নাই! হারে অভাগা—ভগবান যাহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহেন না, ক্ষুদ্র মানুষ তাহার পানে চাহিয়া দেখিবে, এমন আশা এখনও তুই করিস্!

হাকিম কাগজে কি-সব লিখিয়া লইয়া আমায় কহিলেন, "একে জেরা করবি?"

জেরা! কি তাহার অর্থ? কি সে? আমি একবার চোখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিলাম। কাঠের পিঁজরার মধ্যে কি-এক দ্রষ্টব্য পশুর মত আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। এক-আদালত লোক আমার পানে চাহিয়া আছে। আমি মাথা নীচু করিলাম! হাকিম গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "জেরা করবি কিছু?"

আবার সেই উদ্ভট শব্দ! যে কথার অর্থও বুঝি না—তাহার কি করিব? আমি বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। হাকিম হুঙ্কার দিলেন, "একে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাস্?" আমি ঘাড় নাড়িলাম—না। এমন করিয়া মিথ্যা যে সাজাইয়া

করিব? তাহার দিকে চাহিতে ঘৃণা করে —আর তাহার সহিত কথা কহিব?

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে যেন গানের বাঁধা গতের মত এক নিশ্বাসে তিনি বলিয়া গেলেন, 'ছ মাসের জন্য পঞ্চাশ টাকা জামিন, না দিলে ছ'মাস জেল।'

ছোট ছেলেরা সাদা কাগজে যেমন কালির দাগ টানিয়া নিমেষেই শুভ্র কাগজ কালো করিয়া দেয়, হাকিমের কলমের একটি আঁচড় আমার ললাটে তেমনই করিয়া কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিল। সন্ধ্যার সময় আঁটা গাড়ীতে চড়িয়া অসংখ্য চোর-ডাকাত-খুনীর সঙ্গী হইয়া আমি প্রথম জেলে আসিলাম।

৮

জেলে বসিয়া মৃত্যুর কথা কেবলই মনে হইত! এক এক সময় ভাবিতাম মাথায় মুগুর মারিয়া, না হয় প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া সব শেষ করিয়া দি। কিন্তু একটা সাধ সে সময় মনের মধ্যে উঁকি দিয়া আমায় মরিতে দিত না। সে সাধ—একবার শোধ তুলিব। যাহার মিথ্যা কথায় রিক্ত সর্ব্বস্ব-হারা হইয়াও স্বাধীন আমি এই সব বদমায়েসের দলে পড়িয়া আমার সে শুভ্র জীবনে ছয়মাস ধরিয়া কেবল কলঙ্কের কালো কালি মাখাইয়াছি,—সেই পাষণ্ডের সেই মিথ্যার একবার চূড়ান্ত শাস্তি দিব! জেলের সঙ্গীরা আমায় টিট্‌কারি দিত, আমি বোকা—মিছা জেল খাটিতেছি। ইহাতে মজা নাই, কেবল সাজাই আছে। চুরি করিয়া, লোককে মারিয়া-ধরিয়া জেলে আসিলে তাকেই বলে জেল! দিব্য স্ফূর্ত্তির সঙ্গে বলিত, যাহার উদরের অন্ন নাই, জেল ত তাহার কাছে কাশীর অন্নসত্র! এ কথাটা নেহাৎ মন্দ শুনাইত না।

ছয়মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম। বাহির হইয়াই—সেই পথের কথা প্রথমে মনে পড়িল। জোর করিয়া দুলালীকে ভুলিলাম—স্ত্রীকে ভুলিলাম—নিজের অতীত ভুলিলাম! সে সব কথা মনে পড়িলে মন দুর্ব্বল হয়—শক্তি উবিয়া যায়!

ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার পর সেই পাহারওয়ালাকে দেখিলাম—সেই মোটা শরীর—বিপুল গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন বিশ্রী মুখ! সে এক পানের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য করিতেছিল। দেখিয়া আমার প্রাণে দৈত্য নাচিয়া উঠিল। বাঘের মত ঝাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ে পড়িলাম! দাড়ি ধরিয়া সবলে টানিয়া তাহাকে ভূমে ফেলিলাম—তার পর অজস্র কিল চড় লাথিতে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলাম। আমার জ্ঞান ছিল না—চোখের সম্মুখে মহাকালী লোল রসনা মেলিয়া নৃত্য করিতেছিল—করালিনী কালীকে সেদিন যেন আমি সত্যই প্রত্যক্ষ করিলাম। নৃমুণ্ড-মালিনীর ভীষণ নৃত্য; চকিতে সে দৃশ্য সরিয়া গেল—চোখের সম্মুখে রক্তের নদী বহিল!

বিস্তর লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল—পাহারওয়ালা তখন রক্তে স্নান করিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর আবার সেই আদালতে হাকিম, উকিল পেয়াদার ভিড়ের মধ্যে হাজির

রক্ষা পাইল—কিন্তু তাহার সে ভাঙ্গা নাক আর খাড়া হইল না। আমার দেড় বৎসর জেলের হুকুম হইল। স্থির হইয়াই সে শাস্তির আদেশ শুনিলাম। যখন ডক্ হইতে আমায় লইয়া গেল, তখন সে পাহারওয়ালা একদিকে দাঁড়াইয়াছিল—ভাঙ্গা নাক—কাটা কপাল—ফাটা মাথা—মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া আমি হাজতে আসিলাম। মনে আনন্দ হইল--জয়ের আনন্দ! সেবার বিনা দোষে জেলে ঢুকিয়াছিলাম—এবার মনে ক্ষোভ রহিল না—দোষ করিয়া জেলে চলিয়াছি।"

উমেশ স্থির হইল। সে ফুঁসিতেছিল। তাহার চোখ দুইটাও জ্বলিতেছিল। সে যেন আরও কি বলিবে মনে হইতেছিল—একটু যেন জিরাইয়া লইতেছে! এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিয়া গেল। আমি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উমেশ কহিল "বাবু—",

আমি কহিলাম, "বেলা হয়ে যাচ্ছে, উমেশ—এখনই ত আবার বেরুতে হবে—। কাজ-কর্ম্ম চুকিয়ে দুপুরবেলা এসে বাকি টুকু শুনব'খন।"

উমেশ কোন কথা কহিল না—আমার পানে চাহিয়া রহিল,—উদাস, করুণ দৃষ্টি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যার সীমা

সই আসিয়া ডাকিল—সই, ও সই, কি করিতেছ?

আমি উত্তর দিলাম—যাহা নয় তাহাই করিতেছি।

সই আসিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া বলিল—ও কি লেকচ ভাই?

আমি বলিলাম লিখ্‌ছি আমার মাথা! যখন্ যাহা শুনি, যখন যাহা মনে পড়ে, তখন তাহা লিখিয়া রাখি।

সই বলিল—উহাতে কি হয় ভাই?

আমি। অন্যের কিছুই হয় না বটে, তবে আমার মনে শান্তি পাই।

আমি। অনেক সুখ পাই।

সই। আচ্ছা সই, আমাদের পাড়ার রায় গিন্নি বলে, তুমি নাকি খুব ইংরাজি, ফারসি ন্যাকা-পড়া জান। রায়-গিন্নি বলে, তুমি যা জান তাকোত্তে ন্যাকা-পড়া মেয়েমানুষকে পড়তে নাই।

আমি হাসিয়া বলিলাম—আমি যে বিদ্যার জাহাজ তাহা রায়-গিন্নি কিসে প্রমাণ পাইল?

সই। তা কি জানি! হাঁ সই, তুমি এত ন্যাকা-পড়া কি করে শিখ্‌লে?

সইয়ের কথা শুনিয়া আমি লেখা বন্ধ

অস্ত পরিচয় দিতে বসিলাম। আমার যে বড় দাদা ছিলেন, তিনিই আমাকে বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ পড়াইয়া ছিলেন; তাহার পর বড় দাদার কাল হইলে পাল-পাড়ার উমেশ ঘোষ নামে একজন গোয়ালা ছোট দাদাকে পড়াইতে আসিতেন, মা আমাকে তাঁহার নিকট পড়িবার কথা বলিয়া দিলেন। আমি তাঁহার নিকট দ্বিতীয় ভাগ, নীতিকথা শেষ করিলাম।

তাহার পর মেয়ে-স্কুলে কিছুদিন আনাগোনা করিলাম; তাহার পর পিতামাতা বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া এই কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন।

সই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—

আহা, তাই বটে সই! মেয়েমানুষের শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার নিয়মটা কে করে ছিল?

আমি। যিনিই করুন তিনি নিশ্চয় পুরুষ, তাহার সন্দেহ নাই।

সই। ঠিক্ কথা! বেটাছেলেরা আপনাদের বাড়ীতে থাকিবে আর মেয়েরা চিরকাল উহাদের বাড়ী গিয়ে দাস্যবৃত্তি করিবে! তাতেও মন পায় না। সই, তুমি ত ন্যাকা-পড়া জান, তুমি ত আপনার স্বাধীন!

আমি। স্বাধীন আর কেমন করে?

সই। তুমি ত নেকৃতে জান, মন হলে বাপের বাড়ি পত্তর নেকৃতে পার আমরা যে তাও জানি না। কত খোসামোদ করেও কেউ একখানা পত্র নেকে দেয় না। সই, তুমি কি করে পত্র নেকৃতে শিখে

আমি। আমি যদি চেষ্টা করতাম তবে আরো ভাল শিখতে পারিতাম।

সই। চেষ্টা কর নাই কেন?

আমি। এখন তাই মনে হয়—তখন চেষ্টা করি নাই কেন? তখন মনে হইত এত চেষ্টা করিতেছি তথাপি লেখা ভাল হয় না কেন? কিন্তু সই, চেষ্টা যে কাহার নাম তাহা এখন জানিতেছি। দিনকতক লিখিয়া দেখিলাম, বাবার মত হস্তাক্ষর করিতে পারিলাম না। কলম ফেলিয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, যত দিন না বাবার মত লেখা হইবে, ততদিন আর কলম ধরিব না।

সই। তবে যে বলে, নেকে-নেকে সরে আর খেতে-খেতেই মরে।

আমি। কিন্তু আমার হস্তাক্ষরের সীমা ঐ পর্য্যন্ত!

সই। তবে যে লোকে বলে তোমার স্বামী তোমার কাছে ন্যাকা-পড়া শিখেছিল। তাই তিনি অত পণ্ডিত হয়েছিল।

আমি সবিস্ময়ে কহিলাম—সে কি! এ কথা তোমায় কে কহিল?

সই হাসিয়া বলিল—তুমি গোপন করিতেছ, কিন্তু তোমার বরই আমার কাছে বলিয়াছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, তাহা পরিহাস মাত্র। সই, তখন যদি জানিতাম যে লেখাই আমার একমাত্র বন্ধু হইবে, লেখাই আমার একমাত্র শান্তির উপায় হইবে, তবে কি আমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতাম? এখন বড়ই অনুতাপ হয়, কিন্তু নিরুপায়, আজীবন অনুতাপ করিতেই রহিলাম।

আগ্রহের সহিত বলিল—সই, তবে এই গুজবটা কি আমাকে খুলিয়া বল। তোমার কাছে ন্যাকা-পড়া শিখিয়াছিল এ কথা কেন তোমার স্বামী আমার কাছে বলিয়াছিল।

আমি বলিতে লাগিলাম,—

একদিনের একটা ঘটনা বলি শোন, তাহাতেই বুঝিতে পারিবে আমি কত বড় বিদ্যাবতী।

আমি পুত্র দুইটিকে লইয়া শয়ন করিয়া ঘুম পাড়াইতাম, আমার স্বামী শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বেদান্তসার ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। আমি চুপ করিয়া সেই সংস্কৃত শ্লোকগুলি শুনিতাম। সই, তেমন কখনও শুনি নাই। আমি শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইতাম; শ্লোক সুন্দর কি মুখ সুন্দর কি কণ্ঠ সুন্দর তাহা বুঝিতে পারিতাম না। একদিন তাঁহাকে কহিলাম—আমাকে সংস্কৃত শিখাও। তিনি বলিলেন—আচ্ছা। শুধু "আচ্ছা" শুনিয়া আমার সন্তোষ হইল না; তাঁহাকে বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিলাম;—পুস্তক কাড়িয়া লইতাম, প্রদীপ নিবাইয়া দিতাম! আমি একদিনে বিদ্যালঙ্কার হইবার জন্য বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিলাম। একদিন তিনি কহিলেন—ভূতে পাইলে ঝাড়া ফুঁয়ে ছাড়ে। কিন্তু পেত্নী পাইলে ঝাড়া ফুঁয়ে বা জলপড়াতে ছাড়ে না। বলিয়া তিনি একখানা সরল ব্যাকরণ হাতে করিয়া আমাকে বলিলেন—এই নাও, এই ব্যাকরণের গোড়াটা আজ মুখস্থ কর, কাল তোমাকে পড়া বুঝাইয়া দিব। আমি বলিলাম—এ কি বই! তোমার সেই বই ... আমি তাহাই পড়িব।

স্বামী কহিলেন—বাঙ্গলা ব্যাকরণে জ্ঞান না জন্মিলে সংস্কৃত শিক্ষা হয় না। আগে এই বই পড়।

আমি ব্যাকরণ পড়িতে বসিলাম। তিনি আপনার পড়া দেখিতে লাগিলেন। ব্যাকরণ খুলিয়া আমার কান্না পাইল।

সই বাধা দিয়া কহিল—তাতে বুঝি হরিশ্চন্দ্রের পালা ন্যাকা ছিল? কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রামে যাত্রা হইয়াছিল এবং তাহাতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পালা অভিনয় হইয়াছিল; সই সে স্থলে উপস্থিত ছিল। আমি বলিলাম—না সই, হরিশ্চন্দ্রের পালা কি ব্যাকরণে লেখা থাকে? তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহা বলিলে কি তুমি বুঝিতে পারিবে?

সই। পারি না পারি তুমি বলই না কেন?

আমি। পুস্তক খুলিয়া দেখি, তাহাতে লেখা রহিয়াছে—অ, আ, ই, ঈ, ইত্যাদিকে স্বরবর্ণ কহে। সই, আমি অমনি পুস্তক বন্ধ করিয়া শিক্ষকের মুখ-পানে চাহিয়া রহিলাম, ক্রমে ঘুম আসিল। স্বামী কহিলেন,—আমার মুখে কিছু লেখা আছে কি? আমি অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া সেই স্থানেই শয়ন করিয়া অঞ্চল লইয়া মুখে চাপা দিলাম। সেদিন আমার ব্যাকরণ-শিক্ষা এই পর্য্যন্তই হইল। সই, পর-রাত্রে আবার স্বামী বলিলেন—এস, আগে তোমার পড়া দেখি। আমি ব্যাকরণ লইয়া বসিলাম। আমার হাতে পুস্তক, তিনি পড়া বলিয়া দিতে লাগিলেন, আর আমি হতভাগিনী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অযথা হুঁ দিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন—বুঝিতে পারিলে? আমি এক হুঁ দিলাম। তিনি কহিলেন,—কি

বুঝিলে, আমাকে বুঝাও। আমি অপ্রতিভ হইয়া রাগিয়া গেলাম। বলিলাম—যাও, বুঝাইব না!

স্বামী কহিলেন—বুঝিতে পার নাই। এস তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি—অর পর আ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়।

আমি সক্রোধে কহিলাম—হয় হউক তাহাতে আমার কি! আমি কেন তাহা লইয়া মাথা কুটিয়া রাত জাগিয়া মরিব!

স্বামী কহিলেন,—আমারই বুঝিবার ভুল! সাড়ে নয়টার সময় ঘুমাইতে না পাইলে যত ক্ষতি অর পর আ থাকিলে কি তত ক্ষতি হয়?

আমি বলিলাম—যাও, ওসব বলিলে আমি পড়িব না,—আর কখনও তোমার কাছে পড়িব না। বলিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলাম।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম; আর আমার আরাধ্যদেব হাসিয়া বলিলেন—পায়ে পড়ি, পিঠে দাঁত ছেড়ে দে, কাল সাতটা সরিষা মাথায় দিয়া গঙ্গাস্নান করিব। কাল তোমাকে লইয়া আমি পড়িতে বসিব, নচেৎ আমার স্কন্ধস্থিত প্রেতিনী ছাড়াইবার উপায় নাই! তোমাকে লইয়া না বসিলে এ বৎসর পরীক্ষা দিতে পারিব না।

—সই, আমার বিদ্যার সীমা এই পর্য্যন্ত!

সই। ছিঃ সই, তুমি ত ছেলেমানুষ নও ভাই, দুপুরবেলা কাঁদিতে নাই, চুপ কর, ছেলেদের অকল্যাণ হইবে।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।

লুপ্তকাব্য-পরিচয়

প্রবাদ আছে যে বেদমন্ত্রগুলি এক সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং পরে ঋষি সারস্বত ঐ নষ্টবেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। যে যুগকে বৈদিক যুগ বলি, সে যুগেও যে লোকসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য লৌকিক-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বেদ এবং ব্রাহ্মণ নামক সাহিত্যের কোন কোন উল্লেখ হইতে ধরিতে পারা যায়। লৌকিক-কবিতার কবিদিগকে যে কারু বলিত, এ কথা বেদমন্ত্রেই উল্লিখিত আছে। প্রলয়-পয়োধি হইতে যে সময়ে আর্ষ-মন্ত্র টানিয়া তোলা হইয়াছিল, তখন কোন মহাপুরুষ কারু-কৃত সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করেন নাই। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে যে সকল লৌকিক কাব্যের নাম পাওয়া যায়, তাহাদেরও কোন সন্ধান নাই। অতি প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি অর্ব্বাচীনযুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাইব যে, যে সকল কাব্য এক-সময়ে প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাও ধ্বংস হইয়াছে। কাল যাহা ধ্বংস করিয়াছে তাহা যে সম্পূর্ণ ধ্বংসের যোগ্যই ছিল এ কথা বলিতে পারি না। এই প্রবন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, যে প্রলয়-পয়োধি আমাদের অনেক অমূল্যরত্ন গ্রাস করিয়াছে।

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা হইতে এক সময়ে বঙ্গভাষা নামে যে মাসিক

পত্রিকা প্রকাশিত হইত, তাহাতে ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে "কয়েকখানি লুপ্তকাব্য" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এবং উহাতে উল্লেখ করিয়াছিলাম—"নাটক লিখিয়া "ভাস" নামক কবি খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু এই কবির নামাঙ্কিত কোন নাটক প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে কবি ভাসের কয়েকখানি নাটক পাওয়া গিয়াছে। গুণাঢ্য বা আঢ্যরাজ-কৃত বৃহৎ-কথা কাশ্মীরি অনুবাদে কতদূর পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে, তাহা জানা অসম্ভব। দৈবাৎ যদি সেই পৈশাচী-প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত গ্রন্থখানি পাওয়া যায়, তবে ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যাইবে। সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থখানি আন্ধ্র-ভাষায় লিখিত ছিল, এবং হইতে পারে যে, ভাসের কাব্যের মত, মাদ্রাজপ্রদেশের কোন পুস্তকালয়ে এখনও উহা রক্ষিত আছে।

ভট্টার হরিচন্দ্রের গদ্যকাব্য যখন বাণভট্ট কর্তৃক প্রশংসিত, তখন নিশ্চয়ই ঐ গ্রন্থের লোপে একখানি সুপাঠ্য সাহিত্যগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। এমন পণ্ডিতও আছেন যাঁহারা ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়-কাব্য প্রণেতা হরিচন্দ্রকে এই হরিচন্দ্র বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন। প্রথমতঃ ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয় পদ্য মহাকাব্য,—গদ্য-বন্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ এই কাব্য বাণভট্টের বহুকাল পরে, ৮০৯ শকাব্দে অর্থাৎ ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, বিলাসপুর জেলায় রতনপুরের রাজসভায় লিখিত। (২১ সর্গের ১৮৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

কবি সাতবাহনের সম্বন্ধে বাণভট্ট এইরূপ

অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ
বিশুদ্ধি জাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ।

বাণভট্টের রচনা শ্লেষপ্রায়, তাহা সকলেই জানেন। বিশুদ্ধ জাতির রত্নে কোষ সংগ্রহ, এই অর্থ ব্যতীত "জাতি" কথার অন্য অর্থ আছে। জাতি, প্রাকৃত-রচনায় একটি বৃত্তের নাম; ঐ বৃত্ত অক্ষর সংখ্যা দ্বারা অথবা মাত্রানিবদ্ধ হইয়া রচিত হইত। ভট্টি কাব্যে এবং কাব্যাদর্শে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। ইহাতে ঐ গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত তাহা বুঝিতে পারা যায়। হাল কবির গাথা-সপ্তশতীকে সাতবাহনের এই গ্রন্থ বলিয়া নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। হাল কবির এই গ্রন্থ যে বিভিন্ন কবির রচনা, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে, এবং এই কাব্য যে কদাচ বাণভট্টের উল্লিখিত কাব্য নহে, তাহা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি।

প্রথমতঃ, যে প্রাকৃত ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিত, তাহা সপ্তম-শতাব্দীরও পরবর্ত্তী সময়ের প্রাকৃত। তাহার পর হাল কবিকে হাল, শালিবাহন এবং সাতবাহন করা বড় দুঃসাহসের কথা। দ্বিতীয়তঃ, অভিনন্দ-প্রণীত রামচরিতে এই হাল-প্রণীত গ্রন্থের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ কাব্য সাতবাহন-প্রণীত বলিয়া লিখিত [illegible] নাই। তৃতীয়তঃ, বাণভট্টের বর্ণনা দেখিয়া ঐ কাব্যের নাম কদাচ গাথা সপ্ত-শতী বলিয়া মনে করা যায় না। উহার নাম সম্ভবতঃ সুভাষিত কোষ, অথবা সুভাষিত রত্নকোষ, এইরূপ কিছু ছিল। চতুর্থতঃ,

ইহাতে জাতিবৃত্ত আছে, কিন্তু অল্প। প্রাচীন সময়ে যে প্রাকৃত রচনা জাতিবৃত্তেই অধিক হইত তাহা কাব্যাদর্শে দেখিতে পাই; এবং বাণভট্টের উক্তি হইতেও জানিতে পারি যে, সাত-বাহনের গ্রন্থ জাতিবৃত্তে রচিত হইয়াছিল।

মহাকবি কালিদাস যে সুপ্রসিদ্ধ গুপ্ত-সম্রাটদের রাজত্বকালে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন তাহা মৎপ্রণীত "কালিদাস"-গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছি। সুখের বিষয় যে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আমার গ্রন্থের যুক্তিগুলি সুবিবেচিত মনে করিয়াছেন এবং কালিদাসের অভ্যুদয়কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কবি কালিদাসের পূর্ব্বে, মহারাজা সমুদ্রগুপ্তের সময়, যে সুকবির জন্ম হইয়াছিল, প্রাচীন খোদিত-লিপিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজা সমুদ্রগুপ্তের সময়কার খোদিত-লিপিতে কবি হরিসেনের নাম এবং রচনা পাওয়া যায়। এই কবি হরিসেন সমুদ্রগুপ্তের একখানি প্রস্তর লিপিতে স্রগ্ধরা, শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দে পদ্য রচনা করিয়াছেন, এবং অতি সুস্পষ্ট ওজস্বী ভাষায় গদ্য রচনা করিয়াছেন। এই লিপিতে স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত সুকবি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। নূতন নূতন ছন্দ, এবং নূতন ধরণের কাব্য-রচনা-কৌশল লইয়া যখন এই সময়ে পণ্ডিতদিগের সহিত তর্কবিতর্ক হইত তখন মনে হয় যে, ঐগুলি সম্ভবতঃ সমুদ্র-গুপ্তের সময়ে প্রায় নূতনভাবে আরব্ধ। এই দেখুন, এই লিপির একস্থানে আছে–

যস্য প্রজ্ঞানুসঙ্গোচিতসুখ মনসাঃ শাস্ত্রতত্ত্বার্থভর্ত্তুঃ
......স্তব্ধো......নি......নোচ্ছৃ.........
সৎকাব্য শ্রীবিরোধান্ বুধ গুণিতগুণাজ্ঞহতানেব কৃত্বা
বিদ্বল্লোকে বি...স্ফুটবহু কবিতা কীর্ত্তিরাজ্যাং ভুনক্তি।

সমুদ্রগুপ্তের কীর্ত্তিকলাপ লইয়া যে মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা যেন এলাবাবাদ-স্তম্ভলিপির কয়েকটি অর্দ্ধস্ফুট শব্দ হইতে সূচিত হয়। "কাব্যাং...ধ্যানপাত্রং স্তোত ব্যানেকাদ্ভুতোদারচরিতস্য" প্রভৃতি কথা আমার অনুমানের অনুকূল। হইতে পারে, যে এটা বড় দুর্ব্বল ভিত্তি, কিন্তু অসম্ভব নহে বলিয়া উহার উল্লেখ করিলাম!

কবি কালিদাসের সময়ের পরে ৪৭২ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপিতে, কবি বৎস-ভট্টির যে রচনা পাওয়া যায়, তাহা সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই "রচিতা বৎসভট্টিনা" প্রস্তর-লিপির কবিতার কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

যঃ প্রত্যহং প্রতিবিভাত্যুদয়াচলেন্দ্র
বিস্তীর্ণ তুঙ্গ শিখরস্খলিতাংশু জালঃ
ক্ষীবাঙ্গনা জন কপোলতলাভিতাম্রঃ
পায়াৎ স বঃ সুকিরণাভরণো বিবস্বান্।

মদমত্তা রমণীর কপোলের বর্ণের সহিত সূর্য্যকিরণের তুলনাটা নূতন বটে। নদী-তটস্থ নগরের শোভা-বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে:—

তটোত্থ বৃক্ষচ্যুতনৈক পুষ্প
বিচিত্র তীরান্ত জলানি ভান্তি।
প্রফুল্লপদ্মাভরণানি যত্র
সরাংসি কারণ্ডব সংকুলানি॥

বিলোল বীচী চলিতারবিন্দ
পতদ্রজঃ পিঞ্জরিতৈশ্চ হংসৈঃ
সকেশরোদারভরাবভুগ্নৈঃ

সপুষ্প ভারাবনতৈর্নগেন্দ্রৈ
র্মদপ্রগল্ভালি কুলস্বনৈশ্চ
অজস্র গাভিশ্চ পুরাঙ্গনাভি
র্বনানি যস্মিন্ সমলং কৃতানি ॥

এই প্রস্তরলিপির কবি বৎসভট্টি, যে বলভী নগরে প্রথম শ্রীধর সেন রাজার সভায় ভট্টি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে লিখিয়াছিলাম। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে কয়েকজন আমার ঐ অনুমান গ্রহণ-যোগ্য মনে করিয়াছেন। পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, যে শেষোদ্ধৃত পদ্যগুলির সহিত ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের পদ্যগুলির রচনা-সাদৃশ্য আছে। যে সকল যুক্তির বলে উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি করিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা এখন যে পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থখানি পাই, উহা গুপ্তকালের সাহিত্য। এই গ্রন্থ যখন প্রথম রচিত হয়, তখন ইহার তন্ত্র বা ভাগ, পাঁচটির স্থলে দ্বাদশটি ছিল; নামও পঞ্চতন্ত্র ছিল না। সম্ভবতঃ ইহার নাম ছিল, "করটকদমনকৌ" কারণ সিরীয়া এবং আরবে ইহার ঐ নামের অনুবাদ পাওয়া যায়। পুস্তকখানি যখন ৫৩০ খৃষ্টাব্দে পারস্য-ভাষায় ভাষান্তরিত হয়, তখনও ১২টি ভাগ ছিল। নূতন সংক্ষিপ্ত পঞ্চতন্ত্রে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিদ্রূপের অংশ অনেক পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং উহাতে পরবর্ত্তী সময়ের অনেক শ্লোকও সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সকল লুপ্তকাব্যেরই উদ্ধার-সাধন হইতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। সেদিনকার অলঙ্কার-দর্পণ গ্রন্থে যে সকল নাটক এবং অন্যান্য কাব্য হইতে দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছিল, সেইগুলিই যখন পাওয়া যায় না, তখন বেশি আশা করা চলে না। প্রাচীন খোদিত লিপিতে অনেক স্থানে যে উত্তম রচনা পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটির নিদর্শন দিয়াছি। কেহ যদি খোদিত-লিপি-সংগ্রহের গ্রন্থগুলি হইতে পর্য্যায়ক্রমে সুরচিত কবিতাগুলি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অনেক সুখপাঠ্য রচনা সাধারণের নিকট সুলভ হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সাহিত্যিক ইস্তাহার

[সাহিত্যিক সুহৃদ্বর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পূজার বাজারে আমরা এই ইস্তাহার প্রথম বাহির করিলাম। সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের ইস্তাহার ইহাতে লওয়া হইবে না। এই ইস্তাহার প্রচারের জন্য আমরা অনেকগুলি শিক্ষিত সন্দেশবাহী পারাবত নিযুক্ত করিয়াছি। সেইজন্য এই ইস্তাহারে খোপের উল্লেখ পাইবেন। কোন্ ইস্তাহার কোন্ খোপে পড়িবে আমরা ঠিক করিয়া দিব। আমাদের বিশ্বাস, এই ইস্তাহারের মারফৎ আমরা সাহিত্যিকবর্গের এবং সাহিত্যব্যবসায়ীদের উন্নতির চৌরাস্তা খুলিয়া দিতে পারিব। বিজ্ঞাপন না হইলে আজকাল কিছুই চলে না। আমাদের সাহিত্যিকেরা যে এত পঙ্গু

আশ্চর্য্য ছিপ

এ মাছ ধরিবার ছিপ নয়; লেখক গাঁথিবার ছিপ। এই ছিপ ফেলিয়া ইচ্ছামত লেখক ধরিতে পারিবেন। তবে কোন্ লেখক কোন্ টোপ গিলিবেন তাহা আমাদের নিকট জানিয়া লওয়া দরকার। বহুবিধ টোপ আমরা মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে নূতন টোপ তৈয়ারি করিয়া দিতে পারি। খোপ নং ৪৭

সমালোচকের জন্য

সম্প্রতি কোনো কোনো সমালোচক ভারি মুস্কিলে পড়িয়াছেন। তাঁহারা গীতি-কবিতা, ছোট গল্প, প্রভৃতির ভাব ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না; তাঁহারা এ সকল জিনিস ঝাপসা দেখিতেছেন—অথচ চোখে ছানি পড়ে নাই। তাঁহাদের দাওয়াই আমাদের কাছে আছে। আমাদের কাছে আসিলে আমরা আচ্ছা-করিয়া-সমঝাইয়া দিব। খোপ নং ৪২

সম্পাদক প্রয়োজন

একটি নূতন মাসিক-পত্রের উদ্গম হইবে। একজন প্রগাঢ় ঘুমন্ত সম্পাদকের প্রয়োজন। প্রতিমাসে ছাপাখানার এবং রাত্রের খানার বিল শোধ করিবার সামর্থ্য যাঁহার নাই, তিনি যেন আবেদন না করেন। ঘুমন্ত সম্পাদকের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হইবে না;—সেজন্য আমরা দায়ী থাকিব। খোপ নং ৭

গ্রন্থকর্ত্তার কারখানা

আর পরের খোসামোদ করিতে হইবে না!

এতদিনে দেশের দারুণ দুর্ভাবনা দূর হইল!

আমরা গ্রন্থকর্ত্তা প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিয়াছি।

আমাদের এই কারখানা হইতে নানা প্যাটার্ণের চমৎকার চমৎকার গ্রন্থকার বাহির হইতেছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। খোপ নং ১৪

সভাপতি হইবার কাকুতি

আমি সাহিত্যসংক্রান্ত (রাজনৈতিক নহে) সভার সভাপতি হইতে চাই। আমার যোগ্যতা ও গুণপনা এই:—আমার জমিদারীর বার্ষিক কম নহে এবং আমি রাজসম্মানেও ভূষিত। আমাকে সভাপতি করিলে সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ লাভবান হইবার সম্ভাবনা।

মহামন্ত্র প্রচার

অনেকদিন ধরিয়া এক জটাজুটধারী হিমালয়বাসী মহাত্মার মনস্তুষ্টি করিয়া এই মহামন্ত্র লাভ করিয়াছি। আমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি একদিন বলিলেন—"যাও বৎস! তোমাকে এই অমূল্য মহামন্ত্র দিলাম—জগতের হিতার্থ ইহার প্রচার কর।" পবিত্র হিমালয় ছাড়িয়া এই পাপ-পঙ্কিল সংসারে আসিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করিব? গুরুর আদেশ! সন্ন্যাসীপ্রদত্ত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহামন্ত্রের গুণ এই যে ইহার মাহাত্ম্যে মাসিক-পত্রের সম্পাদক হইতে আরম্ভ করিয়া ছাপক পর্য্যন্ত যাহাকে খুসী বশ করা যায়। এই মন্ত্র পড়িয়া কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প যাহা পাঠাইবেন কিছুতেই ছাপা থাকিবে না—নিশ্চয় ছাপা হইবে। মন্ত্রবলে খলস্বভাব সর্প বশ হয় দেখিয়াছেন তো? তবে সন্দেহের কারণ কি? খোপ নং ২৮

সাহিত্যের উন্নতি

ইহা সকলেই জানেন আজকালকার অর্ব্বাচীন সাহিত্য আমাদের সনাতন আদর্শ নাশ করিতে বসিয়াছে। আমাদের এত সাধের গরল-হীন সরল সমাজ, ঘুটঘুটে-অন্ধকার অন্তঃপুর, কুণ্ডলীময় পরিপক্ব পাকশালা, বিলাতী বৈ-বিবর্জ্জিত বৈষয়িক বৈঠকখানা—এ সমস্তেরই উচ্চ আদর্শ অসার সাহিত্যের দৌরাত্ম্যে হীন হইয়া পড়িতেছে। ইহার একটা উপায় করা চাই ভাবিয়া আমরা যোগাসনে বসিয়াছিলাম। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর একটা প্রকৃষ্ট উপায় বাহির হইয়াছে। বাজারে গোরুর ছবির মধ্যে আমাদের সমস্ত দেবদেবীর অধিষ্ঠান দেখিয়াছেন তো! এই গোরুকে দিয়া যদি সাহিত্য রচনা করানো যায়, তাহা হইলে কিছুতেই আমাদের উচ্চ আদর্শের মর্য্যাদা নষ্ট হইতে পারে না এবং তাহাতে সাহিত্যের উন্নতি হইতেই হইবে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য অনেক। বিস্তারিত করিয়া সকল কথা লিখিতে গেলে খরচ বাড়িয়া যায়। অতএব সাহিত্যের উন্নতিপ্রয়াসীগণ! আমাদের অফিসে আসিয়া পরামর্শ করুন। খোপ নং ৩৫

গন্ধমাদন

ওয়েবষ্টার ডিক্সনারী দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই! আমরা তাই বিপুল আয়োজনে ঠিক সেই আকারের নূতন মাসিক-পত্র বাহির করিতেছি। প্রতিমাসে ওজন করিয়া লইবেন—এক মণ ওজনের বিরাট পত্রিকা! পাতায় পাতায় ছবি থাকিবে। লেখকদের ছবি তো ইহাতে থাকিবেই! তাহার উপর যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাঁহাদের কলম ধরিবার প্রধান সহায় সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছবি, যাহাতে লেখেন সেই দোয়াতের ছবি, কলমের ছবি থাকিবে। আরও শুনুন! বিজ্ঞাপন- দাতাদের ছবি, তাঁহাদের ফার্ম্মের ছবি—যে প্রিণ্টার কাগজ ছাপিবে তাহার ছবি—

যে সকল কম্পোজিটর প্রাণপাত-পরিশ্রমে কাপি দেখিয়া ভুল টাইপ সাজাইবে তাহাদের ছবি, যে কুলী ললাটের ঘর্ম্ম চরণে ফেলিয়া কাগজ বহিয়া আনিবে, তাহার ছবি, যে দপ্তরী বই বাঁধিবে তাহার ছবি,—এমন কি ডিকিন্সন কোম্পানির দরোয়ানদের ছবি পর্য্যন্ত আমরা প্রতি মাসে ছাপিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি।

তাহার পর প্রবন্ধ! যিনি যাহা লিখিবেন, গন্ধমাদন সাদরে তাহাই বক্ষে ধরিবে।

প্রথম সংখ্যার জন্য জাঁকালো আয়োজন হইতেছে। অনেক অর্থব্যয়ে আমরা "আলকাৎরার স্বরূপ" নামে প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে ৫২ খানি ছবি থাকিবে। পটুয়াদের আঁকা ছবির ন্যায় এ ছবির ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন নাই—ছবি দেখিয়াই সকলে বুঝিয়া ফেলিবেন, আদি ও অকৃত্রিম আলকাৎরা। এই ছবির গায়ে তুলি বুলাইয়া আপনারা বাড়ীর কড়ি-কাঠের কাঠিন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া বিখ্যাত লক্কড় ও ভুইফোঁড় কবিদের কবিতা, সবজান্তা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের স্নিগ্ধ-শীতল পান্তা প্রবন্ধ এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ফক্কড় হামবড়া গল্পলেখকদের দমে-ভারী ও দম-হারী গল্প ও উপন্যাসে গন্ধমাদন আচ্ছাদিত থাকিবে!

মূল্য নগদে দিতে পারেন, ধারও রাখিতে পারেন অর্থাৎ যাঁহার যেমন সুবিধা। যিনি তাহাও না পারিবেন, তিনি পত্র লিখিয়া স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করুন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য চিঠি লিখুন—বেয়ারিং পত্রও সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি কার্য্যাধ্যক্ষ গন্ধমাদন। খোপ নং ৬৩

ব্রহ্মচারী ফিল্‌টার বা বিশুদ্ধ বক-যন্ত্র

ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প জগতে অভাবনীয় আবিষ্কার! উচ্চ শিক্ষিত সাধারণের উন্নতি-কল্পে বিরচিত এই ফিল্‌টার-যন্ত্রটি ব্যবহার করুন। পরিশুদ্ধ সাহিত্যের বিশুদ্ধানন্দ উপভোগ করিয়া নির্ব্বিকার জীবন যাপন করিতে থাকুন। ইহার গুণ এই যে ইহা সাহিত্যের চিত্ত-উদ্‌ভ্রান্তকারী অসার রসকষ মারিয়া একেবারে খাঁটি পবিত্র মালটুকু বাহির করিয়া দেয়। প্রাপ্তিস্থান:—নয় নম্বর, রসিক কর্ম্মকার্‌স্ লেন এবং মুচীপাড়া নবীনমিস্ত্রীর জুতার দোকান ও বঙ্গদেশের তাবৎ ধর্ম্ম-শালা এবং পাঠ-শালার সংলগ্ন আমাদের এজেন্সি।

"প্রশংসাপত্র"

বক্ষ, চুম্বন, রসনা, মেখলা, যুগল-মিলন, কুহু-কেকা ইত্যাদি ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক দুষ্ট সাহিত্যের পক্ষে আপনাদের ব্রহ্মচারী ফিল্‌টার ও বিশুদ্ধ বক-যন্ত্র সম্মার্জ্জনীর কাজ করিতেছে। আর কিছুদিন ইহা রীতিমত চলিলে বঙ্গ-সাহিত্য সম্পূর্ণ দোষ-বর্জ্জিত টেক্‌সট্‌ বুকের আকার ধারণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাস্তি। ইতি—সম্পাদক "সম্মার্জ্জনী।"

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।